(বঙ্গানুবাদ)

স্বাধীনতার সঙ্কল্প-বাণী

(২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ পূর্ণ স্বরাজ দিবসে ভারতীয় জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত)

"আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভের জন্য অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের ন্যায় ভারতবাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় শ্রমার্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনও গভর্নমেণ্ট কোনও জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে নির্যাতন করে তবে সেই গভর্নমেণ্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করার অধিকারও সেই জাতির আছে। ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াই বিরত হয় নাই, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষকে অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যতা ও ধর্মনীতির দিক দিয়া ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

"অর্থনীতির দিক হইতে ভারতের সর্বনাশ সাধন করা হইয়াছে। আয়ের তুলনায় অত্যধিক পরিমিত রাজস্ব আমাদের দেশের লোকের নিকট হইতে আদায় করা হয়। আমাদের দৈনিক গড়ে আয় মাত্র সাত পয়সা। আমরা যে গুরুকরভার বহন করিতে বাধ্য হই তাহার শতকরা ২০ টাকা কৃষকদিগের নিকট হইতে ভূমিকর স্বরূপ এবং শতকরা ৩ টাকা লবণের শুল্ক বাবদ আদায় করা হয়। এই শুল্কভারে দরিদ্র জনসাধারণ অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে। সূতাকাটা প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার পরিবর্তে অন্যান্য দেশের ন্যায় কোনও নতুন শিল্পের প্রবর্তন করা হয় নাই—ফলে দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে বৎসরে অন্ততঃ চারিমাস কাল অলসভাবে সময় কাটাইতে হইতেছে এবং কুটির শিল্পের অভাবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও খর্ব হইতেছে।

"বাণিজ্যশুল্ক এবং মুদ্রানীতি এরূপ চতুরতার সহিত পরিচালিত করা হইতেছে যে, তাহার ফলে কৃষকদের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

(প্রাচীন ও মধ্য যুগ)

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., পি. এইচ. ডি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভূতপূর্ব শতবার্ষিকী
অধ্যাপক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস
বিভাগে ভূতপূর্ব গুরু নানক অধ্যাপক

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

কলকাতা • বোম্বে • দিল্লী • হায়দ্রাবাদ

প্রকাশক :
রাজীব নিয়োগী
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩

প্রথম সংস্করণ :
পৌষ ১৩৬৭
জানুয়ারি ১৯৬০

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শিবব্রত রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীশিবনাথ পাল
প্রিণ্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৪

প্রকাশকের নিবেদন

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *History of India* নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত বইটি ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। রুশ, রুমানীয়, সিংহলী এবং অসমীয়া ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার বহুল প্রচলন আছে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে নূতন গবেষণার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিভিন্ন সংস্করণে বইটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশিত নূতন সংস্করণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ সংযোজিত হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গের সকল কলেজেই এখন বাংলা ভাষায় অধ্যয়ন-অধ্যাপন সুপ্রচলিত হইয়াছে। বহু অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রী আমাদিগকে *History of India* বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাই আমরা বইটির সম্প্রতি প্রকাশিত নূতন সংস্করণের সরল ও সহজপাঠ্য বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থকারের নির্দেশ অনুযায়ী ডঃ দীপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজ, কলিকাতা) এবং ডঃ শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, ভিক্টোরিয়া ইনৃস্টিটিউশন, কলিকাতা) অনুবাদের কাজটি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হইয়াছে এবং যাহাতে সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর পক্ষে বইটি সর্বতোভাবে সহায়ক হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। আশা করি বইটি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সহায়ক হইবে।

প্রথম খণ্ডে প্রাচীনতম কাল হইতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ কালের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিক যুগের (১৭০৭-১৯৪৭) ইতিহাস আলোচিত হইবে।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১. ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভৌগোলিক উপাদান

কথিত আছে, "ভূগোল এবং কালগণনা হইল সূর্য এবং চন্দ্র, ইতিহাসের দক্ষিণ চক্ষু এবং বাম চক্ষু"। ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তনের কাহিনী সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে ইহার সহিত জড়িত ভৌগোলিক তথ্যাদি সম্বন্ধেও উপযুক্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সীমা—ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক

ভৌগোলিক বিচারে ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশ—এই তিনটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র লইয়া গঠিত ভারতীয় উপমহাদেশ উত্তরে, উত্তর-পশ্চিমে এবং উত্তর-পূর্বে পর্বতমালা দ্বারা, এবং অন্যান্য দিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। ব্রহ্মদেশ কিংবা সিংহল ভৌগোলিক বিচারে এই উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত নহে।

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সীমা অবশ্য সর্বদা ইহার প্রাকৃতিক সীমার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে নাই। ভৌগোলিক দিক হইতে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান বিশাল ইরাণীয় মালভূমির অংশ, কিন্তু ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে এই দুইটি ভূখণ্ড বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। মৌর্য সম্রাটগণ ঐ দুইটি দেশের কোন কোন অংশের উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। বাহলীক দেশীয় গ্রীকগণ (Bactrian Greeks), পহ্লবগণ (Parthians), শকগণ ও কুষাণগণ আফগানিস্থানের এক বৃহৎ অঞ্চলের সহিত উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চলকে যুক্ত করিয়াছিল। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী এবং মুঘল সম্রাটগণের শাসনকালে ভারতবর্ষ আবার আফগানিস্থানের সহিত রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুঘল যুগে আফগানিস্থান ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আহম্মদ শাহ আবদালী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও কাশ্মীর আফগানিস্থানের শাসনাধীন হয়। অদ্যাবধি বেলুচিস্থানের কিছু অংশ—যাহা ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সীমার অন্তর্ভুক্ত নহে, বরং যাহা প্রকৃতপক্ষে ইরাণীয় মালভূমির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ—পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে তাকাইলে দেখা যাইবে, প্রায় দুর্ভেদ্য গিরিশ্রেণী আসাম ও বাংলাকে ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ব্রহ্মদেশ ভারতীয় সংস্কৃতির নিকট নানাভাবে ঋণী। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের সমাপ্তি

পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতের রাজনৈতিক প্রভাব-পরিধির বাহিরে ছিল। এই যুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জয়লাভের ফলে ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ বাংলা সরকারের শাসনাধীনে আসে। ১৮৫২ ও ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি পৃথক খণ্ড বলিয়া স্বীকৃত হইলে ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের এই দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক সম্পর্কের অবসান হয়।

সন্নিহিত সমুদ্রের দ্বীপসমূহ—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভারতীয় শাসকের শাসনাধীন হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের চোল রাজগণ এই সকল দ্বীপের কোন কোনটি অধিকার করেন। বিজয় সিংহ নামে একজন দুঃসাহসী ভারতীয় অভিযাত্রী সিংহল অধিকার করিয়া নিজ শাসনাধীনে আনেন। বিজয় সিংহ বাংলার অধিবাসী বলিয়া প্রবাদ আছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংরাজ সরকার সিংহল এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ এখনও ভারতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সিংহলের সহিত ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের কোন সময়েই শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক ছিল না।

সামুদ্রিক ঐতিহ্য

ভারতবর্ষের উপকূলভাগ অতিশয় দীর্ঘ, প্রায় ৩,০০০ মাইলেরও অধিক বিস্তৃত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় উপকূলে স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা কম। উপকূলভাগ প্রায়শঃ সরলরেখায় সম্প্রসারিত থাকার ফলে সুবিধাজনক পোতাশ্রয়ের সৃষ্টি হইতে পারে নাই। প্রাচীন যুগে ও মধ্য যুগে ভারতীয় শাসকগণের দৃষ্টি উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিকেই নিবদ্ধ ছিল; সমুদ্রপারের দেশ অপেক্ষা পশ্চিম এশিয়া, পারস্য, মধ্য এশিয়া, চীন এবং তিব্বত তাঁহাদের মনোযোগ অধিক আকর্ষণ করিত। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করাও ভুল হইবে যে সমুদ্রের রহস্য কোন সময়েই ভারতীয়দের মনকে আলোড়িত করে নাই। প্রাগৈতিহাসিক কালের দ্রাবিড়গণ বাণিজ্যের জন্য জাহাজে করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিত। প্রাচীন আর্যগণের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

Periplus of the Erythrean Sea নামক সুপরিচিত গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষের সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে বহুসংখ্যক ভারতীয় সামুদ্রিক বন্দরের এবং বাণিজ্যকেন্দ্রের উল্লেখ আছে। বাণিজ্যিক উদ্যোগ এবং অভিযানের স্পৃহা সহস্র সহস্র ভারতীয়কে পূর্ব সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ এবং তৎসন্নিহিত দ্বীপগুলির অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক, পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত) তখন ছিল এক সমৃদ্ধ বন্দর। এইখানেই প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্যটক

ফা-হিয়েন চীনে প্রত্যাবর্তনের জন্য জাহাজে আরোহণ করেন। চোলগণ 'সমু মধ্যবর্তী বহু প্রাচীন দ্বীপে' তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সপ্তদশ ও অষ্ট শতাব্দীতে মারাঠাগণ একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের মুসলমান শাসকগণের মধ্যে কেহ কেহ স্থলভাগে অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইলেও নৌ-শক্তি সম্বন্ধে তাঁহারা কখনও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। নৌ-শক্তি সংগঠনে অবহেলাকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পর্তুগীজগণ ভারত মহাসাগরে তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করে। পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবুকার্ক (Albuquerque) সমুদ্র উপকূলে গোয়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া এবং রণকৌশলের দিক হইতে বিশেষ উপযোগী উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির শাসকগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া সেই আধিপত্য আরও সুদৃঢ় করেন। পর্তুগীজ নৌ-শক্তি ধ্বংস করিতে অসমর্থ হইলেও ওলন্দাজগণ সপ্তদশ শতাব্দীতে যবদ্বীপ, মলক্কা, কলম্বো ও কোচিন অধিকার করে। তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী ও ইংরাজ বণিকদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে ইংরাজ-গণ তাহাদের নৌ শক্তির সাহায্যে বিজয়ী হয়। ১৭৮২-৮৪ খ্রীস্টাব্দে ভারত মহা-সাগরে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সাফ্রেন (Suffrein) ব্যর্থ হইলে এই অঞ্চলে ইংরাজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সিঙ্গাপুরের পতন পর্যন্ত তাহা অটুট ছিল। প্রায় দেড়শত বৎসরের অধিককাল ভারত মহাসাগরে ইংরাজ প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ অথবা 'বৃহত্তর ভারত' সাংস্কৃতিক দিক হইতে ভারতীয় প্রভাব-পরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতীয় বন্দরগুলি হইতে নৌ-শক্তির মাধ্যমে এই উপমহাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের সহিত ঐ সকল দ্বীপের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তাহার কেন্দ্র ছিল ভারতে। পর্তুগীজদের পরে আসে ওলন্দাজগণ। তাহাদের মূল ঘাঁটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাটাভিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাদের নৌ-শক্তির কেন্দ্র ছিল সিংহল। ওলন্দাজগণ পরে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর সহায়তায় পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অধিকার প্রসারিত করে। অতএব, পূর্ব সমুদ্রে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ আধিপত্যের যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক আত্মরক্ষার প্রশ্ন ভারতবর্ষের সহিত যুক্ত ছিল।

বহির্জগতের সহিত যোগ

আমরা যখন ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সীমানার—অর্থাৎ যে সকল পর্বতমালা ও সমুদ্র ভারতবর্ষকে অবশিষ্ট পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের—

কথা বলি, তখন স্বভাবতঃই ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্যকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে আমরা প্রলুব্ধ হই। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বের ঝড়-ঝঞ্ঝা হইতে সংরক্ষিত, নিরাপদ ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একটি বৃক্ষের সহিত তুলনা করিলে ভুল হইবে। ইহা সত্য যে 'হিমালয় পর্বতমালার রক্ষা প্রাচীর' প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছে। তথাপি উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের এই সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী ভারতবর্ষকে অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে অথবা অন্যান্য দেশের সহিত তাহার বাণিজ্যসম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে খাইবার, গোমাল ও বোলান প্রভৃতি একাধিক সুপরিচিত গিরিপথ রহিয়াছে। নানা প্রাকৃতিক বাধা সত্ত্বেও আর্য অভিযানকারীগণ হইতে আহম্মদ শাহ আবদালী পর্যন্ত বহু বৈদেশিক আক্রমণকারী এই সকল গিরিপথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তরে তিব্বত ও নেপাল হইতে একাধিক পথে কেবলমাত্র সংস্কৃতি ও ধর্মের শান্তিপ্রিয় প্রচারকগণই নহে, সামরিক আক্রমণকারীগণও আসিয়াছে। উত্তর-পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্তী পর্বতমালার নানা ছিদ্রপথ দিয়া আসিয়াছে তিব্বতীয়-বর্মীগণ, আহোমগণ ও বর্মীগণ। ভারতের প্রাকৃতিক সীমানার গুরুত্ব এই যে তাহা এই দেশকে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আংশিকভাবে রক্ষা করিয়াছে এবং সুনির্দিষ্ট সীমারেখার দ্বারা ভারতীয় জনগণকে এশিয়াবাসী অন্যান্য জনগোষ্ঠী হইতে পৃথক রাখিয়া তাহাদের একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে।

ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক বিভাগ

ভারতবর্ষ চারটি তথাকথিত আঞ্চলিক বিভাগে ('Territorial compartments') বিভক্ত—(১) সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চল, (২) গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল, (৩) বিন্ধ্য পর্বতমালা এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (Deccan Plateau), এবং (৪) 'সুদূর দক্ষিণ' (Far South)। সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলের পথ দিয়া যুগ যুগ ধরিয়া আক্রমণকারী ও অনুপ্রবেশকারীগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ঐতিহাসিক বিচারে গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যগুলির বিকাশ এইখানেই ঘটিয়াছে, এবং সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলির কেন্দ্রস্থলও এই অঞ্চল। ভারতীয় ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্য কয়েকটি সুস্পষ্ট ভৌগোলিক কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উত্তর ভারতের বিশাল উপত্যকা রাজস্থানের মরুভূমি ও আরাবল্লী পর্বতমালার দ্বারা দুইটি অসমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মরুভূমির পশ্চিম দিকের সমতল অঞ্চল সিন্ধু নদের দ্বারা বিধৌত, এবং ইহার পূর্ব দিকের সমতল ভাগ গঙ্গা ও উহার উপনদীগুলি দ্বারা বিধৌত। এই নদীসমূহের অবস্থানের ফলে ভূমি উর্বরা এবং যোগাযোগ সহজ হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সিন্ধু-গাঙ্গেয় অববাহিকা

অঞ্চল এক সমৃদ্ধ, ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বাসভূমিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের ইতিহাস বরাবর উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে আগত আক্রমণকারীগণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম ইংরাজগণ। এই সকল আক্রমণকারীর দল স্বভাবতঃই গঙ্গানদীর প্রবাহ অনুসরণ করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে। অতঃপর তাহারা বিন্ধ্য পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়। আর্য ও মুসলমান আক্রমণের ইতিহাস এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। দিল্লী গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের প্রবেশমুখে অবস্থিত। উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে হইলে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে আগত সকল আক্রমণকারীকেই দিল্লী অথবা তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্য হইতে অগ্রসর হইতে হইত। এই কারণেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ—তরাইনের দুইটি এবং পানিপথের তিনটি যুদ্ধ—এবং কর্নালের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধও দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলেই সংঘটিত হয়।

বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত অপর দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগ কয়েকটি ভৌগোলিক বাধার জন্য উত্তর ভারত হইতে কিছু পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। বিন্ধ্য পর্বতমালা এই অঞ্চলকে উত্তর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্বেই ভারতে অনুপ্রবেশকারী আর্যগণ প্রমাণ করিয়াছিল যে এই সুউচ্চ এবং বহুদূর বিস্তৃত পর্বতমালা প্রকৃতপক্ষে অনতিক্রম্য নহে। তাহারা যে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রপাত করিয়াছিল তাহা কালক্রমে আরও ঘনিষ্ঠ হয়, এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দক্ষিণাপথ আর্যাবর্তের মতই ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাক্ষিণাত্য এবং 'সুদূর দক্ষিণের' ইতিবৃত্ত উত্তর ভারতের ইতিবৃত্তের তুলনায় কম গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ, বিন্ধ্য পর্বতের অপর প্রান্তবর্তী অঞ্চলের ইতিহাস মূলতঃ দ্রাবিড়গণের ইতিহাস; কিন্তু তাহাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কীর্তির সুবিচার করার মত উপযুক্ত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। 'দক্ষিণের কোন শক্তি কখনও উত্তর ভারতকে পদানত করার চেষ্টা করিতে পারে নাই, কিন্তু আর্যাবর্ত বা হিন্দুস্থানের অপেক্ষাকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজগণ প্রায়শঃ নর্মদা নদীর সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বহু দূর পর্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন।' অবশ্য রাষ্ট্রকূট ও চোল বংশীয় কোন কোন দক্ষিণ ভারতীয় নৃপতি স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে না হইলেও অন্ততঃ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং সামরিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য উত্তর ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন। মারাঠাগণ পুনাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এক বৃহৎ অংশব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তবুও মোটের উপর, দক্ষিণ ভারতের ভূমিকা উত্তর ভারতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই বিশাল দেশের জটিল ইতিবৃত্তের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা আনিতে হইলে যে সকল সামরিক অভিযানের কোন স্থায়ী ফল হয় নাই, তাহাদের উপর গুরুত্ব

আরোপ না করিয়া ভারতবর্ষের ঐতিহাসিককে বৃহৎ রাজ্য ও সাম্রাজ্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। যে সকল রাজ্য আঞ্চলিক গুরুত্বের অধিক শক্তি কখনও অর্জন করিতে পারে নাই, তাহাদের তিনি কেবল গৌণ মর্যাদা দিতে পারেন।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি পূর্ব ঘাট ও পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার দ্বারা তিনটি সুস্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব ঘাট পর্বতমালা বহু অংশে বিভক্ত, কিন্তু পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা প্রায় অবিভক্ত একটি প্রাচীর। করোমণ্ডল উপকূল পূর্ব ঘাট পর্বতমালা ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে অবস্থিত; কোঙ্কন উপকূল এবং মালাবার পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা ও আরব সাগরের মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে ও পশ্চিমে বিস্তৃত এই দুইটি পর্বতমালার মধ্যবর্তী অঞ্চলটি দাক্ষিণাত্যের মালভূমি নামে অভিহিত। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক হইতে এই তিনটি সুচিহ্নিত প্রাকৃতিক বিভাগের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই, কারণ রাজনৈতিক ঐক্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথে পর্বতগুলি কখনও অন্তরায় হইয়া উঠিতে পারে নাই। মারাঠাগণ পশ্চিম ঘাট পর্বতের উভয় প্রান্তে বাস করে; কিন্তু তাহাদের ভাষা এক, সামাজিক রীতি-নীতি এক। মহারাষ্ট্র যখন যে শক্তির দ্বারা শাসিত হইয়াছে, প্রায়ই পশ্চিম ঘাট ও আরব সাগরের মধ্যবর্তী কোঙ্কন উপকূলকে সেই শক্তির নিয়ন্ত্রণে আসিতে হইয়াছে।

গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী দাক্ষিণাত্যকে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করিয়াছে। এই তিনটি বিভাগে যে সকল রাজ্য প্রাধান্য লাভ করিত, তাহাদের পারস্পরিক সংগ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস আবর্তিত হইত। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব দাক্ষিণাত্য ও 'সুদূর দক্ষিণের' প্রধান রাজগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখ্য কেন্দ্র ছিল। রায়চুর দোয়াবে প্রাধান্য স্থাপনের প্রলোভন কয়েকটি প্রজন্ম ধরিয়া বাহমনী সুলতানগণ ও বিজয়নগরের রাজগণকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল।

কোনরূপ সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখা কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর পরপারের 'সুদূর দক্ষিণ' অঞ্চলকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করে নাই। কিন্তু তবুও ইহার একটি রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ছিল। কৃষ্ণা নদীর উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলের রাজনৈতিক ঘটনাবলী এই স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষ বিপর্যস্ত করে নাই। এই 'সুদূর দক্ষিণই' ছিল দ্রাবিড় জাতির সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব ও রাজনৈতিক প্রতিভার প্রকৃত কেন্দ্র। এই অঞ্চলেই, আগ্রাসী ও বিজয়ী উত্তর ভারতের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত থাকিয়া, তাহাদের চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল। উত্তর ভারতের হিন্দু অথবা মুসলমান কোন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতাই 'সুদূর দক্ষিণের' সমগ্র ভূভাগের উপর আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই।

মহীশূর এবং তামিল দেশ হইতে মালাবারে যাওয়া কঠিন ছিল বলিয়া এই অঞ্চল দক্ষিণ ভারতের মূল কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। সৈন্যদলের পক্ষে স্থলপথে মালাবারে প্রবেশ করা সহজ ছিল না। মালাবারের প্রবেশ পথ সমুদ্রের দিকে,

ভারতীয় স্থলভাগের দিকে নহে। এই জন্য প্রথম হইতে আরব ঔপনিবেশিকগণ এবং পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ এই অঞ্চলে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল।

নদীসমূহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

উত্তর ভারতের নদীগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। সিন্ধু নদের উপত্যকায় ভারতের প্রাচীনতম নাগরিক সভ্যতার—মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতার—উদ্ভব হয়। পাঞ্জাবের নদীসমূহ ও গঙ্গা নদী উত্তর ভারতের আর্য সভ্যতার প্রকৃতি ও গতি বহুলাংশে নির্ধারণ করিয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার বিশালতা ও সমৃদ্ধি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক প্রসারের পক্ষে বিশেষ-ভাবে অনুকূল ছিল। উত্তর ভারত অকারণে সকল ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া গণ্য হয় নাই। ফরাসীদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ইংরাজদের সাফল্যের মূলে ছিল সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং গাঙ্গেয় নদীপথের উপর তাহাদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ। ইংরাজদের অগ্রগতির পরবর্তী স্তরে—লর্ড অকল্যাণ্ড ও লর্ড এলেনবরোর দুর্নীতিমূলক কার্যাবলীর মাধ্যমে—সিন্ধু নদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবেই তাহারা পাঞ্জাব অধিকার করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অন্যরূপ ; সেখানে নদীপথের উপর অধিকার বিস্তার করিয়া রাজ্যাভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করা সহজ নয়। ঐতিহাসিক বিচারে এই নদীগুলি কেবলমাত্র কমবেশী সুবিধাজনক রাজনৈতিক সীমারেখা হিসাবেই কাজ করিত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র নদীর ভূমিকা ছিল কিছু পরিমাণে উত্তর ভারতে গঙ্গা নদীর ভূমিকার অনুরূপ।

ভারতের নদীসমূহ এবং তাহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে অতীতে অনেক নদীরই গতিপথ পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং কোন কোন নদী এখনও গতিপথ পরিবর্তন করিতেছে। নদীতে প্রবল বন্যা হইলে জলস্রোত সহজেই পলিমাটি দ্বারা গঠিত কোমল ভূখণ্ড ভেদ করিয়া গতিপথ রচনা করে। বৈদিক আর্যগণের সমসাময়িক নদীগুলির গতিপথ এখন আর নির্ধারণ করা যায় না। বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সময় সিন্ধু নদ কোন্ পথে প্রবাহিত হইত তাহাও এখন সঠিক জানা যায় না। প্রথম মুসলমান অভিযানগুলির সময় হইতে নদীগুলির গতিপথে বহু পরিবর্তন হইয়াছে, এবং এই পরিবর্তনের কথা স্মরণ না রাখিলে এই সকল বিজেতাদের সমসাময়িক ইতিহাস বুঝা যাইবে না।

স্বভাবতঃই নদীর গতিপথে পরিবর্তন হইলে তাহার পার্শ্ববর্তী শহরগুলির অব-স্থানেরও পরিবর্তন ঘটিত। পাটলিপুত্র সূচনায় গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে ঐ স্থানটি সঙ্গম হইতে বহু মাইল দূরে অবস্থিত। যদি অদ্যাবধি পাটলিপুত্র নগরের অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে কেবলমাত্র শোণ নদের গতিপরিবর্তনের জন্যই তাহার সামরিক গুরুত্ব বিলুপ্ত হইত। কোনও নদীর

তীরে অবস্থিত নগর নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে পারে। পাঞ্জাবের মধ্য হইতে একদা রাজস্থানের দিকে প্রবাহিত হাকরা নদীর গতিপথ এখন কেবলমাত্র কয়েকটি মাটির স্তূপের দ্বারাই নির্ধারণ করা যায়। "এই স্তূপগুলি অসংখ্য বিস্মৃত এবং প্রায়শঃই নামহীন শহরের অস্তিত্বের নীরব সাক্ষী।"

উপকূল রেখার পরিবর্তন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে স্থলভাগের উচ্চতার তারতম্যের ফলেও এইরূপ পরিণতি ঘটিতে পারে। তমলুকের প্রাচীন বন্দর এখন সমুদ্র হইতে বহু দূরে। তামিল নাড়ুর তিন্নেভেলী উপকূলের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যনগরী কায়ল এখন সমুদ্রতীর হইতে বহু দূরে অবস্থিত এবং বালুকাস্তূপে প্রোথিত। কোন কোন স্থলে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার পরিবর্তে বরং আরও অগ্রসর হইয়াছে। সমুদ্রের তটরেখা পরিবর্তনের ফল অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ।

২. ভারতবর্ষের মৌলিক ঐক্য

বৈচিত্র্যের লীলাভূমি

ভৌগোলিক বিচারে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ বৈচিত্র্যের দেশ। এইজন্য সঙ্গতভাবেই তাহাকে 'পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ' ('the epitome of the world') বলা হইয়াছে। প্রাকৃতিক দিক হইতে, জলবায়ু ও আবহাওয়া, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু, এ সকলের বৈচিত্র্য স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হিমালয়ের শুষ্ক, প্রবল শৈত্য হইতে কোঙ্কন ও করোমণ্ডল উপকূলের আর্দ্রতাযুক্ত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উত্তাপ পর্যন্ত আবহাওয়ার নানারকম বৈচিত্র্য এখানে দেখা যায়। ভারতবর্ষে সব রকমের আবহাওয়াই পাওয়া যায়—মেরুদেশীয় আবহাওয়া, পরিমিত আবহাওয়া (temperate climate) এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া (tropical climate)। বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও তারতম্য দেখা যায়। আসামের চেরাপুঞ্জিতে বৎসরে ৪৮০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়; পৃথিবীতে ইহাই বৃষ্টিপাতের সর্বোচ্চ নিদর্শন। আবার সিন্ধু ও রাজস্থানের কোন কোন অঞ্চলে বৎসরে ৩ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানে বর্ণিত উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর প্রায় সকল প্রজাতির নমুনাই এখানে দেখা যায়।

জাতিসংমিশ্রণ

ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের তুলনায় তাহার কোটি কোটি অধিবাসীর জাতিগত বৈচিত্র্যও কম উল্লেখযোগ্য নহে। সঙ্গতভাবেই ভারতবর্ষকে একটি 'নৃতাত্ত্বিক যাদুঘর' (ethnological museum) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির উপনিবেশস্থাপনার্থীগণকে স্থান দিয়া আসিতেছে। সুদূর অতীতে এদেশে নব্য-প্রস্তর যুগ ও তাম্র-প্রস্তর যুগের যে সব

মানুষ বাস করিত তাহাদের কোন জাতি হইতে উদ্ভব সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। ভারতের অধিবাসীদের অনেকের শরীরে যে দ্রাবিড় জাতির রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। দ্রাবিড়গণের পর দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ আর্যগণ ভারতে পদার্পণ করে। যদিও প্রথমে তাহারা এই দেশের অনার্য কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী সম্প্রদায়সমূহ হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, তবুও নিঃসন্দেহে পরবর্তী-কালে উহাদের পরস্পরের মধ্যে রক্তের যথেষ্ট সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। আর্যদের আগমনের পর বহু শতাব্দী ভারতে কোন বৈদেশিক জাতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথগুলি কোনও সময়েই বিদেশীদের পক্ষে সম্পূর্ণ রুদ্ধ ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আহোমদের অনুপ্রবেশের পূর্বে উত্তর-পূর্ব গিরিপথগুলির মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও নিশ্চয়ই একাধিক বহিরাগত দলের পদার্পণ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিক যুগে যে সকল বৈদেশিক জাতি উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে তাহাদের মধ্যে প্রথম ছিল ইরাণীয় বা পারসিকগণ। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অ্যাকিমেনীয় (Achaemenian) শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তাহারা আসিয়াছিল। তাহাদের পরে আসিল দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সহগামী ও অনুগামী গ্রীকগণ। তাহার পর আসে পহ্লব (Parthian) ও শকেরা (Scythians)। তাহারা বেশ কিছুকাল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করে এবং কালক্রমে ভারতীয় জনসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়। "জাতি-বর্ণ-নির্বিচারে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গিরিপথগুলি পার হইয়া আগত সকল বিদেশী সম্বন্ধেই ভারতীয়গণ 'শক' শব্দটি ব্যবহার করিত। শক বলিতে কুৎসিত-দর্শন ক্ষুদ্র চক্ষু মোঙ্গলদেরও বুঝাইত, আবার আর্যদের ন্যায় সুগঠিত দেহের অধিকারী সুদর্শন তুর্কী প্রভৃতি জাতিকেও বুঝাইত"। শকদের পরে আসিল কুষাণগণ; তাহারা ছিল প্রসিদ্ধ ইউ-চি জাতির একটি শাখা। সম্ভবতঃ তাহারা গৌরবর্ণ ছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারত হূণ জাতির অধিকৃত হয়। হূণগণ ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বৈদেশিক রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছিল। যে সকল জাতি ক্ষয়িষ্ণু গুপ্ত সাম্রাজ্যে হানা দিয়াছিল তাহাদের চিহ্নিত করিবার জন্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও শিলালিপিতে 'শক' শব্দটির মতই 'হূণ' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। হূণদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির মধ্যে গুর্জরগণ বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে রাজপুতদের কোন কোন শাখা এবং জাঠ, গুজার ও সমজাতীয় অন্যান্য সম্প্রদায় হূণদের, অথবা তাহাদের সহিত ভারতে আগত ও উপনিবেশস্থাপনকারী অন্যান্য জাতির, বংশধর।

সপ্তম শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষ মুসলমান আক্রমণকারী ও ভ্রমণকারীদের

বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাহাদের অনেকেই এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাহাদের মধ্যে আরব, তুর্কী, পারসিক, আফগান (বা পাঠান), মোঙ্গল প্রভৃতি এশিয়াবাসী বিভিন্ন জাতির লোক ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেক আফ্রিকাবাসী, বিশেষতঃ আবিসিনিয়ার অধিবাসী, ছিল। মালাবারে, করোমণ্ডল অঞ্চলে এবং পরে নববিজিত সিন্ধু দেশে মুসলমানদের বসতি স্থাপিত হয়। একাদশ শতাব্দীতে গজনীর সুলতান মামুদ পাঞ্জাব অধিকার করিলে ভারতে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের বসতিস্থাপন শুরু হয়। সিন্ধু প্রদেশে আরবদের শাসন প্রতিষ্ঠা ও বসতিস্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানদের প্রবেশ ঘটিয়াছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ভাষা ও আঞ্চলিক কথ্যভঙ্গী

ভারতীয় সংবিধানে মোট ১৪টি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি ভাষা—সংস্কৃত—ভারতবর্ষের কোন অধিবাসীর কথ্য ভাষা নহে। ইংরাজী ভাষা সরকারী কাজকর্মের এবং উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম; ইহা ছাড়া ইংরাজী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা। প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব সাহিত্য আছে। আঞ্চলিক কথ্যরীতির (dialect) পার্থক্য স্বীকার করিলে ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা দুই শতেরও অধিক হইবে।

ধর্ম

ধর্মের দিক হইতেও অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে বৈচিত্র্য অনেক বেশী। পৃথিবীর সব কয়টি প্রধান ধর্মই এ দেশে প্রচলিত—হিন্দু ধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রীস্ট ধর্ম। তাহা ছাড়া স্থানীয় কয়েকটি ধর্মও আছে—যেমন, জৈন ধর্ম ও শিখ ধর্ম। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের মাধ্যমে অবশ্য শিখ ধর্ম অন্যান্য দেশেও প্রচলিত হইতেছে। ভারতের আদিম জাতিগুলির প্রত্যেকের নিজস্ব বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস রহিয়াছে। বস্তুতঃ, ভারত নানা প্রকারের ধর্ম ও প্রথা, মতবাদ ও সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও ভাষা, জাতিগোষ্ঠী ও সমাজ-ব্যবস্থার এক বিচিত্র সংগ্রহশালা।

রাজনৈতিক অনৈক্য

জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির বৈচিত্র্য এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সুবিশাল আয়তন—যাহা রাশিয়া ব্যতীত ইয়োরোপের আয়তনের প্রায় সমান—এই উভয়ের প্রভাবে প্রাচীন কালে রাজনৈতিক ঐক্য ভারতীয় ইতিহাসের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। সকল যুগেই এই বিরাট উপমহাদেশ পর্বত ও নদনদী দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বহু রাজ্য ও জনপদে বিভক্ত ছিল। কখনও কখনও কোন শক্তিশালী নৃপতি অথবা রাজবংশ এই বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলিকে অধিকার করিয়া

এক সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছেন। যখন আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, অথবা বৈদেশিক আক্রমণ, অথবা উভয় কারণেই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন রাজনৈতিক অনৈক্যও আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। "ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেকখানিই এই দেশের সমগ্র অথবা বৃহত্তর অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি স্থায়ী সামাজ্য গঠনের ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনী মাত্র।" ঐক্যস্থাপনের এই অভিলাষের মূলে ছিল কিছুটা রাজগণের রাজনৈতিক উচ্চাশা এবং কিছুটা এই দেশের সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ঐক্য সম্বন্ধে সাধারণ সচেতনতা।

ঐক্যের আদর্শ

সুদূর অতীতে মৌর্যরাজগণ তিন প্রজন্ম ধরিয়া প্রায় সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মধ্য যুগের সূত্রপাতে দিল্লীর সুলতানগণ প্রায় এক শতাব্দীকাল এবং মধ্য যুগের শেষদিকে মুঘল সম্রাটগণ চার প্রজন্মকাল এই কৃতিত্বের অধিকারী হন। পরে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা কোন রাজবংশ বা জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট নহে। এই আদর্শ নূতন আবিষ্কার নহে, সুদূর অতীতেও ইহার মূল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। ভারত-সভ্যতার মহান প্রবর্তকগণ তাঁহাদের স্বদেশ এই বিরাট ভূখণ্ডের ভৌগোলিক ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং নানা উপায়ে এই ঐক্যভাবটি জাতীয় মানসের ভিতর মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই ঐক্যানুভূতির প্রথম প্রমাণ, প্রাচীন মহাকাব্যে ও পুরাণে এই সম্পূর্ণ দেশটির নাম দেওয়া হইয়াছে "ভারতবর্ষ"[১]—যে ভূখণ্ডে ভরতের বংশধরগণ (ভারত-সন্ততিঃ) বাস করে। 'এই দেশ (ভারত) মহাসাগরের উত্তরে এবং তুষারাবৃত (হিমালয়) পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত'।

ভারতবর্ষ নামটি একটি ভৌগোলিক ধারণার পরিচায়ক; কিন্তু ইহার রাজনৈতিক গুরুত্বও রহিয়াছে, কারণ ইহার সহিত এই বিশাল ভূখণ্ডের শাসক সার্বভৌম রাজতন্ত্রের ধারণাও জড়িত। একজন 'চক্রবর্তী রাজা' ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের রাজগণের আনুগত্য গ্রহণ করিতেছেন—এই ধারণার সহিত প্রাচীন হিন্দুগণ বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল। বহু সংস্কৃত গ্রন্থে 'অধিরাজ', 'সম্রাট', 'একরাট' প্রভৃতি শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। রাজসার্বভৌম পদপ্রার্থী রাজারা 'অশ্বমেধ', 'রাজসূয়' ও 'বাজপেয়' প্রভৃতি যজ্ঞ করিবেন, এমন ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন রাজা বিভিন্ন যুগে এই সকল যজ্ঞ করিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় যে সমগ্র ভারতব্যাপী

---

১ 'India' নামের উৎপত্তি সিন্ধু নদের নাম হইতে; সিন্ধুকে পারসিকগণ বলিত 'হিন্দু' এবং গ্রীকগণ বলিত 'Indus'।

সাম্রাজ্য স্থাপনের ধারণা প্রাচীন রাজগণ ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের নিকট সুপরিচিত ছিল। মহাপদ্ম নন্দ ভারতবর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট। তিনি যে ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান তাহার রূপায়ণ করেন মৌর্যগণ এবং, অপেক্ষাকৃত কম সফলতার সহিত, গুপ্তগণ। পরে হর্ষ এবং গুর্জর-প্রতিহারগণ এই আদর্শের রূপায়ণে সীমিত সাফল্যের অধিকারী হন।

মধ্য যুগে ও আধুনিক যুগে রাজনৈতিক ঐক্য

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খলজী ও তুঘলক সুলতানগণ বিন্ধ্য পর্বতমালার পরপারে দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের অধিকার প্রসারিত করেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল শাসকগণ এমন এক সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার পত্তন করেন যাহা ভারতীয় জনগণের মনে 'ঐক্যবদ্ধ শাসন ও অভিন্ন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার' আদর্শ বদ্ধমূল করিয়া দেয়। যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন : "নিছক স্বৈরাচারী প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া জনগণের মাথার উপর দিয়া শাসনতান্ত্রিক স্টীম রোলার চালানোর মাধ্যমে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। অন্ততঃ, এইরূপ ঐক্য স্বাভাবিক নয় এবং তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একই ধরনের শাসন-ব্যবস্থার পরিচালক এবং তাহার সাফল্য ও ব্যর্থতার অংশীদার যে জনগণ, তাহাদের মধ্যেই প্রকৃত ঐতিহাসিক ঐক্যের উদ্ভব সম্ভব, কারণ এই ঐক্যবোধ তাহাদেরই প্রয়াসের ফল। এই জাতীয় শাসনতান্ত্রিক ঐক্যবোধ মুঘল সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়।" কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা, একই প্রকারের আইন ও সরকারী প্রথার প্রবর্তন, এক মুদ্রা-ব্যবস্থা, এক সরকারী ভাষা (ফার্সী) প্রভৃতি রাজনৈতিক বন্ধন দ্বারা বিচক্ষণ মুঘল শাসকগণ ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে ইংরাজ শাসকগণ বহুলাংশে মুঘলদের পথই অনুসরণ করেন। অপেক্ষাকৃত অনুকূল আধুনিক পরিবেশের মধ্যে তাঁহারা ভারতবর্ষকে এমন রাজনৈতিক ঐক্য দান করেন যাহার স্বাদ ভারতবর্ষ পূর্বে কখনও পায় নাই। এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে যে ব্যবহারিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক ঐক্য তাহাকে দৃঢ়মূল করে। দেশীয় রাজ্যগুলি অল্পবিস্তর শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতার অধিকারী হইলেও ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব ঐক্য স্থাপনে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ 'ভারত' ও 'পাকিস্থান' নামে দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাতে ভারতের ঐতিহাসিক ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আর এক দিকে নবগঠিত ভারত-রাষ্ট্র সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। এই রাষ্ট্রের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তিকরণের ফলে এই বিভক্ত উপমহাদেশের বৃহত্তর অংশে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক অভিন্নতা

যদুনাথ সরকার বলেন, ভারতবর্ষে নানা জাতির বারংবার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, কিন্তু "বিভিন্ন বৈদেশিক জাতি, যাহারা যথেষ্ট দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করিয়াছে, একই ধরনের খাদ্য গ্রহণ করিয়াছে, একই নদীর জল পান করিয়াছে, একই রৌদ্রালোকে পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং দৈনন্দিন জীবনে একই নিয়ম অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদের দেহাবয়বে এবং জীবনযাত্রায় কিছু পরিমাণে সাদৃশ্য আসিয়া গিয়াছে।" সুদূর অতীতে যে সকল বিদেশী এ দেশে বসবাস শুরু করিয়াছে তাহাদের কথা বাদ দিলেও, পরবর্তী কালে আগত মুসলমানগণ পর্যন্ত এই দেশের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে, যেমন আরব দেশ ও পারস্যে, বসবাসকারী মুসলমানদের সহিত বর্তমানে তাহাদের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। স্যার হার্বার্ট রিস্‌লে (Sir Herbert Risley) বলিয়াছেন, "দেহ গঠন, সামাজিক লক্ষণ, ভাষা, রীতিনীতি ও ধর্ম বিশ্বাসের যে বৈচিত্র্য ভারত-পর্যবেক্ষকের চোখে পড়ে, তাহার তলায় তলায় আসমুদ্র হিমাচল জীবনযাত্রার এক প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় চরিত্র এবং সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তিত্বের সত্যই অস্তিত্ব আছে। তাহাকে আমরা পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি না।"

সাংস্কৃতিক ঐক্য

এই 'সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তিত্ব' দীর্ঘকাল ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এখনও, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে, তাহার বিবর্তন চলিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় ঐক্যের সর্বপ্রধান লক্ষণ হইল এই যে, ভারতের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সমবেত ভাবে এমন এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি বা সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে যাহা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অশোকের লিপিগুলি যে সকল স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে একই ভাষা এবং একই লিপি ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হইত, অথবা অন্ততঃ জনগণের বোধগম্য ছিল। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে, রাজনৈতিক অনৈক্য এবং ভাষা ও রীতি-নীতির পার্থক্য সত্ত্বেও, "এই বিশাল দেশের সকল প্রদেশের সাহিত্য ও দর্শনের উপর সংস্কৃত ভাষার সাধারণ প্রভাব মুদ্রিত ছিল।" ইহার অর্থ এই নয় যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্রাবিড়দের, অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির এবং আদিবাসী বা ভারতের আদিম উপজাতিগুলির কোন অবদান নাই। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে হিন্দুরা বিদেশী চিন্তাধারা ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিতে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিল। তাই বৈদেশিক অনুপ্রবেশকারীরা ক্রমশঃ নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে এবং ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতের হিন্দু এবং বৌদ্ধ

সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহাদের নিকট হইতে নূতন ধারণা আত্মসাৎ করিয়া আরও বিচিত্র ও শক্তিশালী হইয়া ওঠে।

বহু শতাব্দীর মুসলমান শাসনে নানা বিচিত্র ও নবজীবনদায়িনী চিন্তাধারা এ দেশে প্রবেশ করে। কিন্তু মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের নিজস্ব বিশিষ্ট ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন ছিল বলিয়া হিন্দুগণ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বিলোপ করিয়া তাহাদের নিজ সমাজভুক্ত করিতে পারে নাই। দুই সম্প্রদায় নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনতা এবং প্রাত্যহিক জীবনে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাহাদের পরস্পরের নিকটে আনিয়া দিল। অবশ্যম্ভাবী রূপে উভয়ের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন শুরু হইল। ফল হইল এক যৌথ সংস্কৃতি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক নূতন রূপ।

সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিবর্তনের পরবর্তী পদক্ষেপ দেখা যায় ব্রিটিশ শাসনের সময়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং কোন কোন ব্যাপারে পাশ্চাত্য জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ করিল। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল।

স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে হিন্দু জনগণের মধ্যে 'ধর্ম, দর্শন, সাহিত্যিক চিন্তাধারা ও সামাজিক প্রথা এবং জীবনদর্শনের একটি মৌলিক ঐক্য' দেখা যায়। মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মবিশ্বাস এবং অ-ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু তাহারা স্বীকার করে যে (জওহরলাল নেহরুর ভাষায়) 'ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যময়' এক ভারতবর্ষের অস্তিত্ব আছে, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ যাহাকে কেন্দ্রচ্যুত করিতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারত ইতিহাসের উপাদান

১. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

ঐতিহাসিক বিবরণাদির অভাব

বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত অল-বিরুণী (Al-Biruni) একাদশ শতাব্দীতে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "হিন্দুরা ঘটনাসমূহের ঐতিহাসিক ক্রম সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী নহে। রাজগণের রাজত্বকালের ক্রমপর্যায় বর্ণনায় তাহারা বিশেষ অবহেলার পরিচয় দিয়া থাকে। যখন তাহাদিগকে যথার্থ তথ্যের জন্য চাপ দেওয়া হয়, তখন কি বলিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহারা অবধারিত ভাবে কল্প কথার আশ্রয় গ্রহণ করে।" প্রসিদ্ধ ইংরাজ ভারতবিদ ফ্লিট (Fleet) অল-বিরুণীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন: "প্রাচীন হিন্দুরা কখনই যথার্থ ঐতিহাসিক চেতনার—অর্থাৎ ব্যাপক ভিত্তিতে বিচার করিয়া যথার্থ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতার—অধিকারী ছিল কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাহারা সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ ভাবে ছোটখাট ঐতিহাসিক নিবন্ধ লিখিতে পারিত, কিন্তু তাহাদের পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল। সচেতনভাবে রচিত নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের আকারে সাধারণ ইতিহাস যে তাহারা লিখিতে পারিত তাহার কোন প্রমাণ তাহারা রাখিয়া যায় নাই।"

ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য

সুসংবদ্ধ ঐতিহাসিক বিবরণ না থাকায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণকে অন্যান্য নানাবিধ সূত্র হইতে উপাদান আহরণ করিতে হইবে। প্রাচীনতম যুগের ইতিহাসের কোন উৎকীর্ণ লিপি-প্রমাণ (inscriptional evidence) নাই, অতএব ঐ সম্পর্কে জানিতে হইলে ধর্মীয় সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বৈদিক সাহিত্য হইতে আর্যগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুইটি 'মহাকাব্য' ও পুরাণগুলি হইতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। পুরাণগুলিকে 'ঐতিহ্য, কিংবদন্তী, রূপক-কাহিনী, ধর্মবিশ্বাস, আচার, সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্বের এক সংগ্রহশালা' বলা যাইতে পারে। পুরাণে রক্ষিত বংশাবলীগুলি হইতে বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস নির্ণয় করা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসাহিত্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ

আছে। ধর্মসাহিত্য ছাড়া 'গার্গী-সংহিতা' প্রভৃতি গ্রহবিজ্ঞান-সম্পর্কিত গ্রন্থে, পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ও পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' প্রভৃতি ব্যাকরণে এবং কালিদাস ও ভাস প্রভৃতি কবির রচিত কাব্যে ও নাটকে অনেক সময় অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যের সূত্রে প্রাপ্ত এই সকল বিচ্ছিন্ন ও আংশিক সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে অতীত ইতিহাসের যথার্থ চিত্র উপস্থাপিত করা সহজ নহে।

ঐতিহাসিক সাহিত্য

প্রাচীন কালে এমন খাঁটি উপাদানের অভাব ছিল না যাহা হইতে ইতিহাস রচনা করা যায়। বংশ তালিকা রাখা একটি প্রাচীন ভারতীয় প্রথা। রাজগণের উত্তরাধিকারের তালিকা বা বংশাবলী বহু প্রাচীন কাল হইতেই সংকলিত ও সংরক্ষিত হইত। সম্ভবতঃ এই জাতীয় বহু তালিকা 'মহাকাব্য'দ্বয়ে (রামায়ণে এবং মহাভারতে) এবং পুরাণগুলিতে গ্রথিত হইয়াছিল। পুরাণসমূহের চিরাচরিত বিষয়বস্তু হইল 'সর্গ' (আদি সৃষ্টি), 'প্রতিসর্গ' (প্রলয়ের পরে পুনরায় সৃষ্টি), 'বংশ' (দেবতা ও ঋষিগণের বংশাবলী), 'মন্বন্তর' (ইতিহাসের বিভিন্ন যুগবিভাগ) এবং 'বংশানুচরিত' (রাজবংশগুলির ইতিহাস)। রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুইটি 'মহাকাব্যে' ও পুরাণগুলিতে অতি প্রাচীন কাল সম্বন্ধে নানাবিধ পরম্পরাগত তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু সম্ভবতঃ যীশু খ্রীস্টের আবির্ভাবের পরেই তাহারা তাহাদের বর্তমান রূপ লাভ করে। কয়েকটি পুরাণ নিঃসন্দেহে আরও পরবর্তী কালের রচনা। দীর্ঘ সময় ধরিয়া পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে নিশ্চয়ই এমন অনেক তথ্য ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে যাহাদের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্যই। ফলে কালানুক্রম বিপর্যস্ত হইয়াছে। কাজেই পুরাণসমূহ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যত্নশীল ও বিচারপরায়ণ অনুসন্ধিৎসুর কাছে বহু মূল্যবান তথ্যের উৎস হইলেও তাহাদের উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করা নিরাপদ নহে।

বংশাবলী ছাড়াও শাসনকার্য সংক্রান্ত সরকারী বিবরণী ও দলিল পত্র এবং রাজবংশের ইতিবৃত্তও অনেক ছিল, কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থ সংকলনে ইহাদের যথাযথ ব্যবহার হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাকারে রচিত কাশ্মীরের রাজবংশীয় ইতিবৃত্ত কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' সম্ভবতঃ সরকারী বিবরণ এবং প্রাচীন আখ্যায়িকার ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল। কহ্লন তাঁহার নিজ কাল এবং তৎ-পূর্ববর্তী শতাব্দীর ইতিহাস মোটামুটি নির্ভুলভাবে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সযত্ন পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার প্রদত্ত প্রাচীনতর যুগের ঘটনাবলীর বিবরণী তেমন নির্ভরযোগ্য নহে। 'রাজতরঙ্গিণী' ছাড়াও আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ আছে; তবে তাহাদের ইতিবৃত্ত না বলিয়া ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা বলাই যুক্তিযুক্ত। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত,'

সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' ও পদ্মগুপ্তের 'নবসাহসাঙ্কচরিত' সংস্কৃত ভাষায় রচিত ইতিবৃত্ত-ভিত্তিক আখ্যায়িকা। 'স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিপ্রসূত সহজ সরল ভাষা' ব্যবহার না করিয়া এই সকল কাব্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে, উপমায় এবং চিত্রকল্পে ধ্রুপদী কাব্যগুলির অনুকরণ করিয়াছে। প্রাকৃত ভাষায় রচিত বাক্‌পতির 'গৌড়বহো' এবং হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচরিত' এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা। গুজরাটের ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন কাহিনীর সংকলন মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধচিন্তামণি'ও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বৈদেশিকদের লিখিত বিবরণ

গ্রীক, রোমান, চৈনিক, তিব্বতীয়, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বৈদেশিক লেখক ও পর্যটকদের রচিত বিবরণী ভারতের ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া অথবা ভারতে পর্যটন বা বাস করিয়া তাঁহারা এই দেশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus) কখনও ভারতবর্ষে আসেন নাই, কিন্তু তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক বিজয়ের বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে আমাদের জানা যাবতীয় তথ্য কুইন্‌টাস কার্টিয়াস (Quintus Curtius), ডিওডোরাস (Diodorus), আরিয়ান (Arrian), প্লুটার্ক (Plutarch) প্রভৃতি গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের রচনা হইতে সংগৃহীত। ভারতীয় সাহিত্যে ও শিলালিপিতে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মেগাস্থিনিসের (Megasthenes) 'ইণ্ডিকা' (Indika) গ্রন্থটির মূল পাওয়া যায় না; ইহার কিন্তু কোন কোন অংশ আরিয়ান, স্ট্র্যাবো (Strabo), জাস্টিন (Justin) ও অন্যান্য ঐতিহাসিকের রচনায় উদ্ধৃতির আকারে রক্ষিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি মৌর্য যুগের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের উপর প্রভূত আলোকপাত করে। একজন গ্রীক লেখক রচিত *Periplus of the Erythrean Sea* এবং টলেমীর (Ptolemy) ভৌগোলিক বিবরণ বহু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যের সন্ধান দেয়।

ভারত ইতিহাসের মৌর্যোত্তর যুগের ইতিবৃত্ত রচনায় চৈনিকদের লিখিত বিবরণী অপরিহার্য। তাহাদের সাহায্য ব্যতীত শক, পহ্লব ও কুষাণদের গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ফা-হিয়েন (Fa-hien) ও হিউয়েন সাঙ্‌ (Hiuen Tsang, অথবা য়ুয়ান-চোয়াঙ্‌—Yuan Chwang) প্রমুখ চৈনিক পর্যটকগণ এই দেশ সম্বন্ধে মূল্যবান বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। চৈনিক ও তিব্বতীয় সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণের সাহায্য ব্যতীত বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নহে। প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের (Taranath) রচনায় এ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

মুসলমানগণ কর্তৃক উত্তর ভারত জয়ের কাহিনী মুসলমানদের রচিত ঐতিহাসিক

ইতিবৃত্তগুলিতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। অল-বিরুণী প্রভৃতি মুসলমান পর্যটকগণ অবক্ষয়ের যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং হিন্দুদের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম যুগের মুসলমান ইতিবৃত্তকারদের মধ্যে অল-বিরুণী, সুলেমান, অল-মাসুদী (Al-Masudi), হাসান নিজামী (Hasan Nizami) এবং ইবন-উল-আথিরের (Ibn-ul-Athir) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিলালিপি, তাম্রলিপি ইত্যাদি

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রধানতঃ শিলালিপি ও তাম্র-লিপির (inscriptions, copper-plates—epigraphs) ভিত্তিতেই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে সঠিকভাবে কাল নির্ণয় অথবা ঘটনা ও ব্যক্তিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব। পুরাতন ঐতিহ্য, সাহিত্য, মুদ্রা, শিল্পকলা, স্থাপত্য বা অন্যান্য কোন সূত্র হইতে আমরা যাহা জানিতে পারি তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় করে শিলালিপি এবং তাম্রলিপি।

লিপিগুলি উৎকীর্ণ করা হইত পাহাড়ের গাত্রে, স্তম্ভের গাত্রে এবং বিবিধ উপকরণে নির্মিত দ্রব্যসমূহে। লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, কাঁসা, তাম্র, কাদামাটি, পোড়ামাটি, ইষ্টক, প্রস্তর, স্ফটিকখণ্ড ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহৃত হইত। কখনও কখনও লিপিতে ঘটনাবলীর সরল বর্ণনামাত্র থাকিত। যেমন, খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালিপি, রুদ্রদামনের জুনাগড় পর্বতস্থিত শিলালিপি, সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদের স্তম্ভলিপি ইত্যাদি। "প্রাচীন হিন্দুগণ কত সুন্দরভাবে সংহত এবং যথাযথ, কিন্তু সীমিত পরিসরে আবদ্ধ সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক রচনায় দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন", এই লিপিগুলি তাহারই প্রমাণ। অধিকাংশ লিপিই অবশ্য ধর্মীয় বা সাধারণ দানের দলিল স্বরূপ রচিত। অনেক ক্ষেত্রে এই সব লিপি হইতে রাজবংশাবলী সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ইহাদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থাকে।

লিপিগুলিতে ব্যবহৃত ভাষাগুলি লিপির উপাদানের মতই সংখ্যায় অনেক—সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী, ইত্যাদি। সাধারণতঃ বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত ব্রাহ্মী (Brahmi) লিপিই ব্যবহৃত হইত; তবে দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত খরোষ্ঠী (Kharoshthi) লিপির ব্যবহারও বিরল ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় রচিত লিপিগুলির কোন কোনটি (যেমন সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি) কাব্যগুণবিশিষ্ট এবং সাহিত্যকীর্তি হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

বহির্ভারতের দেশসমূহে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে কখনও কখনও ভারত ইতিহাসের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এশিয়া মাইনরের বোঘাজ-কোই (Boghaz-koi) নামক স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহে সম্ভবতঃ ভারতে আগমনের পূর্বে আর্যদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। অতএব পরোক্ষভাবে

বৈদিক যুগের ইতিহাস সংকলনে ইহারা সাহায্য করে। ইরাণের বেহিস্তুন (Behistun), পার্সিপোলিস (Persepolis) ও নকস্-ই-রুস্তম (Naksh-i-Rustam) নামক স্থানগুলিতে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহে প্রাচীন ভারত ও ইরাণের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগ সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দুদের উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াস সম্বন্ধে তথ্য আহরণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হইল শিলালিপি।

মুদ্রা ও শীলমোহর

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের আর একটি প্রধান উপাদান হইল মুদ্রা (Coins)। সাহিত্যের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির যাথার্থ্য বিচারের জন্যই মুদ্রার প্রাথমিক গুরুত্ব, তবে কখনও কখনও মুদ্রা হইতে অন্য সূত্রনিরপেক্ষ বা অন্য সূত্রের পরিপূরক তথ্যও পাওয়া যায়। কালক্রম নির্ধারণে তারিখ সংবলিত মুদ্রা খুব মূল্যবান। তারিখ না থাকিলেও মুদ্রায় সাধারণতঃ রাজগণের নাম খোদিত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রা হইতে পরোক্ষভাবে সেই মুদ্রা প্রচলনকালে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। কোনও অঞ্চলে কোন বিশেষ রাজার মুদ্রার সংখ্যাধিক্য তাঁহার রাজ্যের সীমানির্দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। ভারতবর্ষের বাহ্লীক দেশীয়, পহ্লব ও শক রাজগণের ইতিহাস প্রধানতঃ মুদ্রার সযত্ন পর্যালোচনার ভিত্তিতেই সংগৃহীত হইয়াছে। গুপ্ত রাজগণের মুদ্রা হইতেও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মুদ্রাতত্ত্ব (Numismatics) আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মুদ্রার ন্যায় শীলমোহরেরও (Seals) গুরুত্ব আছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত শীলমোহরগুলি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদিমতম লিখিত প্রমাণ।

স্থাপত্য

বিশুদ্ধ রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি যাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ, স্থাপত্যকীর্তি (architectural monuments) অর্থাৎ মন্দির, স্তম্ভ, প্রাসাদ প্রভৃতি তাঁহাদের বিশেষ কোন কাজে লাগে না। কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার পক্ষে স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা (Archaeology) বিশেষ উপযোগী। স্থাপত্যকীর্তিগুলি হইতে শিল্প ও ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস জানা যায়, কারণ ইহাদের অধিকাংশই ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। ইহারা পরোক্ষভাবে তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও প্রতিফলিত করে। সৌধাবলীর স্তরবিন্যাস হইতে কখনও কখনও ইতিহাসের কালক্রম নির্ণয়ের সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সৌধাবলী।

২. মধ্য যুগের ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাসের উপাদান প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানেব তুলনায় অনেক বেশী পূর্ণ ও প্রচুর। ইতিহাসের কাঠামো খাড়া করিবার জন্য শিলালিপি, কিংবদন্তী, মুদ্রা ও সাহিত্য হইতে খণ্ড খণ্ড সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বহু পরিশ্রমে সেগুলি একত্র জুডিবার প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন মুসলমান শাসক ও রাজবংশের বিবরণ সংবলিত অনেক সমসাময়িক ও অর্ধ-সমসাময়িক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। ইহাদের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ভৌগোলিক বিবরণ, কালক্রমের মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য হিসাব এবং বাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলীর পারম্পর্য-ভিত্তিক বিবরণ পাওয়া যায়।

সরকারী কাগজ

সরকাবী কাগজপত্র, এবং সরকারী অথবা বেসরকারী দলিলপত্র, সকল দেশেই ঐতিহাসিকদের প্রচুর পরিমাণে নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে। মুঘলদের সরকাবী মহাফেজখানা অত্যন্ত দক্ষ ছিল; কিন্তু উত্তর ভারতের প্রধান শহরগুলি বারবার শত্রুসৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় এই সকল স্থানে সংরক্ষিত দলিলগুলির অতি সামান্য অংশই রক্ষা পাইয়াছে। আকবরের মূল্যবান পুস্তকাগারে বড বড় পণ্ডিতদের লেখা ২৪,০০০ সেরা সেরা পুঁথি ছিল; তাহাদের একটিও আর নাই। এই সব হারানো পুঁথির মধ্যে হয়তো ইতিহাসের কিছু উপাদান ছিল। তবে নানা ধরনের সরকারী কাগজ, যেমন বাদশাহী ফর্মান (Farman, হুকুমনামা) এবং ভূমিদানের দলিল, অনেক সময় নাগরিকদের গৃহ হইতে পাওয়া যায়। ইহারা শাসন-ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রচুর আলোকপাত করে।

ইতিবৃত্ত

সমসাময়িক দলিলপত্রের অভাব আমাদের ফার্সী ভাষায় রচিত ইতিবৃত্তগুলির উপর নির্ভরশীল কবিয়াছে। ইহাদের কতকগুলি হইল মুসলমান দুনিয়ার সাধারণ ইতিহাস, ভারতের কথা ইহাদের সামান্য অংশ অধিকার করিয়া আছে। আবার এমন ইতিবৃত্তও আছে যাহাদের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র ভাবতের ইতিহাস। ইহাদের কয়েকটি আবার কোন বিশেষ রাজবংশ অথবা শাসকদেব কথা বর্ণনা করিয়াছে।[১]

১ Sir Henry Elliot ও John Dowson তাঁহাদেব আট খণ্ড *History of India as Told by Its Own Historians*-এ ফার্সী ইতিবৃত্তগুলি হইতে নির্বাচিত অংশেব অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তসাব দিয়াছেন। ইহা হইতে ঐ ইতিবৃত্তগুলিব স্বরূপ ও বিষয়বস্তু মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। তবে উহাদের মধ্যে কিছু কিছু গুরুতর ভুল ও ফাঁক আছে। Hodivala তাঁহার *Studies in Indo-Muslim History* গ্রন্থে কিছু কিছু ভুল সংশোধন করিয়াছেন। অন্যান্য লেখকেরা বহু ইতিবৃত্তেব সম্পূর্ণ এবং সঠিক অনুবাদ কবিয়াছেন।

মিনহাজউদ্দীন রচিত 'তবকৎ-ই-নাসিরি' (*Tabaqat-i-Nasiri*) মুসলমান দুনিয়ার সাধারণ ইতিহাস। ইহাতে ১২৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর দাসবংশীয় সুলতানদের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরবর্তী কালের বিবরণ পাওয়া যায় জিয়াউদ্দীন বরনীর (Ziauddin Barani) 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী' (*Tarikh-i-Firuz Shahi*) নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ফিরোজ শাহের রাজত্বকালের প্রথম ছয় বৎসর পর্যন্ত সময়ের বিবরণ পাওয়া যায়। ফিরোজ শাহের রচিত 'ফুতুহাৎ-ই-ফিরুজ শাহী (*Futuhat-i-Firuz Shahi*) গ্রন্থে তাঁহার ধর্মনীতি ও শাসন-সংস্কার বর্ণিত আছে। ইসামি (Isami) গজনীর সুলতানগণের রাজত্বের শুরু হইতে মহম্মদ বিন তুঘলুকের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার 'ফুতুহ্-উস্-সালাতীন' (*Futuh-us-Salatin*) নামক গ্রন্থে। আফগান রাজবংশগুলি সম্বন্ধে কোন সমসাময়িক ইতিবৃত্ত নাই। উহাদের সম্বন্ধে জানিতে হইলে আমাদের আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে রচিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তুর্কী ভাষায় রচিত বাবরের আত্মজীবনী যথার্থই একটি মূল্যবান গ্রন্থ। পরে উহা ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। হুমায়ুনের ব্যক্তিগত অনুচর জওহর (Jauhar) 'তজকিরৎ-উল-ওয়াকিয়ৎ' (*Tazkirat-ul-wakiat*) নামে এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের লিখিত আত্মকথাও ইতিহাসের একটি চমৎকার উপাদান। গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন-নামা' (*Humayun-nama*) গ্রন্থে মুঘল অন্তঃপুরের নানাবিধ তথ্য জানা যায়। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' (*Ain-i-Akbari*) ও 'আকবর-নামা' (*Akbar-nama*) আকবরের শাসনকাল-সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দুইটি গ্রন্থ। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ইতিবৃত্ত হইল বদায়ূনী (Badauni) রচিত 'মুন্তাখাব-উল-তারিখ' (*Muntakhab-ul-Tawarikh*)। তিন জন লেখক কর্তৃক তিনটি খণ্ডে রচিত 'পাদশাহ-নামা' (*Padshah-nama*) ও 'আলমগীর-নামা' (*Alamgir nama*) নামে দুইটি সরকারী ইতিকথায় শাহ জাহানের শাসনকাল এবং আওরঙ্গজেবের শাসনকালের প্রথমদিকের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ চল্লিশ বৎসরের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় 'মাসির-ই-আলমগিরি' (*Masir-i-Alamgiri*) নামক গ্রন্থে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সরকারী নথিপত্র হইতে ইহা সংকলিত হইয়াছিল। খাফি খাঁ (Khafi Khan) তাঁহার 'মুন্তাখাব-উল-লুবাব' (*Muntakhab-ul-lubab*) গ্রন্থে এমন অনেক তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা সরকারী ইতিবৃত্তে প্রকাশ করা হয় নাই।

ফার্সী ইতিবৃত্তগুলির দুইটি প্রধান ত্রুটি আছে। লেখকেরা সাধারণতঃ রাজদরবারের সহিত সম্পর্কিত এবং রাজার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল হওয়াতে তাঁহারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া, হিন্দুদের সম্বন্ধে, এমন কি, ধর্ম সম্পর্কে যাঁহারা নূতন ভাবে চিন্তা করিয়াছেন সেই সকল মুসলমান শাসকদের (যেমন, মহম্মদ বিন তুঘলুক, আকবর এবং দারা)

সম্বন্ধে, লিখিতে গিয়া তাঁহারা প্রায়ই ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের দৃষ্টি রাজদরবার এবং সামরিক ছাউনিতেই আবদ্ধ ছিল; জনসাধারণের অবস্থা বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ঔৎসুক্য ছিল না।

বৈদেশিক পর্যটকগণ

বৈদেশিক পর্যটকদের রচনা হইতে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। অল-বিরুণী সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের সময়ে ভারতবর্ষের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। মুঘল যুগের পূর্বে যে সকল বিদেশী ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইবন বতুতার (Ibn Batuta) নাম সর্বাধিক পরিচিত। তিনি ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর বাস করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে প্রামাণ্যতার ছাপ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্তি (Nicolo Conti), কালিকটের রাজার (জামোরিনের) দরবারে পারস্যের রাজদূত আবদুর রেজ্জাক (Abdur Razzaq) এবং রাশিয়ান পর্যটক আথানাসিয়াস নিকিটিন (Athanasius Nikitin)।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপীয় পর্যটকগণ ভারতে আসিতে শুরু করেন। তাঁহারা ঐতিহাসিকদের ব্যবহারের জন্য প্রচুর তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন। জেসুইট (Jesuit) ধর্মযাজকদের লিখিত বিবরণে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। পাএস (Paes), বারবোসা (Barbosa), র‍্যাল্‌ফ ফিচ (Ralph Fitch), পার্চাস (Purchas), টেরী (Terry), স্যার টমাস রো (Sir Thomas (Roe), তাভার্নিয়ে (Tavernier), বের্নিয়ে (Bernier), কারেরি (Careri) এবং মানুচি (Manucci) প্রমুখ ইয়োরোপীয় পর্যটকগণ জনসাধারণের অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিল্পের কথা এবং দরবার ও শিবির জীবনের আড়ম্বর সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রদত্ত তথ্য দুই-চারিটি ঘটনা বাদ দিলে সাধারণতঃ বাজার-গুজবের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

সংবাদ-লিপি

সরকারী বিবরণী, আত্মকথা, বেসরকারী ইতিবৃত্ত এবং পর্যটকদের বিবরণী ছাড়াও সম্রাট আওরঙ্গজেব ও তাঁহার বংশধরদের রাজত্বকালের বহু সংবাদ-লিপি (News-letters) বা 'আকবরাৎ' (*Akhbarat*) পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া গিয়াছে। সবিস্তার আলোচনা ও প্রামাণ্যতার দিক হইতে এই সংবাদ-লিপিগুলি ফার্সী ইতিবৃত্তগুলির তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান।

মুদ্রা, শিলালিপি ও স্থাপত্য

সুলতানী রাজত্ব এবং মুঘল রাজত্বের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মুদ্রা, শিলালিপি ও স্থাপত্যকীর্তির গুরুত্বও আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। মুদ্রা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: 'যে সকল অঞ্চলে মুদ্রণ অপ্রচলিত ছিল, সে সকল স্থানে ছাপ-মারা মুদ্রাগুলি বাজারে বাজারে প্রবেশ করিয়া মানুষের বুদ্ধির আবিষ্কৃত সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রচারপত্র ও ঘোষণার কাজ করিত।' (অর্থাৎ সেকালে ভারতে ছাপার ব্যবস্থা না থাকায় মুদ্রিত সংবাদপত্র বা সরকারী ইস্তাহার মাধ্যমে জনসাধারণ কোন সংবাদ জানিতে পারিত না, তবে মুদ্রায় রাজার নাম খোদিত থাকায় কে কখন রাজা হইলেন তাহা জানিতে পারিত।) বাংলা প্রভৃতি প্রদেশের শাসকগণের তারিখ ও ছাপ সহ মুদ্রাগুলি প্রাদেশিক ইতিহাস রচনার জন্য বিশেষ মূল্যবান, কারণ সুলতানী সাম্রাজ্যের এবং মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ ইতিবৃত্তগুলিতে প্রাদেশিক ইতিহাসের সবিস্তার আলোচনা পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ভারতীয় মিউজিয়াম (কলিকাতা) ও পাঞ্জাব মিউজিয়ামে ইংরাজ পণ্ডিতদের প্রস্তুত মুসলমান আমলের মুদ্রার তালিকা আছে। এই সকল তালিকা অনেক মূল্যবান তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শিলালিপিগুলি মুঘল যুগের অপেক্ষা মুঘল-পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাস রচনায় অধিক প্রয়োজনীয়। তবে মধ্য যুগের ইতিহাসের অপেক্ষা প্রাচীন কালের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই শিলালিপির গুরুত্ব অধিক।

স্থাপত্যকীর্তিগুলি দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। মধ্য যুগের শিল্পে হিন্দু-মুসলমানের ভাব বিনিময়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় শিল্পকীর্তির গুরুত্ব অতি নগণ্য।

মারাঠা, রাজপুত ও শিখ

মুঘল আমলে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস রচনার জন্য অনেক ইতিবৃত্ত আছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান হইল শিবাজীর সমসাময়িক এক ব্যক্তি রচিত 'সভাসদ বখর' (*Sabhasad Bakhar*)। সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ইংরাজ বাণিজ্যকুঠির নথিপত্র তৎকালীন ঘটনাবলী সম্বন্ধে অমূল্য সাক্ষ্যের উৎস। পর্তুগীজ এবং ওলন্দাজদের দলিলপত্রও বিশেষ মূল্যবান।

রাজপুত কবিদের রচিত গাথাগুলি রাজপুত ইতিহাসের প্রয়োজনীয় উপাদান, কিন্তু ইহাদের সাবধানে ব্যবহার করা প্রয়োজন। সত্য ও কল্পনার এই বিচিত্র মিশ্রণ হইতে আমাদের প্রকৃত সত্য খুঁজিয়া লইতে হইবে। জেমস টড (James Tod) কর্তৃক রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *Annals and Antiquities of Rajasthan* চারণদের গাথা ও কাব্য অবলম্বনে রচিত; ইতিহাসের উৎস হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন।

শিখ গুরুদিগের এবং শিখ ধর্মের ইতিহাস রচনার জন্য আছে শিখদের ধর্মগ্রন্থ, 'গ্রন্থ সাহেব'[১] অথবা 'আদি গ্রন্থ', গুরু গোবিন্দ সিংহের রচনাবলী ('দশম পাদশা কা গ্রন্থ') এবং 'জনম-সাখি' প্রভৃতি আখ্যায়িকা। এই সকল উপাদানের ভিত্তিতে সত্য ও কল্পনা, নির্ভরযোগ্য সমসাময়িক বিবরণ এবং পরবর্তীকালীন কল্পকাহিনীর মধ্যে সীমারেখা নির্ণয় করা সহজ নহে।

সাহিত্য

সমসাময়িক ফার্সী সাহিত্য হইতে কখনও কখনও সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি আমীর খসরুর (Amir Khusrau) রচনাবলীর মধ্যে মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ সন্নিবিষ্ট আছে। তাঁহার অন্যতম রচনা 'খাজাইন-উল-ফুতুহ্' (*Khazain-ul-Futuh*) আলাউদ্দীন খলজীর শাসনকাল সম্বন্ধে বিশেষ তথ্যপূর্ণ।

৩. আধুনিক ভারত ইতিহাসের উপাদান

ব্রিটিশ সরকারী কাগজপত্র

ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুগণ যখন আধুনিক যুগের ইতিহাসে হাত দেন তখন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে উপাদানের প্রাচুর্যে তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়েন। এই সকল উপাদানকে যে সকল বিভাগে ভাগ করা যায় তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল সরকারী কাগজপত্র, অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের সরকারী দপ্তরের নথিপত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে এবং ইংলণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্রে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়েরই বেশী উল্লেখ থাকিত। ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়ের গুরুত্ব বাড়িতে লাগিল। কোম্পানীর শাসনের শেষের দিকে এই সকল বিষয়ই কোম্পানীর মনোযোগ সম্পূর্ণ অধিকার করিল। এই সকল কাগজপত্র হইতে ডিরেক্টর সভা (Court of Directors) ও বোর্ড অব কণ্ট্রোলের (Board of Control) কাজকর্ম ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার হইতে জেলা স্তর পর্যন্ত শাসন-ব্যবস্থার সকল স্তর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা

১ ইংরাজী ভাষায় ইহার প্রথম অনুবাদ Trumpp রচিত *Adi Granth*; ইহা ত্রুটিপূর্ণ এবং শিখবিরোধী। Macauliffe তাঁহার *Sikh Religion* গ্রন্থে বিচ্ছিন্ন ভাবে আদি গ্রন্থের কিছু অংশ অনুবাদ করিয়াছেন। সাম্প্রতিক কালে সমগ্র গ্রন্থের কেহ কেহ অনুবাদ করিয়াছেন, যেমন গোপাল সিং।

যায়।[১] ইহাদের মধ্যে আছে চিঠিপত্র, রিপোর্ট এবং বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মন্তব্য (Minutes) ও স্মারকলিপি (Memoranda) ইত্যাদি। ইহাদের বৈচিত্র্য প্রায়ই বিভ্রান্তিকর, এবং ইহাদের সংখ্যা বিপুল ও ভয়োদ্রেককারী। উৎসাহী গবেষক ইহাদের মধ্যে তথ্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার পাইবেন।

সরকারী দলিল সংরক্ষণের এই ঐতিহ্য ব্রিটিশ রাজশক্তি কর্তৃক কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করার পরও অক্ষুণ্ণ থাকে। শাসন-ব্যবস্থার এবং বৈদেশিক নীতির জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাগজ-পত্রের বৈচিত্র্য এবং সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। যত্ন সহকারে পাঠ করিলে এই সকল দলিল হইতে প্রতিটি ঘটনার বিভিন্ন স্তর অনুধাবন করা যায়, কিভাবে সরকারী সিদ্ধান্ত লওয়া হইত তাহাও জানা যায়। ব্রিটিশ ভারতের সহিত তাহার প্রতিবেশীদের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানিতে হইলে ফ্রান্স এবং রাশিয়ার সরকারী মহাফেজ-খানায় সংরক্ষিত দলিলগুলি দেখা প্রয়োজন।

অন্যান্য ইয়োরোপীয় কোম্পানীর দলিলপত্র

পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী কোম্পানীর দলিলপত্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই ইহাদের মূল্য অধিক, কিন্তু এই সকল কাগজপত্রে অনেক সময় রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, ফরাসী কোম্পানীর কাগজপত্রগুলি রাজনৈতিক ইতিহাস, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস, রচনার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ভারতীয় ভাষায় লিখিত উপাদান

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনার জন্য ফার্সী ইতিবৃত্তগুলির গুরুত্ব ক্রমশঃ ক্ষীয়-মান হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে গোলাম হোসেন তবাতবাই (Ghulam Husain Tabatabai) রচিত ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাস 'সিয়র-উল-মুতা-খরিন' (*Siyar-ul-Mutakharin*) গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বাংলা সুবার ইতিহাসও সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। রাজওয়াড়ে, খারে, সরদেশাই এবং অন্যান্যদের সম্পাদিত মারাঠি সরকারী সংবাদ-লিপিগুলি ফার্সী ইতিবৃত্তগুলির তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। মারাঠা শক্তির জয়-পরাজয় এবং মারাঠা রাজ-নীতির ঘটনা-প্রবাহ এই কাগজগুলিতে সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়াছে। দুপ্লের (Dupleix) দোভাষী আনন্দ রঙ্গ পিল্লাইয়ের রচিত তামিল রোজনামচা একটি

১ এই কাগজপত্রগুলি নূতন দিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানায় (National Archives of India), বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের মহাফেজখানায় এবং লণ্ডনে (Commonwealth Relations Office-এ) সংরক্ষিত আছে।

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-গ্রন্থ। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক শক্তিগুলির উত্থান-পতন ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

অন্যান্য উপাদান

ইংরাজগণের রচিত নানা রকম সমসাময়িক গ্রন্থ—স্মৃতিকথা, জীবনী, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি—অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দেয়। এই সকল লেখকদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার সহিত জড়িত ছিলেন। এই সময়ে রচিত কয়েকটি ইতিহাস গ্রন্থ পুরাতন হইলেও সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয় নাই। যেমন, জেমস মিলের (James Mill) *History of British India*, ম্যাল্‌কমের (Malcolm) *Central India*, উইল্‌কৃসের (Wilkes) *History of Mysore*, গ্র্যাণ্ট ডাফের (Grant Duff) *History of the Marathas* এবং কানিংহামের (Cunningham) *History of the Sikhs*। খুঁটিনাটি বহু তথ্য ছাড়াও এই গ্রন্থগুলিতে যে দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায় তাহা বিবেচনার যোগ্য। রাজপুতগণের সহিত ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক আলোচনার জন্য টডের Annals-এর কোন কোন অংশ প্রয়োজনীয়।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়গণ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে এই দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ এবং ঘটনা সম্বন্ধে জানা যায়। জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আইনসভাগুলি ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যাবলীর বিবরণীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। *Hansard*-এ সংকলিত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বক্তৃতাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতবর্ষে ইংরাজদের শাসন-নীতি ইংলণ্ডে নির্ধারিত হইত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *A Nation in Making*, মহাত্মা গান্ধীর *My Experiments with Truth*, জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনী এবং *Discovery of India*, সুভাষচন্দ্র বসুর *Indian Struggle* প্রভৃতি আত্মজীবনী হইতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদীগণের মনোভাব জানা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

সিন্ধু সভ্যতা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

ভারতবর্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূচনা হয় প্রায় আড়াই লক্ষ বৎসর আগে। অবশ্য এই যুগের ইতিহাস যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। লিখিত ইতিহাস সৃষ্টি হইবার পূর্বে মানব সমাজের সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও শিল্পের বিবর্তনকেই প্রাক্-ইতিহাস (Pre-history) বলা হয়।

ভারতবর্ষে মনুষ্য বসতির আদিমতম যুগ হইল প্রত্ন-প্রস্তর যুগ (Palaeolithic Age)। প্রায় আড়াই লক্ষ বৎসর আগে ইহার সূত্রপাত হয়। ইহার একমাত্র সাক্ষ্য—নানা ধরনের প্রস্তরনির্মিত স্থূল হাতিয়ার। এগুলি সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার বাহিরে, একমাত্র কেরল ছাড়া ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক দিক হইতে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল শিকারী; পশুমাংসই ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য। তাহারা ধাতুর ব্যবহার এবং কৃষিকর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল।

প্রত্ন-প্রস্তর যুগের পর শুরু হইল মধ্য-প্রস্তর যুগ (Mesolithic Age)। এই সময়ে ব্যবহৃত প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রগুলি ক্ষুদ্রাকার হইলেও গঠন-বৈচিত্র্য ও ব্যবহারের দিক হইতে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের অস্ত্রগুলির তুলনায় অনেক উন্নত। কোন কোন অঞ্চলে পাওয়া অস্ত্রগুলি অন্ততঃ চার বা পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এই যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ের অর্থনীতি প্রধানতঃ খাদ্য-সংগ্রহ ও পশু-শিকারভিত্তিক ছিল। তবে সম্ভবতঃ মৎস্য-শিকার ও নৌকা নির্মাণও শুরু হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে খাদ্য উৎপাদন ও গ্রাম নির্মাণ প্রথম শুরু হয় বেলুচিস্থানে, প্রায় ৩,৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ হইতে। ভারতের এই প্রাচীনতম গ্রামগুলিতে কি কি শস্যের চাষ হইত তাহা এখনও জানা যায় না; তবে গম ও বার্লি ছিল সম্ভবতঃ প্রধান শস্য। প্রায় ২৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রাম নির্মাণের সূচনা হয়। যে অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব হয়, সেখানে ইহার আবির্ভাবের বহু পূর্বে গ্রামীণ জীবনের একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মধ্য-প্রস্তর যুগ শেষ হইলে শুরু হইল নব্য-প্রস্তর যুগ (Neolithic Age)। এই যুগের মানুষ প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রগুলিতে ঘর্ষণ, খোদাই ও পালিশ করিয়া সেগুলি বিভিন্ন কার্যের উপযোগী সুন্দর হাতিয়ারে পরিণত করিয়াছিল। প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষ অপেক্ষা তাহারা নিঃসন্দেহে উচ্চ স্তরের সভ্যতার অধিকারী ছিল। তাহারা

জমি চাষ করিত, পশুপালন করিত এবং মৃত্তিকার দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য তৈয়ারী করিতে পারিত। সম্ভবতঃ কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি জ্বালিবার উপায়ও তাহারা আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রত্ন-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন।

নব্য-প্রস্তর যুগ ও ধাতুর যুগের মধ্যে কোন সীমারেখা নির্দেশ করা যায় না। সম্ভবতঃ তামার ব্যবহার প্রথম শুরু হয়। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র প্রথমে তামায় প্রস্তুত হইত, পরে ব্রোঞ্জ এবং সর্বশেষে লোহার প্রচলন হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য তাম্রনির্মিত যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের যুগেও ইহাদের প্রচলন ছিল।

তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার আদিম নিদর্শনগুলি একটি সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারের ফলে অন্যান্য প্রাচীন দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব হয়। ভারতের নানা স্থানে এইরূপ নাগরিক বসতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অথর্ববেদে লোহার উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতে লোহার ব্যবহার সম্ভবতঃ আরও অনেক পরে শুরু হয়।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারোতে এবং পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলায় হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের[১] ফলে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এতকাল পর্যন্ত অজ্ঞাত এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়াছে। উৎসাহী ও অক্লান্ত প্রত্নতাত্ত্বিকদের চেষ্টায় ঐতিহাসিকদের নিকট এতকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক সমৃদ্ধ এবং সুগঠিত সভ্যতার অস্তিত্বে আলোকপাত করা সম্ভব হইয়াছে। পরবর্তীকালে অন্যান্য স্থানে খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে এই সভ্যতা পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট এবং রাজস্থানের বিস্তীর্ণ

১ সিন্ধী ভাষায় 'মহেঞ্জোদারো' শব্দের অর্থ 'মৃতগণের সমাধি বা স্তূপ'। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থানে একটি স্তূপ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তখন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিম অনুসন্ধান-শাখার কর্মকর্তা ছিলেন। বৌদ্ধ প্রভাবের সহিত সম্পর্কিত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের আশায় তিনি ঐ স্থান খননের নির্দেশ দেন; কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পান। এক বৎসর পূর্বে দয়ারাম সাহানী হরপ্পায় অনুরূপ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। তখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের নেতৃত্বে ঐ দুই স্থানে ব্যাপক খননকার্য শুরু হয়। হরপ্পার খননকার্য পরিচালনা করেন M. S. Vats। E. J. H. Mackay এবং Sir Mortimer Wheeler গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সাম্প্রতিক কালে গুজরাটের লোথাল এবং রাজস্থানের কালিবাঙ্গান প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে খননকার্যের ফলে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

অঞ্চলে প্রসারিত ছিল। হরপ্পায় প্রথম খননকার্য শুরু হইয়াছিল বলিয়া এই সভ্যতা 'হরপ্পা সভ্যতা' নামে পরিচিত। বেলুচিস্থান, মধ্য প্রদেশ এবং বিহারেও এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু উপত্যকা ইহার প্রকৃত জন্মভূমি বলিয়া এই সভ্যতা 'সিন্ধু সভ্যতা' নামেও পরিচিত। এই সভ্যতার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ, কারণ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখনও হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত শীলমোহরগুলিতে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে এই লিপিগুলিতে ব্যবহৃত ভাষা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা নহে এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার কোন সম্পর্কও নাই। কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা, সিন্ধু সভ্যতার ভাষার সহিত দ্রাবিড়দের ভাষার সাদৃশ্য আছে; দুই ভাষার গঠন একই ধরনের।

প্রাচীন মিশরের সভ্যতা যেমন নীল নদের উপত্যকায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং প্রাচীন ব্যাবিলন ও অ্যাসিরিয়ার সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায়, তেমনই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা বিকশিত হয় সিন্ধু নদের উপত্যকায়।

সিন্ধু সভ্যতা ছিল ব্রোঞ্জ যুগ অথবা তাম্র-প্রস্তর যুগের নাগরিক সভ্যতা।

মহেঞ্জোদারো নগর

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মহেঞ্জোদারোতে এক বিশাল ও সুগঠিত নগরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে; এই নগরগুলি একটির উপরে আরেকটি গঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ প্রাচীন নগরগুলি ধ্বংস বা ক্ষয়িষ্ণু হইলে নূতন নগর নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। যাহাই হউক, এই নগরটি সুদক্ষ পূর্তবিজ্ঞানীদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। উহাতে সকল নাগরিকের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ছিল। মহেঞ্জোদারো পৃথিবীর প্রাচীনতম সুপরিকল্পিত নগর।

৯ ফুট হইতে ৩৪ ফুট চওড়া বহু রাস্তা পরস্পরকে সমকোণে এবং সমগ্র নগরটিকে কয়েকটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়াছিল। আলোকস্তম্ভ দ্বারা পথ আলোকিত করার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মধ্যে কয়েকটি অপরিসর পথ গৃহগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতিটি খণ্ডে একটি করিয়া সাধারণের ব্যবহার্য কূপ ছিল। গৃহগুলির অধিকাংশেই নিজস্ব কূপ ও স্নানাগার ছিল। গৃহগুলিতে বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্ত ছিল। পয়ঃ-প্রণালীর মাধ্যমে জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের যুগের আগে এরূপ উৎকৃষ্ট জলনিকাশের ব্যবস্থা আর দেখা যায় নাই।

গৃহ, পথ, কূপ—সকলই ইষ্টক নির্মিত ছিল। ইষ্টক বা কাষ্ঠ, কোন কিছুতেই কারুকার্যের কোন চিহ্ন নাই। গৃহগুলি ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর: ছোট-বড় বাসগৃহ

(সম্ভবতঃ সরকারী কর্মচারী ও পুরোহিতদের বাসের জন্য); সাধারণ সভার জন্য ব্যবহৃত বড় বড় গৃহ। ইহা ছাড়া ছিল বহু সাধারণ স্নানাগার। একটি বৃহৎ স্নানাগারের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৯ ফুট, প্রস্থ ২৩ ফুট এবং গভীরতা ৮ ফুট। সম্ভবতঃ উহা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু কোন উপাসনা গৃহ আবিষ্কৃত হয় নাই।

একটি প্রাচীর নগরটিকে বেষ্টন করিয়াছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ কোন দুর্গ ছিল না। মোটের উপর নগরটির স্থাপত্য ছিল বাহুল্যবর্জিত ও প্রয়োজনভিত্তিক; শিল্প-কীর্তি হিসাবে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না। বাঁকানো খিলানের (arches) নির্মাণ-পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল, তবে প্রাচীর গাত্র হইতে বহির্বিলম্বিত কয়েকটি খিলান (corbelled arches) পাওয়া গিয়াছে।

হরপ্পা নগর

আয়তনের দিক হইতে হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর তুলনায় বৃহত্তর ছিল, কিন্তু উভয়ের গঠনপদ্ধতি ছিল একই রকমের। এখানে আবিষ্কৃত বৃহত্তম গৃহ হইল একটি শস্যাগার। উহার আয়তন ছিল ১৬৯ × ১৩৫ ফুট। এখানে শ্রমিকদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত ১৪টি ক্ষুদ্র গৃহ পাওয়া গিয়াছে। মহেঞ্জোদারোর তুলনায় হরপ্পায় কূপের সংখ্যা কম।

রাজস্থানের কালিবাঙ্গানে হরপ্পার ন্যায় একটি শহর ছিল, কিন্তু আয়তনে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার তুলনায় ইহা অনেক ক্ষুদ্র ছিল।

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা

সিন্ধু সভ্যতার যুগের মানুষ এক প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না; বহু জাতির মানুষ একত্রে বাস ও কাজকর্ম করিত। জলপথে ও স্থলপথে মহেঞ্জোদারোতে যাতায়াত অত্যন্ত সহজ ছিল। 'ইহা ছিল এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত মানুষের মিলন ক্ষেত্র'।

'যে দেশে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন হয়, এবং যেখানে পরিবহন, সেচ ও বাণিজ্যে ব্যবহারের উপযোগী প্রশস্ত কোন নদী আছে, কেবল সেই দেশেই এত বৃহৎ নগরের উদ্ভব সম্ভব'। গম, বার্লি, চাউল, দুগ্ধ, খর্জুর প্রভৃতি ফল এবং তরি-তরকারী খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইত। গরু, ভেড়া, শূকর ও বিভিন্ন পক্ষীর মাংস আহারও প্রচলিত ছিল।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে বৃষ, মহিষ, ভেড়া, শূকর, হস্তী ও উট উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ অশ্বও ছিল। অরণ্যচারী জন্তুর মধ্যে বন্য মহিষ, গণ্ডার ও ব্যাঘ্রের নাম করা যায়। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলে সিংহও ছিল।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দুই খণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করিত। শালের ন্যায় এক খণ্ড বস্ত্র ঊর্ধ্ববাস হিসাবে কাঁধে থাকিত; অপর বস্ত্রটি ছিল আধুনিক ধুতির মত।

নারীদের পোষাকও ছিল একই ধরনের। বস্ত্রগুলি ছিল সূতী অথবা পশমের। সম্ভবতঃ এগুলি সেলাই করা হইত।

নারী-পুরুষ সকলেই নানা প্রকারের ধাতু ও অল্পমূল্যের প্রস্তর নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিত। পুরুষেরা শিরোভূষণ ব্যবহার করিত এবং তাগা ও আংটি পরিত। নারীরা পরিত কর্ণভূষণ, চুড়ি, বালা, কটিদেশের আভরণ, নূপুর ইত্যাদি। অলঙ্কারগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতু দ্বারা নির্মিত হইত। কোন কোন অলঙ্কার শিল্পীগণের দক্ষতা ও নির্মাণ কৌশল প্রমাণ করে।

দৈনন্দিন কাজে মৃত্তিকা, ঝিনুক, হস্তিদন্ত ও ধাতু নির্মিত জিনিসপত্র ব্যবহৃত হইত। কাষ্ঠনির্মিত চেয়ার, খাট ও টুল প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মার্বেলের গুলি, বল ও গুটিকা (dice) লইয়া খেলা হইত। অনেক প্রকারের খেলনার প্রচলন ছিল। যাতায়াতের প্রধান উপায় ছিল গরুর গাড়ী। হরিণের শিং, নিমগাছের পাতা ইত্যাদি ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। 'এই সকল দ্রব্য এখনও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। অতএব ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া যাইতে পারে'।

অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতির বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আছে তরবারি. কুঠার, বর্শা, ছুরি, তীর ও ধনুক প্রভৃতি। যুদ্ধ ও শিকারে ইহাদের ব্যবহার হইত।

মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, টিন, সীসা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানিত। লোহার ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। এই অঞ্চলে স্বর্ণ পাওয়া যাইত না; সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতের খনিগুলি হইতে উহা আমদানি করা হইত। প্রস্তরও সুলভ ছিল না; উহা আমদানি হইত কাথিয়াবাড় ও রাজস্থান হইতে। ছুরি, দাঁড়িপাল্লা, মূর্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র ও অলঙ্কার নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রস্তরের ব্যবহার ছিল।

বস্ত্রশিল্পী, কাষ্ঠশিল্পী, মৃত্তিকাশিল্পী, রাজমিস্ত্রী, স্বর্ণকার, হস্তিদন্ত শিল্পী ও অন্যান্য সুদক্ষ শিল্পীদের কাজের নমুনা হইতে দেখা যায় যে শিল্পক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগ ছিল। ধনী ও দরিদ্র সকলেই তুলা ও পশম হইতে সূতা তৈয়ারী করিত। রঙীন বা কারুকার্যমণ্ডিত মৃৎপাত্রের তুলনায় কুমারের চাকায় প্রস্তুত সাধারণ মৃৎপাত্রের প্রচলন অনেক বেশী ছিল। নানা আকারের ও চেহারার মৃৎপাত্র দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হইত। অলঙ্কারগুলির নির্মাণ কৌশল স্বর্ণকারদের দক্ষতার পরিচায়ক।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ধ্বংসাবশেষগুলি হইতে বহু সংখ্যক শীলমোহর খুঁজিয়া পাইয়াছেন। শীলমোহরগুলি প্রস্তর, চীনামাটি, হস্তিদন্ত ও মৃত্তিকা নির্মিত। ইহাদের উপরে খোদাই করা চিত্রগুলি সম্ভবতঃ ধর্মীয় চিহ্ন ছিল। শীলমোহরগুলি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া যে ধারণা আছে তাহা সম্ভবতঃ ভিত্তিহীন। মাদুলি হিসাবেও এগুলি ব্যবহৃত হইত কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল

আইনসঙ্গত করার জন্য শীলমোহরগুলির ছাপ দেওয়া হইত এবং পাত্র অথবা গৃহদ্বার বন্ধ করার জন্য শীলমোহরগুলি ব্যবহৃত হইত।

দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত, কাশ্মীর, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, ক্রীট দ্বীপ ও মিশরের সহিত মহেঞ্জোদারোর অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। সম্ভবতঃ সমুদ্রপথেও পশ্চিম এশিয়ার সহিত যোগাযোগ রাখা হইত। মহেঞ্জোদারো বোধহয় একটি বিশাল অন্তর্দেশীয় বন্দর ছিল। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন এবং সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন দ্রব্য হইতে প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত।

মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : পণ্ডিত, সৈনিক, বণিক ও কারিগর এবং শ্রমিক। 'বৈদিক যুগের চতুর্বর্ণ বিভাগের সহিত এই ব্যবস্থার সাদৃশ্য আছে'।

শিল্প

সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা শিল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিল না। বাসগৃহ ও জনসাধারণের ব্যবহার্য অট্টালিকাগুলিতে অলঙ্করণের কোন চিহ্ন নাই। মৃৎপাত্রগুলির উপরিভাগ খুবই মসৃণ, কখনও কখনও অলঙ্কৃত ও নানা বর্ণে রঞ্জিত; কিন্তু অলঙ্করণের মান খুবই সাধারণ। মৃৎপাত্র, অলঙ্কার ও শীলমোহরগুলি অধিবাসীদের শিল্পরুচির পরিচয় বহন করে। শীলমোহরগুলির উপর খোদিত চিত্রগুলির মধ্যে বৃষ, মহিষ ও বন্যমহিষ প্রভৃতি পশুর চিত্র সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রস্তরনির্মিত কয়েকটি সুন্দর মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। হরপ্পায় আবিষ্কৃত একটি ক্ষুদ্র মূর্তি 'সারল্য ও হৃদয়ানুভূতির' একটি অপরূপ রূপায়ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গ্রীক শিল্পের চরম বিকাশের পূর্বে ইহার সহিত তুলনীয় আর কোন শিল্পদ্রব্য সৃষ্ট হয় নাই।

রাজনৈতিক জীবন

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা মানুষগুলির রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো এই দুইটি 'যমজ রাজধানীর' অধীনে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'রোমান সাম্রাজ্যের উদ্ভবের পূর্বে ইহাই ছিল বৃহত্তম রাজনৈতিক পরীক্ষা'। অপর একটি মত এই যে, এই দুইটি শহর দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। এই দুইটি মতবাদের কোনটির সমর্থনেই কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। হয়ত এই শহরগুলিতে বণিকশাসিত অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, অথবা হয়ত পুরোহিতেরা ইহাদের শাসন করিত। তবে নাগরিকদের সুবিধা বিধানের জন্য একটি নগর পরিষদ যে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে

এই নগরগুলি প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। নিশ্চয়ই বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ধর্ম

মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীদের ধর্ম কি ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। বোধ-হয় মন্দির বলিয়া কিছু ছিল না, কারণ এ পর্যন্ত যে সকল অট্টালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের কোনটিকেই মন্দির আখ্যা দেওয়া চলে না। তবে শীলমোহরের উপর খোদিত চিত্র এবং মৃত্তিকা, ধাতু ও প্রস্তর নির্মিত মূর্তিগুলির ভিত্তিতে কিছু কিছু আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মাতৃকা (Mother Goddess) পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সিন্ধু উপত্যকার ধর্মীয় জীবনের এই বৈশিষ্ট্য বৈদিক সভ্যতার পরিবর্তে পশ্চিম এশিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্দেশ করে। সম্ভবতঃ পশ্চিম এশিয়াতেই মাতৃকা পূজার উদ্ভব হয়, কিন্তু বৈদিক ভারতবর্ষে পুরুষ দেবগণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা একটি পুরুষ দেবতারও পূজা করিত। অনুমান করা হয় যে এই দেবতা হইলেন শিব। লিঙ্গপূজাও প্রচলিত ছিল। এখানেও বৈদিক সভ্যতার সহিত সিন্ধু সভ্যতার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, কারণ ঋগ্বেদে লিঙ্গপূজকদের স্পষ্টতঃই নিন্দা করা হইয়াছে। বৃষ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও হস্তী প্রভৃতি পশুও পূজিত হইত। সম্ভবতঃ বৃক্ষ, অগ্নি ও নদীর পূজার প্রচলন ছিল।

মৃতদেহের সৎকারবিধি ধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় শব সৎকারের চারটি প্রথা প্রচলিত ছিল : পূর্ণ সমাধি, মৃতদেহের অংশ বিশেষের সমাধি, দাহকার্য অন্তে দগ্ধ মৃতদেহের অংশ বিশেষের সমাধি, এবং শবদাহ।

কালানুক্রম

ভূ-বিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখনও পর্যন্ত সিন্ধু সভ্যতার সময়-সীমা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। লিখিত প্রমাণের অভাবে তাঁহারা খননকার্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত খনন করা সম্ভব হয় নাই। শীলমোহরগুলিতে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলিকে আনুমানিক বলিয়া মনে করিতে হইবে।

মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলিকে কালক্রম অনুসারে তিন যুগের সৃষ্টি বলিয়া স্থির করা হইয়াছে—আদি যুগ, মধ্যবর্তী যুগ এবং সর্বশেষ যুগ। এই তিন যুগ হইতে সম্ভবতঃ অনধিক পাঁচ শত বৎসরের হিসাব পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু মহেঞ্জোদারোতে নগর স্থাপনের বহু পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব হয় এবং নগর ধ্বংসের পরেও উহার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ হইতে ১৭০০ অব্দ পর্যন্ত মহেঞ্জোদারোর অস্তিত্ব ছিল। আনুমানিক ২৩০০ হইতে

২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে পশ্চিম এশিয়ার সুমেরে (Sumer) সিন্ধু সভ্যতার শীলমোহর পাওয়া যাইত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রাজস্থানের কালিবাঙ্গানে ও বেলুচিস্থানেব কোট-ডিজিতে (Kot-Diji) হরপ্পার পূর্ববর্তী সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা

সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীবৃন্দ ও বৈদিক আর্যগণেব মধ্যে সম্পর্ক প্রমাণ করাব নানা চেষ্টা হইয়াছে। এ কথাও বলা হইয়াছে যে হবপ্পার সংস্কৃতি ছিল প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সংস্কৃতি। কিন্তু এই অনুমানের সপক্ষে ন্যায়সঙ্গত যুক্তি খুব কমই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আনুমানিক ২৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মহেঞ্জোদারোব পতন হইবাব পূর্বে আর্যগণ এদেশে আসিয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। ঋগ্বেদ মূলতঃ গ্রামীণ সভ্যতার দান, কিন্তু মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা সুস্পষ্টভাবেই নাগরিক। অশ্ব সম্ভবতঃ মহেঞ্জোদারোতে অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু বৈদিক যোদ্ধাবা প্রায়শঃ অশ্বের ব্যবহাব করিত। বেদে গাভী একটি সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু মহেঞ্জোদারোতে বৃষ অধিক সম্মানের অধিকারী ছিল। বিগ্রহপূজা মহেঞ্জোদারোতে একটি সাধাবণ প্রথা ছিল, কিন্তু বৈদিক আর্যগণ বিগ্রহপূজাব পক্ষপাতী ছিল না। বেদে পুরুষ দেবগণের প্রাধান্য, মহেঞ্জোদারোতে মাতৃকাদেবীই প্রধান উপাস্য। মহেঞ্জোদারোতে প্রচলিত লিঙ্গপূজাব প্রথা বৈদিক সমাজে নিন্দিত ছিল। এই সকল প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হইয়া পড়ে যে বৈদিক আর্য সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা হইতে পরবর্তী কালের ও ভিন্ন প্রকৃতির।

সিন্ধু সভ্যতার পতন

কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে আর্যদের আগমনের ফলে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সিন্ধু উপত্যকার সমৃদ্ধ নগরগুলির পতন ঘটে। নগরগুলিতে এক সময় বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল এবং তাহার ফলেই উহাদের ধ্বংস হয়, এইরূপ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল তথ্যের—বিশেষতঃ মহেঞ্জোদারোতে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত নরকঙ্কালের স্তূপের—সহিত ঋগ্বেদে আর্য যুদ্ধদেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি কর্তৃক দুর্গাধিকাবী 'দাস' বা 'দস্যু'দিগের বিরুদ্ধে অভিযানের উল্লেখের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে, আর্যদের এই শত্রুরা সিন্ধু উপত্যকার সুরক্ষিত নগরগুলির অধিবাসীরা ছাড়া আর কেহ নহে।

সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে সিন্ধু সভ্যতার পতন সম্পর্কে আরও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন প্রায় সকলেই মনে করেন যে সিন্ধু নদের গতি পরিবর্তন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক কারণে সিন্ধু সভ্যতার পতন হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতে মনে হয়, সিন্ধু নদের বাৎসরিক বন্যায় মহেঞ্জোদারোর

সমৃদ্ধিহানি এবং অর্থনৈতিক অবনতির সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহাও সম্ভব যে গৃহ নির্মাণের জন্য কাষ্ঠের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বনভূমি বিনষ্ট হয়, ফলে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় কৃষিকার্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। "বহু বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে মহেঞ্জোদারো মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আক্রমণকারী কোন উপজাতি উহার প্রতি চরম আঘাত হানে"। আক্রমণকারীদের মধ্যে হয়ত আর্যগণও ছিল। নগরটির সুরক্ষার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না। নগরে কোন দুর্গপ্রাকার ছিল না, যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও যোদ্ধারও অভাব ছিল। তাই উহার সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

সিন্ধু সভ্যতা ও পশ্চিম এশিয়া

সম্ভবতঃ সিন্ধু সভ্যতার সহিত পশ্চিম এশিয়ায় টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়ার সমসাময়িক সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পশ্চিম এশিয়ার উর (Ur), তেল আসমীর (Tel Asmer—বাগদাদের সন্নিকটে) ও অন্যান্য স্থানে বহু ভারতীয় শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের কোন কোনটিতে মহেঞ্জোদারোর লিপি খোদিত রহিয়াছে। অট্টালিকার বহির্ভাগের খিলান, দেওয়ালের কুলুঙ্গী, মাতৃকা পূজা, শীলমোহরের উপর একই জীবজন্তুর রূপায়ণ—এই সকলই মহেঞ্জোদারো ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের নির্দেশ করিতেছে। কেহ কেহ বলেন, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার প্রভাবেই সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে। ইহাও বলা হয় যে এই দুই দূরবর্তী অঞ্চলের সভ্যতা একই সাধারণ সভ্যতা হইতে উদ্ভূত; ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহার কারণ স্থানীয় অবস্থা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য। এই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সিন্ধু সভ্যতার একটি নিজস্ব চরিত্র ছিল, এবং ভারতবর্ষেই ইহার উৎপত্তি হওয়াও সম্ভব। মিশরের নীল নদের উপত্যকার সহিত সিন্ধু উপত্যকার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে পশ্চিম এশিয়ার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক যোগাযোগ থাকিতে পারে।

সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকার

সিন্ধু উপত্যকার নাগরিক সভ্যতা ঋগ্বেদের যুগের গ্রামীণ সভ্যতার উপর অতি সামান্যই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। খননকার্যের ফলে আনুমানিক ১৭০০ হইতে ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামীণ বসতির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু হরপ্পায় নির্মিত মৃৎপাত্রগুলির অলঙ্করণ ও আকৃতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে বহুকাল প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালের চিহ্নাঙ্কিত (Punch-marked) মুদ্রাগুলিও সিন্ধু লিপির স্মৃতি বহন করে। শৈব ধর্ম, বিশেষতঃ লিঙ্গপূজা, সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম উত্তরাধিকার বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

আর্য জাতির আগমন

১. ভারতে আর্য উপনিবেশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্যার উইলিয়ম জোন্‌স (Sir William Jones) প্রমাণ করেন যে সংস্কৃত এবং ইরাণীয় ভাষার সহিত গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ইয়োরোপীয় ভাষার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যকে আকস্মিক মনে করা যায় না। মনে হয় যে এই সকল পরস্পর সদৃশ ভাষাগুলি অধুনালুপ্ত একটি মূল মাতৃভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই মূল ভাষাটি যাহাদের মাতৃভাষা ছিল, তাহারা ইন্দো-ইয়োরোপীয় (Indo-European), উইরো, (Wiro) অথবা আর্য (Arya) নামে পরিচিত।

আর্যদের আদি বাসভূমি

ভারতবর্ষে আগত আর্যদের[১] সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হইল বৈদিক সাহিত্য। সাহিত্যের সাক্ষ্যের সমর্থনে কোন শিলালিপি, মুদ্রা বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার কোন নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে ভারতবর্ষই আর্যদের আদি বাসস্থল। তবে সাধারণ ধারণা এই যে তাহারা মধ্য এশিয়া অথবা ইয়োরোপের কোনও অঞ্চল হইতে ভারতে আসিয়াছিল।

ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা ভাষাভিত্তিক নিদর্শনাদির সাহায্যে আর্যদের আদিম সংস্কৃতির একটা মোটামুটি প্রাথমিক রেখাঙ্কনে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও বলিতে পারেন না ঠিক কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে ঐ সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। বর্তমানে আমরা যাহা জানি তাহা হইতে 'আর্য' অথবা 'ইন্দো-ইয়োরোপীয়' অথবা ঐ জাতীয় অন্য নামে পরিচিত মানুষদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে নিরূপণ

১ সংস্কৃত Arya—আবেস্তায় Airya—প্রাচীন পারসিকে Ariya। শব্দটির মৌলিক অর্থ হইল 'বিশ্বস্ত জন', 'একই জাতির মানুষ'। বৈদিক স্তোত্রগুলির রচয়িতাগণ ভারতের প্রাচীন অধিবাসীগোষ্ঠী হইতে নিজেদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বুঝাইতে 'আর্য' শব্দের ব্যবহার করিতেন। প্রাচীন অধিবাসীদিগকে তাঁহারা শত্রু বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহাদিগকে 'দাস' বা 'দস্যু' আখ্যা দিয়া গিয়াছেন।

করা সম্ভব নয়। মনে হয় তাহারা শ্বেতকায় ছিল; কিন্তু তাহারা 'দীর্ঘমুণ্ড অথবা খর্বমুণ্ড, দীর্ঘকায় অথবা ক্ষুদ্রাকৃতি, কৃষ্ণকেশী অথবা স্বর্ণকেশী' ছিল তাহা বলা যায় না।

ইন্দো-ইয়োরোপীয় শব্দ সমষ্টির বিবর্তনের সম্ভবতঃ দুইটি সুস্পষ্ট স্তর ছিল। এই স্তর দুইটি দুইটি বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে দেখা দিয়াছিল। সম্ভবতঃ প্রথম স্তরটির উদ্ভব কোন পর্বতমালার সানুদেশে অবস্থিত এক তৃণময় প্রান্তরে। এই প্রান্তরটিকে উরাল পর্বতমালার দক্ষিণ দিকের কিরঘিজ তৃণপ্রান্তর বলিয়া মনে করা হয়। পরবর্তী স্তরের উদ্ভব কার্পেথিয়ান পর্বতমালার পূর্ব দিকে অবস্থিত অঞ্চলে, অর্থাৎ বোহেমিয়া, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী ভূখণ্ডে। এই মত অনুসারে ইন্দো-ইয়োরোপীয়গণ প্রথমে কিরঘিজ তৃণপ্রান্তরের উত্তর-পশ্চিমাংশে বাস করিত; তথা হইতে ইন্দো-ইরাণীয় জাতিগোষ্ঠী পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং পরবর্তী কালে অপর কোন কোন গোষ্ঠী পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়।

ভারতে আর্যদের আগমনকাল

ঠিক কোন সময়ে ভারতবর্ষে আর্যজাতির অনুপ্রবেশ শুরু হইয়াছিল, মোটামুটি ভাবেও তাহা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে ও ভৌগোলিক কারণে আর্যগণ তাহাদের পর্বতবেষ্টিত ক্ষুদ্র বাসভূমি ত্যাগ করিয়া দূরবর্তী দেশে খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইতে বাধ্য হইয়াছিল। যে সকল দেশ অধিকার করিবার জন্য তাহারা চেষ্টা করিয়াছিল সেই সকল দেশের অধিবাসীদের সহিত নিশ্চয় তাহাদের প্রভূত সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, এবং এইভাবে বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়। পশ্চিম এশিয়ার কাপ্পাডোসিয়ার (Cappadocia) বোঘাজ-কোই (Boghaz-Koi) শিলালিপি হইতে মনে হয় যে খ্রীস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে আর্যগণ ঐ অঞ্চলের অধিবাসী মিটান্নি (Mitanni) নামক জনগোষ্ঠীকে তাহাদের কয়েকজন দেবতাকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশ্য এই সাক্ষ্য হইতে এরূপ বলা যায় না যে ১৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের পূর্বে ভারতে আর্য অনুপ্রবেশ ঘটে নাই।

এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে ভারতে উপনিবেশ স্থাপনকারী আর্যগণ জাতিগতভাবে প্রাচীন ইরাণীয়দের সগোত্র। প্রধানতঃ ভাষার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। পাঞ্জাবে বসবাসকারী আর্যদের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন ইরাণীয় ও আবেস্তার (আবেস্তা ইরাণীয়দের ধর্মগ্রন্থ) ভাষার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ছিল। সংস্কৃত ও পালি ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য, তাহার তুলনায় বেদের ভাষা ও আদিম ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার মধ্যে পার্থক্য অনেক কম। সম্ভবতঃ ১৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রচিত বোঘাজ-কোই শিলালিপির পরবর্তী কালে ইন্দো-আর্য ও ইরাণীয় ভাষার মধ্যে পার্থক্যের সূত্রপাত হয়।

ভারতে আর্য-আগমনের কাল নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় করিতে হইবে। "এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যেও প্রচুর মতভেদ, শুধুমাত্র শতাব্দীর হিসাব লইয়াই নয় সহস্রাব্দের হিসাব লইয়াও। কেহ কেহ খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ বৎসরকে ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলির রচনাকালের আদিতম সীমানা বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ মনে করেন সেগুলি খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ হইতে ২৫০০ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছে।" বৈদিক সাহিত্যের সূচনাকালকে খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ কিংবা ২৫০০ বৎসরের কাছাকাছি বলিয়া ধরিয়া লইলে বোধ হয় খুব ভুল হইবে না। বৈদিক সাহিত্যের সময় নিরূপণে সবাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সহায় হইল এই সুনিশ্চিত তথ্য যে জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিক সাহিত্য রচনার পরবর্তী কালের ঘটনা। যদি ঋগ্বেদের প্রাচীনতম স্তোত্রগুলি খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অথবা ২৫০০ অব্দে রচিত হইয়া থাকে, তবেই জৈন ও বৌদ্ধদের নিকট সুপরিচিত উপনিষদগুলি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবের পূর্বে রচিত হইয়াছিল ইহা বলা যায়। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের পূর্বেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্যজাতির আগমন হইয়াছিল।

ভারতের আদি আর্য উপনিবেশ

ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্র আধুনিক হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত আম্বালার দক্ষিণে, অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। আর্যরা যে আফগানিস্থান ও পাঞ্জাব অধিকার করিয়াছিল তাহা ঋগ্বেদে জাক্সারটেস, কাবুল, সোয়াট, কোরাম, গুমাল, সিন্ধু, ঝিলম, চেনাব, ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু প্রভৃতি নদীর উল্লেখ হইতে বুঝা যায়। যমুনা ও গঙ্গা নদীরও উল্লেখ দেখা যায়, তবে নর্মদা নদীর কোন উল্লেখ নাই। পর্বতসমূহের মধ্যে হিমালয় বিশেষ পরিচিত ছিল, কিন্তু বিন্ধ্যপর্বত ছিল অজ্ঞাত। এই সকল ভৌগোলিক উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের বসতি পূর্ব আফগানিস্থান, পাকিস্থান, পাঞ্জাব ও আধুনিক উত্তর প্রদেশের কোন কোন অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ভূখণ্ডের একটি বৃহৎ অংশের নাম ছিল 'সপ্ত সিন্ধু' অর্থাৎ সপ্ত নদী (সিন্ধু, উহার পাঁচটি উপনদী এবং সরস্বতী) দ্বারা বেষ্টিত দেশ।

পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্য বসতির প্রসার

ঋগ্বেদ 'দাস' বা 'দস্যু'দের (অর্থাৎ অনার্যগণের) সহিত অবিরাম যুদ্ধের বর্ণনায় পূর্ণ। ইহা হইতে দেখা যায় যে আর্যগণ ক্রমশঃ পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতেছিল। 'ব্রাহ্মণে'র যুগে পাঞ্জাবের গুরুত্ব ক্রমশঃ হ্রাস পায়, এবং পূর্বাঞ্চলের গুরুত্ব বাড়িতে থাকে।

এই যুগে আর্য সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল সরস্বতী নদী হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত 'মধ্যদেশ'। কুরুক্ষেত্র (দিল্লীর সন্নিকটে), কোশল (উত্তর

প্রদেশের অযোধ্যা), কাশী (বারাণসী), বিদেহ (উত্তর বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও অঙ্গ (পূর্ব বিহার) প্রভৃতি অঞ্চলের বার বার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে কুরু ও পাঞ্চালগণ ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি গোষ্ঠী। মনে হয় যে দক্ষিণাপথের সহিতও যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। গোদাবরী উপত্যকার অন্ধ্র জাতি এবং বিন্ধ্য পর্বতের অরণ্যাঞ্চলের পুলিন্দ ও শবরগণের উল্লেখ দেখা যায়। এই সকল জাতি তখনও আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, কারণ তাহারা অন্ত্যজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর্য সভ্যতা তখন সবেমাত্র বিন্ধ্য পর্বত পার হইয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতেছিল।

২. বৈদিক সাহিত্য ও ধর্ম

বেদের রচয়িতা

সম্ভবতঃ সমগ্র বৈদিক সাহিত্য আনুমানিক ১৫০০ হইতে ৬০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়। গোঁড়া হিন্দুদের ধারণা, বেদ মানুষের রচনা নহে ; ঈশ্বর স্বয়ং প্রাচীন ঋষিদের বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, নতুবা বেদ অপৌরুষেয় বাণীসমষ্টি রূপে ঋষিদের নিকট আপনা হইতেই প্রতিভাত হইয়াছিল। তবে উৎস যাহাই হউক না কেন, বেদ নিঃসন্দেহে আর্যদের সাহিত্যসৃষ্টির প্রাচীনতম নিদর্শন।

বেদের গুরুত্ব

পুরুষপরম্পরাক্রমে বেদ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। এইজন্য বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। বেদের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এরূপ বিশাল পরিমাণ এক সাহিত্যের মুখে মুখে প্রচার সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। এই সময়ে উহা লিখিত আকারে না থাকিলেও উহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ খুবই সামান্য। পরবর্তী কালে ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরিয়া বেদ সকল শ্রেণীর হিন্দুর নিকট শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের স্থান অধিকার করিয়া আছে। অদ্যাবধি হিন্দুদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় আবশ্যিক আনুষ্ঠানিক কর্ম সেই সনাতন বৈদিক বিধি মতে নিষ্পন্ন হয়। এখনও একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা যে প্রার্থনামন্ত্র (গায়ত্রী) উচ্চারণ করেন, তাহা বেদের শ্লোক হইতে নির্বাচিত দুই বা তিন হাজার বৎসর পূর্বে উচ্চারিত একই প্রার্থনামন্ত্র। "হিন্দু দর্শন যে কেবল বেদের প্রতি অনুগত তাহাই নহে। এক দর্শনের অনুবর্তীগণ অপর দর্শনের অনুবর্তীগণের সহিত প্রায়শঃ এই যুক্তিতে তর্ক করিতেন যে তাঁহাদের দর্শনই শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহাদের দর্শনই বেদের বিশ্বস্ততম অনুগামী এবং একমাত্র উহাতেই বেদের মতামত নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।" যে সকল নীতি-নিয়মের দ্বারা হিন্দুদের সামাজিক, গার্হস্থ্য ও ধর্মীয় প্রথা ও অনুষ্ঠান অদ্যাবধি

নিয়ন্ত্রিত, তাহারা বেদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই বাধ্যতামূলক। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের পরে বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত হিন্দু বিধিগুলিতে বহু পরিবর্তন করা হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুমতে অনুষ্ঠিত বিবাহ ও অন্যান্য ধর্মীয় ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বৈদিক প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।

বৈদিক সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ

বৈদিক সাহিত্য চারটি ভাগে বিভক্ত।

(১) 'সংহিতা'—বৈদিক সাহিত্যের এই অংশ কতকগুলি স্তোত্র, প্রার্থনামন্ত্র, আশীর্বচন, যজ্ঞবিধি ও সামাজিক উপাসনা-মন্ত্রের সমষ্টি।

'সংহিতা'র মন্ত্রগুলি চার ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে 'ঋগ্বেদ সংহিতা' সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদের বর্তমান মন্ত্রসংখ্যা ১০২৮; এই মন্ত্রগুলি দশটি 'মণ্ডলে' বিভক্ত। এই মন্ত্রগুলির কিছু অংশ প্রথম হইতেই যজ্ঞ ও উপাসনার মন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রও আছে যাহাদের সহিত যজ্ঞবিধির কোনও সম্পর্ক নাই। "এই সকল মন্ত্রে সত্যকার আদিম আধ্যাত্মিক কাব্যানুভূতির আমেজ পাওয়া যায়।"

'সামবেদ সংহিতা'য় মন্ত্রের সংখ্যা ১৫৪৯। মাত্র ৭৫টি ব্যতীত সামবেদের অন্যান্য সকল মন্ত্রই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। এই ৭৫টি মন্ত্র অন্যান্য সংহিতায়ও পাওয়া যায়। যজ্ঞকালে সঙ্গীত রূপে এই মন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইত।

'যজুর্বেদ সংহিতা' কেবল মন্ত্রের সমষ্টি নহে, উহাতে গদ্যাংশও (যজুঃ) আছে। এই গদ্যাংশগুলির কিছু অংশ ছন্দোময় এবং কখনও কখনও কবিত্বমণ্ডিত। যজুর্বেদের অধিকাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়।

'অথর্ববেদ সংহিতা' ৭৩১টি মন্ত্রের সমষ্টি। এই মন্ত্রগুলি ২০টি 'মণ্ডলে' বিভক্ত। ইহাদের একাংশ ঋগ্বেদ হইতে হুবহু গৃহীত হইয়াছে। অথর্ববেদের বর্তমান রূপ নিঃসন্দেহে ঋগ্বেদের তুলনায় পরবর্তী কালের রচনা। অথর্ববেদের প্রধান গুরুত্ব এই যে, ইহা পুরোহিততন্ত্রের প্রভাবমুক্ত। "ইহা সত্যকার লৌকিক বিশ্বাসসমূহ, বহু ভূতপ্রেত, অপদেবতা ও উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস, এবং আভিচারিক মন্ত্রাদি সম্বন্ধে অমূল্য জ্ঞানের উৎস, ইহা নৃতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।"

(২) বৈদিক সাহিত্যের 'ব্রাহ্মণ' অংশ গদ্যে রচিত। ইহাতে যাগযজ্ঞ সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায়। "ব্রাহ্মণ অংশ সেই যুগের রচনা যখন আর্য সমাজের সমস্ত মানসিক তৎপরতা যাগযজ্ঞ, তাহাদের নিয়ম-প্রণালী, মূল্যবোধ, উৎস ও তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনায় কেন্দ্রীভূত ছিল"। প্রাচীনতম 'ব্রাহ্মণ'গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' ও 'কৌশিতকী ব্রাহ্মণ'; সামবেদের অন্তর্ভুক্ত 'তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ' ও 'জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ'; এবং যজুর্বেদের

অন্তর্ভুক্ত 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ' ও 'শতপথ ব্রাহ্মণ'। অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত 'ব্রাহ্মণ'-গুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা। উহাদের মধ্যে 'গোপথ ব্রাহ্মণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) বৈদিক সাহিত্যের তৃতীয় অংশ 'আরণ্যক' নামে পরিচিত।. যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইতেন, এবং অরণ্যে উপযুক্ত উপকরণের অভাবে আড়ম্বর সহকারে যাগযজ্ঞ করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের ধর্মজীবন যাপনের পথ প্রদর্শনের জন্যই সম্ভবতঃ 'আরণ্যক'গুলি রচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের পক্ষে যাগযজ্ঞের পরিবর্তে ধ্যান শ্রেষ্ঠতর, এই ধারণা ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে। এইভাবে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের একাংশের মধ্যে "যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সার্থকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস হ্রাস পাইতে থাকে, এবং তাহার পরিবর্তে সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত হয়।" 'আরণ্যক' ভাগ 'ব্রাহ্মণ' ভাগের পরিশিষ্ট। যেমন, 'ঐতরেয় আরণ্যক' 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের' ধারাবাহী রচনা।

(৪) 'উপনিষদ'গুলিতে একান্ত-বৈঠকে শিষ্যের প্রতি গুরুর গুহ্য উপদেশাবলী বিবৃত হইয়াছে। প্রাচীন 'উপনিষদ'গুলি কোন কোন ক্ষেত্রে 'আরণ্যকে'র অংশ-মাত্র, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 'আরণ্যকে'র সহিত নূতন সংযোজন। বস্তুতঃ, 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদের' মধ্যে প্রভেদ করা প্রায়ই কঠিন। 'উপনিষদ' যাগযজ্ঞ-কেন্দ্রিক ধর্মের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়াবিশেষ। 'উপনিষদে' পরম সত্য ও সত্তার রূপ নির্ণয় করা হইয়াছে। এই সত্যের জ্ঞান মানুষের মুক্তির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। 'উপনিষদ'গুলি সচরাচর গদ্যে রচিত, তবে কোন কোন 'উপনিষদ' সম্পূর্ণতঃ অথবা খণ্ডতঃ পদ্যে রচিত। প্রধান 'উপনিষদ'গুলির মধ্যে 'ঈশ', 'কেন', 'কঠ', 'প্রশ্ন', 'মুণ্ডক', 'মাণ্ডুক্য', 'তৈত্তিরীয়', 'ঐতরেয়', 'ছান্দোগ্য', 'বৃহদারণ্যক', 'শ্বেতাশ্বতর', 'কৌশিতকী' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক ধর্ম

বৈদিক সাহিত্য হইতে বৈদিক ভারতের ধর্মজীবনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের আর্যদের ধর্মীয় চিন্তা ও আচার বিবর্তনের মাধ্যমে নব রূপ লাভ করিতেছিল। "ঋগ্বেদে আদিম ধর্মীয় চেতনার সরল উচ্ছ্বাস দেখা যায় না; উহাতে যে ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পুরোহিতগণের চেষ্টার এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াসের পরিণাম।"

বৈদিক ভারতীয়দের ধর্ম আর্য জাতির প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের অনুস্মৃতি মাত্র। তাহাদের দেবতাগণের মধ্যে কেহ কেহ আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্ব হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন। আবার কোন কোন দেবদেবীর—যেমন নদীমাতা সরস্বতীর—পূজা প্রচলিত হয় তাহাদের ভারতবর্ষে আগমনের পর। অধিকাংশ দেবদেবীই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে দ্যৌঃ, অগ্নি ও পর্জন্যের

নাম করা যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমা নিঃসন্দেহে বৈদিক ঋষিগণের কল্পনাকে উদ্দীপিত ও তাঁহাদের মনে ভক্তিভাবের সঞ্চার করিয়াছিল।

বৈদিক সাহিত্যে অগণিত দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কখনও কখনও তাঁহাদের বিহারভূমি অনুসারে তাঁহাদিগকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—আকাশ-চারী দেবতা (যথা, মিত্র ও বরুণ), মধ্য-নভোমণ্ডলের দেবতা (যথা, ইন্দ্র ও মরুৎগণ), এবং মর্ত্যের দেবতা (যথা, অগ্নি ও সোম)। পুরুষ দেবতার প্রাধান্য বৈদিক দেবতাচক্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। দেবগণের মধ্যে মর্যাদাভিত্তিক কোন সুস্পষ্ট স্তরভেদ নাই, অর্থাৎ কোন দেবতা অপর কোন দেবতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন স্বীকৃতি নাই। কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণাও দেখা যায় না। "প্রতি দেব বা দেবী তাঁহার পূজার বহুল প্রচলনহেতু প্রাধান্য পাইয়াছেন, অথবা পূজার সীমিত প্রচলনের ফলে অকিঞ্চিৎকর রূপে গণ্য হইয়াছেন।" এইজন্য এই ধর্মীয় স্তরকে 'বহু-দেববাদ' (Polytheism) বলা হয় নাই, 'একেশ্বরবাদ'ও (Monotheism) বলা হয় নাই। "ইহার মধ্যে দুই দিকেই প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস তখনও এতদূর পরিণত হয় নাই যে ইহাদের কোনটির সহিত উহাকে অভিন্ন মনে করা যায়।"

আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিকাশ মানবভাগ্যের নিয়ন্তারূপে দেবদেবীগণের গুরুত্ব ক্রমশঃ অনেক নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। প্রাচীন বৈদিক আচার অত্যন্ত সরল ছিল। দেবগণের উদ্দেশ্যে দুগ্ধ, শস্য ও ঘৃতের অনাড়ম্বর নৈবেদ্য নিবেদিত হইত। পূজার লক্ষ্য ছিল পার্থিব সুখ—সন্তান ও গোধন লাভ অথবা শত্রুবিনাশ। 'ব্রাহ্মণে'র যুগ হইতে জটিলতার উদ্ভব হইতে থাকে। অর্ঘ্যের উপকরণ বৃদ্ধি পাইল, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াও জটিল হইয়া উঠিল। যজ্ঞের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য বহুসংখ্যক পুরোহিতের প্রয়োজন হইত। 'হোতৃ'গণ মন্ত্র আবৃত্তি করিতেন, 'অধ্বর্যু' প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ পূজাপ্রকরণের অনুষ্ঠান করিতেন, 'উদগাতৃ' সামগান করিতেন, এবং অপর কয়েকজন সহকারীর কাজ করিতেন। ক্রমশঃ যে মনোভাবের সহিত নৈবেদ্য নিবেদন করা হইত তাহার মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হইল। দেবগণের তুষ্টিবিধানের পরিবর্তে যজ্ঞের মাধ্যমে যজ্ঞকারীর আকাঙ্ক্ষিত বস্তুদানে দেবতাকে বাধ্য করাই উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। এইভাবে দেবতারও উপরে যজ্ঞের মর্যাদা নির্ধারিত হইল। ইহার স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপ 'পূর্ব মীমাংসা' দর্শনে দেবগণ সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইলেন।

দার্শনিক চিন্তা, অর্থাৎ সত্য ও পরম সত্তার সন্ধানের চেষ্টার সূচনা, হয় 'আরণ্যকে'। 'উপনিষদ'-গুলিতে এই চেষ্টার স্বাভাবিক পরিণতি দেখা যায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এই রচনাগুলি বিশেষ মূল্যবান স্থানের অধিকারী। উহাদের অন্তর্নিহিত মূল ভাবটি এই যে এই দৃশ্যমান পরিবর্তনশীল জগতের অন্তরালে এক অপরিবর্তনীয় সত্তা (অর্থাৎ ব্রহ্ম) বিদ্যমান আছেন, এই পরম সত্তা মানবাত্মার সহিত অভিন্ন। ইহাই দার্শনিক দিক হইতে একেশ্বরবাদের চরম বিকাশ।

৩. ঋগ্বেদীয় আর্যগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন

বৈদিক যুগে অনার্যদের অবস্থা

প্রাচীন বৈদিক যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই দেশের আদিম অধিবাসী 'দস্যু' এবং 'পণি'গণের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার অভাব। আর্য ও তাহাদের অনার্য শত্রুগণের মধ্যে পার্থক্য ছিল স্পষ্টতঃই আকৃতির, ভাষার ও ধর্মের। অনার্যদের কৃষ্ণবর্ণ ও নাসিকাবিহীন ('অনাসঃ') বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; তাহাদের ভাষা ছিল উপহাসের বিষয়, এবং আর্য দেবতাদের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করিত না বলিয়া তাহারা প্রায়ই ধিক্কৃত হইত। দুই জাতির মধ্যে সংঘর্ষ খুব দীর্ঘস্থায়ী ও তিক্ত হইলেও বিজয়ী আর্যগণ পরাজিত অনার্য জনসাধারণকে নিঃশেষ করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বহু অনার্য পর্বত ও অরণ্যে আশ্রয় লয়, অন্যান্যরা 'দাস' শ্রেণীভুক্ত হইয়া বৈদিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। বৈদিক ও আদি পর্বের বেদোত্তর সাহিত্যে দাসদাসীর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়; ইহারা সম্ভবতঃ অনার্য ছিল। কিন্তু অনার্যরা সকলেই বর্বর বা অসভ্য ছিল না। তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রচুর গোধনের অধিকারী ছিল। তাহারা নগর নির্মাণে, অন্ততঃ পক্ষে সুদৃঢ় 'পুর' নির্মাণে, দক্ষ ছিল। 'দাস'গণ আর্যদের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

আর্যদের রাজনৈতিক অনৈক্য

বিজয়ী আর্য জাতির মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। দিবোদাস নামক এক আর্য রাজা তুর্বস, যদু ও পুরু জাতির সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অথবা পৌত্র সুদাস সরস্বতী নদী ও দৃষদ্বতী নদীর অন্তর্বর্তী ব্রহ্মাবর্তের অধিবাসী ভারত কুল এবং উত্তর-পশ্চিমের আর্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে এক প্রবল সংঘর্ষে নেতৃত্ব দেন। এই সংঘর্ষ ঋগ্বেদে 'দশ রাজার যুদ্ধ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আদি বৈদিক যুগের আর্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারতগণ, সরস্বতী নদীর চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী পুরুগণ, সিন্ধু ও চন্দ্রভাগা নদীর নিকটে বসবাসকারী কুরুগণ এবং ভারতগণের প্রতিবেশী সৃঞ্জয়গণ।

আর্যদের রাজনৈতিক সংগঠন

বৈদিক যুগে আর্যদের অধিকৃত ভূখণ্ড বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কর্তৃক অধ্যুষিত জনপদে বিভক্ত ছিল। রাজতন্ত্র সম্ভবতঃ অধিক প্রচলিত ছিল, তবে অন্য প্রকারের শাসন-ব্যবস্থারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সচরাচর উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা সিংহাসন

লাভ করিতেন ; জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচনের কয়েকটি অপ্রমাণিত দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। প্রজাপালন এবং যজ্ঞার্থে পুরোহিতগণের পোষণ রাজার প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। পরাজিত জাতিগুলির প্রদত্ত কর এবং প্রজাগণের উপহার রাজার আয়ের উৎস ছিল। এই সকল উপহার নিয়মিত বাধ্যতামূলক কর ছিল, অথবা অনিয়মিত স্বেচ্ছাধীন উপঢৌকন ছিল, তাহা জানা যায় না। সরকারী কর্ম-কর্তাদের মধ্যে 'সেনানী' অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ এবং 'গ্রামনী' অর্থাৎ গ্রাম-প্রধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমাজে পুরোহিতদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং খুব সম্ভব তাঁহাদের কর্তৃত্ব কেবলমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। "যে সকল ব্রাহ্মণ রাজনীতিবিদ যুগে যুগে রাজ্যশাসন ব্যাপারে প্রভূত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, বৈদিক যুগের পুরোহিত তাঁহাদেরই অগ্রদূত। একজন বিশ্বামিত্র বা একজন বশিষ্ঠ যে আদি বৈদিক যুগের রাজ্যশাসন-ব্যবস্থার অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।"

রাজনৈতিক সংগঠনের গণতান্ত্রিক অংশ ছিল 'সমিতি' (সাধারণের পরিষদ) ও 'সভা' (বিশেষ কয়েকজনের পরিষদ)। ইহাদের যথার্থ স্বরূপ ও কর্তব্য নিরূপণ করা সম্ভব নহে। তবে "বিশেষ বিশেষ সময়ে যে সম্প্রদায়ের সকল মানুষ তাহাদের নেতাদের নির্দেশিত কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনার, বা অন্ততঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের, জন্য সমবেত হইত এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই"। রাজা যদিও এই পরিষদ-গুলির কার্যে অংশগ্রহণ করিতেন তবুও ইহাদের অস্তিত্বই সম্ভবতঃ তাঁহার কর্তৃত্ব কিছু পরিমাণে খর্ব করিয়াছিল। 'সমিতি'র বিশেষ মর্যাদা ছিল। যে 'প্রজাপতি' রাজকীয় ক্ষমতার উৎস ছিলেন, সেই 'প্রজাপতি' হইতেই সমিতির উদ্ভব বলিয়া মনে করা হইত। রাজা আইন প্রণয়ন অথবা বিচারকার্য সম্পাদন করিতে পারিতেন কিনা তাহা জানা যায় না। বিচার-ব্যবস্থা এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য। সম্ভবতঃ যুদ্ধকালে, সচরাচর যেমন দেখা যায়, রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইত। তিনি যুদ্ধকালে কেবলমাত্র সৈন্য পরিচালনাই করিতেন না, রথে আরোহণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধও করিতেন।

প্রাচীন আর্য সমাজ

বৈদিক আর্যদের সামাজিক সংগঠন সম্বন্ধে মোটামুটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ছিল সামাজিক তথা রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। পুরুষের এক বিবাহ প্রচলিত ছিল, তবে বহুবিবাহ অজ্ঞাত ছিল না। নারীর একাধিক বিবাহের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সমাজে নারীদের স্থান উচ্চ ছিল। সচরাচর তাঁহারাই ছিলেন গৃহের কর্ত্রী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষিতা ও সংস্কৃতি-চেতনাসম্পন্না ছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ সংহিতাগুলিতে নারী-রচিত স্তোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহ অজ্ঞাত ছিল। বিধবাদের

পুনর্বিবাহও সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল। নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতেন এবং ভোজসভা ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিতেন।

যব, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, তরি-তরকারী এবং ফল প্রধান আহার্য ছিল। সম্ভবতঃ যজ্ঞকালে মাংসাহার করা হইত। বৃষ, মেষ ও ছাগমাংস আহার করা হইত। কেবলমাত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় অশ্বমাংস আহার করা হইত। গাভী অবধ্য পশু বলিয়া গণ্য হইত। সমাজে মদ্যপানের বিশেষ প্রচলন ছিল। 'সুরা' ছিল জনপ্রিয় পানীয়। 'সোমরসে'র তুলনায় উহার মাদকতাগুণ অধিক ছিল।

দেহের উপরিভাগ ও নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য দুই খণ্ড বস্ত্র পরিচ্ছদ রূপে ব্যবহৃত হইত। পশমনির্মিত বস্ত্রের প্রচলন ছিল। অলঙ্কার সাধারণতঃ স্বর্ণনির্মিত হইত; স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অলঙ্কার পরিধান করিত। কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত উভয়েরই প্রচলন ছিল। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দুন্দুভি, বীণা ও বাঁশী অধিক প্রচলিত ছিল। রথচালনা ছিল জনপ্রিয় প্রমোদ। শিক্ষা ছিল মৌখিক, অর্থাৎ গুরু মুখে মুখে শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন। সম্ভবতঃ লিপির ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল।

আদিম আর্যগণ যেমন নিরীহ মেষপালক সম্প্রদায় ছিল না, তেমনি তাহারা রুক্ষস্বভাব বন্য জাতিও ছিল না। তাহারা ছিল কর্মঠ, সদানন্দ ও যুদ্ধপ্রিয় মানুষ। জীবনকে তাহারা দুঃখময় বলিয়া মনে করিত না। বেদান্তে ও বৌদ্ধ সাহিত্যে ভারতীয় চরিত্রের যে ভোগবিমুখ ও নৈরাশ্যবাদী দিকটি আমাদের চোখে পড়ে, ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলিতে তাহা দেখা যায় না।

প্রাচীন বৈদিক যুগে আর্য সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল কি? ইতিহাস-বিদগণ এই কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিভিন্ন সমাধানে উপনীত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন ছিল না বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা বলেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের উল্লেখ কেবলমাত্র ঋগ্বেদের শেষ-পর্যায়ের একটি স্তোত্রে (দশম 'মণ্ডলে') পাওয়া যায়। এই প্রসিদ্ধ স্তোত্রটি 'পুরুষ সূক্ত' নামে পরিচিত। ইহাতে বলা হইয়াছে : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে ঈশ্বরের মুখ, বাহু, উরু ও পদযুগল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাচীনতর স্তোত্রগুলিতে যোদ্ধা ও পুরোহিতগণের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন যুদ্ধব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই। যাঁহারা এই মতের বিরোধী তাঁহারা বলেন, ঋগ্বেদের যুগে পুরোহিতের কার্য সাধারণতঃ বংশগত ছিল, এবং 'রাজন্য' শব্দটির উল্লেখ হইতে মনে হয় যে সেই সময় অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল এক অভিজাত শাসকশ্রেণীরও অস্তিত্ব ছিল। বস্তুতঃ, আদি বৈদিক সমাজ যে ধর্মীয় ক্ষমতার অধিকারী 'ব্রাহ্মণ', রাজকীয় শক্তির অধিকারী 'ক্ষত্র' এবং সাধারণ সম্প্রদায় অর্থাৎ 'বিশ'—এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। এই দুই বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বলা যায় যে ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলিতে

জাতিভেদ প্রথার অঙ্কুরমাত্র দেখা যায়—জীবিকা, অসবর্ণ বিবাহ ও ভোজনের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ ছিল না। তবে শ্বেতকায় আর্যগণ 'বর্ণ' দ্বারা কৃষ্ণকায় অনার্যদের হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

আর্যগণের অর্থ নৈতিক জীবন

আদি বৈদিক আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান তৎকালীন সাহিত্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্লেখ হইতে সংগৃহীত। আর্যরা প্রধানতঃ পশুপালক ছিল; গাভী ও বৃষ ছিল তাহাদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পত্তি। জনসাধারণের আয়ের প্রধান উপায় ছিল পশুপালন। 'গোধনের প্রতি কবিরা যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা প্রায় হৃদয়বিদারক'। অশ্বও খুব মূল্যবান বলিয়া মনে করা হইত। অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল ভেড়া, ছাগল, গাধা ও কুকুর। শিকার ছিল একাধারে আমোদ ও খাদ্যসংগ্রহের উপায়। সাধারণতঃ সিংহ, শূকর, মহিষ, হরিণ ও পক্ষী প্রভৃতি শিকার করা হইত।

কৃষির বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। কৃষির জন্য জলসেচের প্রচলন ছিল। যবের চাষ করা হইত। ধানের চাষ শুরু হয় আরও পরবর্তী কালে। লাঙ্গল ও গাড়ী টানার জন্য বলদ ব্যবহার করা হইত।

আত্মরক্ষার জন্য পরস্পরের সংলগ্ন কয়েকটি গৃহ লইয়া এক-একটি গ্রাম গঠিত ছিল। 'পুর' শব্দটির বহু ব্যবহার দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহার অর্থ ছিল মাটির দেওয়াল দ্বারা সুরক্ষিত স্থান, শহর নহে। 'ব্রাহ্মণ' রচনার যুগে অশন্দিবৎ, কৌশাম্বী, কাশী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

শিল্পোৎপাদনে পেশাগত নৈপুণ্য অর্জন বৈদিক অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। চর্মকার বৃষচর্ম হইতে তরল পদার্থের আধার, ধনুর ছিলা ও রজ্জু ইত্যাদি প্রস্তুত করিত। কাঠের কাজ যাহারা করিত তাহারা ছিল একাধারে সাধারণ সূত্রধর, আসবাবপত্র নির্মাতা ও রথপ্রস্তুতকারী। ধাতুদ্রব্য-নির্মাতাও ছিল। জাহাজ নির্মাণের পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ নদীপথে চলাচলের জন্য নাতিবৃহৎ নৌকা ব্যবহৃত হইত। সমুদ্রপথ বোধ হয় অজ্ঞাত ছিল না; আরব সাগর ও ভারত সাগরের সহিত আর্যগণ পরিচিত ছিল। তবে ব্যাপকভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ছিল। মুদ্রার পরিবর্তে বৃষ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। দূরবর্তী অঞ্চলে লাভের জন্য বাণিজ্যযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে দাসপ্রথার বার বার উল্লেখ থাকিলেও ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে বৈদিক অর্থনীতি দাসশ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল না। কোন জীবিকাই তখন অশ্রদ্ধেয় ছিল না; এমন কি, চর্মকারেরাও সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ বলিয়া গণ্য হইত না।

৪. পরবর্তী বৈদিক যুগ : রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য

উপনিষদগুলিকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় 'বেদান্ত' (বেদের উপসংহার ভাগ)। এতদ্ব্যতীত আছে ছয়টি 'বেদাঙ্গ' (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের সাহায্যকারী শাস্ত্র)— 'শিক্ষা' (শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ নির্ধারণের পদ্ধতি); 'কল্প' (ধর্মীয় রীতিনীতি নির্ধারক শাস্ত্র); ব্যাকরণ, 'নিরুক্ত' (শব্দের উৎপত্তি নির্ধারক শাস্ত্র), 'ছন্দ'; 'জ্যোতিষ'। এই সকল শাস্ত্রের সূচনা হইয়াছে 'ব্রাহ্মণ' ও 'আরণ্যক' গুলিতে; উহারা সূত্রের আকারে রচিত (সূত্র অর্থ স্মৃতির সহায়ক সংক্ষিপ্ত শব্দসমষ্টি)।

ছয় 'বেদাঙ্গে'র মধ্যে 'কল্পসূত্র'গুলিতেই সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ লইয়া বিস্তারিত আলোচনা শুরু হয়। যে সূত্রগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ যাগযজ্ঞের বর্ণনা আছে উহার নাম 'শ্রৌত সূত্র', যে সূত্রগুলিতে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান তথা দৈনন্দিন জীবনের যজ্ঞাদির আলোচনা আছে উহাদিগকে বলা হয় 'গৃহ্য সূত্র'। এই রচনা-সমূহ ধর্মতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব, উভয় শাস্ত্রের পণ্ডিতদিগের নিকট বিশেষ মূল্যবান তথ্যের উৎস। 'গৃহ্য সূত্রে'র সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে 'ধর্ম সূত্র'। ইহাতে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ আলোচিত হইয়াছে। 'শ্রৌত সূত্রে'র সহিত যুক্ত 'শুল্ব সূত্রে' বেদী ও যজ্ঞস্থানের মাপজোক সম্বন্ধে নির্দেশ আছে। এই সূত্রগুলিকে জ্যামিতি সম্বন্ধীয় সর্বপ্রাচীন ভারতীয় রচনা বলা যায়।

'কল্প সূত্র' 'ব্রাহ্মণ' ভাগের পরিপূরক, আর 'শিক্ষা' সম্বন্ধীয় সূত্রগুলি 'সংহিতা'র পরিপূরক। এই বিষয়ে প্রাচীনতম রচনা হইল 'প্রতিশাখ্য' সমূহ। উহাদের মধ্যে 'সংহিতা'গুলি কি ভাবে আবৃত্তি করিতে হইবে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

বৈদিক শব্দার্থ বিধি সম্বন্ধে একটি মাত্র গ্রন্থ বিদ্যমান; উহা হইল যাস্ক-রচিত 'নিরুক্ত'। পরিমাপ বিদ্যা (Metrics), গ্রহবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় পুরাতন রচনাদি হারাইয়া গিয়াছে। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাকরণগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন পাণিনির ব্যাকরণ। উহাতে মূলতঃ পরবর্তী যুগের সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য-গুলি আলোচিত হইয়াছে; বৈদিক ভাষার প্রসঙ্গ উহাতে কদাচিৎ কখনও উল্লিখিত হইয়াছে।

পরবর্তী বৈদিক যুগে সামাজিক পরিবর্তন

'কল্প সূত্র'গুলি ধর্মীয় ও সামাজিক উভয়বিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার আলোচনা, তাই উহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার বিবর্তন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'ব্রাহ্মণ' রচনার যুগে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশঃ একটি নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবিকা বংশগত হইল। বৈশ্য ও শূদ্রগণ ক্রমশঃ অধিকসংখ্যায় বংশগত জীবিকাভিত্তিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে লাগিল। অসবর্ণ

বিবাহ সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিল। জাতি পরিবর্তন করা যাইত কিনা তাহা বলা যায় না।

শূদ্রদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছিল। তাহারা আর দাসমাত্র রহিল না, স্বাধীন শ্রমজীবিরূপে পরিগণিত হইল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আর্য সভ্যতার বিস্তার হওয়ায় আর্য সমাজের নেতৃবর্গের পক্ষে লক্ষ লক্ষ অনার্যকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা আর সম্ভব ছিল না। গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানগুলিতে শূদ্রদের অংশগ্রহণের অধিকার 'সূত্র'গুলিতে কখনও কখনও স্বীকৃত হইয়াছে। ঐতরেয় 'ব্রাহ্মণে' বলা হইয়াছে যে 'শূদ্র হইল অপর কাহারও ভৃত্য; তাহাকে ইচ্ছামত বহিষ্কার করা এবং হত্যা করা যায়'। এই নির্দয় ব্যবস্থার তুলনায় শূদ্রদের পরিবর্তিত অবস্থা নিশ্চয়ই উন্নতির সূচক। কিন্তু উচ্চ বংশের 'পবিত্র' মানুষ নীচ জাতির 'অপবিত্র' মানুষের ছায়া মাড়াইলে তাহার জাতি নষ্ট হইবে, এই ধারণার প্রসার ঘটিল। ফলে অপবিত্র মানুষকে স্পর্শ করায় নিষেধবিধি প্রবর্তিত হইল। এভাবে অন্য এক দিক দিয়া শূদ্রদের সামাজিক অবনতির সূত্রপাত হইল।

সমাজ ক্রমশঃ এক নূতন আকার ধারণ করিতেছিল। বংশানুক্রমিক বৃত্তিধারী সম্প্রদায়গুলির গঠন ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তবে এই বিবর্তনের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলির সম্বন্ধে আমরা শুধু অনুমান করিতে পারি। যাঁহারা বেদপাঠের বিশেষ অনুশীলন করিতেন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির পরিচালনা করিতেন তাঁহারা 'ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হইলেন। যাঁহারা রাজনৈতিক ও সামরিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদের বলা হইত 'ক্ষত্রিয়'। এই দুইটি শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্য সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইত। কখনও কখনও ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় রাজগণের অপেক্ষা অধিক সম্মানীয় বলিয়া গণ্য হইতেন। আর্য সমাজের সাধারণ জনগণ 'বৈশ্য' নামে অভিহিত হইল। ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি তাহাদের প্রধান জীবিকা ছিল। তবে জাতিভেদ প্রথার বন্ধন তখনও বিশেষ কঠিন হয় নাই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ তখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। কিছু কিছু ক্ষত্রিয় তখনও বেদপাঠ করিতেন এবং যাগ-যজ্ঞের হোতা রূপে কাজ করিতেন। সমাজে শূদ্রদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, কিন্তু তাহাদের বিশেষ কোন মর্যাদা ছিল না।

সাহিত্য হইতে নারীদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। নারীদের শিক্ষার সুযোগ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ (যেমন, গার্গী ও মৈত্রেয়ী) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যার জন্ম সেই যুগেও 'দুঃখের কারণ' বলিয়া গণ্য হইত। রাজকুলে ও ধনী শ্রেণীর মধ্যে সম্ভবতঃ বহু বিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। নারীগণ সম্পত্তি ভোগ বা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি লাভ করিতে পারিত না। ক্রমশঃ স্বামীর সহিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণের অধিকার হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইয়াছিল।

পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজনৈতিক পরিবর্তন

আর্যদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনে বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু তথ্য আমরা পাই 'ব্রাহ্মণ' ও 'উপনিষদ' সমূহে এবং 'সূত্র' সাহিত্যে। আর্যদের কাছে এই সময় ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রোমাঞ্চকর অভিযান ও সম্প্রসারণের যুগ। তাহারা ইতিমধ্যে নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু তখনও কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চলই ছিল আর্য-সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। ঋগ্বেদের যুগের ছোট ছোট রাজনৈতিক বিভাগগুলির পরিবর্তে দেখা দিয়াছিল মোটামুটি বৃহদায়তন রাজ্যখণ্ড। রাজনৈতিক ঐক্যের ক্রমবর্ধমান আদর্শ ক্রমশঃ 'বাজপেয়', 'রাজসূয়' ও 'অশ্বমেধ' প্রভৃতি যজ্ঞক্রিয়ার মধ্যে বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতেছিল। এই সব যজ্ঞ ছিল একাধারে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যে সকল রাজা তাঁহাদের রাজ্য বিস্তারের অভিলাষ কিছুটা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতেন, তাঁহারাই এ-জাতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রাজ্যের উৎপত্তির ফলে স্বভাবতঃই রাজশক্তি বৃদ্ধি পাইল। 'সমিতি' ও 'সভার' গুরুত্ব কমিয়া গেল। বড় বড় শহরের উদ্ভব হইল। গ্রামভিত্তিক সভ্যতার অঙ্গরূপে নাগরিক সভ্যতার উৎপত্তি হইল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পাঞ্চালদের রাজধানী কাম্পিল, কুরুদের রাজধানী অশন্দিবৎ, বৎসদেশের রাজধানী কোশাম্বী এবং কাশী রাজ্যের রাজধানী কাশী নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারত প্রভৃতি কয়েকটি গোষ্ঠী, যাহারা ঋগ্বেদের যুগে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল, তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য হারাইল। তাহাদের স্থান অধিকার করিল কুরু ও পাঞ্চাল প্রভৃতি অপর কয়েকটি গোষ্ঠী। সাহিত্যে এই সকল গোষ্ঠীর রাজাদের যে-সব বিচ্ছিন্ন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা মোটামুটি কাঠামোও খাড়া করা যায় কিনা সন্দেহ।

পরবর্তী বৈদিক যুগে অর্থনৈতিক পরিবর্তন

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। কৃষির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির, বিশেষতঃ লাঙ্গলের, উন্নতি হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, সীসা, টিন ও লৌহ প্রভৃতি নূতন ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়। বস্ত্র রঞ্জন ও রজ্জু বয়ন প্রভৃতি নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়। মুদ্রার প্রচলনের সূত্রপাত হয়। এইভাবে অর্থনৈতিক জীবনে উন্নয়নের সূত্রপাত হয়।

৫. মহাকাব্য ও ধর্মশাস্ত্র

মহাকাব্যের সূচনা ও সময়

মহাকাব্যের (Epics) সূচনা হইয়াছে বৈদিক সাহিত্যে এবং 'সূত্র' সাহিত্যের সহিত উহার সম্পর্ক মোটামুটি স্পষ্ট। 'ইতিহাস পুরাণ' ও 'গাথা নারাশংসী'র

(মনুষ্যের স্তুতিমূলক গীত) বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে মহাভারত[১] ও রামায়ণ এই বিশেষ ধারার রচনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

রাজসভার গায়ক বা চারণ কবিরা যে সকল পুরাতন বীরগাথা গান করিত সেগুলির ভিত্তিতে কোন মহৎ কবি 'মহাভারত' রচনা করিয়াছেন—এই অনুমান ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে মহাকাব্যটি শতাব্দীর ও শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন কবির রচিত বিভিন্ন মানের কাব্যের একত্রীভূত রূপ। স্বভাবতঃই ইহাতে কাহিনীর এবং রচনা-বিন্যাসের মৌলিক ঐক্য নাই। বিভিন্ন সময়ে ইহাতে নানা প্রকার প্রক্ষেপণ ও সংযোজন ঘটিয়াছিল। মহাভারত একটিমাত্র কাব্য নহে, উহা একটি সমগ্র সাহিত্য।

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম উল্লেখগুলিতে মহাভারতের মূল কাহিনীটি পাওয়া যায়, রামায়ণের উল্লেখ দেখা যায় না। এই দিক দিয়া মহাভারতকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিতে হয়। ঋগ্বেদের যুগের সুপরিচিত গোষ্ঠী ভারতগণ সম্বন্ধে রচিত একটি বীরগাথা সম্ভবতঃ মহাভারতের কেন্দ্রস্থ বিষয়। কিন্তু যুগে যুগে উহাতে এত বেশী পরিবর্তন ও সংযোজন ঘটিয়াছে যে বর্তমানে কেন্দ্রস্থ বিষয়টিকে একেবারেই চিনিয়া বাহির করা সম্ভব নহে। ভারতীয় ঐতিহ্যে পুরাণোক্ত মহর্ষি ব্যাসকে মহাভারতের প্রণেতা বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু মহাভারত বর্তমানে যে রূপে বিদ্যমান, ব্যাসদেবকে উহার সংকলনকারী আখ্যাও দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতবিরোধ রহিয়াছে। বর্তমানে প্রচলিত মহাভারত সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে এবং খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরে রচিত নহে। স্পষ্টতঃই বর্তমান মহাভারতের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল।

রামায়ণও একটি সামগ্রিক সাহিত্য, কিন্তু মহাভারত অপেক্ষা উহাতে কাহিনীর ও ভাবের অধিক ঐক্য দেখা যায়। পুরাতন গাথা-কবিতার ভিত্তিতে বাল্মীকি কর্তৃক আদি রামায়ণ রচিত হয় খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। ঐ আদি রামায়ণকে কেন্দ্র করিয়া পরে অসংখ্য সংযোজন ও পরিবর্তন ঘটে, উহার ফলেই গ্রন্থটি বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। রামায়ণ উহার বর্তমান-প্রচলিত আকার ও বিষয়-বৈশিষ্ট্য লাভ করে সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে।

মহাকাব্যে সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন

মহাকাব্য দুইটিতে ক্ষত্রিয়কুলের প্রাধান্য দেখা যায়। এখানে সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয়দের অপেক্ষা নিম্নতর স্থান দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর

১ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাভারত ও রামায়ণকে 'মহাকাব্য' (Epics) বলিয়াছেন, কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে মহাকাব্য বলিতে যে শ্রেণীর রচনা বুঝায়, এই দুইটি রচনা ঠিক সেই পর্যায়ে পড়ে না।

সহিত এইখানে মহাকাব্যদ্বয়ের সাদৃশ্য দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে চারটি শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায়: (১) ক্ষাত্রকুল, যাহার প্রধান হইলেন রাজা; (২) পুরোহিতগণ, যাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও রাজনীতিক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ নহেন; (৩) বণিকসম্প্রদায়, যাহা কয়েকটি 'বৃত্তিভিত্তিক সংস্থায়' (guild) সংগঠিত ও যাহাদের প্রধান 'মহাজন'গণ যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্বের অধিকারী; (৪) কৃষকগণ, যাহারা সংঘবদ্ধ না হইলেও নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিল এবং আর্যত্বের গৌরব দাবি করিত। আর্যগণের নিম্নে ছিল শূদ্র, দাস ও বন্য জাতিসমূহ।

মহাকাব্যদ্বয়ে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিফলন

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে রামায়ণে ও মহাভারতে যে সকল বংশ-তালিকা পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি নির্ভুল। পার্জিটার (Pargiter) হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছেন যে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খ্রীস্টপূর্ব ১১০০ অব্দে বা উহার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে এখন নূতনভাবে গবেষণা ও আলোচনা করা হইতেছে। কুরুগণ পরবর্তী বৈদিক যুগের পরাক্রান্ত আর্য গোষ্ঠীগুলির অন্যতম ছিল; কিন্তু পাণ্ডুদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অনেক পরে—পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে। সেখানে তাহাদিগকে একটি পার্বত্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কুরু ও পাণ্ডবদের ঐতিহ্যমণ্ডিত হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ উভয় নগরই ঐতিহাসিক। হস্তিনাপুরে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ হইতে ৭০০ অব্দের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণের কাহিনীকে কোন কোন পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিক আর্যগণ কর্তৃক দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টার রূপকাশ্রিত কাহিনী বলিয়া মনে করেন। একটি জাতক-কাহিনীতে রামের উল্লেখ আছে। কোশল দেশ দীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য আর্য রাজগুলির অন্যতম ছিল। অতএব রামায়ণ কাহিনীর সারাংশটি ঐতিহাসিক দিক হইতে সত্য হওয়াই সম্ভব।

ধর্মশাস্ত্র

'ধর্মশাস্ত্র'গুলির বিষয় হইল ধর্মীয় কর্তব্য এবং সামাজিক বিধি-বিধান। প্রধান প্রধান 'ধর্মশাস্ত্র' বলিতে মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ বিরচিত বলিয়া পরিচিত 'সংহিতা'গুলিকে বুঝায়। ইহাদের রচনাকাল সঠিক জানা যায় না, তবে সাধারণতঃ মনে করা হয় যে খ্রীস্টীয় প্রথম ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ইহারা রচিত হয়।

'ধর্মশাস্ত্র'গুলিতে জাতিভেদ প্রথার কঠোর রূপ দেখা যায়। সনাতন চারিটি জাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) কর্তব্য কর্মের সবিস্তার আলোচনা ছাড়াও

ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বিভিন্ন 'সঙ্কর' বা মিশ্র জাতির উল্লেখ দেখা যায়। অসবর্ণ বিবাহ এবং ভিন্ন জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ মিলনের ফলে এই 'সঙ্কর' জাতিগুলির উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়।

'ধর্মশাস্ত্র'গুলি হইতে প্রাচীন আর্যগণের জীবনযাত্রার একটি বিশিষ্ট দিক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। প্রত্যেক 'দ্বিজ' বা ব্রাহ্মণকে 'চতুরাশ্রম' পালন করিতে হইত। প্রথম আশ্রম 'ব্রহ্মচর্য', উপনয়ন অনুষ্ঠানে উহার সূত্রপাত এবং পাঠ-সমাপ্তিতে উহার অবসান। দ্বিতীয় আশ্রম 'গাহস্থ্য'। এই অধ্যায়ে দ্বিজ বিবাহ করিয়া গৃহীজীবন যাপন করিত। তৃতীয় আশ্রম 'বাণপ্রস্থ'। এই অধ্যায়ে গৃহী মানুষ সাংসারিক দুশ্চিন্তার বন্ধন কাটাইয়া বনে গমন করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিত। চতুর্থ আশ্রম 'সন্ন্যাস'। তখন মানুষ নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া আত্মাকে মূল আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধিতে নিয়োজিত করিত।

'ধর্মশাস্ত্র'গুলি হইতে স্ত্রীজাতির অবস্থার ক্রমিক অবনতির পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। মনু বলিয়াছেন, "নারীকে স্বাধীনভাবে বাস করিতে দেওয়া উচিত নহে: নারী স্বাধীনতার যোগ্য নহে। বাল্যে নারী তাহার পিতার দ্বারা, যৌবনে স্বামীর দ্বারা এবং বার্ধক্যে পুত্রগণের দ্বারা পালিত হইবে।" মনু নারীর বাল্যবিবাহকে ধর্মাচরণের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সম্পত্তির উত্তরাধিকারেও নারীর দাবি স্বীকৃত হয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

বেদোত্তর যুগ

১. জৈন ধর্ম

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে এক বিস্ময়কর ধর্মবিপ্লবের সূচনা হয়। এই ঘটনা ভারতীয় ইতিহাসের গতিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। তৎকালীন জটিল ক্রিয়াকলাপ ও রক্তপাতী যাগযজ্ঞভিত্তিক বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই ধর্ম-বিপ্লবের সূচনা হয়। তবে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে ইহাকে উপনিষদের তত্ত্বজিজ্ঞাসার সম্প্রসারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই বিপ্লব ছিল নিরীশ্বরবাদী, বৈদিক দেবপূজা এবং ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরোধী। ইহার প্রবর্তক, মহাবীর ও বুদ্ধ, উভয়েই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

মহাবীর

সচরাচর মনে করা হয় যে বর্ধমান মহাবীর জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তবে জৈনগণের বিশ্বাস, তিনি ছিলেন এই ধর্মের প্রবর্তন ও প্রসারের নায়ক 'তীর্থঙ্কর' নামে পরিচিত এক সুদীর্ঘ গুরু-পরম্পরার শেষ তীর্থঙ্কর। জৈন সাহিত্যে উল্লিখিত তীর্থঙ্করদের মধ্যে একজন, পার্শ্বনাথ, সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। অন্যান্যরা কাল্পনিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে হয়; রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁহাদের নাম অজ্ঞাত। কথিত আছে, পার্শ্বনাথ ছিলেন বারাণসীর রাজপুত্র। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রচারিত শিক্ষায় অহিংসা, অসত্য কথন ও চৌর্য হইতে নিবৃত্তি এবং অপরিগ্রহের আধ্যাত্মিক মূল্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

মহাবীরের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তিনি খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ৪৭৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। উত্তর বিহারের বৈশালীর সন্নিকটে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এক বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান ছিলেন এবং বৈশালীর লিচ্ছবি রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি সাধারণ গৃহীর জীবন যাপন করেন। তারপর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর নানা স্থানে পর্যটন করেন এবং ক্রমাগত কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা স্বীয় দেহকে নিগৃহীত করেন। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি দিব্যজ্ঞান ('কৈবল্য') লাভ করেন এবং 'জিন' (ইন্দ্রিয়জয়ী) এবং 'নিগ্রন্থ' (সাংসারিক

গ্রন্থিবন্ধন বিমুক্ত) বলিয়া পরিচিত হন। এই দুইটি অভিধা হইতে তাঁহার অনুগামীদের নাম হইয়াছে 'জৈন' বা 'নিগ্রন্থ'। মহাবীর তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ত্রিশ বৎসর মগধে, অঙ্গে, মিথিলায় ও কোশলে তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। কথিত আছে, মগধের পরাক্রান্ত রাজা বিম্বিসার ও তাঁহার পুত্র অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। পার্শ্বনাথের শিক্ষাকে তিনি তাঁহার ধর্মমতের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেন, এবং পার্শ্বনাথের প্রচারিত চারটি নির্দেশের সঙ্গে তিনি আর একটি যোগ করেন—সর্বদা জিতেন্দ্রিয় হইবে। বিহারের পাটনা জেলার অন্তর্গত পাবা নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জৈন ধর্মের মূলনীতি

জৈনগণ বেদের মাহাত্ম্য অস্বীকার ও পশুবলি বর্জন করে। বৌদ্ধদের তুলনায় তাহারা অহিংসা ধর্মে অধিকতর নিষ্ঠাবান। তাহারা বিশ্বাস করে যে প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই সচেতন এক আত্মা ('জীব') বর্তমান। এক পরমা শক্তির দ্বারা বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে এই তত্ত্ব তাহারা অস্বীকার করে। তাহাদের মতে 'মানুষের আত্মার মধ্যে যে শক্তি' অন্তর্নিহিত আছে, ঈশ্বর তাহারই উচ্চতম মহত্তম পূর্ণতম অভিব্যক্তি। হিন্দুদের কর্মবাদে জৈনদের আস্থা আছে। জৈন মতে মুক্তি বলিতে বুঝায় বিগত সকল জন্মের কর্মের বন্ধন হইতে পরিপূর্ণ অব্যাহতি। এই মুক্তিলাভের উপায় 'ত্রি-রত্নে'র সাধনা। প্রকৃত ভক্তি, যথার্থ জ্ঞান ও সম্যক্ আচরণ, এই হইল 'ত্রিরত্ন'। কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মনিগ্রহের দ্বারা আত্মার বলবৃদ্ধি হয়—এই বিশ্বাসে জৈনগণ সন্ন্যাসের আদর্শের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

জৈন ধর্মের আদি ইতিহাস

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। মহাবীর ও বুদ্ধ—উভয়েই পূর্ব ভারতে ধর্ম প্রচার করেন এবং একই শ্রেণীর মানুষদের মধ্য হইতে শিষ্য সংগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ প্রথম যুগে জৈন ধর্ম অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই জৈন ধর্ম দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করে।

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জৈনগণ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়—'শ্বেতাম্বর' সম্প্রদায় ও 'দিগম্বর' সম্প্রদায়। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিত, কিন্তু দিগম্বরগণ মহাবীরের অনুকরণে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র থাকিত। জৈন ধর্ম ভারতবর্ষের বাহিরে কখনও প্রচারিত হয় নাই, তবে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই ধর্ম দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে—গুজরাটে ও রাজপুতানায়—অন্যতম প্রধান ধর্ম ছিল।

জৈনদিগের ধর্মসাহিত্য

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাটলিপুত্র নগরে অনুষ্ঠিত এক জৈন সমাবেশে মহাবীরের প্রচারিত নীতিসমূহকে দ্বাদশটি 'অঙ্গে' সুবিন্যস্ত করা হয়। কালক্রমে দ্বাদশতম অঙ্গটি হারাইয়া যায়। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুজরাটের বলভী নগরে আহূত একটি সভায় অবশিষ্ট একাদশটি অঙ্গকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। এই অঙ্গগুলির যাথার্থ্য দিগম্বরেরা স্বীকার করে নাই ; অতএব উহা কেবল শ্বেতাম্বরদের ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। এই রচনাগুলি 'আর্ষ' বা 'অর্ধমাগধী' নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত, কারণ বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনরাও পণ্ডিতদের ভাষা সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থগুলিকে সর্বসাধারণের অধিগম্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। খ্রীস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে জৈন টীকাভাষ্য ও দার্শনিক গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইতে থাকে।

জৈনদিগের ধর্মীয় সাহিত্যের পরিমাণ বিশাল, তবে উহাদের সাহিত্যিক মূল্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মূল্যই অধিক। 'দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া জৈনদের ধর্মগ্রন্থগুলি নীরস, বিশুদ্ধ উপদেশাত্মক ভঙ্গীতে রচিত ; উহাদের রচনারীতিতে বৌদ্ধ সাহিত্যের ন্যায় মানবিক আবেদন খুবই অল্প।'

জৈনদের অন্যবিধ সাহিত্য

ধর্মীয় সাহিত্য ছাড়া জৈনগণ অন্যবিধ সাহিত্যও রচনা করিয়াছেন। ইহাদের কিছু প্রাকৃত, কিছু সংস্কৃত ভাষায় রচিত। জৈন লেখকদিগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভদ্রবাহু, সিদ্ধসেন, দিবাকর, হরিভদ্র, সিদ্ধ ও হেমচন্দ্র। কাহিনী-সাহিত্য জৈনদের অন্যতম বিশিষ্ট কীর্তি। তাহা ছাড়া তাঁহারা উল্লেখযোগ্য কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও স্তোত্র ইত্যাদিও রচনা করিয়াছেন। তবে দর্শনে তাঁহাদের দানের মূল্য অনেক বেশী। বৌদ্ধ 'শূণ্যবাদে'র বিপরীতে তাঁহারা 'স্যাৎবাদ' নামক অস্তিত্ববাদী দর্শন প্রচার করেন। জৈন দার্শনিকগণ ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ, অভিধান প্রণয়ন-বিদ্যা, কাব্যতত্ত্ব, অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ফলিত জ্যোতিষ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় জৈন রচনার দ্বারা সবিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, গুজরাটী, হিন্দী ও রাজস্থানী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার বিকাশেও তাঁহাদের অবদান মূল্যবান। অতএব, ভারতীয় দর্শনের ও সাহিত্যের ইতিহাসে জৈনগণ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

অন্যান্য সম্প্রদায়

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব ভারতে আধ্যাত্মিক অস্থিরতা এত প্রবল হইয়া উঠে যে বিভিন্ন গুরুর নেতৃত্বে বহু ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। জৈন গ্রন্থগুলিতে ৩৬টি

সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায়, বুদ্ধ যখন ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হন তখন দেশে ধর্মসম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল ৬২। এই সকল সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবে 'আজীবিক' সম্প্রদায়ের উল্লেখ বার বার দেখা যায়। অশোকের শিলালিপিগুলিতেও আজীবিকগণের উল্লেখ আছে। ইহাদের প্রধান নেতা, গোশাল মৌখলিপুত্ত, মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন।

২. বৌদ্ধধর্ম

গৌতম বুদ্ধ : জীবনী

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। মহাবীরের ন্যায় তাঁহারও জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অনিশ্চিত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনি ৪৮৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে পরিনির্বাণ লাভ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন তাঁহার পরিনির্বাণ লাভ হয় ৫৪৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। তিনি বর্তমান উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার উত্তরে নেপালের তরাই অঞ্চলের অধিবাসী শাক্য জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহাবীরের ন্যায় তিনিও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন শাক্যগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তিনি কপিলাবস্তু নগরে বাস করিতেন।

কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনী নামক গ্রামের উদ্যানে (বর্তমানে নেপালের অন্তর্ভুক্ত রুম্মিনদেই) গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। অশোকের রুম্মিনদেই স্তম্ভ অদ্যাপি এই পবিত্র ঘটনার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। তরুণ বয়সে তিনি গোপা অথবা যশোধরা নাম্নী এক বালিকাকে বিবাহ করেন। গৌতমের বয়স যখন উনত্রিশ বৎসর তখন রাহুল নামে তাঁহার এক পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু তাঁহার মন ইতিমধ্যেই তৎকালীন আধ্যাত্মিক অশান্তির সংস্পর্শে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তির সন্ধানে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাসীরূপে তিনি কিছুকাল রাজগৃহে দুইজন বিশিষ্ট গুরুর নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। অতঃপর তিনি বর্তমান বিহারের অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধগয়ার নিকটস্থ উরুবিল্ব নামক স্থানে গিয়া তৎকালীন যোগীদের অনুকরণে কঠোর তপস্যায় লিপ্ত হইলেন। কিন্তু মুক্তি তখনও সুদূরপরাহত রহিল। অবশেষে গভীর মনঃসংযোগ ও নিবিড় ধ্যানের ফলে তিনি পরম সত্য উপলব্ধি করিলেন। তিনি 'সম্বোধি' লাভ করিয়া 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী নামে পরিচিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বৎসর।

বুদ্ধ তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় তাঁহার ধ্যানলব্ধ সত্য প্রচারে নিয়োজিত করিলেন। তিনি কাশীর নিকটবর্তী সারনাথের মৃগদাবে প্রথম 'ধর্মচক্র প্রবর্তন'

করেন, অর্থাৎ প্রথম উপদেশ প্রদান করেন। এখানে তিনি পাঁচজন শিষ্য লাভ করেন। পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বৎসর তিনি তাঁহার ধর্মপ্রচার কার্যে ব্রতী ছিলেন। অযোধ্যা, বিহার ও সন্নিহিত অঞ্চলে বহু ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। অবশেষে আশী বৎসর বয়সে কুশীনগরে (উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত কাশীয়া) তাঁহার নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে।

বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা

বুদ্ধ ছিলেন বাস্তববাদী সংস্কারক। তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল দুঃখ-যন্ত্রণার রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতার পীড়ন হইতে মানুষকে মুক্তিদান। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'চারটি মহাসত্য' প্রচার করেন; ইহাদের 'আর্য সত্য' বলা হয়:—(১) জগতে দুঃখ আছে। (২) দুঃখের কারণ আছে; আকাঙ্ক্ষাই হইল দুঃখের কারণ। (৩) দুঃখের নিবৃত্তি একান্ত কাম্য। (৪) দুঃখ নিবৃত্তির যথার্থ উপায় কি তাহা জানা আবশ্যক।

আকাঙ্ক্ষা হইতে দুঃখের সৃষ্টি, সুতরাং আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতে দুঃখেরও নিবৃত্তি। আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির আটটি উপায় ('অষ্টাঙ্গিক মার্গ') আছে: (১) সম্যগ্ দৃষ্টি; (২) সৎ সংকল্প; (৩) সদ্বাক্য; (৪) সৎ কর্ম; (৫) সৎ জীবন; (৬) সৎ চেষ্টা; (৭) সৎ স্মৃতি; (৮) সম্যক্ সমাধি। ইহাই হইল বহুখ্যাত 'মধ্যম পন্থা' (Middle Path)। ইহা চূড়ান্ত বিলাস ও কঠোর আত্মনিগ্রহ, উভয়কেই বর্জন করিয়া চলে। এই পন্থা অবলম্বন করিলে মানুষ নির্বাণ লাভ করিতে পারে। নির্বাণ অর্থ কেবল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নহে, ইহা এক আত্ম-সমাহিত পরম শান্তির অবস্থা। বৌদ্ধ ধর্মে 'শীল' বা নীতি (অর্থাৎ হিংসা, মিথ্যা, বিলাসব্যসন ইত্যাদি বর্জন), 'সমাধি' বা ধ্যান, এবং 'প্রজ্ঞা' বা অন্তর্দৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

কৃচ্ছ্রসাধন অর্থাৎ দেহকে ক্লিষ্ট করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা বুদ্ধ অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এই প্রশ্নে মহাবীরের সহিত বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষিত হয়। বুদ্ধ প্রাণীগণের প্রতি হিংসা হইতে বিরত থাকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তবে এই প্রশ্নে জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষাও কঠোর। বুদ্ধ বেদের মাহাত্ম্য অস্বীকার করেন। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ আচার-অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক উপযোগিতায় তাঁহার আস্থা ছিল না। কিন্তু হিন্দুদের সনাতন জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ তিনি স্বীকার করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্বের প্রশ্ন লইয়া তিনি চিন্তা করেন নাই, কারণ তাঁহার মতে দুরূহ ও জটিল দার্শনিক চিন্তায় সময় অতিবাহিত করা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের পক্ষে অনাবশ্যক। তাঁহার সরল ধর্ম স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, উচ্চ-নীচ সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য ছিল। তিনি তৎকালীন জনগণের কথিত ভাষায়, অর্থাৎ পালিতে,

ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনার রীতি প্রবর্তন করেন। কেবলমাত্র স্বল্প-সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির বোধগম্য সংস্কৃত ভাষায় ধর্মশিক্ষাদান সীমাবদ্ধ রাখার রীতি তিনি পরিত্যাগ করেন।

বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য

বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ বিহারের অন্তর্গত রাজগৃহ নগরে এক সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া তাঁহার উপদেশাবলীর এক পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক সংকলন লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু মনে হয়, আরও দুই-এক শতাব্দী অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য তাহার বর্তমান রূপ লাভ করে নাই। এই সাহিত্য সামগ্রিকভাবে 'ত্রিপিটক' (অর্থাৎ তিন পেটিকার সমাহার) বলিয়া পরিচিত। ইহার প্রথম অংশের নাম 'বিনয় পিটক'। উহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের পক্ষে পালনীয় নিয়মাবলী এবং বৌদ্ধ বিহারসমূহের সাধারণ পরিচালন রীতি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশের নাম 'সুত্ত (সূত্র) পিটক'। উহাতে বুদ্ধের ধর্মোপদেশসমূহ সংকলিত হইয়াছে। তৃতীয় অংশের নাম 'অভিধম্ম (অভিধর্ম) পিটক'। উহাতে বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্নিহিত দর্শনের আলোচনা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

বুদ্ধের নির্বাণের প্রায় এক শতাব্দী পরে বিহারের অন্তর্গত বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ 'সঙ্গীতি' বা সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বৌদ্ধধর্মের প্রচলিত কয়েকটি বৌদ্ধধর্মবিরোধী মতবাদের নিন্দা করা হয় এবং শাস্ত্রগ্রন্থ-গুলির সংস্কার করা হয়। তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন হয় পাটলিপুত্র নগরে, অশোকের উদ্যোগে। এই অধিবেশনেও কয়েকটি বিরুদ্ধ মতের নিন্দা করা হয় এবং শাস্ত্রগুলিকে যথাযথ চূড়ান্ত রূপদানের চেষ্টা হয়। চতুর্থ ও শেষ সঙ্গীতির অধিবেশন হয় কণিষ্কের উদ্যোগে, কাশ্মীরে অথবা পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধরে। এই অধিবেশনে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলির প্রামাণ্য টীকাভাষ্য সংকলিত হয়। এই সময়েই 'মহাযান' বৌদ্ধ ধর্মমতের উদ্ভব হয়। ইহা বৌদ্ধধর্মের একটি পরিবর্তিত রূপ। বৌদ্ধধর্মের আদি রূপ 'হীনযান' নামে পরিচিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে 'জাতক'গুলির উল্লেখ করা যায়। জাতকগুলির বিষয়বস্তু হইল বুদ্ধের পূর্ব জন্মের কাহিনী। এগুলি পালি ভাষায় রচিত এবং নিশ্চিতভাবে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীর পূর্বের রচনা। ভক্তিমান বৌদ্ধদের নিকট জাতকের বিশেষ মূল্য আছে। তাহা ছাড়া প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অনুশীলনকারীদের পক্ষেও জাতকের গল্পগুলি বিশেষ অনু-ধাবনযোগ্য, কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জাতক হইতে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়

বৌদ্ধ সম্প্রদায়সমূহ

দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির সময়ে 'পূর্বদেশীয়' (অর্থাৎ বিহারের অন্তর্গত বৈশালী ও পাটলিপুত্রের অধিবাসী) এবং 'পশ্চিমদেশীয়' (অর্থাৎ এলাহাবাদের নিকটস্থ কৌশাম্বী ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত অবন্তীর অধিবাসী) বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। প্রথম দলের নাম হইল 'আচারীয়বাদী', এবং দ্বিতীয় দলের নাম হইল 'থেরবাদী'। কালক্রমে মতবিরোধ আরও বৃদ্ধি পাইল। আচারীয়বাদীগণ সাতটি উপদলে, এবং থেরবাদীগণ একাদশটি উপদলে বিভক্ত হইল। কিছুকাল পরে প্রথম সম্প্রদায়ের কয়েকটি উপদল নূতন নূতন ধারণার প্রবর্তন করিল ; যেমন, বুদ্ধের অবতারত্ব স্বীকার, বোধিসত্ত্বের ধারণার প্রবর্তন ইত্যাদি। এইভাবে 'মহাযান' মতবাদের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। বুদ্ধের তিরোধানের মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আর একটি মাত্র ধর্মীয় সংস্থার ইতিহাস রহিল না, সুসংহত উহা হইয়া উঠিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত পরস্পর-নিরপেক্ষ অনেকগুলি ধর্মীয় সংস্থার ইতিহাস।

৩. রাজনৈতিক ঐক্যের বিকাশ

ঐক্যের আদর্শ

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ একটি সুপরিচিত ধারণা। 'বাজপেয়' যজ্ঞের অনুষ্ঠান যিনি করিতেন তিনি 'সাম্রাজ্যে'র অধীশ্বর রূপে সমাদৃত হইতেন। 'ঐন্দ্র মহাভিষেক' অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল 'একরাট' অর্থাৎ পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজার মর্যাদা লাভ। সার্বভৌম শাসকের পক্ষে 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ অনুষ্ঠেয় কর্ম ছিল, এবং প্রাচীন সাহিত্যে এমন অনেক রাজার নাম পাওয়া যায় যাহারা এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান লইয়া আমরা কোনক্রমেই বলিতে পারি না খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগে ভারতবর্ষে যথার্থই কোন বৃহৎ সামাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মহাপদ্ম নন্দ উত্তর ভারতের অধিকাংশ, এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতেরও কিছু অংশকে মগধের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করেন।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজনৈতিক অবস্থা

প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে জানা যায় যে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে ষোলটি রাজ্য বা 'মহাজনপদ' ছিল। রাজ্যগুলির নাম :

(১) কাশী—ইহার রাজধানী ছিল বারাণসী। প্রথমে 'মহাজনপদ'গুলির মধ্যে কাশী সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য ছিল, কিন্তু পরে কোশল সমধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে।

(২) কোশল—মোটামুটিভাবে বর্তমান অযোধ্যাকে (উত্তর প্রদেশের অংশ) আমরা কোশল রাজ্য বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি। কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী (বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোন্দা জেলার অন্তর্গত সাহেত মাহেত)। অপর দুইটি প্রধান নগরী ছিল আযোধ্যা ও কপিলাবস্তু। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশী কোশল রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়।

(৩) অঙ্গ—মগধের পূর্বদিকে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। চম্পা (বর্তমান বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের সন্নিকটে) এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। বিম্বিসার এই রাজ্যকে মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(৪) মগধ—বর্তমান বিহার রাজ্যের পাটনা ও গয়া জেলা লইয়া এই রাজ্যটি গঠিত ছিল। প্রথমে গয়ার নিকটবর্তী পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত, রাজগীরের নিকটবর্তী, গিরিব্রজ এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। পরে রাজধানী রাজগৃহে স্থানান্তরিত হয়। সর্বশেষে রাজধানী হয় পাটলিপুত্র।

(৫) বৃজি যুক্তরাষ্ট্র—আটটি খণ্ডজাতির অধিকৃত অঞ্চল সম্মিলিত করিয়া এই যুক্তরাষ্ট্র সংগঠিত হইয়াছিল। খণ্ডজাতিগুলির মধ্যে বৃজিকুল, বৈদেহী কুল, লিচ্ছবি কুল ও জ্ঞাতৃক কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃজি ও লিচ্ছবিকুলের এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল বৈশালী (বর্তমান বিহারের মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বসার ও বখিরা)। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে, লিচ্ছবিগণ ছিল মোঙ্গল বংশোদ্ভূত। বৈদেহী কুলের রাজধানী ছিল মিথিলা (বর্তমান নেপালের অন্তর্গত জনকপুর)। জৈনগুরু মহাবীর জ্ঞাতৃক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞাতৃকগণ বৈশালী নগরীর উপান্তস্থিত কুন্দপুর ও কোল্লাগা অঞ্চলে বাস করিত।

(৬) মল্ল রাষ্ট্র—মল্লদের রাষ্ট্র সম্ভবতঃ বৃজি রাষ্ট্রের উত্তরে অবস্থিত ছিল। ইহা দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল—এক অংশের রাজধানীর নাম কুশীনারা (উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত); অপর অংশের রাজধানী ছিল পাবা (কুশীনারার সন্নিকটে)। বৃজি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এই রাজ্যেও অভিজাততন্ত্র (Oligarchy) প্রচলিত ছিল, তবে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ইহা ছিল রাজতন্ত্র শাসিত।

(৭) চেদী রাজ্য—বর্তমান মধ্য প্রদেশের বুন্দেলখণ্ড ও সন্নিহিত অঞ্চলে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল শুক্তিমতী (বর্তমান উত্তর প্রদেশের বান্দার নিকটে)।

(৮) বংশ বা বৎস রাজ্য—অবন্তীর উত্তর-পূর্বে, যমুনা নদীর তীরে, বৎস রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল কৌশাম্বী (বর্তমান এলাহাবাদের নিকটবর্তী কোশম)।

(৯) কুরু রাজ্য—এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লীর নিকটে)।

অপর একটি প্রধান নগর ছিল হস্তিনাপুর। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই রাজ্যের বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না।

(১০) পাঞ্চাল—বর্তমান উত্তর প্রদেশের রোহিলখণ্ড ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের মধ্যভাগে পাঞ্চাল রাজ্য অবস্থিত ছিল। গঙ্গা নদী দেশটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল—উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র (বর্তমান উত্তর প্রদেশের বেরিলী জেলার রামপুর) এবং দক্ষিণাঞ্চলের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য।

(১১) মৎস্য—এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বিরাটনগর (বর্তমান রাজস্থানের জয়পুরের সন্নিকটে বৈরাট)।

(১২) সুরসেন—ইহার রাজধানী ছিল মথুরা।

(১৩) অশ্বক বা অশ্মক—এই রাজ্যটি গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। প্রতিষ্ঠান (বর্তমান মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলার পৈঠান) ইহার রাজধানী ছিল।

(১৪) অবন্তী—বর্তমান মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত মালব ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। রাজ্যটি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তরাংশের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। দক্ষিণাংশের রাজধানী মাহিষ্মতী (নর্মদা নদীর তীরবর্তী বর্তমান মান্ধাতা)।

(১৫) গান্ধার—কাশ্মীর ও তক্ষশিলা অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানী ছিল তক্ষশিলা (পাকিস্থানের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় অবস্থিত)।

(১৬) কম্বোজ—কম্বোজের অবস্থান ছিল সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, কারণ সাহিত্য ও শিলালিপিতে প্রায়ই গান্ধারের সঙ্গে একত্রে কম্বোজের উল্লেখ দেখা যায়।

মহাজনপদসমূহের এই তালিকা ঐতিহাসিক ভূগোলের দিক হইতে যেমন মূল্যবান, তেমনই খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক। প্রথমতঃ, ইহা সুস্পষ্ট যে তখন কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ভারতবর্ষ তখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং বিবদমান অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ মহাজনপদ বর্তমান বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে অবস্থিত ছিল। আসাম, বঙ্গ, উড়িষ্যা, 'সুদূর দক্ষিণ', গুজরাট ও সিন্ধুদেশের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তালিকায় একটি মাত্র দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যের উল্লেখ আছে—অশ্মক। আর্য জাতির প্রথম ভারতীয় উপনিবেশ পাঞ্জাবে দুই তিনটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার ও কম্বোজ, এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে কুরু রাজ্য। পাঞ্জাবের মধ্যাঞ্চল তালিকা হইতে সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে। স্পষ্টতঃই গঙ্গা ও যমুনা নদীর উপত্যকাই তখন রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্র ছিল।

তৃতীয়তঃ, রাজতন্ত্র অধিক প্রচলিত হইলেও উত্তর-পূর্ব ভারতে কয়েকটি

অভিজাততন্ত্র-শাসিত রাষ্ট্র ছিল। তালিকায় উল্লিখিত বৃজি ও মল্ল রাষ্ট্র ছাড়াও বৌদ্ধসূত্র হইতে এইরূপ অভিজাত-শাসিত অপর কয়েকটি গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। এগুলি বুদ্ধের সমসাময়িক। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল শাক্য কুল, কোলিয় কুল (শাক্যদিগের পূর্বদেশীয় প্রতিবেশী), ভগ্‌গ কুল (ইহাদের অধিকৃত জনপদ বৎস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল), অল্লকাপ্পার বুলিগণ, কেশপুত্তের (সম্ভবতঃ কোশলস্থিত) কলমগণ এবং পিপ্পলিবনের (কুশীনারার অদূরবর্তী) মোরিয় কুল। এই সকল রাষ্ট্রের অধিকাংশই ধীরে ধীরে মগধের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

মগধের আধিপত্যের সূচনা

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে মগধের রাজা ছিলেন হর্যঙ্ক বংশীয় বিম্বিসার। দক্ষিণ বিহারের এক সামান্য রাজন্যের পুত্র হইয়াও তিনি নিজ বাহুবলে পৈতৃক রাজ্যের সীমা প্রসারিত করিয়া মগধের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। রাজগৃহ ছিল তাঁহার রাজধানী। তিনি তাঁহার সমসাময়িক প্রতিপত্তিশালী রাজগণের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধাররাজ তাঁহার রাজ্যে দূত প্রেরণ করেন। বিম্বিসার অবন্তীর রাজার চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক প্রেরণ করেন। মদ্র (মধ্য পঞ্জাব), কোশল ও বৈশালীর রাজপরিবারের সঙ্গে তিনি বৈবাহিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার কোশলদেশীয় পত্নী বিবাহের যৌতুক-রূপে কাশী রাজ্যের একটি গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। উহার রাজস্ব হইতে তাঁহার স্নানের জন্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ হইত। এই সকল বিবাহ-সম্পর্ক নিঃসন্দেহে বিম্বিসারের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। মগধ ও অঙ্গের মধ্যে প্রাচীন শত্রুতার সম্পর্ক অটুট ছিল, ফলে শেষ পর্যন্ত অঙ্গ মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। অঙ্গদেশ জয় করিয়া বিম্বিসার মগধের দিগ্বিজয়ের সূচনা করেন; অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ে তাহার সমাপ্তি ঘটে।

শেষ জীবনে বিম্বিসার এক বৃহৎ রাজ্য শাসন করিতেন। কথিত আছে, তাঁহার রাজ্যে ছোট-বড় আশী হাজার নগর ছিল। বিম্বিসার তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতেন; উহা হইতে তাঁহার সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মগধে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত, তপ্ত লৌহ-দণ্ডের দ্বারা ছেঁকা লাগান, শিরশ্ছেদ, জিহ্বা কর্তন, পঞ্জরাস্থি ভগ্নকরণ ইত্যাদি নানাবিধ শাস্তি প্রচলিত ছিল। শাস্তিদানের এই প্রথা সম্ভবতঃ মৌর্য যুগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটগণ উহার পরিবর্তন করিয়া মানবিকতার পরিচয় দেন।

বিম্বিসার বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। তবে তিনি সত্য সত্যই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন

কিনা তাহা বলা কঠিন। কোন কোন জৈন গ্রন্থে তাঁহাকে মহাবীরের অনুগামী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

বিম্বিসারের পর মগধের সিংহাসন লাভ করেন তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অজাতশত্রু রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতৃহত্যার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া যে কাহিনী প্রচলিত আছে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত ভারহুত স্তূপের একটি শিল্পকর্মে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

অজাতশত্রু পিতার রাজ্যবিস্তারের নীতি অনুসরণ করিয়া মগধের সীমা সম্প্রসারিত করেন। সম্ভবতঃ প্রথমে কোশলের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। বিম্বিসারের কোশলদেশীয় পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনজিত তাঁহার বিবাহকালে যৌতুকরূপে প্রদত্ত কাশীর গ্রামটি পুনরধিকার করিতে চাহেন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর সন্ধি স্থাপিত হয়। অজাতশত্রু প্রসেনজিতের কন্যাকে বিবাহ করেন, প্রসেনজিত বিতর্কাধীন গ্রামটি কন্যাকে যৌতুক দেন তাঁহার স্নানের গন্ধদ্রব্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য।

জৈন লেখকগণ বৈশালীর লিচ্ছবিগণের সহিত অজাতশত্রুর সংঘর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। কি কারণে এই সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল তাহা অনিশ্চিত, তবে সম্ভবতঃ মগধ—কোশল যুদ্ধের সহিত উহার সম্পর্ক ছিল। অনুমান করা যায়, কোশল ও বৈশালী যুক্তভাবে মগধের আধিপত্যের বিরোধিতা করিয়াছিল। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর অজাতশত্রু বৈশালী অধিকার করেন। এইরূপে মগধ উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য হইয়া উঠে। বোধ হয় মগধের শক্তিবৃদ্ধির ফলে অবন্তীর ঈর্ষার উদ্রেক হইয়াছিল। ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়। তবে অজাতশত্রুর রাজ্যকালেই অবন্তী ও মগধের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না।

পুরাতন জৈন গ্রন্থগুলিতে অজাতশত্রুকে মহাবীরের অনুগামী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার বৌদ্ধদের মতে তিনি ছিলেন বুদ্ধের অনুগামী।

অজাতশত্রুর পর সম্ভবতঃ রাজা হন তাঁহার পুত্র উদয়ী। তিনি পাটলিপুত্রে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। গঙ্গা ও শোন, এই দুইটি প্রশস্ত নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বাণিজ্য ও রণনীতি, উভয় দিক হইতে পাটলিপুত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জৈন লেখকদের মতে অবন্তীরাজ উদয়ীর শত্রু ছিলেন।

উদয়ীর উত্তরাধিকারিগণ সম্ভবতঃ দুর্বল শাসক ছিলেন। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে তাঁহারা সকলেই ছিলেন পিতৃহন্তা। ফলে প্রজাগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এই সুযোগে শিশুনাগ নামে একজন মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি প্রথমে গিরিব্রজ, এবং পরে বৈশালীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি হইল অবন্তীর প্রদ্যোত রাজবংশের ক্ষমতা ও

প্রতিপত্তির উচ্ছেদ। অবন্তী ইতিমধ্যে বৈশালী অধিকার করিয়া অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

শিশুনাগের উত্তরাধিকারী কালাশোক মগধের রাজধানী পুনরায় পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। সম্ভবতঃ নন্দ বংশের প্রবর্তক মহাপদ্ম নন্দ তাঁহাকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নন্দ বংশ

পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী মহাপদ্ম (অথবা উগ্রসেন) ছিলেন শূদ্রা মাতার সন্তান। জৈন সাহিত্য অনুসারে তিনি এক নাপিত ও এক বারাঙ্গনার পুত্র। একজন গ্রীক লেখক লিখিয়াছেন যে মহাপদ্ম নন্দ রাজ্ঞীর প্রীতিলাভে সক্ষম হন, এবং রাজা ও তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি নীচ জাতীয় ছিলেন ও অনুচিত উপায়ে সিংহাসন অধিকার করেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; তবে নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন নিপুণ ও পরাক্রান্ত শাসক। পুরাণে তাঁহাকে 'সর্বক্ষত্রান্তক' বা সকল ক্ষত্রিয়ের বিনাশকারী এবং 'একরাট' বা একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সীমা নির্ধারণ করা কঠিন। খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালিপি হইতে অনুমান করা হয় যে কলিঙ্গ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাহিত্যের সূত্রে তাঁহার কোশলজয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চল, বিশেষতঃ কুন্তল (মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের দক্ষিণাংশ) ও অশ্মক, সম্ভবতঃ নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্রীক লেখকদের মতে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সময়ে বিপাশা নদীর পরপারে যে শক্তিশালী জাতি বাস করিত, তাহারা পাটলিপুত্রে যাঁহার রাজধানী এমন এক সম্রাটের অধীন ছিল। অতএব, মহাপদ্ম নন্দ নিঃসন্দেহে এক রাজছত্রতলে ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ভারতবর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে।

মহাপদ্মের পর একে একে তাঁহার আট পুত্র রাজত্ব করেন। শেষ রাজা, বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত ধন নন্দ, আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ছিলেন। গ্রীক লেখকেরা তাঁহাকে আগ্রামেস (Agrammes) ও জাণ্ড্রামেস (Xandrames) নামে অভিহিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই নাম তাঁহার পিতৃনামপ্রসূত 'ঔগ্রসেনীয়' (উগ্রসেনের পুত্র) নামের বিকৃতি। তিনি নিঃসন্দেহে একজন পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। জনৈক গ্রীক লেখকের মতে, তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, দুই হাজার চতুরশ্ববাহিত রথ ও তিন হাজার হস্তী ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নন্দ বংশের অপরিমেয় ঐশ্বর্যের

কথা বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে। মনে হয় যে ধন নন্দ তাঁহার নীচ বংশ, অধার্মিক আচরণ ও অর্থলোভের জন্য প্রজাদের বিরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ চাণক্য বা কৌটিল্যের সহায়তায় মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন।

৪. পারসিক ও গ্রীক অভিযান

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাজনৈতিক অনৈক্য

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্য শক্তির প্রথম অধিষ্ঠানস্থল পাঞ্জাবের পূর্ব গুরুত্ব লোপ পাইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র পূর্ব দিকে সরিয়া আসিয়াছিল। মধ্য দেশ আর্যজাতির প্রধান কেন্দ্র হইল, এবং মগধ ক্রমশঃ এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। ভারতীয় সাহিত্যে উল্লিখিত ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে একটিও পাঞ্জাবের মধ্যস্থলে অবস্থিত নহে; শুধু কম্বোজ ও গান্ধারকে পাঞ্জাবের নিকটবর্তী অঞ্চল রূপে গণ্য করা যায়। পাঞ্জাবের অন্য একটি রাজ্য—যাহার নাম মহাজন-পদগুলির তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই—হইল মদ্র। যখন উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অংশ ধীরে ধীরে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত হইতেছিল, তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিভেদের ফলে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হইতেছিল।

পারসিক বিজয়

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অ্যাকেমেনীয় (Achaemenian) বংশীয় কুরুস্ (Cyrus) ইরান বা পারস্য দেশে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্য পশ্চিম দিকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত এবং পূর্ব দিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। কুরুস্ গেড্রোসিয়া (Gedrosia) বা মাকরানের মধ্য দিয়া ভারতের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন বলিয়া কথিত আছে। উহা চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু তিনি সিন্ধু নদ ও কাবুল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অধিকার করিতে সক্ষম হন।

এই বংশের তৃতীয় সম্রাট দারয়বৌস্ (Darius) ৫২২-৪৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রাজত্ব করেন। তিনি গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকা অধিকার করেন। পার্সিপোলিস, নক্শ্-ই-রুস্তম ও হামাদানে প্রাপ্ত কয়েকটি পারসিক শিলালিপিতে গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের পারসিক প্রজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus) বলেন, গান্ধার পারসিক সাম্রাজ্যের সপ্তম প্রদেশের (Satrapy) অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর ভারত (অর্থাৎ পূর্ব দিকে রাজস্থানের মরুভূমি বেষ্টিত সিন্ধু উপত্যকা) ছিল বিংশতিতম প্রদেশ।

ভারত ছিল পারসিক সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা জনবহুল প্রদেশ। বর্তমান যুগের হিসাবে ১২ লক্ষ ৯০ হাজার পাউণ্ড রাজস্ব এই প্রদেশ হইতে আদায় করা হইত।

দারয়বৌসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ক্ষয়র্ষ (Xerxes) উত্তর-পশ্চিম ভারতের পারসিক প্রদেশগুলির উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন গ্রীস আক্রমণ করেন তখন ভারতীয়রা তাঁহার সৈন্যদলে যুদ্ধ করিয়াছিল।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে তৃতীয় দারয়বৌস্ কডমেনাস্ (Darius Codomanus) যে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতেও ভারতীয়গণ যোগ দিয়াছিল। তবে বোধ হয় আলেকজাণ্ডারের অভিযানের প্রাক্কালে ভারতীয় প্রদেশগুলিতে পারসিক অধিকার অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদেশিক শাসনের ফলে যে সাময়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার অবসান করিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল।

পারসিক শাসনের ফলাফল

ভারত ও পারস্যের মধ্যে দুই শতাব্দীব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতীয় ইতিহাসে কিছু স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যায়। পারসিকগণ ভারতবর্ষে তাহাদের নিজস্ব লিপি (Aramaic) প্রবর্তন করে; পরে ইহা খরোষ্ঠী লিপিতে রূপান্তরিত হয়। অশোকের সময়ের স্থাপত্য শিল্প, বিশেষতঃ তাঁহার স্তম্ভগুলির চূড়ার ঘণ্টার ন্যায় আকৃতি, সম্ভবতঃ কিছু পরিমাণে পারসিক প্রভাবের ফল। অশোকের অনুশাসনগুলির মুখবন্ধে এবং উহাদের কিছু শব্দের ব্যবহারেও পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'অর্থশাস্ত্র' হইতে জানা যায় যে মৌর্য রাজসভায় কিছু কিছু পারসিক রীতিনীতি অনুসরণ করা হইত। মৌর্যোত্তর যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক শাসকগণ পারসিক প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ন্যায় 'সত্রপ' বা 'ক্ষত্রপ' (Satrap, Kshatrap) উপাধি ব্যবহার করিতেন।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবস্থা

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সিন্ধু নদের উপত্যকায় রাজনৈতিক ঐক্য অজ্ঞাত ছিল। ঐ সময়ে উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অংশ মগধের নন্দ রাজবংশের শাসনে ঐক্য ও শক্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাব অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজতন্ত্রশাসিত অথবা সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে অযথা শক্তিক্ষয় করিতেছিল। প্রাচীন গ্রীক লেখকগণ ইহাদের সম্বন্ধে নানা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি রাজ্য বেশ শক্তিশালী ছিল। আসাকেনোইদের (Assakenoi) রাজধানী ছিল মাসাগা (Massaga)। মালাকান্দ গিরিপথের নিকটে, উত্তর দিকে, এই দুর্ভেদ্য

দুর্গটি অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই গোষ্ঠীর যিনি রাজা ছিলেন তাঁহার সেনাবাহিনীতে কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, ত্রিশ হাজারেরও অধিক পদাতিক এবং ত্রিশটি হস্তী ছিল। তক্ষশিলা রাজ্য প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল। তক্ষশিলা খুব বড় শহর ছিল, এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খুব জনাকীর্ণ ও উর্বর ছিল। ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যে অবস্থিত পুরুর রাজ্য ছিল বৃহৎ ও উর্বর; এই রাজ্যে প্রায় তিন শত নগর ছিল। রাজার সৈন্যবাহিনী ছিল বিশাল; উহাতে পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, এক হাজার রথ ও একশত ত্রিশটি হস্তী ছিল। সোফাইটদের (Sophytes) রাজ্য ছিল ঝিলাম নদীর পূর্ব দিকে। অভিজাতশাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে শিবোইগণ (Siboi) বাস করিত ঝিলাম ও চেনাব নদীর সঙ্গমস্থলের দক্ষিণে অবস্থিত ঝঙ্ (Jhang) জেলায়। আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের সময়ে তাহাদের সৈন্যবাহিনীতে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তাহাদের নিকটে বাস করিত আগালাসোইগণ (Agalassoi)। তাহারা প্রয়োজন হইলে চল্লিশ হাজার পদাতিক ও তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিত। ইরাবতী ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী অক্সিড্রাকাইগণ (Oxydrakai) উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিগুলির অন্যতম ছিল। আবাস্তানোই (Abastanoi) জাতি বাস করিত চেনাব নদীর উপত্যকার নিম্নাঞ্চলে। তাহারা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল; তাহাদের সৈন্যবাহিনীতে ষাট হাজার পদাতিক, ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, এবং পাঁচ শত রথ ছিল। তাহাদের শাসন-ব্যবস্থা ছিল গণতান্ত্রিক।

আলেকজাণ্ডারের অগ্রগতি

আলেকজাণ্ডার ৩৩৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডনের (Macedon) সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রীসের অভ্যন্তরে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ৩৩৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে তিনি পারস্য জয়ের জন্য যাত্রা করেন। পারস্য সাম্রাজ্য তখন আকারে বিশাল হইলেও দুর্বল ও শিথিলগ্রন্থি হইয়া পড়িয়াছিল। উহার শাসক ছিলেন কুরুস্ ও প্রথম দারয়বৌসের অযোগ্য বংশধর, দারয়বৌস্ কডমেনাস্। চার বৎসরের মধ্যে আলেকজাণ্ডার একে একে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর, ব্যাবিলন ও পারস্য জয় করেন। দারয়বৌস্ কডমেনাস্ তাঁহার এক প্রাদেশিক শাসনকর্তার হস্তে নিহত হন। এইভাবে অগৌরবের মধ্যে অ্যাকেমেনীয় রাজবংশের অবসান ঘটে।

দারয়বৌসের হত্যাকারী বেসাস্ (Bessus) বাহ্লীকদেশে (Bactria) পলায়ন করিয়া পারস্যের মহাপরাক্রান্ত রাজগণের মত 'মহান্ রাজা' ('Great King') উপাধি ধারণ করেন। তাঁহাকে অনুসরণ করার পথে আলেকজাণ্ডার পূর্ব পারস্য, বেলুচিস্থান ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন এবং বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার ও নূতন নগর পত্তন করেন।

পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডার

আফগানিস্থান হইতে আলেকজাণ্ডার ভারতে প্রবেশ করেন। এদেশের আকার ও আয়তন সম্বন্ধে তাঁহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। গ্রীকরা ভারতবর্ষকে পৃথিবীর পূর্ব-সীমার শেষে অবস্থিত সমুদ্রবেষ্টিত দেশ বলিয়া মনে করিত। তাহাদের চোখে ভারতবর্ষ ছিল অফুরন্ত সম্পদের আকর, বিচিত্র জীবজন্তু ও উদ্ভিদের দেশ।

ভারতে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে গ্রীক ও রোমান লেখকদের বিবরণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় নামের সহিত তাঁহাদের পরিচয় না থাকায় এমন বহু ভৌগোলিক নাম-বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার সমাধান অদ্যাবধি হয় নাই। "আলেকজাণ্ডারের অভিযানের সাফল্য ভারতীয়দের মনে এতই সামান্য প্রভাব বিস্তার করে যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কোন শ্রেণীর রচনাতেই উহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না"।

আলেকজাণ্ডার ৩২৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দের গ্রীষ্মকালে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন এবং সোয়াট (Swat) ও বাজাউর (Bazaur) উপত্যকার বন্য জাতিগুলিকে দমন করিতে বৎসরের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করেন। শীতকালীন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তাঁহার সৈন্যবাহিনী সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে বিশ্রাম করে। অবশেষে বসন্ত কালের সূচনায়, খ্রীস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে, তাহারা আটকের উত্তরে উণ্ড নামক স্থানে নৌকা দ্বারা নির্মিত এক সেতুর সাহায্যে সিন্ধু নদ পার হয়। আলেকজাণ্ডার তক্ষশিলার নিকটে উপস্থিত হইলে তক্ষশিলার রাজা অম্ভি তাঁহাকে স্বাগত জানান এবং প্রচুর মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক উপহার প্রদান করেন। সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে এক নূতন প্রদেশ (Satrapy) গঠিত হইল; উহার রক্ষার জন্য তক্ষশিলায় ও সিন্ধু নদের পূর্ব তীরবর্তী অন্যান্য কয়েকটি স্থানে ম্যাসিডনীয় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হইল।

অতঃপর আলেকজাণ্ডার পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ঝিলাম (গ্রীকদের লেখায় Hydaspes) নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি পুরুর নিকট হইতে কঠিন বাধার সম্মুখীন হইলেন। হস্তীযূথের দ্বারা সুরক্ষিত এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ পুরু ঝিলাম নদীর দক্ষিণ তীরে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গ্রীকরা তাহাদের চক্ষু এড়াইয়া পুরুর শিবির হইতে প্রায় ষোল মাইল উত্তরে নদী পার হইল। দুই সৈন্যদল কারীর প্রান্তরে (Karri, বর্তমান সিরোয়াল ও পাক্রাল গ্রাম) পরস্পরের সম্মুখীন হইল। পুরু শত্রুপক্ষকে প্রথম আক্রমণের সুযোগ দিয়া মারাত্মক ভুল করিলেন। 'ঝিলাম নদীর যুদ্ধে' (Battle of the Hydaspes) তাঁহার বিশাল সৈন্যদল ধ্বংস হইল। পুরু খুব কৌশলী সেনানায়ক ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী সৈনিক। পরাজিত হইয়াও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন নাই; বন্দী হইবার পূর্বে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নয়টি আঘাত পাইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে নীত হইয়া তিনি সগর্বে রাজার প্রতি রাজার

আচরণ দাবি করিলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন, রাজ্যের সীমাও প্রসারিত হইল। চতুর গ্রীকরাজ জানিতেন যে অম্ভি ও পুরুর পারস্পরিক ঈর্ষা উভয়কেই তাঁহার প্রতি অনুগত রাখিবে। ঝিলাম নদীর দুই তীরে, যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে, তিনি দুইটি শহর স্থাপন করেন। ইহাদের নাম বুকেফালা (Boukephala) ও নিকাইয়া (Nikaia)। নববিজিত অঞ্চলের রক্ষার জন্য সেনানিবাস হিসাবে এই দুইটি শহরের পত্তন হয়।

অতঃপর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তিনি কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিলেন এবং সাংগালা (Sangala) শহর ধ্বংস করিলেন, কারণ এই শহরের অধিবাসীরা তাঁহাকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিজয়পতাকা প্রোথিত করার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল, কিন্তু তাঁহার সৈন্যরা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। দীর্ঘকাল কঠোর অভিযানে নিয়োজিত থাকিবার ফলে তাহাদের দেহে ও মনে ক্লান্তি আসিয়া গিয়াছিল, এবং স্বভাবতঃই তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। জনৈক গ্রীক লেখক বলেন যে গ্রীক সৈন্যদল তাহাদের রাজার ক্রমাগত বাধা ও বিপদের সম্মুখীন হইবার নেশা লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিল। ভারতীয়দের দুর্দান্ত সাহস ও সামরিক নৈপুণ্য তাহাদের মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। পারস্যের দুর্বল সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে তাহাদের যুদ্ধ করিতে হয় পুরুর ন্যায় সেনাপতি এবং সাংগালার রক্ষীবাহিনীর ন্যায় যোদ্ধাদের সহিত। তদানীন্তন ভারতীয়দের সামরিক দক্ষতার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আরিয়ান (Arrian) বলিয়াছেন, 'যুদ্ধবিদ্যায় ভারতীয়রা এশিয়ার তৎকালীন অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ছিল'। প্রধানতঃ যুদ্ধবিদ্যায় ভারতীয়দের নৈপুণ্যের অভিজ্ঞতার ফলেই গ্রীক সৈন্যগণ বিপাশা নদী অতিক্রম করিতে অস্বীকার করে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজত্ব করিতেন পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় রাজা। তিনি আশী হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য, আট হাজার যুদ্ধরথ ও ছয় হাজার রণকুশল হস্তী লইয়া আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছিল। গ্রীক সৈন্যদল সম্ভবতঃ এত শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হইতে সম্মত হয় নাই।

সৈন্যরা গাঙ্গেয় উপত্যকা আক্রমণ করিতে অস্বীকার করিলে আলেকজাণ্ডার বাধ্য হইয়া ঝিলাম নদীর তীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঝিলাম ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসনভার পুরুকে দেওয়া হইল। সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের ভার দেওয়া হইল অম্ভিকে। ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক স্থাপিত শহরগুলিতে বড় বড় রক্ষী সৈন্যদল নিযুক্ত হইল।

এই সকল বিধি-ব্যবস্থা করিয়া ৩২৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দের অক্টোবর মাসে আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাবের নদীপথে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করেন। পথে শিবোই (Siboi),

আগালাসোই (Agalassoi), মাল্লোই (Malloi) ও অক্সিড্রাকাই (Oxydrakai) প্রভৃতি যোদ্ধা জাতিগুলি তাঁহাকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। এই সকল যুদ্ধের ফলে সিন্ধু উপত্যকার দক্ষিণাংশে আলেকজাণ্ডারের অধিকার স্থাপিত হয়। মৌসিকানোস্ (Mousikanos) জাতি আলেকজাণ্ডারের আধিপত্য স্বীকার করে। ৩২৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দে অক্টোবর মাসে আলেকজাণ্ডার তাঁহার সৈন্যদলের একাংশ লইয়া বর্তমান করাচী অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া গেড্রোসিয়ার (Gedrosia) মধ্য দিয়া পারস্যে যাত্রা করেন ; সৈন্যদলের বাকী অংশ সেনাপতি নিয়ারকসের (Nearchos) নেতৃত্বে সমুদ্রপথে যাত্রা করে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসনের অবসান

৩২৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মে মাসে আলেকজাণ্ডার পারস্যের সুসা (Susa) নগরীতে উপস্থিত হন। বর্তমান বাগদাদের নিকটবর্তী ব্যাবিলন শহরে খ্রীস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র তেত্রিশ বৎসর। পারস্যযাত্রার পথে তিনি সংবাদ পান যে উত্তর সিন্ধু উপত্যকার গ্রীক শাসনকর্তা নিহত হইয়াছেন। তিনি ইউডেমাস্ (Eudemus) নামক এক গ্রীক শাসনকর্তার পরিচালনায় পুরু ও অম্ভিকে পাঞ্জাব শাসনের ভার দিলেন। তৎকালে ইহার অধিক আর কিছু করার সাধ্য তাঁহার ছিল না।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পাঞ্জাবের গ্রীক শাসনকর্তাদের বিতাড়িত করেন। ইউডেমাস্ ৩১৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত কোনক্রমে নিজ দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। তারপরে তিনি ভারত ত্যাগ করেন। সেলুকাস্ (Seleucus) আলেকজাণ্ডারের বিজিত ভারতীয় প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে বাহ্লীকদেশীয় (Bactrian) গ্রীকগণ আবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল

একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "আলেকজাণ্ডারের প্রবল অভিযান ভারতের চিন্তাধারা বা প্রথা-প্রতিষ্ঠানের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ধর্ম, সমাজ, শিল্প-সংস্কৃতির রূপ অপরিবর্তিত ছিল। এমন কি যুদ্ধ বিদ্যাতেও ভারতীয়রা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতির রণকৌশল হইতে শিক্ষা গ্রহণে তেমন ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে নাই। ভারতীয় রাজগণ সনাতন প্রথায় হস্তী, রথ ও সুবিশাল অথচ রণকৌশলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, আলেকজাণ্ডারের অশ্বারোহী বাহিনীর ক্ষিপ্র রণকৌশল তাঁহারা আয়ত্ত করিলেন না।" প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় যে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহা আসিয়াছিল আরও পরে, বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকদের মাধ্যমে। তবে উত্তর-পশ্চিম

ভারতে বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকদের আগমন যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরোক্ষ ফল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশের পত্তনকে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ ফল বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শহরগুলির মধ্যে কয়েকটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। অশোকের একটি অনুশাসনে তাঁহার সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যবনদিগের (গ্রীক) বাসের উল্লেখ আছে।

পাঞ্জাবের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির শক্তি হ্রাস করিয়া আলেকজাণ্ডার পরোক্ষভাবে ভারতীয় ঐক্যের বিকাশ ও মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে সাহায্য করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত এতকাল মগধ সাম্রাজ্যের পরিধির বাহিরে ছিল। আলেকজাণ্ডার যদি এই অঞ্চলের যোদ্ধা জাতিগুলির সামরিক দর্প চূর্ণ না করিতেন তবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে এই অঞ্চলে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করা বোধ হয় কঠিন হইত। এইভাবে গ্রীক আক্রমণ ভারতবর্ষের ঐক্যস্থাপনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌর্য সাম্রাজ্য

১. চন্দ্রগুপ্ত

মগধের গুরুত্ব

বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর সময়ে মহাজনপদগুলির মধ্যে মগধের প্রাধান্য এবং নন্দদের সময়ে মগধের একটি বিরাট সাম্রাজ্যের রূপ গ্রহণের জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল ভৌগোলিক কারণ। শাখানদীসমূহ সহ গঙ্গা, দক্ষিণে শোন এবং উত্তরে গণ্ডক ও গোগরা মগধের নিরাপত্তা রক্ষা করিত এবং উত্তর ভারত ও বাংলার সহিত মগধের যোগাযোগ সহজ করিত। পুরাতন রাজধানী রাজগৃহ পার্শ্ববর্তী পাহাড় দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। গঙ্গা এবং শোনের মিলনস্থলে অবস্থিত পরবর্তী রাজধানী পাটলিপুত্রের অবস্থান যথেষ্ট নিরাপত্তামূলক ছিল। রাজধানীর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছাড়াও নদী-উপত্যকাগুলি ছিল উর্বর কৃষি অঞ্চল এবং নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত।

মগধের উত্থান ক্ষত্রিয় শাসনের বৈদিক ঐতিহ্যের অবসান সূচিত করে। 'পুরাণে' শূদ্র রাজা মহাপদ্ম নন্দ কর্তৃক ক্ষত্রিয় রাজাদের ক্ষমতা ধ্বংসের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে। মৌর্যরা সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বৈদিক বিশ্বাসের প্রতি অনুগত ছিলেন না। বলা হইয়াছে যে চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন এবং অশোক ছিলেন বৌদ্ধ। মহাবীর এবং বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মীয় মতবাদগুলি এবং তাঁহাদের বাণী প্রচারের ফলে পুরাতন সামাজিক বিধি-নিষেধের শিথিলতা পূর্ব ভারতে নূতন শক্তি সৃষ্টি করে।

মৌর্য বংশের উদ্ভব

আলেকজাণ্ডারের অভিযানগুলি সম্পর্কে আলোচনাকারী গ্রীক লেখকদের মধ্যে অন্যতম জাস্টিন (Justin) বলিয়াছেন : "আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে ভারতবাসীরা বিদেশীদের শাসনশৃঙ্খল হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়াছিল এবং আলেকজাণ্ডার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসকদের হত্যা করিয়াছিল। এই মুক্তির নেতা ছিলেন স্যানড্রোকোটাস (Sandrocottus)।" গ্রীকদের উল্লিখিত এই স্যানড্রোকোটাসই ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের মহান্ প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত। জাস্টিন তাঁহাকে নিম্নবংশোদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণের কারণ হিসাবে তাঁহার 'অতি-মানবীয় উৎসাহে'র উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণের একটি বিবরণীতে এবং বিশাখ-

দত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে চন্দ্রগুপ্ত এবং নন্দ বংশের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে মৌর্য উপাধির উদ্ভব রাজা নন্দর পত্নী এবং চন্দ্রগুপ্তর মাতা মুরা হইতে। কিন্তু ইহা 'কল্পিত ইতিহাস এবং ব্যাকরণের দিক হইতে ভ্রান্ত'। 'মুদ্রারাক্ষসের' একজন টীকাকার চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য এবং তাহার শূদ্রা পত্নী মুরার পুত্র রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইসব পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের তুলনায় অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য হইল বৌদ্ধ ঐতিহ্য—যেখানে মৌর্যদের ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধদের একটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে পিপ্পলিবনের (উত্তর প্রদেশ) শাসকগোষ্ঠী মোরীয়দের ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন ঐতিহাসিকেরা এই মতটিকেই সাধারণভাবে গ্রহণ করেন যে চন্দ্রগুপ্ত মোরীয় নামক ক্ষত্রিয়কুলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবন

বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি হইতে চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবন সম্পর্কে অল্প কিছু ধারণা পাওয়া যায়। মোরীয় কুলের নেতা তাঁহার পিতা তাঁহার জন্মের পূর্বেই এক সংঘর্ষে প্রাণ হারান। তাঁহার নিঃসহায় মাতা পাটলিপুত্রে যান। সেখানে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথমে একজন গোপালক ও পরে একজন শিকারী কর্তৃক প্রতিপালিত এই পিতৃ-মাতৃহীন বালক কৌটিল্য নামে পরিচিত ব্রাহ্মণ চাণক্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চাণক্য তাঁহাকে তাঁহার নিজের শহর তক্ষশিলায় লইয়া যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন কলা ও বিজ্ঞানে সুশিক্ষা লাভ করেন ও ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ও আলেকজাণ্ডার

পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময়ে চন্দ্রগুপ্ত সেখানে বাস করিতেছিলেন। গ্রীক লেখকগণের মতে তিনি আক্রমণকারীর সঙ্গে মিলিত হন, কিন্তু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিতে পারি না। জাস্টিন বলিয়াছেন যে আলেকজাণ্ডার তাঁহার 'বক্তব্যের দৃঢ়তায়' অসন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে হত্যার আদেশ দেন, কিন্তু 'দ্রুত পদক্ষেপে' তিনি পলায়ন করিতে সক্ষম হন। প্লুটার্কের (Plutarch) মতে তিনি তখন 'খুবই অল্পবয়স্ক'।

পাঞ্জাবের মুক্তি

বিজিত অঞ্চল হইতে আলেকজাণ্ডারের প্রস্থানের পর চন্দ্রগুপ্ত বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। জাস্টিনের মতে, তিনি একটি 'দস্যুদল' গঠন করেন এবং গ্রীক সরকারের উচ্ছেদের জন্য ভারতীয়দের উত্তেজিত করেন। এই 'দস্যুদল' ছিল প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবের স্বাধীনতাকামী উপজাতিগণ, যাহারা আলেকজাণ্ডারের

আক্রমণে বাধা দিয়াছিল। সেই আক্রমণকারীর সঙ্গে যুদ্ধের সময়ের তুলনায় তাহারা এখন আরও শক্তিশালী নেতৃত্ব লাভ করিল। উপরন্তু, কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই অসন্তোষ ছিল না; আলেকজাণ্ডার যে সকল গ্রীককে পাঞ্জাবে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যেও অসন্তোষ ছিল।

কিভাবে চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাবে গ্রীক শাসনের উচ্ছেদ করেন তাহা আমরা বিস্তৃত-ভাবে জানি না। সম্ভবতঃ পাঞ্জাবে গ্রীকদের অসন্তোষ তাঁহাকে সাহায্য করিয়া-ছিল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তাঁহার সেনাপতিরা তাঁহার সাম্রাজ্য পুনরায় বিভক্ত করেন; তখন সিন্ধু নদীর পূর্ব তীরে কোন ভারতীয় অঞ্চল গ্রীক শাসনাধীন ছিল না। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর বৎসর অর্থাৎ ৩২৩ গ্রীস্টপূর্বাব্দকে চন্দ্রগুপ্তের সার্বভৌম ক্ষমতা দখলের বৎসর হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

নন্দ বংশের পতন

উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক শাসনের অবসানের স্বাভাবিক পরিণতি ছিল পূর্বে নন্দ শাসনের অবসান। নন্দ রাজার ক্ষমতা নির্ভর করিত তাঁহার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী এবং বিরাট আর্থিক সম্পদের উপর। কিন্তু নন্দ শাসন জনপ্রিয় ছিল না; রাজার দুষ্ট চরিত্র এবং নীচ বংশে জন্মের জন্য প্রজারা তাঁহাকে ঘৃণা করিত। সম্ভবতঃ তাঁহার জনপ্রিয়তার অভাবের একটি প্রত্যক্ষ কারণ ছিল উচ্চ হারে কর। নন্দ রাজার বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের সংঘর্ষ সম্পর্কে বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বলা হইয়াছে যে প্রদেশগুলি জয়ের পর চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র অবরোধ করেন এবং তাঁহার শত্রুকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। ইহা ছিল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম; ইহার অবসান ঘটে নূতন নেতার সম্পূর্ণ জয় লাভে।

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য জয়

নন্দ বংশের পতনের পর তাহার শাসনাধীন অঞ্চলগুলিতে চন্দ্রগুপ্তের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইগুলির মধ্যে ছিল সেই অঞ্চল যাহা গ্রীকদের কাছে 'গঙ্গারিদী' (Gangaridae) এবং 'প্রাসিয়াই' (Prasii) নামে পরিচিত ছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং কলিঙ্গ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র নন্দ রাজ্য লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্লুটার্কের মতে তিনি ছয় লক্ষ সৈন্যের সাহায্যে সমগ্র ভারত অধীনে আনেন। কিন্তু গ্রীক লেখকদের রচনা এবং ভারতীয় গ্রন্থাদি হইতে সমগ্র ভারত জয়ে তাঁহার অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। পশ্চিমে তাঁহার ক্ষমতা সম্ভবতঃ সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়, বর্তমানে গুজরাটের একটি অংশ) ও কোঙ্কন (মহারাষ্ট্র) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে সম্ভবতঃ তিনি তিনেভেল্লী জেলা (তামিল ন্যাড়ু) এবং উত্তর কর্ণাটক পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু যে সকল গ্রন্থ ও শিলালিপির সূত্রে ইহা জানা যায়, তাহা পরবর্তী যুগের।

যাহাই হউক, দক্ষিণে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তার নিঃসন্দেহে ছিল চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব, কারণ অশোকের দ্বাদশ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি নিজে কলিঙ্গ ছাড়া অন্য কোন রাজ্য জয় করেন নাই।

চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকাস

প্লুটার্ক বলিয়াছেন যে অ্যানড্রোকোটাস্ (Androcottus) (অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত) সেলুকাসকে (Seleucus) ৫০০টি হস্তী উপহার দেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে ক্ষমতার সংঘর্ষের সময়ে সেলুকাস্ ব্যাবিলনের শাসক হন। তাহার পর ভারতবর্ষে তাঁহার প্রভুর রাজ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে তিনি সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন। এইখানে তাঁহার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দেন চন্দ্রগুপ্ত। 'নিকাটোর' (Nikator) অর্থাৎ বিজয়ী আখ্যায় গ্রীকদের কাছে পরিচিত সেলুকাস্‌কে তিনটি প্রদেশ (Satrapy) ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে হয়। এইগুলি ছিল আরাকোসিয়া (Arachosia, অর্থাৎ কান্দাহার), পারোপমিসদাঈ (Paropamisadae, অর্থাৎ কাবুল), গান্ধার, এরিয়ার (Aria, অর্থাৎ হিরাট) কিছু অংশ এবং গেড্রোসিয়া (Gedrosia, অর্থাৎ বেলুচিস্তান)। এইভাবে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সম্ভবতঃ বন্ধুত্বের প্রতীক হিসাবেই মৌর্য শাসক গ্রীক প্রতিবেশীকে ৫০০ হস্তী উপহার দেন। বন্ধুত্বের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক ছিল দুই শাসক পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন: সেলুকাস্ চন্দ্রগুপ্তের শ্বশুর বা জামাতা হন।

মৌর্য বংশ এবং সেলুকাসের বংশের মধ্যে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব তিন প্রজন্ম স্থায়ী হয়। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস (Megasthenes) নামে এক দূতকে পাঠান। বিন্দুসারের শাসনকালে মৌর্য রাজসভায় দূত পাঠান সিরিয়া ও মিশরের গ্রীক রাজারা। অশোকের 'ধম্মবিজয়ে'র পরিধি সিরিয়া, মিশর, সাইরীন (Cyrene), এবং এপিরাস (Epirus) অথবা করিন্থ (Corinth)—এই সকল গ্রীক শাসিত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চন্দ্রগুপ্তের শেষ জীবন

পুরাণ অনুসারে, চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। যদি তাঁহার শাসনকাল ৩২৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে শুরু হয়, তবে তাহা শেষ হয় ৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে। জৈন গ্রন্থ অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শেষ বয়সে জৈন সন্ত ভদ্রবাহুর প্রভাবে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে শ্রবণবেলগোলায় (কর্ণাটক) যান। সেখানে কিছুকাল সন্ন্যাস জীবন যাপনের পর তিনি ধর্মীয় প্রথায় আত্মহত্যা করেন।

মেগাস্থিনিস

সেলুকাস নিকাটোরের দূত মেগাস্থিনিস ৩০৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে

পাটলিপুত্রে আসেন। ইহাই গ্রীক শাসকের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তির আনুমানিক সময়। তিনি ভারতবর্ষে কত বৎসর অবস্থান করেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ তিনি চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের পরে থাকেন নাই। আমরা জানি যে তিনি কাবুল এবং পাঞ্জাব হইয়া রাজ-সড়ক বরাবর পাটলিপুত্রের অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। তিনি যাহা দেখেন ও শোনেন তাহাতে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখান এবং যে অজানা দেশে তিনি কূটনৈতিক কার্য সম্পাদন করেন তাহার একটি বিবরণ রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার রচনা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না ; পরবর্তীকালীন গ্রীক লেখকদের রচনায় ইহার কিছু অংশের উদ্ধৃতি আছে।

মূল গ্রন্থ হইতে বিচ্ছিন্ন এই অসমাপ্ত উদ্ধৃতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই মৌর্য যুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের বিবরণীর মূল্য বিচার করিতে হইবে। কোন কোন প্রাচীন লেখক বলিয়াছেন যে তিনি অসত্যভাষী ছিলেন এবং তাঁহার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু এই মন্তব্য অতি কঠোর বিচার। বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতিগুলিতেও তিনি যে সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সেই সকল বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য সত্যনিষ্ঠার সুস্পষ্ট চিহ্ন বহন করে। পাটলিপুত্র শহরের বর্ণনা ইহার উদাহরণ। আবার মৌর্য শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন কৌটিল্যের 'অর্থ-শাস্ত্রে'র বিবরণীর সঙ্গে তাহার মৌলিক অসঙ্গতি নাই। মেগাস্থিনিসের দুইটি অসুবিধা ছিল যাহা তিনি দূর করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমালোচনামূলক বিচার শক্তির অভাব ছিল ; তিনি অসম্ভব কাহিনীও উপেক্ষা করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ভাষায় জ্ঞান না থাকায় তিনি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত হন। মোটের উপর মৌর্য যুগের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিসকে শুধু গল্প-লেখক রূপে বাতিল করিতে পারেন না।

পাটলিপুত্র নগরী

মেগাস্থিনিস আমাদের জন্য রাজধানী শহর পাটলিপুত্রের একটি আকর্ষণীয় বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। শোন ও গঙ্গা, দুই নদীর সঙ্গমস্থলে নির্মিত এই শহরের আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে নয় মাইল ও প্রস্থে দেড় মাইল। একটি ৬০ ফুট গভীর ও ৬০০ ফুট চওড়া পরিখা দ্বারা ইহা পরিবেষ্টিত ছিল। ইহা সুরক্ষিত ছিল একটি বিরাট কাঠের প্রাচীরের দ্বারা। ইহার ৬৪টি প্রবেশ পথ ও ৫৭০টি উচ্চ চূড়া ছিল। শহরটি নির্মাণে প্রধানতঃ কাষ্ঠই ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখানে বন্যার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া ইষ্টকের ব্যবহার উচিত বিবেচিত হয় নাই।

মেগাস্থিনিসের সাত শতাব্দী পরে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসেন এবং পাটলিপুত্রে অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, অশোকের নিযুক্ত দানবগণ (spirits) এই প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্তের যে প্রাসাদ মেগাস্থিনিস দেখিয়াছিলেন, তাহাও কম মনোমুগ্ধকর ছিল না। এই প্রাসাদে 'সোনালি রঙ্ করা স্তম্ভগুলিকে বেষ্টন করিয়া সোনালি রঙের লতা ও রূপালি রঙের পক্ষীর চিত্র অঙ্কিত ছিল।' ছায়াময় কুঞ্জ ও চিরহরিৎ বৃক্ষ-শোভিত এক প্রশস্ত উদ্যানে এই প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। এই উদ্যানে মৎস্যপূর্ণ ও নৌবিহারের উপযোগী বিশাল বিশাল সরোবর ছিল। রাজপ্রাসাদ ছিল কাষ্ঠ-নির্মিত। পাটনা শহরের নিকটবর্তী বর্তমান কুমরাহার গ্রামে ইহার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রায় ১১৫০ মাইল দীর্ঘ এক রাজপথ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সহিত রাজধানীর যোগাযোগ রক্ষা করিত। "এই পথে এক মাইল অন্তর একটি প্রস্তর এই পথের সহিত যুক্ত অন্যান্য পথের এবং দূরত্বের নির্দেশ বহন করিত"।

রাজসভা

মেগাস্থিনিস রাজার দৈনন্দিন কার্যাবলীর বিবরণ দিয়াছেন। তিনি নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা না করিয়া সারাদিন রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। দিবসে তিনি নিদ্রা যাইতেন না। "রাজার কেশ-পরিচর্যার সময়েও যে কোন ব্যক্তি প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারে। তখন তিনি রাজদূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিচারকার্য সম্পন্ন করেন।"

শিকার, দৌড় ও পশুদের যুদ্ধ রাজার প্রিয় প্রমোদ ছিল। অস্ত্রধারিণী নারী-রক্ষীগণ রাজার দেহরক্ষা করিত।

বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা

মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে দেখা যায় যে রাজা রাজকার্যে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহাকে সাহায্য করিতেন দুই শ্রেণীর উচ্চপদস্থ অমাত্য (Councillors এবং Assessors)। ইঁহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। "তাঁহারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা, প্রাদেশিক প্রধান, সহকারী শাসনকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, নৌ-সেনাপতি, বিচারক, প্রশাসক (Magistrates) এবং কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নিয়োগ করিতেন।"

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন: 'আগ্রোনোমোই' (Agronomoi) অর্থাৎ জেলাশাসক এবং 'আস্টিনোমোই' (Astynomoi) অর্থাৎ নগরশাসক। প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ জেলাশাসকদের সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন: "কেহ কেহ নদীপথের তত্ত্বাবধান করেন, মিশরীয়দের ন্যায় জমি জরিপ করেন এবং সকলে যাহাতে জলের সমান ভাগ পায় তাহার জন্য নদীর প্রধান খাত হইতে শাখা-প্রশাখায় জলচলাচল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে সকল নালা (sluices) আছে তাহাদের পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁহারা শিকারীদের কাজকর্মও পরিদর্শন করেন

এবং যোগ্যতা-অযোগ্যতা অনুযায়ী তাহাদের পুরস্কৃত বা দণ্ডিত করেন। তাঁহারা কর সংগ্রহ করেন, এবং কৃষক, কাঠুরিয়া, সূত্রধর, কর্মকার ও খনিশ্রমিকদের কাজ পরিদর্শন করেন। তাঁহারা পথনির্মাণ করেন এবং দূরত্ব ও শাখা-পথ নির্দেশ করার জন্য প্রতি দশ 'স্টেডিয়া' (stadia, ১৯৪০ গজ) অন্তর একটি প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করেন।"

নগরশাসকগণ ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রতি সমিতিতে পাঁচ জন সদস্য ছিলেন। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন: "প্রথম সমিতির সদস্যেরা শিল্পগুলির তদারক করেন। দ্বিতীয় সমিতির উপর বৈদেশিকদের তদারকের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বৈদেশিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদের জন্য পরিচারক নিযুক্ত করেন এবং পরিচারকদের মাধ্যমে তাঁহাদের জীবনযাত্রার উপর লক্ষ্য রাখেন। বৈদেশিক আগন্তুকগণ এই দেশ ত্যাগ করিতে চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন। বৈদেশিকদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা তাঁহাদের সম্পত্তি তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে প্রেরণ করেন। বৈদেশিকগণ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহারা পরিচর্যার ব্যবস্থা করেন এবং কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার সৎকার করেন। তৃতীয় সমিতি জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখেন। ইহার উদ্দেশ্য করধার্য করা এবং উচ্চ শ্রেণীর ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা সরকারের গোচরভুক্ত করা। চতুর্থ সমিতি ব্যবসা-বাণিজ্য পরিদর্শন করেন এবং ওজন ও পরিমাপ তত্ত্বাবধান করেন। পঞ্চম সমিতি উৎপন্ন দ্রব্য পরিদর্শন এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। ষষ্ঠ সমিতি বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের এক-দশমাংশ রাজকর হিসাবে গ্রহণ করেন। এই কর ফাঁকি দেওয়ার শাস্তি হইল মৃত্যুদণ্ড।" সামগ্রিকভাবে নগরশাসকগণ জনসাধারণের স্বার্থসংক্রান্ত নানা বিষয়ের জন্য দায়ী থাকিতেন—যেমন, সাধারণের ব্যবহার্য অট্টালিকাসমূহের তত্ত্বাবধান, বিভিন্ন জিনিসের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, হাটবাজার, বন্দর ও মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। পাটলিপুত্রে নগর-শাসনের এইরূপ বিশদ ব্যবস্থা ছিল।

রাজা বহু চর বা সংবাদ-সংগ্রাহক নিয়োগ করিতেন। মেগাস্থিনিস ইহাদের পরিদর্শক (Overseers) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহারা রাজধানী ও সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ গোপনে রাজার নিকট উপস্থিত করিত।

আইন ও বিচার বিভাগ

মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে রাজা বিচার করিতেন। অপরাধ সংক্রান্ত বিধি-বিধান অত্যন্ত কঠোর ছিল। অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দানের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদন করা হইত। যে ব্যক্তি অপর কাহারও অঙ্গচ্ছেদনের অপরাধে অপরাধী, তাহার সেই অঙ্গ ছেদন

করা হইত ; উপরন্তু তাহার হাতও কাটিয়া লওয়া হইত। কোন কারিগরের হাত কিংবা চক্ষুর হানি ঘটাইলে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হইত।

মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে ভারতীয়দের লিখিত আইন ছিল না, কিন্তু একথা সত্য নয়। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান ছাড়াও রাজার তৈরি আইন (রাজানুশাসন) ছিল।

সেনাবাহিনী

মেগাস্থিনিসের মতে, ছয়টি সমিতি সামরিক বাহিনীকে পরিচালনা করিতেন। প্রতি সমিতিতে পাঁচ জন সদস্য ছিলেন। এক-একটি সমিতির উপর এক-একটি বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছিল—যথা, পদাতিক, অশ্বারোহী, যুদ্ধরথ, রণহস্তী, রসদ সরবরাহ ও যানবাহন বিভাগ, নৌ-বাহিনীর সহিত সংযোগ রক্ষা।

কৃষকদের পরে সমাজে সৈন্যদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। তাহারা সরকার হইতে নিয়মিত বেতন এবং অস্ত্রশস্ত্র পাইত। যুদ্ধের প্রয়োজন না থাকিলে তাহারা আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকিতে পারিত।

সামাজিক অবস্থা

মেগাস্থিনিস ভারতবাসীদের সাতটি জাতিতে ভাগ করিয়াছেন: (১) দার্শনিক (Philosophers), অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণগণ। ইহারা সংখ্যায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অল্প হইলেও সম্মানের দিক হইতে সকলের উপরে ছিলেন। (২) কৃষকগণ। জনগণের উপকারক বলিয়া যুদ্ধের সময়ও তাহাদের সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি হইতে রক্ষা করা হইত। (৩) পশুপালক ও শিকারী। ইহারা নগরেও বাস করিত না, গ্রামেও বাস করিত না, সচরাচর তাঁবুতে বাস করিত। (৪) শিল্পী ও কারিগর সম্প্রদায়। ইহাদের খাজনা দিতে হইত না, বরং রাজকোষ হইতে তাহাদের ভরণ পোষণ করা হইত। (৫) সৈনিক। রাজা ইহাদের ভরণ পোষণ করিতেন। (৬) পরিদর্শকগণ (Overseers)। তাঁহারা দেশের অভ্যন্তরে যাহা কিছু ঘটিত সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করিয়া রাজাকে জানাইতেন। (৭) অমাত্যগণ (Councillors)। তাঁহারা শাসনকার্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

মেগাস্থিনিস স্পষ্টতঃ জাতি ও বৃত্তিকে পৃথক করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিবরণে জাতিভেদ প্রথার বৃত্তিমূলক দিকটি সম্বন্ধে একটি ভাসা-ভাসা ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু চতুর্বর্ণ সম্বন্ধে প্রচলিত হিন্দু ধারণার সহিত ইহার মিল নাই। মৌর্য যুগে জাতিভেদ প্রথা সম্ভবতঃ ক্রমশঃ কঠোর হইতেছিল, কারণ মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে স্বীয় জাতির বাহিরে কাহারও বিবাহের অধিকার ছিল না, স্বীয় বৃত্তি ভিন্ন অপর বৃত্তি অবলম্বনের স্বাধীনতাও ছিল না।

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথা দেখেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,

"ভারতবাসী মাত্রেই স্বাধীন, তাহাদের মধ্যে কেহই দাস নহে।" কিন্তু সাহিত্য ও শিলালিপির সূত্রে জানা যায় যে ইহা সত্য নহে। সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিস তাঁহার স্বদেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই ভ্রমে পতিত হন। ভারতবর্ষের তুলনায় গ্রীসে দাসত্ব প্রথা অনেক বেশী ব্যাপক ও নিষ্ঠুর ছিল। এইজন্য ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথার অস্তিত্ব তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

ভারতীয় চরিত্র

মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের চরিত্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাহারা মিতব্যয়ী ও সৎ ছিল, সংযত জীবন যাপন করিত। "ভারতীয়রা সকলেই মিতব্যয়ী, বিশেষতঃ যখন তাহারা শিবিরজীবন যাপন করে।···চুরির ঘটনা খুবই বিরল···যজ্ঞকাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাহারা মদ্যপান করে না"। তিনি বলেন যে ভারতীয়রা কদাচিৎ বিচারালয়ের শরণাপন্ন হইত। "তাহাদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি অথবা গচ্ছিত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কোনও বিবাদ-বিসম্বাদ হয় না; সাক্ষী বা শীলমোহর ইত্যাদি প্রমাণেরও প্রয়োজন হয় না; তাহারা পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া দ্রব্যাদি গচ্ছিত রাখে। তাহাদের বাসগৃহ ও সম্পত্তি সাধারণতঃ অরক্ষিতভাবেই থাকে।" কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র পাঠকমাত্রেই জানেন যে এই বিবরণ অতিশয়োক্তি দোষে কিছু পরিমাণে অবিশ্বাসযোগ্য।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মেগাস্থিনিস ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। "ভূমিতে সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, ভূ-নিম্নে পাওয়া যায় সর্বপ্রকার ধাতু। প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য, এবং তামা ও লোহা, এমন কি টিন ও অন্যান্য ধাতুও পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্য ও অলঙ্কার, এবং যুদ্ধের উপকরণাদি নির্মাণের জন্য এই সকল ধাতু ব্যবহৃত হয়।" ভূমির উর্বরতার কারণ ছিল নদীর প্রাচুর্য। বৎসরে দুই বার বৃষ্টিপাত হওয়ায় দুই বার ফসল পাওয়া যাইত, এবং জনগণের খাদ্যাভাব হইত না।

যুদ্ধের সময় কৃষকদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকায় কৃষির উন্নতি হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন, কৃষক শ্রেণী সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার অধিকারী ছিল। যখন নিকটবর্তী এলাকায় যুদ্ধ হইত তখনও তাহারা নির্বিবাদে কৃষিকার্য করিতে পারিত। সমাজে তাহাদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে ব্যবসায়ীগণও সংখ্যায় অনেক ছিল। পাইকারী ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। যুদ্ধাস্ত্র ও জাহাজ নির্মাণের কাজে বহু শ্রমিক নিযুক্ত থাকিত।

নগরের সংখ্যা ছিল অনেক। নদী বা সমুদ্রতীরে অবস্থিত নগর-নির্মাণে কাষ্ঠের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উচ্চ ভূমিতে নগর ইষ্টক ও কাদামাটির দ্বারা নির্মিত হইত।

মেগাস্থিনিস বলেন, ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ অথবা প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব ঘটে নাই। ভূমির উর্বরতা, দুই বার বৃষ্টিপাত এবং যুদ্ধের সময়ও কৃষিকার্য অব্যাহত রাখার সুসভ্য ব্যবস্থা শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের উক্তিকে আক্ষরিক অর্থে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সাহিত্যে দুর্ভিক্ষের বহু উল্লেখ দেখা যায়। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহু মগধে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় বহু জৈন উপাসকের সহিত দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন।

'অর্থশাস্ত্রে'র রচনাকাল

চন্দ্রগুপ্তের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের বিবরণের কিছু সমর্থন পাওয়া যায় রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত 'অর্থশাস্ত্র' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে; উহাতে কিছু অতিরিক্ত তথ্যও পাওয়া যায়। গ্রীক দূত চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন, এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে 'অর্থশাস্ত্রে'র রচয়িতা কৌটিল্য (বা চাণক্য অথবা বিষ্ণুগুপ্ত), যিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভে সহায়তা করেন এবং পরে তাঁহার মন্ত্রী হন। কিন্তু এই গ্রন্থের রচয়িতা ও রচনাকাল সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

যদি 'অর্থশাস্ত্রে'র বর্তমান রূপ চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক হইয়া থাকে, তবে অশোক কেন এই গ্রন্থে বর্ণিত সময়গণনা পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া পারসিক পদ্ধতি অনুসরণ করিলেন তাহা বুঝা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, 'অর্থশাস্ত্রে' সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু মৌর্য যুগে রাষ্ট্রভাষা ছিল প্রাকৃত। তৃতীয়তঃ, মৌর্য যুগে প্রচলিত রাজকীয় উপাধিগুলি 'অর্থশাস্ত্রে' উল্লিখিত হয় নাই। চতুর্থতঃ, 'অর্থশাস্ত্রে' বলা হইয়াছে যে গৃহনির্মাণে ইষ্টকের ব্যবহারই প্রশস্ত, কারণ কাষ্ঠনির্মিত গৃহে অগ্নিসংযোগের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু গ্রীক লেখকদের বর্ণিত নগরগুলি ইষ্টকের পরিবর্তে কাষ্ঠনির্মিত, এবং পাটলিপুত্র নগর 'কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল।' অবশেষে, 'অর্থশাস্ত্রে' চীন ও কাম্বোডিয়ার (কম্বু) উল্লেখ আছে। কিন্তু মৌর্যগণ এই সকল দেশের সহিত পরিচিত ছিলেন না। তবে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে এই সকল উক্তি প্রক্ষিপ্ত, অর্থাৎ মূল 'অর্থশাস্ত্রে'র মধ্যে পরবর্তী কালে অন্য লেখক কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছিল।

'অর্থশাস্ত্রে'র বর্তমান রূপ যে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল তাহার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নাই। রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপিতে অর্থবিদ্যা চর্চার উল্লেখ হইতে মনে হয় যে সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'অর্থশাস্ত্রে'র অস্তিত্ব

ছিল। তবে সাধারণতঃ এই গ্রন্থটিকে মৌর্য যুগের ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য উপকরণ রূপে গ্রহণ করা হয়।

রাজা

'অর্থশাস্ত্রে' রাজার কর্তব্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে: "প্রজার মঙ্গলসাধনের জন্য অবিরাম কর্মতৎপরতাই রাজার ব্রত; শাসনকার্যই তাঁহার ধর্মানুষ্ঠান; সকলের প্রতি সমব্যবহার তাঁহার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ দান।" কৌটিল্য রাজার দৈনন্দিন কর্মতালিকাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমগ্র দিবস ও সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত তিনি কর্মব্যস্ত থাকিতেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণেও একই চিত্র দেখা যায়। রাজার এই কঠিন পরিশ্রমের আদর্শ অশোকের সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। অশোকের ষষ্ঠ শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে তিনি যখন আহার করিতেন, অন্তঃপুরে থাকিতেন, অথবা উপাসনা করিতেন, তখনও তিনি রাজকার্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।

রাজার কর্তব্য ছিল বহুবিধ। 'অর্থশাস্ত্রে'র মতে রাজার করণীয় কর্ম ছিল আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা, নাগরিক ও পল্লীবাসীদের কার্যকলাপ পরিদর্শন, কার্যাধ্যক্ষদের নিয়োগ, মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ, গুপ্তচর কর্তৃক সংগৃহীত সংবাদ শ্রবণ, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক বাহিনীর তত্ত্বাবধান এবং সামরিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা। আইন প্রণয়ণও তাঁহার কর্তব্য ছিল; কৌটিল্যের মতে আইনের চারটি উৎসের মধ্যে অন্যতম হইল 'রাজশাসন' অর্থাৎ রাজাদেশ,—অপর তিনটি হইল 'ধর্ম' (প্রচলিত ধর্মীয় নিয়ম), 'ব্যবহার' (সাক্ষ্য), এবং 'চরিত্র' (ইতিহাস বা ঐতিহ্য)। রাজার বিচার-ক্ষমতার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে; "রাজা যখন সভায় উপস্থিত থাকেন, তখন তিনি বিচারপ্রার্থীগণকে কখনও দ্বারে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিবেন না।"

রাজা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী শাসক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল না। ঐতিহ্য ও সামাজিক পরিবেশ ধর্মের প্রতি আনুগত্য তাঁহার পক্ষে বাধ্যতামূলক করিয়াছিল। উপরন্তু, শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রী পরিষদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। যথাযথভাবে কার্য করিলে এই পরিষদ রাজার স্বৈরাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত।

মন্ত্রী

রাজকার্য পরিচালনায় যোগ্য ব্যক্তিদের সহায়তা আবশ্যক। রাজকার্যে সাহায্য করিতেন মন্ত্রিগণ; মেগাস্থিনিস ইহাদের অমাত্য (Councillors and Assessors) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কৌটিল্য দুই শ্রেণীর মন্ত্রীর উল্লেখ করিয়াছেন —'মন্ত্রী' ও 'অমাত্য'। মন্ত্রিগণ ছিলেন ঊর্ধ্বতন সচিব; ইঁহাদেরই সম্ভবতঃ অশোক তাহার অনুশাসনগুলিতে 'মহামাত্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'মন্ত্রী

'পরিষদ' একটি পৃথক সংস্থা ছিল। এই পরিষদের সদস্য ও 'মন্ত্রী' এক পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। 'মন্ত্রী পরিষদে'র সদস্যদের পদমর্যাদা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। বিশেষ পরিস্থিতিতে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কালে রাজা তাঁহাদের পরামর্শ লইতেন। ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের পরিচালনার জন্য যতজন মন্ত্রীর প্রয়োজন হইত ততজন মন্ত্রীই নিযুক্ত করা হইত। কোন কোন লেখক অবশ্য 'মন্ত্রী' ও 'মন্ত্রী পরিষদে'র সদস্যের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন না। 'অমাত্য'গণ ছিলেন সাম্রাজ্যের শাসন ও বিচার বিভাগীয় উচ্চতন রাজকর্মচারী।

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী

'মন্ত্রী', 'মন্ত্রী পরিষদ' ও 'অমাত্য' ছাড়াও আরও এক শ্রেণীর উর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন শাসন-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ! ইহারা হইলেন 'অধ্যক্ষ' বা বিভাগীয় প্রধান কর্মচারী। গ্রীক লেখকগণ ইহাদের রাজধানী ও গ্রামাঞ্চলের শাসনবিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তা (Agronomoi এবং Astynomoi) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত বত্রিশ শ্রেণীর 'অধ্যক্ষে'র ও তাঁহাদের কর্তব্যের উল্লেখ 'অর্থশাস্ত্রে' পাওয়া যায়। বিভাগগুলির মধ্যে আছে রাজকোষ, খনি, [illegible]নির্মাণ, শুল্কসংগ্রহ, জাহাজ চলাচল, গবাদি পশু সংরক্ষণ, অশ্ব, রথ, কারাগার, ডাকবিভাগ, ইত্যাদি। যাঁহারা জাহাজ চলাচল, অশ্ব, রথ ইত্যাদি বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারাই মেগাস্থিনিস বর্ণিত সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। 'সমাহর্তৃ', 'সন্নিধাতৃ' ও 'সেনাপতি' ইহাদের কার্য পরিদর্শন করিতেন।

বিচার-ব্যবস্থা

রাজা ছিলেন বিচার বিভাগের প্রধান। 'অর্থশাস্ত্রে' বিভিন্ন শ্রেণীর বিচারালয়ের উল্লেখ আছে। "'সংগ্রহণ', 'দ্রোণমুখ' ও 'স্থানীয়' নামক নগরগুলিতে, এবং যে সকল স্থলে দুই জেলার সংযোগ হইয়াছে সেই স্থলে, ধর্মবিধিবিদ তিন জন সদস্য ও রাজার তিন মন্ত্রী সম্মিলিতভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করিবেন"। 'স্থানীয়' হইল আট শত গ্রামের কেন্দ্র, 'দ্রোণমুখ' চারি শত গ্রামের কেন্দ্র, এবং 'সংগ্রহণ' দশটি গ্রামের কেন্দ্র। গ্রামের ছোটখাট বিরোধের নিষ্পত্তি করিতেন 'গ্রামিক' অর্থাৎ নির্বাচিত গ্রামীণ কর্মকর্তাগণ, এবং গ্রামবৃদ্ধগণ। গ্রীক লেখকগণ বলেন যে বৈদেশিকদের বিচারের জন্য পৃথক বিচারক ছিলেন। দণ্ডবিধির কঠোরতা সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের বিবরণের সহিত 'অর্থশাস্ত্রে'র মিল দেখা যায়।

প্রাদেশিক শাসন

উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চল হইতে বহু দূরে অবস্থিত একটিমাত্র কেন্দ্র (পাটলিপুত্র) হইতে চন্দ্রগুপ্তের বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসন সম্ভব ছিল না। রুদ্র-

দামনের একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যগুপ্ত সৌরাষ্ট্রের 'রাষ্ট্রীয়' অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে অশোকের সময়ে অন্ততঃ পাঁচটি প্রদেশ ছিল। 'উত্তরা-পথে'র রাজধানী ছিল তক্ষশিলা, 'অবন্তিরাষ্ট্রে'র রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী, 'দক্ষিণা-পথে'র রাজধানী ছিল সুবর্ণগিরি, 'কলিঙ্গে'র রাজধানী ছিল তোশালী, এবং 'প্রাচ্যে'র (অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের) রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। রাজা ও রাজ-প্রতিনিধি শাসিত প্রদেশগুলি ছাড়াও কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত জনপদ ও নগর ছিল। ইহাদের কয়েকটিতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত ছিল। 'অর্থশাস্ত্রে' কম্বোজ ও সৌরাষ্ট্রের 'সঙ্ঘ' অর্থাৎ যোদ্ধসমবায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গুপ্তচর ব্যবস্থা

'অর্থশাস্ত্রে' গুপ্তচরদের কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ আছে। দুই শ্রেণীর গুপ্তচরের উল্লেখ দেখা যায়—'সংস্থা' অর্থাৎ স্থানীয় গুপ্তচর এবং 'সঞ্চারা' অর্থাৎ ভ্রাম্যমান গুপ্তচর। মেগাস্থিনিসের বিবরণেও গুপ্তচরদের উল্লেখ আছে। ইহা মৌর্য শাসন-ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ।

রাজস্ব

গ্রীক লেখকদের সাক্ষ্য অনুসারে রাজা ছিলেন ভূস্বামী। "সমগ্র ভারতবর্ষ রাজার সম্পত্তি, প্রজাদের কাহারও ভূমির মালিক হওয়ার অধিকার নাই"। সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ ছিল রাজস্ব ('ভাগ')। কিন্তু কখনও কখনও ইহা বাড়িয়া এক-চতুর্থাংশে, অথবা কমিয়া এক-অষ্টমাংশে দাঁড়াইত। নগরে জন্ম ও মৃত্যু, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় ইত্যাদি খাতে কর আদায় করা হইত।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ

'অর্থশাস্ত্র' হইতে জানা যায় যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সংগঠন ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। রাষ্ট্রের বিশাল ভূসম্পত্তি ও ধন সম্পদ ছিল। খনিগুলি এবং খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রজাগণ যে বিপুল পরিমাণ শস্য রাজস্ব হিসাবে দিত, তাহা রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিত। কৃষির উন্নতির জন্য সেচ কার্য করা হইত এবং বীজধান, গবাদি পশু ও লাঙ্গল প্রভৃতি সরবরাহ করা হইত। লবণের ব্যবসায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল। জলপথে বাণিজ্যও নিয়ন্ত্রিত ছিল। বিভিন্ন দ্রব্যের সরবরাহ, মূল্য, ক্রয়-বিক্রয় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। বন-সংরক্ষণ ও বন্যপশুদের নিরাপত্তার জন্যও ব্যবস্থা লওয়া হইত।

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময়

স্থানের অধিকারী। আলেকজাণ্ডারের রাজ্যবিস্তার প্রয়াসের অবসান করিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত করেন। গ্রীকদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমা পারস্যের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি গ্রীকদের বন্ধুত্ব অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই বন্ধুত্ব তিন প্রজন্মকাল স্থায়ী হয়। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে তিনি তৎকালের বৃহত্তম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয়গণ যে ঐক্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহা সফল করেন। রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা করিয়া তিনি তাঁহার দিগ্বিজয়কে স্থায়ী রূপ দেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী বহু উদ্যমী রাজকর্মচারী ও সতর্ক গুপ্তচরবাহিনীর দ্বারা সুপরিচালিত ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার সাম্রাজ্য সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা মাত্র ছিল না। কৌটিল্য বলেন : "প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। যাহা রাজাকে তুষ্ট করে, তাহাকেই তিনি বাঞ্ছিত মনে করিবেন না, যাহাতে প্রজার তুষ্টি, রাজা তাহাকেই বাঞ্ছিত মনে করিবেন"। মনে হয় যে চন্দ্রগুপ্তের শাসন-ব্যবস্থা এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তিনি শাসন-ব্যবস্থায় যে আদর্শের প্রবর্তন করেন, তাহাই পরিণতি লাভ করে অশোকের এই সরল উক্তিতে : "সকল প্রজাই আমার সন্তান"।

বিন্দুসার

চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহার পুত্র বিন্দুসার। তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ হইতে ২৭৩ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন বলিয়া অনুমান করা হয়। তাঁহার উপাধি ছিল 'অমিত্রঘাত', অর্থাৎ শত্রুবিনাশকারী। ইহা হইতে মনে হয় যে তিনি কিছু রাজ্য জয় করেন, বা অন্ততঃ কোন শত্রুকে পরাজিত করেন ; কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তাঁহার পিতার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সময়ে অটুট ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে তক্ষশিলায় এক প্রবল বিদ্রোহ হয় ; কিন্তু রাজপুত্র অশোকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে।

চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় বিন্দুসারও গ্রীক রাজগণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সমকক্ষতার সম্পর্ক রক্ষা করেন। সিরিয়ার রাজা, সেলুকসের পুত্র প্রথম অ্যান্টিয়োকাস (Antiochos I) তাঁহার রাজসভায় ডেইমেকস (Deimachos) নামে এক দূত প্রেরণ করেন। বিন্দুসার তাঁহাকে 'মধুর মদ্য, ডুমুর ও একজন দার্শনিক (Sophist)' প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দার্শনিক প্রেরণ করার এই অনুরোধ ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইঙ্গিত করে। মিশরের রাজা টলেমী ফিলাডেল্‌ফস (Plolemy Philadelphos) মৌর্য রাজসভায় ডায়োনিসিয়াস (Dionysius) নামে এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বিন্দুসার অথবা অশোকের রাজত্বকালে এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

২. অশোক

ইতিহাসের উপাদান

বিন্দুসারের পুত্র ও উত্তরাধিকারী অশোক পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল শিলালিপি তাঁহার রাজ্যজয় ও শাসন-ব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম প্রচার, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করে। এই সকল শিলালিপি হইতে তাঁহার নিজের ভাষায় তাঁহার স্মরণীয় রাজত্বকালের ইতিহাস জানা যায়। তথ্যের উৎস হিসাবে ইহাদের তুলনা নাই। সিংহলী ইতিবৃত্ত 'মহাবংশ' ও 'দীপবংশ' এবং 'দিব্যাবদান' প্রভৃতি বৌদ্ধ রচনা হইতেও অশোকের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়, কিন্তু ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের জন্য তাহাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র প্রভাবে 'চণ্ডাশোক' 'ধর্মাশোকে' পরিণত হইয়াছিলেন, ইহাই তাহাদের প্রধান বক্তব্য।

রাজ্যলাভ ও রাজ্যাভিষেক

অশোকের প্রথম জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের উৎস এই বৌদ্ধ রচনাগুলি; তাঁহার শিলালিপিগুলি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। কথিত আছে যে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক তাঁহার নিরানব্বই জন ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। নিরপেক্ষ সাক্ষ্যের অভাবে এই কাহিনী বিশ্বাস করা সম্ভব নহে। সিংহাসন লাভের যুদ্ধে জয়লাভের জন্য অশোকের পক্ষে এত জন ভ্রাতাকে হত্যা করা অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছিল না।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে আনুমানিক ২৭৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয় আরও চার বৎসর পরে, অর্থাৎ ২৬৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। এই চার বৎসর 'ভারতীয় ইতিহাসের বর্ণ সমারোহের মধ্যে অন্যতম অন্ধকারের যুগ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এই সময় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে সিংহাসনের জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে অভিষেকের বিলম্ব ঘটিয়াছিল। অশোকের শিলা-লিপিগুলিতে উল্লিখিত সকল তারিখ তাঁহার অভিষেকের সময় হইতে গণনা করা হয়।

সিংহাসন লাভের পূর্বে অশোক উজ্জয়িনীতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। পরে তিনি তক্ষশিলার রাজপ্রতিনিধি রূপে সেখানে বিদ্রোহ দমনের জন্য সসৈন্যে প্রেরিত হন। অতএব সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে প্রশাসনিক ও সামরিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

নাম ও উপাধি

মস্কি (Maski) ও গুজরের (Gujarra) ক্ষুদ্র শিলালিপিগুলি ছাড়া অন্যত্র কোথাও অশোকের নিজ নামের উল্লেখ নাই। অন্য সকল শিলালিপিতে তিনি 'দেবানাম্ পিয়' (দেবপ্রিয়) এবং 'পিয়দশী' (প্রিয়দর্শী) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার পৌত্রও 'দেবানাম পিয়' বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁহার পিতামহের উপাধি ছিল 'প্রিয়দর্শন'। রাজকীয় উপাধি হিসাবে অশোক কেবলমাত্র 'রাজা' শব্দটি ব্যবহার করিতেন। তিনি সম্রাট মর্যাদাজ্ঞাপক কোন উপাধি গ্রহণ করেন নাই।

কলিঙ্গ জয়

বিম্বিসারের সময় হইতে মগধের শাসকগণ যে রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন, তাহা অনুসরণ করিয়া অশোক তাঁহার রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পর কলিঙ্গ জয় করেন। কলিঙ্গ নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু গ্রীক সূত্র অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ইহা স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য ছিল। কলিঙ্গ ছিল মগধের নিকটবর্তী, এবং দক্ষিণে যাত্রার পথে অবস্থিত; এই কারণে পাটলিপুত্রের রাজগণ কলিঙ্গ জয়ে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু কলিঙ্গ জয় অশোকের পক্ষে সহজ হয় নাই, কারণ কলিঙ্গরাজের বিশাল সৈন্যবাহিনী তাঁহাকে প্রবলভাবে বাধা দিয়াছিল। ত্রয়োদশ সংখ্যক শিলালিপিতে (Rock Edict XIII) অশোক বলিয়াছেন: "দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী, এক লক্ষ নিহত এবং উহার বহুগুণ সংখ্যক মানুষ বিনষ্ট হইয়াছিল।" কলিঙ্গের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে ইহা ছিল ভয়াবহ রক্তক্ষয়। নববিজিত রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। একজন রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হন, তাঁহার রাজধানী হয় তোশালী (বর্তমান উড়িষ্যার পুরী জেলার অন্তর্গত)।

জীবন ও নীতি সম্বন্ধে অশোকের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন করিয়া কলিঙ্গ যুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রয়োজন সাধন করিয়াছিল। রাজ্যজয়ের আগ্রহ-বৃদ্ধির পরিবর্তে তাঁহার অন্তরে মানবের প্রতি দাক্ষিণ্যের উদয় হইল। 'সুদূর দক্ষিণ' অবিজিত রহিল। এই কলিঙ্গ অভিযানের ফলে পরাজিত জনগণের দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু অশোকের মনে যে অনুশোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শিলালিপিতে: "এইরূপে কলিঙ্গ বিজয়ের জন্য রাজার মনে অনুশোচনার উদয় হইল। কারণ যে দেশ পূর্বে বিজিত হয় নাই সেই দেশ জয়ের অর্থ জনগণের হত্যা, মৃত্যু ও বন্দীদশা। রাজার নিকট উহা গভীর দুঃখ ও অনু-তাপের কারণ হইয়াছে।···কলিঙ্গ যুদ্ধে যত লোক নিহত, মৃত অথবা বন্দী রূপে অন্যত্র নীত হইয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশ, অথবা সহস্রাংশের একাংশ মানুষও যদি এখন অনুরূপ দুর্ভাগ্যের দ্বারা কবলিত হয়, তবে তাহা রাজার নিকট বিশেষ বেদনাদায়ক বলিয়া মনে হইবে"।

অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ

এই ঘোষণা শূন্যগর্ভ অনুশোচনা বা সাময়িক অনুভূতির প্রকাশ মাত্র ছিল না। কলিঙ্গ জয়ের প্রায় এক বৎসর পরে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। এত মানুষের দুঃখদর্শনে অশোক যে প্রবল মানসিক আঘাত পাইয়াছিলেন তাহার প্রত্যক্ষ ফল তাঁহার নব ধর্ম গ্রহণ—যে ধর্ম অহিংসা ও সর্ব জীবের প্রতি করুণায় বিশ্বাসী ছিল।

নব ধর্ম গ্রহণের পরে এক বৎসর অশোক ধর্ম প্রচারের বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। অতঃপর তিনি প্রায় এক বৎসরকাল বৌদ্ধ সংঘে 'প্রবেশ, পরিদর্শন অথবা বাস করেন'। সংঘের সহিত অশোকের প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে তিনি সত্য সত্যই ভিক্ষু হইয়াছিলেন। চীনা পর্যটক ইৎ-সিং বলেন যে তিনি ভিক্ষুবেশী অশোকের একটি মূর্তি দেখিয়াছিলেন। অপর মতে, তিনি বৌদ্ধ সংঘ পরিদর্শন করিয়া প্রকাশ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁহার আনুগত্য ঘোষণা করেন। ইহাও সম্ভব যে তিনি বৎসরকাল সংঘে বাস করেন, কিন্তু ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন নাই।

অশোকের ভাব্রু অনুশাসনে (Bhabru Edict) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে তিনি বুদ্ধের 'ধম্ম' ও সংঘের প্রতি অনুগত ছিলেন। এই অনুশাসনে বুদ্ধের সকল উক্তিকেই পরম সত্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কোন শিলালিপিতে কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে তাঁহার গুরু বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। সিংহলী ইতিবৃত্ত অনুসারে নিগ্রোধ নামে সপ্তবর্ষীয় এক ভিক্ষু তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। অন্যান্য বৌদ্ধ সূত্র অনুসারে তাঁহার গুরু ছিলেন উপগুপ্ত।

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পর অশোক স্বভাবতঃই বৌদ্ধ সংঘের পরিচালন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হন। তিনি বলিয়াছেন যে সংঘে মতবিভেদ দেখা দিয়াছিল এবং তিনি সংঘে ঐক্য রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে মত-সংঘর্ষ নিরোধ ও যথার্থ বৌদ্ধনীতিসমূহের সংকলনের জন্য তিনি পাটলিপুত্রে এক বৌদ্ধ সঙ্গীতি (Buddhist Council) আহ্বান করেন।

'ধম্ম'

অশোকের শিলালিপিতে প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে 'ধম্ম' (ধর্ম) অর্থ হইল 'কল্যাণ-মূলক কার্য', 'দুশ্চরিত্রতা হইতে মুক্তি', 'দয়া', 'দান', 'সত্যবাদিতা', 'পবিত্রতা' ও 'মৃদুতা'। 'ধম্ম' আচরণ করিতে হইলে এই গুণগুলির অনুশীলন করিতে হইবে। 'দয়া' অর্থ জীবহত্যা হইতে বিরত হওয়া এবং অহিংসা। বন্ধু, পরিচিত ব্যক্তিগণ, আত্মীয়গণ এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের প্রতি 'দান' আচরণীয়। 'মৃদুতা' অর্থ পিতামাতাকে এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণকে মান্য করা, এবং বন্ধু, পরিচিত ব্যক্তিগণ, আত্মীয়গণ এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের প্রতি যথাযথ ব্যবহার করা। 'কল্যাণমূলক কার্য' অর্থ পথপার্শ্বে ছায়াতরু রোপণ, মানুষ ও পশুকে জলদানের জন্য কূপ খনন ইত্যাদি জনকল্যাণকর কার্য। ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে আর একটি গুণ, 'আসিনব' অর্থাৎ হিংসা,

নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ প্রভৃতি হইতে মুক্তি। অতএব বলা যায়, অশোকের 'ধম্ম' কয়েকটি নৈতিক কর্তব্য, কল্যাণকর কর্ম ও আসক্তিহীনতার সমন্বয়।

অশোকের 'ধম্মে'র ধারণার সহিত বুদ্ধের 'চার মহাসত্য' ও 'অষ্টাঙ্গিক মার্গে'র ধারণার বিশেষ সাদৃশ্য নাই। অশোক 'নির্বাণে'র উল্লেখ করেন নাই; তিনি বলেন, 'ধম্ম' আচরণ স্বর্গলাভের উপায়। কোন কোন ঐতিহাসিক 'ধম্ম' ও বৌদ্ধ ধর্মকে এক বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, 'ধম্ম' সকল ভারতীয় ধর্মের মূলীভূত কয়েকটি নৈতিক কর্তব্যের ধারণা। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে ভক্তগণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে; তাহাদের কর্তব্য কর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। 'চার মহাসত্য' ও 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' কেবলমাত্র নির্বাণপ্রার্থী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের আচরণীয়। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে গৃহী ভক্তগণের জন্য যে সকল কর্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে, অশোক তাঁহার প্রজাদের সে সকল কর্তব্যই পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে 'ধম্ম' পালনের পুরস্কার হইল স্বর্গলাভ। অতএব অশোকের 'ধম্ম' 'সকল ধর্মের অন্তর্গত সাধারণ নীতিপরায়ণতা মাত্র নহে, ইহা বুদ্ধের গৃহী ভক্তের পক্ষে পালনীয় বিশেষ কয়েকটি নৈতিক কর্তব্য'। "বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের অপেক্ষা নৈতিক তত্ত্ব অশোককে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল, এবং তিনি এই ধর্মনির্দিষ্ট কল্যাণমূলক কর্ম ও মহৎ চিন্তার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন"।

অশোকের ধর্মপ্রচার

অশোক ধর্মের প্রচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার শিলালিপিসমূহে বর্ণিত আছে। তিনি চিরাচরিত রাজকীয় প্রমোদভ্রমণ পরিহার করিয়া 'ধর্মযাত্রা'য় বহির্গত হইলেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে দর্শন ও উপহার প্রদান করেন, বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহার প্রজাগণকে ধর্মশিক্ষা দেন, এবং ধর্ম আলোচনার ব্যবস্থা করেন। তবে এত বিশাল সাম্রাজ্যের শাসকের পক্ষে ধর্ম প্রচারের সময় ও সুযোগ অধিক ছিল না। তাই অশোক 'প্রাদেশিক', 'যুক্ত', ও 'রাজুক' প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণকে তাঁহাদের পঞ্চবাৎসরিক রাজ্য-পরিদর্শনের সময় ধর্মপ্রচারের নির্দেশ দেন। এইরূপে প্রশাসনিক কর্তব্যের সহিত ধর্মপ্রচার যুক্ত হইল। ইহা ছাড়া অশোক বিভিন্ন শ্রেণীর দেবগণের মূর্তি, তাঁহাদের শরীরের বিভিন্ন ধরণের উজ্জ্বল রঙ, তাঁহাদের স্বর্গস্থিত প্রাসাদের এবং স্বর্গস্থিত হস্তীদের মূর্তি প্রভৃতি সাধারণ মানুষের কাছে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। 'ধম্মে'র অনুসরণ করিলে পরলোকে সুখশান্তি পাওয়া যাইবে—ইহা প্রচার করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল। আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল 'ধর্মমহামাত্র' নামে এক নূতন শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিয়োগ। জনগণের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধনের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের অন্যতম কর্তব্য ছিল।

অশোকের ধর্মপ্রচার কেবলমাত্র তাঁহার রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। 'সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে, এমন কি ছয় শত যোজন পর্যন্ত দূরবর্তী অঞ্চলেও' তিনি ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অশোকের মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে রচিত সিংহলী ইতিবৃত্তগুলিতে সিংহল ও সুবর্ণভূমিতে (দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ) অশোকের প্রচারক প্রেরণ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই সকল ইতিবৃত্ত অনুসারে সিংহলে প্রচার অভিযানের নেতা ছিলেন অশোকের পুত্র মহেন্দ্র; তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। অশোক সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, এপিরাস (Epirus) ও সাইরিনের (Cyrene) গ্রীক রাজ্যগুলিতেও ধর্ম প্রচারের জন্য দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রচারকার্যের কোন ভৌগোলিক সীমা ছিল না। তিনি বলেন: 'যে সকল স্থানে রাজার প্রচারকগণ প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সেই সকল স্থানের জনসাধারণও তাঁহার মৈত্রীভাবনা প্রসূত অনুশাসন ও নির্দেশসমূহের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মাচরণে প্রবুদ্ধ হইয়াছে এবং হইবে।' অনুমান করা হয় যে যে সকল স্থানে অশোকের প্রচারকগণ প্রবেশ করিতে পারেন নাই, চীন ও উত্তর ব্রহ্ম তাহাদের অন্যতম।

মৌর্য সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে ধর্ম প্রচারকে অশোক 'ধর্মবিজয়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব ইয়োরোপে এই ধর্মবিজয়ের ফল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক অশোকের বক্তব্যকে 'রাজকীয় বাগাড়ম্বর মাত্র' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে প্রাক্-খ্রীষ্টীয় ইহুদী ধর্মে এবং প্রাচীন খ্রীস্ট ধর্মের তত্ত্বে ও আচরণে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মানুষ ও পশুর কল্যাণের জন্য ব্যবস্থা

অশোক বলিয়াছেন: 'জগতের হিতসাধনের অপেক্ষা বৃহত্তর কর্তব্য আর কিছু নাই। আমি যৎসামান্য যাহা করি তাহার উদ্দেশ্য হইল জীবগণের নিকট ঋণ হইতে মুক্তিলাভ, ইহলোকে তাহাদের সুখসাধন এবং পরলোকে তাহাদের স্বর্গলাভের ব্যবস্থা।' সকল জীবের কল্যাণ অশোকের ধর্মের একটি মৌলিক নীতি। মানুষ ও পশুর জন্য অশোক যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তিনি তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন: 'আমি পথিপার্শ্বে বটবৃক্ষ রোপণ করিয়াছি; তাহারা মানুষ ও পশুগণকে ছায়াদান করিবে। আমি আম্রবন রোপণ করিয়াছি, আট 'ক্রোশ' অন্তর কূপ খননের ব্যবস্থা করিয়াছি, এবং মানুষ ও পশুগণের কল্যাণার্থে বহু স্থানে ছায়া ও জলের ব্যবস্থা করিয়াছি।' তিনি মানুষ ও পশুগণের জন্য চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন: 'যে সকল স্থানে প্রয়োজনীয় তরুলতার অভাবে মানুষ ও পশুগণের চিকিৎসার জন্য ঔষধ প্রস্তুত করা যায় না, সেই সকল স্থানে সেই সকল তরুলতা রোপণ করা হইয়াছে। কন্দমূল ও

ফলও যে সকল স্থানে পাওয়া যায় না সেই সকল স্থানে মূল ও তরু রোপণ করা হইয়াছে।' পশুহত্যা ও পশুক্লেশ নিবারণের জন্য তিনি কিছু কিছু বিধিনিষেধ প্রচার করেন। তিনি নিজ আহার্য মাংসের পরিমাণ হ্রাস করেন, এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী জীবনে মাংসাহার সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন। তিনি রাজগণের চিরাচরিত শিকারের প্রথাও তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ ই 'দ্বিপদ ও চতুষ্পদদিগের, পক্ষী ও জলজন্তুগণের বহু উপকার এবং তাহাদিগকে জীবন পর্যন্ত দান করার' কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন। মৃত্যুদণ্ড তুলিয়া দেওয়া হয় নাই, তবে অপরাধীকে মৃত্যুর পূর্বে তিন দিন সময় দেওয়া হইত।

কেবলমাত্র মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই নয়,—সাম্রাজ্যের বাহিরে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে, এমন কি ভারতের বাহিরে গ্রীক রাজ্যগুলিতেও, এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

নূতন বৈদেশিক নীতি

কলিঙ্গ জয়ের পর অশোক মগধের চিরাচরিত বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত করেন। সামরিক শক্তির দ্বারা দিগ্বিজয়ের নীতি পরিত্যক্ত হইল। ধর্মের দ্বারা হৃদয় জয়ের অর্থাৎ 'ধর্মবিজয়ে'র নীতি গ্রহণ করা হইল। অশোক বলিয়াছেন, 'যুদ্ধভেরীর নির্ঘোষ ধর্মনির্ঘোষে পরিণত হইয়াছে।' পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যুদ্ধের এই সম্পূর্ণ পরিহার অদ্যাপি পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনাহীন। ইহা আরও অধিক বিস্ময়কর এইজন্য যে পরাজয়ের মুহূর্তে কোনও দুর্বল শাসক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়া (অর্থাৎ কলিঙ্গ জয়ের পরে) একজন অত্যন্ত পরাক্রান্ত শাসক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

'ধর্মবিজয়' বৌদ্ধ ধর্মের একটি বিশিষ্ট ধারণা। ভারতবর্ষের ও অন্যান্য বৌদ্ধ রাষ্ট্রের শাসকগণের মধ্যে একমাত্র অশোকই ইহাকে তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। 'ধর্মবিজয়ে'র ক্ষেত্র সীমান্তরাজ্যগুলি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই 'অন্ত' অর্থাৎ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিল চোল, পাণ্ড্য, কেরলপুত্র ও সত্যপুত্র প্রভৃতি 'সুদূর দক্ষিণে'র রাজ্য। দিগ্বিজয়ের নীতি পরিত্যক্ত না হইলে এই রাজ্যগুলি অবশ্যই আক্রান্ত হইত। ইহাদের পরে ছিল তাম্রপর্ণী বা সিংহল দ্বীপ। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব ইয়োরোপের গ্রীক রাজ্যগুলি। সিরিয়ার শাসক দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাস থিওস (Antiochos Theos, ২৬১-২৪৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ), মিশরের শাসক দ্বিতীয় টলেমী ফিলাডেলফস (Ptolemy II Philadelphos, ২৮৫-২৪৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দ), ম্যাসিডনের শাসক অ্যান্টিগোনাস গোনাটাস (Antigonus Gonatas ২৭৬-২৩৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দ), সাইরিনের (Cyrene) শাসক মগস (Magas, আনুমানিক ৩০০-২৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) এবং এপিরাসের (Epirus) শাসক আলেকজাণ্ডার

(আনুমানিক ২৭২-২৫৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) অথবা করিন্থের শাসক আলেকজাণ্ডার (আনুমানিক ২৫২-২৪৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) অশোকের সমসাময়িক ছিলেন।

এই সকল রাজ্যেই অশোক দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার পিতামহের সহিত সিরিয়ার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তাঁহার পিতা সম্ভবতঃ মিশরের সহিতও সম্পর্ক স্থাপন করেন। অশোক আরও দুইটি গ্রীক রাজ্যের (সাইরিন, এবং এপিরাস বা করিন্থ) সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন। উপরন্তু, সকল সীমান্তবর্তী রাজ্যে দূত প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচার এবং মানুষ ও পশুদের জন্য নানারূপ কল্যাণকর ব্যবস্থা করা হয়। মনে হয়, এইরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বাণিজ্য ও সংস্কৃতির প্রসারে সাহায্য করিয়াছিল।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হইলেও অশোক অন্যান্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিলেন না। তিনি বলেন, 'সকল ধর্মের অনুগামীগণ আমার রাজ্যের সর্বত্র বাস করিতে পারে।' তিনি সকল ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে, সন্ন্যাসী ও গৃহী সকলকেই উপহার প্রদান ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ধর্মসম্বন্ধে সহিষ্ণুতা প্রচারের জন্য তিনি বহু নির্দেশ দিয়াছিলেন। 'প্রত্যেকে অপরের ধর্ম সম্বন্ধে শুনিবে এবং শুনিতে ইচ্ছা করিবে, যাহাতে সকল ধর্মাবলম্বীগণই ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত এবং মঙ্গলসাধনে ইচ্ছুক হয়।' তিনি আরও বলিয়াছেন : 'নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং তাহার গৌরব বৃদ্ধির জন্য যে ব্যক্তি নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং অপরের ধর্মের নিন্দা করে, সে অবশ্যই নিজ ধর্মেরই প্রবল ক্ষতিসাধন করে।' ব্রাহ্মণগণের প্রতি দাক্ষিণ্য ও সদ্ব্যবহার প্রচার এবং আজিবিক সন্ন্যাসী-গণকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়া অশোক প্রমাণ করেন যে ধর্মের সারবস্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধের বহু উর্ধ্বে।

অশোকের সাম্রাজ্যের পরিধি

অশোকের শিলালিপিগুলির অবস্থান ও বিষয়বস্তু হইতে তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমানা নিরূপণ করা সম্ভব। উত্তর-পশ্চিমে তাঁহার সাম্রাজ্য সিরিয়ার দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাস থিওসের রাজ্যসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরিয়া, আরাকোসিয়া, পারোপামি-সদাঈ ও গেড্রোসিয়া প্রভৃতি যে প্রদেশগুলি সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে ছাড়িয়া দিয়া-ছিলেন, তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে (শাহবাজগড়ি, মনেশরা, তক্ষশিলা) এবং আফগানিস্থানে (লাঘমান ও কান্দা-হার) তাঁহার শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যে সকল জাতি তাঁহার সাম্রাজ্যে বাস করিত তাহাদের মধ্যে ছিল যোন, কম্বোজ, গান্ধার এবং সম্ভবতঃ নভক-নভপংক্তিগণ। হিউয়েন সাঙের বিবরণ ও কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী'

অনুসারে কাশ্মীর অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কলসি ও রুম্মিনদেইতে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে দেখা যায় যে হিমালয়ের পাদদেশে অশোকের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূর্ব দিকে বঙ্গদেশে অশোকের কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নাই, তবে হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের তাম্রলিপ্ত ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধনে অশোকের স্থাপিত স্তূপ দর্শন করেন। উড়িষ্যার ধৌলী ও জৌগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি সমুদ্রকূল পর্যন্ত অশোকের অধিকার প্রমাণ করে ; শিলালিপিতে কলিঙ্গজয়ের বর্ণনা হইতেও এই ধারণা সমর্থিত হয়। দক্ষিণে অশোকের সাম্রাজ্য সম্ভবতঃ পেন্নার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কারণ কর্ণাটকে ও অন্ধ্র প্রদেশে তাঁহার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে ছিল 'সুদূর দক্ষিণের' স্বাধীন 'অন্ত' রাজ্যগুলি —চোল, পাণ্ড্য, কেরলপুত্র ও সত্যপুত্র। এই রাজ্যগুলি বর্তমান তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও কেরালা রাজ্যসীমার মধ্যে অবস্থিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলে বর্তমান মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশে বসবাসকারী রাষ্ট্রিক ভোজ, অন্ধ্র ও পরিন্দ প্রভৃতি উপজাতির উল্লেখ শিলালিপিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই শহরের নিকটবর্তী সোপারা নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে ইহাও জানা যায় যে সৌরাষ্ট্র তাঁহার শাসনাধীন ছিল। আসামে অশোকের কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নাই। অতএব বলা যায় যে কেবল 'সুদূর দক্ষিণে'র রাজ্যগুলি ও আসাম ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান অশোকের সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শাসন-ব্যবস্থা

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছিল। পাঁচটি প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় : প্রাচ্য অথবা পাটলিপুত্র, উত্তরাপথ, অবন্তীরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, কলিঙ্গ। ইহাদের রাজধানী ছিল যথাক্রমে পাটলিপুত্র, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি এবং তোশালী। প্রাচ্য ব্যতীত অপর চারটি প্রদেশের শাসক ছিলেন রাজবংশীয় কুমারগণ। কেবলমাত্র সৌরাষ্ট্র তুষাস্প নামক এক যবন (পারসিক বা গ্রীক) 'রাষ্ট্রীয়' বা শাসকের শাসনাধীন ছিল।

প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে বহু রাজকর্মচারী ছিলেন। কয়েকটি জেলার শাসককে বলা হইত 'প্রাদেশিক'। জেলা শাসন করিতেন 'রাজুক'। পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা তাঁহার ছিল ; তিনি জনকল্যাণকর কাজকর্ম পরিদর্শন করিতেন। 'যুক্ত'গণ রাজস্ব আদায় করিতেন ও হিসাব রাখিতেন। অশোক বলেন যে তাঁহারা প্রজাদের মঙ্গল ও সুখ বিধানের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। 'নগর-ব্যবহারিক'গণ নগর শাসন করিতেন। অশোক 'ধর্ম মহামাত্র' নামে এক নূতন শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন। জনগণের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের

জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ ইঁহাদের কর্তব্য ছিল। 'মহামাত্র'গণ সম্ভবতঃ বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। 'অন্ত মহামাত্র'গণের উপর সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব ছিল। 'স্ত্রী-অধ্যক্ষ মহামাত্র' নারীগণের মঙ্গল সাধনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। অশোক উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারীগণকে পাঁচ বৎসর অথবা তিন বৎসর অন্তর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের (circuit tour) নির্দেশ দেন। শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান ছাড়াও ধর্ম প্রচার তাঁহাদের কর্তব্য ছিল। 'ব্রজভূমিক' নামক কর্মচারী কূপ খনন ও রক্ষণ, সাধারণ উদ্যান ও ঔষধি বৃক্ষের জন্য বিশেষ উদ্যান সংরক্ষণ ইত্যাদি জনকল্যাণ-মূলক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

জনগণের সেবার জন্য কেবল শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোর উন্নতি করাই যথেষ্ট বলিয়া অশোক মনে করেন নাই। প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে এক মহান্ আদর্শ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, 'সকল মানুষ আমার সন্তান; আমি যেমন আমার সন্তানগণের জন্য সকল প্রকার ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ও সুখ কামনা করি, সকল মানুষের জন্যও সেইরূপ কামনা করি।' তিনি শাসন-ব্যবস্থাকে জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়া-ছিলেন। তিনি বলেন, 'কোন ব্যক্তি যেমন তাহার সন্তানের জন্য দক্ষ পরিচারিকা নিয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়...আমিও সেইরূপ প্রজাদের মঙ্গল ও সুখের জন্য রাজুকগণকে নিয়োগ করিয়াছি।' সুবিচারের ব্যবস্থা করা 'মহামাত্র'গণের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। অশোক দীনভাবে বলিয়াছেন যে তিনি 'জগতের মঙ্গলের জন্য' 'সামান্যমাত্র' চেষ্টা করিয়াছেন—যাহাতে তিনি জীবগণের প্রতি ঋণমুক্ত হইতে পারেন, কিছু মানুষকে ইহলোকে সুখী ও পরলোকে স্বর্গসুখের অধিকারী হইতে সাহায্য করিতে পারেন।

অশোকের শিল্পকীর্তি

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে অশোকের শাসনকাল এক গৌরবময় যুগ। তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি কাষ্ঠ ও ইষ্টকের পরিবর্তে প্রস্তরের ব্যবহার। তিনি বহু নগর, প্রাসাদ, স্তূপ, বিহার ও গুহাগৃহ নির্মাণ করেন এবং প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করেন।

পাটলিপুত্রে অশোকের প্রাসাদ দেখিয়া চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন বিস্মিত হইয়াছিলেন; তিনি মনে করেন যে উহা মনুষ্যনির্মিত নহে, অসুরনির্মিত। তিনি বলেন যে উহারা "যে রূপে প্রস্তরের উপর প্রস্তর স্থাপন করিয়া গৃহ প্রাচীর ও প্রবেশদ্বার নির্মাণ করিয়াছিল, এবং প্রস্তরগাত্রে খোদাই ও মূল্যবান প্রস্তরের সাহায্যে অলঙ্করণ করিয়াছিল, তাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।"

কথিত আছে, অশোক ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৮৪,০০০ শহরে ৮৪,০০০ স্তূপ বা বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে আটটি স্তূপে বুদ্ধের নখ, কেশ প্রভৃতি সংরক্ষিত ছিল।

বরাবর ও নাগার্জুনি পাহাড়ের প্রস্তর-খোদিত গুহা-চৈত্যের প্রাচীরগাত্র শত শত বৎসর ধরিয়া দর্পণের ন্যায় মসৃণ ও উজ্জ্বল রহিয়াছে। একটি মাত্র প্রস্তর-খণ্ডে গঠিত (monolithic) অশোক স্তম্ভগুলি কেবলমাত্র শিল্পকলার ক্ষেত্রেই নহে, কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রেও অতুলনীয় কীর্তি। সারনাথ স্তম্ভের শীর্ষস্থিত ত্রিসিংহ মূর্তি সম্বন্ধে স্মিথ বলিয়াছেন, "প্রাচীন পশুমূর্তির রূপায়ণমূলক ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এই সুন্দর শিল্পকর্মটির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বা উহার সমতুল্য, কোন উদাহরণ পৃথিবীর কোন দেশে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে। ইহাতে বাস্তবধর্মী প্রতিকৃতি অঙ্কন পদ্ধতির সহিত শ্রেষ্ঠ গাম্ভীর্যের সমন্বয় ঘটিয়াছে এবং ইহার প্রতিটি খুঁটিনাটি নির্ভুলভাবে খোদিত হইয়াছে।" ভাস্কর্যের সৌন্দর্য ছাড়াও, এই স্তম্ভগুলি নির্মাণে বিশাল প্রস্তরখণ্ডকে যে নিপুণতার সহিত ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা হইতে মৌর্য যুগের কারিগরগণের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কারিগরি কৌশলের আর একটি ভিন্নতর উদাহরণ জুনাগড়ের নিকটে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে নির্মিত সুদর্শন হ্রদের সংস্কার। অশোক এই হ্রদের সহিত যুক্ত খাল ও পয়ঃপ্রণালী খনন করাইয়াছিলেন এবং হ্রদের জল নির্মল রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অশোকের কৃতিত্ব

রাজনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে অশোকের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। শুধু ইহাই নহে। তিনি এই সুবিশাল সাম্রাজ্যকে বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ হইতে রক্ষা করেন এবং ইহার জন্য সুদক্ষ ও জনকল্যাণমূলক এক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 'ভেরীঘোষ'কে 'ধর্মঘোষে' পরিণত করিয়া তিনি সম-সাময়িক রাজনীতিতে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বিদেশী রাজ্যে প্রচারক প্রেরণ করিয়া তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতার প্রসারের অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সভ্যতার প্রসারের জন্য তিনি অস্ত্রের উপর নির্ভর করেন নাই, তিনি নির্ভর করিয়াছিলেন সৌহার্দ্য ও জনকল্যাণকর কাজকর্মের উপর। তিনি রাজনীতিতে মানবিকতা সঞ্চার করেন এবং রাষ্ট্রনীতির সহিত উচ্চ নৈতিক আদর্শের সংযোগ স্থাপন করেন।

অশোকের মহত্ত্ব কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রক্তক্ষয়ী কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তিনি বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে মানসিক শান্তি ও জীবসেবার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দেশে ও বিদেশে অবিরাম প্রচারের মাধ্যমে তিনি পূর্ব ভারতের একটি অপ্রধান ধর্মকে বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত করেন। অশোকের জীবনকালে এবং পরবর্তী কালে যখন বুদ্ধের বাণী পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে, তখন ভারতবর্ষ একটি বিশ্বজনীন ধর্মের উৎসস্থল রূপে বিভিন্ন স্থান হইতে তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করিতে থাকে।

অশোকের বাণী হইতে আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র, আদর্শ ও শাসন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার কথা জানিতে পারি। তিনি কেবল নিজ সময়ের পটভূমিকায় চিন্তা করেন নাই, ভবিষ্যতে সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন। "তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে 'ধর্মবিজয়ে'র পথ অনুসরণ করিতে, ধর্মশিক্ষা ও পালনের দ্বারা জনগণের হৃদয় জয় করিতে বলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবে এবং এই পথ অনুসরণ করিবে বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। অতএব তিনি তাহাদের এই উপদেশ দেন যে যদি তাঁহার নির্দেশ সত্ত্বেও তাহারা দিগ্বিজয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে তাহারা যেন তাহাদের পরিকল্পনার রূপায়ণে মৃদুতা ও দয়া প্রদর্শন করে এবং প্রকৃত বিজয়ের আদর্শ বিস্মৃত না হয়।" স্বাধীন ভারতের সরকার এই যুদ্ধের ভয়ে সন্ত্রস্ত বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে নিতান্ত অকারণে সারনাথের ত্রিসিংহ মূর্তি ও ধর্ম-চক্রকে তাহাদের আদর্শের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

অশোকের উত্তরাধিকারীগণ

অশোকের মৃত্যু হয় ২৩৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। প্রায় ১৮৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল; কিন্তু এই সময়ের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। বিভিন্ন গ্রন্থে অশোকের উত্তরাধিকারীগণের বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র কুণাল, জলৌক ও তিবর, পৌত্র দশরথ ও সম্প্রতি, এবং শালিশুক নামে এক রাজ-পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে কে কাহার পর রাজত্ব করিয়াছিলেন, বা রাজ্যের আয়তন কি ছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এই সকল রাজা অশোকের বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হন।

২০৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে সিরিয়ার গ্রীকরাজ তৃতীয় অ্যান্টিও-কাসের (Antiochos III) অভিযানের পূর্বেই, সম্ভবতঃ সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃ-বিরোধের ফলে, সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। অ্যান্টিওকাস সুভগসেন নামক 'ভারতীয়দের এক রাজার' সহিত "বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ়তর করেন"। সম্ভবতঃ সুভগ-সেন পাটলিপুত্রের অধীন ছিলেন না।

মৌর্য সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত আসে বৃহদ্রথের রাজত্বকালে। তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ তাঁহাকে হত্যা করিয়া মগধে নূতন রাজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

কোন কোন ঐতিহাসিক মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোককে দায়ী করেন। তাঁহারা বলেন যে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া অশোক ব্রাহ্মণগণকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন, ইহার ফলে ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র সিংহাসন অধিকারে সমর্থ হন। কিন্তু

অশোক ব্রাহ্মণগণকে বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার শিলালিপি-গুলিতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে এক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল, এবং তাঁহার ধর্মীয় উপদেশেও এমন কিছু ছিল না যাহা ব্রাহ্মণদের ক্ষুব্ধ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পুষ্যমিত্র ধর্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণদের আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যই তিনি তাঁহার দুর্বল প্রভুর সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেনাপতি হিসাবে সৈন্যদের উপর তাঁহার প্রভাব তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

অশোকের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে অহিংসা ধর্মের প্রতি তাঁহার আনুগত্য এবং 'ভেরীঘোষে'র পরিবর্তে 'ধর্মঘোষে'র প্রবর্তন সাম্রাজ্যের সামরিক ঐতিহ্যকে দুর্বল করিয়াছিল। যুদ্ধ পরিহার করিয়া, এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণকেও যুদ্ধ পরিহার করিতে নির্দেশ দিয়া, অশোক নিঃসন্দেহে যে সামরিক শক্তি তাঁহার পিতামহকে সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিল তাহার গুরুত্ব হ্রাস করেন। কিন্তু তিনি সৈন্যবাহিনী বিলোপ করা দূরে থাকুক, কোন রকমে উহার শক্তি হ্রাস করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে কোন বৈদেশিক আক্রমণ অথবা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটে নাই। তাঁহার মৃত্যুর ৩৩ বৎসর পরে প্রথম বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে। অশোক অস্ত্রের সাহায্যে দিগ্বিজয়ের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহার দুর্বল উত্তরাধিকারীগণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সৈন্য-বাহিনীর শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন না।

অশোকের মৃত্যুর পরে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দুইটি কারণকে দায়ী করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের দুর্বলতা। তাঁহারা ছিলেন ছায়ার মত কয়েকজন ব্যক্তি; তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কারণ সম্ভবতঃ তাঁহারা বিশেষ কিছুই করেন নাই। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। অপর কারণ অশোকের সাম্রাজ্যের বিশালতা। যাতায়াতের অব্যবস্থার সেই যুগে সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রান্ত হইতে একটিমাত্র সরকারের পক্ষে এই সুবিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং দূরদর্শিতা দীর্ঘকাল সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু ঐক্যবিরোধী শক্তির অভাব ছিল না। সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে তক্ষশিলায় বার বার বিদ্রোহ হইত। কলিঙ্গ শিলালিপিতে দেখা যায় যে অশোক প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অপশাসন সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। যে কেন্দ্রাতিগ শক্তি সাম্রাজ্যকে ভাঙনের পথে ঠেলিতেছিল, তিন প্রজন্মের পর মৌর্য রাজবংশ তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে অসমর্থ হন। গ্রীক আক্রমণ সাম্রাজ্যের মৃত্যুর কারণ নহে, মৃত্যুব্যাধির লক্ষণমাত্র।

সপ্তম অধ্যায়

রাজনৈতিক ঐক্যের অবসান এবং বৈদেশিক শাসন

১. মগধের ক্রমাবনতি

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ (আনুমানিক ১৮৭-১৪৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া মৌর্য বংশের অবসান ঘটান এবং মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি সম্ভবতঃ বৈম্বিক.বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐতিহাসিক সাহিত্যে তাঁহাকে 'সেনাপতি' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার সাম্রাজ্য আয়তনে অশোকের সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র ছিল। শুঙ্গ রাজগণের সাম্রাজ্য পাটলিপুত্র হইতে নর্মদা নদী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং অযোধ্যা ও বিদিশা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের জলন্ধর ও শিয়ালকোট পুষ্যমিত্রের অধীন ছিল। মৌর্য বংশের পতনের পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সময় বিদর্ভে (বেরার) একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পুষ্যমিত্র যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিদর্ভে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি 'শুঙ্গ রাজত্বকালে' গ্রীক আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যবনেরা (ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীক) সাকেত (অযোধ্যা) এবং মাধ্যমিকা (চিতোরের নিকটস্থ নগরী) অবরোধ করে। সম্ভবতঃ মগধের সৈন্যবাহিনী তাহাদের প্রতিহত করে। ভারতীয় সাহিত্যে অনুপ্রবেশকারী গ্রীক রাজার নাম পাওয়া যায় না, গ্রীক সাহিত্য হইতেও তাঁহার পরিচয় জানা যায় না। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে ইনি ছিলেন মিনান্দার (Menander), আবার কাহারও কাহারও মতে ইনি ছিলেন ডেমেট্রিয়স (Demetrios)।

পুষ্যমিত্র দুই বার, সম্ভবতঃ বিদর্ভ এবং যবনদের বিরুদ্ধে বিজয় উপলক্ষে, অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তী বৌদ্ধ লেখকেরা বলেন যে তিনি বৌদ্ধদের উপর উৎপীড়ন করিতেন, কিন্তু এই অভিযোগ সম্ভবতঃ সত্য নয়। মধ্য প্রদেশে ভারহুতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধস্তূপ শুঙ্গ রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল।

পরবর্তী শুঙ্গগণ

পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র সিংহাসন লাভ করেন। তিনি কালিদাস রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের নায়ক। পিতার রাজত্বকালে তিনি

বিদিশায় রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, এবং বিদর্ভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ভাগভদ্র। তক্ষশিলার গ্রীক রাজা অ্যান্টিয়ালকিডাস (Antialkidas) তাঁহার নিকট হেলিওডোরস (Heliodoros) নামে একজন দূত প্রেরণ করেন। হেলিওডোরস ভাগবত (বৈষ্ণব) ধর্ম গ্রহণ করিয়া বিদিশায় (মধ্য প্রদেশের বেসনগর) একটি গরুড় স্তম্ভ স্থাপন করেন। (গরুড় বিষ্ণুর বাহন)। ইহা হইতে জানা যায় যে উত্তর-পশ্চিম ভারতেব গ্রীক রাজগণ ভারতীয় রাজগণের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রীক রাজদূতের ভারতীয় ধর্ম গ্রহণে প্রমাণিত হয় যে গ্রীকরা ধীরে ধীরে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিতেছিল।

শুঙ্গগণের গুরুত্ব

শুঙ্গ রাজগণ মৌর্য সাম্রাজ্যের এক বৃহৎ অংশে রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষা করেন এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে ব্যাকৃট্রিয় গ্রীকদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁহাদের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। বিদিশার গরুড় স্তম্ভ প্রমাণ করে যে ভাগবত ধর্ম ব্যাকৃট্রিয় গ্রীকগণকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। 'মহাভাষ্য' রচয়িতা প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পতঞ্জলি মধ্য ভারতের গোনর্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভারহুতের বৌদ্ধস্তূপ শুঙ্গ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। সাঁচীতে অশোকনির্মিত স্তূপকে বেষ্টন করিয়া কারুকার্যখচিত প্রাচীর এবং দ্বারগুলি শুঙ্গ যুগে নির্মিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ শিল্পকীর্তিগুলি প্রমাণ করে যে শুঙ্গ রাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষণ করিলেও বৌদ্ধদের উপর উৎপীড়ন করিতেন না।

কাহ্ব বংশ

পুরাণে লিখিত আছে যে শুঙ্গ রাজগণ ১১২ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৭৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দে শুঙ্গ বংশের শেষ শাসক দেবভূমি তাঁহার মন্ত্রী বাসুদেব কর্তৃক নিহত হন। বাসুদেব সিংহাসন অধিকার করিয়া কাহ্ব বা কাহ্বায়ন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের চারি জন রাজা ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। আনুমানিক ৩০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে কাহ্ব বংশের শাসনের অবসান হয়।

কাহ্ব বংশের পতনের পর হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত মগধের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজগণ কাহ্ব বংশের পতনের পরে মালবের পূর্বাংশে রাজত্ব করেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ মগধের শাসক ছিলেন না। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে 'মিত্র বংশীয় রাজগণ' মগধ শাসন করিতেন, কিন্তু শুঙ্গ এবং কাহ্বদের সহিত তাঁহাদের

কি সম্পর্ক ছিল তাহা জানা যায় না। মিত্র রাজগণের পরে পাটলিপুত্র ও মথুরায় সম্ভবতঃ শক 'মুরুন্দ' এবং ক্ষত্রপেরা রাজত্ব করিতেন। পরে এই অঞ্চলে নাগ এবং গুপ্তদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ

কলিঙ্গের চেত বংশ : খারবেল

অশোকের মৃত্যুর পরে কলিঙ্গের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এই অঞ্চলে চেত, চেতী অথবা চেদী নামে এক নূতন রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজবংশের ইতিহাসের একমাত্র উপাদান উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকটে এই রাজবংশের তৃতীয় শাসক খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালিপি। এই শিলালিপিতে খারবেলের পূর্ববর্তী দুই জন শাসকের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা খারবেলের রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে রচিত হইয়াছিল, তাই তাঁহার শেষ জীবন সম্বন্ধে কোন তথ্য ইহাতে পাওয়া যায় না। শিলালিপিতে কোন তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই। তবে ইহার অন্তর্ভুক্ত একটি শব্দ হইতে মনে হয় যে খারবেল নন্দ রাজগণের ৩০০ বৎসর পরে, অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধে, রাজত্ব করেন।

খারবেল মহামেঘবাহন কর্তৃক স্থাপিত রাজবংশের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী রাজগণের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। হাতীগুম্ফা শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে অঙ্কশাস্ত্র, ব্যবহারবিধি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন কলা ও বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করিয়া যুবরাজ খারবেল ২৪ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কলিঙ্গ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। 'কলিঙ্গ চক্রবর্তী' উপাধি গ্রহণ করিয়া তিনি কলিঙ্গ অঞ্চলে সার্বভৌম অধিকার ঘোষণা করেন। 'সাতকর্ণীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া' তিনি পশ্চিম দিকে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং বেরার অঞ্চলে রাঠিক এবং ভোজকগণকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। এই 'সাতকর্ণী' ছিলেন সাতবাহন বংশের রাজা সাতকর্ণী। খারবেল দুই বার উত্তর ভারত আক্রমণ করেন। তাঁহার আক্রমণে মগধের জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং মগধরাজ তাঁহার কাছে নতি স্বীকার করেন। এই মগধরাজের নাম সঠিক জানা যায় না। খারবেল দক্ষিণ ভারতেও অভিযান করেন। এই অভিযানে পিঠুড় নগর (সম্ভবতঃ অন্ধ্র প্রদেশে মসুলিপটমের নিকটবর্তী) ধ্বংস হয়। এই পরাক্রান্ত রাজার শেষ জীবনের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। তাঁহার পরবর্তী কলিঙ্গ রাজগণের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাঁহার উত্তরাধিকারী-গণ সম্ভবতঃ কলিঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী অন্ধ্র প্রদেশে কিছুকাল রাজত্ব করেন।

খারবেল প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তিনি প্রজাদের করভার লাঘব করেন এবং বহু পূর্বে 'নন্দরাজা' (মগধের নন্দরাজ নিযুক্ত কলিঙ্গের শাসক) কর্তৃক নির্মিত

একটি খালের সংস্কার করিয়া সেচের সুবন্দোবস্ত করেন। খারবেল জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। জৈন সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য তিনি উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকটে উদয়গিরিতে কয়েকটি গুহাগৃহ নির্মাণ করেন। কিন্তু শাসক হিসাবে সাফল্য অর্জন করিলেও খারবেল কলিঙ্গের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অথবা দাক্ষিণাত্যের পূর্বাংশে ঐক্য স্থাপন করিতে পারেন নাই।

মহারাষ্ট্রে সাতবাহন বংশের উত্থান

মহারাষ্ট্রের সাতবাহন বংশের সম্বন্ধে পুরাণে পরস্পরবিরোধী কাহিনী পাওয়া যায়। একটি কাহিনী অনুসারে তাঁহারা মোট ৪৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই কাহিনীর ভিত্তিতে কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক বলেন যে সাতবাহন রাজগণ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ হইতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অপর একটি পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে তাঁহাদের রাজত্বকাল মাত্র তিন শত বৎসর। তৃতীয় একটি পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক 'শুঙ্গশক্তিকে উৎপাটন করিয়া পৃথিবী অধিকার করেন'। এই মত অনুসারে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সিমুক রাজত্ব করেন।

পুরাণে সাতবাহনগণকে 'অন্ধ্র' অথবা 'অন্ধ্রভৃত্য' বলা হইয়াছে। অন্ধ্রগন গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী তেলুগু দেশে বাস করিতেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে, মেগাস্থিনিসের বিবরণে এবং অশোকের শিলালিপিতে তাঁহাদের উল্লেখ আছে। সাতবাহনগণ অন্ধ্রজাতীয় ছিলেন না বলিয়া প্রমাণ আছে। সম্ভবতঃ অনার্য জাতির সহিত ব্রাহ্মণদের সংমিশ্রণে তাঁহাদের উদ্ভব হয়। এই বংশের রাজগণের শিলালিপিতে সাতবাহন নামটি সর্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে, অন্ধ্র নামটি কোথাও দেখা যায় না। তাঁহাদের রাজত্বের প্রাচীনতম চিহ্নগুলি পাওয়া যায় মধ্য ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে, অন্ধ্র প্রদেশে নহে। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে যখন তাঁহাদের অধিকার কৃষ্ণা নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়, তখনই তাঁহারা 'অন্ধ্র' নামে পরিচিত হন।

সিমুক সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের তৃতীয় শাসক প্রথম সাতকর্ণী রাজ্যবিস্তারের মাধ্যমে বংশের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি মালবের পূর্বাংশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিষী নায়নিকার একটি শিলালিপিতে তাঁহাকে 'দক্ষিণাপথপতি' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি একটি রাজসূয় এবং দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া এই শিলালিপিতে উল্লেখ আছে। প্রতিষ্ঠানে (বর্তমান মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলার পৈঠান) তাঁহার রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ তিনিই সেই সাতবাহনরাজ যাঁহার নাম খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রথম সাতকর্ণীর উত্তরাধিকারীগণের সম্বন্ধে অতি সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়।

প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে 'ক্ষহরাট' নামে পরিচিত পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপগণ সাতবাহনগণের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চল অধিকার করেন। সাতবাহনশক্তি সম্ভবতঃ তাঁহাদের রাজ্যের দক্ষিণাংশে সীমাবদ্ধ থাকে।

সাতবাহন প্রাধান্যের যুগ

সাতবাহন বংশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী (আনুমানিক ১০৬-১৩০ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি পরাক্রান্ত শক ক্ষত্রপ নহপানকে পরাজিত করেন এবং শক, যবন (গ্রীক) ও পহ্লবগণকে বিধ্বস্ত করেন। তাঁহার রাজ্য মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত পৈঠানের নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে উত্তর কোঙ্কন, সৌরাষ্ট্র, বেরার এবং মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ১০৬ খ্রীস্টাব্দের পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্ততঃ ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। সমসাময়িক একটি শিলালিপিতে তাঁহাকে সমাজ-সংস্কারক রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে : "তিনি ক্ষত্রিয়দের দর্পচূর্ণ করেন, দ্বিজ বা ব্রাহ্মণগণের এবং নিম্নবর্ণের উন্নতিসাধন করেন, এবং চতুর্বর্ণের মিশ্রণ রোধ করেন।"

তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী, বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ী (আনুমানিক ১৩০-১৫৯ খ্রীস্টাব্দ) সম্ভবতঃ প্রথম সাতবাহন নৃপতি যিনি অন্ধ্র অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করেন। সম্ভবতঃ করমণ্ডল উপকূলে এবং মধ্য ভারতের কোন কোন অঞ্চলে তাঁহার অধিকার প্রসারিত হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণী (১৫৯-১৬৬ খ্রীস্টাব্দ) তাঁহার শ্বশুর, প্রসিদ্ধ শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের নিকট দুই বার পরাজিত হন, কিন্তু 'সম্পর্কের নৈকট্যবশতঃ' রুদ্রদামন 'তাঁহাকে বিনষ্ট করেন নাই।'

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী (আনুমানিক ১৭৪-২০৩ খ্রীস্টাব্দ) এই বংশের শেষ শক্তিশালী শাসক। তিনি মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র, উভয় অঞ্চলে রাজত্ব করেন এবং সম্ভবতঃ রুদ্রদামনের উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে উত্তর কোঙ্কন উদ্ধার করেন। তাঁহার মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তিনি নৌশক্তি বিস্তারে উৎসাহী ছিলেন।

সাতবাহন বংশের পতন

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর পর হইতে সাতবাহনশক্তির পতন শুরু হয়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে আভীরগণ মহারাষ্ট্র অধিকার করে। পরবর্তী সাতবাহনগণ দাক্ষিণাত্যের পূর্বভাগে এবং কানাড়া অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। পরে এই অঞ্চলে ইক্ষাকু এবং পল্লবগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মধ্য ভারতের বাকাটকগণ

যে সকল রাজবংশ সাতবাহন বংশের পতনের পরে এবং চালুক্যগণের অভ্যুত্থানের

পূর্বে দাক্ষিণাত্যে এবং মধ্য ভারতে রাজত্ব করেন, তাঁহাদের মধ্যে বাকাটক বংশ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বাকাটকগণ ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। সম্ভবতঃ বুন্দেলখণ্ডে তাঁহাদের আদি বাসভূমি ছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁহাদের শাসনের সূত্রপাত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিন্ধ্যশক্তি পুরাণে বিদিশার (মধ্য ভারতের ভূপালের নিকটবর্তী বর্তমান ভিলসা) শাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র প্রথম প্রবরসেন বুন্দেলখণ্ড হইতে অন্ধ্র প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন এবং চারিটি অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বাজপেয় প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

প্রথম পৃথ্বীসেন সম্ভবতঃ পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্র গুপ্তের বিজয় অভিযানের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে বাকাটকগণের উল্লেখ নাই। কিন্তু সম্ভবতঃ এই অভিযানের ফলে মধ্য ভারতে গুপ্ত সম্রাটগণের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাকাটক-শাসন দাক্ষিণাত্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য নিজ কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার সহিত বাকাটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিবাহ দেন। বাকাটকগণের সহযোগিতা পশ্চিম ভারতের শকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিক্রমাদিত্যের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। "বাকাটক মহারাজের রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ ছিল যে তিনি উত্তর ভারত হইতে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের শক রাজ্য আক্রমণকারীকে যথেষ্ট সাহায্য অথবা বাধাপ্রদান করিতে পারিতেন।"

বাকাটক বংশের এক শাখার বংশধর হরিসেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে রাজত্ব করেন। তিনি মালব, দক্ষিণ কোশল (মধ্য প্রদেশের পূর্বাঞ্চল), কলিঙ্গ, অন্ধ্র অঞ্চল, কানাড়া অঞ্চল এবং লাট (দক্ষিণ গুজরাট) জয় করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলচুরি ও কদম্বগণ বাকাটক-রাজ্য অধিকার করেন।

বাকাটকগণ শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বৈদর্ভী রীতি তাঁহাদের রাজসভায় সমাদর লাভ করে। অজন্তার কয়েকটি চিত্রশোভিত গুহাগৃহ তাঁহাদের রাজত্বকালে, এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, নির্মিত হয়।

পল্লব বংশের আদি ইতিহাস

পল্লবগণের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নের এখনও সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদেশিক অনুপ্রবেশকারী পহ্লবদের বংশধর বলিয়া যে ধারণা প্রচলিত আছে তাহার একমাত্র ভিত্তি নামসাদৃশ্য। অপর একটি মতে পল্লবেরা 'সুদূর দক্ষিণ' এবং সিংহলের চোল-নাগ বংশোদ্ভূত। কিন্তু চোলদের সহিত পল্লবদের বংশানুক্রমিক শত্রুতা এবং উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত পল্লব সংস্কৃতির সাদৃশ্য এই ধারণার বিরোধিতা করে। পল্লবদের প্রাচীন লিপিগুলিতে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং

অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতীয় বা তামিল শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল না। তাঁহারা নিজেদের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সকল তথ্য হইতে মনে হয় তাঁহারা উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ছিলেন।

পল্লবদের প্রাচীনতম শিলালিপিগুলি খ্রীস্টীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয়। এই বংশের প্রথম শক্তিশালী শাসক শিবস্কন্দ বর্মন এক বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন এবং অশ্বমেধ ও অন্যান্য যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। পল্লবদের রাজধানী ছিল বর্তমান তামিল নাড়ুতে অবস্থিত কাঞ্চী। সমুদ্র গুপ্ত দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করিলে কাঞ্চীর পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপ পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে পল্লবদের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। কোন কোন সংস্কৃত লিপিতে কয়েকজন পল্লব রাজার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

'সুদূর দক্ষিণের' রাজবংশ সমূহ

চোল, পাণ্ড্য এবং চেরগণ 'সুদূর দক্ষিণে'র অধিবাসী ছিলেন। প্রাচীন চোল দেশ (বর্তমান তামিল নাড়ু) পেন্নার ও ভেলার নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল। বর্তমান তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপল্লী জেলা ও পূর্বতন পুড়ুকোট্টাই রাজ্যের এক অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অশোকের শিলালিপিতে চোল রাজশক্তির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এলারা নামে একজন চোলরাজ সিংহল অধিকার করিয়া তথায় কিছুকাল রাজত্ব করেন। প্রথম শক্তিশালী চোল শাসক কারিকল সিংহল আক্রমণ করেন। তিনি কাবেরী নদীর জল সেচকার্যে ব্যবহারের জন্য একটি বিশাল বাঁধ নির্মাণ করেন। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত 'পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী' (*Periplus of the Erythrean Sea*) নামক গ্রীক গ্রন্থে এবং আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত টলেমীর প্রসিদ্ধ ভূগোল গ্রন্থে চোল দেশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে পল্লবদের অভ্যুত্থান এবং পাণ্ড্য ও চেরগণের আক্রমণের ফলে চোলদের প্রভাব হ্রাস পায়। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি চোল দেশকে 'জনহীন ও বন্য, জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শাসকের নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু লিখিয়াছেন, "এখানে জনসংখ্যা খুব কম, এবং সৈন্য ও দস্যুদল এখানে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করে"। নবম শতাব্দীতে চোল শক্তির পুনরভ্যুত্থান ঘটে।

বর্তমান তামিল নাড়ুর মাদুরা, রামনাদ ও তিন্নেভেল্লী জেলায় এবং কেরালার ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলের দক্ষিণাংশে পাণ্ড্য রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী

ছিল 'দাক্ষিণাত্যের মথুরা' নামে অভিহিত মাদুরা। তিন্নেভেল্লী জেলায় কোরকাই এবং কয়াল ছিল প্রধান বন্দর এবং বাণিজ্যকেন্দ্র।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর ভারতীয় সাহিত্যে পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখ আছে। এই রাজ্য সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস কয়েকটি কৌতূহলজনক কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই রাজ্য স্ত্রীলোক-শাসিত ছিল। অশোকের একটি শিলালিপিতে পাণ্ড্যগণকে তাঁহার রাজ্যসীমার দক্ষিণে বসবাসকারী স্বাধীন জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কলিঙ্গরাজ খারবেল একজন পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। খ্রীস্টপূর্ব ২০ অব্দে একজন পাণ্ড্যরাজ পরাক্রান্ত রোমসম্রাট অগাস্টাসের (Augustus) নিকট দূত প্রেরণ করেন। এই বংশের প্রথম শক্তিশালী শাসক কাডুংগন সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে পাণ্ড্যগণের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বর্তমান মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরাংশে চের রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী বঞ্জী কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় নাই। পশ্চিম উপকূলের দুটি বন্দর—মুজিরিস (Muziris), বর্তমান ক্র্যাঙ্গানোর এবং বৈক্কারাই—বৈদেশিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল।

চেরগণের সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অশোকের শিলালিপিতে। ইহাতে কেরলপুত্রগণকে দক্ষিণের একটি স্বাধীন জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে এবং টলেমীর ভূগোল গ্রন্থে চের রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তামিল সাহিত্যে সেনগুট্টুবন নামে এক চের রাজার বীরত্বের অতিরঞ্জিত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি হিমালয় পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দী হইতে চের রাজ্যে ক্রমান্বয়ে পাণ্ড্য ও চোলদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. বৈদেশিক আক্রমণ

মগধ সাম্রাজ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্তর্ভুক্তি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অন্যতম প্রধান কীর্তি। এক রাজবংশের শাসনে ভারতবর্ষের ঐক্যস্থাপনে ইহা এক নূতন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সম্ভবতঃ মগধ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই রাজনৈতিক যোগাযোগ অশোকের মৃত্যুর পরে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কারণ সিরিয়ার অধিপতি অ্যান্টিয়োকাসের আক্রমণের (২০৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) পূর্বেই সুভগসেন নামে একজন ভারতীয় নৃপতি গান্ধারে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে (উত্তরাপথ), পশ্চিম ভারতে (অপরান্ত) এবং মধ্য ভারতে (মধ্য দেশ) একাধিক বৈদেশিক জাতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

যবনগণ

মধ্য যুগে 'যবন' শব্দটি যে কোন বিদেশীকে, বিশেষত মুসলমানগণকে, নির্দেশ করিত। প্রাচীন কালে এই শব্দটি কেবলমাত্র গ্রীকদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন পারসিক 'যৌন' শব্দটি হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহা প্রথমে আয়োনীয় (Ionian) গ্রীকদের, পরে যে কোন গ্রীকজাতীয়কে বুঝাইত। প্রথম ডেরিয়াসের সময় হইতে পারসিক সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে আয়োনিয়া (Ionia) বা এশিয়া মাইনরের গ্রীকগণ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকরাজগণ

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে সেলুকাস যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, গ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাহা ভাঙিয়া পড়ে। পার্থিয়া (খোরাসান এবং কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীর) এবং বাহ্লীকে (বল্‌খ্, অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্বত ও অক্ষু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাহ্লীক এশিয়ায় গ্রীক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

বাহ্লীকে একাধিক রাজবংশ রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কারণ মুদ্রাই তাঁহাদের ইতিহাসের প্রধান উপাদান, এবং মুদ্রা হইতে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। আনুমানিক ২৩৫ গ্রীস্টপূর্বাব্দে ইউথিডেমস (Euthydemos) একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেলুকাসের বংশীয় (Seleucid) অ্যান্টিয়োকাসের (Antiochos) সমসাময়িক ছিলেন। দীর্ঘ-কালব্যাপী যুদ্ধের পরে অ্যান্টিয়োকাস তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র ডেমেট্রিয়সের (Demetrios) সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। ২০৬ গ্রীস্টপূর্বাব্দে অ্যান্টিয়োকাস ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে ইউথিডেমস আফগানিস্থানের এক বৃহদংশ অধিকার করেন। গ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁহার পুত্র ডেমেট্রিয়স সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পাঞ্জাবের কিছু অংশ অধিকার করেন। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে, যে যবনরাজ পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে উত্তর ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি ও ডেমেট্রিয়স একই ব্যক্তি। ইউথিডেমস এবং ডেমেট্রিয়সের নামে ভারতের এবং আফগানিস্থানের কোন কোন শহরের নামকরণ করা হয়।

ডেমেট্রিয়স যখন উত্তর ভারতে যুদ্ধ করিতেছিলেন তখন ইউক্র্যাটাইড়িস (Eucratides) নামে এক গ্রীক সেনাপতি বাহ্লীক অধিকার করিয়া অপর একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (আনুমানিক ১৭১ গ্রীস্টপূর্বাব্দ)। ডেমেট্রিয়স বাহ্লীক পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই; তাঁহার অধিকার সিন্ধু নদীর উপত্যকায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং তিনি 'ভারতীয়দের রাজা' বলিয়া পরিচিত হন। ইউথিডেমিয়া অথবা

শাকল (বর্তমান পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাবের শিয়ালকোট) তাঁহার রাজধানী ছিল। গ্রীকরাজগণের মধ্যে তিনি প্রথম দ্বিভাষী (bilingual) মুদ্রা প্রচলন করেন। ইহাতে গ্রীক ভাষার সহিত একটি ভারতীয় ভাষায় (খরোষ্ঠী লিপিতে) লেখা থাকিত।

ইউক্র্যাটাইডিসের বংশধরগণ ইউথিডেমসের বংশধরগণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বাহ্লীকে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ইউক্র্যাটাইডিস কাবুল উপত্যকা, গান্ধার এবং পশ্চিম পাঞ্জাব অধিকার করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী হেলিয়োক্লেস (Heliocles) ১৫৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দে তাঁহাকে হত্যা করেন। হেলিয়োক্লেসের মৃত্যুর পর বাহ্লীকের কিছু অংশ পার্থিয়ানগণ (Parthians) এবং কিছু অংশ শকগণ অধিকার করে। যবনরাজগণ মধ্য ও দক্ষিণ আফগানিস্থানে রাজত্ব করিতে থাকেন, কিন্তু ডেমেট্রিয়স ও ইউক্র্যাটাইডিসের বংশধরগণের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকে। ডেমেট্রিয়াস ও ইউক্র্যাটাইডিসের পরে দুই শতাব্দীরও কম সময়ে প্রায় ত্রিশ জন রাজার নাম পাওয়া যায়।

ইন্দো-গ্রীক রাজগণ

উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মিনান্দার (Menander)। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। তিনি ইউথিডেমস বংশীয় কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না, তবে ডেমেট্রিয়াসের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিপূর্বেই বাহ্লীকে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল, কিন্তু মিনান্দার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সকল গ্রীক রাজার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তিনি বিশাল রাজ্যের অধিপতি শক্তিশালী শাসক ছিলেন। স্ট্র্যাবো (Strabo) বলেন যে তিনি 'আলেকজাণ্ডারের অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক জাতিকে' পরাজিত করিয়াছিলেন। পশ্চিমে কাবুল হইতে পূর্বে মথুরা, এমন কি বুন্দেলখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, তাঁহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। 'পেরিপ্লাসে'র যুগে, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলিতে তাঁহার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে, যে যবন রাজাকে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ প্রতিহত করিয়াছিলেন, তিনিই মিনান্দার। তাঁহার রাজধানী শাকল (শিয়ালকোট) মনোহর সৌধ এবং দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। প্লুটার্ক (Plutarch) বলেন তিনি ন্যায়বিচারের জন্য খ্যাতিলাভ করেন এবং প্রজাদের নিকট বিশেষ প্রিয় ছিলেন।

এই বিদেশী নৃপতি ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকদের মতে 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' বা 'মিলিন্দের প্রশ্ন' নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অন্যতম প্রধান চরিত্র মিলিন্দ এবং মিনান্দার একই ব্যক্তি। তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।

অপর একজন ইন্দো-গ্রীক শাসক অ্যান্টিয়ালকিডাস তক্ষশিলার অধিপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ইউক্র্যাটাইডিসের বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি বিদিশার (মধ্য প্রদেশের বেসনগর) শুঙ্গবংশীয় শাসক ভাগভদ্রের রাজসভায় হেলিওডোরস (Heliodoros) নামে এক যবন দূত প্রেরণ করেন। তিনি বাসুদেব বা বিষ্ণুর সম্মানার্থে একটি গরুড়-ধ্বজ, অর্থাৎ বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মূর্তিশোভিত একটি স্তম্ভ, স্থাপন করেন। মিনান্দার ও হেলিওডোরসের দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গ্রীকগণ ক্রমশঃ ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করিতেছিলেন।

উত্তর ভারতে শক শাসন

যে সকল বিদেশী জাতি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে শক এবং পহ্লবগণ ভারতীয় সাহিত্যে ও শিলালিপিতে যবন বা গ্রীকগণের সহিত একসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। মধ্য এশিয়ার একটি যাযাবর উপজাতি হইতে শকগণের উৎপত্তি। বিভিন্ন যাযাবর উপজাতির বাসস্থান পরিবর্তন এবং প্রতিবেশী উপজাতিদের আক্রমণের ফলে তাহারা পূর্ব দিকে আসিয়া বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। পূর্ব পারস্য হইতে তাহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে আসে।

ভারতীয় শিলালিপিতে উল্লিখিত প্রাচীনতম শক শাসকগণের মধ্যে ময়েস (Maues) বা মোগ সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তাঁহার মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তিনি গান্ধারের শাসক ছিলেন। তাঁহার রাজ্য কাবুল উপত্যকার বাহ্লীক গ্রীক-রাজ্য এবং পূর্ব পাঞ্জাবের ইন্দো-গ্রীক রাজ্যের মধ্যবর্তী ছিল। তিনি রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম এজেস (Azes 1) সম্ভবতঃ পূর্ব পাঞ্জাব জয় করেন। এই রাজবংশের অপর একজন শাসক ছিলেন এজিলাইসেস (Azilises)। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক শাসকগণের শাসন-ব্যবস্থায় পারসিক ও গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মথুরায় একটি শক রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। রঞ্জুভুল সম্ভবতঃ পূর্ব পাঞ্জাবে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটান। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন ময়েস এবং রঞ্জুভুল প্রভৃতি 'উত্তর ভারতীয় ক্ষত্রপগণ শক ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন পহ্লব-

পশ্চিম ভারতে শক শাসন : ক্ষহরাটগণ

'ক্ষত্রপ' শব্দটির অর্থ হইল প্রাদেশিক শাসনকর্তা। প্রাচীন পারসিক 'ক্ষথ্রপাবন' শব্দটি হইতে ইহার উদ্ভব। ইহার সংস্কৃত রূপ হইল 'ক্ষত্রপ'। কোন কোন শক্তিশালী ক্ষত্রপ 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করেন।

'ক্ষহরাট' নামে পরিচিত শক ক্ষত্রপদের একটি বংশ পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে নিজ অধিকার স্থাপন করেন। ভূমক সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়)

শাসন করিতেন। ক্ষহরাট ক্ষত্রপগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নহপান সাতবাহনগণের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করেন। সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র ও উত্তর কোঙ্কন হইতে কাথিয়াবাড়, মালব ও আজমীর পর্যন্ত তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ হইতে অন্ততঃ ১২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নহপানের ক্ষমতা খর্ব করেন। তিনি মহারাষ্ট্র এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাতবাহন শাসন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন।

উজ্জয়িনীর শক শাসক: কর্দমকগণ

'কর্দমক' নামে পরিচিত শক ক্ষত্রপগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পশ্চিম ভারত শাসন করেন। উজ্জয়িনী তাঁহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। যশমোতিকের পুত্র চষ্টন এই বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কর্দমকগণের আদি বাসস্থান আমাদের অজ্ঞাত, তবে চষ্টন সম্ভবতঃ কুষাণদের অধীনে সিন্ধু প্রদেশ শাসন করিতেন। প্রথমে তিনি কচ্ছের শাসক ছিলেন; পরে তিনি কুষাণ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। তিনি অন্ততঃ ১৩০-৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদামন পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। ১৫০ খ্রীস্টাব্দে রচিত তাঁহার জুনাগড় শিলালিপি 'ভারতের প্রাচীনতম তারিখসহ শিলালিপিগুলির অন্যতম'। ইহাতে তাঁহার জীবনেতিহাস মোটামুটি সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শিলালিপি অনুসারে রুদ্রদামন মহাক্ষত্রপের গৌরবময় উপাধিটি জয় করিয়াছিলেন। মনে হয় কোন শক্তিশালী প্রতিবেশী, সম্ভবতঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী, তাঁহার বংশের প্রতিপত্তি বিনষ্ট করেন এবং তিনি নিজ বাহুবলে বংশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেন। পূর্ব ও পশ্চিম মালব, উত্তর গুজরাট, কচ্ছ, কাথিয়াবাড়, মারবার, সিন্ধু নদের উপত্যকার দক্ষিণাংশ, উত্তর কোঙ্কন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁহার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল অঞ্চলের কোন কোন অংশ পূর্বে সাতবাহন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; সম্ভবতঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে রুদ্রদামন এই সকল অঞ্চল জয় করেন। জুনাগড় শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে তিনি দাক্ষিণাত্যের অধিপতি সাতকর্ণীকে দুই বার পরাজিত করেন, কিন্তু সম্পর্কের নৈকট্যবশতঃ তাঁহাকে বিনষ্ট করেন নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, এই সাতকর্ণী হইলেন বশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ী; তিনি সম্ভবতঃ রুদ্রদামনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সিন্ধু নদের উপত্যকার দক্ষিণাংশ সম্ভবতঃ কণিষ্কের উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে অধিকৃত হয়। রুদ্রদামন শতদ্রু নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এবং রাজস্থানের ভরতপুরের কোন কোন অংশের শাসক যৌধেয়গণকেও পরাজিত করেন।

রুদ্রদামন কেবলমাত্র দিগ্বিজয়ী ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী শাসক।

তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ ভিন্ন অন্য কারণে প্রাণহরণ করিতেন না। জুনাগড় শিলালিপিতে বলা হইয়াছে, তিনি প্রসিদ্ধ সুদর্শন হ্রদের বাঁধটি সংস্কার করেন এবং প্রজাদের উপর নূতন কর ধার্য না করিয়া নিজে ইহার সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ব্যাকরণ, রাজনীতি, ন্যায়শাস্ত্র এবং সঙ্গীতশাস্ত্র চর্চায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রপগণের পতন

চষ্টনের বংশধরগণ মালব, গুজরাট এবং কাথিয়াবাড় লইয়া গঠিত পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রপ রাজ্যটি প্রায় দুই শতাব্দী কাল শাসন করেন। রুদ্রদামনের মৃত্যুর পর সিংহাসনের জন্যে যুদ্ধ, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং সাতবাহন প্রভৃতি পরাক্রান্ত প্রতিবেশীদের আক্রমণে এই রাজ্যটি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমদিকে একজন অজ্ঞাতকুলশীল শাসক চষ্টনের বংশ ধ্বংস করেন। ২৯৫ হইতে ৩৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মহাক্ষত্রপ কেহ ছিলেন না; শাসকগণ নিম্নতর ক্ষত্রপ উপাধিটি ব্যবহার করিতেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সাসানীয় (Persian) শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শক শক্তির পতন ঘটে। যখন দূরবর্তী ভারতীয় প্রদেশগুলিতে সাসানীয় সম্রাটগণের কর্তৃত্ব শিথিল হইয়া পড়ে তখন তৃতীয় রুদ্রসেন নামে রুদ্রদামনের এক বংশধর 'মহারাজা' উপাধি ধারণ করেন। তিনি সম্ভবতঃ চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে রাজত্ব করেন। পশ্চিম ভারতে শক শক্তির এই পুনরভ্যুত্থান স্থায়ী হয় নাই। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য শেষ শক শাসককে নিহত করিয়া মালব ও কাথিয়াবাড় জয় করেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পহ্লব শাসন : গণ্ডোফার্নেস

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে পহ্লবগণ (Parthians) গান্ধারের কোন কোন অংশে শক শাসনের অবসান ঘটাইয়া ক্রমশঃ পূর্ব দিকে প্রাধান্য বিস্তার করে। গণ্ডোফার্নেস (Gondophernes, প্রাচীন পারসিক ভাষায় বিন্দফর্ন) পহ্লব শাসকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে রাজত্ব করেন। প্রথমে তাঁহার অধিকার দক্ষিণ আফগানিস্থানে সীমাবদ্ধ ছিল; পরে তিনি পেশোয়ার অঞ্চল জয় করেন। তিনি পূর্ব গান্ধার জয় করেন, এমন কোন প্রমাণ নাই; তবে সম্ভবতঃ এজেসের উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে তিনি কোন কোন রাজ্যাংশ অধিকার করেন। খ্রীস্টীয় কিংবদন্তী অনুসারে যীশু খ্রীস্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস (St. Thomas) তাঁহাকে খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে কুষাণগণ আফগানিস্থান, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু হইতে পহ্লবগণকে বিতাড়িত করে।

ইউ-চি জাতির অনুপ্রবেশ

আনুমানিক ১৫৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ইউ-চি (Yueh-chi) নামে উত্তর-পশ্চিম চীনের অধিবাসী একটি যাযাবর জাতি হিউং-নু (Hiung-nu) নামে অপর একটি যাযাবর জাতির আক্রমণে দেশত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা করে। শকগণকে পরাজিত করিয়া তাহারা শিরদরিয়া নদীর উপত্যকা অধিকার করে। আনুমানিক ১৪০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে বাহ্‌ংশত্রুর আক্রমণে বিতাড়িত হইয়া তাহারা অক্ষু নদীর (Oxus) উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া কয়েকটি উপজাতিকে পরাজিত করে। সম্ভবতঃ খ্রীস্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র বাহ্লীক ও সোগ্‌ডিয়ানা ইউ-চি জাতি কর্তৃক অধিকৃত হয়। এই সময় ইউ-চিগণ যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ করে এবং তাহাদের অধিকৃত ভূখণ্ড পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত হয়। ইউ-চি জাতির অন্যতম শাখা কুষাণগণের রাজ্য সম্ভবতঃ চিত্রল এবং পঞ্জশির অঞ্চলের মধ্যবর্তী ছিল।

আদি কুষাণগণ

কুষাণগণের প্রথম সুপরিচিত নৃপতি কুজুল কদফিস, বা প্রথম কদফিস (Kujula Kadphises, Kadphises I) ইউ-চি রাজ্যের পাঁচটি খণ্ডকে ঐক্যবদ্ধ করেন। সম্ভবতঃ তিনি কাবুল নদের তীরবর্তী অঞ্চলের অধিপতি, ইউক্র্যাটাইডিস বংশের শেষ শাসক, হারমেয়সের (Hermeus) মিত্র অথবা সহযোগী ছিলেন এবং পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। এই মত অনুসারে, কুষাণগণ বাহ্লীক দেশীয় গ্রীকগণকে বিতাড়িত করিয়া কাবুল নদের তীরবর্তী অঞ্চল অধিকার করে। প্রথম কদফিস পহ্লবগণকেও পরাজিত করেন। গান্ধার এবং দক্ষিণ আফগানিস্থান সম্ভবতঃ তাঁহার অধীন হয়। কুষাণরাজগণের মধ্যে তাঁহার মুদ্রাই সর্বপ্রথম হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে প্রচলিত হয়। রোমক সম্রাট অগাস্টাস ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী সম্রাটগণের মুদ্রার অনুকরণে তিনি মুদ্রা প্রস্তুত করান। কদফিস রাজগণের মুদ্রায় রোমক-প্রভাব হইতে প্রমাণিত হয়, এই সময় ভারতবর্ষের সহিত চীন এবং রোমক সাম্রাজ্যের ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কুজুল কদফিস তাঁহার কোন কোন মুদ্রায় আপনাকে 'সত্য ধর্মে (অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মে) অবিচলিতচিত্ত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্পষ্টতঃই ভারতে প্রবেশের পর হইতেই কুষাণগণ ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

কুজুল কদফিসের পর তাঁহার পুত্র বিম কদফিস, অথবা দ্বিতীয় কদফিস (Wema Kadphises, Kadphises II) সিংহাসন লাভ করেন। ভারতের অভ্যন্তরে বহুদূর—পাঞ্জাব এবং সম্ভবতঃ উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত—তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। এই ভূ-খণ্ড শাসনের জন্য তিনি একজন রাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে তিনিই ৭৮ খ্রীস্টাব্দে 'শকাব্দ' প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই মত অনুসারে, বিম কদফিস ছিলেন ক্ষহরাট ক্ষত্রপ

নহপানের অধিরাজ (Overlord)। তাঁহার মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তিনি শিবের উপাসক ছিলেন।

কণিষ্কের রাজ্যকাল

কণিষ্ক নিঃসন্দেহে ভারতের কুষাণ শাসকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি কদফিস রাজগণের পূর্ববর্তী ছিলেন এবং ৫৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সূচিত 'বিক্রমাব্দে'র প্রবর্তন করেন। এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। শিলালিপি এবং মুদ্রার সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে গান্ধার কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু চৈনিক সূত্র হইতে জানা যায় যে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এই অঞ্চল কুষাণগণের শাসনাধীন ছিল না। তাহা ছাড়া, কণিষ্কের মুদ্রায় খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমক মুদ্রার প্রভাব সুস্পষ্ট। বর্তমানে সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন যে কণিষ্ক কদফিস রাজগণের পরবর্তী-কালীন শাসক ছিলেন, যদিও তাঁহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কণিষ্কের রাজ্যকাল খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী, কিন্তু চৈনিক ও তিব্বতীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ইহার বিরোধিতা করে। কয়েকজন ঐতিহাসিক মনে করেন যে কণিষ্কের রাজ্যকাল ১২৫ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হইয়া খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শেষ হয়। কিন্তু আমরা জানি যে কণিষ্ক একটি অব্দের প্রবর্তক ছিলেন। এই তথ্যের সঙ্গে তাঁহার রাজ্যকাল সংক্রান্ত এই মতের সামঞ্জস্য নাই। অতএব অপর কয়েকজন ঐতিহাসিকের ভিন্ন মত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা বলেন যে কণিষ্ক খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে রাজত্ব করেন এবং ৭৮ খ্রীস্টাব্দে 'শকাব্দে'র সূচনা করেন। পশ্চিম ভারতের শক রাজগণ দীর্ঘকাল সময় নির্ণয়ে কণিষ্কের অব্দকে ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ ইহা 'শকাব্দ' নামে অভিহিত। কণিষ্ক অন্ততঃ ২৩ শকাব্দ, অর্থাৎ ১০১ খ্রীস্টাব্দ, পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

কণিষ্কের রাজ্যজয়

কণিষ্ক ছিলেন পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী। তাঁহার সামরিক সাফল্যের ফলে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি কাশ্মীর জয় করেন। তিব্বতীয় ও চৈনিক সাহিত্যে সাকেত ও পাটলিপুত্রের শাসকদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কণিষ্ক পহ্লবরাজকে পরাজিত করেন। চৈনিকগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি মধ্য এশিয়া, কাশগড়, খোটান এবং ইয়ারখন্দ অধিকার করেন। পরাক্রান্ত সম্রাট হো-তির রাজত্বকালে (৮৯-১০৫ খ্রীস্টাব্দ) চৈনিকগণ মধ্য এশিয়ায় তাহাদের হৃত প্রভাব পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে, এবং পাঞ্চাও নামে এক চৈনিক সেনাপতি কণিষ্ককে পরাজিত করেন। কয়েক বৎসর পরে

কণিষ্ক পামীর মালভূমির পরপারে, এক অভিযান পরিচালনা করিয়া পাঞ্চাও-এর পুত্রকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ এই অভিযানেই তিনি সন্ধির জামীন স্বরূপ একজন চৈনিক রাজপুত্রকে নিজ রাজ্যে বন্দী রাখেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণে এই তথ্য পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের বাহিরে আফগানিস্থান, বাহ্লীক, কাশগড়, খোটান এবং ইয়ার-খন্দ কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পাঞ্জাব, কাশ্মীর সিন্ধু এবং পূর্ব দিকে কাশী পর্যন্ত সমগ্র উত্তর প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল,—ইহা প্রায় নিশ্চিত জানা যায়। সম্ভবতঃ মালব, রাজস্থান, কাথিয়াবাড় এবং কোঙ্কনেও তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। বাংলা এবং বিহারেও তাঁহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল 'মহাক্ষত্রপ' ও 'ক্ষত্রপ' উপাধি-ধারী রাজপ্রতিনিধিগণের দ্বারা শাসিত হইত। তাঁহার বাসস্থান পুরুষপুর (পেশোয়ার) ছিল এক বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এই সর্বপ্রথম প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত, এবং ভারতবর্ষের বাহিরে প্রায় মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক ভূখণ্ড, এক সাম্রাজ্যের শাসনাধীন হয়।

কণিষ্কের ধর্ম

বৌদ্ধ সাহিত্যে কিংবদন্তী আছে যে কণিষ্ক তাঁহার রাজত্বকালের সূচনাতেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। মুদ্রা, শিলালিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁহার কোন কোন মুদ্রায় বুদ্ধের মূর্তি অঙ্কিত আছে। পুরুষপুরে একটি চৈত্য এবং কাষ্ঠময় বিশাল একটি মিনার নির্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে তিনি বুদ্ধের কিছু চিহ্ন রক্ষা করেন। তিনিই শেষ বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন আহ্বান করেন। ঐ সঙ্গীতি কাশ্মীরে, অথবা গান্ধারে, অথবা পাঞ্জাবের জলন্ধরে অনুষ্ঠিত হয়। বসুমিত্র এবং অশ্বঘোষ ইহার কার্য পরিচালনা করেন। অধিবেশনে বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহের উপর পূর্ণাঙ্গ টীকাভাষ্য সংকলিত হয়। এই সকল রচনা পিত্তলফলকে খোদিত করিয়া স্তূপের অভ্যন্তরে রক্ষিত হয়। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম 'হীনযান' ও 'মহাযান' এই দুই মতে বিভক্ত হয়। কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য বিদেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান হইয়াও কণিষ্ক ভারতীয় সর্বধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় হিন্দু, গ্রীক, জরথুস্ট্রীয়, ইরাণীয় এবং পশ্চিম এশিয়ার অন্তর্গত এলাম দেশের (Elam) বিভিন্ন ধর্মের দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। সম্ভবতঃ কণিষ্ক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সকল উপাস্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

শিল্প-সাহিত্যের প্রতি কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতা

কণিষ্ক শিল্প ও সাহিত্যের একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পুরুষপুরে তিনি যে চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরেও চৈনিক ও মুসলমান পর্যটকদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। স্তূপটির নির্মাণকার্যের তত্ত্বা-বধান করেন এজেসিলাওস (Agesilaos) নামে একজন গ্রীক স্থপতি। কণিষ্ক তক্ষশিলার নিকটে একটি নগরী নির্মাণ করেন। সম্ভবতঃ কাশ্মীরের কণিষ্কপুর নগরীটিও তিনিই স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মনীষী পার্শ্ব ও বসুমিত্র, কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ, সুপরিচিত দার্শনিক নাগার্জুন এবং আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রবিৎ চরক তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন।

কণিষ্কের উত্তরাধিকারীগণ

মনে হয় কণিষ্ক তাঁহার শেষ জীবনে শাসনকার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন সহকারী শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন তাঁহার পুত্র অথবা ভ্রাতা বাসিষ্ক। তাঁহার সহযোগী শাসক ছিলেন হুবিষ্ক। কণিষ্কের সহিত হুবিষ্কের সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। দুইটি শিলা-লিপির সাক্ষ্য অনুসারে হুবিষ্ক সম্ভবতঃ বিম কদফিসের পৌত্র ছিলেন। খুব সম্ভব প্রসিদ্ধ শক 'মহাক্ষত্রপ' রুদ্রদামন হুবিষ্কের নিকট হইতে সিন্ধু উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চল জয় করেন। হুবিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং মথুরায় একটি মনোরম বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রাগুলি শিল্পকীর্তি হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল মুদ্রায় বহু গ্রীক, পারসিক এবং ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তি চিত্রিত হইয়াছে।

পেশোয়ার জেলার আরায় আবিষ্কৃত একটি শিলালিপিতে কণিষ্কের নাম পাওয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কণিষ্ক। কিন্তু সাধারণতঃ মনে করা হয় যে ইনি একজন ভিন্ন ব্যক্তি। ইহাকে দ্বিতীয় কণিষ্ক বলিয়া অভিহিত করা হয়। তিনি বাঝিষ্কের (সম্ভবতঃ বাসিষ্ক) পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে তিনি হুবিষ্কের সহিত যৌথভাবে কিছুকাল রাজত্ব করেন।

কুষাণ বংশের শেষ গুরুত্বপূর্ণ শাসক বাসুদেবের (আনুমানিক ১৪৫ – ১৭৬ খ্রীস্টাব্দ) মুদ্রা কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। তিনি সম্ভবতঃ শিবের উপাসক ছিলেন।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন

খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কণিষ্কের বিশাল সাম্রাজ্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল রাজ্যের শাসকেরা ছিলেন অত্যন্ত হীনবল ;

তাঁহাদের রাজ্যকালের সীমা ও ঘটনাবলী অন্ধকারাচ্ছন্ন। পারস্যের সাসানীয় সম্রাটগণ বাহ্লীক, আফগানিস্থান এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু তাঁহারা পাঞ্জাব জয় করেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। চতুর্থ শতাব্দীতে সাসানীয় সম্রাটদের প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয় এবং গুপ্ত সম্রাটগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অবশিষ্ট কুষাণ রাজগণের ("দৈবপুত্র-শাহী-শাহানুশাহী') উপর সমুদ্র গুপ্তের প্রভাব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্ত রাজগণের পতনের পর তাঁহারা প্রথমে হূণগণের এবং পরে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হন। নবম শতাব্দীর শেষভাগে পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশ কুষাণ সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করেন।

কুষাণদের উত্তরাধিকারীগণ : নাগ বংশ

কুষাণ শাসনের অবসান হইলে মথুরা এবং গোয়ালিয়র অঞ্চলে নাগগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। নাগগণের দুইটি রাজবংশ ছিল। এক বংশের রাজধানী ছিল মথুরায়; অপর বংশের রাজধানী ছিল পদ্মাবতীতে (মধ্য প্রদেশের পদম্-পাওয়া)। এই দুই বংশের মধ্যে আত্মীয়তা ছিল কিনা তাহা বলা যায় না। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে নাগগণ রাজত্ব করেন। পদ্মাবতীর নাগ রাজগণ 'ভারশিব' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজনের সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। তিনি হইলেন ভব নাগ; তিনি বাকাটকগণের মিত্র ছিলেন। গুপ্ত সম্রাটগণ নাগ শক্তি নির্মূল করেন।

মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম

কুষাণ শাসনকালেই সর্বপ্রথম ভারতীয় সভ্যতা মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। কুষাণ যুগেই, আনুমানিক ৬১-৬৭ খ্রীস্টাব্দে, কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। ভারতবর্ষের বাহিরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার এবং বৈদেশিক জাতিগুলির সহিত উহার নিবিড় সংস্পর্শ বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। কণিষ্কের রাজত্বকাল হইতেই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের সূত্রপাত হয়।

খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসনগুলিকে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা হইতে থাকে। ইহাকে এই সময়ের বৌদ্ধ ধর্মের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ভিক্ষু জীবনের পূর্বতন কঠোর নিয়মগুলি কিঞ্চিৎ শিথিল করা হইল। বোধিসত্ত্বের নূতন আদর্শ প্রবর্তিত হইল। বলা হইল যে গৃহী অথবা ভিক্ষু —যে কেহই 'পারমিতা' রূপ পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরিণামে বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী। অশোকের ঘোষণাগুলিতে সর্বপ্রথম এই আদর্শের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। আদি বৌদ্ধগণ বুদ্ধ-অনুরাগী জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য এই মত

প্রচার করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্মের পরিমণ্ডলের মধ্যে গৃহী জনগণের জন্য স্থান নির্দেশের উপায় সন্ধান করিতে থাকেন। সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'পারমিতা' তত্ত্বের সূচনা হয়।

'মহাসঙ্ঘিক'গণ এই নূতন মত সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন যে, যে কেহ বুদ্ধত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন এবং উপযুক্ত শীলাদির আচরণ করিয়া প্রত্যেকেরই 'বোধিসত্ত্ব' হইবার সাধনা করা উচিত। তাঁহারা বুদ্ধ-পূজার প্রচার করেন। প্রতীক পূজার পরিবর্তে এই ব্যক্তিপূজা বুদ্ধ-অনুরাগীগণের মধ্যে নূতন অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন এবং পূজার প্রচলন হইল। 'লোকান্তরিত ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত ত্রাতার পূজায়' পরিণত হইল। এইরূপে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা হইল।

ঠিক কোন সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূত্রপাত হয় তাহা বলা কঠিন। তবে এই বিষয়ে আদিতম রচনা 'প্রজ্ঞাপারমিতা' খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল এবং ১৪৮ খ্রীস্টাব্দে চৈনিক ভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছিল। কণিষ্ক যখন বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন আহ্বান করেন, তাহার পূর্ব হইতেই মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম একটি জাগ্রত শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। মহাযান দর্শনের প্রথম প্রবক্তা নাগার্জুন সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি বিদর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; পরে তিনি নালন্দা সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। হীনযান ধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বোধগয়া তখন নালন্দার তুলনায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। মহাসঙ্ঘিকগণের প্রধান কেন্দ্র অন্ধ্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম খ্রীস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত হয়। 'নাগার্জুন, আর্যদেব, আসঙ্গ এবং বসুবন্ধুর সযত্ন চেষ্টায় উহা পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়'। বৌদ্ধ ধর্মের আদি রূপ 'হীনযান' নামে পরিচিত হইল।

কুষাণ শিল্প

ধর্ম স্বভাবতঃই শিল্পে প্রতিফলিত হয়। সাঁচী ও ভারহুত প্রভৃতি বৌদ্ধ শিল্পের আদি নিদর্শনগুলিতে জাতকের গল্প ও বুদ্ধের জীবন-কাহিনীর মনোমুগ্ধকর রূপায়ণ দেখা যায়, কিন্তু কোথাও স্বয়ং বুদ্ধের মূর্তি প্রস্তরে খোদিত দেখা যায় না। পদ-চিহ্ন, ছত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতীকের দ্বারা তাঁহার উপস্থিতি নির্দেশ করা হইত। কুষাণ যুগে ভাস্করগণ বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণের প্রস্তর মূর্তি নির্মাণের অভিনব শিল্প-কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। এই নব শিল্পরীতির অধিকাংশ নিদর্শন গান্ধার অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিল্পে 'বৌদ্ধ বিষয়ের রূপায়ণে গ্রীক শিল্পরীতি অনুসরণ করা হইয়াছে' বলিয়া ইহাকে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পরীতিও বলা হয়। গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর মূর্তির আদর্শে বুদ্ধ মূর্তি নির্মিত হয়, গ্রীক শিল্পী ফিডিয়াস

(Phedius) কর্তৃক নির্মিত গ্রীক দেবতা জুপিটারের (Jupiter) অনুরূপ ভঙ্গিতে যক্ষ কুবেরের মূর্তি গঠন করা হয়। বেশভূষাতেও গ্রীক মূর্তিগুলির অনুকরণ করা হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর গ্রীক প্রভাবের ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গান্ধার শিল্প

পাঞ্জাবের ন্যায় গান্ধারও প্রায় পাঁচ শতাব্দীকাল—খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত—ভারতীয় শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভৌগোলিক কারণে এই অঞ্চল পারসিক, গ্রীক, রোমক, শক ও কুষাণগণের প্রভাবাধীন হইয়াছিল। গান্ধার শিল্প গ্রীক আদর্শ ও শিল্পরীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও ভারতীয় ইতিবৃত্ত, রূপক, উপকথা এবং মূর্তিনির্মাণরীতির ধারা অনুসরণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ কিংবদন্তী এবং দেবমণ্ডলী সম্পর্কিত বিষয়কে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইত। গান্ধার শিল্পে ভারতীয় মূর্তিকে বিদেশী আবরণে দেখা যায়।

তক্ষশিলা ও হাদ্দা (আফগানিস্থানে জালালাবাদের নিকটবর্তী) গান্ধার শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কুষাণ যুগে এই শিল্পের পূর্ণ বিকাশ হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মাধ্যমে গান্ধার শিল্পের প্রভাব মধ্য এশিয়া ও চীনে প্রসারিত হয়। মৌর্যোত্তর যুগের দুইটি প্রধান শিল্পকেন্দ্র মথুরা ও অমরাবতীর (বিদর্ভে অবস্থিত) শিল্পকীর্তিগুলির উপর গান্ধার শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শাসন-ব্যবস্থায় বৈদেশিক প্রভাব

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির দীর্ঘকালব্যাপী শাসন স্বভাবতঃই রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং শাসনতান্ত্রিক সংগঠনে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করে। প্রাদেশিক 'সত্রপ'দের মাধ্যমে রাজ্যশাসনের পারসিক রীতি ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত হয়। 'স্ট্র্যাটেগস্' (Strategos) প্রভৃতি গ্রীক-উপাধিধারী রাজকর্মচারীগণও জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠেন। রাজ-তন্ত্রের ধারণায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। 'রাজতন্ত্রের মহিমা প্রচারের চেষ্টা দুইটি বিষয় হইতে প্রমাণিত হয়—রাজগণ কর্তৃক বাগাড়ম্বরপূর্ণ দেবকল্প বিভিন্ন উপাধি ধারণ, এবং মৃত শাসকগণের প্রতি দেবত্ব আরোপ।' অশোকের ন্যায় পরাক্রান্ত শাসক সামান্য 'রাজা' উপাধি ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্রতর বহু রাজ্যের শাসক গৌরব বাচক 'সম্রাট' উপাধি ধারণ করিতেন। অশোক আপনাকে কেবলমাত্র 'দেবানাম্ প্রিয়' বলিয়া বর্ণনা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু বহু বৈদেশিক শাসক, সম্ভবতঃ চৈনিক সম্রাটগণের অনুকরণে, আপনাদিগকে 'দেবপুত্র' বলিয়া প্রচার করিতেন। কুষাণেরা শাসকগণের প্রতি দেবত্ব আরোপের রোমক রীতি ভারতবর্ষে প্রচলন করেন। মথুরায় 'দেবকুল'

নামে পরিচিত রাজকীয় সংগ্রহশালাগুলিতে রাজগণের প্রতিমূর্তি সংরক্ষিত হইত। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে কোন কোন অঞ্চলে যে দ্বৈরাজ্যরীতি (দুই রাজা কর্তৃক যৌথভাবে রাজ্যশাসন) প্রচলিত ছিল তাহার মূলে ছিল গ্রীক-রোমক প্রভাব।

বৈদেশিক বাণিজ্য

খ্রীস্ট জন্মের পর প্রথম কয়েক শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সহিত ইয়োরোপের লাভজনক বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। রোমক সাম্রাজ্য ছিল ভারতবর্ষের প্রধান বৈদেশিক বাজার। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য এবং বিলাসদ্রব্যের (যেমন বিভিন্ন রত্ন ও মুক্তা, সুগন্ধি দ্রব্য, মশলা, রেশম ও মসলিন) প্রচুর চাহিদা ছিল। ইহার পরিবর্তে রোমক সাম্রাজ্যের স্বর্ণভাণ্ডারের অংশ ভারতবর্ষে আমদানি হইত। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে রোমক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তামিল সাহিত্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বের বহু উল্লেখ দেখা যায়। 'পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী' **(Periplus of the Erythraean sea)** নামে একটি গ্রীক গ্রন্থে ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের আকর্ষণীয় বর্ণনা পাওয়া যায়। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একজন অজ্ঞাত-নামা মিশরবাসী গ্রীক এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

কুষাণ যুগের গুরুত্ব

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুষাণ যুগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। "মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এই সর্বপ্রথম প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত এবং ভারতবর্ষের বাহিরে প্রায় মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ড লইয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।" বহিঃবিশ্বের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন, এবং মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের পথ সুগম হয়। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ধর্ম, সাহিত্য এবং শিল্পের উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়। এই সময়েই মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম, শৈব ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ দেখা যায়। অশ্বঘোষ এবং নাগার্জুন এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে গান্ধার শিল্প অতি উচ্চ স্থানের অধিকারী।

অষ্টম অধ্যায়

গুপ্ত সাম্রাজ্য

১. গুপ্ত রাজবংশের রাজনৈতিক ইতিহাস

খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চলে বিদেশী রাজগণের আধিপত্য স্থাপিত হয়। গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় নাগগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অংশে বহু ক্ষুদ্র রাজ্য ও উপজাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। দক্ষিণ ভারতও বহু রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এই সময় পূর্ব ভারতের একটি রাজবংশ আবার রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

গুপ্ত রাজবংশের অভ্যুত্থান

গুপ্ত রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। সম্ভবতঃ ইঁহারা বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তবে এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুসারে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম গুপ্ত। তিনি শুধুমাত্র 'মহারাজ' উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং সম্ভবতঃ মগধের অন্তর্গত কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ; তিনিও 'মহারাজ' উপাধি ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা স্বাধীন নরপতি ছিলেন, অথবা সামন্তরাজ মাত্র ছিলেন, তাহা বলা কঠিন।

প্রথম চন্দ্র গুপ্ত

ঘটোৎকচের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম চন্দ্র গুপ্ত 'মহারাজাধিরাজ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহে স্বাধীন নরপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ৩২০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সন হইতেই 'গুপ্ত অব্দ' আরম্ভ হয় এবং প্রথম চন্দ্র গুপ্তই উহার প্রবর্তক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে তিনি বংশের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। তিনি লিচ্ছবি বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ এই বৈবাহিক বন্ধন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। এই সময়ের লিচ্ছবি-গণের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহারা উত্তর বিহারে রাজত্ব করিতেছিলেন; তাঁহাদের রাজধানী ছিল বৈশালী (বিহারের মজঃফরপুর জেলায় বর্তমান বসার শহর)। হয়তো লিচ্ছবিগণের উত্তরাধিকারিণীর সহিত

বিবাহ হওয়ায় প্রথম চন্দ্র গুপ্তের রাজ্য লিচ্ছবি রাজ্যের সহিত মিলিত হয়। এই বিবাহকে বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম চন্দ্র গুপ্তের মুদ্রায় তাঁহার নাম ও মূর্তির সহিত কুমারদেবীর নাম ও মূর্তিও খোদিত হইত, এবং তাঁহাদের পুত্র সমুদ্র গুপ্ত গুপ্ত শিলালিপিসমূহে সর্বদাই 'লিচ্ছবি-দৌহিত্র' নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রথম চন্দ্র গুপ্ত মগধ (দক্ষিণ বিহার), প্রয়াগ (এলাহাবাদ), সাকেত (অযোধ্যা) এবং সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের এক অংশে নিজের অধিকার স্থাপন করেন।

সমুদ্র গুপ্ত

প্রথম চন্দ্র গুপ্ত স্বীয় পুত্রদের মধ্য হইতে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া সমুদ্র গুপ্তকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ৩২০ খ্রীস্টাব্দের পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৮০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় না।

সমুদ্র গুপ্তের বিজয় অভিযান

সমুদ্র গুপ্ত দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন। মহাপদ্ম নন্দ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ন্যায় তিনিও ভারতের ঐক্যবিধানে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিজয় অভিযানের মোটামুটি বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তাঁহার সভাকবি হরিষেণ কর্তৃক সংস্কৃত ছন্দে রচিত এবং এলাহাবাদে স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ এক প্রশস্তিতে। এই প্রশস্তি হইতে তাঁহার কর্মজীবন ও চরিত্রের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। মধ্য প্রদেশের এরানে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপি এবং সমুদ্র গুপ্তের মুদ্রা হইতেও অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং মধ্য ভারতে বিজিত রাজাদের রাজ্য সমুদ্র গুপ্ত নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তিনি শুধু যুদ্ধ জয় করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন,—পরাজিত রাজাদের রাজ্য তিনি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। উত্তর-পূর্বাঞ্চল হইতে সুদূর দক্ষিণ ভারত শাসনের অসুবিধা তিনি সম্ভবতঃ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে সমুদ্র গুপ্ত আর্যাবর্ত অর্থাৎ উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু রাজাকে রাজ্যচ্যুত করেন। পরাজিত রাজগণের মধ্যে ছিলেন অচ্যুত (অহিচ্ছত্র, বর্তমান উত্তর প্রদেশে বেরিলী জেলায় রামনগরের শাসক), নাগসেন (মধ্য ভারতের পদ্মাবতীর রাজা), 'কোট' কুলের এক শাসক (সম্ভবতঃ পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলে), রুদ্রদেব (সম্ভবতঃ বাকাটক বংশীয় প্রথম রুদ্রসেন), মতিল (সম্ভবতঃ উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরের শাসক), নাগদত্ত (জনৈক নাগরাজ), চন্দ্রবর্মন (শুশুনিয়া পাহাড়ে

শিলালিপিতে যে চন্দ্রবর্মনের উল্লেখ আছে ইনি সেই ব্যক্তি—পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় পুষ্করণ বা পোখরান অঞ্চলের শাসক). গণপতি নাগ (মথুরার জনৈক নাগবংশীয় শাসক), নন্দী (সম্ভবতঃ জনৈক নাগরাজা), ও বালবর্মণ (সম্ভবতঃ আসামের কোন রাজা)। মোটামুটি বলা যায়, এই সকল পরাজিত রাজাদের রাজ্য উত্তর প্রদেশ, মধ্য ভারতের কিয়দংশ এবং বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। এই সকল অঞ্চল রাজপ্রতিনিধি ও রাজকীয় কর্মচারীবৃন্দ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হইত। উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের গাজীপুর-জব্বলপুর অঞ্চলে অবস্থিত 'বন্য দেশের' আরণ্য অঞ্চলের শাসকদেরও সমুদ্র গুপ্ত পরাজিত করেন।

উত্তর ভারতে বিজয় অভিযান সমাপ্ত হইলে সমুদ্র গুপ্ত দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টি দিলেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার অভিযান মধ্য প্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে, উড়িষ্যায়, এবং দক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলে কাঞ্চী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। দক্ষিণ ভারতের যে সকল শাসককে তিনি পরাজিত করেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কোশল (অর্থাৎ দক্ষিণ কোশল, বা মধ্য প্রদেশের বিলাসপুর ও রায়পুর জেলা এবং উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলা) রাজ্যের রাজা মহেন্দ্র, মহাকান্তার (মধ্য ভারতের অরণ্য) অঞ্চলের ব্যাঘ্ররাজ, কুরল (সম্ভবতঃ শোনপুর অঞ্চল) রাজ্যের মন্তরাজ, কোট্টরের (উড়িষ্যার অন্তর্গত গঞ্জাম জেলা) রাজা স্বামীদত্ত, পিষ্টপুর (গোদাবরী জেলা) রাজ্যের রাজা মহেন্দ্রগিরি, এরণ্ডপল্ল (ভিজাগাপট্টম জেলা) রাজ্যের শাসক দমন, কাঞ্চীর (পল্লব বংশীয়) বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তের নীলরাজ (পরিচয় অনিশ্চিত), বেঙ্গীর (ইলোরার নিকটে) হস্তীবর্মন (সম্ভবতঃ সালঙ্কায়ণ বংশীয়), কুস্থলপুরের (উত্তর আর্কট জেলায়) রাজা ধনঞ্জয় এবং আরও অনেকে। এই সকল বিজিত রাজাদের রাজ্য সমুদ্র গুপ্ত নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সমুদ্র গুপ্তের সহিত বাকাটকদের সংঘর্ষের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কেহ কেহ বলেন যে সম্ভবতঃ ব্যাঘ্ররাজ বাকাটকদিগের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন, এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সমুদ্র গুপ্ত মধ্য ভারতে গুপ্ত বংশের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

সমুদ্র গুপ্তের দিগ্বিজয়ের ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত এলাকার শাসকগণ এবং পাঞ্জাব, পশ্চিম ভারত, মালব ও মধ্য প্রদেশের উপজাতিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে। এলাহাবাদ লিপিতে বলা হইয়াছে, তাহারা 'কর প্রদান করিয়া, আদেশ পালন করিয়া ও বশ্যতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সম্রাটোচিত নির্দেশ পালন করিয়াছিল'। সীমান্ত অঞ্চলের যে সকল রাজ্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে তাহাদের মধ্যে ছিল সমতট (দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ, রাজধানী বাংলাদেশের কুমিল্লার নিকটস্থ বড়কামতা,) ডবাক (আসামের নওগাঁও জেলা অথবা বাংলাদেশের ঢাকা জেলা), কামরূপ (পশ্চিম আসাম), নেপাল এবং কর্তৃপুর

(পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলা অথবা উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন, গাড়োয়াল এবং রোহিলখণ্ড অঞ্চল)। পূর্ব রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত মান্দাসোর অঞ্চলের অধিবাসী মালবগণ, রাজস্থানের জয়পুর ও আলোয়ার অঞ্চলের অধিবাসী অর্জুনায়নগণ, পাকিস্থানের বাহাওয়ালপুর রাজ্যসীমায় শতদ্রু নদীর উভয় তীরে বসবাসকারী যৌধেয়গণ, পাকিস্থানে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত শিয়ালকোটের অধিবাসী মদ্রকগণ, আভীরগণ (সম্ভবতঃ মধ্য প্রদেশের সাঁচী অঞ্চলের অধিবাসী), খরপরিক-গণ (সম্ভবতঃ মধ্য প্রদেশের অধিবাসী). প্রার্জুনগণ (সম্ভবতঃ মধ্য প্রদেশের অধিবাসী), সনকাণিকগণ (সম্ভবতঃ মধ্য প্রদেশের ভিল্‌সা অঞ্চলের অধিবাসী, এবং ভিল্‌সা অঞ্চলের কাকগণ প্রভৃতি উপজাতিগুলি সমুদ্র গুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

সমুদ্র গুপ্ত তাঁহার সমসাময়িক রাজগণের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে উত্তর-পশ্চিম ভারত, মালব ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলের বৈদেশিক শাসকগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন। হরিষেণ এই সকল শাসকগণকে 'দৈবপুত্র শাহী-শাহানুশাহী-শক-মুরুন্দ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতের এক বৃহৎ অংশের ভূতপূর্ব শাসক কুষাণ ও শকগণের ইঁহারা উত্তরাধিকারী ছিলেন।

সমুদ্র গুপ্তের খ্যাতি ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সিংহল ও 'অন্যান্য সকল দ্বীপের অধিবাসীরা' তাঁহার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার রাজসভায় একজন দূত প্রেরণ করেন এবং বুদ্ধগয়াতে একটি বিহার নির্মাণের জন্য তাঁহার অনুমতি লাভ করেন। সম্ভবতঃ মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপের হিন্দু উপনিবেশগুলির উপর সমুদ্র গুপ্তের কিছু নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল। এই দিগ্বিজয়ী রাজা স্বভাবতঃই অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা তাঁহার বিজয়গৌরব জ্ঞাপন করেন।

সমুদ্র গুপ্তের সাম্রাজ্য

সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বকালের শেষ দিকে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে (পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু, পশ্চিম রাজস্থান এবং গুজরাট ব্যতীত), মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যার মালভূমি অঞ্চলে, এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ শহর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশ সম্রাট স্বয়ং তাঁহার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন করিতেন। বহু সামন্তরাজ্য এই প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। ইহাদের বাহিরে ছিল শক ও কুষাণ বংশীয়দের শাসিত রাজ্য এবং সিংহল প্রভৃতি দ্বীপ। এই সকল অঞ্চলের শাসকেরাও সমুদ্র গুপ্তের আজ্ঞাবহ মিত্র ছিলেন।

এইভাবে সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছিল।

সমুদ্র গুপ্তের গুণাবলী

সমুদ্র গুপ্তের সামরিক অভিযান—বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য অভিযান—হইতে যে অসামান্য নেতৃত্ব ও সংগঠনশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার ভিত্তিতে একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক তাঁহাকে সঙ্গতভাবেই 'ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়াছেন। সমুদ্রের দ্বীপগুলির উপর তাঁহার আধিপত্য হইতে জানা যায় যে তাঁহার একটি নৌবাহিনী ছিল। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন। তিনি সাম্রাজ্য-সংস্থাপক হিসাবে অসাধারণ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার খ্যাতি কেবলমাত্র তাঁহার রাজনৈতিক ও সামরিক কৃতিত্বের উপর নির্ভরশীল নহে। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে তিনি বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। এই লিপিতে বলা হইয়াছে: "বহু কবিতা রচনা করিয়া তিনি 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।" সম্ভবতঃ তিনি কিছুসংখ্যক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি সবই লুপ্ত হইয়াছে। সঙ্গীত তাঁহার প্রিয় ছিল। কোন কোন মুদ্রায় উৎকীর্ণ তাঁহার বীণাবাদনরত প্রতিমূর্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার দক্ষতা ছিল। তিনি বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামী ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার স্বর্ণমুদ্রাগুলি শিল্পকীর্তি হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য

তাঁহার বহু পুত্রের মধ্যে যোগ্যতম বলিয়া সম্ভবতঃ সমুদ্র গুপ্ত চন্দ্র গুপ্তকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম জ্ঞাত তারিখ ৩৮০ খ্রীস্টাব্দ এবং শেষ জ্ঞাত তারিখ ৪১২-১৩ খ্রীস্টাব্দ।

উত্তরাধিকারসূত্রে দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য এবং রাজ্যবিস্তার নীতি লাভ করিয়াছিলেন। নাগ ও বাকাটকদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তিনি এই সাম্রাজ্যকে আরও সুদৃঢ় করিলেন। উপরন্তু যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে পশ্চিম ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। তিনি কুবেরনাগা নামে এক নাগ বংশীয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং বাকাটক বংশীয় রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত নিজ কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার বিবাহ দেন। নাগ ও বাকাটক-গণের সহিত এই সম্বন্ধ পশ্চিম ভারতের শকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল, কারণ তাঁহারা যে ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতেন তাহা হইতে গুজরাট ও

সৌরাষ্ট্রের শক রাজ্য আক্রমণকারী উত্তর ভারতীয় শাসককে তাঁহারা যথেষ্ট সাহায্য অথবা বাধা প্রদান করিতে পারিতেন। মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে শক রাজ্যগুলি অধিকৃত হইয়াছিল। পশ্চিম মালব, গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ে শক শাসনের অবসানের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য আরব সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধ বন্দরগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক উন্নতিতে সহায়তা করে।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভে চন্দ্র নামে যে রাজার উল্লেখ আছে, কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বলিয়া মনে করেন। এই অনুমান সত্য হইলে দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত পূর্ব বঙ্গের শত্রুভাবাপন্ন রাজগণকে দমন করেন এবং মধ্য এশিয়ায় বাহ্লীক (বল্‌খ) অধিকার করেন।

চন্দ্র গুপ্ত ভক্তিমান বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তিনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণকে অকৃপণভাবে সাহায্য করিতেন। তাঁহার একজন মন্ত্রী ছিলেন শৈব, এবং সম্ভবতঃ তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন বৌদ্ধ। স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত তিনি বহু তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন।

কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য

কোন কোন ঐতিহাসিক দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তকে কিংবদন্তীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত অভিন্ন মনে করেন। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্য শকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং মহাকবি কালিদাস প্রমুখ 'নব রত্ন' তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। চন্দ্র গুপ্ত পশ্চিম ভারতের শকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ইহা সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক সত্য। মহাকবি কালিদাস তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য হইতে পারে। কিন্তু 'নব রত্নের' অন্ততঃ কয়েকজন, —যেমন, জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির—তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন না ইহা সুনিশ্চিত। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় যে বিক্রমাদিত্য পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী ও অন্যান্য শহরে রাজত্ব করিতেন। পাটলিপুত্র চন্দ্র গুপ্তের রাজধানী ছিল, এবং পশ্চিম ভারতে শকদিগকে দমন করিবার জন্য তিনি মালবে—প্রথমে বিদিশায় এবং পরে উজ্জয়িনীতে—রাজকীয় আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে বিক্রমাদিত্য 'বিক্রমাব্দ' প্রবর্তন করেন। বিক্রমাব্দ খ্রীস্টপূর্ব ৫২ অব্দে শুরু হয়। সুতরাং কোনক্রমেই দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তকে ইহার প্রবর্তক বলা যায় না। তবে সম্ভবতঃ এই অব্দের সহিত 'বিক্রম' নামের যোগাযোগ পরবর্তী যুগের আবিষ্কার।

ফা-হিয়েন

দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের রাজত্বকালে বিখ্যাত চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে পর্যটন

করেন। তিনি গোবী মরুভূমির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া খোটানের পার্বত্য এলাকা, পামীর মালভূমি এবং সোয়াত ও গান্ধার দেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষে তিনি পেশোয়ার, মথুরা, কনৌজ, শ্রাবস্তী, বারাণসী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, বৈশালী, পাটলিপুত্র ও অন্যান্য অঞ্চল পরিদর্শন করেন। বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য নিদর্শনের অন্বেষণই তাঁহার ভারতে আসিবার মূল উদ্দেশ্য ছিল; তাই বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য স্থানগুলিতেই তিনি ভ্রমণ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তিতে (পশ্চিম বঙ্গে মেদিনীপুর জেলার তমলুক) সিংহল ও যবদ্বীপের উদ্দেশ্যে জাহাজে আরোহণ করেন। তিনি দশ বৎসরের অধিককাল (আনুমানিক ৪০০-৪১১ খ্রীস্টাব্দ) ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ফা-হিয়েন তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের নাম উল্লেখ করেন নাই, তবে এই দেশ সম্বন্ধে তিনি চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পাটলিপুত্রে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি এই শহরে দুইটি বিশাল বৌদ্ধ মঠ দেখিয়াছিলেন। এই মঠ দুইটি বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান ও মহাযান মতের শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু ছাত্র এই মঠ দুইটিতে অধ্যয়ন করিতে আসিত। অশোকের বিশাল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই প্রাসাদ 'অশোক কর্তৃক নিযুক্ত দানবগণ' নির্মাণ করিয়াছিল। পাটলিপুত্রের অধিবাসীরা ধনী এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল; তাহারা ন্যায়পরায়ণতা ও সদাশয়তা সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত। বৈশ্য পরিবারের প্রধানগণ চিকিৎসা ও দানের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেন। পাটলিপুত্রে একটি উৎকৃষ্ট চিকিৎসালয় ছিল। দরিদ্র রোগীরা এখানে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য পাইত। বড় বড় শহরে এবং রাজপথের পার্শ্বে বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা ছিল।

চণ্ডালগণ ব্যতীত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থ মধ্য দেশের (উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা) সকল অধিবাসীই নিরামিশাষী এবং অহিংসার অনুরাগী ছিল। ফা-হিয়েন বলেন: "ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা বিপুল এবং তাহারা সুখী; তাহাদের বাসগৃহ রাজদ্বারে নথিভুক্ত করিবার অথবা কোন বিচারক বা তাঁহার আদেশকে মান্য করার প্রয়োজন হয় না। যাহারা রাজার জমি চাষ করে কেবল তাহারাই জমি হইতে লাভের এক অংশ রাজাকে দেয়। তাহারা যাইতে ইচ্ছা করিলে যাইতে পারে; থাকিতে ইচ্ছা করিলে থাকে। (অর্থাৎ রাজকর্মচারীরা তাহাদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করেন না।) রাজা মৃত্যুদণ্ড বা অন্যান্য গুরুতর শাস্তি দেন না। অপরাধ অনুযায়ী অপরাধীরা কেবলমাত্র লঘু অথবা গুরু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বারংবার বিদ্রোহ করিলেও কেবলমাত্র অপরাধীদের ডান হাত কাটিয়া দেওয়া হয়। রাজার দেহরক্ষী ও অন্যান্য রক্ষীরা প্রত্যেকেই বেতন পায়।"

চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসন-ব্যবস্থার এই বিবরণ নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক, তবে পর্যটক কর্তৃক অঙ্কিত এই চিত্র কতখানি বাস্তব তাহা বলা কঠিন।

স্বভাবতঃই ফা-হিয়েন বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপারেই অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে পাঞ্জাবে ও বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয় ছিল, এবং মথুরাতেও উহা বিস্তার লাভ করিতেছিল। কিন্তু মধ্য দেশে বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয় ছিল না, সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল। ধর্ম সম্পর্কে কোন সরকারী বাধা-নিষেধ ছিল না এবং হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ ছিল।

প্রথম কুমার গুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য

দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের পর তাঁহার পুত্র প্রথম কুমার গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৪১৫ হইতে ৪৫৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে তাঁহার সময়ে সাম্রাজ্যের শক্তি, ঐক্য ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। সমুদ্র গুপ্তের ন্যায় তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তবে নূতন কোন রাজ্য জয়ের উপলক্ষ্যে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রাজত্বকালের শেষের দিকে পুষ্যমিত্র নামক এক গোষ্ঠীর আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পুষ্যমিত্রগণের সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা যায় না। কুমার গুপ্তের পুত্র স্কন্দ গুপ্ত সাম্রাজ্যের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন।

স্কন্দ গুপ্ত বিক্রমাদিত্য

গুপ্ত বংশের শেষ পরাক্রান্ত শাসক স্কন্দ গুপ্ত ৪৫৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৪৬৭ খ্রীস্টাব্দ—মাত্র এই কয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্রগণের সহিত যখন যুদ্ধ চলিতেছে সম্ভবতঃ তখনই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বিজয়ের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা পায়। কিন্তু তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পরে অল্পকালের মধ্যেই হূণরা পশ্চিম ও মধ্য ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দ গুপ্ত এই দুর্দান্ত বিদেশী আক্রমণকারীদিগকে পরাজিত করিয়া পৈতৃক সাম্রাজ্যের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। জুনাগড়ের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক সুদর্শন হ্রদের উপর নির্মিত একটি বাঁধ পশ্চিম ভারতে তাঁহার অধিকার প্রমাণ করে। হূণগণকে সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিয়া তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গুপ্ত

সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। স্কন্দ গুপ্ত বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষদের ন্যায় তিনিও পরমতসহিষ্ণু ছিলেন।

গুপ্ত সম্রাটদের শাসন-ব্যবস্থা

সমুদ্র গুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত কেবলমাত্র সামরিক শক্তির সাহায্যে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নাই, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে তাহাকে সংগঠিতও করিয়াছিলেন। সমসাময়িক শিলালিপিতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সংগঠন সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

মৌর্যোত্তর যুগে বৈদেশিক রাজগণ রাজাদের মর্যাদাবৃদ্ধির সূত্রপাত করেন ; গুপ্ত যুগে তাহার চরম উন্নতি হয়। অশোক প্রভৃতি পূর্ববর্তী রাজগণের ব্যবহৃত সাধারণ 'রাজা' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া গুপ্ত রাজগণ 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। অশোক নিজেকে 'দেবতাদের প্রিয়' (দেবানাম্ প্রিয়) বলিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। বৈদেশিক শাসকেরা নিজেদের আর এক স্তর উন্নীত করিয়া 'দেবপুত্র' আখ্যা গ্রহণ করিলেন। গুপ্ত রাজগণ দেবত্ব দাবি করিলেন। বরুণ, ইন্দ্র, যম প্রভৃতি দেবগণের সমস্তরে তাঁহাদের উন্নীত করা হইল। এমন কি, তাঁহাদিগকে সর্বময় ঈশ্বর ('অচিন্ত্য পুরুষ') বলিয়াও গণ্য করা হইত।

গুপ্ত রাজগণ উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন লাভ করিতেন, তবে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অগ্রাধিকারের রীতি প্রচলিত ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্রাট নিজ পুত্রদের মধ্য হইতে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিতেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য এত বিশাল ছিল যে কোন একটি কেন্দ্র হইতে তাহা শাসন করা যাইত না। ইহাকে কয়েকটি প্রদেশে (দেশ, ভুক্তি ইত্যাদি) ভাগ করা হইয়াছিল। প্রদেশগুলি আবার কয়েকটি জেলায় (প্রদেশ, বিষয়) বিভক্ত হইত। প্রদেশগুলি রাজপ্রতিনিধি (উপরিক, উপরিক মহারাজ) কর্তৃক শাসিত হইত। ইঁহারা অনেকেই রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন। জেলাগুলি শাসন করিতেন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীগণ (বিষয়পতি)। তাঁহাদের কেহ কেহ প্রত্যক্ষভাবে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন ; কেহ কেহ প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। শাসন-ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম বিভাগ ছিল গ্রাম ; একজন প্রধান (গ্রামিক) গ্রাম শাসন করিতেন। বঙ্গদেশ ও উত্তর বিহারে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা ছিল। বণিক সমিতির প্রধান (নগরশ্রেষ্ঠী), প্রধান বণিক (সার্থবাহ), প্রধান কারিগর (প্রথম কুলিক) এবং প্রধান করণিককে (পরমকায়স্থ) লইয়া পৌরসভা গঠিত হইত। সম্ভবতঃ গ্রামবৃদ্ধ বা 'মহত্তরে'র নেতৃত্বে গ্রামসভাও (অষ্টকুলাধিকরণ) ছিল। 'স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সহিত জনগণের এই সংযোগ স্থাপনে গুপ্ত সম্রাটগণের শাসন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।' সীমান্ত অঞ্চলের দায়িত্ব থাকিত 'গোপ্‌ত্রী' নামে পরিচিত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর।

সম্রাটের প্রত্যক্ষশাসিত অঞ্চলগুলির বাহিরে ছিল সামন্ত রাজ্য ও উপজাতীয় সাধারণতন্ত্র। তাহারা সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিত এবং তাঁহাকে কর দিত।

সম্রাটের মন্ত্রীদের মধ্যে 'মন্ত্রী' ছিলেন সাধারণ শাসন-ব্যবস্থার প্রধান, এবং 'সন্ধিবিগ্রহিক' ছিলেন যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত বিষয়ের (অর্থাৎ পররাষ্ট্র বিভাগের) প্রধান। সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিলেন 'মহাবলাধিকৃত।'

ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে দেশে শান্তি এবং সমৃদ্ধি ছিল। মৌর্য যুগের তুলনায় গুপ্ত যুগে দণ্ডনীতি অনেক লঘু এবং মানবিক ছিল। চীনা পর্যটক বলেন : 'রাজা মৃত্যুদণ্ড বা অন্য কোন গুরুতর শাস্তি দেন না। অপরাধ অনুযায়ী অপরাধীগণ কেবল লঘু অথবা গুরু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়'।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

৪৬৭ খ্রীস্টাব্দে স্কন্দ গুপ্তের মৃত্যুর পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস সঠিকভাবে রচনা করা সম্ভব নহে। এই বংশের একাধিক শাসকের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বকাল বা পরস্পরের সহিত সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না।

বুধ গুপ্তের রাজত্বকাল শেষ হয় সম্ভবতঃ ৫০০ খ্রীস্টাব্দে, এই সময়েই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পরে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও উত্তরাধিকার লইয়া কলহের ফলে সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায়। তোরমান ও মিহিরকুলের নেতৃত্বে হূণ আক্রমণ এবং মান্দাসোরের যশোধর্মনের মত স্থানীয় শাসনকর্তাদের অভ্যুত্থানের ফলে সমুদ্র গুপ্ত কর্তৃক সৃষ্ট বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে থাকে।

হিউয়েন সাঙ্ বর্ণিত কাহিনী সত্য হইলে, মিহিরকুল বুধ গুপ্তের ভ্রাতা নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে শাসিত অঞ্চল আক্রমণ করেন এবং নরসিংহ গুপ্ত তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হন। পরে অবশ্য, সম্ভবতঃ মৌখরীগণ ও অন্যান্য সামন্তরাজাদের সহায়তায়, গুপ্ত সম্রাট হূণ আক্রমণকারীকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। মিহিরকুলকে পরে মুক্তি দেওয়া হইলেও তাঁহার পরাজয়ের ফলে ভারতে হূণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা লুপ্ত হইল। নরসিংহ গুপ্ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। নালন্দায় তিনি একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

কুমার গুপ্ত ও স্কন্দ গুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যমিত্রগণ ও হূণগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। 'আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, বিধ্বংসী বৈদেশিক আক্রমণ এবং রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সাম্রাজ্যের পতন হয়।" মনে হয় যে পুষ্যমিত্রগণকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা হইয়াছিল, কিন্তু হূণেরা সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে ও পশ্চিমাঞ্চলে পূর্ববৎ আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছিল, এবং স্কন্দগুপ্তের

মৃত্যুর পরে উহার কিয়দংশ তাহারা অধিকার করিয়াছিল। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের বিজয়লাভের পর হূণ আতঙ্ক দূরীভূত হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার ফলে ভিতর হইতেই সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। বলভীর মৈত্রকগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। যশোধর্মনের অধীনে মান্দাসোরের স্বাধীনতা লাভ পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের মর্যাদা ও শক্তিকে প্রবল আঘাত করিল। উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় মৌখরীগণ একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিলেন। গৌড়ের রাজগণ বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব সামন্তরাজগণের ও অধীন প্রজাদের স্বাধীনতাস্পৃহাকে উৎসাহিত করিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত রাজগণ তৎকালীন রাজনৈতিক সংগ্রামে অনেক সময় পরস্পরবিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিতেন।

গুপ্ত যুগে অর্থনৈতিক অবস্থা :

গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত প্রসার ঘটিয়াছিল। রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা, আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন এবং দক্ষ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে।

শিল্পকৌশলের ক্ষেত্রে কোন উন্নতি ঘটে নাই ; কৃষকেরা পুরাতন উপকরণের সাহায্যেই চাষ করিত। কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল ছিল ; কিন্তু জমির উর্বরতা এবং জলের প্রাচুর্যের জন্য বহু প্রকারের শস্য উৎপন্ন হইত। কোন কোন সময়ে রাষ্ট্র জলসেচের ব্যবস্থা করিত। স্কন্দ গুপ্তের রাজত্বকালে সৌরাষ্ট্রের স্থানীয় শাসনকর্তা প্রাচীন সুদর্শন হ্রদের সংস্কার করাইয়াছিলেন।

কাঁচামালের প্রাচুর্য এবং শিল্পীদের উদ্যম ও নৈপুণ্যের ফলে শিল্পের প্রসার হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে সূতী ও রেশমী বস্ত্র, চর্মশিল্প ও হস্তিদন্ত শিল্পের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্ত যুগে খনিগুলির পরিচালনা সম্বন্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। রোমান সাম্রাজ্য হইতে ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য হিসাবে যে স্বর্ণমুদ্রা আমদানি করা হইত, সম্ভবতঃ তাহা হইতেই স্বর্ণ সংগৃহীত হইত। তাম্র, টিন ও সীসা সম্ভবতঃ বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। অলঙ্কারশিল্পের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

সামুদ্রিক বন্দরগুলি ছিল আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে স্থলপথে বন্দরগুলিতে দ্রব্য লইয়া আসা হইত। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিভিন্ন প্রকারের মশলা। তাম্রলিপ্তি (বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের নূতন হলদিয়া বন্দরের নিকটে) ছিল একটি সমৃদ্ধ বন্দর। চীনা পরিব্রাজকেরা এই বন্দর হইতে স্বদেশে যাত্রা করিতেন। সমুদ্র পথে ইন্দোনেশিয়া পথে ভারতের পূর্ব উপকূল ও সিংহল হইতে চীনে যাইতে হইত। ভারতবর্ষ হইতে চীনে যাইবার অনেকগুলি স্থলপথও ছিল।

শিল্পী-সংগঠন (guild) ও যৌথ উদ্যোগ (Partnership) ছিল শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। কৃষিকার্য, পশুপালন, শিল্প এবং গৃহকার্যের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হইত। স্মৃতিশাস্ত্রে শিল্পী সংগঠন, যৌথ উদ্যোগ ও শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে নিয়মকানুন উল্লিখিত আছে। গৃহকার্যের জন্য সাধারণতঃ ক্রীতদাসদের নিযুক্ত করা হইত।

সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল। সাহিত্যে নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধার চিত্র পাওয়া যায়। জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে খুব সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন বলেন যে মধ্য দেশের অধিবাসীরা ছিল সমৃদ্ধ এবং সুখী। তিনি বিশেষ করিয়া মগধের অধিবাসীদের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকেরা পারিশ্রমিক হিসাবে নগদ অর্থ অথবা শস্যের একাংশ পাইত। উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ হইতে ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ পর্যন্ত তাহাদের দেওয়া হইত।

২. গুপ্ত সভ্যতা

রাজনৈতিক ঐক্য

গুপ্ত সম্রাটগণকে সর্বশেষ বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। পরবর্তী কালে হর্ষ, গুর্জর-প্রতিহারগণ, পালগণ, রাষ্ট্রকূটগণ ও চোলগণ যে সকল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিযাছিলেন, সেগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের তুলনায় ক্ষুদ্রতর, অল্পকালস্থায়ী ও দীপ্তিহীন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, গুপ্ত যুগের পরে সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীন আদর্শ আর উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও গৌরবের সহিত রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অথবা 'সুদূর দক্ষিণাংশ' কখনও নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলেও গুপ্ত সম্রাটগণ প্রায় দুই শতাব্দী কাল যাবৎ ভারতের একটি বিশাল অংশ ঐক্যবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের চাপে যখন তাঁহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছিল, তখনও তাঁহারা প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রদেশ শাসন করেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের মহিমা কেবলমাত্র উহার বিস্তৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উহার উচ্চ আদর্শভিত্তিক শাসন ব্যবস্থায়ও প্রতিফলিত হইয়াছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে গুপ্ত সাম্রাজ্য সুশাসিত ও সমৃদ্ধ ছিল। শাসন ব্যবস্থা ছিল দক্ষ ও মানবিক, মৌর্য রাজগণের রক্তলিপ্সু আইনের তুলনায় তাঁহাদের আইন অনেক কম কঠোর ছিল। রাজনৈতিক ঐক্য ও সুশাসন স্বভাবতঃই বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব করিয়াছিল। বৈষয়িক উন্নতির ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিকাশ হইয়াছিল।

ধর্ম

অশোক ও কণিষ্কের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্যের ফলে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের অথবা জৈন ধর্মের বিলুপ্তি ঘটে নাই। শুঙ্গ রাজগণ ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পুষ্যমিত্র বেদবিহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হেলিওডোরসের দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে হিন্দু ধর্মের ভাগবত অথবা বৈষ্ণব রূপ উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীকগণকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতীয়দের মধ্যে এই ধর্ম শক্তিশালী না থাকিলে ইহার প্রভাব বৈদেশিক সমাজে প্রসারিত হইত না। উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপগণ ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। দ্বিতীয় কদফিস ও প্রথম বাসুদেব প্রভৃতি কোন কোন কুষাণরাজ হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিতেন। মৌর্যোত্তর যুগে উত্তরাঞ্চলের ও দক্ষিণাঞ্চলের বহু রাজবংশ (যেমন, ভারশিব নাগরাজগণ, বাকাটক রাজগণ, সাতবাহন রাজগণ, পল্লব রাজগণ, এবং সালঙ্কায়ন রাজগণ) ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রীতি অনুযায়ী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সুতরাং গুপ্ত যুগে 'হিন্দু সংস্কৃতির নবজন্ম' ('Hindu Renaissance') অথবা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। তবে গুপ্ত সম্রাটগণের সক্রিয় আনুকূল্য নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে শক্তিশালী করিয়াছিল এবং উহাতে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল।

গুপ্ত যুগের ধর্মীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল প্রাচীন বৈদিক ধর্মের ধীরে ধীরে কতকটা আধুনিক হিন্দু ধর্মে রূপান্তর। বৈদিক অনুষ্ঠান ও বৈদিক দেব-দেবীর পূজার পরিবর্তে বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয়, সূর্য, লক্ষ্মী, পার্বতী ও অন্যান্য বহু নূতন দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হইতেছিল। শিল্প ও সাহিত্যে এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়। পুরাণগুলিকে আধুনিক রূপ দান করিয়া ধর্মের রূপান্তরের পক্ষে প্রয়োজনীয় পৌরাণিক কাহিনীর সৃষ্টি করা হয়। প্রাচীন বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণের পরিবর্তে এই পুরাণগুলিই প্রধান ধর্মীয় সাহিত্য রূপে গণ্য হয়। দেব-দেবীর মূর্তি পূজা এই নূতন ধর্মের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাস্কর্য শিল্প দেব-দেবীগণকে মন্দিরে মন্দিরে, এমন কি সাধারণ মানুষের গৃহেও, আনিয়া উপস্থিত করিতেছিল।

সমুদ্র গুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত 'ভাগবত', অর্থাৎ বৈষ্ণব, ধর্মের অনুগামী ছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্র এই ধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বিষ্ণুর পত্নী রূপে লক্ষ্মীর পূজা করা হইত। বিষ্ণুর অবতারগণেরও পূজা শুরু হইল। শৈব ধর্মও প্রসার লাভ করিল। কালিদাস সম্ভবতঃ শিবের উপাসক ছিলেন। শিব-পার্বতীর বিবাহ এবং তাঁহাদের পুত্র স্কন্দের জন্ম তাঁহার 'কুমারসম্ভব' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার 'রঘুবংশ' কাব্যের প্রথম শ্লোকেই জগতের জনক-জননী রূপে পার্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা আছে। শৈব ধর্মের সহিত স্কন্দ বা কার্তিকেয়ের উপাসনা জড়িত ছিল। কুমার গুপ্ত বৈষ্ণব ছিলেন;

কিন্তু তিনি স্কন্দের উপাসনা সমর্থন করিতেন এবং নিজ পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন স্কন্দ। দক্ষিণ ভারতে শৈব ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হইল। শক্তি পূজাও প্রচলিত ছিল। এই মতে বিশ্বাসীগণ যে দেবীর পূজা করিতেন তিনি পার্বতী, উমা, দুর্গা প্রভৃতি বহু নামে পরিচিত ছিলেন।

গুপ্ত যুগে হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং মহাযান মতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ফা-হিয়েন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও কনৌজে হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য দেখিয়াছিলেন। আফগানিস্থান, পাঞ্জাব, মথুরা ও পাটলিপুত্রে তিনি হীনযান ও মহাযান—উভয় মতেরই সমর্থকদের দেখিয়াছিলেন। খোটানে বৌদ্ধ শ্রমণেরা সকলেই মহাযান মতের অনুগামী ছিলেন।

তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতবর্ষের সর্বত্র জৈন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম উভয়েরই পতন শুরু হয়। জৈনদের সম্পর্কে শিলালিপি বিরল। ফা-হিয়েন জৈন ধর্মের উল্লেখ করেন নাই। এই অবনতির প্রধান কারণ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে গুজরাটের বলভীতে আয়োজিত একটি সম্মেলনে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থগুলি সম্পাদিত হয়।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের অনুগামীদের ন্যায় বৌদ্ধ ও জৈনগণও মূর্তি পূজা শুরু করে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের বহু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ভুবনেশ্বরে খণ্ডগিরি অঞ্চলে জৈন তীর্থঙ্করগণের কয়েকটি মূর্তি দেখা যায়।

বহু ধর্মের প্রচলন সত্ত্বেও গুপ্ত যুগে ধর্ম সম্বন্ধে কোন রূপ বিদ্বেষপরায়ণতা ছিল না। গুপ্ত সম্রাটগণ অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে দমন করিতেন না। ধর্ম বিশ্বাসে পার্থক্য থাকার জন্য তাহারা কাহাকেও উচ্চ পদ দানে ইতস্ততঃ করিতেন না। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের জয় সাম্প্রদায়িক ভাব বা পরমত সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করে নাই বা উহাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। ফা-হিয়েনের বিবরণী হইতে প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

সাহিত্য

জনৈক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত যথার্থই বলিয়াছেন যে "গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লীয যুগ (Periclean Age) যে স্থান লাভ করিয়াছে, 'ক্ল্যাসিকাল' ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ তদ্রুপ স্থান অধিকার করিয়া আছে।" প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে গুপ্ত যুগের স্থান নিঃসন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই যুগে জাতীয় মনীষা ও কল্পনা শক্তির যে বিস্ময়কর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাহা অংশতঃ রাজনৈতিক ঐক্য ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য, এবং অংশতঃ গুপ্ত সম্রাটদের আনুকূল্যে, সম্ভব হইয়াছিল। সমুদ্র গুপ্ত কেবল পাণ্ডিত্যের পৃষ্ঠপোষক মাত্র ছিলেন না, তিনি নিজেও ছিলেন একজন 'কবিরাজ'। দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তকে যদি কিংবদন্তীর

বিক্রমাদিত্য বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি ছিলেন ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যে উৎসাহী রাজগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের আর একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "গুপ্ত যুগে ধী-শক্তির যে বিস্ময়কর বিকাশ দেখা যায়, তাহা নিঃসন্দেহে প্রধানতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলির সহিত অবিরাম মত ও চিন্তাধারা বিনিময়ের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল।" এই সময়ে পূর্বে চীন ও পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির সংযোগের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবু ঐ সংযোগ নিঃসন্দেহে বুদ্ধিবৃত্তির উদ্দীপক ও প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করিয়াছে।

গুপ্ত যুগে সংস্কৃত ছিল সাহিত্যের ভাষা। সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল একথা বলিলে ভুল হইবে, কারণ ঐ ভাষা কখনও মৃত বা মৃতকল্প হয় নাই। মৌর্য যুগে সংস্কৃত সরকারী ভাষা ছিল না ; অশোকের অনুশাসন 'সহজে বোধগম্য বিভিন্ন দেশজ ভাষায়' লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু বহু পণ্ডিত মনে করেন যে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। পতঞ্জলির মহৎ কীর্তি, 'মহাভাষ্য', পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। জুনাগড়ে প্রাপ্ত রুদ্রদামনের প্রসিদ্ধ শিলালিপি সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। অশ্বঘোষ ও চরক সম্ভবতঃ কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমগ্র রচনাবলীই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃত ভাষাকেই সাহিত্য ও দর্শন সংক্রান্ত ভাবপ্রকাশের বাহন রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ সেই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা উহাতে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশ শিলালিপিই সংস্কৃত ভাষায় সুন্দর কাব্যছন্দে রচিত। হরিষেণের প্রশস্তি বর্ণনামূলক কাব্যের একটি চমৎকার নিদর্শন। গুপ্ত সম্রাটগণের মুদ্রাগুলিতেও সংস্কৃত লিপি উৎকীর্ণ।

প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য, অথবা তাঁহার পুত্র প্রথম কুমার গুপ্ত, অথবা উভয়েরই সমসাময়িক ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি বিক্রমাদিত্যের রাজসভার 'নব রত্নে'র অন্যতম রত্ন ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ মালবের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার রচনায় 'ধ্বনি ও অনুভূতির সুকুমার সংযোগ, শব্দ ও অর্থের যুক্তিযুক্ত মিলন' দেখা যায়। তাঁহার প্রসিদ্ধ মহাকাব্য, 'রঘুবংশম্'-এ সম্ভবতঃ সমুদ্র গুপ্ত অথবা দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের বিজয় অভিযানের সামান্য ইঙ্গিত আছে। তাঁহার অপর মহাকাব্য 'কুমার সম্ভবম্'-এ শিবের প্রতি গুপ্ত যুগের সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'মেঘদূতম্' সুকুমার সৌন্দর্যমণ্ডিত এক অপরূপ গীতিকাব্য।

কাব্য ও নাটক—সাহিত্যের উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভা সমান দীপ্তিমান। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'কে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও সমালোচকগণও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক রূপে গণ্য করিয়াছেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকটিতে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের পুত্র অগ্নিমিত্রের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাতে ইতিহাসের দিক হইতে মূল্যবান কিছু তথ্য আছে।

গুপ্ত যুগে বহু খ্যাতিমান সাহিত্যকলাকুশলী, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নাটক 'মুদ্রারাক্ষসম্'-এর রচয়িতা বিশাখদত্ত, কৌতূহলোদ্দীপক নাটক 'মৃচ্ছ-কটিকম্'-এর রচয়িতা শূদ্রক, বিখ্যাত শব্দকোষ রচয়িতা অমরসিংহ, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগ, এবং প্রসিদ্ধ তিন জন জ্যোতির্বিদ—আর্যভট (জন্ম ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দ), বরাহমিহির (৫০৫-৫৮ খ্রীস্টাব্দ) ও ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫৯৮ খ্রীস্টাব্দ)। আর্যভট ও বরাহমিহির গ্রীক বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের রচনায় গ্রীক প্রভাব পরিষ্কারভাবে প্রস্ফুট।

মহাভারত ও রামায়ণ—এই দুইটি 'মহাকাব্য' বহু পরিবর্তনের ফলে সম্ভবতঃ গুপ্ত যুগেই তাহাদের বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছিল।

আমাদের বিপুলকায় পৌরাণিক সাহিত্য কিংবদন্তী, কাহিনী, উপকথা দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মাচরণের বিধি, নৈতিক বিধি এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক মূলনীতি দ্বারা পরিপূর্ণ। অনেক পূর্বে এই পৌরাণিক সাহিত্যের উৎপত্তি হইলেও সম্ভবতঃ গুপ্ত যুগেই ইহা বর্তমান আকার পরিগ্রহ করে। ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন পুরাণের ধারার সহিত নূতন যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধান করেন। পুরাণগুলিকে নূতন রূপ দিয়া তাঁহারা উহাদের সহজ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। কয়েকটি পুরাণ—যেমন বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও স্কন্দপুরাণ—কিছু পরিমাণে সম্প্রদায়গত; গুপ্ত যুগে যে সকল নূতন দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হইতেছিল তাঁহাদের গৌরব বর্ধনের জন্য এবং নব-ব্রাহ্মণ্য হিন্দু-ধর্মের রীতিনীতি বর্ণনার জন্য এইগুলি রচিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা যায়। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর প্রভৃতির রচিত প্রাচীন স্মৃতিগুলি নবরূপ লাভ করে। কাত্যায়ন, দেবল এবং ব্যাস নূতন স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন। এই রচনাগুলিতে সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিফলন এবং আইন ও বিচার-ব্যবস্থার বর্ণনা দেখা যায়।

শিল্প

গুপ্ত যুগে 'স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কণ—এই তিনটি পরস্পরঘনিষ্ঠ শিল্পকলা উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল'।

স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন দুই শ্রেণীর—পাহাড় কাটিয়া নির্মিত গুহা এবং মন্দির। পাহাড় কাটিয়া বৌদ্ধগণ দুই ধরণের গুহা নির্মাণ করিত—'চৈত্য' (উপাসনা গৃহ) এবং 'বিহার' (শ্রমণদিগের বাসস্থান)। গুহাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রে অজন্তা, ইলোরা ও ঔরঙ্গাবাদের এবং মধ্য প্রদেশের বাগ নামক স্থানের গুহা। বিভিন্ন সময়ে এগুলি নির্মিত হয়। মধ্য প্রদেশের ভিল্সার নিকটবর্তী উদয়গিরিতে পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত, এবং ইলোরাতে সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদের কয়েকটি গুহাও দেখা যায়। গুপ্ত যুগে নির্মিত জৈন গুহার সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প।

গুহাগুলি মূর্তিপূজার জন্য প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। এই কারণে মন্দির নিমাণের প্রথা প্রচলিত হয়। ইঁট ও প্রস্তর প্রভৃতি স্থায়ী উপকরণের সাহায্যে মন্দির নির্মিত হইত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীগণ, বৌদ্ধগণ ও জৈনগণ বহু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল। উত্তর ভারতে গুপ্ত যুগে নির্মিত অধিকাংশ অট্টালিকা ও মন্দিরই মুসলমান অভিযানকারীর দল বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, এইজন্য সেই যুগের স্থাপত্যের পূর্ণ ও সমালোচনামূলক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। তবে জানা যায় যে মধ্য যুগে মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচলিত দুইটি প্রধান রীতি—নগর ও দ্রাবিড় রীতি—গুপ্ত যুগে বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

গুপ্ত সম্রাটদের ভাস্কযকলা নিঃসন্দেহে নৈপুণ্যের উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। গুপ্ত ভাস্কর্যের দুইটি প্রধান কেন্দ্র মথুরা ও সারনাথ। বারাণসীর নিকটস্থ 'সারনাথ গুপ্ত যুগের মূর্তি ও অন্যান্য শ্রেণীর ভাস্কযের ভাণ্ডার ('treasure-house') বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদেব মধ্যে অনেকগুলি শিল্পকলার দিক হইতে খুবই উচ্চ স্তরের, এবং সমুদ্র গুপ্ত ও তাঁহাব উত্তরাধিকারীগণের সমসাময়িক। এই সকল ভাস্কযের বিষয়বস্তু বৌদ্ধ ধর্মের এবং পুরাণে বর্ণিত ঘটনাবলীর, সহিত সংশ্লিষ্ট। এখানে উভয় ধর্মের ঐতিহ্য প্রতিফলিত হইযাছে। মূর্তিসমূহের আকৃতিগত সৌন্দর্য ও মর্যাদার অভিব্যক্তি, এবং তাহাদের রূপায়ণে শিল্পীদের সংযত ও মার্জিত রুচি ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পে প্রায় তুলনাবিহীন।

বেদসা নামক স্থানে অবস্থিত গুহাগুলিতে তৃতীয় শতাব্দীতে অঙ্কিত চিত্রের চিহ্ন দেখা যায়। কান্হেরী ও ঔরঙ্গাবাদের ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত গুহাগুলিতেও চিত্রের অস্পষ্টপ্রায় চিহ্ন আছে। বাগ, অজন্তা ও বাদামীতে অধিকসংখ্যক চিত্রের অস্তিত্ব আছে। অজন্তার বিশ্ববিশ্রুত গুহাগুলি প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের অভ্যন্তরভাগ প্রাচীর চিত্রের দ্বারা সজ্জিত ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল শিল্প বিশেষজ্ঞ এই চিত্রগুলির অবিমিশ্র প্রশংসা করিয়াছেন। এই চিত্রগুলির কয়েকটি নিঃসন্দেহে গুপ্ত যুগে অঙ্কিত হইয়াছিল। বাগে (আনুমানিক ৫০০ খ্রীস্টাব্দ) ও বাদামীতে (ষষ্ঠ শতাব্দী) অঙ্কিত চিত্রগুলি বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

গুপ্ত যুগের শিল্পী ও কারিগরগণ ধাতুশিল্পে চমকপ্রদ দক্ষতার অধিকারী ছিল।

দিল্লীর লৌহনির্মিত বিখ্যাত স্তম্ভটি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া রৌদ্র ও বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও ইহাতে বিন্দুমাত্র মরিচা ধরে নাই। তামা ঢালাই করিয়া মূর্তিনির্মাণের কাজেও এই যুগের শিল্পীগণ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। গুপ্ত যুগের স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত মুদ্রাগুলি প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রানির্মাণ শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কুম্ভকারগণের শিল্পকর্মও উন্নত মানের ছিল।

বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগ

গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষ বিশ্বের অবশিষ্টাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতবর্ষ বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে চীনে প্রচারকদল প্রেরিত হইয়াছিল। চীন হইতে কয়েকজন বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী ভারতে আসিয়াছিলেন। ভারতও তাহার কয়েকজন স্বনামধন্য সন্তানকে চীনদেশে পাঠাইয়াছিল। কুমারজীব বহু বৎসর (৪০১-৪১২ খ্রীস্টাব্দ) চীনদেশের রাজধানীতে বাস করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ করিয়াছিলেন। গুণবর্মন নামে কাশ্মীরের জনৈক রাজপুত্র যবদ্বীপবাসীগণকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি চীনদেশেও গিয়াছিলেন; নানকিং শহরে তাঁহার মৃত্যু হয় (আনুমানিক ৪৩২ খ্রীস্টাব্দ)।

শিলালিপি ও সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষের সহিত মালয় উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় নাবিকদের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক উদ্যোগে এবং ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধাদের প্রচেষ্টায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া ও ঐ অঞ্চলের অন্যান্য দ্বীপে নীত হইয়াছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ও পারস্যের মধ্যে দূতবিনিময়ের একটি ঘটনা অজন্তা গুহায় চিত্রিত হইয়াছে। কুষাণ যুগে সম্ভবতঃ রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের যোগ স্থাপিত হয়; পরবর্তী কালেও তাহা অব্যাহত ছিল। রোম সাম্রাজ্যে তিনটি প্রতিনিধিদল (৩৩৬, ৩৬১ ও ৫৩০ খ্রীস্টাব্দে) প্রেরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্ত সম্রাটদের মুদ্রা রোমক প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। ভারতীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রভাবও পাশ্চাত্য দেশে দৃষ্ট হয়।

অন্যান্য দেশে ভারতীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যথেষ্ট আদর ছিল। সংস্কৃত হইতে পহ্লভী ভাষায়, এবং পহ্লভী হইতে আরবী ও সীরিয় ভাষায়, 'পঞ্চতন্ত্রে'র অনুবাদ হইয়াছিল। আরবী অনুবাদ হইতে পরবর্তী কালে পারসিক, হিব্রু, লাতিন, স্পেনীয়, ইতালীয় ও অন্যান্য কয়েকটি ইয়োরোপীয় ভাষায় এই জনপ্রিয় বইটির অনুবাদ করা হয়। গ্রীক ও ইরাণীয়গণ চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহাদের জ্ঞানের জন্য আয়ুর্বেদের নিকট ঋণী ছিলেন।

নবম অধ্যায়

গুপ্তোত্তর যুগে উত্তর ভারত

১. রাজনৈতিক ঐক্যের অবসান

হূণগণ এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউং-নু জাতি উত্তর-পশ্চিম চীন হইতে ইউ-চি জাতিকে বিতাড়িত করে। ভারতীয় সাহিত্যে ও শিলালিপিতে হিউং-নু জাতি হূণ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার কিছুকাল পরে হূণগণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। হূণদের একটি শাখা ধীরে ধীরে ইয়োরোপে আসিয়া উপনীত হয়, এবং রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। অপর একটি শাখা খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে অক্ষু নদীর উপত্যকায় শিবির স্থাপন করে। ইহারা শ্বেত হূণ (Ephthalites) নামে পরিচিত। স্কন্দ গুপ্তের রাজত্বকালের প্রথমদিকে (৪৬০ খ্রীস্টাব্দে) তাহারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণ করে, কিন্তু স্কন্দ গুপ্ত তাহাদের প্রতিহত করেন। ভারতবর্ষে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা ক্রমশঃ কাবুল ও পারস্য অধিকার করে এবং ৪৮৪ খ্রীস্টাব্দে তাহারা পারস্যের সাসানীয় নৃপতি ফিরোজকে হত্যা করে। পারস্য জয়ের পরে হূণদের শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং তাহারা একটি বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করে। ইহার রাজধানী ছিল বল্‌খ।

স্কন্দ গুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হইয়া পড়িল। হূণগণ আবার ভাবতবর্ষ আক্রমণ করিল। তাহাদের প্রথম প্রসিদ্ধ দলপতি ছিলেন তোরমান। একাধিক শিলালিপিতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলির একটি বৃহৎ অংশ তিনি জয় করেন। উত্তর প্রদেশের কোন কোন অংশে, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে তাঁহার শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বোধ হয় তাঁহার অধিকার মধ্য মালব পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ভানু গুপ্ত তাঁহাকে পরাজিত করেন।

তোরমানের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মিহিরকুল বা মিহিরগুল নৃশংস এবং বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মদ্বেষী ছিলেন; তিনি বৌদ্ধদের বহু স্তূপ ও বিহার ধ্বংস করেন। তাঁহার শাসন গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ৫৩৩ খ্রীস্টাব্দের কিছু পূর্বে তিনি মান্দাসোরের অধিপতি যশোধর্মন কর্তৃক পরাজিত হন। কিন্তু এই পরাজয়ের ফলে তাঁহার শক্তি বিনষ্ট হয় নাই; যশোধর্মনের মৃত্যুর পর তিনি হৃত প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন। পরে তিনি পুনরায় নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হন। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুসারে কনৌজের মৌখরী-

রাজ ঈশানবর্মন হূণদমনে বালাদিত্যকে সহায়তা করেন। সম্ভবতঃ বালাদিত্যের বিজয়ের ফলে মধ্য ভারত হূণ-শাসন হইতে মুক্তি লাভ করে এবং এই অঞ্চলে গুপ্তগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাজিত মিহিরকুল কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের শাকল (শিয়ালকোট) তাঁহার রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার রাজত্বের অবসান হয়।

মিহিরকুলের মৃত্যুর পরে উপযুক্ত নেতার অভাবে হূণগণের প্রাধান্যের অবসান হয়। তবে শিলালিপি ও সাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাহারা ভারতীয় রাজগণকে উত্যক্ত করিয়াছে।

হূণদিগের হিন্দু সমাজে অন্তর্ভুক্তি

সম্ভবতঃ হূণগণ ধীরে ধীরে আক্রান্ত অঞ্চলের ধর্ম ও ভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজে মিশিয়া যায়। মেবারের একজন গুহিলোত শাসক এবং একজন কলচুরিরাজ হূণ রাজকুমারীগণকে বিবাহ করেন। পরমার রাজ্যের মধ্যে একটি 'হূণমণ্ডল' ছিল। গুর্জর প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল বৈদেশিক জাতি হূণগণের সহিত, অথবা তাহাদের পরে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহারাও পরিণামে ভারতীয় জনগণের মধ্যে মিশিয়া যায়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্বর জাতিগুলির অনুপ্রবেশ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে পরিবর্তনের দিকচিহ্ন। রাজনৈতিক ভাবে তাহারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের এবং সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তির অন্যতম কারণ হইয়াছিল। সামাজিক দিক হইতে তাহারা একটি বিপ্লবের সূচনা করে, যাহার ফলে তথাকথিত ক্ষত্রিয় রাজপুতদের উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে একাধিক শিলালিপি ও সাহিত্যকীর্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে হূণগণ মধ্যযুগের প্রারম্ভে পাঞ্জাব-রাজস্থান-গুজরাট-মালব অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বলভীর মৈত্রকরাজগণ

গুপ্ত শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যে সকল প্রদেশ বিদ্রোহ করে তাহাদের মধ্যে সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়) অন্যতম। এই রাজ্যের শাসকগণ ছিলেন মৈত্রক গোষ্ঠী-ভুক্ত। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ভটার্ক। তাঁহার রাজধানী ছিল বলভীতে। সপ্তম শতাব্দীতে দ্বিতীয় ধ্রুবসেন কনৌজরাজ হর্ষের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী চতুর্থ ধ্রুবসেন আড়ম্বরপূর্ণ সম্রাট মর্যাদাজ্ঞাপক উপাধি ধারণ করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজত্বকালেই কবি ভট্টি 'ভট্টিকাব্যম্' বা 'রাবণবধম্' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যটি রচনা করেন। সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে বলভী বিদ্যাচর্চার একটি

প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে সিন্ধু প্রদেশের আরবগণ এই রাজ্যটির অবসান ঘটায়।

মান্দাসোরের যশোধর্মণ

মান্দাসোর গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি-শাসিত প্রধান প্রদেশগুলির অন্যতম ছিল। যশোধর্মন গুপ্ত সম্রাটদের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং নিজ জয় ঘোষণার জন্য বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। ৫৩৩ খ্রীস্টাব্দের একটি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে, পূর্বে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদ হইতে পশ্চিমে মহাসাগর (পশ্চিম পয়োধি) এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে পূর্বঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসকগণ যশোধর্মনের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ের এই গতানুগতিক বর্ণনা সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ সত্য নয়; সম্রাটের মর্যাদায় তাঁহার দাবি স্বীকার করা যায় না। তাঁহার ক্ষমতা স্বল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। মিহিরকুলের পরাজয় তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক কীর্তি।

কনৌজের মৌখরী বংশ

মৌখরীগণ সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় ছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর তাঁহারা উত্তর ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। এই রাজবংশটি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বিশেষতঃ কনৌজ অঞ্চলে, রাজত্ব করিত। এই বংশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শাসক ঈশানবর্মন (আনুমানিক ৫৫৪ খ্রীস্টাব্দ) অন্ধ্র, উড়িষ্যাবাসী শূলিক, এবং গৌড় জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করেন। তিনি সম্রাট মর্যাদা জ্ঞাপক উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মৌখরী ও 'পরবর্তী' গুপ্ত বংশীয়দের মধ্যে এক দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দ্বের সূচনা হয় এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মৌখরী শক্তির পতনের সঙ্গে উহার অবসান হয়। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধন প্রথমে 'পরবর্তী গুপ্ত'গণের মিত্র ছিলেন। পরে তিনি নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর সহিত মৌখরী রাজপুত্র গ্রহবর্মনের বিবাহ দিয়া মৌখরীগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। থানেশ্বর ও কনৌজের এই মিত্রতার পর মালবের সমসাময়িক 'পরবর্তী' গুপ্ত বংশীয় শাসক দেব গুপ্ত গৌড়রাজ শশাঙ্কের সহিত সন্ধি করেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর দেব গুপ্ত ও শশাঙ্ক সম্ভবতঃ যৌথভাবে মৌখরীগণের রাজধানী আক্রমণ করিয়া উহা ধ্বংস করেন। গ্রহবর্মন নিহত হন, রাজ্যশ্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এই দুর্বিপাকের ফলে মৌখরী রাজ্য থানেশ্বর রাজ্যের সহিত যুক্ত হয়।

'পরবর্তী' গুপ্তরাজগণ (Later Guptas)

মৌখরীগণের ন্যায় তথাকথিত 'পরবর্তী' গুপ্তরাজগণও প্রথমে গুপ্ত সম্রাটগণের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাঁহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

সম্ভবতঃ প্রথম হইতেই তাঁহারা মগধ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু অনেকে বলেন, তাঁহাদের শাসন প্রথমে মালবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে মগধে প্রসার লাভ করে। ক্রমে 'পরবর্তী' গুপ্তগণ গৌড় ও মগধে রাজ্যস্থাপন করেন। মালবও তাঁহাদের অধীন ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের যে সকল অংশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয় নাই, গুপ্তদের উত্তরাধিকারী রূপে সেই সকল অংশ ইঁহাদের অধিকারে আসে। কিন্তু ইঁহাদের নামের সঙ্গে 'গুপ্ত' শব্দটি যুক্ত থাকিলেও ইঁহারা যে গুপ্তবংশীয় সম্রাট-দের বংশোদ্ভূত তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাঁহাদের সভাকবিগণও তাঁহাদের গুপ্তবংশীয় বলিয়া দাবি করেন নাই।

এই বংশের প্রথম শক্তিশালী ও স্বাধীন শাসক ছিলেন সম্ভবতঃ কুমার গুপ্ত। তিনি মৌখরীরাজ ঈশানবর্মনকে পরাজিত করিয়া প্রয়াগ (এলাহাবাদ) পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। মহাসেন গুপ্ত কামরূপের (পশ্চিম আসাম) অধিপতি সুস্থিতবর্মনকে পরাজিত করেন এবং মালব জয় করেন। বলভীর মৈত্রকগণ এবং মধ্য ভারতের কলচুরিগণ তাঁহার শক্তিশালী শত্রু ছিলেন। পূর্ব দিকে গৌড়ে শশাঙ্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সম্ভবতঃ বিপর্যয়ের মধ্যে মহাসেন গুপ্তের জীবনের অবসান ঘটে এবং তাঁহার পুত্রগণ থানেশ্বরের রাজসভায় আশ্রয় লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম মাধব গুপ্ত হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে মগধের অধিপতি হন। তাঁহার পুত্র আদিত্যসেন সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সম্রাট মর্যাদা জ্ঞাপক উপাধি ধারণ করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। মৌখরীগণের এবং নেপালের রাজবংশের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে 'পরবর্তী' গুপ্তরাজগণের ক্ষমতা লোপ পায়।

মালবের দেব গুপ্ত মৌখরী ও পুষ্যভূতিগণের শত্রু ছিলেন। তিনি 'পরবর্তী' গুপ্তরাজগণের কোন জ্ঞাতি-শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। থানেশ্বরের রাজ্যবর্ধন কর্তৃক তিনি নিহত হন।

গৌড় (বঙ্গদেশ)

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গৌড় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে বঙ্গদেশ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

গৌড়ের (উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ) রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন শশাঙ্ক। তিনি থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের এবং কনৌজের মৌখরী বংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী রাজগণ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এমন কি, তিনি কোন বংশোদ্ভূত ছিলেন তাহাও আমরা জানি না। তাঁহার রাজ্য

লাভের বহু পূর্বে 'পরবর্তী' গুপ্তগণের অধীনে গৌড় মৌখরীগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। সম্ভবতঃ আদিতে তিনি 'পরবর্তী' গুপ্তগণের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন, মহাসেন গুপ্তের ক্ষমতা হ্রাসের পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যাহা হউক, 'পরবর্তী' গুপ্তগণ ও মৌখরীগণের শত্রুতা শশাঙ্ককে পশ্চিম দিকে রাজ্য বিস্তারের সুবর্ণসুযোগ আনিয়া দেয়। মৌখরীগণের শত্রু মালবরাজ দেব গুপ্তের সহিত সন্ধি করিয়া শশাঙ্ক তাঁহার সহিত যুক্তভাবে কনৌজ আক্রমণ করেন। মৌখরীরাজ গ্রহবর্মন নিহত হন এবং তাঁহার মহিষী, থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের কন্যা, রাজ্যশ্রী কনৌজের এক কারাগারে আবদ্ধ হন। প্রভাকরবর্ধনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রাজ্যবর্ধন ভগিনীর উপর অবিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য এক বিশাল সৈন্য-বাহিনী লইয়া অগ্রসর হন। তিনি দেব গুপ্তকে পরাজিত করেন; কিন্তু শশাঙ্ক, সম্ভবতঃ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তাঁহাকে হত্যা করেন (৬০৬ খ্রীস্টাব্দ)। এই বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী পাওয়া যায় পুষ্যভূতি বংশের প্রতি সহানুভূতিশীল 'হর্ষচরিত' রচয়িতা বানভট্ট এবং হিউয়েন সাঙ—এই দুইজন লেখকের রচনায়। অতএব ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। শশাঙ্ক কনৌজ জয় করিলেও দীর্ঘকাল তাহা নিজ অধিকারে রাখিতে পারেন নাই।

রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং উত্তরাধিকারী হর্ষবর্ধন স্বভাবতঃই ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শশাঙ্কের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিশদ বিবরণ জানা যায় না। হর্ষ কামরূপের অধিপতি ভাস্করবর্মনের সহিত সন্ধি করেন। একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (চিরুটি, মুর্শিদাবাদ জেলা, পশ্চিম বঙ্গ) কিছুকাল কামরূপরাজের অধীনে ছিল। সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণের যে অধিপতিকে ভাস্করবর্মন পরাজিত করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন শশাঙ্কের একজন উত্তরাধিকারী। আর একটি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে কামরূপের দুইজন রাজপুত্র—সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মন এবং ভাস্করবর্মন—গৌড়ের সেনাবাহিনী কর্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন, কিন্তু পরে গৌড়রাজ নিজের অধীন সামন্ত রূপে তাঁহাদের কামরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই গৌড়রাজ ছিলেন শশাঙ্ক স্বয়ং।

৬১৯ এবং ৬৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। ইহা নিশ্চিত যে হর্ষ তাঁহার ক্ষমতা খর্ব করিতে পারেন নাই। পূর্ব উপকূলে উড়িষ্যায় গঞ্জাম পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পুষ্যভূতি বংশের পক্ষপাতী কিংবদন্তীতে শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মদ্বেষী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু এই অভিযোগের সপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

২. হর্ষবর্ধন

পুষ্যভূতি রাজবংশের আদি ইতিহাস

সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন প্রভাকরবর্ধন। কথিত আছে, তিনি গুর্জরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং মালব ও গুজরাট পর্যন্ত নিজ প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি 'পরবর্তী' গুপ্তরাজ মহাসেন গুপ্তের মিত্র ছিলেন। তাঁহার শাসনকালের শেষের দিকে তিনি কনৌজের মৌখরী বংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে মিত্রতা স্থাপন করেন। মৌখরী রাজপুত্র গ্রহবর্মনের সঙ্গে তাঁহার কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। এই ভাবে উত্তর ভারতে একটি প্রবল রাজনৈতিক শক্তিসমবায়ের উদ্ভব হয়। এই শক্তিসমবায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মালবরাজ দেব গুপ্ত এবং গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৈত্রীসূত্রে গঠিত আর একটি শক্তিসমবায়।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পরে সিংহাসন লাভ করেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন। দেব গুপ্ত এবং শশাঙ্ক মিলিত ভাবে কনৌজ আক্রমণ করেন এবং গ্রহবর্মন ও রাজ্যবর্ধন নিহিত হন (৬০৬ খ্রীস্টাব্দ)। একই সময়ে দুই জনের মৃত্যুর ফলে কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসন শূন্য হয়।

হর্ষের প্রথম জীবন

৬০৬ খ্রীস্টাব্দের বিপর্যয়ের পরে রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বৎসর হইতে 'হর্ষাব্দ' গণনা করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও এই অব্দ প্রচলিত ছিল।

রাজকীয় ক্ষমতা অর্জনের পর হর্ষের প্রথম কর্তব্য হইল কনৌজের কারাগার হইতে ভগ্নী (গ্রহবর্মনের স্ত্রী) রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করা। তিনি এক বিশাল বাহিনী লইয়া কনৌজ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কামরূপের (পশ্চিম আসামের) অধিপতি ভাস্করবর্মণের সহিত তাঁহার এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এই দক্ষ কূটনৈতিক চালের ফলে শশাঙ্ক পূর্ব ও পশ্চিম, দুই দিক হইতেই আক্রমণের সম্মুখীন হইলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিন্ধ্য পর্বতের অরণ্যাঞ্চলে গমন করেন। বহু অনুসন্ধানের পর হর্ষ যখন রাজ্যশ্রীর সন্ধান পাইলেন তখন তিনি তাঁহার সহচরীগণের সহিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন। হর্ষ এবং সম্ভবতঃ তাঁহার মিত্র কামরূপরাজের আক্রমণের ভয়ে শশাঙ্ক কনৌজ পরিত্যাগ করেন।

কবে এবং কিরূপে হর্ষ কনৌজের সিংহাসন লাভ করেন তাহা জানা যায় না। হিউয়েন সাঙের মতে, মৌখরী রাজ্যের মন্ত্রিগণের অনুরোধে হর্ষ কনৌজের সিংহাসন

গ্রহণ করেন। গ্রহবর্মনের মৃত্যুর পরে কনৌজের সিংহাসনের কোন উত্তরাধিকারী অবশিষ্ট ছিল না, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক হিউয়েন সাঙের বক্তব্যকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শিলালিপি হইতে জানা যায় যে গ্রহবর্মনের মৃত্যুর পরে মৌখরী বংশীয় একজন রাজা কনৌজে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ হর্ষের সিংহাসন লাভ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে হয় নাই। হয়ত তিনি রাজ্যশ্রীর নামে সিংহাসন দাবি করেন এবং তাঁহার প্রতিভূ হিসাবে কিছুকাল রাজ্য শাসন করেন। পরে ৬১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রকাশ্যে রাজক্ষমতা গ্রহণ করেন।

হর্ষের বিজয় অভিযান

'হর্ষচরিতে' বানভট্ট লিখিয়াছেন যে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হর্ষ 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে…পৃথিবীকে গৌড়শূণ্য' করিবার (অর্থাৎ শশাঙ্ককে ধ্বংস করিবার) শপথ গ্রহণ করেন এবং তাহার কয়েক দিন পরে তিনি 'চতুর্দিক জয়ের' জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের পর হর্ষের শিবিরে প্রত্যাবর্তনেই বানভট্টের বিবরণ সমাপ্ত হইয়াছে। শশাঙ্কের সহিত হর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তাঁহার অন্যান্য সামরিক অভিযানের কোন বিবরণ বানভট্ট লিপিবদ্ধ করেন নাই। হিউয়েন সাঙ হর্ষের দিগ্বিজয়ের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা ধোঁয়াটে রকমের সাধারণ কাহিনী মাত্র। কাজেই হর্ষের রাজ্যজয়ের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না।

ভাস্করবর্মনের সহিত হর্ষের মিত্রতা সত্ত্বেও শশাঙ্ক অন্ততঃ ৬১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ ইহার বহুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়, কারণ ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে হিউয়েন সাঙ তাঁহার মৃত্যুকে সাম্প্রতিক ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই হর্ষ মগধ, গৌড়, উড়িষ্যা এবং কোঙ্গোদ (উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা) অধিকার করেন। জনৈক চীনদেশীয় লেখকের মতে তিনি ৬৪১ খ্রীস্টাব্দে 'মগধরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন।

পশ্চিমে হর্ষ বলভীর অধিপতি দ্বিতীয় ধ্রুবসেনকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ বলভী তাঁহার সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়। হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন যে বলভীর রাজা হর্ষের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণে হর্ষ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। যুদ্ধ কোথায় হইয়াছিল, এবং হর্ষ নর্মদা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় না। উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত শাসককে প্রতিহত করিয়া চালুক্যগণ বিশেষ গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারা হর্ষকে 'সকলোত্তরাপথনাথ' (সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু হর্ষ কখনও সমগ্র উত্তরাপথের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন না।

বানভট্ট এবং হিউয়েন সাঙ, উভয়েই সিন্ধু প্রদেশের সহিত হর্ষের সম্বন্ধের

উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি এই প্রদেশটি আক্রমণ করেন, কিন্তু উহা জয় করিতে পারেন নাই।

সমসাময়িক শিলালিপির সাক্ষ্য এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে উত্তর ভারতের অধিকাংশও হর্ষের শাসনাধীন ছিল না। সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চল, প্রায় সমগ্র উত্তর প্রদেশ, বিহার, বঙ্গদেশের কিছু অংশ, এবং কোঙ্গোদ (গঞ্জাম) সহ উড়িষ্যায় তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়) এবং কামরূপ (আসাম) তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। উত্তর ভারতের সমসাময়িক সকল শাসকই তাঁহার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রাচীন ভারতের শেষ সাম্রাজ্য-সংস্থাপক বলিয়া ধারণা করিবার কোন কারণ নাই।

চীনের সহিত সম্পর্ক

হর্ষ চীনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। ৬৪১ খ্রীস্টাব্দে তিনি চীনের তাঙ বংশীয় সম্রাট তাই-স্থঙের নিকট একজন ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ করেন। পরে চীনা দূতগণ তিন বার তাঁহার রাজসভায় আসিয়াছিলেন।

হিউয়েন সাঙ

প্রসিদ্ধ চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ হর্ষের রাজত্বকালে ভারতে আসিয়াছিলেন। ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে, তিনি যাত্রা শুরু করেন, এবং তাসখন্দ ও সমরকন্দের পথে ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে গান্ধারে আসেন। ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারত ত্যাগ করেন এবং কাশগড়, ইয়ারখন্দ এবং খোটান হইয়া চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি এই দেশ ও ইহার স্থাপত্যকীর্তি, জনগণ এবং ধর্ম সম্বন্ধে বহু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এজন্য তিনি 'ভারতের পসানিয়াস' (ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক হিসাবে খ্যাত প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকার Pausanias) বলিয়া অভিহিত হওয়ার যোগ্য। হর্ষের রাজ্যে তিনি প্রায় আট বৎসর (৬৩৫ -৬৪৩ খ্রীস্টাব্দ) বাস করিয়া তাঁহার বন্ধুত্ব অর্জন করেন। তাঁহার বিবরণী হর্ষের রাজত্বকালের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় তথ্যের ভাণ্ডার, কিন্তু হর্ষের সামরিক অভিযানগুলি সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা বিশদ নহে। ভারতের ঐতিহাসিকগণ হিউয়েন সাঙের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী।

হর্ষের শাসন-ব্যবস্থা

হর্ষ একজন প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তাঁহার বিশাল রাজ্যের বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা তিনি নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। হিউয়েন সাঙ বলেন, 'তিনি ছিলেন অক্লান্ত, এবং দিনগুলি তাঁহার কাজের তুলনায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল।'

তিনি রাজ্যের সকল অঞ্চল পরিদর্শন করিতেন ; কোথাও দীর্ঘ দিন অবস্থান করিতেন না। তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য সম্ভবতঃ একটি মন্ত্রী-পরিষদ ছিল। রাজপ্রতিনিধি বা সামন্ত রাজগণ দূরবর্তী প্রদেশগুলি শাসন করিতেন। এই শাসকেরা সম্ভবতঃ খুব দক্ষ ছিলেন। প্রতিটি প্রদেশ বা 'ভুক্তি' কয়েকটি 'বিষয়' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। স্বভাবতঃই গ্রামগুলি ছিল শাসন-ব্যবস্থার সর্বনিম্ন কেন্দ্র। রাজস্বের হার খুব কম ছিল। কৃষকেরা তাহাদের উৎপাদনের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে দিত। দণ্ডবিধি গুপ্ত যুগের তুলনায় কঠোর ছিল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, নির্বাসন এবং অঙ্গচ্ছেদ ছিল সাধারণ শাস্তি। লঘু অপরাধের জন্য সাধারণতঃ অর্থদণ্ড হইত। সময় সময় অগ্নি, জল প্রভৃতি দ্বারা অপরাধীর নির্দোষিতা পরীক্ষা করা হইত। দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্ত্বেও গুপ্ত যুগের তুলনায় এই সময় অপরাধ বেশী হইত। কিন্তু হিউয়েন সাঙ ভারতীয়দের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তাহারা অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ করে না, এবং যাহা দেওয়া উচিত তদপেক্ষা বেশী দেয়। তাহারা অপরের পাপের শাস্তি দেখিয়া ভীত হয় এবং তাহাদের কাজকর্ম ইহলোকে কতখানি ফল দেয় সেদিকে দৃষ্টি দেয় না। তাহারা প্রবঞ্চনা করে না এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে।" হর্ষের বহু শতাব্দী পূর্বে মেগাস্থিনিস যাহা লিখিয়াছিলেন, হিউয়েন সাঙের বিবৃতি যেন তাহারই প্রতিধ্বনি।

হর্ষের শাসনে কনৌজ

হর্ষের শাসনে কনৌজ পাটলিপুত্রের গৌরব হরণ করিয়া উত্তর ভারতের প্রধান নগরে পরিণত হয়। হিউয়েন সাঙ বলেন যে এই শহরটি ছিল বেশ বড় (দৈর্ঘ্যে ৫ মাইল এবং প্রস্থে ১½ মাইল), সুরক্ষিত এবং সুন্দর। এখানে একশত বৌদ্ধ বিহার এবং প্রায় দুইশত দেবমন্দির ছিল।

৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে কনৌজে যে মহাসম্মেলন হয়, চীনা পর্যটক তাহার একটি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। কুড়ি জন রাজা এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মাবলম্বী অগণিত পুরোহিত ও শাস্ত্রবিদ এই সম্মেলনে যোগ দেন। হিউয়েন সাঙ ও ভাস্করবর্মনের সহিত হর্ষ তাঁহার শিবির হইতে গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া অগ্রসর হন। গন্তব্যস্থলে উপনীত হইলে বহু রাজা ও ধর্মগুরু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। হস্তিপৃষ্ঠে বাহিত বুদ্ধের একটি স্বর্ণময় প্রতিমূর্তি লইয়া একটি শোভাযাত্রার দ্বারা সম্মেলন শুরু হয়। শোভাযাত্রা শেষ হইলে হর্ষ সেই মূর্তিকে পূজা করেন এবং জনগণের জন্য ভোজ দেন। তারপর সম্মেলন শুরু হয় এবং হিউয়েন সাঙ মহাযান ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রতি হর্ষ অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করায় ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হন এবং হিউয়েন সাঙ্‌কে হত্যা করিবার জন্য একজন গুপ্ত-ঘাতক নিয়োগ করেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রধান অপরাধীরা শাস্তি পায় ; এবং অন্যান্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয়

প্রয়াগে পঞ্চবার্ষিক দানোৎসব

প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তে হর্ষ প্রয়াগে (এলাহাবাদ) গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে একটি ভাবগম্ভীর উৎসবের আয়োজন করিতেন। কনৌজের সম্মেলন শেষ হইলে হর্ষ হিউয়েন সাঙকে প্রয়াগে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উৎসব দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করেন (৬৪৩ খ্রীস্টাব্দ)। প্রথম দিনে একটি অস্থায়ী চৈত্যে বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করিয়া ভক্তির নিদর্শন রূপে উৎসর্গ করা মূল্যবান দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে সূর্য ও শিবের উপাসনা করা হইত, কিন্তু এই দুই দিনে যে সকল উপহার বিতরণ করা হইত তাহা প্রথম দিনের দ্রব্যাদির তুলনায় কম মূল্যবান। চতুর্থ দিনে ১০,০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে উপহার দেওয়া হইত। পরবর্তী কুড়ি দিন ধরিয়া ব্রাহ্মণগণকে উপহার দেওয়া হইত। তারপর দশ দিন ধরিয়া জৈন ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপহার দেওয়া হইত। তারপর দশ দিন ভিখারীদের ভিক্ষা দেওয়া হইত। তারপর একমাস ধরিয়া দরিদ্র, অনাথ এবং নিঃসম্বলগণকে দান করা হইত। এই ভাবে গত পাঁচ বৎসরে সঞ্চিত সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষ হইয়া যাইত। তখন হর্ষ তাঁহার ব্যক্তিগত রত্নগুলি ও অন্যান্য সামগ্রী দান করিতেন। তারপর রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে একখানি পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া লইয়া তাহাই পরিধান করিয়া তিনি দশ অঞ্চলের বুদ্ধের পূজা করিতেন। ভারতের ইতিহাসে দয়া ও দানের এতবড় দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না।

হর্ষের ধর্ম

হর্ষের পূর্বপুরুষগণ সূর্যের উপাসক ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার রাজত্বকালের অন্ততঃ প্রথম পঁচিশ বৎসর হর্ষ শিবের উপাসক ছিলেন। শেষ জীবনে, সম্ভবতঃ তাঁহার ভগ্নী রাজ্যশ্রীর প্রভাবে, তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। হিউয়েন সাঙের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্তনের আংশিক কারণ হইতে পারে। কথিত আছে, তিনি বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করেন। ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তিনি প্রতি বৎসর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক সম্মেলন আহ্বান করিতেন। তিনি পশুহত্যা নিষিদ্ধ করেন। অশোকের ন্যায় তিনিও দরিদ্র সহায়সম্বলহীন ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। কনৌজের ধর্মসম্মেলনে তিনি মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিনি কখনও বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। প্রয়াগের উৎসবে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শিব এবং আদিত্যকে (সূর্য) উপাসনা করিতেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে তখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল, যদিও চীনা পর্যটক এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। কেবলমাত্র উত্তর বিহার, উত্তর বঙ্গ এবং সমতট (পূর্ব বঙ্গ)

ভিন্ন অন্যত্র জৈন ধর্ম জনপ্রিয় ছিল না। সেই সময়ে প্রধান ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম, এবং প্রধান দেবতা ছিলেন আদিত্য, শিব এবং বিষ্ণু।

নালন্দা

হর্ষ অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। হিউয়েন সাঙ বলেন যে রাজকীয় জমি-জমার আয়ের এক-চতুর্থাংশ বিদ্বান ও সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইত। বৌদ্ধদের বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দায় হর্ষ প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ নালন্দায় কয়েক বৎসর বিদ্যাচর্চা করিয়াছিলেন। চীনা পর্যটক বলেন, "ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সহস্রাধিক ছিল, কিন্তু নালন্দার মত জাঁকজমকপূর্ণ প্রতিষ্ঠান একটিও ছিল না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্বন্ধীয় বহু বিষয়ে দশ সহস্র ছাত্র শিক্ষা লাভ করিত। শতাধিক পাদপীঠ হইতে প্রতিদিন শিক্ষাদান করা হইত। রাজগণ বংশ পরম্পরায় এখানে যে কেবল বিশাল বিশাল আবাসিক অট্টালিকা ও শিক্ষাভবন নির্মাণ করাইয়া দিতেন তাহা নহে, সেই অগণিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই সরবরাহ করিতেন। এই উদ্দেশ্যে এক শত গ্রামের রাজস্ব দান করা হইয়াছিল, এবং এই সকল গ্রামের দুই শত গৃহের প্রধান পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন ইহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিতেন। নালন্দার শিক্ষকগণ উচ্চ ক্ষমতা ও ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান শীলভদ্র সমতট বা পূর্ব বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বদা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় ব্যস্ত থাকিত। 'গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও সমাধানের জন্য সমগ্র দিবসও যথেষ্ট মনে হয় না। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত তাঁহারা আলোচনায় মগ্ন থাকেন; বৃদ্ধ ও যুবা সেই আলোচনায় পরস্পরকে সাহায্য করেন'।

সাহিত্যচর্চা

হর্ষ সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষক, এবং স্বয়ং খ্যাতিমান কবি ছিলেন। 'হর্ষচরিত' এবং 'কাদম্বরী' রচয়িতা বানভট্ট তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করেন। 'হর্ষচরিতে' হর্ষের রাজত্বের প্রথম দিকের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। 'কাদম্বরী' নামক কাব্যধর্মী উপন্যাসটি সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। হর্ষ নিজে 'প্রিয়দর্শিকা', 'নাগানন্দ' এবং 'রত্নাবলী' নামে তিনখানি প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করেন।

হর্ষের মৃত্যুর ফলাফল

৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে হর্ষের মৃত্যু হয়। তাঁহার খ্যাতি তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল লেখকদ্বয়ের—বানভট্ট ও হিউয়েন সাঙের—রচনার উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল। কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং শান্তির সময়ে নিজের কৃতিত্ব প্রমাণিত

করিয়াছেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে উত্তর ভারত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অল্প কালের জন্য হইলেও হর্ষ উত্তর ভারতের অধিকাংশে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন।

তাঁহার সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর পর স্থায়ী হয় নাই। তিনি কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই। তাঁহার সাম্রাজ্যের সামরিক ও বেসামরিক সংগঠন এত শক্তিশালী ছিল না যে তাহা উহার প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরেও অটুট থাকিতে পারে। সম্ভবতঃ অর্জুন নামে তাঁহার কোন মন্ত্রী কনৌজের সিংহাসন অধিকার করেন। তিব্বতের পরাক্রান্ত রাজা স্ট্রং-সান-গাম্পো হর্ষের সিংহাসন অপহরণকারীকে শাস্তি দিবার জন্য এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। অর্জুন বন্দী হইলেন। ত্রিহুত বা উত্তর বিহার তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই অঞ্চল ৭০৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিব্বত-রাজগণের অধীনে ছিল। উত্তর ভারত পুনরায় রাজনৈতিক ঐক্য হারাইয়া ফেলিল।

৩. হর্ষের পরে উত্তর ভারত

কনৌজ

হর্ষের মৃত্যুর পরবর্তী প্রায় ৭৫ বৎসরের কনৌজের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ যশোবর্মন নামে একজন সমরনায়ক আনুমানিক ৭০০ হইতে ৭৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কনৌজের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার সঠিক বংশ পরিচয় জানা যায় না। চৈনিক সূত্রে জানা যায়, ৭৩১ খ্রীস্টাব্দে 'মধ্য ভারতের রাজা' তাঁহার মন্ত্রীকে চীনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনিই যশোবর্মন। এই মন্ত্রী প্রেরণের উদ্দেশ্য বা ফলাফল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। যশোবর্মনের জনৈক সভাকবি বাক্‌পতির রচনায় বলা হইয়াছে যে তিনি গৌড়রাজকে পরাজিত করেন এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে রাজ্যজয় করেন। 'গৌড়বহ' নামক বাক্‌পতি-রচিত প্রসিদ্ধ প্রাকৃত গ্রন্থে বর্ণিত যশোবর্মনের এই দিগ্বিজয়ের কাহিনী সত্য ঘটনা, অথবা চিরাচরিত প্রথায় গুণবর্ণনা মাত্র, তাহা বলা কঠিন। যশোবর্মন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ভবভূতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভবভূতি-রচিত 'উত্তর রামচরিত' সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যশোবর্মনের পরিণতি দুঃখজনক হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে কনৌজে একটি ক্ষুদ্র রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের রাজগণের নামের শেষে 'আয়ুধ' শব্দটি যুক্ত থাকিত। বঙ্গদেশের রাজা ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া নিজ আশ্রিত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন গুর্জর-প্রতিহার বংশীয়

দ্বিতীয় নাগভট। কথিত আছে, তিনি নিজ রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। এইরূপে হর্ষের এই নগরী অধিকারের জন্য বঙ্গদেশের পাল রাজগণ এবং গুর্জর-প্রতিহারগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়।

কাশ্মীর

কাশ্মীর উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আপন স্বাতন্ত্র্যে গড়িয়া উঠিবার পক্ষে অধিকতর অনুকূল হইলেও এই অঞ্চলকে ভারতের মূল ঐতিহাসিক প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। কাশ্মীর নিঃসন্দেহে মৌর্য ও কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু গুপ্ত সম্রাটগণ এই সুদূরবর্তী অঞ্চলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কহ্লন রচিত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'রাজতরঙ্গিনী' কাশ্মীর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের প্রধান উৎস। তাহাতে দেখা যায় যে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে দুর্লভবর্ধন কাশ্মীরে কর্কোট বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ কাশ্মীর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

এই বংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত শাসক ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (আনুমানিক ৭২৪ হইতে ৭৬০ খ্রীস্টাব্দ) তিব্বতীয়দের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। অক্ষু নদীর উপত্যকার উত্তরাংশ পর্যন্ত তাঁহার সামরিক প্রভাব প্রসারিত হয়। তিনি কনৌজরাজ যশোবর্মনকে পরাজিত করেন। পাঞ্জাবের কিছু অংশও তিনি অধিকার করেন। কথিত আছে, তাঁহার আক্রমণে পূর্ব ভারত (মগধ, বঙ্গদেশ, কামরূপ এবং উড়িষ্যা) বিপর্যস্ত হয়; দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া তিনি চালুক্য বংশের দর্প খর্ব করেন; মালব ও গুজরাট তিনি অধিকার করেন এবং সিন্ধু প্রদেশবাসী আরবগণকে পরাজিত করেন। এই সকল কাহিনী সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে নিঃসন্দেহে কাশ্মার উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ললিতাদিত্য চীন সম্রাট হিউয়েন সাঙের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার এবং হিন্দু মন্দির নির্মাণ করেন। ইহাদের মধ্যে সূর্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বিশাল মার্তণ্ড মন্দিরটি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পরে কয়েকজন অকর্মণ্য রাজা কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারা কাশ্মীরের ক্ষমতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। ললিতাদিত্যের পৌত্র বিনয়াদিত্য জয়াপীড় (আনুমানিক ৭৭৯-৮১০ খ্রীস্টাব্দ) কর্কোট বংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি কনৌজের এক রাজাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসনচ্যুত করেন। সম্ভবতঃ ইনি ছিলেন ইন্দ্রায়ুধ অথবা তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী শাসক। কহ্লন বলেন যে বিনয়াদিত্য নেপাল এবং উত্তর বঙ্গে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বক্তব্যের ঐতিহাসিক মূল্য

সন্দেহাতীত নয়। বিনয়াদিত্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎপল বংশ কর্কোট বংশের স্থান অধিকার করে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা অবন্তীবর্মন কৃষির উন্নতির জন্য সেচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী শঙ্করবর্মন গুর্জর-প্রতিহারগণের নিকট হইতে পাঞ্জাবের এক অংশ অধিকার করেন। কিন্তু শাসকগণের অত্যাচারের ফলে রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজবংশের পতন হয়। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দিদ্দা নামে একজন ব্যক্তিত্বময়ী রাণী কাশ্মীর শাসন করিতেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী, লোহর বংশের প্রতিষ্ঠাতা, সংগ্রামরাজের রাজত্ব কালে গজনীর সুলতান মামুদ উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহী রাজ্য অধিকার করেন। আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের ফলে কাশ্মীর ঐতিহাসিক গৌরব হারাইয়া বিস্মৃতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তবে ১৩৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

কনৌজের গুরুত্ব

হর্ষের রাজত্বকালে কনৌজ উত্তর ভারতের প্রধান নগর হইয়া দাঁড়ায় এবং রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র রূপে পাটলিপুত্রের স্থান অধিকার করে। "পশ্চিম এশিয়ার যোদ্ধা জাতিগুলির নিকট ব্যাবিলনের যে স্থান ছিল, বর্বর জার্মান উপজাতিদিগের নিকট রোমের এবং মধ্য যুগে পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপবাসীগণের নিকট বাইজ্যান-টিয়ামের যে গুরুত্ব ছিল, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে নবোদিত রাজবংশগুলির নিকট মহোদয়-শ্রী অর্থাৎ কনৌজের গুরুত্বও ছিল তাহার অনুরূপ।"

অষ্টম শতাব্দীতে কনৌজ অধিকারই ছিল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রমাণ। কাশ্মীরের দুই জন অধিপতি—ললিতাদিত্য এবং বিনয়াদিত্য—কনৌজের রাজগণকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ ললিতাদিত্য কনৌজ কিছুদিন নিজ অধিকারে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের পালরাজগণ, গুর্জর-প্রতিহারগণ এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটগণ দীর্ঘকাল কনৌজ অধিকারের জন্য পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেন গুর্জর-প্রতিহারগণ। এই রাজপুত রাজবংশটি কনৌজে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহারা যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তাহা হর্ষের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং অল্পকালস্থায়ী রাজ্যের তুলনায় অধিকতর বিস্তৃত, শক্তিশালী এবং স্থায়ী হইয়াছিল।

৪. রাজপুত জাতির আধিপত্য

অষ্টম শতাব্দী হইতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে রাজপুত জাতির বিশিষ্ট ভূমিকার প্রতি একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, "হর্ষের মৃত্যু হইতে মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দুস্থান বিজয় পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রাজপুতগণ এতদূর প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল যে এই সময়টিকে সঙ্গতভাবেই 'রাজপুত যুগ' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রায় সমস্ত রাজ্যই যে সকল রাজবংশ বা গোষ্ঠির দ্বারা শাসিত হইত, তাহারা বহু যুগ ধরিয়া সমবেতভাবে রাজপুত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।"

বহু শতাব্দী ধরিয়া উত্তর ভারতের বৃহৎ অংশে রাজনৈতিক প্রভুত্বই ইতিহাসে রাজপুত জাতির গুরুত্বের একমাত্র কারণ নয়। মুসলমান আক্রমণের যুগে তাহারাই ছিল হিন্দু ধর্মের রক্ষক, হিন্দু সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক, হিন্দু ঐতিহ্যের পতাকাবাহী। ঐতিহাসিক টড (James Tod) তাঁহার 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত এবং পুরাতত্ত্ব' (*Annals and Antiquities of Rajasthan*) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তাহাদের বীরত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "একমাত্র অসাধারণচরিত্র রাজপুত জাতি ভিন্ন বিশ্বের অন্য কোন জাতি এত শতাব্দীর নিদারুণ অবসাদের মধ্যেও সভ্যতার ঐতিহ্য, তাহাদের পূর্ব পুরুষের সাহস এবং রীতিনীতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিত? পৃথিবীর ইতিহাসে রাজপুতগণই এমন একটি জাতির একমাত্র উদাহরণ-স্থল, যাহারা মনুষ্যজাতির সহনীয় সর্বপ্রকার বর্বর অত্যাচার অগ্রাহ্য করিয়াছে, ভূলুণ্ঠিত হইয়াও পুনরায় নূতন উদ্যমে মাথা তুলিয়াছে, এবং বিপদকেই সাহসের খড়্গকে' শাণিত করিবার কঠিন প্রস্তরে পরিণত করিয়াছে।"

রাজপুত জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে বিতর্ক

রাজপুতগণের উদ্ভব সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। কিংবদন্তী অনুসারে, রাজপুতগণ প্রাচীন সূর্য ও চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের বংশধর। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এই কিংবদন্তীর সুযোগ্য সমর্থক ছিলেন পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। হিন্দী ভাষায় তিনি রাজপুত জাতির যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাহা কালোত্তীর্ণ গবেষণার পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে ঐতিহাসিক বিচারে বহু ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক এই কিংবদন্তীকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিমত সংক্ষেপে এই: "কয়েকটি অভিজাত রাজপুত গোষ্ঠী গুর্জর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি হইতে উদ্ভূত এবং অন্যান্য রাজপুত গোষ্ঠীগুলির সহিত ভারতের আদিম জাতিগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।" এই সাধারণ মতবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

লোকপরম্পরাগত অভিমত

পুরাতন ধারণার সমর্থকগণ স্বভাবতঃই কিংবদন্তীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই কিংবদন্তীগুলি শিলালিপির দ্বারা সমর্থিত নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মেবারে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে উদয়পুরের রাণাগণ রামায়ণের বীর নায়ক রামের বংশধর, কিন্তু প্রাচীনতম শিলালিপিগুলিতে এই গুহিলোত বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যখন মধ্য-যুগীয় এবং আধুনিক কিংবদন্তীর সহিত প্রাচীন শিলালিপির মতবিরোধ দেখা যায়, তখন শিলালিপির মতকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

লোকপরম্পরাগত অভিমতের সমর্থকেরা আরও বলেন যে হিন্দু ধর্মের প্রতি রাজপুতগণের আনুগত্য, এবং হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য মুসলমানগণের সহিত তাহাদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম হইতে প্রমাণিত হয় যে তাহারা মূলতঃ ভারতীয়। যে ধর্ম তাহারা নূতন গ্রহণ করিয়াছে সেই ধর্মের জন্য তাহারা কেন এত কঠোর সংগ্রাম করিবে? আধুনিক মতের সমর্থকেরা বলেন যে অনেক সময় কোন ধর্মে নবদীক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহ সেই ধর্মের পুরাতন অনুগামীদের অপেক্ষা অধিক হয়।

সর্বশেষে, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের লোকগণনার সময় মনুষ্যদেহের যে মাপ গ্রহণ করা হয় তাহা হইতে দেখা যায় যে রাজপুতদের দৈহিক গঠনের সহিত আর্যদের দৈহিক গঠনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। যদি আমরা দৈহিক সাদৃশ্যকে এক জাতির সহিত আর এক জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে রাজপুত জাতির সহিত আর্য জাতির সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লোকপরম্পরাগত যে মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ভারতের মত যে দেশে প্রায়শঃই বহু জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে মনুষ্য-দেহের মাপের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে তাহা ঐতিহাসিক দিক হইতে গ্রহণযোগ্য হইবে না। "বহু জাতির রক্তের সংমিশ্রণে যেখানে এক জাতির উদ্ভব হইয়াছে, সেখানে মাথার খুলি মাপিয়া অথবা আকৃতির বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া কিছু জানা যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না"।

আধুনিক মত

টডের সময়ে রাজস্থানের যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন। তথাপি তিনি রাজপুত জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত ছিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে রাজপুতরা শক (Scythian) জাতি হইতে উদ্ভূত। অতএব বৈদেশিক জাতি হইতে রাজপুতদের উদ্ভব সম্বন্ধীয় মতবাদটি এক শতাব্দী কালের বেশী সময় ধরিয়া (অর্থাৎ টডের সময় হইতে) প্রচলিত। কোন কোন ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিত ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা এই মতকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

যে যুগে রাজপুতগণের উদ্ভব ঘটে তখন হিন্দু সমাজে বৈদেশিক জাতির মিশ্রণ

কোন অভিনব ব্যাপার ছিল না। শকেরা যে হিন্দুদের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইত তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন, একজন সাতবাহন রাজা শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার, হূণ, গুর্জর এবং অন্যান্য যে সব জাতি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, হিন্দুরা নিশ্চয়ই তাহাদের নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে নাই। মনে হয় যে গ্রীক, কুষাণ এবং শকদের ন্যায় ইহারাও ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে মিশিয়া যায়।

হিন্দুদের সামাজিক সংগঠনে এই সকল বিদেশীর স্থান নির্ধারিত হইত তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে। যে সকল পরিবার আপন আপন রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহারা ক্ষত্রিয় বা রাজপুত বলিয়া অভিহিত হন। টড-বর্ণিত রাজপুত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটির নাম 'হূণ'। কখনও কখনও বৃত্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিরও পরিবর্তন হইত। মেবারের গুহিলোতগণের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া তাঁহারা ক্ষত্রিয়া পত্নী গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা রাজপুত বলিয়া পরিচিত হইলেন। এরূপ পরিবর্তন প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য বা ইতিহাসের পরিপন্থী নয়। দক্ষিণ ভারতের কদম্ব রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ময়ুরবর্মন জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজ্যলাভের পর তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া ময়ূরবর্মন নামে পরিচিত হন।

কোন কোন রাজপুত গোষ্ঠী (Clan) যে বৈদেশিক জাতি হইতে উদ্ভূত, তাহা শিলালিপির ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন, গুর্জর-প্রতিহারগণকে শিলালিপিতে 'গুর্জর বংশসম্ভূত' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী কালের কিংবদন্তী অনুসারে চারিটি প্রধান রাজপুত গোষ্ঠী—প্রতিহার, পরমার, চাহমান এবং চৌলুক্য—আবু পাহাড়ে যজ্ঞকুণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল, এইজন্য তাহারা 'অগ্নিকুল' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ বৈদেশিকগণের অপবিত্রতা দূর করিয়া তাহাদের হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন শুদ্ধিযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

কোন কোন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবুও ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে কোন কোন রাজপুত গোষ্ঠী ভারতের আদিম জাতিদের বংশধর।

চন্দেল্লগণ সম্ভবতঃ 'হিন্দু ধর্ম গ্রহণকারী গোন্দ' ছিলেন। ধর্মশাস্ত্রেও নিম্ন জাতির উচ্চ জাতিতে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা হইয়াছে। এখনও হিন্দু সমাজে এইভাবে নীচ জাতি হইতে উচ্চ জাতিতে উন্নয়নের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। রাজপুতদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপাসনা-পদ্ধতি ও ধর্মবিশ্বাস, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার দেখা যায়। ইহা সম্ভবতঃ তাহাদের পৃথক পৃথক উৎস হইতে উদ্ভবের নিদর্শন। যেমন, যে সকল রাজপুত গোষ্ঠী বিশেষভাবে সূর্যের উপাসক, তাহারা বৈদেশিক বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে করা যায়, আর যাহারা নাগপূজা করে তাহারা এই দেশেরই আদিম জাতির বংশধর।

গুর্জর-প্রতিহার বংশের অভ্যুত্থান

গুর্জর-প্রতিহার বংশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত জাতির রাজনৈতিক প্রাধান্যের সূত্রপাত হয়। গুর্জর-প্রতিহারগণ নিজেদের সূর্যবংশীয় বলিয়া দাবি করিতেন। কিংবদন্তী অনুসারে তাঁহাদের আদিপুরুষ ছিলেন রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। খ্রীস্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে হূণগণের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার যে সকল উপজাতি ভারতে প্রবেশ করে, তাহাদের অন্যতম গুর্জর জাতি হইতে সম্ভবতঃ ইঁহাদের উৎপত্তি। একদা রামের 'প্রতিহারী' (দ্বাররক্ষক) রূপে যিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করিয়াছিলেন সেই লক্ষ্মণকে একটি গুর্জর বংশের আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'গুর্জর-প্রতিহার' শব্দটির অর্থ সম্ভবতঃ ইহাই।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিচন্দ্র রাজস্থানের যোধপুর অঞ্চলে গুর্জর বংশের আদি রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পরে যুদ্ধবৃত্তি গ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক সাফল্যের অধিকারী হন। গুপ্ত সাম্রাজ্য, হূণ-নায়ক মিহিরকুল এবং মান্দাসোরের যশোধর্মনের পতনের ফলে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, তিনি তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।

দক্ষিণ গুজরাটে (লাট) ও অবন্তীতে (মালব) একাধিক গুর্জর বংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। হিউয়েন সাঙ ভিল্লমালকে (ভিনমাল, সম্ভবতঃ ব্রোচ) একজন গুর্জর রাজের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অবন্তীর গুর্জর রাজা প্রথম নাগভট অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধুর আরবগণের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া প্রাধান্য লাভ করেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে সিন্ধু অধিকার করিয়া আরবেরা গুজরাট ও রাজস্থান বিধ্বস্ত করে এবং নাগভটের রাজধানী উজ্জয়িনী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। একটি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে তিনি 'শক্তিশালী ম্লেচ্ছ রাজার বিশাল বাহিনীকে ধ্বংস করেন'। অতঃপর তিনি সম্ভবতঃ আরব আক্রমণের ফলে শক্তিহীন রাজস্থান ও দক্ষিণ গুজরাটের গুর্জর রাজ্যগুলির উপর নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে নাগভটের মৃত্যু হয়। অবন্তীর গুর্জর রাজ্যের পরবর্তী শক্তিশালী শাসক বৎসরাজ ৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন। মালব ও রাজস্থানের এক বৃহৎ অংশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তিনি উত্তর দিকেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল একটি উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন।

গুর্জর-পাল-রাষ্ট্রকূট প্রতিদ্বন্দ্বিতা

উত্তর ভারতে সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য গুর্জরগণ, পূর্ব ভারতের পালরাজগণ এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটগণের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয় বৎসরাজের রাজত্বকালে। সম্ভবতঃ প্রথম নাগভট রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু

এই সংঘর্ষের কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। বৎসরাজ এক গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেন; ইনি সম্ভবতঃ পরাক্রান্ত পালরাজ ধর্মপাল। তিনি পাল রাজ্যের কোন অংশে অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। তবে এই সময়ে পাল রাজ্য গঙ্গা-যমুনা দোয়াব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এই অঞ্চলে কোথাও সংঘর্ষ ঘটিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়গৌরবের অধিকারী হইলেন রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব। তিনি বৎসরাজ ও ধর্মপাল, উভয়কেই পরাজিত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধগুলি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

এই তিনটি প্রধান রাজবংশের মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় এক শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়। 'কনৌজনগরী, হর্ষবর্ধন যাহাকে সাম্রাজ্যকেন্দ্রের মর্যাদায় ভূষিত করেন, এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেকেই এই পুরস্কার অর্জনে অল্পবিস্তর সাফল্য লাভ করেন।'

ধ্রুবের নিকট পরাজয়ের পরে বৎসরাজের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহার শক্তি রাজস্থানের কিয়দংশে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নাগভট বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। একটি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে: অন্ধ্র, সৈন্ধব, বিদর্ভ ও কলিঙ্গের শাসকগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন; তিনি চক্রায়ুধ ও বঙ্গেশ্বরকে পরাজিত করেন; তিনি আনর্ত্ত, কিরাত, তুরুষ্ক, বৎস ও মৎসের গিরিদুর্গগুলি অধিকার করেন। রাষ্ট্রকূট শিলালিপি অনুসারে, রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত করেন এবং হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত হন।

এই সকল বক্তব্যের যথাযথ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে, তবে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, দ্বিতীয় নাগভট পশ্চিম দিকে মুসলমান শাসকগণের (তুরুষ্ক) বিরুদ্ধে কিছু সাফল্য অর্জন করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ধর্মপালের অনুগত কনৌজরাজ চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ তিনি কনৌজ অধিকার করেন এবং উহা পরবর্তী কালে গুর্জর-প্রতিহারগণের স্থায়ী রাজধানী হয়। তৃতীয়তঃ, তিনি পাল রাজ্যের প্রায় কেন্দ্রে মুঙ্গের (বিহারে) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ধর্মপালকে পরাজিত করেন। চতুর্থতঃ, তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহাকে প্রবল আঘাত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূটরাজের সার্বভৌম আধিপত্য স্বীকার করেন। বোধহয় এই কারণেই বলা হইয়াছে যে তিনি হিমালয় (অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনা দোয়াব) পর্যন্ত অগ্রসর হন।

তৃতীয় গোবিন্দ নাগভটের শক্তি হ্রাস করিয়াছিলেন, কিন্তু চূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে সম্ভবতঃ ধর্মপালের উত্তরাধিকারী দেবপাল তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত করেন। পরে বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন ভোজ। তিনি ৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়া অন্ততঃ ৮৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ তিনি কনৌজে রাজধানী স্থাপন করেন। দেবপাল, গুজরাটের রাষ্ট্রকূট শাসক এবং

কলচুরিরাজ কোক্কল্ল তাঁহাকে পরাজিত করেন। পূর্বে ও পশ্চিমে প্রতিহত হইলেও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলে তিনি 'ত্রিভুবন জয়' করিতে মনস্থ করেন। দেবপালের মৃত্যুর পর পাল রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। তাঁহার পরবর্তী দুই জন শাসক দুর্বলপ্রকৃতি ছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ পাল রাজ্য আক্রমণ করিয়া আংশিক সাফল্য লাভ করেন। ইহার সুযোগে ভোজ পালরাজ নারায়ণ পালকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের এক বৃহদংশ অধিকার করেন। অতঃপর অমোঘবর্ষের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটে। কিন্তু উহার ফল কি হইয়াছিল তাহা জানা যায় না।

উত্তর-পশ্চিমে ভোজের রাজ্য পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। কাথিয়াবাড়, অযোধ্যা ও বুন্দেলখণ্ডেও তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মালব তাঁহার অধীনে ছিল কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না। 'তিনি উত্তর ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন', ইহা মনে করা ভুল। কিন্তু তিনি অবশ্যই উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। সুলেমান নামক আরব লেখকের রচনা হইতে জানা যায় :

"রাজার অসংখ্য সৈন্য আছে, এবং অন্য কোন ভারতীয় রাজার অধীনে এরূপ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী বাহিনী নাই। তিনি আরবদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে আরবদের রাজা রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। উত্তর ভারতের রাজগণের মধ্যে ইসলাম ধর্মের এরূপ প্রবল শত্রু আর কেহ নহে। তাঁহার প্রচুর ধনসম্পদ আছে। তাঁহার বহু উট ও অশ্বও আছে। তাঁহার রাজ্যে রৌপ্য (ও স্বর্ণ)-চূর্ণ বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে যে দেশে (এই সব ধাতুর) খনিও আছে। অন্য কোনও দেশই দস্যুর উপদ্রব হইতে ভারতের মত সুরক্ষিত নহে।"

ভোজের উত্তরাধিকারী প্রথম মহেন্দ্রপাল ৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৯০৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি পালগণের নিকট হইতে মগধ, এমন কি উত্তর বঙ্গের একাংশ, অধিকার করেন। পশ্চিমে তাঁহার অধিকার আরব সাগর পর্যন্ত প্রসারিত হয়, এবং উত্তর-পশ্চিমে পূর্ব পাঞ্জাব তাঁহার হস্তগত হয়। তাঁহার গুরু, প্রসিদ্ধ কবি রাজশেখরের রচনায় কনৌজের সমৃদ্ধি ও গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়।

৯১২ খ্রীস্টাব্দে মহীপাল কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজশেখর তাঁহাকে 'আর্যাবর্তের মহারাজাধিরাজ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন যে তিনি মুরল, মেকল, কলিঙ্গ, কেরল, কুলুত, কুন্তল ও রমথগণকে পরাজিত করেন। উক্তির সাধারণ অর্থ এই যে রাষ্ট্রকূটদের শাসনাধীন দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে গুর্জররাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আরব পর্যটক অল মাসুদী ৯১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতে আসেন। তিনি

বলেন যে কনৌজ রাজ্যের রাজ্য দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট রাজ্য ও পশ্চিমে মূলতানের মুসলমান রাজ্য পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, এবং এই দুই প্রতিবেশীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ চলিত। আরব লেখক আরও বলিয়াছেন যে তাঁহার বহু অশ্ব ও উট ছিল, এবং তাঁহার চার দিকে চারটি সৈন্যবাহিনী ছিল; ইহাদের প্রত্যেকটির সৈন্য সংখ্যা ছিল সাত অথবা নয় লক্ষ।

৯১৫ হইতে ৯১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র গুর্জর রাজ্য আক্রমণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি কনৌজ অধিকার করেন, এবং মহীপাল 'বজ্রাহতের ন্যায়' প্রয়াগ (এলাহাবাদ) অভিমুখে পলায়ন করেন। রাষ্ট্রকূট বাহিনী দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিলে মহীপাল তাঁহার রাজ্যের অন্ততঃ কিছু অংশ উদ্ধার করেন। কিন্তু গুর্জর-প্রতিহার বংশের মর্যাদা প্রবলভাবে আহত হইল। সামন্ত রাজগণ ও প্রাদেশিক শাসকগণ ধীরে ধীরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। নূতন নূতন রাজবংশের আবির্ভাব হইল।

মহীপালের উত্তরাধিকারীগণের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশাল গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এই বংশের পরবর্তী শাসকগণ ১০২৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কনৌজের চারিপাশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন।

গুর্জর-প্রতিহারগণের কৃতিত্ব

ভারতের ইতিহাসে গুর্জর-প্রতিহার রাজগণের গুরুত্বের তিনটি দিক রহিয়াছে। প্রথমতঃ, তাঁহারা হর্ষের রাজ্যের তুলনায় বিশালতর এবং দীর্ঘস্থায়ী এক রাজ্য স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে গুপ্ত সম্রাটদের পতনের পরে রাজনৈতিক ঐক্যের যে আদর্শ ক্ষয়িষ্ণু হইয়াছিল, গুর্জর-প্রতিহারগণ তাহা শক্তিশালী করেন এবং পাল ও রাষ্ট্রকূটদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তাহাকে একটি দীর্ঘকালস্থায়ী রূপ দেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তাঁহারা ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের শেষ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা সিন্ধুর আরবগণের বিরুদ্ধে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত অক্লান্তভাবে রক্ষা করেন। প্রথম নাগভট ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বাধা না দিলে আরবগণ গুজরাট, রাজস্থান, এমন কি মালব পর্যন্ত অধিকার করিত। ম্লেচ্ছ আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের রক্ষাকর্তা রূপে নিজ গৌরব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভোজ 'আদি বরাহ' (বিষ্ণুর বরাহ অবতার) এই কৌতূহলোদ্দীপক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু বরাহ রূপ গ্রহণ করিয়া দন্ত দ্বারা বন্যাপ্লাবিত পৃথিবী জলের উপরে উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন।) তৃতীয়তঃ, গুর্জর-প্রতিহার রাজত্বকালে পঞ্চম শতাব্দী হইতে ভারতে অনুপ্রবেশকারী বৈদেশিক জাতি ও উপজাতিগুলির ভারতীয়করণের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা হিন্দু ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহাদের স্থাপিত রাজবংশগুলি প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশ হইতে

উদ্ভূত বলিয়া দাবি করে, এবং রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনে ক্ষত্রিয়দের ভূমিকা গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে অন্যান্য রাজপুত রাজবংশগুলি গুর্জর-প্রতিহারদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিল।

নূতন রাজপুত রাজবংশসমূহ

দশম শতাব্দীতে গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতনের পরে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে বহু রাজপুত রাজবংশের উদ্ভব হয়। ইহাদের কোন কোনটি প্রভূত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল।

চাহমান (চৌহান) বংশ

রাজপুত চারণগণ কর্তৃক সংরক্ষিত ঐতিহ্য অনুসারে রাজস্থানের আবু পাহাড়ে প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ মুনির অগ্নিবেদী হইতে প্রতিহার, চাহমান, চালুক্য এবং পরমার— এই চারিটি 'অগ্নিকুলে'র উদ্ভব হইয়াছিল। অবশ্য চাহমান বংশের প্রাচীন শিলা-লিপিতে এই কাহিনীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। চাহমানেরা সাধারণতঃ 'চৌহান' নামে পরিচিত।

মনে হয়, ভূতপূর্ব যোধপুর ও জয়পুর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত শাকম্ভরী (বা শাম্ভর) ছিল চাহমানদের আদি বাসভূমি। তাহারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে শাকম্ভরী শাখা ছিল নিঃসন্দেহে প্রধান। চাহমানদের এই শাখা যে অঞ্চলে রাজত্ব করিত তাহা 'শপাদলক্ষ' দেশ নামেও পরিচিত ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বসুদেব, কিন্তু তিনি কবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তাহা সঠিক জানা যায় না। প্রথম গুবাক ছিলেন গুর্জর-প্রতিহার সম্রাট দ্বিতীয় নাগভটের অধীন সামন্ত রাজা। কথিত আছে, দ্বিতীয় গুবাক দিল্লী অঞ্চলের[১] একজন তোমর কুলের রাজপুত রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেন। এইরূপে শুরু হয় চাহমান ও তোমরগণের মধ্যে দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে চাহমান বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম বাক্‌পতি ও সিংহরাজের সামরিক সাফল্যের ফলে বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় বিগ্রহরাজের (আনুমানিক ৯৭৩-৯৯৭ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসন লাভের পূর্বেই চাহমানগণ প্রতিহারদের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

১ তোমর (তুয়ার) বংশ ৩৬টি বিখ্যাত রাজপুত কুলের অন্যতম ছিল। চারণদের গাথা অনুসারে, তোমর বংশের রাজা অনঙ্গপাল অষ্টম শতাব্দীতে দিল্লী শহর প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত তোমরগণ গুর্জর-প্রতিহার রাজগণের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা স্বাধীন হন, কিন্তু চাহমানগণের বিরোধিতার ফলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। ১১৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে চাহমানগণ দিল্লী অধিকার করিলে তোমর বংশের অবসান হয়।

দ্বিতীয় বিগ্রহরাজ দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন এবং গুজরাটের চৌলুক্য বংশীয় নৃপতি মূলরাজকে পরাজিত করেন। অজয়রাজ মালবের পরমার রাজ্যের একজন সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া উজ্জয়িনী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি প্রসিদ্ধ অজয়-মেরু বা আজমীর শহরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র অর্ণোরাজ (আনুমানিক ১১৩৯ খ্রীস্টাব্দ) গুজরাটের চৌলুক্য বংশীয় রাজা জয়সিংহ ও কুমারপালের নিকট পরাজিত হন।

কোন কোন চাহমান শিলালিপিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোবিন্দরাজ, অজয়রাজ ও অর্ণোরাজের সামরিক সাফল্যের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পরাজিত মুসলমানেরা ছিল গজনীর সুলতান মামুদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সৈন্যদল। মুসলমানদের সহিত এই বিরোধিতা চতুর্থ বিগ্রহরাজের সময় (আনুমানিক ১১৫৩-১১৬৪ খ্রীস্টাব্দ) পর্যন্ত চলে। তিনি পাঞ্জাবের ইয়ামিনী বংশের (সুলতান মামুদের বংশধরদের) দুর্বলতার সুযোগে শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি তোমরগণের নিকট হইতে দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলও অধিকার করিয়াছিলেন। "দিল্লী এবং যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ অধিকারের ফলে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার প্রবেশদ্বার রক্ষার ভার চাহমান বংশের উপরে আসিয়া পড়ে। পরবর্তীকালের ইতিহাসে দেখা যায়, ঘূরের পর্বত হইতে উত্থিত পুনরুজ্জীবিত মুসলমান শক্তির প্রথম সংঘাত চাহমান-গণকেই সহ্য করিতে হয়।

বিগ্রহরাজ 'হরকেলি নাটক' রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাকবি সোমদেব 'ললিত-বিগ্রহরাজ-নাটক' রচনা করেন।

চাহমান বংশের শাকম্ভরী শাখার শেষ বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন তৃতীয় পৃথীরাজ (আনুমানিক ১১৭৯-১১৯২ খ্রীস্টাব্দ)। ভারতীয় ইতিহাসের পাঠকদিগের নিকট তাঁহার নাম বিশেষ পরিচিত। সম্ভবতঃ জয়ঙ্ক কর্তৃক বিরচিত 'পৃথীরাজ-বিজয়' নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে এবং চাঁদ বরদাই রচিত 'পৃথীরাজ-রাসো' নামক বিখ্যাত হিন্দী মহাকাব্যে তাঁহার জীবনকাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে চাঁদ বরদাই রচিত গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য সন্দেহের অতীত নহে। ইহাতে বর্ণিত ঘটনাবলীর পারম্পর্য অযৌক্তিকতায় পরিপূর্ণ। তাহা ছাড়া পৃথীরাজের সহিত সংযুক্তার প্রেমকাহিনীও সত্য বলিয়া মনে হয় না।

জেজাভুক্তির চন্দেল্লগণের এবং গুজরাটের চৌলুক্যগণের সহিত পৃথীরাজের সংঘর্ষের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে, কিন্তু হিন্দু ভারতের শেষ মহাবীর রূপে তাঁহার খ্যাতির কারণ মহম্মদ ঘূরীকে প্রতিরোধের জন্য তাঁহার প্রয়াস। ইয়ামিনি বংশের বিলোপ (১১৮৬ খ্রীস্টাব্দ) করিয়া মহম্মদ পাঞ্জাবের অধিপতি হইলেন। তখন ঘূর এবং শাকম্ভরীর দুই রাজবংশ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য উত্তর ভারতের হিন্দু রাজগণ সমবেতভাবে কোন চেষ্টা

করেন নাই। ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে তরাইনের প্রান্তরে মহম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হন। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, "ইসলামের বাহিনীর এমনই পরাভব ঘটিল যে তাহার আর কোন প্রতিকার রহিল না।" কিন্তু পৃথ্বীরাজ মুসলমান বাহিনীর হতাবশিষ্টগণকে গজনীতে ফিরিয়া যাইতে দিলেন। মহম্মদ নিজ বাহিনী পুনর্গঠিত করিয়া ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় তরাইনে উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ পরাজিত, ধৃত ও নিহত হন। হিন্দুদের এই বিপর্যয়ের কারণ ছিল মহম্মদের উন্নততর রণকৌশল এবং দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনীর সুদক্ষ ব্যবহার।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে কার্যত চাহমান রাজ্য মুসলমানদের হাতে চলিয়া যায়। আজমীর, দিল্লী ও মীরাট অল্পদিনের মধ্যেই অধিকৃত হয়। পৃথ্বীরাজের আত্মীয়-স্বজন নূতন শাসকদের বিব্রত করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাদের দমন করা হয়।

চন্দ্রাত্রেয় (চন্দেল্ল) বংশ

চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্ল বংশের আদি ইতিহাস রহস্যাবৃত। সাধারণের বিশ্বাস, চন্দ্রের পুত্র ঋষি চন্দ্রাত্রেয় হইতে এই বংশের উৎপত্তি। শিলালিপিতে এই বংশের প্রথম যে ঐতিহাসিক ব্যক্তির উল্লেখ আছে তাঁহার নাম নন্নুক। তিনি সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। মধ্য প্রদেশের খাজুরাহো চন্দেল্ল শক্তির আদি কেন্দ্র ছিল। এই বংশের প্রথম নৃপতিগণ ছিলেন গুর্জর-প্রতিহারগণের সামন্ত। তাঁহাদের অন্যতম জয়শক্তি, জেজ্জক বা জেজা নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার অধিকৃত রাজ্য 'জেজকভুক্তি' নামে পরিচিত হয়। এই বংশের হর্ষ এবং যশোবর্মন ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন।

প্রথম পরাক্রান্ত চন্দেল্ল নৃপতির নাম ধঙ্গ (আনুমানিক ৯৫৪-১০০২ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি এলাহাবাদ, কালঞ্জর ও গোয়ালিয়র সহ উত্তর ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। কথিত আছে, তিনি উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের বহু নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু শিলালিপির এই সব বিবরণের সত্যতা বিচার করা কঠিন। তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার পুত্র গণ্ড। অনেকের মতে, কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক গজনীর সুলতান মামুদের প্রতিপক্ষ রূপে নন্দ নামে যে পরাক্রান্ত নৃপতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই গণ্ড; তবে সম্ভবতঃ এই ধারণা সত্য নহে। গণ্ডের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিদ্যাধরকে (আনুমানিক ১০১৭—১০২৯ খ্রীস্টাব্দ) মুসলমান ঐতিহাসিকগণ 'ভারতের নৃপতিগণের মধ্যে রাজ্যের আয়তনের দিক হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি প্রতিহার বংশের শেষ প্রতিনিধি রাজ্যপালকে পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর সুলতান মামুদের আক্রমণ হইতে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাঁহার উপরেই পড়িল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তিনিই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক

বর্ণিত পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা 'নন্দ'। 'নন্দের' সহিত সুলতান মামুদের সংঘর্ষের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই প্রসিদ্ধ বিজয়ী অন্যান্য হিন্দুরাজাদের বিরুদ্ধে যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, চন্দেল্লদের ক্ষেত্রে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন নাই।

বিদ্যাধরের অব্যবহিত পরবর্তী চন্দেল্ল রাজগণ দুর্বল শাসক ছিলেন। ফলে প্রসিদ্ধ কলচুরিরাজ লক্ষ্মী-কর্ণের বিজয়গৌরবে চন্দেল্ল রাজগণের শক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাবৃত হইয়াছিল। কীর্তিবর্মনের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১০৭০-১০৯৮ খ্রীস্টাব্দ) চন্দেল্ল শক্তির পুনরুদ্ধার হয়। তাঁহার সেনাপতি গোপাল লক্ষ্মী-কর্ণকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু কলচুরি রাজার আঘাত এত প্রবল হইয়াছিল যে তাহার পরে চন্দেল্ল রাজগণের পক্ষে উত্তর ভারতে প্রধান স্থান অর্জন আর সম্ভব হয় নাই।

এই বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী শাসক মদনবর্মন (আনুমানিক ১১২৯–১১৬৩ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি চন্দেল্ল রাজবংশের ইতিহাসের সহিত যুক্ত চারিটি প্রধান স্থান—কালঞ্জর, খাজুরাহো, অজয়গড় এবং মহোবা—নিজ অধিকারে রাখিয়া-ছিলেন। কথিত আছে, তিনি মালবের পরমাররাজ, ডাহলের কলচুরিরাজ, এবং গুজরাটের চৌলুক্যরাজ সিদ্ধরাজ জয়সিংহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। শোনা যায়, বারাণসীর গাহড়বাল রাজা তাঁহার প্রতি 'বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে কালযাপন করিতেন।'

মদনবর্মনের পৌত্র পরমর্দি (আনুমানিক ১১৬৭–১২০২ খ্রীস্টাব্দ) দিল্লী ও আজমীরের চাহমান বংশীয় বিখ্যাত নৃপতি তৃতীয় পৃথ্বীরাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়া-ছিলেন। ১২০২ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘূরীর সেনাপতি কুতবউদ্দীন কালঞ্জর অধিকার করিয়া পরমর্দিকে 'দাসত্বের বন্ধন গলায় পরিতে' বাধ্য করেন। তাঁহার পুত্র ত্রৈলোক্যবর্মন (আনুমানিক ১২০৫-১২৪১ খ্রীস্টাব্দ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি সম্ভবতঃ কালঞ্জর উদ্ধার করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বুন্দেলখণ্ডের কোন কোন অংশ চন্দেল্ল বংশের রাজগণের শাসনাধীন ছিল।

চন্দেল্ল রাজগণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খাজুরাহোতে (মধ্য প্রদেশ) প্রায় ত্রিশটি মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি তিন ধর্মের উপাসনার জন্য নির্মিত হয়—শৈব ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম ও জৈন ধর্ম। ইহারা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অতি উচ্চ মানের নিদর্শন।

কলচুরি বংশ

কলচুরি রাজগণ দাবি করিতেন যে তাঁহারা 'মহাকাব্য' ও পুরাণে বর্ণিত হৈহয় ক্ষত্রিয়গণের বংশোদ্ভূত। অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিলালিপিতে ইহাদের নাম পাওয়া যায়। এই বংশের প্রধান শাখা, ডাহল বা

ত্রিপুরীর (মধ্য প্রদেশের জব্বলপুরের নিকটে বর্তমান তেওয়ার) কলচুরিগণ নিজেদের বিষ্ণুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কোক্কল্ল (আনুমানিক ৮৭৫-৯২৫ খ্রীস্টাব্দ) সম্ভবতঃ বর্তমান মধ্য প্রদেশের জব্বলপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তিনি রাষ্ট্রকূট ও চন্দেল্ল বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। গুর্জর-প্রতিহারগণের সহিতও তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের রীতি তিন পুরুষ ধরিয়া অনুসৃত হইয়াছিল। কলচুরিবংশীয় লক্ষ্মণরাজ দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজত্ব করিতেন। তিনি বঙ্গ, কোশল, গুজরাট, কাশ্মীর ও পাণ্ড্য রাজ্যের রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। তিনি হয়ত লুণ্ঠনের জন্য বঙ্গদেশ, কোশল ও গুজরাটে অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশ্মীর ও পাণ্ড্য রাজ্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রমাণ করা কঠিন। পরমারবংশীয় দ্বিতীয় বাক্‌পতি (মুঞ্জ) কলচুরিবংশীয় দ্বিতীয় যুবরাজকে পরাজিত করেন। কলচুরিগণের রাজধানী ত্রিপুরীও তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। ত্রিপুরী অল্প-দিনের মধ্যেই পুনরধিকৃত হয়। কিন্তু কল্যাণের চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় তৈল সম্ভবতঃ দ্বিতীয় যুবরাজকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় যুবরাজের উত্তরাধিকারী সম্ভবতঃ চন্দেল্লরাজ বিদ্যাধরের নিকট পরাজিত হন।

গাঙ্গেয় বিক্রমাদিত্য (আনুমানিক ১০৩০—১০৪১ খ্রীস্টাব্দ) কলচুরি বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। কথিত আছে, তিনি কীর (হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকা), বঙ্গ, উৎকল ও কুন্তল রাজ্যের রাজগণকে পরাজিত করেন। তিনি এলাহাবাদ ও বারাণসী অধিকার করিয়া উত্তরে গঙ্গা নদী পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেন। তবে তিনি পরমার বংশীয় নৃপতি ভোজের নিকট পরাজিত হন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মী-কর্ণ (আনুমানিক ১০৪১—১০৭০ খ্রীস্টাব্দ) একজন খ্যাতনামা দিগ্বিজয়ী ছিলেন। "অন্ততঃ কিছুকালের জন্য তিনি পশ্চিমে বণস ও মাহী নদীর উৎস হইতে পূর্বে হুগলী নদীর মোহানা পর্যন্ত, এবং উত্তরে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা হইতে দক্ষিণে মহানদী, বেনগঙ্গা. ওয়ার্ধা ও তাপ্তী নদীর উজান অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড নিজ শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন।" কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের শেষের দিকে এই পরাক্রান্ত রাজাও বঙ্গদেশের নয়পাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল, চন্দেল্ল বংশীয় রাজা কীর্তিবর্মন, পরমার বংশীয় রাজা উদয়াদিত্য এবং চৌলুক্য বংশীয় রাজা প্রথম ভীম. কল্যাণের চালুক্য বংশীয় রাজা সোমেশ্বর কর্তৃক পরাজিত হন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী যশঃ-কর্ণও (আনুমানিক ১০৭৩—১১২৫ খ্রীস্টাব্দ) পরমার, চন্দেল্ল ও চৌলুক্য রাজগণ কর্তৃক পরাজিত হন। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজত্ব-কালেই গাহড়বালগণ বারাণসী হইতে কনৌজ পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন। ইহার ফলে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার উর্বরতম জেলাগুলি কলচুরিগণের হস্তচ্যুত হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী গয়-কর্ণ (আনুমানিক ১১৫১ খ্রীস্টাব্দ) সম্ভবতঃ চন্দেল্ল বংশীয়

মদনবর্মন কর্তৃক পরাজিত হন। তুম্মনের কলচুরি রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দক্ষিণ কোশল গয়-কর্ণের প্রভাবমুক্ত হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের সম্বন্ধে খুব সামান্য তথ্যই জানা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে মুসলমানগণ ভান্‌রের গিরিমালা পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জব্বলপুর অঞ্চলে গোন্দদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সম্ভবতঃ কলচুরি রাজগণ ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গাহড়বাল বংশ

শিলালিপি হইতে জানা যায়, গাহড়বাল রাজবংশের আদিপুরুষের নাম যশো-বিগ্রহ। তিনি বোধ হয় রাজবংশীয় ছিলেন না। এই বংশের রাজকীয়-মর্যাদা ও গৌরবের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম চন্দ্র। একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি কনৌজ অধিকার করেন। সম্ভবতঃ বারাণসী গাহড়বালগণের আদি রাজধানী ছিল। প্রধানতঃ কলচুরিগণকে পরাজিত করিয়াই তাঁহারা বর্তমান উত্তর প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র (আনুমানিক ১১১৪—১১৫৫ খ্রীস্টাব্দ) গাহড়বাল বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। পাঞ্জাবের ইয়ামিনি সুলতানগণ, বিহারের পালরাজগণ, বঙ্গদেশের সেনরাজগণ এবং ডাহলের কলচুরি রাজগণের সহিত তাঁহার যে সকল সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। উত্তর ভারতে চন্দেল্ল রাজগণ এবং দক্ষিণ ভারতে চোল রাজগণের সহিত তিনি সদ্ভাব বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজয়চন্দ্রও ইয়ামিনি সুলতানদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

গাহড়বাল বংশের পরবর্তী রাজা জয়চ্চন্দ্রের (আনুমানিক ১১৭০-১১৯৩ খ্রীস্টাব্দ) নাম ভারতীয় ইতিহাসের সকল পাঠকের নিকটই সুপরিচিত। কথিত আছে, তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গদেশের সেনবংশীয় নৃপতি লক্ষণ সেন বারাণসী ও এলাহাবাদে বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দাবি যদি সত্য হয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই জয়চ্চন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। চাঁদ বরদাই কর্তৃক রচিত ‘পৃথ্বীরাজ-রাসো’ নামক কাব্যে জয়চ্চন্দ্রের সহিত চৌহানরাজ তৃতীয় পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং জয়চ্চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তার সহিত পৃথ্বীরাজের প্রেমের বিখ্যাত কাহিনীটি আছে। কিন্তু চাঁদ বরদাই-এর কাব্যটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে মহম্মদ ঘূরীর বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতবউদ্দীন গাহড়বাল রাজ্য আক্রমণ করেন। ১১৯৩ খ্রীস্টাব্দে চন্দাবারের (উত্তর প্রদেশের এটোয়া জেলা) যুদ্ধে জয়চ্চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন। অসনি (উত্তর প্রদেশের জৌনপুর বা ফতেপুরের নিকটে)—‘যেখানে রাজার ধনসম্পত্তি লুক্কায়িত ছিল’—লুণ্ঠিত হয়। বিজয়ী মুসলমানেরা অতঃপর বারাণসী অধিকার করিয়া বহু মন্দির ধ্বংস করে।

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, গাহড়বাল রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরগুলি মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হইলেও হরিশ্চন্দ্র নামে জয়চ্চন্দ্রের এক পুত্র পিতৃরাজ্যের কিয়দংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজস্থানের চারণগণের কোন কোন গাথায় যোধপুরের রাঠোর বংশকে জয়চ্চন্দ্রের বংশোদ্ভূত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শিলালিপির সাক্ষ্যও এই কিংবদন্তীকে সমর্থন করে।

পরমার বংশ

চারণদের গাথা ও পরবর্তী কালের শিলালিপি অনুসারে আবু পাহাড়ের পৌরাণিক অগ্নিকুণ্ড হইতে পরমার বংশের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই রাজবংশের কয়েকটি প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ইঁহাদের সহিত দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণের সম্পর্ক ছিল। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূট রাজগণের অধীন সামন্ত রূপে গুজরাটে পরমারগণের আবির্ভাব হয়। সম্ভবতঃ এই বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন উপেন্দ্ররাজ। তবে বোধ হয় রাষ্ট্রকূটগণের সামন্ত প্রথম বাক্‌পতিরাজ ছিলেন ইঁহাদের বংশগৌরবের প্রতিষ্ঠাতা। পরমার বংশের আদি শাসকগণ সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর-প্রতিহারগণের সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করেন। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী বংশের যুগপৎ শক্তিহানির ফলে পরমারগণের পক্ষে মালবে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্ভব হইয়াছিল। ইতিপূর্বেই তাঁহারা গুজরাট হইতে মালবে সরিয়া আসিয়াছিলেন।

হর্ষ, অথবা দ্বিতীয় সিয়ক (আনুমানিক ৯৪৯-৯৭১ খ্রীস্টাব্দ), সম্ভবতঃ পরমার বংশের প্রথম স্বাধীন শাসক। তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বাক্‌পতি বা মুঞ্জ শক্তিশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী নৃপতি ছিলেন। অন্যায় ভাবে কল্যাণের সিংহাসন দখলকারী দ্বিতীয় তৈলকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য তিনি বারবার চেষ্টা করেন। ডাহলের কলচুরি বংশীয় দ্বিতীয় যুবরাজ তাঁহার নিকট পরাজিত হন। কেরল, চোল, গুজরাটের চৌলুক্য, নাড়োলের চাহমান ও মেবারের গুহিলোত বংশের রাজগণের সহিত তাঁহার সংগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় তৈলের সহিত সংঘর্ষে তাঁহার জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটে। তিনি বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'নবসাহসাঙ্কচরিত' রচয়িতা পদ্মগুপ্ত এবং ছন্দঃশাস্ত্রের বিখ্যাত টীকাকার হলায়ুধ সহ কয়েকজন প্রসিদ্ধ মনীষী তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মুঞ্জ নিজেও সুপণ্ডিত এবং খ্যাতিমান কবি ছিলেন।

'নবসাহসাঙ্কচরিতে' মুঞ্জের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী সিন্ধুরাজের নানা অবিশ্বাস্য কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ভোজ (আনুমানিক ১০১০-১০৫৫ খ্রীস্টাব্দ) পরমার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ভারতীয় ইতিহাসে ও প্রাচীন উপাখ্যানে বিখ্যাত হইয়া আছেন। সমসাময়িক শিলালিপিতে তাঁহার বিজয় অভিযান অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কল্যাণের চৌলুক্য ও

ডাহলের কলচুরিগণের সহিত তাঁহার সংগ্রামের প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই সকল যুদ্ধের কোন কোনটিতে তিনি জয়লাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্‌পতির ন্যায় তাঁহার জীবনেরও বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটিয়াছিল। কল্যাণের চালুক্যবংশীয় প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্ল, গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় প্রথম ভীম এবং কলচুরিবংশীয় লক্ষ্মী-কর্ণ সংঘবদ্ধভাবে ভোজের রাজধানী ধারা আক্রমণ করিলে যুদ্ধে ভোজের মৃত্যু হয়। চন্দেল্ল রাজগণের সহিত ভোজের সম্ভবতঃ সদ্ভাব ছিল না। সামরিক ও রাজনৈতিক কৃতিত্ব অপেক্ষা শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই ভোজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি বহু সৌধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অতি অল্প নিদর্শনই অবশিষ্ট আছে। এই প্রতিভাশালী নৃপতি দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্য, চিকিৎসা বিদ্যা, ব্যাকরণ, শব্দকোষ এবং অনুরূপ আরও বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

উদয়াদিত্য (আনুমানিক ১০৫৮-১০৮৭ খ্রীস্টাব্দ) পরমার বংশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেন। যে তিনটি মিত্র শক্তি (চালুক্য, চৌলুক্য ও কলচুরি বংশ) ভোজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সম্ভবতঃ উদয়াদিত্যের সুবিধা হয়। এই বংশের পরবর্তী কয়েকজন শাসক বংশের গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুজরাটের সিদ্ধরাজ জয়সিংহ উজ্জয়িনী সহ পরমার রাজ্যের এক বৃহদংশ অধিকার করেন। আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে এই সকল সামরিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কুফল বৃদ্ধি পায়। অর্জুনবর্মন (আনুমানিক ১২১১-১২১৫ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন এই বংশের শেষ ক্ষমতাশালী নৃপতি। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে বারবার মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হয়। আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে মালবে মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

চৌলুক্য (সোলাঙ্কি) বংশ

প্রায় সার্ধ তিন শতাব্দী কাল (আনুমানিক ৯৫০-১৩০০ খ্রীস্টাব্দ) চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি বংশ গুজরাট ও কাথিয়াবাড় শাসন করেন। কোন কোন লেখক বলেন, চৌলুক্যগণের সহিত চালুক্যগণের সম্পর্ক ছিল; আবার কেহ কেহ মনে করেন যে এই মত বিশ্বাসযোগ্য নহে। চারণগণের গীতিতে চৌলুক্যগণ প্রসিদ্ধ 'অগ্নিকুল'-গণের অন্যতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মূলরাজ বোধ হয় চাপোৎকট রাজবংশের কোন রাজকুমারীর সন্তান। চাপোৎকট বংশ অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে গুজরাট শাসন করিতেন।

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশের ক্ষমতাহ্রাসের ফলে যে রাজনৈতিক উন্নতির সুযোগ দেখা দেয়, বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজা তাহার সদ্ব্যবহার

করেন। প্রথম মূলরাজ (আনুমানিক ৯৭১-৯৯৭ খ্রীস্টাব্দ) সরস্বতী নদীর উপত্যকায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চাপোৎকট বংশের শেষ রাজার নিকট হইতে অনহিলওয়াড়া (বা অনহিল-পাটক) শহরটি অধিকার করেন। এই বংশের পরবর্তী শক্তিশালী নৃপতি প্রথম ভীম (আনুমানিক ১০২২-১০৬৪ খ্রীস্টাব্দ) তাঁহার পূর্বপুরুষদের অনুসৃত রীতি অনুযায়ী সিন্ধুর মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করেন। কলচুরিগণ ও কল্যাণের চালুক্য রাজগণের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া তিনি প্রসিদ্ধ পরমার নৃপতি ভোজকে পরাজিত করেন। কথিত আছে, তিনি কলচুরিরাজ লক্ষ্মী-কর্ণকেও পরাজিত করিয়াছিলেন।

সুলতান মামুদ প্রথম ভীমের রাজত্বকালে সোমনাথ আক্রমণ করেন, কিন্তু অদ্যাবধি প্রাপ্ত কোন শিলালিপিতে অথবা জৈন ঐতিহাসিকদের রচনায় ইহার কোন উল্লেখ নাই। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির ইতিহাসের জন্য আমরা একান্তভাবে মুসলমান-গণের রচনার উপর নির্ভরশীল। মামুদ অনহিলওয়াড়ার নিকট উপস্থিত হইলে যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত থাকায় ভীম সম্ভবতঃ নগর ত্যাগ করেন। মামুদ সোমনাথের মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলে স্থানীয় সেনাপতিও সম্ভবতঃ সমুদ্রবক্ষে এক জাহাজে উঠিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। মন্দিরের পূজারীগণ অবশ্য পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও অসীম সাহসে আক্রমণকারীদের বাধা দিলেন। সমসাময়িক একজন মুসলমান লেখক বলেন, "মন্দিরের চারিপাশে পঞ্চাশ হাজার কাফেরকে হত্যা করা হয়। যাহারা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায় তাহারা জাহাজে করিয়া পলায়ন করে।" বিজয়ী মামুদ মন্দির লুণ্ঠন করেন। তিনি যে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন একজন আধুনিক লেখকের মতে তাহার মূল্য ১০,৫০০,০০০ পাউণ্ড। কথিত আছে যে মন্দিরের পুরোহিতগণ বিগ্রহটি নষ্ট না করা হইলে মামুদকে বহু স্বর্ণ দিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু মামুদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া হস্তস্থিত এক দণ্ডের আঘাতে 'সোমনাথের ফাঁপা উদর' বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন এবং বিগ্রহের অভ্যন্তর হইতে বহু মূল্যবান রত্ন লাভ করেন। মামুদের মৃত্যুর প্রায় ছয় শতাব্দী পরে এই কাহিনী প্রচলিত হয়। এই জন্য ইহা বাতিল করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সোমনাথ হইতে ফিরিবার পথে মামুদ অনহিলওয়াড়ায় যান নাই। তিনি মনসুরা হইয়া একটি জনবিরল পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পথে সম্ভবতঃ প্রথম ভীম কর্তৃক প্রেরিত একটি সৈন্যদল তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়াছিল। মামুদ কোন শহর বা গুজরাটের কোন অংশ অধিকার করার চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে সাফল্যের সহিত একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন।

প্রথম ভীমের উত্তরাধিকারী প্রথম কর্ণের (আনুমানিক ১০৬৪-১০৯৪ খ্রীস্টাব্দ) শাসনকাল শান্তিপূর্ণ ছিল। তাঁহার পুত্র জয়সিংহ সিদ্ধরাজ (আনুমানিক ১০৯৪-১১৪৩ খ্রীস্টাব্দ) তদানীন্তন কালের একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে গুজরাট, কাথিয়াবাড় ও কচ্ছ ছাড়াও মধ্য প্রদেশ ও

রাজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি পরমার বংশীয় যশোবর্মনকে পরাজিত করিয়া উজ্জয়িনী সহ পরমার রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করেন। তিনি চন্দেল্লগণ, সিন্ধু প্রদেশের মুসলমানগণ ও অন্য কয়েকজন ক্ষুদ্র রাজার সহিতও যুদ্ধ করেন। ভোজ পরমারের ন্যায় তিনিও বহু সৌধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পাটনে অবস্থিত বিশাল কৃত্রিম হ্রদ (সহস্রলিঙ্গ) তাঁহারই অন্যতম কীর্তি বলিয়া পরিচিত। তিনি নানাবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতকে নানাভাবে অনুগৃহীত করেন।

কুমারপাল (আনুমানিক ১১৪৪-১১৭৩ খ্রীস্টাব্দ) দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি শাকম্ভরীর চাহমান বংশীয় শাসক অর্ণোরাজকে পরাজিত করেন। মালব ও আবুর পরমার বংশীয় রাজগণ, কোঙ্কনের রাজা ও সৌরাষ্ট্রের শাসকের সহিত তাঁহার যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুমারপাল জৈন ছিলেন। তিনি নিজ রাজ্যে পশু হত্যা নিষিদ্ধ করেন। বারাণসীতেও পশুক্লেশ নিবারণের জন্য তিনি দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অজয়পালের শাসনকালে (আনুমানিক ১১৭৩-১১৭৬ খ্রীস্টাব্দ) এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তিনি বহু জৈন মন্দির ধ্বংস করেন।

দ্বিতীয় ভীমের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১১৭৮-১২৪১ খ্রীস্টাব্দ) মহম্মদ ঘূরী গুজরাট আক্রমণ করেন (১১৭৮ খ্রীস্টাব্দ)। একজন মুসলমান লেখক বলিয়াছেন, 'বয়সে তরুণ' হইলেও ভীমের অধীনে 'অগণিত বাহিনী ও বহু হস্তী ছিল, এবং যুদ্ধ শুরু হইলে ইসলামের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।' মহম্মদ গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরবর্তী দুই দশকে তিনি আর গুজরাট আক্রমণের চেষ্টা করেন নাই। ১১৯৫ খ্রীস্টাব্দে কুতবউদ্দীন অনহিলওয়াড়া লুণ্ঠন করেন। দুই বৎসর পরে তিনি আজমীর ও নাড়োলের পথে আবার অভিযান করিয়া স্বল্পকালের জন্য অনহিলওয়াড়া অধিকার করেন। সম্ভবতঃ ভীমকে মালবের পরমারগণের, শাকম্ভরীর চাহমানগণের এবং দেবগিরির যাদবগণের আক্রমণও প্রতিরোধ করিতে হয়।

এই সকল যুদ্ধের ফলে সম্ভবতঃ রাজার কর্তৃত্ব শিথিল হইয়া পড়ে এবং অধীনস্থ সামন্ত ও মন্ত্রীগণ স্বাধীন ক্ষমতা অর্জনে উৎসাহ পান। ভীমের শাসনকালের শেষের দিকে চৌলুক্য বংশের বাঘেলা শাখার প্রধান লবণপ্রসাদ সবরমতী ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী ঢোলকার আশেপাশে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিশালদেবের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১২৪৪-১২৬২ খ্রীস্টাব্দ) বাঘেলগণের রাজ্যাপহরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়। বিশালদেব অনহিলওয়াড়া অধিকার করিয়া চালুক্যদের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গুজরাটের শেষ স্বাধীন শাসক দ্বিতীয় কর্ণ ১২৯৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে গুজরাট আলাউদ্দীন খলজীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

গুহিলোত বংশ

রাণা সংগ্রাম সিংহ, রাণা প্রতাপ সিংহ এবং রাণা রাজ সিংহের কীর্তিকাহিনীর সহিত ভারতীয় ইতিহাসের সকল পাঠকই অল্পবিস্তর পরিচিত; কিন্তু গুহিলোত বংশের প্রাচীন রাজাদের সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য অতি বিরল। চারণ কবিদের গাথায় গুহিলোতগণকে রামায়ণের নায়ক রামের বংশধর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে মনে হয় তাঁহারা হূণ-গুর্জর বংশোদ্ভূত। এই রাজবংশের সর্বপ্রাচীন শিলালিপিগুলি হইতে জানা যায় যে গুহিলোতদের আদিপুরুষেরা ছিলেন গুজরাটের আনন্দপুর নিবাসী বিদেশী ব্রাহ্মণ।

কিংবদন্তী অনুসারে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাপ্পা। কিন্তু বাস্তবিক ইহা কাহারও ব্যক্তিগত নাম কিনা তাহা বলা কঠিন। এই বংশের বংশতালিকা সমন্বিত প্রাচীনতম শিলালিপিতে বাপ্পার নামোল্লেখ নাই। তালিকার প্রথম নাম গুহদত্ত। এই গুহদত্ত নামের বিকৃত রূপ 'গুহিল' হইতে 'গুহিলোত' নামটির উদ্ভব হইয়াছে। এই বংশের প্রথম রাজগণ সম্ভবতঃ সবরমতী নদীর উপত্যকার উজানের দিকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ হয়ত পরমার এবং চৌলুক্যদের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। গুহিলোতগণ কখন স্বাধীনতা অর্জন করেন তাহা জানা যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গুহিলোত রাজগণ রাজস্থানের মেবারে রাজত্ব করিতেন। জৈত্র সিংহ (আনুমানিক ১২১৮-১২৫৩ খ্রীস্টাব্দ) মুসলমানদের কয়েকটি আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। মুসলমানদের আগ্রাসী নীতি চরম পরিণতি লাভ করে ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে, যখন আলাউদ্দীন খলজী মেবার আক্রমণ করিয়া রাজধানী চিতোর অধিকার করেন।

৫. পূর্ব ভারত

রাজপুতগণের আধিপত্য পূর্বাঞ্চলে প্রসারিত হয় নাই। এই অঞ্চলে স্থানীয় রাজবংশগুলি রাজত্ব করে এবং অবশেষে মুসলমান আক্রমণের ফলে তাহাদের পতন হয়। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম কামরূপ (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা)। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে আহোম নামে এক বৈদেশিক জাতির আধিপত্য স্থাপিত হয়, এবং তাহারা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত কামরূপ শাসন করে।

বাংলার পাল রাজবংশের অভ্যুত্থান

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে (আনুমানিক ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দ) গৌড়ে বা বঙ্গদেশে রাজনৈতিক গোলযোগের যুগ শুরু হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই হিউয়েন সাঙ বঙ্গদেশ ভ্রমণে আসেন। তিনি বঙ্গদেশের চারিটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন—পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ), কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলা), সমতট (দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ) এবং

তাম্রলিপ্তি (মেদিনীপুর জেলায় তমলুক)। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়া শশাঙ্কের রাজধানী হইতে একটি দানপত্র প্রচার করেন।

আনুমানিক ৬৫০—৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব বৈদেশিক আক্রমণ আমন্ত্রণ করিয়া আনে। বৈদেশিক আক্রমণকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কনৌজের রাজা যশোবর্মন ; কথিত আছে, তিনি গৌড়রাজকে হত্যা করিয়াছিলেন। শোনা যায়, কাশ্মীরের ললিতাদিত্য এবং জয়াপীড় বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

এক শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বঙ্গদেশে যে অরাজকতা ও গোলযোগ চলিতেছিল, অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি তাহার অবসান ঘটে। তখন 'মাৎস্যন্যায়' (যে অবস্থায় বড় মাছ ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে—অর্থাৎ প্রবল দুর্বলকে ধ্বংস করে।) বা অরাজকতার ফলে প্রতিবেশীদের পরস্পরের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এই অসহনীয় অবস্থা দূর করিবার জন্য জনসাধারণ ('প্রকৃতি') গোপালকে রাজপদে বরণ করে। গোপালের পূর্বপুরুষগণ যে রাজা ছিলেন এরূপ কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। পাল রাজগণের পুরাতন শিলালিপিগুলিতে তাঁহাদের কোন পৌরাণিক বংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া দাবি করা হয় নাই, কোন প্রাচীন রাজবংশের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্কের উল্লেখ করা হয় নাই। তবে তাঁহাদের পরবর্তী শিলালিপিগুলিতে সূর্য বংশ এবং সমুদ্র হইতেও তাঁহাদের উদ্ভবের কথা পাওয়া যায়। ইঁহারা জাতিতে ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য হইতেন, তবে আবুল ফজল ইঁহাদের কায়স্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। কথিত আছে, গোপাল নালন্দাতে একটি মঠনির্মাণ ও ধর্মশিক্ষার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন।

গোপালের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহার রাজ্য ঠিক কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহাও আমরা জানি না। তবে এই বংশের প্রথম দিকের রাজাদের বঙ্গ (পূর্ব বঙ্গ) ও গৌড়ের (পশ্চিম বঙ্গ) অধীশ্বর রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। গোপালের রাজত্বকাল মোটামুটি ৭৫০-৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

ধর্মপাল

গোপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রীস্টাব্দ) দুই জন প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হন। প্রতিহারগণ মালব ও রাজস্থানে প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমশঃ পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ উত্তর ভারতের সমৃদ্ধ সমতল ভূমির প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। পালরাজগণ উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হন। এই অবস্থায় পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটগণের মধ্যে সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য ছিল।

গাঙ্গেয় উপত্যকার যে অঞ্চলে পাল বংশের অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহারই কোন স্থানে প্রতিহাররাজ বৎসরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই বৎসরাজ রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব কর্তৃক পরাজিত হন। অতঃপর ধ্রুব গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের দিকে অগ্রসর হইয়া ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু দুই বার বিজয়ী হইয়াও উত্তর ভারতে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টা না করিয়াই ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করেন। বৎসরাজ যুদ্ধে পরাজয়ের পরে রাজস্থানের মরুভূমিতে আশ্রয় লইলেন।

ধর্মপাল অতঃপর বিনা বাধায় উত্তর ভারতে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। জনৈক গুজরাটি কবি তাঁহাকে 'উত্তরাপথস্বামী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কনৌজের শাসক ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া তিনি তাঁহার পরিবর্তে চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন এবং নিজ সার্বভৌমত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যে কনৌজে এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। তথায় ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীরের রাজগণ 'রাজমুকুট কম্পিত করিয়া' তাঁহাকে অভিবাদন করেন। এই সকল রাজগণের রাজ্য ধর্মপাল অধিকার করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। বৎসরাজের অনুগত সামন্ত ইন্দ্রায়ুধের পরিবর্তে চন্দ্রায়ুধ ধর্মপালের সামন্ত রূপে কনৌজ শাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উত্তর ভারতে প্রতিহারগণের পরিবর্তে পালগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

বৎসরাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় নাগভট এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিলেন। তিনি চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন। অতঃপর তিনি পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া পাল রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে মুঙ্গেরে (বিহার) এক যুদ্ধে ধর্মপালকে পরাজিত করিলেন। এই সময় রাষ্ট্রকূটগণ আবার উত্তর ভারতের এই সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করেন এবং ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ উভয়েই স্বেচ্ছায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর তৃতীয় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ধর্মপাল পুনরায় উত্তর ভারতে নিজ সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ বিক্রমশীলা মহাবিহার (বিহারের ভাগলপুরের নিকটস্থ) স্থাপন করেন। ইহা বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়; নালন্দার পরেই ইহার স্থান ছিল। তিনি সোমপুরীতেও (উত্তর বাংলার পাহাড়পুর) আর একটি বিহার এবং ওদন্দপুরীতে (বিহার) একটি সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন। তিনি ধর্মশিক্ষার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সাহিত্যিক হরিভদ্র তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

দেবপাল

ধর্মপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দেবপাল (আনুমানিক ৮১০-৮৫০ খ্রীস্টাব্দ) কেবলমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ বিশাল পৈতৃক রাজ্যই শাসন করেন নাই, নূতন রাজ্যখণ্ডও জয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি উত্তর-পশ্চিমে কাম্বোজ ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন। শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে তিনি হূণ, গুর্জর, দ্রাবিড় ও উৎকলগণকে এবং প্রাগজ্যোতিষ (আসাম) জয় করেন। তিনি ভোজ সহ পরপর তিন জন গুর্জর-প্রতিহার রাজার বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া উত্তর ভারতে তাঁহার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। যে দ্রাবিড়গণের সহিত তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা সম্ভবতঃ পাণ্ড্যগণ, রাষ্ট্রকূট নহে। একটি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে তাঁহার রাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা যে অতিশয়োক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেবপাল বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার যশ ভারতের বাহিরে কয়েকটি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশে প্রসারিত হইয়াছিল। সুমাত্রা ও যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্রদেব তাঁহার নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়া, নালন্দায় তিনি যে সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার ব্যয়ভার বহনের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দেবপাল এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

সমসাময়িক আরবদেশীয় পর্যটক সুলেমান বলেন, 'রুম্মি'র (পাল রাজ্যের) রাজার সৈন্যসংখ্যা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারগণের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। অভিযানকালে তাঁহার সঙ্গে থাকিত প্রায় ৫০,০০০ হস্তী এবং তাঁহার সৈন্যগণের পোষাক-পরিচ্ছদ ধৌত করার জন্য থাকিত প্রায় ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০ লোক।

ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকাল প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। 'ইহার পূর্বে অথবা পরে, ব্রিটিশদের অভ্যুত্থান পর্যন্ত অন্য কোন সময়ে, বঙ্গদেশ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নাই।'

পাল সাম্রাজ্যের পতন

দেবপালের মৃত্যুর পরে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। পাল বংশের লিপিগুলিতে তাঁহার উত্তরাধিকারী বিগ্রহপাল (আনুমানিক ৮৫০-৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ) এবং নারায়ণপালের (আনুমানিক ৮৫৪-৯০৮ খ্রীস্টাব্দ) কোন সামরিক কীর্তির উল্লেখ দেখা যায় না। রাষ্ট্রকূট রাজবংশের একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের রাজগণ প্রথম অমোঘবর্ষকে কর প্রদান করিতেন। প্রথম অমোঘবর্ষ সম্ভবতঃ নারায়ণপালের রাজত্বকালে পাল রাজ্য আক্রমণ করেন।

সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটরাজ কর্তৃক দুর্বল ও শান্তিপ্রিয় পালরাজের পরাজয়ের ফলেই গুর্জর ভোজ উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপনের সুযোগ লাভ করেন। কেবলমাত্র মগধই (দক্ষিণ বিহার) নারায়ণপালের হস্তচ্যুত হয় নাই, প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল উত্তর বঙ্গও অধিকার করেন। দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ বিহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। বোধহয় রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের আক্রমণে প্রতিহারগণের শক্তিহ্রাসই ইহার কারণ। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় কৃষ্ণ নারায়ণপালকেও পরাজিত করেন ; তবে নারায়ণপালের কন্যার সহিত একজন রাষ্ট্রকূট রাজপুত্রের বিবাহের দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয়।

নারায়ণপালের তিন জন উত্তরাধিকারীর প্রায় ৮০ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে পাল রাজ্যের পতন অব্যাহত থাকে। প্রতিহার-শক্তির পতনের পরেও পালগণের বিপদের অবসান হয় নাই। চন্দেল্ল ও কলচুরিগণ পাল রাজ্য আক্রমণ করেন। উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন কয়েকটি রাজ্যের উদ্ভব হয়।

পাল বংশের লুপ্ত শক্তি ও গৌরব সাময়িকভাবে পুনরুদ্ধার করেন প্রথম মহীপাল (আনুমানিক ৯৭৮-১০৩৮ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ পুনরধিকার করেন। সমগ্র বিহারও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি দক্ষিণ দিক ও পশ্চিম দিক হইতে দুই বার আক্রমণের সম্মুখীন হন। রাজেন্দ্র চোল বাংলা আক্রমণ করিয়া পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের কোন কোন শাসককে পরাজিত করেন। অতঃপর মহীপালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। ইহা ছিল 'এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর দ্রুত অভিযান' মাত্র ; বাংলার কোন অংশে চোল রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অপর আক্রমণকারী, পরাক্রান্ত কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব, সম্ভবতঃ মহীপালের নিকট হইতে বারাণসী অধিকার করেন। মহীপাল ছিলেন ভক্তিমান বৌদ্ধ। তিনি বারাণসী, সারনাথ, নালন্দা ও বুদ্ধগয়াতে মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার করেন।

মহীপালের মৃত্যুর পরে কলচুরিরাজ কর্ণ, মহাশিবগুপ্ত যযাতি নামক কোশলের সোমবংশীয় শাসক, এবং চালুক্যরাজ চতুর্থ বিক্রমাদিত্য পাল রাজ্য আক্রমণ করেন। সামন্তগণের উচ্চাভিলাষ এবং রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে পাল রাজ্য আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। সামন্তগণের বিদ্রোহের ফলে দ্বিতীয় মহীপালের পতন (আনুমানিক ১০৭৫ খ্রীস্টাব্দ) ঘটে এবং দিব্য নামে জনৈক রাজকর্মচারী সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি কৈবর্ত্তজাতীয় ছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা রুদোক, এবং রুদোকের পরে তাঁহার পুত্র ভীম, সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই তিন জন কৈবর্ত্তজাতীয় শাসক বরেন্দ্রীতে (উত্তর বঙ্গে) শক্তি সংহত করেন এবং রাজ্যকে সমৃদ্ধ করেন। ভীমের রাজত্বকালে মালবের পরমার-বংশীয় রাজা বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা রামপাল পূর্বতন সামন্তগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া এবং কয়েকজন প্রতিবেশী শাসকের সাহায্য লইয়া ভীমকে পরাজিত ও

নিহত করেন। এইরূপে তিনি বরেন্দ্রীর অধিপতি হন। এই রাজনৈতিক বিপ্লবের কাহিনী সমসাময়িক কবি সন্ধ্যাকরনন্দী রচিত 'রামচরিত' নামক সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যের প্রতিটি শ্লোকের দুইটি অর্থ আছে—একটি রামায়ণের নায়ক রাম এবং অপরটি পাল বংশীয় রাম সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

রামপাল বিহার ও আসাম সহ বাংলার এক বৃহদংশ নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের সহিত কনৌজের গাহড়বালগণ ও উড়িষ্যার গঙ্গগণের সংঘর্ষ ঘটে। গোপালের বংশোদ্ভূত বাংলার শেষ পরিচিত শাসক মদনপাল। সেন বংশীয় বিজয় সেন তাঁহাকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তিনি অঙ্গদেশে (দক্ষিণ ও পূর্ব বিহার) রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পাল বংশের কৃতিত্ব

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল রাজালাভ করেন জনগণ ('প্রকৃতি') কর্তৃক নির্বাচনের মাধ্যমে; কিন্তু পালরাজগণ গণতান্ত্রিক, এমন কি অভিজাততান্ত্রিক, শাসন-ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেন নাই। তাঁহারা স্বৈরাচারী শাসন ও দ্বিগ্বিজয়ের প্রাচীন আদর্শই অনুসরণ করেন। তাঁহাদের বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তাঁহারা কেবলমাত্র বঙ্গদেশে 'মাৎসন্যায়ে'র অবসান করেন নাই, উত্তর ও মধ্য ভারতের বৃহৎ অংশব্যাপী এক বিশাল রাজ্যও স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁহারা যে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পূর্বে অথবা পরে বঙ্গদেশের অপর কোন রাজবংশ সেরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

পালরাজগণের রাজত্বকাল পূর্ব ভারতে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির একটি বিশিষ্ট যুগ। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বাংলায় সংস্কৃতচর্চা একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করে। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে কেবল সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক কৃষ্টিই নহে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ—উভয় ধর্মীয় সংস্কৃত সাহিত্যও পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল। তবে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্য বাদ দিলে অন্যান্য যে সকল সংস্কৃত সাহিত্যকীর্তি এখনও বিদ্যমান আছে, সেগুলি সংখ্যায় খুবই কম এবং অসম্পূর্ণ। এই যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে ছিলেন তৎকালপ্রসিদ্ধ রাজনীতিক, পণ্ডিত এবং গ্রন্থকার ভবদেব ভট্ট এবং বঙ্গীয় ধর্মশাস্ত্রের প্রথম প্রসিদ্ধ আচার্য জীমূতবাহন।

সেন বংশ

রাজপুত রাজবংশগুলি পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে বারাণসী পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত শাসন করিলেও পূর্ব ভারত তাহাদের প্রভাবাধীন হয় নাই। বঙ্গদেশ ও বিহারে পাল বংশের পতনের পরে সেন বংশের অভ্যুত্থান হয়। শিলালিপি হইতে

জানা যায়, সেনরা আদিতে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় জাতীয় ছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক (কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের কানাড়ী-ভাষী অঞ্চল) হইতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন বৃদ্ধ বয়সে বঙ্গদেশে গঙ্গাতীরনিবাসী হন, তবে তিনি যে রাজ্যশাসক ছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন বঙ্গদেশে কলচুরিগণের আক্রমণের পরে রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন।

তাঁহার পুত্র বিজয় সেন (আনুমানিক ১০৯৫—১১৫৮ খ্রীস্টাব্দ) বর্মনদিগের নিকট হইতে পূর্ব বঙ্গ এবং পালরাজগণের নিকট হইতে উত্তর বঙ্গের একাংশ জয় করেন। সম্ভবতঃ তিনি কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মিথিলার কর্ণাট বংশের প্রতিষ্ঠাতা নান্যদেবের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। শোনা যায়, তিনি কলিঙ্গও জয় করিয়াছিলেন। একটি শিলালিপি পাঠে জানা যায়, 'পশ্চিম দিকে রাজ্যজয়ের জন্য তাঁহার নৌবাহিনী গঙ্গানদী ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল'। ইহা সম্ভবতঃ কনৌজের গাহড়বাল বংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযানের বর্ণনা। তাঁহার দুইটি রাজধানী ছিল—পশ্চিম বঙ্গের বিজয়পুর এবং পূর্ব বঙ্গের বিক্রমপুর। তাঁহার শাসনকাল মোটামুটি সমৃদ্ধ ও স্মরণীয় ছিল। কবি উমাপতিধর তাঁহার সভাসদ ছিলেন।

বিজয় সেনের পরে সিংহাসন লাভ করেন তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন। সম্ভবতঃ তিনিই পালরাজগণকে বিতাড়িত করিয়া উত্তর বঙ্গ বিজয় সম্পূর্ণ করেন। মগধের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কিত প্রচলিত কাহিনী কোন শিলালিপি দ্বারা সমর্থিত হয় নাই, তবে সম্ভবতঃ পূর্ব বিহারের কিয়দংশে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। তিনি নিজে বিদ্বান ও খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। তাঁহার রচনা বলিয়া পরিচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুইখানি গ্রন্থ এখনও বর্তমান আছে। কথিত আছে, তিনি বহু সুদূরপ্রসারী সামাজিক সংস্কার করিয়াছিলেন, এবং গোঁড়া হিন্দুমতে যাগযজ্ঞের পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। তিনি শৈব ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল। সম্ভবতঃ তিনি আধুনিক পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমগ্র অংশ এবং উত্তর বিহারের কিছু অংশ শাসন করিতেন।

সেন বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন বল্লাল সেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণ সেন (আনুমানিক ১১৭৮—১২০৫ খ্রীস্টাব্দ)। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কাশ্মীরের রাজগণকে পরাজিত করেন। কথিত আছে, তিনি পুরী, বারাণসী ও এলাহাবাদে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি গাহড়বালগণের বিরুদ্ধে কিছু সামরিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, কারণ শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিহারের গয়া জেলা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদি তিনি সত্যই বারাণসী ও এলাহাবাদ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকেন,

তবে রাজ্যজয় করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, উহা ছিল সাময়িক বল প্রদর্শনের জন্য অভিযান মাত্র। মোটের উপর বলা যায় যে তিনি বঙ্গদেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত যথেষ্ট সাফল্যের সহিত অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁহার অধীনে বঙ্গদেশ উত্তর ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের শেষের দিকে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে শক্তিশালী সেন রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

ভাগ্যান্বেষী তুর্কী সৈনিক ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খলজীর অভিযানের ফলে সেন রাজ্যের ভাঙ্গনের পর্ব ত্বরান্বিত হইল। ভাগ্যান্বেষী তুর্কী সৈনিক বক্তিয়ার বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে মগধ অধিকার করেন। তারপর তিনি ঝাড়খণ্ডের জনবিরল পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া দ্রুত সৈন্য পরিচালনা করিয়া হঠাৎ নদীয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীয়ায় সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। লক্ষ্মণ সেন তখন নদীয়ায় বাস করিতেছিলেন। বৃদ্ধ সেনরাজ বোধহয় এই দুঃসাহসিক আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে (পূর্ব বঙ্গে) পলায়ন করিলেন। বক্তিয়ার নদীয়া অধিকার করিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। পরে তিনি তাঁহার প্রধান কেন্দ্র লক্ষ্মণাবতীতে স্থানান্তরিত করেন এবং উত্তর বঙ্গের কোন কোন অংশ জয় করেন। নদীয়া আক্রান্ত হইবার পরেও আরও অন্ততঃ তিন চার বৎসর লক্ষ্মণ সেন পূর্ব বঙ্গ শাসন করেন। ১২০৫ খ্রীস্টাব্দের পরে কোন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তুর্কী আক্রমণের সাফল্যে লক্ষ্মণ সেনের খ্যাতি ঢাকা পড়িলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে জীবনের প্রথম দিকে তিনি অসামান্য সামরিক কৃতিত্বেরও অধিকারী হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁহার স্থান স্মরণীয়। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা শৈব হইলেও তিনি ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি জয়দেব তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ধোয়ী, শরণ ও গোবর্ধন প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণও তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। হলায়ুধ নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান বিচারক ছিলেন। লেখক রূপে লক্ষ্মণ সেন নিজেও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তিনি তাঁহার পিতার অসমাপ্ত রচনা, 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থটি, সমাপ্ত করেন। তাঁহার রচনা বলিয়া পরিচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক বিবিধ সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিশ্বরূপ সেন কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন (আনুমানিক ১২০৭ – ১২২০ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার অধিকার সম্ভবতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল। 'তবকৎ-ই-নাসিরি' নামক ফার্সী ভাষায় লিখিত সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ অন্ততঃ ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, সম্ভবতঃ ১২৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়া-

ছিলেন। তাঁহাদের সহিত মুসলমানদের সংঘর্ষের ইঙ্গিত শিলালিপিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না।

"সেন রাজাদের কলঙ্কময় পরিণতি সত্ত্বেও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল বঙ্গদেশের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। পর পর তিন জন দক্ষ ও ক্ষমতাশালী রাজা সমগ্র প্রদেশকে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে দেবপালের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশ আর এইরূপ ঐক্য ও শক্তির আস্বাদ পায় নাই। গোঁড়া হিন্দু ধর্মকে বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া সেন রাজারা, ভারতবর্ষের অন্যত্র বহু পূর্বেই এই ধর্মের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বঙ্গদেশেও তাহা লাভ করিতে এই ধর্মকে সাহায্য করেন। সেন যুগেই বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের চরম উন্নতি দেখা যায়।...বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি যে মুসলমান শাসনকালে আংশিকভাবেও আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ কর্ণাটকের এই শক্তিশালী হিন্দু রাজবংশ কর্তৃক হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নূতন প্রেরণা ও জীবনীশক্তি সঞ্চার।"

কামরূপ

চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে রাজবংশ কামরূপ শাসন করিত, তাহারা মহাকাব্য ও পুরাণে বরাহরূপী বিষ্ণুর ও পৃথিবীর পুত্র বলিয়া বর্ণিত নরকাসুরের বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিত। সম্ভবতঃ এই কিংবদন্তী রাজবংশের অনার্য জাতি হইতে উৎপত্তির ইঙ্গিত দেয়। তবে এই রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

পুষ্যবর্মনের রাজত্বকাল হইতে কামরূপের ইতিহাস শুরু হইয়াছে। তিনি সম্ভবতঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন। ভাস্করবর্মন সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি হর্ষবর্ধনের মিত্র এবং গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের শত্রু ছিলেন। বঙ্গদেশের এক বৃহদংশ কিছুকাল তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তাঁহার আমন্ত্রণে হিউয়েং সাঙ কামরূপে গিয়াছিলেন।

পালরাজ দেবপাল কামরূপে নিজ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু শালস্ত বংশীয় হর্জরবর্মন (আনুমানিক ৮২৯ খ্রীস্টাব্দ) পাল বংশের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তাঁহার বংশধরগণ প্রায় দুই শতাব্দী রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা শিবের উপাসক ছিলেন।

অপুত্রক অবস্থায় এই বংশের শেষ রাজার মৃত্যু হইলে প্রজারা তাঁহার এক আত্মীয় ব্রহ্মপালকে রাজা নির্বাচন করে। এই বংশের কয়েকজন রাজা এক শতাব্দীর অধিককাল রাজত্ব করেন। সর্বশেষ রাজা ধর্মপাল পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। দুর্জয় ইঁহাদের রাজধানী ছিল। সাধারণতঃ এই নগরীকে গৌহাটি শহরের সহিত অভিন্ন মনে করা হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজবংশের পরিবর্তন ঘটে। বল্লভদেব বাংলার সেনবংশীয় লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক পরাজিত হন। তিনি অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী বক্তিয়ার খলজীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলমান শাসন-কর্তাগণ দুই বার (১২২৭ ও ১২৫৭ খ্রীস্টাব্দে) কামরূপ আক্রমণ করেন।

সুকফার নেতৃত্বে আহোম নামে পরিচিত শান জাতির একটি শাখা পটকই পর্বতমালার দুর্গম অঞ্চল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্বাঞ্চলে উপস্থিত হয় এবং ১২৫৩ খ্রীস্টাব্দে চরাইদেও নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। তাঁহার পুত্র সুতেউফা কাছাড়বাসীদের নিকট হইতে দিখু নদীর পূর্বতীরস্থ অঞ্চল অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র সুবিনফা (১২৮১-৯৩) ও তৎপুত্র সুখংফা (১২৯৩-১৩৩২) কামতার (পূর্ব আসাম ও উত্তরবঙ্গের কিয়দংশ) রাজার সহিত দীর্ঘদিন ধরিয়া যুদ্ধ করেন। ক্রমশঃ আহোমগণ তাহাদের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে; প্রাচীন কামরূপ ও প্রাগজ্যোতিষ নূতন রাজনৈতিক সংগঠন, নূতন সমাজ-ব্যবস্থা ও নূতন নাম লাভ করে।

উড়িষ্যা

উড়িষ্যা সম্ভবতঃ গুপ্ত সম্রাটগণের প্রত্যক্ষ শাসিত প্রদেশগুলির অন্যতম ছিল, এই অঞ্চলে কোন সামন্ত রাজা ছিল না। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে মান ও শৈলোদ্ভব নামে দুইটি স্বাধীন রাজবংশ যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ উড়িষ্যা শাসন করিত। উত্তরাংশ 'উৎকল' নামে ও দক্ষিণাংশ 'কোঙ্গদ' নামে পরিচিত ছিল। এই দুইটি রাজ্যই কিছুকালের জন্য গৌড়রাজ শশাঙ্কের অধীনে আসে। তাঁহার মৃত্যুর পরে হর্ষবর্ধন উৎকল এবং কোঙ্গদ অধিকার করেন। হিউয়েন সাঙ উড়িষ্যা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কোঙ্গদ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন: 'এই রাজ্যের সীমানার মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র শহর আছে। তাহারা পর্বতের পার্শ্ববর্তী এবং সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত। শহরগুলি উচ্চস্থানে অবস্থিত এবং শক্তিশালী। সৈন্যগণ সাহসী ও উদ্যমী; তাহারা নিজ শক্তির দ্বারা পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলি শাসন করে, কেহ তাহাদের বাধা দিতে পারে না'।

হর্ষবর্ধনের উড়িষ্যা জয়ের পরেও শৈলোদ্ভব বংশীয়গণ কোঙ্গদ শাসন করিতে থাকে। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহারা পুনরায় স্বাধীন হইয়া শক্তিবৃদ্ধি করেন। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহাদের শাসনের অবসান হয়। পরবর্তী সার্ধ দুই শতাব্দী কাল বিভিন্ন রাজবংশ উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করেন। ভৌম বা কর বংশের রাজধানী ছিল গুহদেব-পটক (বা গুহেশ্বর-পটক)। ভঞ্জ রাজবংশের দুইটি প্রধান শাখা ছিল। ইহা ব্যতীত কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজবংশও ছিল।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গ বংশ (Eastern Gangas) নামে পরিচিত একটি রাজবংশ কলিঙ্গদেশে ক্ষমতা লাভ করে। সম্ভবতঃ ইহা মহীশূরের

গঙ্গ বংশের একটি শাখা ছিল। এই বংশের আদি রাজগণের রাজধানী ছিল কলিঙ্গনগর (গঞ্জাম জেলার মুখলিঙ্গম্)। দশম শতাব্দীতে এই রাজ্যটি সম্ভবতঃ রাজ পরিবারের বিভিন্ন শাখার অধীনে পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গ বংশ চোলরাজগণের অনুগত মিত্র ছিল। অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৫০) চোল, কলচুরি ও পরমারগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের কিয়দংশ অধিকার করেন। তাঁহার রাজ্য গোদাবরী নদী হইতে গঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে উড়িষ্যা বঙ্গদেশ শাসনকারী তুর্কীগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতে বাধ্য হয়। প্রথম নরসিংহ (আনুমানিক ১২৩৮-৬৪) আত্মরক্ষার পরিবর্তে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করেন। তাঁহার সৈন্যদল বঙ্গদেশের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং কিছুকালের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ তাঁহার অধিকারে আসে। বঙ্গদেশে তাঁহার সামরিক অভিযানের কোন স্থায়ী ফল না হইলেও তিনি উড়িষ্যাকে তুর্কী আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিয়াছিলেন। তিনি কোনারকের অপূর্ব সূর্য মন্দির নির্মাণ করেন।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে উড়িষ্যা অতি উচ্চস্থানের অধিকারী। সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত উড়িষ্যায় অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়। নির্মাণকার্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল ভুবনেশ্বর। এই মন্দির-নগরীতে অবস্থিত, শিবের উদ্দেশ্যে নির্মিত, লিঙ্গরাজ মন্দির উড়িষ্যার স্থাপত্য শিল্পের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপের নিদর্শন। বারবার সংস্কার করার ফলে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদি শিল্পসৌন্দর্য বিনষ্ট হইয়াছে। কোনারকের সূর্য মন্দির উড়িষ্যার স্থাপত্যের পরিপূর্ণতার নিদর্শন। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম নরসিংহের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। ইহাকে 'কৃষ্ণ প্যাগোডা' (Black Pagoda) বলা হয়, কারণ দূর হইতে দেখিলে ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া মনে হয়। উড়িষ্যার এই মন্দিরগুলি 'নগর' রীতিতে নির্মিত।

দশম অধ্যায়

গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত

বাতাপির পশ্চিম চালুক্য বংশের অভ্যুত্থান

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চালুক্য বংশের বিভিন্ন শাখা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করে। সম্ভবতঃ এই বংশের পূর্বপুরুষ চল্ক, চলিক অথবা চালুকের নাম হইতে চালুক্য নামের উদ্ভব হয়। পরবর্তী কালে চালুক্যরাজগণ দাবি করেন যে ঋষি হারীতি পঞ্চশিখের চুল্ক অথবা কমণ্ডলু হইতে তাঁহাদের উদ্ভব হইয়াছিল। কল্যাণীর চালুক্যগণের লেখগুলিতে মনু অথবা চন্দ্র হইতে এই বংশের উদ্ভব হইয়াছিল এবং উত্তর ভারতের অযোধ্যার সহিত ইহাদের যোগ ছিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাতাপির (কর্ণাটকের বিজাপুর জেলায় অবস্থিত বাদামী) নিকটবর্তী কানাড়ী ভাষা-ভাষী অঞ্চলে পশ্চিম অঞ্চলের চালুক্য বংশের (Western Chalukyas) শাসনের সূত্রপাত হয়। সম্ভবতঃ এই বংশের প্রথম স্বাধীন শাসক ছিলেন প্রথম পুলকেশী (আনুমানিক ৫৩৫-৫৬৬ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি বাতাপিতে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কথিত আছে, তিনি অশ্বমেধ প্রভৃতি কয়েকটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের আয়তন এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্রাটের মর্যাদা লাভের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী কীর্তিবর্মন (আনুমানিক ৫৬৬-৫৭৮ খ্রীস্টাব্দ) উত্তর কোঙ্কন এবং উত্তর কানাড়া পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন; সম্ভবতঃ তিনি বেল্লারি ও কুর্নল জেলাও অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কদম্বগণের পক্ষে 'ধ্বংসের রাত্রি' (অর্থাৎ ধ্বংসকারী) ছিলেন, একথা বলা হইয়াছে। তিনি 'বাতাপির প্রথম স্রষ্টা' উপাধি গ্রহণ করেন। ইহা হইতে মনে হয় যে তিনি প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করিয়া নগরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা এবং উত্তরাধিকারী প্রথম মঙ্গলেশ (আনুমানিক ৫৯৮-৬১১ খ্রীস্টাব্দ) দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চলে কলচুরিগণকে বশীভূত করেন এবং কোঙ্কন উপকূলে রত্নগিরি জেলা অধিকার করেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (কীর্তিবর্মনের পুত্র) পুলকেশী এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। মঙ্গলেশকে নিহত করিয়া পুলকেশী সিংহাসন অধিকার করেন।

চালুক্য শক্তির চরম উন্নতি: দ্বিতীয় পুলকেশী

দ্বিতীয় পুলকেশী (আনুমানিক ৬১১-৬৪২ খ্রীস্টাব্দ) 'সত্যাশ্রয়' নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর বিদ্রোহী সামন্তগণকে দমন করিতে

এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিতে কাটিয়া যায়। সিংহাসনের উত্তরাধিকারের জন্য যুদ্ধের ফলে 'সমগ্র পৃথিবী শত্রুরূপী অন্ধকারে আবৃত হইয়াছিল।' পৈতৃক রাজ্যে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি রাজ্যজয়ের সূত্রপাত করেন। ৬৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দে জৈন কবি রবিকীর্তি রচিত আইহোল প্রশস্তিতে তাঁহার দিগ্বিজয়ের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। দক্ষিণে তিনি কদম্বগণের রাজধানী বনবাসী (উত্তর কানাড়া) অধিকার করেন, মহীশূরের গঙ্গগণের মনে ভয়ের সঞ্চার করেন, এবং উত্তর কোঙ্কনের মৌর্যগণকে পদানত করেন। দক্ষিণ গুজরাটের লাটগণ, মালবগণ এবং গুর্জরগণ (সম্ভবতঃ ব্রোচ অঞ্চলের) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। কনৌজের হর্ষ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন, এবং উত্তর ভারতের এই পরাক্রান্ত রাজার নর্মদা নদীর দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারের আশা বিফল হয়। মহাকোশল (মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত) ও কলিঙ্গের রাজগণ চালুক্য বাহিনীর আগমন সংবাদে ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। পিষ্টপুরের দুর্গ (গোদাবরী জেলায় অবস্থিত পিঠপুরম) তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে। পিষ্টপুরের রাজবংশের অবসান হয় এবং পুলকেশীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ-বিষ্ণুবর্ধন এই রাজ্যের শাসক নিযুক্ত হন। তিনি পূর্বাঞ্চলের চালুক্য বংশের (Eastern Chalukyas) প্রতিষ্ঠাতা। পুলকেশী পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী কাঞ্চীর কয়েক মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। বিজয়ী চালুক্য বাহিনী কাবেরী নদী অতিক্রম করিলে চোল, কেরল এবং পাণ্ড্যগণ পুলকেশীর অধীনতা স্বীকার করে। এইরূপে চালুক্যরাজ দক্ষিণ ভারতের একটি বৃহৎ অংশ—নর্মদা নদী হইতে কাবেরী নদীর দক্ষিণের জেলাগুলি পর্যন্ত—নিজ শাসনে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের তিনটি শক্তিশালী রাজ্যের ('মহারাষ্ট্রক') উপর আধিপত্য বিস্তার করেন—মহারাষ্ট্র (হিউয়েন সাঙের বিবরণে উল্লিখিত চালুক্য রাজ্য), কোঙ্কন এবং কর্নাট। কিন্তু তাঁহার জীবন অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে শেষ হয়। ৬৪২ খ্রীস্টাব্দে পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন বাতাপি বিধ্বস্ত করিয়া সম্ভবতঃ স্বহস্তে পুলকেশীকে হত্যা করেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী নিঃসন্দেহে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি পারস্যের শাসক দ্বিতীয় খসরুর সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁহার সহিত দূত বিনিময় করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দ্বিতীয় পুলকেশী কর্তৃক পারস্যের দূতগণকে অভ্যর্থনার চিত্র অজন্তার গুহায় অঙ্কিত রহিয়াছে।

চালুক্য রাজ্য সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ

দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রের জমিকে খুব উর্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "এই দেশের অধিবাসীরা গর্বিতপ্রকৃতি এবং যুদ্ধপ্রিয়, সদ্ব্যবহারে কৃতজ্ঞ এবং অসদ্ব্যবহারে

প্রাতশোধপরায়ণ, শরণার্থী আর্তগণের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত এবং অবমাননাকারীর প্রাণনাশের জন্য রক্তক্ষয়ে উন্মুখ। তাহাদের সেনাবাহিনীর পুরোভাগ রক্ষায় নিযুক্ত নায়কগণ মত্ত অবস্থায় যুদ্ধে যোগ দিতেন, যুদ্ধের পূর্বে তাহাদের রণহস্তীগণকে মদ্যপানে মত্ত করিয়া তোলা হইত।" দ্বিতীয় পুলকেশী সম্বন্ধে চীনা পর্যটক বলিয়াছেন, "রাজার অধীনে এইরূপ যোদ্ধার দল ও হস্তিযূথ আছে বলিয়া তিনি প্রতিবেশী রাজগণকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহার কর্মক্ষেত্রের বিস্তার সুদূরপ্রসারী, তাঁহার জনহিতকর কার্যাবলীর প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত অনুভূত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রজাগণ সম্পূর্ণ বশ্যতা সহকারে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া থাকে।"

বাতাপির চালুক্য বংশের পতন

দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে চালুক্য বংশের প্রতিপত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫–৬৮১ খ্রীস্টাব্দ) পল্লবগণের কবল হইতে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন। পল্লবদের সহিত সংগ্রাম চলিতে থাকে, পল্লব রাজধানী লুণ্ঠিত হয় এবং চোল, কেরল ও পাণ্ড্যরাজগণ পুনরায় চালুক্যগণের শক্তি উপলব্ধি করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম বিনয়াদিত্য ও প্রথম বিজয়াদিত্য পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। তাঁহারা ৬৮১ হইতে ৭৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রথম বিনয়াদিত্যকে 'সমগ্র উত্তরাপথের অধিপতি'কে পরাজিত করার গৌরব দান করা হইয়াছে। এই 'উত্তরাপথপতি' সম্ভবতঃ ছিলেন 'পরবর্তী' গুপ্তবংশীয় আদিত্যসেনের কোন বংশধর। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৭৩৩-৭৪৬ খ্রীস্টাব্দ) চালুক্য বাহিনী আবার পল্লবগণকে পরাজিত করিয়া পল্লব রাজধানী লুণ্ঠন করে। চোল ও পাণ্ড্যগণ এবং মালাবারের অধিবাসীগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। সিন্ধু প্রদেশের আরবগণ চালুক্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত লাট (দক্ষিণ গুজরাট) আক্রমণ করিলে তাহাদের বিতাড়িত করা হয়। এইভাবে দক্ষিণ ভারত 'আরব-আতঙ্ক' হইতে অব্যাহতি লাভ করে। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনকে (৭৪৬—৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ) পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকূট বংশীয় শাসক দন্তিদুর্গ মহারাষ্ট্র অধিকার করেন। এইভাবে চালুক্য শাসনের অবসান ঘটে (আনুমানিক ৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ)। পল্লবগণের সহিত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ফলে চালুক্যগণের শক্তিক্ষয় হয় এবং তাঁহাদের পতন ঘটে।

বাতাপির চালুক্য শাসনে ধর্ম ও শিল্প

চালুক্য রাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দু, তবে তাঁহারাও পরমতসহিষ্ণুতার ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, তবে হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে মনে হয় তাহা

তখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। চীনা পর্যটক শতাধিক বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পান। এই সময় দক্ষিণ ভারতে জৈন ধর্মের বেশ প্রসার হয়। চালুক্য রাজগণ দিগম্বর সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উদ্দেশ্যে বাতাপি ও পত্তদকলে (কর্ণাটকের বিজাপুর জেলায়) বড় বড় মন্দির নির্মিত হয়। এই সময় পর্বতগাত্র ক্ষোদিত করিয়া গুহা-মন্দির নির্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। চালুক্য রাজগণের শাসনে 'দ্রাবিড়' নামে পরিচিত স্থাপত্য রীতি বিকাশ লাভ করে। চালুক্য রাজগণ চিত্রশিল্পেরও অনুরাগী ছিলেন। অজন্তার গুহাগাত্রে অঙ্কিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ চিত্র সম্ভবতঃ চালুক্য যুগেরই সৃষ্টি।

রাষ্ট্রকূট বংশের আদি ইতিহাস

রাষ্ট্রকূটগণ দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দুই শতাব্দীরও অধিককাল প্রভুত্ব করেন ; কিন্তু ভারতের অন্যান্য অনেক প্রাচীন রাজবংশের ন্যায় তাঁহাদের উৎপত্তির ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই বংশের পরবর্তী রাজগণ 'মহাকাব্য'-বর্ণিত নায়ক যদুকে পূর্ব-পুরুষ বলিয়া দাবি করিতেন, কিন্তু এইরূপ কিংবদন্তীকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। কোন কোন ঐতিহাসিক রাষ্ট্রকূটগণের সহিত অশোকের একটি অনুশাসনে উল্লিখিত রাষ্ট্রিকগণের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করেন। কোন কোন চালুক্য লিপি হইতে জানা যায় যে রাষ্ট্রকূটগণ প্রথমে অন্ধ্রপ্রদেশীয় কৃষিজীবী ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায়, তাঁহারা বংশানুক্রমে চালুক্যরাজদের অধীনে সামন্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল কর্নাটকে (মহারাষ্ট্রে নহে), এবং তাঁহাদের মাতৃভাষা ছিল কানাড়ী। সাধারণতঃ তাঁহাদের মান্যখেতের (মালখেড়, অন্ধ্রপ্রদেশ) রাষ্ট্রকূট বলিয়া অভিহিত করা হয়, যদিও সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন প্রথম অমোঘবর্ষ। তাঁহাদের আদি রাজধানী কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না।

রাষ্ট্রকূট-শক্তির প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনের নিকট হইতে মহারাষ্ট্র জয় করেন। কথিত আছে, তিনি দক্ষিণ কোশল (মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত), মালব, লাট (দক্ষিণ গুজরাট) এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমসাময়িক রাজগণকে পরাজিত করেন। তিনি উজ্জয়িনী নগরে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ককে তিনি লাট প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার পিতৃব্য প্রথম কৃষ্ণ (৭৫৮-৭৭২ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন, কোঙ্কন পদানত করেন, কর্নাটকের গঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন, এবং বেঙ্গীর পূবাঞ্চলীয় চালুক্যরাজ চতুর্থ বিষ্ণুবর্ধনকে পরাজিত করেন। তিনি সম্রাট মর্যাদাজ্ঞাপক উপাধি গ্রহণ করেন।

মহারাষ্ট্র ছাড়াও মধ্যপ্রদেশের মারাঠীভাষী প্রায় সমগ্র অঞ্চল তাঁহার শাসনাধীনে আসে। তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্তি ইলোরায় (মহারাষ্ট্রে) পাহাড় কাটিয়া বিখ্যাত শিব মন্দির নির্মাণ। ইহা চালুক্যগণের দ্বারা প্রবর্তিত 'দ্রাবিড়' রীতিতে নির্মিত হয়। মন্দির গাত্র অপরূপ ভাস্কর্যমণ্ডিত। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক ইহাকে 'ভারতের ভাস্কর্যের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ কাজ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ (৭৭৩-৭৮০ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুব তাঁহাকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের গৌরবময় যুগ

রাষ্ট্রকূটগণের গৌরবের যুগ শুরু হয় ধ্রুব 'নিরুপমে'র রাজত্বকাল হইতে (৭৮০-৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করেন। গঙ্গরাজ তাঁহার নিকট পরাজিত হন এবং তাঁহার রাজ্য অধিকৃত হয়। কাঞ্চীর পল্লবরাজও পরাজিত হন। অতঃপর ধ্রুব উত্তরদিকে মনোযোগ দেন এবং গুর্জর-প্রতিহার ও পালরাজগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ শুরু হয়। তিনি প্রতিহার বৎসরাজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন ; বৎসরাজ রাজস্থানের মরুভূমিতে পলায়ন করেন। পালরাজ ধর্মপালও পরাজিত হন। কিন্তু ধ্রুব উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্র কনৌজ অধিকার করেন নাই, কারণ দাক্ষিণাত্যে তাঁহার শক্তিকেন্দ্র এই অঞ্চল হইতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। উত্তরাঞ্চলে অভিযানের ফলে তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত না হইলেও রাষ্ট্রকূটগণের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

ধ্রুবের মৃত্যু অথবা সিংহাসন ত্যাগের পরে (আনুমানিক ৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ) উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে তাঁহার পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ 'জগত্তুঙ্গ' (৭৯৩-৮১৪ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসন অধিকার করেন। রাষ্ট্রকূট রাজ্যে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গোবিন্দ উত্তর ভারত যাত্রা করেন। তিনি প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করেন, এবং ধর্মপাল ও তাঁহার অনুগত কনৌজরাজ চক্রায়ুধ স্বেচ্ছায় তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁহার পিতার ন্যায় গোবিন্দও কনৌজ অধিকার করেন নাই। তবে তিনি উত্তর ভারতের বহু রাজার দর্প চূর্ণ করেন। তিনি যখন উত্তর ভারতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় দক্ষিণে পাণ্ড্যগণ, এবং কাঞ্চী, গঙ্গবেড়ী (কর্নাটকের গঙ্গ রাজ্য) এবং কেরলের রাজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হন। গোবিন্দ এই দুর্জয় শক্তিসমবায় বিধ্বস্ত করিয়া দক্ষিণ ভারতে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করেন। তিনি পাণ্ড্য, পল্লব, চোল, গঙ্গ, কেরল, অন্ধ্র, চালুক্য, মৌর্য, বঙ্গ, গুর্জর, কোশল, অবন্তী এবং সিংহলের রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করেন।

গোবিন্দের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র সর্ব। ইনি

তাঁহার 'প্রথম অমোঘবর্ষ' উপাধি দ্বারাই পরিচিত (আনুমানিক ৮১৪-৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ)। সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি নাবালক ছিলেন। তাঁহার অভিভাবক ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের গুজরাট শাখার কর্ক। রাজার নাবালকত্বের সুযোগে কোন কোন করদ রাজা বিদ্রোহ করেন, এবং অমোঘবর্ষ সিংহাসনচ্যুত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সিংহাসন পুনরধিকার করেন। তখনও তাঁহার বয়স অল্প ছিল, সামরিক অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। পরবর্তী কালে তিনি বেঙ্গীর চালুক্যরাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কথিত আছে, তিনি ভারতের পূর্বাঞ্চলেও (বিহারে ও বঙ্গে) রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু এই দাবির বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। বস্তুতঃ অমোঘবর্ষের সামরিক দুর্বলতার জন্যই পাল ও গুর্জর-প্রতিহার রাজগণ উত্তর ভারতের প্রভুত্বের জন্য সংগ্রাম করিবার সুযোগ পান। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে পালরাজ ধর্মপালের সহিত তাঁহার কখনও কখনও সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল।

মনে হয়, অমোঘবর্ষ সামরিক অভিযান অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্য চর্চায় অধিক উৎসাহী ছিলেন। তিনি জৈন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, তবে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের আচরিত ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং হর্ষের ন্যায় তিনি নিজেও ছিলেন একজন গ্রন্থকার। তিনি মান্যখেত নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।

আরব পর্যটক ও ইতিবৃত্তকারগণ রাষ্ট্রকূট রাজগণকে 'বল্‌হরা' উপাধি ভূষিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে সংস্কৃত 'বল্লভরাজ' শব্দের আরবীয় অপভ্রংশ। সুলেমান নামে একজন বণিক নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি 'দীর্ঘজীবী বল্‌হরা'র (অর্থাৎ প্রথম অমোঘবর্ষের, যাঁহার রাজত্বকাল ইতিহাসে লিপিবদ্ধ দীর্ঘতম রাজত্বকালসমূহের অন্যতম) কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: তাঁহাকে বিশ্বের চারিজন শ্রেষ্ঠ নরপতির অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হইত; অপর তিনজন ছিলেন বাগদাদের খলিফা, চীনের সম্রাট এবং কনস্তান্তিনোপলের সম্রাট। রাষ্ট্রকূট রাজগণ সিন্ধুর আরবদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতেন এবং প্রজাদেরও আরবদের সহিত বাণিজ্য করিতে উৎসাহ দিতেন। এই মুসলমান-ঘেঁষা নীতির কারণ সম্ভবতঃ গুর্জর প্রতিহারগণের সহিত রাষ্ট্রকূট ও আরব—উভয় পক্ষেরই শত্রুতা। আরব লেখকগণের রচনা হইতে মনে হয় যে 'বল্‌হরা'গণ মুসলমানদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে নিজেদের রাজ্যের অন্তর্গত নগরীর শাসনকর্তাও নিযুক্ত করিতেন।

প্রথম অমোঘবর্ষের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় কৃষ্ণ 'অকালবর্ষ' (৮৭৮-৯১৩ খ্রীস্টাব্দ) শাসক হিসাবে বিশেষ কৃতী ছিলেন না। বেঙ্গীর পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যগণের সহিত এবং মালবের পরমাররাজ ভোজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের ফলে রাষ্ট্রকূট বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার পৌত্র তৃতীয়

ইন্দ্র 'নিত্যবর্ষ' (৯১৪-৯২২ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দের সামরিক গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি কনৌজের গুর্জর-প্রতিহারগণের গর্ব খর্ব করিতেও সমর্থ হন। তিনি প্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা কেহই উত্তর ভারতের এই রাজনৈতিক কেন্দ্রটিকে অধিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরে দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ এবং তৃতীয় অমোঘবর্ষ পর পর আনুমানিক ৯২৭-৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহারা দুর্বল রাজা ছিলেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ শক্তিশালী শাসক তৃতীয় কৃষ্ণ (আনুমানিক ৯৩৯-৯৬৭ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি সম্ভবতঃ উত্তরদিকে বুন্দেলখণ্ড ও মালব আক্রমণ করেন এবং পরমারগণের নিকট হইতে উজ্জয়িনী অধিকার করেন। দক্ষিণে চোলগণের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। তিনি কাঞ্চী ও তাঞ্জোর অধিকার করেন এবং তোক্কলমের যুদ্ধে (৯৪৯ খ্রীস্টাব্দ) চোলগণকে পরাজিত করেন। তিনি চোল রাজ্যের একাংশ (তোণ্ডমণ্ডলম্) অধিকার করেন। তিনি রামেশ্বরে অথবা উহার নিকটে মন্দির নির্মাণ করেন। ইহা হইতে মনে হয় যে তাঁহার অধিকার ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি বেঙ্গীতে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তিনি নিজেকে 'সকল দক্ষিণ দিগাধিপতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের পতন

৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের পরে তৃতীয় কৃষ্ণের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার ফলে রাষ্ট্রকূট রাজগণের সৌভাগ্য অস্তগামী হয়। তাঁহার ভ্রাতা খোট্টিগের রাজত্বকালে পরমাররাজ সিয়ক-হর্ষ রাজধানী মান্যখেত লুণ্ঠন করেন। এই বংশের শেষ শাসক চতুর্থ অমোঘবর্ষ পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যরাজ তৈলপ কর্তৃক ৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে পরাজিত হন।

বেঙ্গীর পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য বংশ

বাতাপির দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার রাজ্যের পূর্বাঞ্চল শাসনের ভার দেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ-বিষ্ণুবর্ধনের উপর (৬৩১ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার রাজধানী ছিল পিষ্টপুর। এইভাবে এক নূতন রাজ্যের উদ্ভব হয়। পরে প্রাচীন বেঙ্গী নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। দশম শতাব্দীতে রাজমহেন্দ্রীতে রাজধানী স্থাপিত হয়।

কুব্জ-বিষ্ণুবর্ধন স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। যে পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য বংশ (Eastern Chalukyas) অন্ধ্রদেশ এবং কলিঙ্গের কিয়দংশ চার শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া শাসন করেন, তিনি তাহার প্রতিষ্ঠাতা।

বাতাপির পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের পতনের পর অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে

দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য বংশের ভাগ্যও বারবার পরিবর্তিত হইয়াছিল। চতুর্থ বিষ্ণুবর্ধন (আনুমানিক ৭৬৪-৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ) সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের অনুগত মিত্র ছিলেন। দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য (আনুমানিক ৭৯৯-৮৪৬ খ্রীস্টাব্দ) প্রথম অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের কিয়দংশ বিধ্বস্ত করেন, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রকূটগণের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। তৃতীয় বিজয়াদিত্য (৮৪৬-৮৯২ খ্রীস্টাব্দ) পল্লব, পাণ্ড্য, রাষ্ট্রকূট ও কলচুরিদের পরাজিত করেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে।

দশম শতাব্দীতে উত্তরাধিকারের যুদ্ধের ফলে পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যগণ দুর্বল হইয়া পড়েন। রাষ্ট্রকূটদের পতনের পর তাঁহারা চোলগণের অনুগত মিত্রে পরিণত হয়। কুলোত্তুঙ্গ চোলের মাতা ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যবংশীয়া। কুলোত্তুঙ্গ ১০৭৬ খ্রীস্টাব্দে পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

কল্যাণের পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য বংশ

কল্যাণের চালুক্যগণ সম্ভবতঃ বাতাপির চালুক্যগোষ্ঠীর এক শাখা ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা তৈলপ ৯৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রকূট রাজ দ্বিতীয় কর্ককে পরাজিত করিয়া চালুক্য-শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার চব্বিশ বৎসরের (আনুমানিক ৯৭৩-৯৭৯ খ্রীস্টাব্দ) দীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি মালবের পরমার রাজ্যের দক্ষিণাংশ সহ এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের শাসক হন। তিনি পরমাররাজ মুঞ্জকে পরাজিত ও ধৃত করিয়া হত্যা করেন।

মুঞ্জের নিকট হইতে অধিকৃত মালবের রাজ্যাংশ তৈলপের উত্তরাধিকারী সত্যাশ্রয়ের (৯৯৭-১০০৮ খ্রীস্টাব্দ) রাজত্বকালে পরমাররাজ সিন্ধুরাজ কর্তৃক অধিকৃত হয়। সত্যাশ্রয়ের রাজ্য রাজরাজ চোল আক্রমণ করেন।

দ্বিতীয় জয়সিংহ 'জগদেকমল্লের' রাজত্বকালে (১০১৫-১০৪৩ খ্রীস্টাব্দ) কলচুরি গাঙ্গেয়, পরমার ভোজ এবং রাজেন্দ্র চোল সংঘবদ্ধ হন এবং একই সময়ে চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করেন। জয়সিংহ সম্ভবতঃ তাঁহাদের সকলকেই প্রতিহত করেন।

জয়সিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্ল (১০৪৩-১০৬৮ খ্রীস্টাব্দ) চোলদের সহিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। রাজরাজ চালুক্য রাজধানী কল্যাণ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া নগরীটি লুণ্ঠন করেন। আরো দুই বার চালুক্য রাজ্য আক্রান্ত হয়। শেষ যুদ্ধ হয় কোপ্পমে (১০৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দ)। চোলরাজ রাজাধিরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় রাজেন্দ্র সৈন্যগণকে পুনরায় সংঘবদ্ধ করিয়া যুদ্ধজয় করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইতিমধ্যে সোমেশ্বর চোল রাজশক্তির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র কাঞ্চী অধিকার করেন। চোল ও চালুক্যগণের এই বিরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। সোমেশ্বর কয়েকবার পরাজিত হন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের কোন অংশ তাঁহার হস্তচ্যুত হয়

নাই। তাঁহার রাজত্বকালের শেষের দিকে বীর রাজেন্দ্র চোল কুদালের যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন।

চোলগণ ব্যতীত অন্য অনেক রাজবংশের সহিত সোমেশ্বরের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। তিনি গুজরাট ও মালব বিধ্বস্ত করেন। তিনি চৌলুক্যবংশীয় ভীম ও কলচুরি বংশীয় কর্ণকে পরাজিত করেন, এবং পরমার বংশীয় একজন রাজাকে ধারার সিংহাসনে স্থাপন করেন। কথিত আছে, তিনি বঙ্গ, মগধ, নেপাল, কনৌজ, পাঞ্চাল, কুরু ও আভীর রাজ্য জয় করেন। তিনি গৌড়, কামরূপ, পাণ্ড্য রাজ্য ও সিংহলে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়াও শোনা যায়। এই সকল অতিশয়োক্তির সম্ভবতঃ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

প্রথম সোমেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সোমেশ্বর (১০৬৮-১০৭৬ খ্রীস্টাব্দ) অত্যাচারী রাজা ছিলেন। অল্পদিন রাজত্ব করিবার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বা ত্রিভুবনমল্ল (১০৭৬-১১২৬ খ্রীস্টাব্দ) তাঁহাকে অপসারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাতাপির প্রাচীন চালুক্য বংশের রাজাদের কথা বিবেচনা করিলে ইঁহাকে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বলিতে হইবে। বিক্রমাদিত্য (বা বিক্রমাঙ্ক) কবি বিহ্লন রচিত 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে'র নায়ক। 'ইহা সংস্কৃত ভাষার অল্প কয়েকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের অন্যতম'। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যরাজগণের মধ্যে নিঃসন্দেহে তিনি শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। প্রথম সোমেশ্বরের রাজত্বকালের সামরিক সাফল্য তাঁহার নেতৃত্ব ও উদ্যমের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের বৎসর—১০৭৬ খ্রীস্টাব্দ—তৎপ্রবর্তিত 'চালুক্য বিক্রম অব্দে'র প্রথম বৎসর। তিনি অনহিলওয়াড়ার চৌলুক্যগণ, চোলগণ ও হোয়সলরাজ বিষ্ণুবর্ধনের সহিত সাফল্যের সহিত যুদ্ধ করেন। হোয়সলগণ, গোয়ার কদম্বগণ, কাকতীয়গণ এবং আরও অনেক নৃপতি তাঁহার অধীন ছিলেন। তিনি সিংহলের রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। শান্তির ক্ষেত্রে বিজয়ের জন্যও তাঁহার অর্ধশতাব্দীকালস্থায়ী রাজত্বকাল কম উল্লেখযোগ্য নহে। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বিহ্লন নামে একজন কাশ্মীরী কবি এবং 'মিতাক্ষরা' নামক হিন্দু আইন সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র ও উত্তরাধিকারী তৃতীয় সোমেশ্বর (১১২৬-১১৩৮ খ্রীস্টাব্দ) পিতার ন্যায় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন গ্রন্থকার। তিনি হোয়সলদের এক অভিযান প্রতিহত করেন। কথিত আছে, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, মগধ ও নেপালের রাজগণ তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী প্রশস্তি মাত্র। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জগদেকমল্ল (আনুমানিক ১১৩৮-১১৫১ খ্রীস্টাব্দ) মালবের একাংশ অধিকার করেন। তিনি অনহিলওয়াড়ার অধিপতি কুমারপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং হোয়সলদের আক্রমণ প্রতিহত করেন।

দ্বিতীয় জগদেকমল্লের মৃত্যুর পরে পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যদের শক্তি রাহুগ্রস্ত হয়। ১১৫৬ খ্রীস্টাব্দে কলচুরিগণের যুদ্ধসচিব বিজ্জল বা বিজ্জন কল্যাণের সিংহাসন অপহরণ করেন। দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে তাঁহার শাসনকালের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার মন্ত্রী বাসব 'বীর শৈব' বা 'লিঙ্গায়েত' নামক ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও কর্নাটকে ও কানাড়ীভাষী অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের বহু অনুগামী আছেন। এই সম্প্রদায় 'ভক্তি'র উপর বিশেষ জোর দিত এবং শিব ('লিঙ্গ' আকারে) ও তাঁহার বাহন নন্দীর পূজা করিত। লিঙ্গায়েত সম্প্রদায় বেদের মাহাত্ম্য স্বীকার করিত না এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধী বহু রীতিনীতি পালন করিত (যেমন, বিধবা বিবাহ, উপবীত পরিত্যাগ, ইত্যাদি)।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চালুক্যবংশীয় চতুর্থ সোমেশ্বর তাঁহার পিতৃপুরুষদের রাজ্যের একটি বৃহদংশ উদ্ধার করেন। দেবগিরির যাদব বংশের অভ্যুত্থান এবং হোয়সলগণের সহিত সংঘর্ষের ফলে পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য বংশের পতন হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য-শাসনের অবসান হয়।

কদম্ব বংশ

ময়ূরশর্মন নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন কদম্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করায় তিনি ক্ষত্রিয় রূপে গণ্য হইয়া ময়ূরবর্মন নামে পরিচিত হন। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি কর্নাটকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার রাজধানী ছিল বনবাসী। এই বংশের প্রথম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন ককুৎস্থবর্মন। রবিবর্মন খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজত্ব করিতেন। তিনি হালসিতে (মহারাষ্ট্রের বেলগাঁও জেলা) রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি গঙ্গ ও পল্লবগণকে পরাজিত করেন। চালুক্যবংশীয় প্রথম পুলকেশী ও দ্বিতীয় পুলকেশী কদম্বগণের ক্ষমতা হ্রাস করেন, এবং গঙ্গগণ তাঁহাদের রাজ্যের দক্ষিণাংশ অধিকার করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কদম্ব বংশের কোন কোন শাখা গোয়া সহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিল। কদম্ব রাজ্যে প্রচলিত প্রধান ধর্মমত ছিল শৈব ধর্ম ও জৈন ধর্ম।

পশ্চিমাঞ্চলীয় গঙ্গ বংশ

গঙ্গরাজগণ ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন। তাঁহাদের রাজ্য সাধারণতঃ গঙ্গবড়ী নামে পরিচিত ছিল। কর্নাটকের একটি বৃহৎ অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজবংশটি পশ্চিমাঞ্চলীয় গঙ্গ বংশ (Western Gangas) নামে পরিচিত ছিল।

খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথম মাধব এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিবর্মনের রাজধানী কাবেরী নদীর তীরে তালবাড়ে অবস্থিত

ছিল ; পরে বাঙ্গালোরের নিকটস্থ মান্যপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। শ্রীপুরুষের দীর্ঘ রাজত্বকালে (৭২৫-৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ) গঙ্গ বংশের ক্ষমতার চরম উন্নতি হয়। এই রাজ্য এত সমৃদ্ধ ছিল যে ইহা 'শ্রীরাজ্য' নামে পরিচিত হয়। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে রাষ্ট্রকূটগণ গঙ্গ বংশের প্রধান শত্রু রূপে পরিগণিত হন। ১০০৪ খ্রীস্টাব্দে চোলগণ গঙ্গ বংশের সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত করেন। গঙ্গ বংশের কোন কোন রাজা চোল ও হোয়সলদের অধীন সামন্ত রূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। গঙ্গবড়ীতে জৈন ধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল।

যাদব বংশ

যাদবগণ নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের পূর্বপুরুষ যদুর বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। সাহিত্যে ও শিলালিপিতে তাঁহাদের বিস্তারিত বংশতালিকা পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকূট ও পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য রাজগণের অধীন সামন্তরাজ রূপে যাদব বংশের অভ্যুত্থান হয়। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য বংশের পতনের পরে যাদব বংশের উন্নতি শুরু হয়। এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য শাসক পঞ্চম ভিল্লম (আনুমানিক ১১৮৫-১১৯১ খ্রীস্টাব্দ) চতুর্থ সোমেশ্বরের নিকট হইতে কৃষ্ণা নদীর উত্তরে চালুক্য রাজ্যের এক বৃহদংশ অধিকার করেন। তিনি মালব ও গুজরাট বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হোয়সল বংশীয় প্রথম বীরবল্লাল কর্তৃক পরাজিত এবং সম্ভবতঃ নিহত হন। ভিল্লমই দেবগিরিতে (মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত আধুনিক দৌলতাবাদ) রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর এই শহরটি দক্ষিণ ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়।

জৈত্রপাল বা জয়তুগি (আনুমানিক ১১৯১-১২১০ খ্রীস্টাব্দ) কাকতীয় সিংহাসনে নিজ মনোনীত ব্যক্তিকে স্থাপন করিয়া যাদব বংশের প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি চৌলুক্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সিংঘন (আনুমানিক ১২১০-১২৪৭ খ্রীস্টাব্দ) এই বংশের শ্রেষ্ঠতম শাসক ছিলেন। তিনি হোয়সলরাজ দ্বিতীয় বীরবল্লালকে পরাজিত করিয়া কৃষ্ণা নদীর পরপারে রাজ্যবিস্তার করেন। বাঘেলা রাজাদের শাসনকালে তিনি একাধিকবার গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কোহ্লাপুরের শিলহর রাজ্যটি জয় করেন। তিনি মালব ও ছত্রিশগড়ের (মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত) শাসকগণ, গোয়ার কদম্বগণ ও পাণ্ড্যগণের সহিত সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তিনি কাবেরী নদীর তীরে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতের এক বৃহদংশে যাদব বংশের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রাজগণের ন্যায় সিংঘনও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রের উপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচয়িতা শার্ঙ্গধর এবং প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ চঙ্গদেব তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। চঙ্গদেব জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

সিংঘন সাহিত্যক্ষেত্রে যে ধারার প্রবর্তন করেন তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের সময়েও অব্যাহত থাকে। যাদব রাজগণের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন এমন কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি সেই সময় কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ ও ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। 'ধর্মশাস্ত্র' সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থরচয়িতা হেমাদ্রি এবং মারাঠী ভাষায় গীতার ভাষ্য রচয়িতা সন্ত জ্ঞানেশ্বর যাদব বংশের শেষ প্রসিদ্ধ শাসক রামচন্দ্রের (আনুমানিক ১২৭১-১৩০৯ খ্রীস্টাব্দ) আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের রাজত্বকালেই আলাউদ্দীন খলজী দেবগিরি আক্রমণ করেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই যাদব বংশের কলঙ্কময় সমাপ্তি ঘটে।

হোয়সল বংশ

যাদবগণের ন্যায় হোয়সলগণও[১] নিজেদের যদুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহারা প্রথমে চোলগণ অথবা পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের অধীন সামন্ত রূপে কর্নাটকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন। এই রাজ্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য শাসক বিষ্ণুবর্ধন (আনুমানিক ১১১০-১১৫২ খ্রীস্টাব্দ) ভেলপুর (কর্নাটকের হাসান জেলা, বর্তমান বেলুর) হইতে দ্বারসমুদ্রে (বর্তমান হলেবিদ) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি সমগ্র কর্নাটক ও পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল অধিকার করেন। কথিত আছে, তিনি চোল ও পাণ্ড্যরাজগণকে, মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়াবাসীদিগকে ও গোয়ার কদম্বদিগকে পরাজিত করেন এবং কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই সকল কাহিনীর ঐতিহাসিকতা বিচার করা কঠিন, তবে বিষ্ণুবর্ধন নিঃসন্দেহে একজন পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। তাঁহার আগ্রাসী নীতি অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য বংশীয় রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কর্তৃক সাফল্যের সহিত প্রতিহত হইয়াছিল। তিনিই শক্তিশালী হোয়সল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তবে তিনি পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের অধীন সামন্ত ছিলেন। তিনি রামানুজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

দ্বিতীয় বীরবল্লাল (আনুমানিক ১১৭৩-১২২০ খ্রীস্টাব্দ) প্রকাশ্যে রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের প্রভুত্ব অস্বীকার করেন। যাদবগণের সহিত তাঁহার দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলিয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের সময়েও এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকে এবং চোল ও পাণ্ড্যগণও ইহাতে জড়িত হন।

প্রতিবেশীদের সহিত অবিরাম যুদ্ধে পরবর্তী হোয়সলরাজগণের শক্তিক্ষয় হয়। এই বংশের সর্বশেষ রাজা তৃতীয় বীরবল্লাল মহম্মদ বিন তুঘলকের অভিযানের ফলে রাজ্য হারান।

১ কথিত আছে যে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাল একজন সন্তের আদেশে একটি ব্যাঘ্রকে লৌহদণ্ড দ্বারা হত্যা করেন। ইহা হইতেই ('পোয় সাল' অর্থাৎ 'আঘাত কর, সাল') এই বংশের নামকরণ হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মাতা রূপে হোয়সলগণ স্মরণীয় হইয়া আছেন। এই সকল মন্দিরের কয়েকটির ধ্বংসাবশেষ এখনও হলেবিদ ও অন্যান্য স্থানে দেখা যায়। চালুক্যদের শিল্প রীতির অনুসরণে তাঁহাদের সময়ে অলঙ্করণের একটি সুকুমার রীতির বিকাশ ঘটে।

কাকতীয় বংশ

কাকতীয়গণ রামায়ণে উল্লিখিত সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের বংশোদ্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন, কিন্তু শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহারা শূদ্রজাতীয় ছিলেন। যাদব ও হোয়সলগণের ন্যায় তাঁহারাও পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যদের পতনের পর তাঁহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তেলেঙ্গানা (অন্ধ্রপ্রদেশ) অঞ্চলে ইঁহারা রাজত্ব করেন।

কাকতীয় বংশের প্রথম শক্তিশালী রাজা দ্বিতীয় প্রোল (আনুমানিক ১১১৫-১১৫৮ খ্রীস্টাব্দ) পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের বিরুদ্ধে সামরিক সাফল্য অর্জন করিয়া কাকতীয় রাজ্যকে স্বাধীন করেন। প্রথম রুদ্র রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুলেখক ছিলেন।

গণপতি (আনুমানিক ১১৯৯-১২৬১ খ্রীস্টাব্দ) কাকতীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। কথিত আছে, তিনি চোলরাজগণকে, এবং কলিঙ্গ, দেবাগিরি, কর্নাটক এবং লাট (দক্ষিণ গুজরাট) রাজ্যের রাজগণকে পরাজিত করেন। তাঁহার সমসাময়িক চোলরাজগণের দুর্বলতায় ফলে তিনি রাজ্যবিস্তারের এক অভাবনীয় সুযোগ লাভ করেন। তিনি বরঙ্গলে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিণী ছিলেন তাঁহার কন্যা রুদ্রাম্বা। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর সাফল্যের সহিত রাজ্যশাসন করেন। বিখ্যাত ভেনিসীয় পর্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo) তাঁহার শাসনদক্ষতার কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

রুদ্রাম্বার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র কবিগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথমদিকে তিনি কিছু রাজ্য জয় করেন, কিন্তু আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি দিল্লীর সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

পল্লব বংশ : রাজনৈতিক ইতিহাস

পল্লব রাজবংশের ইতিহাসে গৌরবময় যুগ শুরু হয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে। সিংহবিষ্ণু পল্লব রাজ্যের সীমা কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তার করেন। কথিত আছে, তিনি পাণ্ড্য, চোল ও চের রাজগণকে এবং সিংহলরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম মহেন্দ্রবর্মন মোটামুটি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে

রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বেঙ্গী প্রদেশ অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী নরসিংহবর্মন ছিলেন এই শক্তিশালী রাজবংশের সবাপেক্ষা কৃতী ও বিশিষ্ট পুরুষ। ৬৪২ খ্রীস্টাব্দে তিনি চালুক্য বংশের রাজধানী বাতাপি অধিকার করেন, এবং সম্ভবতঃ দ্বিতীয় পুলকেশীকে হত্যা করেন। এই জয়লাভে পল্লবগণ দক্ষিণ ভারতে প্রধান শক্তিতে পরিণত হন। নরসিংহবর্মন সিংহলে দুই বার নৌবাহিনী প্রেরণ করেন এবং নিজ মনোনীত এক ব্যক্তিকে সিংহলের সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে চীনদেশীয় পর্যটক হিউয়েন সাঙ কাঞ্চীতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "এখানকার জমি বেশ উর্বর, নিয়মিতভাবে চাষ-আবাদ করা হয়, ফসলও ফলে প্রচুর। নানা ধরনের ফুল ও ফলও পাওয়া যায়। এখানে মূল্যবান রত্ন ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এখানকার জলবায়ু উষ্ণ, অধিবাসীরা সাহসী। তাহারা সততা ও সত্যের বিশেষ অনুরাগী এবং বিদ্যার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল।"

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে চালুক্য ও পল্লবগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশদ্বয়ের শিলালিপিতে স্ব স্ব বংশের বিজয়ের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যে সত্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। চালুক্যবংশীয় প্রথম বিক্রমাদিত্য সম্ভবতঃ পল্লববংশীয় পরমেশ্বরবর্মনকে (আনুমানিক ৬৭০-৬৯৫ খ্রীস্টাব্দ) পরাজিত করিয়া কাঞ্চী অধিকার করেন। দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন (আনুমানিক ৬৯৫-৭২২ খ্রীস্টাব্দ) চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সিংহাসন লইয়া বিরোধের ফলে পল্লব রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। নন্দীবর্মনের রাজত্বকালে (৭৩০-৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ) চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী অধিকার করেন। কিন্তু পল্লবরাজগণ শীঘ্রই তাঁহাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিলেন। চালুক্যগণ ব্যতীত চোল, পাণ্ড্য ও গঙ্গগণের সহিতও তাঁহাদের সংগ্রাম করিতে হয়। নবম শতাব্দীর প্রথমদিকে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ পল্লব রাজ্য আক্রমণ করিয়া দন্তিবর্মনকে (আনুমানিক ৭৯৫-৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ) পরাজিত করেন। দন্তিবর্মন ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে পাণ্ড্যগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়। ৮৮০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ একজন পাণ্ড্য রাজা ভীষণভাবে পরাজিত হন। অবশেষে চোলরাজ প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিত-বর্মনকে (আনুমানিক ৮৭৯-৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ) পরাজিত করিয়া তোণ্ডমণ্ডলম্ অধিকার করেন এবং পল্লবশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন।

পল্লব রাজ্যে ধর্ম

পল্লবরাজগণ প্রায় সকলেই ছিলেন শিবভক্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হিন্দু। এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য শাসক সিংহবিষ্ণু সম্ভবতঃ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। মহেন্দ্রবর্মন প্রথমে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু স্বীয় রাজত্বকালের মধ্যভাগে তিনি বিখ্যাত

সন্ত অপ্পরের প্রভাবে শিবের উপাসনা আরম্ভ করেন। অপ্পরের প্রচারের ফলেই পল্লব রাজ্যে শৈব ধর্মের অবস্থার উন্নতি ঘটে। মহেন্দ্রবর্মন অন্যান্য দেবদেবীকেও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি জৈন ধর্মের প্রতি ভয়ানক বিরূপ হইয়া উঠেন এবং দক্ষিণ আর্কটে একটি বিশাল জৈন মঠ ধ্বংস করেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণে দেখা যায় যে পল্লব রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে নাই। কাঞ্চীতে তিনি শত শত বৌদ্ধ মঠ এবং দশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই ছিলেন মহাযান মতের অনুগামী। তিনি বহু নির্গ্রন্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আলবার-গণের চেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার হয়। তামিল ভাষায় তাঁহাদের রচিত গীতগুলি গভীর অনুভূতি ও ধর্মভাবে সমৃদ্ধ।

পল্লব যুগের শিল্প

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে পল্লব রাজবংশের অধীনেই দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ইতিহাস শুরু হয়। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও চারুকলার উৎকর্ষ-সাধনে ধর্ম গভীর প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। মহেন্দ্রবর্মন পাহাড় খোদাই করিয়া মন্দির নির্মাণের রীতি গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ইলোরার (মহারাষ্ট্র) কৈলাস মন্দির। ইহা কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। নরসিংহবর্মন বর্তমান মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণে সমুদ্র-তীরে মামল্লপুরম্ বা মহাবলীপুরম্ নগরটি স্থাপন করেন। এখানে তথাকথিত 'সপ্ত প্যাগোডা'ও (Seven Pagodas) তিনিই নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকটি এক একটি বিশাল প্রস্তর খণ্ড কাটিয়া নির্মিত হইয়াছে। এগুলি মন্দিরাকৃতি 'রথ'; পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদী এবং গণেশের নামে ইহাদের নামকরণ হইয়াছিল। মহাবলীপুরমের মন্দিরগাত্র খোদাই করা মনোরম ভাস্কর্যে সুশোভিত। দলভানুর (দক্ষিণ আর্কট জেলা), পল্লভরম, ভল্লম (চিংলিপুট জেলা), পুড়ুকোট্টাই (ত্রিচিনোপলী জেলা) ও কাঞ্চীতে পল্লবরাজগণ কর্তৃক নির্মিত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পল্লব শিল্পরীতি এবং পল্লব বংশের শিলালিপিতে ব্যবহৃত 'গ্রন্থ' লিপির প্রচলন করে।

পল্লব রাজ্যে সাহিত্য

পল্লবরাজগণ সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের শিলালিপিগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত; এমন কি, তামিল শিলালিপিগুলিতেও 'প্রশস্তি' অংশে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই কাঞ্চী সংস্কৃত-চর্চার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। 'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্যের রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি

ভারবি পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এই কাহিনী প্রচলিত আছে। অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রণেতা দণ্ডী সম্ভবতঃ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মনের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। প্রথম মহেন্দ্রবর্মন নিজেই খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ 'মত্তবিলাস প্রহসন' নামে একটি কৌতুকনাট্য রচনা করেন। নন্দীবর্মন সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ আলবার সন্ত ও পণ্ডিত তিরুমঙ্গাই তাঁহার রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন।

চোল রাজবংশের রাজনৈতিক ইতিহাস

নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজয়ালয় (আনুমানিক ৮৫০-৮৭১ খ্রীস্টাব্দ) তাঞ্জোরের চোল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পল্লবগণের অধীন সামন্তরাজ রূপে উরায়ুর অঞ্চলে তাঁহার ক্ষমতার সূত্রপাত হয়। সঙ্গম যুগে ইহাই ছিল চোলগণের রাজধানী। বিজয়ালয় পাণ্ড্যগণের এক অধীন মিত্ররাজের নিকট হইতে তাঞ্জোর অধিকার করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। এইরূপে যে রাজবংশের উদ্ভব হয় তাহা ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া প্রায় দুই শতাব্দী কাল বর্তমান ছিল।

রাজবংশের গৌরবের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ালয়ের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম আদিত্য (আনুমানিক ৮৭১-৯০৭ খ্রীস্টাব্দ) পল্লবরাজ অপরাজিতবর্মনকে পরাজিত করিয়া তোণ্ডমণ্ডলম্ অধিকার করেন। তিনি পাণ্ড্য ও পশ্চিমাঞ্চলীয় গঙ্গদের রাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করেন ; সম্ভবতঃ গঙ্গ রাজধানী (তালাকাড়) তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে চোল রাজ্য সম্ভবতঃ উত্তরে মাদ্রাজ শহর হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আদিত্যের পুত্র পরন্তকের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে (৯০৭-৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ) মাদুরার পাণ্ড্য রাজ্য অধিকৃত হয়। পাণ্ড্যরাজ দ্বিতীয় রাজসিংহ সিংহলরাজের সহায়তা লাভ করেন। কিন্তু পাণ্ড্য ও সিংহলীগণ ভেল্লুরের যুদ্ধে চোলগণের দ্বারা পরাজিত হয় (আনুমানিক ৯১৫ খ্রীস্টাব্দ)। চোল অধিকার কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পরন্তক পল্লব শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন এবং উত্তরে নেলোর পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন। চোলগণ পল্লব রাজ্য অধিকার করিলে কাঞ্চী চোল রাজ্যের অন্যতম রাজধানী রূপে গণ্য হয়।

চোলগণের ক্ষমতার প্রসারে রাষ্ট্রকূটগণ আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। তৃতীয় কৃষ্ণ গঙ্গরাজের সহায়তায় চোলগণকে পরাজিত করেন। পরন্তকের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজাদিত্য ৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে তাক্কোলমের যুদ্ধে (উত্তর আর্কট জেলা) নিহত হন এবং তৃতীয় কৃষ্ণ সম্ভবতঃ তাঞ্জোর এবং কাঞ্চীও অধিকার করেন। এই কঠিন আঘাতে চোলগণ কিছুকালের জন্য শক্তিহীন হইয়া পড়েন। প্রায় তিন দশক কাল তাঁহারা হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই।

চোল রাজবংশের শ্রেষ্ঠত্বের যুগ

প্রথম রাজরাজ (আনুমানিক ৯৮৫-১০১৪ খ্রীস্টাব্দ) চোল বংশকে পুনরায় গৌরবের আসনে বসান এবং দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রায় সক্ষম হন। তিনি চের রাজগণের নৌশক্তি ধ্বংস করেন এবং চের রাজ্য (কেরল) নিজ শাসনাধীনে আনেন। মাদুরা অধিকৃত হয় এবং পাণ্ড্যবংশীয় রাজা বন্দী হন। তিনি কুর্গ আক্রমণ করেন এবং চের ও পাণ্ড্যগণের শক্তিক্ষয়ের জন্য উদাগাই দুর্গ অধিকার করেন। সিংহল আক্রমণ করিয়া উহার উত্তরাংশ অধিকার করা হয়, এবং উহা চোল রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। গঙ্গ রাজ্যের এক বৃহদংশও জয় করা হয়। রাজরাজের এই বিজয়ের ফলে পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের সহিত তাঁহার বিরোধের সৃষ্টি হয়। চোলরাজ চালুক্য রাজ্য লুণ্ঠন করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালুক্যরাজ সত্যাশ্রয় তাঁহাকে প্রতিহত করেন। অতঃপর রাজরাজ বেঙ্গীর পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করেন। বেঙ্গীর বিমলাদিত্য (১০১১-১০১৮ খ্রীস্টাব্দ) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কথিত আছে, রাজরাজ কলিঙ্গ জয় করেন এবং 'সমুদ্রের ১২০০০ পুরাতন দ্বীপ' দখল করেন। এই দ্বীপগুলিকে সাধারণতঃ লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ বলিয়া সনাক্ত করা হয়। বর্তমান তামিল নাড়ু, এবং অন্ধ্র প্রদেশ, কর্নাটক ও কুর্গের কিয়দংশ, সিংহলের উত্তরাংশ, এবং সমুদ্রের অন্যান্য দ্বীপ তাঁহার বিশাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার একটি শক্তিশালী নৌবহর ছিল। ইহার সাহায্যে তিনি চোলগণের সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি শাসন-ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করেন, জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে উৎসাহ দেন।

প্রথম রাজেন্দ্র চোল

রাজরাজের উপযুক্ত পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম রাজেন্দ্র চোল (আনুমানিক ১০১২-'৪৪ খ্রীস্টাব্দ) চোল রাজশক্তিকে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে স্থাপন করেন। তাঁহার পিতার রাজত্বকালের শেষ দিকে তুঙ্গভদ্রা নদীর পরপারে সাফল্যের সহিত অভিযান করিয়া তিনি দিগ্বিজয়ী রূপে নিজের শক্তির পরিচয় দেন। সিংহাসন লাভের অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমগ্র সিংহল অধিকার করেন। তিনি পাণ্ড্য ও কেরল ভূখণ্ড শাসনের জন্য নিজ পুত্রকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া এই সকল অঞ্চলে নিজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যরাজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের ফল সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে তুঙ্গভদ্রার উত্তর তীরস্থ অঞ্চল চালুক্যরাজের হস্তচ্যুত হয় নাই।

রাজেন্দ্র চোলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্রকূটগণের ন্যায় তিনি উত্তরেও বাহু বিস্তার করেন এবং দিগ্বিজয়ী রূপে নিজ নাম চিরস্মরণীয়

করিয়া রাখেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী গঙ্গা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া বঙ্গ ও বিহারের পালবংশীয় নৃপতি মহীপালের রাজ্য বিধ্বস্ত করে। এই অভিযান সম্ভবতঃ ১০২১ ও ১০২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে হইয়াছিল। চোলদের একটি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে রাজেন্দ্র উড়িষ্যা, দক্ষিণ কোশল (বর্তমান মধ্য প্রদেশে) এবং পশ্চিম বঙ্গের কিয়দংশ (মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান)—এমন কি, বর্তমান বাংলা দেশের কিয়দংশও—অধিকার করেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী ঐ সকল অঞ্চল হয়ত আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ঐ সকল অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করেন নাই। তাঁহার এই বিরাট অভিযানের একমাত্র স্থায়ী ফল হইল বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে কিছু কর্নাটকবাসী সামন্তের বসতিস্থাপন এবং সম্ভবতঃ উত্তর হইতে দক্ষিণাঞ্চলে কয়েকজন শৈবকে আনয়ন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিজয় অভিযানের স্মারক হিসাবে রাজেন্দ্র 'গঙ্গৈকোণ্ড' (গঙ্গাতীরবিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করেন এবং গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুরম্ (ত্রিচিনোপল্লী জেলায়, চিদম্বরমের নিকটে) নামে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরের নিকটে এক বিশাল জলাশয় খনন করা হয়; কোলেরুন ও ভেল্লার নদী হইতে খাল কাটিয়া সেই জলাশয় জলপূর্ণ করা হয়। সেই নগরী এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে, এবং সেই সুবিশাল জলাশয়ের স্থানে জন্মিয়াছে গভীর বন।

পিতার ন্যায় রাজেন্দ্রেরও এক শক্তিশালী নৌবহর ছিল। এই নৌবহর বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপ আক্রমণ করে। পূর্ব দিকে চোল রাজাদের নৌবহরের এই সকল অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব দিকের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের পথ প্রসারিত করা। পশ্চিমে রাজেন্দ্র তাঁহার পিতা কর্তৃক অধিকৃত 'সমুদ্রের পুরাতন দ্বীপগুলির' উপর অধিকার অক্ষুণ্ন রাখেন।

চোল-চালুক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা

রাজেন্দ্র চোলের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম রাজাধিরাজ (১০৪৪-১০৫২ খ্রীস্টাব্দ) একজন কৃতী শাসক ছিলেন। তিনি পাণ্ড্য ও কেরল অঞ্চলে এবং সিংহলে বিদ্রোহ দমন করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বিজয় উৎসব সম্পন্ন করেন। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্লের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের ফল নিদারুণ হইয়াছিল। ১০৫২ খ্রীস্টাব্দে কোপ্পমের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও তিনি নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় রাজেন্দ্র (আনুমানিক ১০৫২-৬৪ খ্রীস্টাব্দ) ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেই রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি সোমেশ্বরের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যান। চোল শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধে তিনি জয়ী হন। অপরদিকে বিহ্লন দাবি করেন যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কাঞ্চী বিধ্বস্ত করেন। প্রথম বীর রাজেন্দ্রের সময়ে (১০৬৩-১০৭০ খ্রীস্টাব্দ) একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে। কথিত আছে, তিনি কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর সঙ্গমস্থলে কুদালসঙ্গমের (কুর্নুল জেলা) যুদ্ধে

সোমেশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। বীর রাজেন্দ্র সোমেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকেও পরাজিত করেন, এবং নিজের অনুগত মিত্র দ্বিতীয় বিজয়াদিত্যকে বেঙ্গীর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য-গণকে বারবার পরাজিত এবং তাঁহাদের রাজ্যের কোন কোন অংশ বিধ্বস্ত করিলেও চোলগণ চালুক্যরাজ্যের কোন অংশ স্থায়ীভাবে অধিকার করিতে অথবা তাঁহাদের নিজ অধীনে আনিতে পারেন নাই। বীর রাজেন্দ্র পাণ্ড্য ও কেরল অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করেন। সিংহলের বিজয়বাহু সিংহলকে চোল-শাসন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে বীর রাজেন্দ্র সাফল্যের সহিত তাহা প্রতিহত করেন। অতঃপর চোলরাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন।

চোল-চালুক্য রাজবংশ

বীর রাজেন্দ্রের মৃত্যুর পরে চোল রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ইহার ফলে তাঁহার পুত্র অধিরাজেন্দ্রের মৃত্যু হয় এবং প্রথম কুলোত্তুঙ্গ (১০৭০-১১২০ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসন অপহরণ করেন। তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত হইত দক্ষিণ ভারতের দুইটি শ্রেষ্ঠ রাজবংশ—চোল ও চালুক্যদের রক্ত। তিনি চোল ও পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য রাজ্য এক শাসনের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করেন। বেঙ্গী চোল রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। সাধারণতঃ রাজবংশীয় কোন কুমার এই প্রদেশ শাসন করিতেন। তাঁহার চোলবংশীয় পূর্বপুরুষদের মত কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্য ও কেরল অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করেন, কিন্তু সিংহলের স্বাধীনতা ঘোষণা তিনি প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। তিনি মালবের পরমারগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং দুই বার কলিঙ্গ বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু গঙ্গাবড়ীতে (দক্ষিণ কর্নাটক) তিনি নিজ অধিকার রক্ষা করিতে পারেন নাই; এখানে ধীরে ধীরে হোয়সল বংশ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। সম্ভবতঃ চোলদের সাগরপারের রাজ্যাংশও তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। কুলোত্তুঙ্গ শাসন-সংস্কারক রূপে স্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল করধার্য ও রাজস্ব নির্ধারণের জন্য জমি জরিপের চমৎকার ব্যবস্থা।

কুলোত্তুঙ্গের উত্তরাধিকারীগণ বিশাল চোল রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে অক্ষম হন। বিদ্রোহী করদরাজগণ ধীরে ধীরে উহাকে ধ্বংস করেন। তৃতীয় রাজরাজের সময়ে (১২১৬-১২৪৬ খ্রীস্টাব্দ) পাণ্ড্যরাজ তাঞ্জোর লুণ্ঠন করেন এবং হতভাগ্য চোলরাজকে হোয়সলগণ বন্দীদশা হইতে মুক্ত করেন। চোলদের ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে হোয়সলগণ, কাকতীয়গণ ও পাণ্ড্যগণ চোল রাজ্যের বিভিন্ন অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। চতুর্থ রাজেন্দ্রের রাজত্বকালে (১২৪৬-১২৭৯ খ্রীস্টাব্দ) পাণ্ড্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা জটাবর্মন সুন্দর পাণ্ড্য চোল রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া কাঞ্চী অধিকার করেন। চোলগণ এই আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না; রাজেন্দ্র চোলের বৃহৎ সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

চোল শাসন-ব্যবস্থা : কেন্দ্রীয় শাসন

চোল রাজাদের শিলালিপি হইতে তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

রাজা ছিলেন শাসন-ব্যবস্থার প্রধান। বিশাল রাজ্য এবং সৈন্যবাহিনী ও নৌবহরের বৃহদায়তন তাঁহার শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। তাঞ্জোর, কাঞ্চী, গঙ্গৈকোণ্ড-চোলপুরম্ প্রভৃতি সুশোভন রাজধানী তাঁহার সম্পদের পরিচায়ক ছিল। মন্দিরগুলিতে রাজগণ ও রাজমহিষীদের প্রতিকৃতি স্থাপিত হইত।

সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন, তবে রাজা কনিষ্ঠ পুত্রকেও জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিবর্তে 'যুবরাজ' রূপে নির্বাচন করিতে পারিতেন। ফলে 'যুবরাজ' শাসনকার্যে ও সামরিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতে রাজ্যশাসনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিতেন। অন্যান্য রাজপুত্রগণও শাসনকার্যে ও যুদ্ধে রাজার সহযোগিতা করিতেন।

রাজকার্যে সহায়তা করিতেন মন্ত্রিগণ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা 'পেরুন্দরম্' শ্রেণীর, এবং নিম্নপদস্থ রাজকর্মচারীরা 'সিরুতরম্' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শাসন বিভাগের প্রধানগণ সর্বদা রাজার সহিত যোগাযোগ রাখিতেন এবং রাজা প্রায়শঃই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিতেন। রাজকর্মচারীগণকে পারিশ্রমিক হিসাবে জমি দেওয়া হইত এবং কর্মদক্ষতার পুরস্কার হিসাবে উপাধি দেওয়া হইত। রাজা রাজকর্মচারীদের কাজ পরিদর্শন করার জন্য ভ্রমণে বাহির হইতেন।

চোল রাজ্যের প্রদেশগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কোন কোন অঞ্চল সামন্ত নৃপতিদের দ্বারা শাসিত ছিল। তাঁহারা কর দিতেন এবং যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতেন। রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল কয়েকটি প্রদেশে ('মণ্ডলম্') বিভক্ত ছিল ; প্রত্যেক প্রদেশ বিভিন্ন বিভাগে ('ভালানাড়ু' ও 'নাড়ু') বিভক্ত ছিল। ইহার নীচে ছিল 'কুর্‌রম' বা 'কোট্টম' ; কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম লইয়া ইহারা গঠিত হইত। স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থায় গ্রামগুলির গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। বেঙ্গী ও মাদুরা—এই দুইটি প্রদেশ রাজবংশীয় কুমারগণ শাসন করিতেন।

চোল শাসন-ব্যবস্থা : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

চোলগণের শাসন-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। জেলা ('নাড়ু'), নগর এবং গ্রামের জন-পরিষদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রাম ও নগরের পরিষদগুলি ছিল স্থানীয় জনগণের সভা। জেলার পরিষদ গঠিত হইত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা। পরিষদে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরা সমবেত হইত। সাধারণ গ্রামের অধিবাসীদের সম্মিলনীকে বলা হইত 'উর'। ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত গ্রামের ('অগ্রহার') পরিষদকে বলা হইত 'সভা' অথবা 'মহাসভা'।

'উরে' স্থানীয় জনসাধারণ কোনরূপ আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন ছাড়াই মিলিত হইয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করিত। 'সভা' অথবা 'মহাসভা' আর্থিক ও বিচারসংক্রান্ত ব্যাপারে উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। সমুদায় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট জমি (public land) ইহার অধিকারে ছিল; ইহার প্রভাবাধীন এলাকায় ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত জমিও ইহার নিয়ন্ত্রণে থাকিত। সভা বনভূমি ও পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা করিত। গ্রামের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া রাজস্ব ধার্যের ব্যাপারেও 'সভা'•রাজকর্মচারীদের সাহায্য করিত। জমি ও সেচের অধিকার সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করাও ইহার কাজ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার 'সভা'র সাহায্যে জমি জরিপের ব্যবস্থা করিত। প্রথম রাজরাজের রাজত্বকালে দুই বার জমি জরিপ করা হইয়াছিল।

'সভা'র কর্তব্য কেবল ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রাম-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাও ইহার ছিল। ভাগ্যপরীক্ষার (lot) দ্বারা নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত বিভিন্ন সমিতির মধ্যে 'সভা'র কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। যেমন, বিচারক সমিতি ('ন্যায়ত্তর') বিবাদের মীমাংসা ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিত। 'সভা' রাস্তাঘাট, সেচের জন্য নির্মিত জলাশয় প্রভৃতি সংরক্ষণ করিত, ধর্মীয় কারণে চিকিৎসার জন্য দানের তদারকি করিত, এবং নিজ আয় হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিত।

গ্রাম সমিতিগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের সমর্থন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিই জনমতের অভিব্যক্তি রূপে গ্রামবাসীদের নির্দেশ সহজেই মান্য করিত।

চোল শাসন-ব্যবস্থা : ভূমি-ব্যবস্থা

সাধারণতঃ কৃষকেরা জমির মালিক ছিল; অন্য ধরণের ভূমি-ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। চাষের জমি সযত্নে জরিপ করা হইত এবং প্রত্যেকের জমি যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হইত। জমির শ্রেণীবিভাগ ও রাজস্বের পরিমাণ নিয়মিত ভাবে সংশোধন করা হইত। সম্ভবতঃ প্রথম রাজরাজের সময়ে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজকর রূপে ধার্য হইত। নগদে অথবা উৎপন্ন শস্যে অথবা দুই ভাবেই রাজার প্রাপ্য দেওয়া যাইত।

কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বড় বড় জলাশয় ছিল; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিত 'সভা'। কাবেরী ও অন্যান্য নদীতে বিশাল বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছিল। গঙ্গৈকোণ্ড-চোলপুরমের কৃত্রিম জলাশয় ১৫ মাইল দীর্ঘ ছিল।

ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও তাঁত, তৈল কল, পুষ্করিণী, পশু, বাজার প্রভৃতির উপর বিভিন্ন রকম কর স্থাপিত হইত। সামন্ত রাজগণের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে করভার বৃদ্ধি পায়।

চোল শাসন-ব্যবস্থা : আর্থিক ব্যবস্থা

রাজার আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব ; ইহা ছাড়া নানা প্রকারের কর ও শুল্ক ছিল। অর্থনৈতিক দুরবস্থার সময় কর মকুব করা হইত। কুলোত্তুঙ্গ শুল্ক তুলিয়া দিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।

কৃষির উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ হইত। দুর্ভিক্ষ কখনও কোন বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিত, কখনও সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িত। শিল্পের, বিশেষতঃ অলঙ্কার ও ধাতুশিল্পের, এবং তাঁত ও লবণ প্রস্তুত শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। পূর্ব দিকে চীন, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ এবং পশ্চিমে আরব ও পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির সহিত ব্যাপক বাণিজ্য চলিত। ব্যবসায়ীদের সংগঠন (guild) ছিল। বহু প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণের ফলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য মালপত্র পরিবহনের সুবিধা হইয়াছিল।

চোল শাসন-ব্যবস্থা : জনকল্যাণকর কার্য

চোল রাজগণ জনগণের চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য কিছু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের একটি শিলালিপিতে চিকিৎসাবিদ্যালয় ও শুশ্রূষালয়ের উল্লেখ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের আর একটি শিলালিপিতে আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজেন্দ্র চোলের সময়ে একটি বিদ্যালয়ে ৩৪০ জন ছাত্র ১৪ জন শিক্ষকের নিকট বেদ, মীমাংসা, ন্যায় ও ব্যাকরণ পাঠ করিত। তাঁহার শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। প্রথম রাজাধিরাজের সময়ে ২৬০ জন ছাত্র ও ১২ জন শিক্ষক সহ একটি বিদ্যালয় ছিল।

চোল শাসন-ব্যবস্থা : সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী

চোল রাজগণের অশ্বারোহী, পদাতিক ও গজারোহী সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী ছিল। অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য অতি মূল্যবান আরবী ঘোড়া আমদানি করা হইত। রাজা ও রাজপুত্রগণ সৈন্য পরিচালনা করিতেন। রাজাদিত্য ও রাজাধিরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। চোল নৌবাহিনী করমণ্ডল ও মালাবার উপকূল নিয়ন্ত্রণ করিত।

চোল রাজগণের ধর্মবিশ্বাস

চোলরাজগণ শিবভক্ত ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। রাজরাজের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম কুলোত্তুঙ্গের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের ফলে বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক রামানুজ হোয়সল রাজ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম তখন অবলুপ্তির পথে, তবু কোন

কোন বৌদ্ধমঠে চোলরাজগণ দান করিয়াছিলেন। তবে রাজকীয় দান সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণের অধিকারে ছিল।

চোল রাজগণের শিল্পকলা

চোল যুগের শিল্পকলা পল্লব শিল্পেরই অনুবৃত্তি। এই চোল স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঞ্জোরে রাজরাজ কর্তৃক নির্মিত বৃহদীশ্বর মন্দির এবং গঙ্গৈকোণ্ড-চোলপুরমে রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক নির্মিত বিশাল মন্দির। এই মন্দিরগুলি 'দ্রাবিড়' রীতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং পরাক্রান্ত চোলরাজগণের ঐশ্বর্য ও শক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ। কোন কোন মন্দিরের ভাস্কর্যগুলি কল্পনা ও কারুকর্মের অপরূপ নিদর্শন। মন্দির-গুলির বিশেষত্ব উহাদের 'বিমান' অথবা চূড়া। পরবর্তী কালে কারুকার্যমণ্ডিত 'গোপুরম্' বা প্রবেশদ্বারগুলি প্রধান স্থান অধিকার করে।

তামিল সাহিত্য

তামিল, কানাড়ী, তেলুগু ও মালয়ালম দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে তামিল প্রাচীনতম ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উৎকর্ষের দিক হইতে সংস্কৃত ভাষার পরেই তামিলের স্থান।

তামিল সাহিত্যের ইতিহাস শুরু হয় 'সঙ্গম যুগ' হইতে। 'সঙ্গম' অর্থ পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমিতি, বর্তমান যুগের ফরাসী আকাদেমীর মতো। কথিত আছে, সঙ্গমের সংখ্যা ছিল তিন, এবং সঙ্গমের যুগে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রথম সঙ্গমের কোন রচনাই এখন পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় সঙ্গমের একটি মাত্র রচনা পাওয়া যায়। তৃতীয় সঙ্গমের তিনটি সঙ্কলন এবং বহু কাব্য এখনও বর্তমান আছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ।

ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দী হইতে শৈব ('নায়নার') ও বৈষ্ণব ('আলবার') ভক্তগণের রচনায় তামিল সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। নাম্বি-আন্দার-নাম্বি শৈব গাথাগুলি সঙ্কলন করেন; বৈষ্ণব গাথাগুলি সঙ্কলন করেন নাথমুনি। এই গাথাগুলিতে রূপকধর্মী কাব্যে দেবতার (শিব বা বিষ্ণুর) প্রতি ভক্তের ভক্তি রূপায়িত হইয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কম্বন ছিলেন তামিল কাব্যের বিশিষ্ট স্রষ্টা। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'কম্ব-রামায়ণ' নামে পরিচিত। ইহা রামায়ণের তামিল অনুবাদ।

পাণ্ড্য বংশ

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে, অথবা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে, পাণ্ড্য বংশের গৌরবের সূচনা হয়। এই বংশের প্রথম ক্ষমতাশালী শাসক কাডুনগোঁ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। অষ্টম শতাব্দীতে, প্রধানতঃ চোল ও কেরলগণের অধিকার খর্ব করিয়া পাণ্ড্যদের রাজ্য চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে। মারবর্মন রাজসিংহ (৭১০-৭৪০

খ্রীস্টাব্দ) ও নেডুঞ্জোদাইয়ান (৭৬৫-৮১৫ খ্রীস্টাব্দ) শক্তিশালী রাজা ছিলেন। কথিত আছে, শ্রীমার-শ্রীবল্লভ (আনুমানিক ৮১৫-৮৬২ খ্রীস্টাব্দ) সিংহলরাজ এবং চোল, পল্লব ও গঙ্গরাজগণকে পরাজিত করেন। আনুমানিক ৮৮০ খ্রীস্টাব্দে পল্লব-রাজ অপরাজিতবর্মন পাণ্ড্যরাজ বীরগুণবর্মনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। চোলরাজ প্রথম পরন্তক পাণ্ড্যরাজ দ্বিতীয় মারবর্মন রাজসিংহকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। পাণ্ড্যরাজ পলায়ন করিয়া সিংহলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পরবর্তী তিন শতাব্দীকাল পাণ্ড্য রাজ্য চোলরাজগণের অধীন ছিল। তবে সিংহাসনচ্যুত পাণ্ড্য রাজগণ রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায়ই চেষ্টা করিতেন। প্রথম রাজেন্দ্র চোল পাণ্ড্য রাজ্যকে চোল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করেন এবং নিজ পুত্রকে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশটির শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। প্রথম কুলোত্তুঙ্গের মৃত্যুর পরে চোলরাজগণের শক্তি হ্রাস পাইলে পাণ্ড্যগণের ক্ষমতার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। জটাবর্মন কুলশেখরের শাসনকালকে (আনুমানিক ১১৯০-১২১৬ খ্রীস্টাব্দ) পাণ্ড্যদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তাঁহার সময়ে পাণ্ড্যশক্তির যে পুনরুত্থানের সূচনা হয় তাহা প্রথম মারবর্মন সুন্দর পাণ্ড্যের রাজত্বকাল (আনুমানিক ১২১৬-১২৩৮ খ্রীস্টাব্দ) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রথম মারবর্মন সুন্দর পাণ্ড্য চোল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া তাঞ্জোর ও উরায়ুর লুণ্ঠন করেন। জটাবর্মন সুন্দর পাণ্ড্যের রাজত্বকালে পাণ্ড্যদের ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তিনি চোলদের শক্তি ধ্বংস করেন, কাঞ্চী অধিকার করেন এবং চের দেশ ও সিংহলকে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তিনি হোয়সল, কাকতীয় ও পল্লবরাজগণকে পরাজিত করেন। ইহার ফলে তাঁহার রাজ্য উত্তরে কুদ্দাপা ও নেলোর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি বহু যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। নিজ প্রাধান্য প্রচার করার জন্য তিনি 'রণতপন' উপাধি গ্রহণ করেন।

বিখ্যাত ভেনিসীয় পর্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাণ্ড্য রাজ্যে ভ্রমণ করেন। এই রাজ্য যখন ক্ষমতার শীর্ষদেশে অবস্থিত তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত কায়ল 'একটি বিরাট ও শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল।' উহা একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্রও ছিল। রাজার প্রভূত ধন সম্পত্তি ছিল। মুসলমান লেখক ওয়াসাফ এই সকল বিবৃতি সমর্থন করিয়াছেন।

পাণ্ড্য রাজ্যে যখন উত্তরাধিকারের যুদ্ধ শুরু হয় তখনই আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করেন। ইহার ফলেই পাণ্ড্য রাজ্যের পতন হয়।

একাদশ অধ্যায়

উত্তর ভারতে মুসলমান আক্রমণ

১. আরবগণ কর্তৃক সিন্ধু বিজয়

ধর্মগুরু মহম্মদের মৃত্যুকালে (৬৩২ খ্রীস্টাব্দ) মুসলমান ধর্মাবলম্বী আরবগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা আরব দেশের বাহিরে প্রসারিত হয় নাই। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা আরব, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর ও পারস্য সহ এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহারা অক্ষু নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং অক্ষু নদী ও হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যবর্তী ভূভাগ অধিকার করে। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর আফ্রিকা অধিকৃত হয়। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেন আরবগণের শাসনাধীন হয়।

আরবগণ ও ভারতবর্ষ

আরবগণের এই অভূতপূর্ব সামরিক সাফল্যের দুইটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে : ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তাহাদের আগ্রহ এবং অন্যান্য দেশের ভূমি ও ধনসম্পদ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা। পশ্চিম এশিয়ায় এবং মধ্য এশিয়ার এক অংশে আধিপত্য স্থাপনের পর তাহারা যে ভারতবর্ষের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে ইহা অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাহারা সমুদ্রপথে ও স্থলপথে অগ্রসর হয়।

ভারতে প্রথম আরব অভিযান হয় ৬৩৬-৩৭ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বৎসর আরবেরা ভারতের পশ্চিম উপকূল লুণ্ঠন করার জন্য নৌবাহিনী প্রেরণ করে। বোম্বাইর নিকটবর্তী থানেতে এই অভিযান পাঠানো হয় খলিফা ওমরের শাসনকালে। ওমর জলপথে দূরদেশ আক্রমণের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অধিকতর সাহসী এবং উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাঁহাদের সময় আরবদের রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইল। কিরমান ও মাকরানের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠানো হইল। সামরিক সাফল্য লাভ হইল, কিন্তু স্থায়ী রাজ্য জয় সম্ভব হইল না। আফগানিস্থান অধিকার করিয়া ভারতে আসিবার স্থলপথে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টাও হইয়াছিল।

সিন্ধু বিজয় (৭১২)

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবদের শক্তি উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। পশ্চিম দিকে উত্তর আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া স্পেন পর্যন্ত তাহাদের রাজনৈতিক

প্রাধান্য প্রসারিত হয় ; পূর্ব দিকে তাহারা বোখারা, খোজান্দ, সমরকন্দ ও ফরগণা অধিকার করিয়া কাশগড় পর্যন্ত অগ্রসর হয়। খলিফার প্রতিনিধি রূপে হজ্জাজ ইরাক শাসন করিতেন। সিংহলের রাজা খলিফার জন্য উপঢৌকনে পূর্ণ করিয়া আটটি জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন। সেগুলি জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ায় হজ্জাজ তাহাদের দমন করিবার জন্য সিন্ধু প্রদেশের দেবল বন্দরে (থাট্টা শহরের অনতিদূরে অবস্থিত একটি সামুদ্রিক বন্দর) সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। অভিযান ব্যর্থ হয় ও সেনাপতি নিহত হন। দ্বিতীয় একটি অভিযানও ব্যর্থ হয়। তখন মহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে একটি সুসংবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত অভিযান প্রেরণ করা হয়।

৭১২ খ্রীস্টাব্দে দেবল বন্দরে উপস্থিত হইয়া মহম্মদ শহরটি আক্রমণ এবং অধিকার করেন। বিজয়ীরা প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করে। সতেরো বা তাহার অধিক বয়সের পুরুষদের মধ্যে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তাহাদের হত্যা করা হয়। অতঃপর মহম্মদ উত্তর দিকে অগ্রসর হন। পথে নিরুনের (হায়দরাবাদের দক্ষিণে আধুনিক জরকের নিকটে) জনসাধারণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহির রওয়ারে এক বিশাল বাহিনী সমাবেশ করেন। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, সেই স্থানে 'অশ্রুতপূর্ব ভীষণ সংগ্রাম শুরু হয়'। দাহির যুদ্ধে প্রাণ দেন, এবং তাঁহার নেতৃহীন সৈন্যরা বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। দাহিরের রাণী এবং পুত্র রওয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রায় ১৫,০০০ সৈন্য দুর্গ রক্ষার জন্য মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে থাকে। দুর্গের পতন আসন্ন হইলে বীরাঙ্গনা রাণী ও দুর্গের অধিবাসিনী অন্যান্য নারীরা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করেন। দুর্গ অধিকার করিয়া মহম্মদ প্রায় ৬,০০০ মানুষকে হত্যা করেন ; সেখানে সঞ্চিত দাহিরের যাবতীয় ধনরত্নও তাঁহার হস্তগত হয়। অতঃপর তাঁহার সৈন্যবাহিনী ব্রাহ্মণাবাদের (হায়দরাবাদের উত্তরে এই শহরটির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়) দিকে যাত্রা করে। নিরুনের অধিবাসীদের ন্যায় এই শহরের জনসাধারণও বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর আরোর (আলোর) দুর্গ অধিকৃত হয়। হিন্দুদের শেষ ঘাঁটি মূলতানও তুমুল যুদ্ধের পরে অধিকৃত হয়। মহম্মদ ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি, আরবেরাও ছিল বীর যোদ্ধা। কিন্তু তাঁহার সাফল্যের জন্য স্থানীয় বৌদ্ধদের সহায়তা কিছু পরিমাণে দায়ী ছিল ; তাহারা ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল।

বিজয়ী মহম্মদের জীবন কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। সম্ভবতঃ খলিফার দরবারে তাঁহার শত্রুদের ষড়যন্ত্রেই তাঁহার জীবনাবসান হয়। খলিফা ওয়ালিদের নির্দেশে তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হয়। তবে পরবর্তী কালের

ঐতিহাসিকদের বিবিধ কল্পিত কাহিনী হইতে এই বিয়োগান্ত ঘটনার মূলে কী ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

সিন্ধুদেশে আরব শাসন

নববিজিত প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় (ইক্‌তা) ভাগ করা হয়। সামরিক সেবার (যুদ্ধকালে সরকারের সহায়তার) শর্তে আরবদেশীয় সামরিক কর্মচারীগণ ঐ সকল জেলার ভার পান। সাধারণ সৈন্যদের কেহ কেহ জমি, কেহ কেহ নির্দিষ্ট বেতন পাইত। মুসলমান সন্ত ও মসজিদের ইমামগণ জমি পাইতেন। এই সব ব্যবস্থার ফলে সিন্ধুদেশে ধীরে ধীরে আরবদের কতকগুলি সামরিক উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ক্রমে বাণিজ্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ভূমি-রাজস্ব ও 'জিজিয়া' কর ছিল সরকারী আয়ের প্রধান উৎস। সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ হইতে এক-চতুর্থাংশ ছিল ভূমি-রাজস্ব। প্রথম দিকে 'জিজিয়া' কর 'জিম্মি'দের (মুসলমান রাষ্ট্রের অমুসলমান অধিবাসীগণ) নিকট হইতে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার বিনিময়ে আদায় করা হইত। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত আরও কর ছিল। সাধারণতঃ নিলাম ডাকিয়া যে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ দিতে রাজী হইত তাহাকে এই সকল কর আদায়ের ভার দেওয়া হইত।

সংগঠিত কোন বিচার বিভাগ ছিল না। অভিজাত শ্রেণী নিজের নিজের এলাকায় অনুষ্ঠিত অপরাধের বিচার করিতেন। গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল। কাজীরা ইসলামের আইন অনুযায়ী বিচার করিত ; যে সব মামলায় হিন্দুরা জড়িত থাকিত তাহাদের বিচারও ঐ আইনমতে হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুদের অত্যন্ত কঠোর সাজা দিবার বিধান ছিল। যেমন, হিন্দুরা চুরি করিলে অপরাধীর পরিবারের সকলকে অগ্নি-দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইত। বিবাহ, উত্তরাধিকার, ব্যভিচার প্রভৃতি যে সকল ক্ষেত্রে কেবল হিন্দুরাই জড়িত থাকিত, সেখানে তাহাদের পঞ্চায়েতেই বিচার হইত।

সিন্ধুদেশ জয় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দির ধ্বংস ও 'কাফের'দের নির্যাতন করা শুরু হইল। কিন্তু অল্পদিনেই বোঝা গেল যে শক্তিপ্রয়োগে হিন্দু ধর্ম উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। অতঃপর আরবেরা পরমতসহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করিল। এই নীতি বর্ণনা করিতে গিয়া হজ্জাজ বলিয়াছেন : "যখন তাহারা খলিফার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর দিতে সম্মত হইয়াছে, তখন তাহাদের নিকট হইতে ন্যায়তঃ আর কিছুই দাবি করা উচিত নয়। তাহারা আমাদের রক্ষণাধীনে আসিয়াছে, অতএব তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির দিকে আমরা আর কোনক্রমেই

হাত বাড়াইতে পারি না। নিজ নিজ দেবদেবীগণকে পূজা করিবার অধিকার তাহাদের দেওয়া হইল। কাহাকেও নিজ ধর্ম অনুসরণে নিষেধ করা বা বাধা দেওয়া হইবে না।" মহম্মদ বিন কাসিম মূলতানে ঘোষণা করেন: "খ্রীস্টানদের গীর্জা, ইহুদীদের ধর্মসভা ও পারসিক পুরোহিতদের পূজাবেদীর মতো হিন্দুদের মন্দিরও পবিত্র থাকিবে।" তাঁহার এই ঘোষণা তাঁহার পরবর্তী শাসকগণ কতদূর মান্য করিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন।

সিন্ধুতে আরব শাসনের অবসান

ধর্মীয় উন্মাদনা ও রাজনৈতিক লোভ আরবদিগকে বিজয় অভিযানের প্রথম দিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সিন্ধুদেশে তাহাদের শক্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে দেখা দিল বিরোধ ও বিভেদ। একজন সামরিক নেতা অপর নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুন্নীরা শিয়াদের, এবং খারিজী ও কারমাথিয়ানদের মতো বিরুদ্ধ-মতবাদীদের উৎপীড়ন করিতে লাগিল। খলিফার শক্তিহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুদেশ কার্যতঃ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। নবম শতাব্দীর শেষভাগে সিন্ধুদেশ প্রকৃতপক্ষে খলিফার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তিন শতাব্দী পরে তুর্কী-জাতীয় মহম্মদ ঘূরী মূলতান হইতে দেবল পর্যন্ত সমগ্র সিন্ধুদেশ অধিকার করিলেন, এবং মৃত্যুকালে উহা তাঁহার ভারতস্থিত উত্তরাধিকারীগণকে দিয়া গেলেন।

ভারতীয় ইতিহাসের উপর সিন্ধুতে আরব শাসনের প্রভাব

আরবগণ কর্তৃক সিন্ধু বিজয় 'ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান, একটি নিষ্ফল বিজয়' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আরবগণ সিন্ধুকে ভারত জয়ের জন্য ভিত্তিকেন্দ্র রূপে ব্যবহার করিতে পারে নাই। রাজস্থান, গুজরাট, কাথিয়াবাড় ও কচ্ছের হিন্দুরাজগণের বিরুদ্ধে বার বার অভিযান পাঠানো হইয়াছিল; কিন্তু রাজপুতদের, বিশেষতঃ পরাক্রান্ত গুর্জর-প্রতিহারদের, পরাজিত করা যায় নাই। আরব শাসনাধীন সিন্ধুদেশ ভারতের রাজনৈতিক সংগঠনে একটি স্বতন্ত্র অংশ রূপে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। বস্তুতঃ, সিন্ধুর আরবদের ব্যাপক বাণিজ্যিক তৎপরতার ফলে এই ভারতীয় প্রদেশটি ভারতের বাইরে অবস্থিত মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং রাজস্থানের মরুভূমির পরপারে হিন্দু-জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয় সম্ভব হয় স্থানীয় তুর্কী রাজবংশগুলির নেতৃত্বের দ্বারা—আভ্যন্তরীণ বিভেদের শিকার খলিফার অথবা তাঁহার অধীন কোন মুসলমান শাসকের শক্তিতে নহে। সর্ব প্রকারের দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা

বৈদেশিক আক্রমণকারীগণকে দেশের এক কোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

আরবেরা সিন্ধুবাসীদের এক বৃহৎ অংশকে ধর্মান্তরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু পারস্যের ন্যায় এই দেশে তাহারা স্থানীয় ভাষা, শিল্প, ঐতিহ্য ও রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিলোপ করিতে পারে নাই। তাহাদের নির্মিত অট্টালিকাগুলি কালের ধ্বংসলীলা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। পক্ষান্তরে, আরবেরাই হিন্দু সভ্যতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ইসলাম তাহার তরুণ অবস্থায় ভারতীয় সঙ্গীত, চিত্রকলা, চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র হইতে বহু শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতীয়দের নিকট হইতেই আরবগণ প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করে। হিন্দু ও আরবগণের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আব্বাসীয় খলিফা বংশের পতনের নিদারুণ আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়।

২. গজনীর সুলতানগণ

গজনীর অভ্যুত্থান

পশ্চিম সীমান্তের সিন্ধুদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চল আরব অভিযানের বন্যাস্রোতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব স্থাপন তুর্কীদেরই কীর্তি। এই কাজ আরম্ভ করেন আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনীর তুর্কী সুলতানেরা।

আলপ্তিগীন নামে এক ভাগ্যান্বেষী ৯৬২ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্থানে গজনী রাজ্যের পত্তন করেন। তিনি প্রথম জীবনে সামানী রাজগণের ক্রীতদাস ছিলেন; তাঁহাদের অধিকার এক সময় জাক্সার্টেস নদী হইতে বাগদাদ পর্যন্ত, এবং খোয়ারিজম হইতে ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্যন্ত, প্রসারিত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তিগীন তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন (৯৭৭ খ্রীস্টাব্দ)।

সবুক্তিগীন

এই নূতন শাসক ছিলেন রাজ্যজয়ে উৎসুক একজন উদ্যোগী সামরিক নেতা। স্বভাবতঃই তাঁহার দৃষ্টি প্রতিবেশী হিন্দু শাহী বংশীয় রাজা জয়পালের রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল। জয়পালের অধিকার লামঘান হইতে চন্দ্রভাগা নদী পর্যন্ত প্রসারিত ছিস।

নবম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লল্লিয় হিন্দু শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। জয়পাল মোটামুটিভাবে ৯৫৫-১০০২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি দুই বার গজনী অধিকারের চেষ্টা করেন; কিন্তু সবুক্তিগীন তাঁহাকে পরাজিত

করিয়া তাঁহার রাজ্যের একাংশ অধিকার করিলেন। তিনি লামঘান ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী জেলাগুলি অধিকার করিয়া ঐ অঞ্চলের অধিবাসীগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

সুলতান মামুদ (৯৯৮-১০৩০)

৯৯৮ খ্রীস্টাব্দে সবুক্তিগীনের পুত্র মামুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৯৯৯ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদের খলিফা তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকৃতি দিলেন। তিনি সাধারণতঃ 'সুলতান' মামুদ নামে পরিচিত। এই উপাধিটি স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচায়ক। খলিফা মামুদকে এই উপাধি দেন নাই, তাঁহার মুদ্রাতেও এই উপাধি দেখা যায় না : সেখানে তিনি কেবলমাত্র 'আমীর' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু পতনোন্মুখ খলিফা-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর যে সকল প্রাদেশিক রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে গজনীর রাজবংশ নিঃসন্দেহে সর্বপ্রধান ছিল।

মামুদ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার পিতার প্রবর্তিত আগ্রাসী নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। একজন সমসাময়িক মুসলমান লেখক বলেন, "প্রতি বৎসর ভারতের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করাকে তিনি স্বীয় কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন"।

হিন্দু শাহী বংশের পতন

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু শাহী রাজ্য স্বভাবতঃই মামুদের প্রথম লক্ষ্য হইল। ১০০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম বার ভারত আক্রমণ করেন, এবং সীমান্তবর্তী কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন। পর বৎসর মামুদ পেশোয়ারের নিকটে জয়পালকে পরাজিত করেন। তিনি 'অপরিমেয়' ধনসম্পদ হস্তগত করিলেন। জয়পাল স্বয়ং পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত বন্দী হইলেন। প্রচুর মুক্তিপণ দেওয়ার শর্তে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মামুদ জয়পালের রাজধানী উদভাণ্ডপুর (মুসলমানরা বলিত ওয়াইহিন্দ) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি বিধ্বস্ত করিলেন। গর্বিত হিন্দু রাজা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়া অধিকতর অপমান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

জয়পালের পর তাঁহার পুত্র আনন্দপাল শাহী রাজ্য লাভ করিলেন। ১০০৬ খ্রীস্টাব্দে মামুদ একজন কারমাথিয়ান মতাবলম্বী মুসলমান শাসকের অধীন মূলতান আক্রমণ করিবার জন্য আনন্দপালের রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে চাহিলেন। ইহাতে সম্মতি দানের পরিবর্তে আনন্দপাল তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া তিনি কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন।

১০০৮ খ্রীস্টাব্দে মামুদ মুলতান অভিযানকালে আনন্দপালের ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ওয়াইহিন্দের নিকটে যুদ্ধ হইল। আনন্দপালের হস্তী তীরবিদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল; হিন্দু সৈন্যদলও ইহাকে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ মনে করিয়া নগরকোটের দুর্গ (আধুনিক কোট কাংরা) অভিমুখে পলায়ন করিল। মামুদ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুর্গটি অধিকার করিলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, ও মূল্যবান বস্ত্রাদিসহ 'অপরিমেয় ধনসম্পদ' আক্রমণকারীদের হস্তগত হইল। সম্ভবতঃ সিন্ধু নদ হইতে নগরকোট পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড মামুদ অধিকার করিলেন।

বারংবার এইরূপ পরাজয়ের পরেও আনন্দপাল মনোবল হারাইলেন না। তিনি নন্দন শহরে (লবণ পর্বতশ্রেণীর—Salt Range—উত্তর প্রান্তে অবস্থিত) রাজধানী স্থাপন করিয়া লবণ পর্বত অঞ্চলে নিজ অধিকার সুদৃঢ় করিলেন। ১০১২ খ্রীস্টাব্দে শান্তিতেই তাঁহার জীবনাবসান হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন তাঁহার পুত্র ত্রিলোচনপাল। ১০১৪ খ্রীস্টাব্দে ত্রিলোচনপালের পুত্র ভীমপালের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও মামুদ নন্দন অধিকার করিয়া কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ত্রিলোচনপাল কাশ্মীরের রাজা সংগ্রামরাজের সহায়তা লাভ করেন। কাশ্মীর সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক তুঙ্গ মামুদ কর্তৃক পরাজিত হইলেন। ফলে ত্রিলোচনপাল ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। মামুদ কাশ্মীরের মধ্যস্থলে অবস্থিত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করা উচিত মনে করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সামরিক সাফল্যের ফলে তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন শাসক তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হইল এবং নবদীক্ষিত মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মিত হইল।

কাশ্মীরে ব্যর্থ হইবার পর ত্রিলোচনপাল পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে আসিয়া সম্ভবতঃ শিবালিক পর্বতাঞ্চলে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি পরাক্রান্ত চন্দেল্ল-রাজ বিদ্যাধরের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। ১০১৯ খ্রীস্টাব্দে মামুদ পুনরায় ভারতে আসিলেন এবং রহিব (রামগঙ্গা) নদীর তীরে এক যুদ্ধে ত্রিলোচনপালকে পরাজিত করেন। ইহার কিছুকাল পরে (১০২১-১০২২) ত্রিলোচনপাল তাঁহার কয়েকজন অনুগামীর হস্তে নিহত হন। তাঁহার পুত্র ভীমপাল তাঁহার দুর্দশাপন্ন রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। ১০২৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে হিন্দু শাহী বংশ বিলুপ্ত হয়। ফলে পাঞ্জাব মামুদের অধীন হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে, শিখ শক্তির অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত, পাঞ্জাবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত অল-বিরুনী সুলতান মামুদের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু শাহী বংশের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন: "তাঁহাদের সমস্ত প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁহাদের সৎ ও ন্যায় কার্য সম্পাদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা কখনও শিথিল হয় নাই..."।

সুলতান মামুদের অন্যান্য অভিযান

ভাতিন্দার (মুসলমান লেখকগণের দ্বারা ভাতিয়া নামে অভিহিত) সুদৃঢ় দুর্গটি উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে উর্বর গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রবেশপথ রক্ষা করিত। ১০০৪ খ্রীস্টাব্দে মামুদ এই দুর্গ অধিকারের জন্য গজনী হইতে যাত্রা করেন। স্থানীয় রাজা (মুসলমান লেখকগণ ইঁহাকে বাজি রায় নামে অভিহিত করিয়াছেন) অসীম ধৈর্যসহকারে আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মামুদ দুর্গটি দখল করিতে সক্ষম হন। প্রচুর সম্পদ তাঁহার হস্তগত হইল। দুর্গের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল, কেবল তাহারাই হত্যাকাণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

মূলতান কার্মাথিয়ান সম্প্রদায়ের মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। তাহারা খলিফার প্রাধান্য স্বীকার করিত না। নিষ্ঠাবান সুন্নীরা তাহাদের ঘৃণা করিত। সবুক্তিগীনের সহিত তাহারা সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু মামুদের ভাতিন্দা অভিযানকালে তাঁহার সহিত তাহাদের বিরোধ ঘটে। সম্ভবতঃ মূলতানের শাসক দাউদ তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া মামুদের সৈন্যবাহিনীকে যাইতে দিতে চাহেন নাই। ১০০৬ খ্রীস্টাব্দে মামুদ পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া মূলতানে যাত্রা করেন। দাউদ পলায়ন করিলেন, কিন্তু মূলতানের সৈন্যবাহিনী বিনাবাধায় পরাজয় স্বীকার করে নাই। প্রচুর জরিমানা আদায় করিয়া নাগরিকদের নিষ্কৃতি দেওয়া হয়, কিন্তু কার্মাথিয়ানদের হত্যা করা হইল। সুখপাল নামে জয়পালের এক পৌত্রকে পূর্বে শাহী রাজাদের সদ্‌ব্যবহারের জন্য জামিন (hostage) রূপে গজনীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল; সেখানে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারই হাতে মূলতানের শাসনভার অর্পণ করা হইল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হইলেন। ১০০৮ খ্রীস্টাব্দে মামুদ আবার মূলতানে আসেন, এবং সুখপালকে বন্দী করিয়া রাখেন। দাউদকেও বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ রাখা হয়। ১০১০ খ্রীস্টাব্দে মূলতান সম্পূর্ণ পদানত হয়।

১০০৯ খ্রীস্টাব্দে মামুদ নারায়ণপুর (রাজস্থানের আলোয়ার অঞ্চলে অবস্থিত) অধিকার করিলেন। নারায়ণপুরের হিন্দু রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বাণিজ্যের দিক হইতে নারায়ণপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মামুদ ও নারায়ণপুরের রাজার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে ভারত ও খোরাসানের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার হয়।

চক্রস্বামীর বিশাল মন্দিরের জন্য থানেশ্বর নগর হিন্দুদের নিকট তীর্থস্থান রূপে গণ্য ছিল। ১০১১ খ্রীস্টাব্দে মামুদ এই মন্দির অধিকারের অভিপ্রায়ে গজনী হইতে যাত্রা করেন। থানেশ্বর আসিবার পথে একজন হিন্দু রাজা মামুদকে প্রবলভাবে বাধা দেন। মামুদ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও হিন্দুদের অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। থানেশ্বরে অবশ্য তাঁহাকে বাধা দিবার কেহই ছিল না।

নগর লুণ্ঠিত হইল ; চক্রস্বামীর মূর্তি গজনীতে লইয়া গিয়া রাজপথে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

মামুদ দুই বার কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া লোহকোটের (বর্তমান লোহারিন) পার্বত্য দুর্গ অধিকারের বৃথা চেষ্টা করেন। ত্রিলোচনপালকে সাহায্য দানের অপরাধে সংগ্রামরাজকে শাস্তি দেওয়াই ছিল প্রথম অভিযানের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অভিযানের (১০২১ খ্রীস্টাব্দ) ব্যর্থতার ফলে মামুদ কাশ্মীর জয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১০১৮ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে মামুদ প্রচুর সৈন্যসামন্ত লইয়া পাঞ্জাবে উপস্থিত হন এবং গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের দিকে যাত্রা করেন। তিনি 'দ্রুতগতিতে পরপর অবরোধ, আক্রমণ ও জয়লাভ' করিয়া অগ্রসর হইলেন। এই অভিযানে তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য বৃহৎ মন্দিরাদি দ্বারা শোভিত ও সুরক্ষিত মথুরা নগরী অধিকার। রক্ষীসৈন্যদল নগরী ও মন্দিরগুলি রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিল না। সেখানে সঞ্চিত অপরিমেয় ধনসম্পদ হস্তগত করার পর বিজয়ী মামুদ বহু মন্দির ধ্বংস করেন। অতঃপর তিনি কনৌজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হর্ষের সময় হইতেই কনৌজ ছিল উত্তর ভারতে সার্বভৌম শক্তির শক্তিকেন্দ্র। গুর্জর-প্রতিহার বংশের সর্বশেষ নৃপতি রাজ্যপাল মামুদের আগমন সংবাদ পাইবা-মাত্র পলায়ন করিলেন। স্বল্পকাল অবরোধের পরেই নগর অধিকৃত হইল ; লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডে বিজয়ীর সাফল্য সম্পূর্ণ হইল। গজনীতে ফিরিবার পথে মামুদ কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করেন।

চন্দেল্লরাজ গণ্ড অথবা বিদ্যাধর হিন্দুদের স্বাধীনতা ও ধর্ম রক্ষার জন্য কয়েকজন হিন্দু নৃপতিকে সংঘবদ্ধ করেন। গুর্জর-প্রতিহাররাজ রাজ্যপাল কনৌজ হইতে পলায়ন করিয়া মিত্রশক্তির বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। মামুদ মনে করিলেন যে চন্দেল্ল শক্তি ধ্বংস করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে ১০১৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি গজনী হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শাহীরাজ ত্রিলোচনপাল তাঁহাকে বাধা দেন। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া মামুদ চন্দেল্ল রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন। চন্দেল্লরাজ (গণ্ড অথবা বিদ্যাধর) বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ তাঁহার সম্মুখীন হন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। বিশাল ও সুসজ্জিত চন্দেল্ল-বাহিনী দেখিয়া মামুদ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এখন স্বভাবতঃই তিনি এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধে কালক্ষেপ না করিয়া ১০২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি গজনীতে ফিরিয়া গেলেন।

কয়েক মাস পরে (১০২২) মামুদ চন্দেল্লগণের শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য পুনরায় ভারতবর্ষে আসিলেন। চন্দেল্লগণের অন্যতম দুর্ভেদ্য দুর্গ কালঞ্জরের

পথে তিনি চন্দেল্লগণের জনৈক সামন্ত রাজার অধীন গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। অতঃপর কালঞ্জর অবরোধ করা হইল। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে চন্দেল্লরাজ বার্ষিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দ্বারা অব্যাহতি লাভ করেন; এমন কি, তিনি সুলতান মামুদের গুণকীর্তন করিয়া একটি কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।

সোমনাথের বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির লুণ্ঠন মামুদের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য অভিযান। অনহিলবাড়ার চৌলুক্যদের রাজ্যে সমুদ্রতীরে সোমনাথের মন্দির অবস্থিত ছিল। সমসাময়িক জনৈক মুসলমান লেখক বলেন, "সুলতান মামুদ যখন বিজয় অভিযান চালাইয়া অন্যান্য মন্দির ধ্বংস করিতেছিলেন, তখন হিন্দুরা বলিত যে সোমনাথ ঐ সকল দেবমূর্তির প্রতি বিরূপ ছিলেন; তিনি যদি উহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে কেহই ঐ সকল মূর্তি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত না। সুলতান এই কথা শুনিয়া ঐ মূর্তি ধ্বংসের জন্য অভিযানের সংকল্প করেন।" সম্ভবতঃ এই মন্দিরে সঞ্চিত অপরিমিত ধনরাশি তাঁহার লোভ ও ঔৎসুক্যের উদ্রেক করিয়াছিল। ১০২৫ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি ৩০,০০০ অশ্বারোহী এবং লুণ্ঠনলোভী বহু স্বেচ্ছাসৈনিক সহ গজনী হইতে যাত্রা করেন। মুলতান ও রাজস্থানের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তিনি অনহিলবাড়ায় উপস্থিত হইলে রাজা ভীম নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া তিনি সোমনাথের দিকে যাত্রা করিলেন। মন্দিরে তিনি প্রবল বাধার সম্মুখীন হন, কিন্তু মন্দিরটি অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয় (জানুয়ারি, ১০২৬ খ্রীস্টাব্দ)। সিন্ধু প্রদেশের মধ্য দিয়া গজনীতে ফিরিবার পথে জাঠগণ তাঁহাকে বিব্রত করে। তাঁহার শেষ ভারতীয় অভিযান ইহাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইয়াছিল। ১০৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভারতের বাহিরে মামুদের অভিযান

সুলতান মামুদ ইরাক ও কাস্পিয়ান সাগর হইতে গঙ্গা নদী, এবং আরব সাগর ও ট্রান্স-অক্সিয়ানা হইতে রাজস্থানের মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। পূর্ব হইতে পশ্চিমে ইহার সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ছিল ২০০০ মাইল এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ইহার সর্বাধিক প্রস্থ ছিল ১৪০০ মাইল। কার্যতঃ তিনিই এই সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, কারণ সিংহাসনে আরোহণের সময়ে কেবল গজনী, বুস্ত ও বল্‌খ্‌ তাঁহার অধীন ছিল। এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করিতে গিয়া স্বভাবতঃই তাঁহাকে মধ্য এশিয়া, ইরান, সিস্তান ও পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে অসংখ্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এইসব অভিযান প্রায়ই তাঁহার ভারত অভিযানে বাধা সৃষ্টি করিত।

মামুদের কৃতিত্ব

সুলতান মামুদ নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারীর ন্যায় তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। সাম্রাজ্যের শাসন-পরিচালনা, আইন-প্রণয়ন ও বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা তাঁহারই হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। তিনি অবশ্যই রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিতেন; কার্যক্ষেত্রে কেবল পরামর্শই নয়, কর্তৃত্বের আংশিক হস্তান্তরও অবশ্যই প্রয়োজন হইত। তবে সুলতানের ইচ্ছাই ছিল আইন। তাঁহার সাম্রাজ্যে তিনিই ছিলেন ন্যায়বিচারের জন্য সর্বোচ্চ আবেদনের ক্ষেত্র। তিনি ছিলেন নিজের প্রধান সেনাপতি, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং অভিযান পরিচালনা করিতেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিনি যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সক্ষম হইযাছিলেন, ইহাতেই তাঁহার শাসন-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নিঃসন্দেহে তিনি অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি নূতন কোন যুদ্ধকৌশল বা অস্ত্র উদ্ভাবন করেন নাই; তবে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ পুরাতন সামরিক সংগঠনে তিনি নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃই নেতৃত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। আরব, আফগান, তুর্কী, হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির লোকজনকে লইয়া তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠিত ছিল, কিন্তু তাঁহার সুদক্ষ নেতৃত্বে তাহারা একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধরত একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠনে পরিণত হইয়াছিল। কেবলমাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধেই নয়, মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ জাতিগুলির এবং পুরাকাল হইতে সামরিক খ্যাতিমান ইরানের বিরুদ্ধেও তিনি তাঁহার সামরিক কৌশল ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

মামুদের কিছু পাণ্ডিত্যের ও কবিত্বের খ্যাতি ছিল। নিজের জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ও তত্ত্বানুরাগবশতঃ তিনি সভাপণ্ডিতদের ধর্ম ও সাহিত্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতেন। তিনি বহু মুসলমান পণ্ডিত ও কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অল-বিরুণী, ফিরদৌসী, আনসারী ও ফারুকীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মুসলমান জগতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান ও পুস্তক সংগ্রহ করিতেন। গজনীতে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

মামুদ যথার্থ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। মুসলমান প্রজাদের তিনি কখনও নিষ্ঠাশীল সুন্নী মতবাদ হইতে বিচ্যুত হইতে দিতেন না। কার্মাথিয়ানদের নির্যাতন এই নীতির এই পরিণতি। তিনি বহু হিন্দুকে বলপ্রয়োগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন, তবে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার কিছু সহিষ্ণুতা ছিল। গজনীতে হিন্দুদের জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল, এবং তাহারা স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করিতে পারিত। ভারতের হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করা তাঁহার সামরিক কর্মসূচীর

অন্তর্গত ছিল। পুরোহিতদের সঞ্চিত অর্থ লাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রধানতঃ তাঁহাকে এই কাজে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপনের জন্য মামুদ পরিকল্পিতভাবে কোন চেষ্টা করেন নাই। ভৌগোলিক ও সামরিক কারণে ঘটনাচক্রেই পাঞ্জাবের শাহী রাজ্য অধিকৃত হয়। এই রাজ্যটি যতদিন স্বাধীন ছিল, ততদিন উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের দিকে মামুদ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। শাহী রাজগণের ক্ষমতা বিনষ্ট হইলে মামুদ তাঁহাদের রাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনিলেন এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অভিযানের পথ সুরক্ষিত করিলেন। মামুদ হয়ত সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহার সাম্রাজ্য অতি-বিস্তারের ফলে ইতিমধ্যেই আয়ত্তের বাহিরে যাইবার উপক্রম করিয়াছে, ভারতের অন্যান্য অংশ ইহার সহিত যুক্ত হইলে সাম্রাজ্যের পরিচালনা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে। সাম্রাজ্যের বিশালতার ফলে শাসনকার্যে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহে সচেতন ছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই সাম্রাজ্যের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার পরিবর্তে মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। অধিকন্তু, চন্দেল্ল ও চৌলুক্যদের ন্যায় শক্তিশালী রাজবংশের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করা যে কিরূপ কঠিন ছিল, তাহা তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিচ্ছিন্ন নগর ও মন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন অপেক্ষা তাঁহাদের সুসংগঠিত রাজ্য অধিকার করা অনেক বেশী কঠিন ছিল। তথাপি মামুদকে যথার্থ ই ভারতে তুর্কীশক্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং মহম্মদ ঘূরী ও বাবরের পথপ্রদর্শক বলিয়া অভিহিত করা যায়। 'তাঁহার বারংবার অভিযানের ফলে ভারতের অপরিমিত সম্পদ লুণ্ঠিত হয় এবং ভারতের যোদ্ধাদের অধিকাংশ বিনষ্ট হয়।' এইরূপে অর্থ নৈতিক ও সামরিক শক্তিক্ষয়ের ফলে পরবর্তী কালে হিন্দুদের পক্ষে তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

মামুদের উত্তরাধিকারীগণ : গজনী ও লাহোরের ইয়ামিনি বংশ

সবুক্তিগীন ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ইয়ামিনি বংশোদ্ভূত ছিলেন। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পরে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল এই বংশের কয়েকজন সুলতান গজনী ও লাহোরে রাজত্ব করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মহম্মদ ঘূরী ইয়ামিনি বংশের শাসন বিলোপ করেন।

৩. মহম্মদ ঘূরী

ঘুর রাজ্যের অভ্যুত্থান

সুলতান মামুদের পরবর্তী কালে গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে ঘুর নামক ক্ষুদ্র একটি তুর্কীশাসিত রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এই অঞ্চলের

অধিবাসীরা অশ্ব-পালক ও অস্ত্র-নির্মাতা রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। তাই ঘুর ছিল সামরিক শক্তির একটি সম্ভাব্য উৎস। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু সুলতান মামুদের অধীনে আসার পর এখানে ইসলাম ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘুরে শান্‌সাবানি নামে এক স্থানীয় রাজবংশ রাজত্ব করিত। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রাজবংশ সুলতান মামুদের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আক্রমণ করিবার শক্তি সঞ্চয় করে।

১১৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ ঘুরী গজনী অধিকার করিয়া নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিহাবউদ্দীন মহম্মদকে ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। শিহাবউদ্দীন পরবর্তী কালে মুইজউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার প্রতি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা অটুট ছিল। শক্তি ও খ্যাতির দিক হইতে গিয়াসউদ্দীন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার তুলনায় অনেক নীচে ছিলেন, সুতরাং মুইজউদ্দীন ইচ্ছা করিলে তাঁহার আনুগত্য অস্বীকার করিতে পারিতেন।

মহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযান

মুইজউদ্দীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। তিনি রাজ্যজয় করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে হয় যে, ভারত জয় করাই তিনি তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেন। ক্ষুদ্র ঘুর রাজ্য তাঁহার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভা প্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না। মধ্য এশিয়ার অনুর্বর ভূমি অপেক্ষা ভারতের শস্যসমৃদ্ধ ভূমি এবং ঐশ্বর্যপূর্ণ নগরগুলি তাঁহার কাছে অধিকতর লোভনীয় ছিল।

মহম্মদের প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় মুলতানের বিরুদ্ধে। ১১৭৫ খ্রীস্টাব্দে মুলতান অধিকার করিয়া তিনি ইসমাইলীয় সম্প্রদায়ের মুসলমানদের দমন করেন। পর বৎসর শঠতার দ্বারা তিনি উচ নামক শক্তিশালী দুর্গটি অধিকার করেন; উহা সম্ভবতঃ একজন কার্মাথিয়ান শাসকের অধীন ছিল। কয়েক বৎসর পরে—১১৮২ খ্রীস্টাব্দে—তিনি দক্ষিণ সিন্ধুর সুম্‌রাবংশীয় শাসককে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন।

সিন্ধু প্রদেশে সাফল্যলাভ করিলেও গুজরাট জয়ের জন্য মহম্মদের চেষ্টা (১১৭৮ খ্রীস্টাব্দ) ব্যর্থ হয়। চৌলুক্য বংশীয় দ্বিতীয় ভীম আবু পর্বতের নিকটে কয়দ্রা নামক গ্রামে মহম্মদকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। মুলতান ও সিন্ধুর পথে ভারতজয়ের চেষ্টার অসুবিধার কথা মহম্মদ উপলব্ধি করিলেন। অপর পথ ছিল পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া। এই অঞ্চল তখন সুলতান মামুদের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের অধীন ছিল। মুলতান ও সিন্ধু ছিল সীমান্তবর্তী অঞ্চল, কিন্তু পাঞ্জাব ছিল উত্তর ভারতের কেন্দ্রে প্রবেশের প্রধান দ্বারপথ। অতএব, সামরিক কারণে,

এবং ঘূর ও গজনীর দুই রাজবংশের দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য, মহম্মদের দৃষ্টি পাঞ্জাবের প্রতি আকৃষ্ট হইল।

১১৮৫ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ শিয়ালকোট অধিকার করিয়া তথায় একটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন। লাহোরও অধিকৃত হইল। সুলতান মামুদের শেষ বংশধর নিহত হইলেন।

তরাইনের দুই যুদ্ধ (১১৯১, ১১৯২)

লাহোরের পতনের ফলে সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব কার্যতঃ মহম্মদের অধীন হইল। সিন্ধু প্রদেশের দেবল হইতে পাঞ্জাবের শিয়ালকোট, এবং পেশোয়ার হইতে লাহোর পর্যন্ত অঞ্চলে তিনি কতকগুলি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করিলেন। এই সুদৃঢ় ও বিস্তীর্ণ ভিত্তি হইতে তিনি আত্মবিশ্বাস সহকারে শাকম্ভরীর শক্তিশালী চাহমান রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। চাহমান রাজ্যের রাজা তখন ছিলেন তৃতীয় পৃথ্বীরাজ; মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে 'রায় পিথোরা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহম্মদ তবরহিন্দা (ভাতিন্দা) দুর্গটি অধিকার করিলেন। অতঃপর পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্রীস্টাব্দ) মহম্মদকে পরাজিত করিয়া পৃথ্বীরাজ অগ্রসর হইয়া তবরহিন্দা অধিকার করিলেন। পর বৎসর মহম্মদ আবার আক্রমণ করিলেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীস্টাব্দ) পৃথ্বীরাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া তৎক্ষণাৎ, অথবা কিছুকাল পরে, হত্যা করা হইল।

তৃতীয় পৃথ্বীরাজ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। আজমীর ও দিল্লীর শাসক রূপে তিনিই ছিলেন মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার স্বাভাবিক রক্ষক। তাঁহার পতনে উত্তর ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হইল। মহম্মদ হানসি, সামানা (পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় অবস্থিত) ও কুরম সহ সমগ্র শিবালিক অঞ্চল অধিকার করিলেন। আজমীরও অধিকৃত হইল। বিজয়ী মহম্মদ 'মন্দিরসমূহের স্তম্ভ ও ভিত্তি ধ্বংস করিয়া সেখানে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন; ইসলামের উপদেশ ও শরীয়তের বিধিনির্দেশ উদ্‌ঘাটিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়'। তবে রাজপুতদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এই শহরটি মুসলমান শাসনকর্তার বসবাসের পক্ষে সম্ভবতঃ তখনও নিরাপদ বিবেচিত না হওয়ায় পৃথ্বীরাজের এক পুত্রকে আজমীরের শাসনভার দেওয়া হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই রাজপুতরা বিদ্রোহ করায় একজন মুসলমান শাসনকর্তা নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। মহম্মদ অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার তাঁহার দক্ষ ও বিশ্বস্ত ক্রীতদাস কুতবউদ্দীন আইবকের হস্তে অর্পণ করিয়া ভারত ত্যাগ করেন।

উত্তর ভারতে মুসলমান আধিপত্য বিস্তার

তৃতীয় পৃথ্বীরাজের পতনের পর ভারতে তুর্কী অধিকারের প্রসার প্রধানতঃ কুতবউদ্দীন আইবকের সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলেই সম্ভব হয়। ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বরন (বুলন্দশহর) এবং মীরাট অধিকার করেন। দিল্লীও ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে তোমরগণের নিকট হইতে অধিকৃত হয় এবং সেখানে বিজয়ীদের মূল কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। অষ্টম শতাব্দীতে তোমরগণের দ্বারা স্থাপিত এই অখ্যাত নগরের গুরুত্বের শুরু এই সময় হইতেই। ১১৯৪ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর নিকটবর্তী কোল (আলিগড়) অধিকৃত হয়।

ঐ বৎসরই মহম্মদ পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কনৌজের গাহড়বাল বংশীয় শক্তিশালী শাসক জয়চন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। চান্দবারের (যমুনা নদীর তীরে, কনৌজ ও এটা শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে) তুমুল যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন। সমৃদ্ধিশালী অস্নি ও বারাণসী শহর দুইটি লুণ্ঠিত হয়, কিন্তু ১১৯৮–১১৯৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কনৌজ অধিকার করা সম্ভব হয় নাই। কুতবউদ্দীনের হস্তে ভারতবর্ষে অধিকৃত রাজ্যখণ্ডগুলির শাসনভার অর্পণ করিয়া মহম্মদ পুনরায় গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১১৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ভারতে আসিয়া আগ্রার নিকটে বায়ানা অধিকার করেন। গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ দুর্গের শাসক তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ১১৯৬ খ্রীস্টাব্দে আজমীরের চতুঃপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী মের নামক আদিবাসী জাতি আজমীর অধিকারের জন্য চেষ্টা করে, এবং গুজরাটের রাজা দ্বিতীয় ভীম তাহাদের সাহায্যের জন্য এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কুতবউদ্দীন আজমীরে গিয়া রাজপুতগণের দ্বারা অবরুদ্ধ হন; কিন্তু গজনী হইতে এক বিশাল বাহিনীর আগমনের সংবাদ পাইয়া অবরোধকারীরা পশ্চাদ-পসরণ করে। অতঃপর কুতবউদ্দীন গুজরাট আক্রমণ করিয়া আবু পর্বতের নিম্নে চৌলুক্যরাজ ভীমের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং আরও অগ্রসর হইয়া অনহিলবাড়া লুণ্ঠন করেন। ১২০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি মধ্য ভারতে কালঞ্জর, মহোবা ও খাজুরাহো অধিকার করিলেন। গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, মহোবা ও খাজুরাহো অধিকৃত হওয়ায় মধ্য ভারতে তুর্কীগণ পা রাখিবার স্থান পাইল।

১২০৫ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ মধ্য এশিয়ার তুর্কোম্যানদের দ্বারা নিদারুণ ভাবে পরাজিত হন। ভারতে এই সংবাদ আসিলে লবণ পর্বতের উত্তরে খোকরগণ ও অপর কয়েকটি উপজাতি বিদ্রোহী হয়। মহম্মদ ভারতে আসিয়া কুতবউদ্দীনের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করেন। গজনীতে ফিরিবার পথে সিন্ধুনদের তীরে খোকর অথবা ইসমাইলী সম্প্রদায়ের আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন (১২০৬)।

বিহার ও বাংলা জয়

কুতবউদ্দীন যখন গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় অধিকার বিস্তারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বক্তিয়ার খলজী নামে একজন খলজী জাতীয় ভাগ্যান্বেষী পূর্ব ভারতে তুর্কী প্রাধান্য স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় অযোধ্যায় তুর্কী শাসনকর্তার অধীনে একজন সেনানায়ক রূপে। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় তাঁহার কয়েকটি জায়গীর ছিল। প্রায় অরক্ষিত মগধ স্বভাবতঃই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বিহারের (পাটনা জেলা) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সংঘটি অধিকার করেন; মুসলমানেরা ইহাকে একটি 'সুরক্ষিত নগর' বলিয়া মনে করিয়াছিল। প্রায় সমসাময়িক কালের একজন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, "ঐ স্থানের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ; তাহাদের সকলেরই মস্তক মুণ্ডিত ছিল। ইহাদের সকলকেই হত্যা করা হয়। তথায় বহু গ্রন্থ ছিল; সে সকল গ্রন্থ মুসলমানদের নজরে আসিলে তাহারা ঐ সকল গ্রন্থের তাৎপর্য সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য কয়েকজন হিন্দুকে ডাকিয়া আনে। (এইসব গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সহিত) পরিচিত হইলে জানা গেল যে সমগ্র দুর্গ ও নগরটি ছিল একটি বিদ্যায়তন; হিন্দী ভাষায় তাহারা বিদ্যায়তনকে বিহার বলিয়া থাকে"। অতঃপর সমগ্র মগধ অধিকৃত হয়। মনে হয় এই সময়ে দক্ষিণ বিহারে কোন কার্যকরী শাসন-ব্যবস্থা ছিল না, কারণ আক্রমণকারীদের সহিত কোন রাজার যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পাল রাজবংশ সম্ভবতঃ বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেন রাজ্যের অবস্থান ছিল পূর্বদিকে।

দক্ষিণ বিহারে, সম্ভবতঃ ১১৯৯-১২০০ খ্রীস্টাব্দে, এই সকল অভিযানের সাফল্যের পর বক্তিয়ার খলজী বাংলায় অভিযান করিয়া 'নদীয়া' অধিকার করেন। 'নদীয়া' বা নবদ্বীপে সেনরাজগণের স্থায়ী রাজধানী ছিল না; কোন দুর্গ বা ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরের দ্বারা ইহা সুরক্ষিত ছিল না। গঙ্গা নদীর সন্নিকটে অবস্থিত এই শহরের অধিকাংশ গৃহই ছিল বংশনির্মিত। তীর্থ-যাত্রীদের পবিত্র বাসস্থান রূপেই ইহার প্রসিদ্ধি ছিল। পশ্চিম হইতে এই শহরে আসিবার সাধারণ পথ ছিল রাজমহলের (বিহার) নিকটবর্তী তেলিয়া-গড়ীর সংকীর্ণ গিরিপথের মধ্য দিয়া। কিন্তু বক্তিয়ার খলজী ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়া চুপি চুপি অগ্রসর হন এবং ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ১৮ জন অশ্বারোহী লইয়া নগরে প্রবেশ করেন। অপর এক দল অশ্বারোহী তাহাদের অনুসরণ করিয়া নগরের দুই প্রান্তে একই সঙ্গে আক্রমণ করে। অপর দুইটি দল তাহাদের অনুসরণ করিয়া লুণ্ঠনকার্যে অংশ গ্রহণ করে। সেনবংশীয় বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন তখন ঐ তীর্থস্থানে বাস করিতেছিলেন। আকস্মিক আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া তিনি পূর্ব বঙ্গে পলায়ন করেন। পূর্ব বঙ্গ আরও প্রায় শতাব্দীকাল সেন বংশের শাসনাধীন ছিল।

'নদীয়া' হইতে বক্তিয়ার খলজী দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া বঙ্গের ঐতিহাসিক রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। মুসলমানেরা গৌড়কে 'লখ্নৌতি' (লক্ষ্মণাবতী) বলিত। বরেন্দ্রভূমি (উত্তর বঙ্গ) জয় সম্পূর্ণ হওয়ার (১২০৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই) পর তিনি বর্তমান মালদহ, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি কুতবউদ্দীনের নিকট হইতে বাংলার শাসনকর্তা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি 'তিব্বত' অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বা গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না; তবে উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা করিয়া তিনি দুর্গম গিরিপথের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন। কিন্তু অভিযান সফল হয় নাই। ফিরিবার পথে কামরূপের রাজার সহিত সংঘর্ষের ফলে তাঁহার সৈন্যদল ধ্বংস হয়। তিনি কোনক্রমে তাঁহার রাজধানী দেবকোটে (বর্তমান দিনাজপুর শহরের নিকটে) ফিরিয়া আসেন। অল্পকাল পরেই আলি মর্দান খলজী নামে তাঁহার এক কর্মচারী তাঁহাকে হত্যা করেন (১২০৬ খ্রীস্টাব্দ)। আলি মর্দানের শাসনকালে বাংলা দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করে।

মহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব

মধ্যযুগীয় এশিয়ার ইতিহাসে মহম্মদ ঘূরী ছিলেন অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ক্ষুদ্র ঘুর রাজ্যের স্বল্প সম্পদের সাহায্যে তিনি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে উত্তর ভারতে যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা আফগানিস্তান হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তিনি নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ সেনানায়ক ছিলেন; অসাধারণ রণনৈপুণ্য ব্যতীত সেকালে কেহ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। কিন্তু বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণের নিকট তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভা অধিকতর আকর্ষণীয়। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক দুর্বলতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এই পতনোন্মুখ রাজনৈতিক সংগঠন সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নির্ভীকভাবে একের পর এক দিকে আঘাত করিতে থাকেন। ধনসম্পদের লোভে তাঁহার দৃষ্টির স্বচ্ছতা আচ্ছন্ন হয় নাই। এই কারণে আক্রমণকারীর পরিবর্তে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা রূপে ইতিহাসে তিনি খ্যাত। শাসন-ব্যবস্থা সংগঠন করিবার সময় তাঁহার ছিল না। রাজ্য জয়ের কাজ সম্পন্ন হইতে না হইতেই আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। উপরন্তু, ভারতবর্ষের প্রতি তিনি সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই; খোরাসানের সমস্যা লইয়া প্রায়ই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। সুতরাং ভারতবর্ষের শাসনভার 'সামরিক সামন্ত'দের হস্তে দেওয়া হয়। হিন্দু সামন্ত রাজা ও জমিদারদের নিকট হইতে কর আদায় এবং বিদ্রোহ দমন ছিল তাঁহাদের প্রাথমিক কর্তব্য। বক্তিয়ার খলজীর ন্যায় যে সকল ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের

সাহায্য ব্যতীত এত অল্প সময়ে উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপন সম্ভব হইত না, তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য সম্ভবতঃ এইরূপ ব্যবস্থা অপরিহার্য ছিল। অত অল্প সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু প্রশাসনের কাঠামো গড়িয়া তোলা সম্ভব ছিল না।

সর্বদা যুদ্ধ ও সংগ্রামে ব্যস্ত থাকিলেও মহম্মদ চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বিদ্যা-চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর চার শতাব্দী পরে ঐতিহাসিক ফিরিস্তা লিখিয়াছেন, তিনি ছিলেন 'ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভীরু ও প্রজাবৎসল'।

মুসলমানগণের সাফল্যের কারণ

মুসলমানগণ ধাপে ধাপে উত্তর ভারত অধিকার করিয়াছিল। আরবগণ সিন্ধু দেশ জয় করিলেও রাজস্থান ও গুজরাটে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সুলতান মামুদের নেতৃত্বে তুর্কীগণ কেবলমাত্র পাঞ্জাব অধিকার করে। মহম্মদ ঘূরীর নেতৃত্বে তাহারা বঙ্গদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং দিল্লীতে মুসলমান শক্তির একটি কেন্দ্র স্থাপন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর, পশ্চিমে রাজস্থান ও গুজরাট, মধ্য ভারত, এবং উত্তর-পূর্বে আসাম স্বাধীন ছিল। হিন্দুরাজ্যগুলি বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করে নাই, কিন্তু আক্রমণকারীগণ তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল।

এই দুর্বলতা ছিল প্রধানতঃ সামরিক। যুদ্ধ কেবলমাত্র কয়েকটি জাতির ও উপজাতির পেশা ছিল; জনগণের অধিকাংশের কোনরূপ সামরিক শিক্ষা ছিল না। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকিত, আকস্মিক বিপদে তাড়াতাড়ি সৈন্যবল বৃদ্ধি করা সম্ভব হইত না। তবে যে সব জাতি পেশাগত ভাবে যোদ্ধা ছিল তাহাদের সামরিক উদ্দীপনা এই ব্যবস্থার ফলে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু সৈন্যগণ চিরাচরিত প্রথানুযায়ী প্রচলিত অস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধ করিত। বাহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় তাহারা মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধবিদ্যার উন্নতির কথা জানিতে পারে নাই। তাহাদের গতি ছিল মন্থর। রসদ সরবরাহ ব্যবস্থাও সন্তোষজনক ছিল না। তৃতীয়তঃ, দশম শতাব্দীর শেষ হইতে হিন্দু রাজগণ প্রতিবেশী রাজগণের সহিত যুদ্ধে এবং মুসলমান আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে তাঁহাদের সৈন্য ধ্বংস এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য ক্ষয় করিতেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে এমন একটি সাম্রাজ্য সংগঠন করিবার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। প্রতিবেশীদিগকে পরাজিত করিয়া সামরিক গৌরব লাভ করাই সেকালের রাজাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

উত্তর-পশ্চিমে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হিন্দু রাজগণের অক্ষমতা হইতে তাঁহাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব প্রমাণিত হয়। সিন্ধুদেশে আরব অধিকার স্থাপন এবং সুলতান মামুদের অভিযান সত্ত্বেও ভারতের কেন্দ্র-

স্থলে মুসলমানদের আক্রমণের সম্ভাবনা তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই। প্রতিহারগণ আরবদের সহিত যুদ্ধ করিলেও রাষ্ট্রকূটগণ তাহাদের বন্ধু ছিলেন। ধর্মের উপর আঘাতেও হিন্দুরা জাগ্রত হয় নাই। সিন্ধুতে যখন তাহাদের সহধর্মীদের বলপ্রয়োগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা এবং মন্দির ধ্বংস করা হইতেছিল, তখন তাহারা ছিল নীরব দর্শক মাত্র। তখনও তাঁহাদের সামরিক বল পারস্পরিক কলহে ক্ষুণ্ণ হইত।

জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজকে দুর্বল করিয়াছিল। ধর্মের অর্থ ছিল আনুষ্ঠানিক আচার পালন; তাহা চরিত্রকে গঠন করিতে বা মহৎ কার্যের জন্য উদ্দীপনা জোগাইতে পারে নাই। বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় হিন্দুরা সংকীর্ণচিত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অল-বিরুণী বলেন; "হিন্দুরা মনে করে তাহাদের দেশ ব্যতীত অপর কোন দেশ নাই, তাহাদের রাজার ন্যায় কোন রাজা নাই, তাহাদের বিজ্ঞানের ন্যায় কোন বিজ্ঞান নাই। তাহারা যদি ভ্রমণ করিত এবং অন্যান্য জাতির সহিত পরিচিত হইত, তবে তাহাদের ধারণার পরিবর্তন হইত।" কিন্তু ধর্মীয় বিধি ও সামাজিক আচার অন্য জাতির সংস্পর্শ নিষিদ্ধ করিয়াছিল। যেমন, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল।

অনেক বিষয়ে মুসলমান আক্রমণকারীদের কিছু বিশেষ সুবিধা ছিল। তাহারা নিজেদের ইসলামের জন্য ধর্মযোদ্ধা বলিয়া মনে করিত। অবিশ্বাসীদের ধর্মান্তরিতকরণ তাহাদের পবিত্র কর্তব্য রূপে গণ্য হইত। দ্বিতীয়তঃ, অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চল হইতে আগত এই অভিযানকারীরা ভারতের ন্যায় সমৃদ্ধ দেশ লুণ্ঠনের জন্য ব্যগ্র ছিল। তাহাদের নেতারা ছিলেন উচ্চ স্তরের সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অধিকারী। রাজনৈতিক বা সামরিক নেতৃত্বে কোন হিন্দু রাজা সুলতান মামুদ বা মহম্মদ ঘূরীর সমকক্ষ ছিলেন না।

কেবলমাত্র সামরিক দিক হইতে বিচার করিলে মুসলমানগণ ছিল হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক বেশী দক্ষ ও সংগঠিত। দ্রুত এবং সুপরিচালিত মুসলমান অশ্বারোহীগণ মন্থর ও অসংগঠিত হিন্দু সৈনিকদের তুলনায় দক্ষতর যোদ্ধা ছিল। মুসলমানগণের রসদ বহন করিত উট। তাহাদের জন্য তৃণ ইত্যাদি পশুখাদ্যের প্রয়োজন হইত না; তাহারা পথের পাশে যে সকল গাছ থাকিত তাহাদের পাতা চিবাইয়া খাইত। কিন্তু হিন্দুদের রসদ বহন করিত মন্থরগতি বলদেরা; তাহাদের জন্য শস্যজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হইত। সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘূরী মধ্য এশিয়ার ও আফগানিস্থানের কষ্টসহিষ্ণু বলবান অধিবাসীদের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুরাজগণ যাহাদের সৈন্য রূপে নিয়োগ করিতেন তাহারা ছিল প্রধানতঃ কৃষক এবং শারীরিক দিক হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পার্বত্য ভূমির অধিবাসী দৃঢ়কায় মুসলমানদের মত যুদ্ধ করা তাহাদের প্রধান পেশা ছিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য : রাজনৈতিক ইতিহাস

১. 'মামেলু' বা 'দাস' বংশ (১২০৬-৯০)

মহম্মদ ঘূরীর অভিযানের ফলে পাঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি তুর্কী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা দিল্লীর সুলতানী রাজ্য (Sultanate) নামে পরিচিত, কারণ ইহার রাজধানী ছিল দিল্লী এবং রাজাদের উপাধি ছিল 'সুলতান'। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুলতানগণ সাধারণভাবে 'মামেলুক' (Mameluk) বা 'দাস' (Slave) বংশীয় বলিয়া পরিচিত। এই তথাকথিত 'দাস' বংশের মাত্র তিন জন সুলতান (কুতবউদ্দীন, ইলতুৎমিস এবং বলবন) ক্রীতদাস রূপে কর্মজীবন শুরু করিয়াছিলেন, এবং কুতবউদ্দীন ব্যতীত অপর দুইজন সিংহাসন লাভের পূর্বেই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। উপরন্তু, ১২০৬-১২৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দিল্লীর শাসকগণ তিনটি বংশোদ্ভূত ছিলেন—কুতবি (কুতবউদ্দীন ও আরাম শাহ), শাম্‌সি (শাম্‌সউদ্দীন ইলতুৎমিস ও তাঁহার বংশধরগণ) ও বলবনি (গিয়াসউদ্দীন বলবন ও তাঁহার বংশধরগণ)। এই তিনটি বংশকে এক বংশ হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়।

কুতবউদ্দীন আইবক

মহম্মদ ঘূরীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার পরিবারের বামিয়ান শাখার আলাউদ্দীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি গিয়াসউদ্দীনের পুত্র মামুদ কর্তৃক বিতাড়িত হন। মহম্মদ ঘূরীর ভারতীয় সাম্রাজ্য সম্ভবতঃ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন বলেন যে তিনি তাঁহার ক্রীতদাসগণকে 'কয়েক সহস্র পুত্র' বলিয়া গণ্য করিতেন। কুতবউদ্দীন আইবক তাঁহার সেনাপতি রূপে উল্লেখযোগ্য দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিনিধি রূপে ভারতীয় রাজ্য শাসন করিতেন। সুতরাং দিল্লীর সিংহাসনের জন্য তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের (২৫ জুন, ১২০৬ খ্রীস্টাব্দ) ফলে দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের ইতিহাস শুরু হয়। ঘূর রাজ্যের অধিপতি তাঁহাকে 'সুলতান' উপাধি দেন, এবং ভারতস্থ তুর্কী আমির ও সেনাপতিদের অধিকাংশই তাহা অনুমোদন করেন। তিনি নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন

কিনা অথবা তাঁহার নামে 'খুৎবা'[১] পাঠ করা হইত কিনা, তাহা সঠিক জানা যায় না।

সেকালের অনেক বিশিষ্ট মুসলমানের ন্যায় কুতবউদ্দীনও প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার প্রথম প্রভু নিশাপুরের কাজী তাঁহাকে পুঁথিগত বিদ্যা এবং অশ্বারোহণ ও অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত করিয়া তোলেন। কাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করে। ঐ ব্যবসায়ী তাঁহাকে গজনীতে লইয়া গিয়া মহম্মদ ঘূরীর নিকট বিক্রয় করে। তাঁহার যোগ্যতা ও গুণাবলী অল্পকালের মধ্যেই মহম্মদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ক্রমান্বয়ে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইতে থাকেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্থানে তাঁহার প্রভুর প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। সিংহাসনে আরোহণের পরে, ১২০৮ খ্রীস্টাব্দে, তিনি দাসত্ব হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে মুক্তি লাভ করেন।

মহম্মদ ঘূরীর অপর দুই জন ক্ষমতাশালী ক্রীতদাস ছিলেন মূলতান ও উচের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দীন কাবাচা এবং কিরমানের শাসনকর্তা তাজউদ্দীন ইলদুজ। তাঁহারাও মহম্মদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের প্রার্থী ছিলেন। তাজউদ্দীন গজনী অধিকার করিয়া পাঞ্জাব জয়ের জন্য যাত্রা করেন। কুতবউদ্দীন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন ও গজনী অধিকার করেন। তবে এক মাসের মধ্যেই গজনীর অধিবাসীরা কুতবউদ্দীনের সৈন্যদের দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া তাজউদ্দীনকে ফিরিয়া আসার জন্য গোপনে আমন্ত্রণ করে। তাজউদ্দীন অতর্কিত আক্রমণে গজনী অধিকার করেন এবং কুতবউদ্দীন যুদ্ধ করার কোন চেষ্টা না করিয়াই লাহোরে ফিরিয়া আসেন। সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের মধ্যে যে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা এইরূপে ছিন্ন হয়। বাবর কর্তৃক ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত এই সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয় নাই।

এই অপমানজনক পশ্চাদপসরণের অল্পকাল পরেই কুতবউদ্দীন চৌগান (পোলো) খেলার সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া নিহত হন। তাঁহার স্বল্পকালীন রাজত্বকালে তিনি এমন কিছুই করেন নাই যাহাতে তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। তিনি কোন নূতন রাজ্য জয় করেন নাই, সুষ্ঠুতর শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনেরও কোন চেষ্টা করেন নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁহার উদার শাসন-ব্যবস্থা ও ন্যায়পরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তবে ইহা বোধকরি চিরাচরিত প্রথা পালন মাত্র। তিনি যে দানশীল ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ সচরাচর তিনি

---

১ মুসলমানেরা শুক্রবার মধ্যাহ্নে মসজিদে যে প্রার্থনা (জুহর) করেন তাহাকে 'খুৎবা' বলা হয়। 'খুৎবা'তে খলিফার নাম সংযুক্ত করা হইত, কিন্তু স্বাধীন মুসলমান রাজ্যগুলিতে খলিফার নামের পরিবর্তে ঐ সকল রাজ্যের শাসকদের নাম উচ্চারিত হইত। 'খুৎবা'য় যে রাজার নাম থাকিত তিনিই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী রূপে গণ্য হইতেন।

'লাখবক্‌স্' (লক্ষদাতা) নামে অভিহিত। তাঁহার চরিত্রে 'তুর্কীদের নির্ভীকতার সহিত পারসিকদের সুকুমার রুচিবোধ ও উদারতার সংমিশ্রণ' ঘটিয়াছিল। দিল্লী ও আজমীরে তাঁহার নির্মিত দুইটি মসজিদ তাঁহার ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শিল্পের প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক।

ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬)

কুতবউদ্দীনের উত্তরাধিকারী হন আরাম শাহ; তিনি কুতবউদ্দীনের দত্তক পুত্র বলিয়া পরিচিত। এক মাসের মধ্যেই কুতবউদ্দীনের জামাতা শামসউদ্দীন ইলতুৎমিস তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

ইলতুৎমিস অভিজাত বংশীয় ইলবারী শাখার অন্তর্ভুক্ত এক তুর্কী বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা বাল্যকালেই তাঁহাকে দাস রূপে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। কুতবউদ্দীন তাঁহাকে ক্রয় করেন। আনুগত্য ও কর্মদক্ষতা দ্বারা তিনি কুতবউদ্দীনকে সন্তুষ্ট করেন, এবং সিংহাসন লাভের পূর্বে ক্রমান্বয়ে গোয়ালিয়র, বরন (বুলন্দশহর) ও বদায়ুনের জায়গীর লাভ করেন।

ইলদুজ ও কাবাচার পতন

আরাম শাহকে পরাজিত করিয়া ইলতুৎমিস এক বিঘ্নসংকুল উত্তরাধিকার লাভ করেন। বাংলায় আলি মর্দান খলজী বক্তিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিলেন। কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পরে তিনি দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন। নাসিরউদ্দীন কাবাচা মূলতানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া লাহোর অধিকার করেন এবং সমগ্র পাঞ্জাবে অধিকার বিস্তারের পরিকল্পনা করেন। গজনীর শাসক তাজউদ্দীন ইলদুজ মহম্মদ ঘূরীর উত্তরাধিকারী রূপে ভারতের উপর সার্বভৌম অধিকার দাবি করেন এবং ইলতুৎমিসকে নিজের প্রতিনিধি রূপে গণ্য করিতে চাহেন। অশান্ত রাজপুতগণ ঝালোর, রণথম্ভোর, আজমীর ও গোয়ালিয়র অধিকার করেন। এমন কি, উত্তর ভারতের কয়েকজন ক্ষমতাশালী তুর্কী 'সামরিক সামন্ত'ও নূতন সুলতানের আধিপত্য প্রায় প্রকাশ্যেই অস্বীকার করিতে থাকেন।

ইলতুৎমিস বিচক্ষণতার সহিত সতর্কতার নীতি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রথম কর্তব্য হইল বিক্ষুব্ধ 'সামরিক সামন্ত'দের উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। দিল্লী, বদায়ুন, অযোধ্যা, বারাণসী প্রভৃতি এলাকায় এবং শিবালিক পার্বত্য অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর তিনি তাঁহার অধিকতর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার অবসর পাইলেন। তিনি ইলদুজ ও কাবাচাকে পরাজিত করিয়া সিন্ধু ও পাঞ্জাব সম্পূর্ণভাবে নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনিলেন।

মোঙ্গল আতঙ্ক

ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রথম মোঙ্গল আতঙ্কের আবির্ভাব হয়। 'মোঙ্গ' শব্দ হইতে মোঙ্গল শব্দের উৎপত্তি ; 'মোঙ্গ' অর্থ সাহসী। মোঙ্গলেরা ছিল নিষ্ঠুর বর্বর জাতি। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু একবার মোঙ্গলদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন: 'তাহারা ছিল দুঃসাহসী এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ; তাহারা তাহাদের ইস্পাতের ন্যায় (কঠিন) দেহ কার্পাসবস্ত্রে আবৃত রাখিত। তাহাদের পশমের শিরস্ত্রাণে বেষ্টিত অগ্নিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইত যে পশম এখনই জ্বলিয়া উঠিবে। তাহাদের মস্তক মুণ্ডিত ছিল···রৌপ্যপাত্রে দুটি ফাটলের ন্যায় ছিল তাহাদের চক্ষু, চক্ষুগোলক ছিল পর্বতগাত্রে গভীর ফাটলের মধ্যে অবস্থিত প্রস্তর-খণ্ডের মত। তাহাদের দেহ ছিল গলিত শবের অপেক্ষাও দুর্গন্ধ, তাহারা পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত মস্তক নত করিয়া রাখিত। দামামার সিক্ত চর্মের ন্যায় তাহাদের দেহ ছিল কুঞ্চিত ও বলিরেখাঙ্কিত। তাহাদের নাসারন্ধ্র ছিল বিশাল, এক গাল হইতে অপর গাল পর্যন্ত প্রসারিত। তাহাদের মুখও একদিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাহাদের নাসারন্ধ্র ছিল পরিত্যক্ত কবর অথবা পুতিগন্ধময় জলপূর্ণ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়। কুৎসিত দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া তাহারা শূকর ও কুকুর খাইত ; পান করিত পয়ঃপ্রণালীর জল ও আহার করিত আস্বাদহীন ঘাস।'

চেঙ্গিজ খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ এশিয়ার মধ্যে প্রধানতম রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। চীন, মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়া বিধ্বস্ত করিয়া তিনি খোয়ারিজম্ রাজ্য ধ্বংস করেন। এই রাজ্যের শেষ শাসকের উত্তরাধিকারী জালালউদ্দীন মংকবার্নী পাঞ্জাবে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। পাঞ্জাবে অশান্ত খোকরদের সহযোগিতায় তিনি নাসিরউদ্দীন কাবাচার রাজ্যের এক অংশ অধিকার করেন, এবং লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ইলতুৎমিসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু চেঙ্গিজ খাঁ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এমন কাজ করিতে দিল্লীর সুলতান অস্বীকার করিলেন। চেঙ্গিজ খাঁ ইতিমধ্যে মংকবার্নীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইলতুৎমিসের সৌভাগ্যবশতঃ তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া আফগানিস্থানে চলিয়া যান। মংকবার্নী ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোঙ্গলগণ সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব লুণ্ঠন করে, কিন্তু পাঞ্জাবের প্রবল উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা আর ভারতের মধ্যস্থলে অগ্রসর হয় নাই। ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে আর মোঙ্গল আক্রমণ হয় নাই।

ইলতুৎমিসের রাজ্য বিস্তার

মোঙ্গল বিভীষিকা হইতে মুক্ত এবং জালালউদ্দীনের হস্তে কাবাচার পরাজয়ে

নিশ্চিন্ত হইয়া ইলতুৎমিস বাংলার দিকে দৃষ্টি দিলেন। আলি মর্দান খলজীর নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারে কয়েকজন মুসলমান ওমরাহ বিদ্রোহী হইলেন। তাঁহারা আলি মর্দানকে হত্যা করিয়া (১২১২ খ্রীস্টাব্দ) হাসামউদ্দীন আয়াজ নামে একজন দক্ষ কর্মচারীকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন খলজী উপাধি গ্রহণ করেন (১২১৩-১২২৭ খ্রীস্টাব্দ)। কথিত আছে, তিনি জাজনগর (উড়িষ্যা), কামরূপ, ত্রিহুত (উত্তর বিহার) এবং 'বঙ্গ' অধিকার করেন। তিনি দেবকোট হইতে গৌড়-লখনৌতিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে ইলতুৎমিস এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে গিয়াসউদ্দীন বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনি সুলতান উপাধি ত্যাগ করিয়া দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার করেন, বিহারের উপর নিজ দাবী প্রত্যাহার করেন এবং ইলতুৎমিসকে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। ইলতুৎমিস এই সকল শর্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াসউদ্দীন পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বিহার অধিকার করেন। ১২২৭ খ্রীস্টাব্দে সুলতানের পুত্র, অযোধ্যার শাসনকর্তা নাসিরউদ্দীন মামুদ, বাংলা আক্রমণ করিয়া লখ্‌নৌতি অধিকার করেন। গিয়াসউদ্দীন নিহত হন। অতঃপর নাসিরউদ্দীন বাংলার শাসনকর্তা হন, কিন্তু ১২২৯ খ্রীস্টাব্দে অকালমৃত্যুতে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ শেষ হইয়া যায়।

এই দুর্ঘটনার সুযোগে ইখতিয়ারউদ্দীন বল্‌কা খলজী নামে গিয়াসউদ্দীনের এক সমর্থক বাংলার সর্বময় কর্তৃত্ব অধিকার করেন। ১২৩০-৩১ খ্রীস্টাব্দে ইলতুৎমিস পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন। বল্‌কা পরাজিত ও নিহত হন; বাংলা পুনরায় দিল্লীর অধীনে আসে এবং মালিক আলাউদ্দীন জানি বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

ইলতুৎমিসের অপর একটি কঠিন কর্তব্য ছিল রাজস্থান ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। রণথম্ভোরের বিখ্যাত দুর্গ একজন চৌহান রাজার অধিকারভুক্ত ছিল। ১২২৬ খ্রীস্টাব্দে ইলতুৎমিস রণথম্ভোর, এবং পর বৎসর মান্দোর (মাড়োয়ারে অবস্থিত), অধিকার করেন। ১২২৮ অথবা ১২২৯ খ্রীস্টাব্দে ঝালোর অধিকৃত হয়। আজমীর ও নাগোর পুনরাধিকৃত হইল। ১২৩২ খ্রীস্টাব্দে ইলতুৎমিস মঙ্গলদেব নামক একজন হিন্দু রাজার নিকট হইতে গোয়ালিয়র অধিকার করেন। দোয়াবে বদায়ুন ও কনৌজ এবং বারাণসী ও কাতেহরে (রোহিলখণ্ডে), তুর্কী অধিকার পুনঃস্থাপিত হয়।

মালবে প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটে ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে। ১২৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি উজ্জয়িনী ও ভিলসা লুণ্ঠন করেন। উজ্জয়িনীতে মহাকালের বিখ্যাত মন্দিরটি ধ্বংস করা হয়। কিন্তু মালবের কোন অংশ অধিকৃত হয় নাই।

ইলতুৎমিসের কৃতিত্ব

ইলতুৎমিস ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ১২২৯ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদের খলিফা তাঁহার রাজকীয় উপাধি অনুমোদন করেন। ইহা আনুষ্ঠানিক প্রথাপালন মাত্র। 'ইহার অর্থ ছিল যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে নথিভুক্ত করা—দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতিদান।' কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার মুসলমান প্রজাগণের দৃষ্টিতে ইলতুৎমিসের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ১২৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দে ইলতুৎমিস প্রসিদ্ধ ফকির খাজা কুতবউদ্দীন বক্তিয়ার কাকীর সম্মানে কুতব মিনার নির্মাণ করিয়াছিলেন। বক্তিয়ার কাকী ১২৩৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে প্রাণত্যাগ করেন। ইলতুৎমিসেরও মৃত্যু হয় ১২৩৬ খ্রীস্টাব্দে।

সাধারণতঃ ইলতুৎমিসকে দিল্লীর 'দাস' বংশীয় সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হয়। মহম্মদ ঘুরীর বিজিত রাজ্যখণ্ডগুলি সংগঠিত করিয়া ভারতে নবজাত তুর্কী সাম্রাজ্যে তিনি এমন এক ঐক্যবোধের সঞ্চার করেন যাহা কুতবউদ্দীনের রাজত্বকালে সম্ভব হয় নাই। 'তিনি এই দেশকে দিয়াছিলেন একটি রাজধানী (দিল্লী), একটি স্বাধীন রাজ্য (গজনী ও ঘুরের অধীনতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং খলিফা কর্তৃক স্বীকৃত একটি রাজ্য), একটি রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা এবং (তুর্কী আমীরদের দ্বারা গঠিত) একটি শাসক শ্রেণী।' ইলতুৎমিস দুর্বল শাসক হইলে সমগ্র সুলতানী রাজ্য খুব সম্ভবতঃ কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া এমন সব শাসকদের দ্বারা শাসিত হইত, যাঁহারা কোন কেন্দ্রীয় শক্তির কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন না। সুতরাং একজন দক্ষ সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভের অধিকারী। তাঁহার পূর্ববর্তী দুই জন শাসক অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন চেষ্টা না করিলেও ইলতুৎমিস সে চেষ্টা করেন। তিনি সুলতানী রাজ্যের সংগঠনের প্রধান তিনটি অঙ্গকে—ইকৃতা, সৈন্যবাহিনী ও মুদ্রা-ব্যবস্থাকে—গড়িয়া তোলেন। তাঁহার বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন। তিনি বলেন, 'ধর্মে অগাধ আস্থাবান, ফকির, ভক্ত, সাধুসজ্জন এবং ধর্ম ও অনুশাসন প্রণেতাদের প্রতি এরূপ ভক্তিশীল ও দয়ালু কোন নরপতি ইতিপূর্বে কখনও বিশ্বজননীর ক্রোড় হইতে বিশাল রাজ্য হস্তগত করিতে পারেন নাই।'

রজিয়া (১২৩৬-১২৪০)

মৃত্যুর পূর্বে ইলতুৎমিস তাঁহার পুত্রদের দাবী উপেক্ষা করিয়া কন্যা রজিয়াকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিয়া যান, কারণ পুত্রগণকে তিনি সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার বহনে অযোগ্য মনে করিতেন। কিন্তু রাজ্যের ওমরাহগণ নারীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ইলতুৎমিসের জীবিত পুত্রদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ রুকনউদ্দীন ফিরোজকে সুলতান মনোনীত করেন। রুকনউদ্দীন উচ্ছৃঙ্খলতা

এবং দুর্বলতার জন্য কুখ্যাত ছিলেন। তিনি ব্যভিচারে ও হীনকার্যে মত্ত থাকিতেন, সুতরাং শাসনকার্য পরিচালনার সকল ক্ষমতা ধীরে ধীরে তাঁহার ন্যায়ান্যায়বোধহীন মাতা শাহ্ তুর্কানের হস্তগত হয়। তিনি প্রথমে অন্তঃপুরের দাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর। বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ শুরু হইল। শাহ্ তুর্কানের অখ্যাতির সুযোগ রজিয়া অতি নিপুণভাবে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে বন্দী করিবার জন্য দিল্লীর উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে প্ররোচিত করিলেন। অতঃপর রজিয়াকে 'সুলতান'[১] ঘোষণা করা হইল। কয়েক মাস রাজত্ব করিবার পর রুকনউদ্দীন বন্দী ও নিহত হইলেন (১২৩৬ খ্রীস্টাব্দ)।

রজিয়া সৈন্যবাহিনীর, রাজ-কর্মচারীদের এবং দিল্লীর জনগণের সমর্থনে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ 'উপেক্ষিত ও অপমানিত বোধ' করিয়া তাঁহার বিরোধিতা করিলেন। এইরূপে নূতন সুলতান কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইলেন। বদায়ুন, মুলতান, হান্সি ও লাহোরের শাসনকর্তাগণ রুকনউদ্দীনের উজীর নিজাম-উল-মুল্ক মহম্মদ জুনাইদির সহায়তায় দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কারণ তাঁহারা রজিয়ার সিংহাসনে আরোহণকে স্বীকার করেন নাই। তাহারা রজিয়াকে দিল্লীতে অবরোধ করিলেন। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করার মত শক্তি রজিয়ার ছিল না, কিন্তু তাঁহার কূটনীতির ফলে তাঁহাদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। বিদ্রোহীদের একতা বিনষ্ট হয় এবং তাঁহারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেন। অতঃপর 'লখ্নৌতি হইতে (সিন্ধুদেশের) দেবল পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের সমস্ত মালিক ও আমীরগণ বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করেন।' বাংলার শাসনকর্তা স্বেচ্ছায় পুনরায় দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করেন এবং উচে জনৈক বিশ্বস্ত শাসনকর্তাকে নিয়োগ করা হয়।

মহিলার পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা মুসলমান জগতে অবিদিত বা অননুমোদিত না হইলেও রজিয়ার বিরুদ্ধে এজন্যই কিছু আপত্তি ছিল। তিনি স্ত্রীলোকের বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া এবং অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া গোঁড়া মুসলমানদের মনে আঘাত দিয়াছিলেন। তিনি পুরুষের বেশে রাজদরবার ও শিবিরে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ্যে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। তাহার বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ ছিল এই যে তিনি জামালউদ্দীন ইয়াকুত নামে আবিসিনিয়া হইতে আগত জনৈক কর্মচারীর প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ দেখাইতেন। তখনকার দিনে তুর্কী ওমরাহগণ এক সঙ্কীর্ণ সামন্ততন্ত্র গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষমতা ও পদমর্যাদার একাধিপত্য দাবী করিতেন। তাহারা তাহাদের জাতিগত অধিকার ত্যাগ করিতে বা রাজকীয় কর্তৃত্বের নিকট নতিস্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

---

১ রজিয়াকে 'সুলতানা' বলা ভুল, কারণ 'সুলতানা' শব্দের অর্থ 'সুলতানের পত্নী'—'রাজ্যের শাসনকর্ত্রী' নয়।

রজিয়ার নূতন নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী যে আমীর প্রথম প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন, তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা কবীর খাঁ আয়াজ। ১২৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দে রজিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে তিনি বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন। দিল্লীতে ফিরিয়া আসার অল্পকাল পরেই রজিয়া আরও ভীষণতর বিদ্রোহের সম্মুখীন হইলেন। তুর্কী ওমরাহদের প্ররোচনায় ভাতিন্দার শাসনকর্তা ইক্তিয়ারউদ্দীন আলতুনিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। 'আমীর-ই-হাজিব' পদাধিকারী ইক্তিয়ারউদ্দীন আইতিগীন ছিলেন বিদ্রোহীদের নেতা। বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া রজিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি ভাতিন্দায় পৌঁছিলে ইয়াকুতকে হত্যা করা হইল, রজিয়াকে বন্দিনী করিয়া আলতুনিয়ার হেফাজতে রাখা হইল। ইলতুৎমিসের এক কনিষ্ঠ পুত্র মুইজউদ্দীন বহরামকে সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা হইল।

১২৪০ খ্রীস্টাব্দে বহরাম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, এবং ওমরাহগণ তাঁহাদের নেতা আইতিগীনের হস্তে যাবতীয় রাজকীয় ক্ষমতা অর্পণ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিলেন। সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী রাজপ্রতিনিধিকে সুলতান সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্ররোচনায় আইতিগীনকে হত্যা করা হইল। ইতিমধ্যে আলতুনিয়া সফল বিদ্রোহের পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হওয়ায় স্বভাবতঃই তাঁহার মনে নৈরাশ্যবোধ দেখা দেয় এবং তিনি বন্দিনী রজিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেন। আলতুনিয়া কারাগার হইতে রজিয়াকে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইবার উদ্দেশ্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু বহরামের সৈন্যবাহিনী তাঁহাকে পরাজিত করে এবং কয়েকজন দস্যুর হস্তে তিনি ও রজিয়া নিহত হন।

রজিয়াই একমাত্র নারী যিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাড়ে তিন বৎসর কাল রাজত্ব করেন। রাজকার্য সম্পাদনকালে প্রচলিত প্রথাকে উপেক্ষা এবং তুর্কী আমীরদের একাধিপত্যে হস্তক্ষেপ, প্রধানতঃ এই দুইটি কারণে তাঁহার পতন হয়। প্রতিপক্ষের নিকট তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিতে হইলেও তিনি নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ নারী ছিলেন। মিনহাজউদ্দীন তাঁহাকে 'শ্রেষ্ঠ শাসক, বুদ্ধিমতী, ন্যায়পরায়ণা, দয়াশীলা, বিদ্যোৎসাহিনী, সুবিচারক, প্রজাবৎসলা, সমর-কুশলা এবং অন্যান্য সকল প্রশংসনীয় রাজোচিত গুণের অধিকারিণী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই ঐতিহাসিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'এই সকল অসামান্য গুণাবলী রজিয়ার কোন উপকারে আসিল?'

চল্লিশ আমীরের চক্র

রজিয়া উচ্চাভিলাষী ও অশান্ত তুর্কী অভিজাতদের উপর রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হন। ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে নেতৃস্থানীয় তুর্কীদের মধ্যে চল্লিশ

জন ('The Forty') একটি চক্র বা গোষ্ঠী গঠন করিয়া নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্যের বড় বড় জায়গীর এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সমস্ত পদ ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ইলতুৎমিস তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিগত দক্ষতার ফলে রাজকীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তানদের রাজত্বকালে এই চল্লিশ জনের ক্ষমতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদি একজনের মর্যাদাবৃদ্ধিতে অপর সকলের ঈর্ষা প্রতিবন্ধক হইয়া না দাঁড়াইত, তবে এই চল্লিশ জনেরই একজন সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিতেন।

মুইজউদ্দীন বহরাম শাহ (১২৪০-১২৪২)

আইতিগীনের হত্যার পর বহরাম 'চল্লিশ চক্রের' অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য বদর-উদ্দীন সংকরকে 'আমীর-ই-হাজিব' পদ প্রদান করেন। তবে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অনতিকাল পরেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে আমীরগণ সুলতানের বিরোধী হইলেন। ওমরাহগণ যখন এইভাবে কেন্দ্রীয় শক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন মোঙ্গলগণ সিন্ধু নদ অতিক্রম করে। তাহারা হুলাগু খাঁর অন্যতম সেনানায়ক তায়ের বাহাদুরের নেতৃত্বে লাহোর অধিকার করে। লাহোরের শাসনকর্তাকে সাহায্য করিবার জন্য সুলতান এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক উজীর নিজাম-উল-মুল্কের চক্রান্তের ফলে তাহারা বিপাশা নদীর তীর হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া আসে। রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া এই বিদ্রোহী বাহিনী সুলতানকে বন্দী করিয়া হত্যা করে।

আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ (১২৪২-১২৪৬)

অতঃপর বিজয়ী ওমরাহগণ আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ নামে রুকনউদ্দীন ফিরোজ শাহের এক অতি অল্পবয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে নানাস্থানে বিদ্রোহ হয় এবং মোঙ্গলেরা ভারত আক্রমণ করে।

নাসিরউদ্দীন মামুদ (১২৪৬-১২৬৬)

মাসুদের অযোগ্যতা ও ঔদ্ধত্যে 'চল্লিশ চক্র' অসন্তুষ্ট হন। ফলে মাসুদ সিংহাসন-চ্যুত ও নিহত হন (১২৪৬)। ওমরাহদের মনোনয়নে সিংহাসন লাভ করেন ইলতুৎমিসের এক কনিষ্ঠ পুত্র, অথবা পৌত্র, ষোল বৎসর বয়স্ক নাসিরউদ্দীন মামুদ। তাঁহার পূর্ববর্তী সুলতানগণের ন্যায় তিনি স্বল্পকাল রাজত্বের পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই; তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুও হয় সম্ভবতঃ স্বাভাবিক ভাবে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ও সরলতা সম্বন্ধে নানা অতিরঞ্জিত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল কাহিনীর

সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। সম্ভবতঃ নাসিরউদ্দীন অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন, এবং যে সকল শক্তিশালী ওমরাহকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তাঁহার সাধ্যের অতীত ছিল, তাঁহাদের হাতেই রাজকার্য পরিচালনার ভার সমর্পণ করিয়া কেবলমাত্র রাজকীয় উপাধি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন।

উলুঘ খাঁ ছিলেন নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি গিয়াসউদ্দীন বলবন নামেই অধিক পরিচিত। ইলতুৎমিসের ন্যায় তিনিও ছিলেন জাতিতে ইলবারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তুর্কী। কথিত আছে, তাঁহার পিতা ছিলেন ১০,০০০ পরিবারের প্রধান। তরুণ বয়সে তিনি মোঙ্গলদের হস্তে বন্দী হইয়া বাগদাদে ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হন। তাঁহার প্রভু তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া আসিলে ইলতুৎমিস তাঁহাকে ক্রয় করেন। তাঁহার বুদ্ধি ও বিশ্বস্ততার গুণে দ্রুত তাঁহার পদোন্নতি ঘটিতে থাকে। অবশেষে তিনি 'চল্লিশ চক্রে'র অন্যতম সদস্য হন। রজিয়ার শাসনকালে তিনি 'আমীর-ই-শিকার' নিযুক্ত হন। যে সকল ওমরাহ রজিয়াকে পদচ্যুত করেন, বলবন তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কারণে বহরাম শাহ তাঁহাকে রেওয়ারী (হরিয়ানার গুরগাঁও জেলা) ও হান্‌সির গুরুত্বপূর্ণ জায়গীর দুইটি পুরস্কার দেন। যে অভিযানের ফলে মোঙ্গলরা ১২৪৬ খ্রীস্টাব্দে উচের অবরোধ তুলিয়া লইতে বাধ্য হয়, বলবন সেই অভিযানের সংগঠক ছিলেন। সম্ভবতঃ মাসুদের সিংহাসনচ্যুতি ও নির্বিবাদে মামুদের সিংহাসনারোহণের জন্য তিনিই ছিলেন বহুলাংশে দায়ী।

বলবন নিজেই কার্যতঃ সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসকের পদ অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার ভ্রাতা 'আমীর-ই-হাজিব' এবং তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা শের খাঁ লাহোর ও ভাতিন্দার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কন্যার সহিত সুলতানের বিবাহ হয়। তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ সকল গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করেন। ১২৪৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে সুলতানের প্রতিনিধির ('নায়েব-ই-মামলিকৎ') পদ গ্রহণ করেন। স্বভাবতঃই তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতায় অন্যান্য তুর্কী ওমরাহগণের মনে বিদ্বেষের উদ্রেক হয়। ১২৫৩ খ্রীস্টাব্দে ইমাদউদ্দীন রয়হান নামে একজন ধর্মান্তরিত হিন্দু রাজদরবার হইতে বলবনকে বিতাড়িত করার জন্য সুলতানকে প্ররোচিত করেন। বলবন বিনা প্রতিবাদে এই অপমান সহ্য করেন এবং বৎসরাধিক কাল রয়হান সুলতানের প্রধান পরামর্শদাতা রূপে দিল্লীতে শাসনকার্য চালান। কিন্তু রয়হানের ঔদ্ধত্যে তুর্কী আমীরগণ অসন্তুষ্ট হন। সুলতানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালালউদ্দীনের বিদ্রোহে সুলতান আতঙ্কিত হন। ইহাতে বলবনের পুনরায় ক্ষমতালাভের পথ প্রশস্ত হয় (১২৫৪ খ্রীস্টাব্দ)। রয়হানকে রাজধানী হইতে বদায়ুনে প্রেরণ করা হয়।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে প্রভুর কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করিয়া তোলাই হইল বলবনের প্রথম কর্তব্য। মোঙ্গলদের ক্রমাগত আক্রমণ চলিতেছিল, স্থানীয় রাজকর্মচারীরা

বিশ্বাসের অযোগ্য ছিল। তাই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মাস্‌দের রাজত্বের শেষদিকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের পুনঃস্থাপন দীর্ঘস্থায়ী হয়। সম্ভবতঃ মামুদের রাজত্বকালের শেষভাগ পর্যন্ত পাঞ্জাবের অধিকাংশ মোঙ্গলদের প্রভাবাধীন ছিল।

বলবনকে কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অবাধ্য শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় নাই। বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তা জালালউদ্দীন মাস্‌দ জানি দিল্লীর প্রতি আনুগত্য অস্বীকার না করিলেও 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মুঘিসউদ্দীন উজবাক অযোধ্যা অধিকার করিয়া রাজকীয় উপাধি গ্রহণ এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি কামরূপ আক্রমণ করিতে গিয়া ১২৫৭ খ্রীস্টাব্দে নিহত হন। সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যুর পরে বাংলায় দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ১২৫৯ খ্রীস্টাব্দে কারার শাসনকর্তা আরস্লান খাঁ লখ্‌নৌতি অধিকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী তাতার খাঁও স্বাধীন শাসক ছিলেন।

হিন্দু রাজদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের বারংবার চেষ্টা প্রতিরোধ করা ছিল বলবনের অন্যতম কঠিন কর্তব্য। ১২৪৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি কালঞ্জর অঞ্চলে এক হিন্দু নায়ককে দমন করেন। ১২৫১ খ্রীস্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু মালব ও মধ্য ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত করার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। রণথম্ভোরের বিরুদ্ধেও কয়েকবার অভিযান করা হইয়াছিল। মেওয়াটের (রাজস্থানের অন্তর্গত আলোয়ার) দুর্বৃত্ত উপজাতিদের দমন করা হয়। দোয়াবের বিদ্রোহী হিন্দুগণকেও বলবন দমন করিতে সমর্থ হন।

নাসিরউদ্দীনের রাজত্বকালের শেষ কয়েক বৎসর (১২৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে) সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না; কারণ এই কালের প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ মিনহাজউদ্দীনের 'তবকৎ-ই-নাসিরি'তে ইহার পরই অকস্মাৎ ছেদ পড়িয়াছে, আর বরনীর বৃত্তান্ত ('তারিখ-ই-ফিরুজশাহী') শুরু হইয়াছে বলবনের সিংহাসনে আরোহণের সময় হইতে। একটি প্রায় সমসাময়িক বিবরণ হইতে জানা যায় যে বলবন বিষপ্রয়োগে নাসিরউদ্দীনকে হত্যা করেন (১২৬৬-৬৭ খ্রীস্টাব্দ), এবং তিনি সুলতানের চার পুত্র এবং ইলতুৎমিসের অন্যান্য বংশধরগণকেও হত্যা করিয়া সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করেন।

গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)

বলবনের সিংহাসনারোহণকালে দেশের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বরনী লিখিয়াছেন, 'শাসকশক্তির প্রতি যে ভীতি সুশাসনের ভিত্তি এবং রাজ্যের শ্রী ও গৌরবের উৎস, তাহা জনসাধারণের মন হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, আর তাহারই অভাবে দেশ দুর্দশায় পতিত হইয়াছিল।' জনসাধারণের মনে শাসক শক্তির প্রতি ভীতি উদ্রেকের জন্য বলবন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

দীর্ঘকালের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফলে বলবন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তুর্কী ওমরাহদের ক্ষমতা খর্ব করাই রাজার প্রাথমিক কর্তব্য। ওমরাহদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চক্রান্তই ছিল কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার কারণ, এবং তাহার ফলেই ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পরে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল।

রাজশক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

বলবনের রাজত্বকালের ধারাবাহিক বিবরণ রচনা করা কঠিন, কারণ এই সময়ের প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ বরনীর 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী'-তে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা রক্ষায় একান্ত উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়।

ওমরাহদের শক্তিহরণ করার জন্য বলবন যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন সেগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: ১ সুলতানের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা; ২. 'চল্লিশ চক্রে'র দমন।

বলবন রাজদরবারে পারস্য দেশে প্রচলিত রীতি এবং মধ্য এশিয়ার সেলজুক ও খোয়ারিজম্ রাজ্যে প্রচলিত দরবারী আদব-কায়দা প্রবর্তন করিয়া রাজপদের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি পৌরাণিক তুর্কীবীর আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন।

রাজা যে কাহারও সমপর্যায়ভুক্ত নহেন, তাহা তিনি সুস্পষ্ট রূপে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'রাজার অতিমানবীয় সম্ভ্রম ও পদমর্যাদাই জনসাধারণের আনুগত্যকে সুনিশ্চিত করিতে পারে'। তিনি তাঁহার পুত্র বুঘরা খাঁকে বলেন, 'রাজার অন্তর ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিশেষ আধার, এবং এই বিষয়ে মনুষ্যজগতে তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই।' এই নীতি গুরুগম্ভীর ও কঠোর দরবারী আদবকায়দায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। 'তাঁহার দরবার ছিল এক গুরুগম্ভীর সভা, সেখানে হাস্যকৌতুক অজ্ঞাত ছিল, মদ্য ও দ্যুতক্রীড়া সেই স্থান হইতে...বিতাড়িত হইয়াছিল, অংশতঃ এই জন্য যে ইসলামের বিধিতে এই দুইটি অভ্যাস নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু প্রধান কারণ এই ছিল যে ইহাদের ফলে (দরবারের সদস্যদের মধ্যে) সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইত। তাঁহার দরবারে আচার-অনুষ্ঠানের বিন্দুমাত্র স্খলনও সহ্য করা হইত না'। স্বভাবতঃই তুর্কী ওমরাহগণ, বিশেষতঃ 'চল্লিশ চক্রে'র সদস্যগণ, রাজশক্তির বিচ্ছিন্নতা রক্ষার এই চেষ্টায় ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু নিষ্ঠার সহিত এই নববিধান পালন করিয়া বলবন একটি নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন।

শ চক্রে'র উচ্ছেদ

দরবারে পরোক্ষভাবে ওমরাহদের মর্যাদা খর্ব করিয়াই বলবন সন্তুষ্ট হইলেন তাঁহাদের দমন করিবার সুযোগ পাইলেই তিনি সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন তিনি পূর্বতন রাজবংশের প্রত্যেকটি সদস্য এবং বহু প্রধান প্রধান

তুর্কী ওমরাহকে, এমনকি নিজের আত্মীয়দেরও, নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা, ভাতিন্দা, ভাটনেয়ার, সামানা ও সুমানের ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা, শের খাঁ। তিনি বিনা পক্ষপাতে বিচার করিতেন; সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ওমরাহও তাঁহার নিকট কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব আশা করিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ, সন্দেহ হইতে পারে যে 'চল্লিশ চক্র' সম্বন্ধে তিনি অতি-মাত্রায় এবং অকারণে কঠোর ছিলেন। বদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক বক্‌বক্‌ নামে এক ক্ষমতাশালী ওমরাহের নির্দেশে তাঁহার একজন ভৃত্যকে প্রহার করিয়া হত্যা করা হয়। এই অপরাধে সুলতানের আদেশে বেত্রাঘাত করিয়া ঐ ওমরাহের প্রাণনাশ করা হয়। অযোধ্যার শাসনকর্তা হায়বৎ খাঁ মত্ত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন। বলবনের আদেশে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়া পরে মৃত ব্যক্তির বিধবার হস্তে সমর্পণ করা হয়। 'চল্লিশ চক্রে'র আর একজন সদস্য বিদ্রোহীদের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বলবন বহু সংবাদ-লেখক ('বারিদ') এবং গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাদের মাধ্যমে তিনি ওমরাহদের মতামত ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিতেন। কোন সংবাদ-লেখক বা গুপ্তচর কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইলে তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। যে সংবাদ-লেখক সুলতানকে মালিক বক্‌বকের অপরাধের কথা জানায় নাই, তাহাকে বদায়ুন শহরের প্রধান দ্বারে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। রাজশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করার একটি কার্যকরী অস্ত্র ছিল একটি সুসংগঠিত গুপ্তচর ব্যবস্থা।

বলবন যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহার ফলে 'চল্লিশ চক্রে'র ঐক্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং রাজশক্তির যে প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘ ছিল তাহার ধ্বংস সাধন সম্ভব হয়। সেই সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে তুর্কীরা দুর্বল হইয়া পড়িল, এবং, তাঁহার মৃত্যুর পর তুর্কী ভিন্ন অন্যজাতীয় মুসলমানদের পক্ষে ক্ষমতালাভ সম্ভব হইল।

সামরিক সংস্কার

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সৈন্যবাহিনীর দক্ষতাবৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই উদ্দেশ্যে বলবন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ইলতুৎমিস বহু সৈন্যকে সামরিক সেবার (military service) সর্তে জমি দান করিয়াছিলেন। ঐ সকল সৈন্যের বংশধরগণ তাহাদের সামরিক কর্তব্য পালনে অত্যন্ত অনিয়মিত হইলেও ঐ জমির অধিকার ভোগ করিতে থাকে। এমন কি, তাহারা দাবী করে যে ঐ সকল জমি তাহাদিগকে বিনা সর্তে এবং চিরকালের জন্য দেওয়া হইয়াছে। বলবন এই সকল সামরিক সেবার সর্তে প্রদত্ত জমি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের মালিকদের তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন: (১) সামরিক কার্যের অনুপযুক্ত বৃদ্ধগণ, (২) সামরিক কার্যের উপযুক্ত

যুবকগণ, এবং (৩) বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকা। বলবন আদেশ দিলেন যে সকল বৃদ্ধ, বিধবা ও অনাথগণের মালিকানাধীন জমি ফেরৎ লইয়া তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য মাসোহারা দেওয়া হইবে; যুবকবৃন্দকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর তালিকাভুক্ত করা হইবে, তবে তাহাদের অধিকারভুক্ত জমির খাজনা সরকারী কর্মচারীগণই সংগ্রহ করিবে। দিল্লীর বৃদ্ধ কোতোয়ালের অনুরোধে বলবন বৃদ্ধদের জমি ফেরৎ লওয়া সম্বন্ধে আদেশ প্রত্যাহার করেন। এই ব্যবস্থা তাঁহার নীতির সাফল্য ক্ষুণ্ণ করে এবং সামরিক দুর্বলতার উৎসে পরিণত হয়।

বলবন অন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ছিল সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি, নূতন সামরিক কর্মচারী নিয়োগ, সৈন্যদের বেতনবৃদ্ধি, ঘন ঘন সামরিক কুচকাওয়াজ প্রবর্তন, ইত্যাদি।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন

বলবন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সকল বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা কঠোর হস্তে দমন করেন। মেওয়াটের দুঃসাহসী দস্যুগণ রাজপথে পথিকদের সম্পত্তি লুট করিত, এমনকি দিল্লীর অভ্যন্তরেও তাহারা লুট করিত। বলবন দস্যুদলের উচ্ছেদ সাধন করেন, যে সকল বনজঙ্গলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত সেগুলি কাটাইয়া পরিষ্কার করেন, এবং দিল্লীর নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। দোয়াবের হিন্দুরাও কম উৎপাত করিত না। তাহারা দিল্লী হইতে বাংলায় যাইবার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। বলবন কঠোর সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের উৎপাত দমন করেন। শক্তিশালী ওমরাহ ও আফগান সৈন্যদের জমি দান করা হয়; নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার তাহাদের উপর থাকে। অতঃপর কাতেহর (রোহিলখণ্ড) অঞ্চলের হিন্দুদের নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেওয়া হইল; শিশু ব্যতীত সকল পুরুষকে হত্যা করা হয় এবং নারীগণকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। ১২৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দে বলবন লবণ পর্বত (Salt Range) অঞ্চলে অভিযান করিয়া বিরোধী হিন্দুদের শাস্তি দেন এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য বহু অশ্ব সংগ্রহ করেন। কিন্তু রাজস্থান ও বুন্দেলখণ্ডে হিন্দুদের বিরোধিতা সম্পূর্ণরূপে দমন করা যায় নাই।

বাংলায় বিদ্রোহ

বলবনের রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা গুরুতর আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা দেয় বাংলা দেশে। ১২২৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরবর্তী ষাট বৎসরে কমপক্ষে ১৫ জন শাসক বাংলা শাসন করেন। ইহা ছিল আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও ছলে বলে সিংহাসন অপহরণের যুগ। দিল্লী এই সকল অবৈধ কার্যকলাপের শাস্তি দিতে পারে নাই। বরনী বলেন, 'বহুকাল ধরিয়া এই দেশের

(বাংলার) লোকেরা বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় দিয়া আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষপরায়ণ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা সচরাচর শাসনকর্তাদের আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করিতে সক্ষম হইত।'

১২৬৮ খ্রীস্টাব্দে বলবন মুঘিসউদ্দীন তুঘ্রিল খাঁকে বাংলার সহকারী শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু তিনিই ছিলেন প্রকৃত শাসক; বাংলার নামেমাত্র শাসনকর্তা, আমিন খাঁ, ছিলেন অযোধ্যার শাসনকর্তা। সাহসী ও উচ্চাভিলাষী তুঘ্রিল 'তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতর উচ্চাভিলাষের ডিম ফুটিতে দিলেন।' কুমন্ত্রণাদাতাগণ তাঁহাকে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিল। সম্ভবতঃ বলবনের বার্ধক্য এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আতঙ্কের পুনরাবির্ভাবে তিনি উৎসাহ বোধ করিয়াছিলেন। তিনি 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন, তাঁহার নির্দেশে তাঁহার নামে 'খুৎবা' পাঠ করা হইতে লাগিল। তিনি মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া বহু অনুগামী সংগ্রহ করিলেন। তুঘ্রিল জনপ্রিয়, ধনী ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। অতএব বলবনকে কোন সাধারণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হয় নাই; তিনি 'একটি সমগ্র প্রদেশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন, একজন মাত্র বিদ্রোহীর সঙ্গে নহে।' বলবন এই বিদ্রোহে বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন, কারণ তুঘ্রিল প্রথমে তাঁহার ব্যক্তিগত ক্রীতদাস ছিলেন।

১২৭৮ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা আমিন খাঁর নেতৃত্বে তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান প্রেরণ করা হয়। তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ক্রুদ্ধ সুলতান পরাজিত সেনাপতিকে অযোধ্যা শহরের প্রধান দ্বারে ফাঁসি দেওয়ার আদেশ দেন। নূতন সেনাপতি কর্তৃক পরিচালিত অপর এক সৈন্যবাহিনীও ব্যর্থ হইল। অতঃপর বলবন স্বয়ং বাংলায় অভিযান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। প্রায় বৎসরাধিক কাল প্রস্তুতির পর তিনি বাংলায় দুই বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করেন। ১২৮২ খ্রীস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

বলবন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে সঙ্গে লইয়া প্রায় দুই লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সহ বাংলায় উপস্থিত হইলেন। 'তিনি যুদ্ধের জন্য যে আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে কেবলমাত্র সৈন্যের সংখ্যাধিক্যেই সমগ্র বাংলা প্রদেশকে পদদলিত করা সম্ভব ছিল।' তিনি দেখিলেন লখ্‌নৌতি প্রায় পরিত্যক্ত, কারণ তুঘ্রিল পূর্বেই সৈন্যবাহিনী ও অনুচরবর্গ সহ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বলবন আরও অগ্রসর হইয়া সোনারগাঁওয়ে (ঢাকার নিকটে) আসিয়া উপস্থিত হন এবং 'কিলা-ই-তুঘ্রিল' (তুঘ্রিলের কেল্লা বা দুর্গ) আক্রমণের আয়োজন করেন। কিন্তু তুঘ্রিল সৈন্যবাহিনী এবং ধনসম্পদ লইয়া জাজনগর (উড়িষ্যা) অভিমুখে পলায়ন করিলেন। পথে, সোনারগাঁওয়ের নিকটেই, তিনি ধৃত ও নিহত হন।

লখ্‌নৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলবন তুঘ্রিলের অনুচরদের উপর ভীষণ

প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। 'বড় বাজারের দুই ধারে, দুই মাইলের অধিক দীর্ঘ রাজপথে, সারি সারি শূল পোঁতা হইল এবং সেখানে তুঘ্রিলের পরিবারবগ ও অনুচরদের শূলে দেওয়া হইল। দর্শকদের মধ্যে কেহই আর কখনও এরূপ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নাই, অনেকেই আতঙ্কে ও বিতৃষ্ণায় মূর্ছিত হইয়া পড়িল।' বলবন পুত্র বুঘরা খাঁর হস্তে বাংলার শাসনভার অর্পণ করিয়া তাহাকে বাজারের সেই দৃশ্য স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন : 'আমার কথা অনুধাবন কর। ভুলিও না যে হিন্দ অথবা সিন্ধ, মালব অথবা গুজরাট, লখ্‌নৌতি অথবা সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তারা যদি তরবারি উন্মোচন করিয়া দিল্লীর সিংহাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়, তবে তুঘ্রিল ও তাহার অনুচরেরা যে শাস্তি পাইয়াছে তাহাদের, তাহাদের পত্নীদের, তাহাদের সন্তানসন্ততিদের, এবং তাহাদের যাবতীয় অনুচরদের প্রতিও ঠিক সেই শাস্তি বিধান করা হইবে।' দিল্লীতে ফিরিয়া সুলতান তাঁহার বাহিনী পরিত্যাগ করিয়া যাহারা তুঘ্রিলের দলে যোগ দিয়াছিল তাহাদের কঠোর শাস্তি দিলেন।

মোঙ্গলদের আক্রমণ

মোঙ্গল আক্রমণের স্থায়ী আতঙ্ক বলবনের নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার সভাসদগণ এক সময় তাহাকে মালব ও গুজরাট জয় করিতে বলিয়াছিলেন। সুলতান উত্তর দিলেন যে দিল্লীর অবস্থা বাগদাদের[১] অনুরূপ করিবার কোন ইচ্ছা তাঁহার নাই। বলবন দুর্বল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার জন্য সামরিক শক্তি সংঘবদ্ধ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সুতরাং সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি মনোযোগ দেন নাই। রাজ্যবিস্তার নহে, আভ্যন্তরীণ সংহতি রক্ষাই ছিল তাহার নীতির মূল লক্ষ্য।

গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত প্রদেশ মুলতান-দীপালপুর প্রথমে বলবনের জ্ঞাতিভ্রাতা শের খাঁর শাসনাধীন ছিল। তাহার সাহসিকতা মোঙ্গল এবং খোকর প্রভৃতি সীমান্তের দুর্ধর্ষ উপজাতিদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে একজন যোগ্য সীমান্তরক্ষকের তিরোধান হইল। বলবন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদকে মুলতান, সিন্ধু ও লাহোরের শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া শূন্য স্থান পূরণ করেন। মহম্মদ সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার বিদ্যানুরাগেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে আমীর খসরু ও আমীর হাসান, উভয়েরই সাহিত্যসাধনা শুরু হয়। পারস্যের বিখ্যাত কবি সাদীকে তিনি ভারতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু বার্ধক্যবশতঃ কবি আসিতে অস্বীকৃত হন। যুবরাজ প্রায় ত্রিশ হাজার শ্লোক যুক্ত ফার্সি কবিতার একটি পুস্তক সংকলন করেন। মহম্মদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুঘরা খাঁর উপর সীমান্তবর্তী জেলা সুনাম-সামানার

১ ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে মোঙ্গল নায়ক হুলাগু বাগদাদ অধিকার করিয়া খলিফা মুস্তাসিমকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। খলিফা-সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

শাসনভার দেওয়া হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে মোঙ্গলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সীমান্ত নিরাপদ হয়।

১২৭৯ খ্রীস্টাব্দের দিকে মোঙ্গলেরা উত্তর পাঞ্জাব ছত্রভঙ্গ করিয়া শতদ্রু নদী অতিক্রম করে। মুলতান হইতে মহম্মদের, সামানা হইতে বুঘরা খাঁর, এবং দিল্লী হইতে মালিক বেতকার্সের সৈন্যদল লইয়া গঠিত এক বিশাল বাহিনী আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে ভীষণভাবে পরাজিত করে। কিন্তু ১২৮৬ খ্রীস্টাব্দে, আমীর খসরুর বর্ণনা অনুযায়ী, 'অকস্মাৎ আকাশ হইতে বজ্রপাত হইল, পৃথিবীতে শেষ বিচারের দিন দেখা দিল।' তাইমুর খাঁর নেতৃত্বে একদল মোঙ্গল সৈন্য মুলতান আক্রমণ করিয়া এক খণ্ডযুদ্ধে মহম্মদের প্রাণনাশ করিল। বৃদ্ধ সুলতান যুবরাজকে অত্যধিক ভালবাসিতেন এবং তাহার উপরেই ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া সারাদিন রাজকার্য করিলেও তিনি রাত্রে পুত্রের জন্য নিদারুণ শোকে অশ্রুপাত করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষভাগেও তাহার রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত বিপাশা নদীর পরপারে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। বলবন লাহোর পুনরধিকার ও পুনর্নির্মাণ করেন।

বলবনের কৃতিত্ব

মহম্মদের মৃত্যুর পর বলবন বাংলা হইতে বুঘরা খাঁকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু বুঘরা খাঁ সুলতানের অনুমতি না লইয়াই বাংলায় ফিরিয়া আসেন। মৃত্যুশয্যায় বলবন মহম্মদের পুত্র খসরুকে উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (১২৮৭ খ্রীস্টাব্দ) তাহার 'বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ' তাঁহার শেষ ইচ্ছা রক্ষা করেন নাই। তাঁহারা বুঘরা খাঁর তরুণ পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

বলবন নিঃসন্দেহে একজন অত্যন্ত দক্ষ শাসক ছিলেন। প্রায় চার দশক কাল (১২৪৬-১২৮৭ খ্রীস্টাব্দ) তিনি উত্তর ভারতে বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন এবং শক্তিশালী মোঙ্গলদের আক্রমণ হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করিয়া তিনি নিজ দক্ষতার পরিচয় দেন। রাজ্যবিস্তারে বিরত থাকিয়া তিনি তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের সংহতিসাধনই ছিল তখন প্রয়োজন, এবং বলবন সুবিবেচনার সহিত এ বিষয়েই তাঁহার মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। তাহার নির্মমতা মধ্যে মধ্যে আমাদের বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে এক বিশ্বাসঘাতকতার যুগে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। শাসন-ব্যবস্থার কাঠামো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কোন নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তন না করিলেও, রাজশক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া এবং ওমরাহদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া তিনি ভারতের তুর্কী রাষ্ট্রকে এক নূতন

রূপ দিয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান সুন্নীর ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ তিনি নিয়মিতভাবে পালন করিতেন। মধ্য এশিয়া হইতে মোঙ্গলদের অত্যাচারে দেশত্যাগী অনেক শরণার্থী তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করেন। শিক্ষিত ও ধর্মপরায়ণ মুসলমানগণের সহিত বলবনের সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া তিনি আহার করিতেন এবং আইন ও ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেন।

কায়কোবাদ (১২৮৭-১২৯০)

কায়কোবাদ ১২৮৭ খ্রীস্টাব্দে বলবনের উত্তরাধিকারী রূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন। যে ভার বহনে তাঁহার দৃঢ়চেতা পিতামহের শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছিল তাহার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। বুঘরা খাঁ তাঁহার পুত্রের সিংহাসনে আরোহণে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু তিনি বাংলা দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নাসিরউদ্দীন মামুদ বুঘরা শাহ উপাধি ধারণ করিলেন। বাংলা দিল্লীর অধীনতা হইতে মুক্ত হইল। কায়কোবাদ আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকিতেন; তিনি নিজামউদ্দীন নামক একজন কর্মচারীর হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হন। তামার খাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল মোঙ্গল সৈন্যবাহিনী পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া প্রায় সামানা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মালিক মহম্মদ বক্‌বক্‌ লাহোরের নিকট মোঙ্গলদের পরাজিত করিয়া প্রায় এক সহস্র মোঙ্গলকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যান। ইহাদের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া অথবা হাতীর পায়ের তলায় পিষিয়া মারিয়া ফেলা হয়।

ইতিমধ্যে বুঘরা খাঁ সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্রের নির্বুদ্ধিতায় ক্রুদ্ধ হইয়া এক বিশাল বাহিনী সহ অযোধ্যা পর্যন্ত অগ্রসর হন (১২৮৮ খ্রীস্টাব্দ)। কায়কোবাদও সৈন্যদল সহ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পিতা ও পুত্রের সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে আপোষ হইল, বাংলার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইল।

অতঃপর কায়কোবাদ সহসা দিল্লীতে আপন কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইলেন। নিজামউদ্দীন সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করিতেছিলেন; তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হইল। জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজীকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা হইল। তাঁহার পদোন্নতিতে তুর্কী আমীরগণ অসন্তুষ্ট হন। তাঁহারা খলজী উপজাতির লোকেদের অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতেন। খলজীরা প্রকৃতপক্ষে তুর্কী হইলেও সাধারণতঃ তাহাদিগকে আফগান বলিয়া মনে করা হইত। তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া আফগানিস্থানের 'গরমশিরে' (উষ্ণ অঞ্চলে) বসবাস করিয়াছিল। ফলে তাহারা কিছু কিছু আফগান রীতিনীতি গ্রহণ করে।

অল্পকাল পরেই কায়কোবাদ পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তুর্কী ওমরাহ-গণ তাঁহার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তাঁহাকে শামসউদ্দীন

কায়য়ুমার্স নাম দেওয়া হইল। ওমরাহদের উদ্দেশ্য ছিল বলবনের বংশ এবং তুর্কীদের একাধিপত্য রক্ষা করা। কিন্তু জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী দিল্লী অধিকার করিয়া কায়কোবাদকে হত্যা করিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১২৯০ খ্রীস্টাব্দ)। এইরূপে তথাকথিত 'দাস' বংশের অবসান হইল এবং, বরনীর মতে, তুর্কীদের হাত হইতে সার্বভৌম ক্ষমতা চলিয়া গেল। একথা সত্য নহে, কারণ খলজীগণ প্রকৃতপক্ষে আফগান ছিলেন না, তাঁহারাও ছিলেন তুর্কী জাতীয়।

খলজী বংশের সিংহাসন লাভকে কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক 'খলজী বিপ্লব' (Khalji Revolution) নাম দিয়াছেন। কিন্তু রাজবংশ পরিবর্তনের ফলে সাম্রাজ্যের নীতিতে এবং শাসন-ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, তুর্কীদের আধিপত্যও বিলুপ্ত হয় নাই। তুঘলুক বংশীয় সুলতানেরাও তুর্কী ছিলেন।

২. খলজী বংশ

জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী (১২৯০-১২৯৬)

জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী প্রকাশ্য বলপ্রয়োগের দ্বারা সিংহাসন অধিকার করিলেও জনগণের বৈরভাব প্রশমিত করিতে পারেন নাই। শক্তিশালী তুর্কী ওমরাহগণ একজন খলজী বংশীয়ের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত ছিলেন না; তাঁহাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত আনুগত্য হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। কৈলুগড়ি প্রাসাদে তাঁহার অভিষেক হয়; ইহার কিছুকাল পরেও তিনি দিল্লীতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি কৈলুগড়িতে কায়কোবাদ কর্তৃক নির্মিত অসম্পূর্ণ প্রাসাদটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার সভাসদগণকে নূতন প্রাসাদের নিকট তাঁহাদের বাসভবন নির্মাণ করিতে বাধ্য করেন। এইরূপে দিল্লীর নিকটে এক নূতন শহর গড়িয়া উঠে।

জায়গীর ও সরকারী চাকুরির বণ্টনে সুলতান স্বভাবতঃই তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়া তুর্কী ওমরাহদের মনোরঞ্জনের চেষ্টাও করা হইল। বলবনের পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য মালিক ছজ্জু কারা-মানিকপুরের জায়গীর লাভ করেন। রাজধানীতে বাস করিলে তিনি গোলযোগ সৃষ্টি করিতে পারেন, এই ভয়ে তাঁহাকে এইরূপে দূরে অপসারিত করা হয়। ফকরউদ্দীন দীর্ঘকাল যাবৎ দিল্লীর কোতোয়াল ছিলেন; তাঁহাকে ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা হয়। সুলতানের নম্র স্বভাব এবং বলবনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার জন্য তাঁহার প্রতি যে বিরূপ মনোভাব ছিল তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়, এবং তিনি প্রবীণ ব্যক্তিদের আস্থা ও আনুগত্য লাভ করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বলবনের সিংহাসন-কক্ষের সম্মুখে অশ্রু বিসর্জন করিতেন তিনি

বলবনের পরিত্যক্ত বিশাল রাজ্য শাসনের যোগ্য কিনা সে বিষয়ে নবীনেরা সন্দেহ পোষণ করিত।

জালালউদ্দীনের দুর্বলতা ক্রমশঃ সকলের নিকট প্রকট হইয়া উঠে। তাঁহার রাজ্যলাভের দ্বিতীয় বৎসরে ছজ্জু কারা-মানিকপুরে রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা হাতেম খাঁর সাহায্য লাভে কৃতকার্য হন। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আরকালি খাঁ বদাযুনের নিকট বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন, কিন্তু বন্দীগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সুলতানের নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বন্দীদের মুক্ত করিয়া তাহাদের এক পানসভায় আপ্যায়িত করিলেন। বন্দী মালিক ছজ্জুকে সম্মানিত বন্দী রূপে মূলতানে পাঠানো হইল। সুলতানের অনুগত কর্মচারীগণ যখন দয়াধর্মের এইরূপ বিপজ্জনক ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন, তখন সুলতান বলিলেন যে মুসলমানের রক্তপাত করিয়া তিনি পরকাল বিপন্ন করিতে পারেন না। একবার লুণ্ঠন ও নরহত্যার অভিযোগে সহস্রাধিক 'ঠগ'কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের শাস্তি না দিয়া সুলতান তাহাদের বাংলায় প্রেরণ করেন ; সেখানে তাহাদের মুক্তি দেওয়া হয়। কেবলমাত্র একবার জালালউদ্দীন তাঁহার কোমলতা পরিহার করিয়াছিলেন। সিদি মৌলা নামে দিল্লীর একজন মুসলমান সাধুকে তাঁহার শিষ্যগণ খলিফার সিংহাসনে স্থাপন করার অভিপ্রায় পোষণ করিতেছে, এই অভিযোগে তাঁহাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া হত্যা করা হয়। এই দুর্ভাগ্যজনক হত্যাকাণ্ডের পর দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে জনসাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে সুলতানের উপর ঈশ্বরের কোপ দৃষ্টি পড়িয়াছে।

রণথম্ভোরের বিরুদ্ধে প্রেরিত এক অভিযানই (১২৯০ খ্রীস্টাব্দ) ছিল সুলতানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সামরিক প্রয়াস। রণথম্ভোর তখন হামীরের নেতৃত্বে অবশিষ্ট চৌহানশক্তির কেন্দ্র ছিল। কিন্তু এই প্রসিদ্ধ দুর্গটি অবরোধ না করিয়াই জালালউদ্দীন দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। তিনি অতঃপর এই বলিয়া বিক্ষুব্ধ সভাসদদের মুখ বন্ধ করেন যে পার্থিব সম্পদের লোভে তিনি একজনও সত্য ধর্মাশ্রয়ীর (অর্থাৎ মুসলমানের) জীবন বিপন্ন করিতে পারেন না।

মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে জালালউদ্দীন অধিকতর শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ১২৯২ খ্রীস্টাব্দে হুলাগুর এক পৌত্রের নেতৃত্বে এক বিশাল মোঙ্গল বাহিনী সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া সুনাম পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সুলতান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাহাদের পরাজিত করেন। চেঙ্গিজ খাঁর একজন বংশধর সহ কয়েকজন মোঙ্গল কর্মচারী এবং তাঁহাদের সৈন্যসামন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, এবং সুলতানের অধীনে কর্মে নিযুক্ত হইয়া দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহারা 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত হন।

আলাউদ্দীনের মালব ও দেবগিরি অভিযান

সিংহাসনে আরোহণের পর জালালউদ্দীন তাঁহার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলি গুরসাস্পকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। ইনি আলাউদ্দীন নামে অধিকতর পরিচিত। মালিক ছজ্জুর বিদ্রোহের পরে কারা-মানিকপুরের জায়গীর তাঁহাকে দেওয়া হয়। আলাউদ্দীন উচ্চাভিলাষী ছিলেন। মালিক ছজ্জুর অনুচরগণের প্ররোচনায়, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে সুলতানের কানে তাঁহার স্ত্রী ও শ্বশ্রূমাতার বিষ ঢালিবার চেষ্টায়, বিরক্ত হইয়া তিনি স্বাধীন ক্ষমতালাভের সংকল্প করিলেন। উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। তিনি মালবের পতনোন্মুখ পরমার রাজ্যের দিকে দৃষ্টি দিলেন। ১২৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি সুলতানের অনুমতি লইয়া মালব আক্রমণ করেন। ভিলসা লুণ্ঠন করিয়া তিনি প্রচুর ধনরত্ন লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। সুলতান পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ জায়গীরের উপর আবার অযোধ্যার শাসনভারও তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

ভিলসায় আলাউদ্দীন দেবগিরির যাদব রাজ্যের বিপুল সমৃদ্ধির কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি বিন্ধ্য পর্বত লঙ্ঘন করিয়া ঐ রাজ্য আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। ইতিপূর্বে কোন মুসলমান রাজা বা সেনাপতি এই দুঃসাধ্য কর্ম সাধন করেন নাই। মালব আক্রমণ করিয়া চান্দেরী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জয় করিতে চান, এই অজুহাতে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। সুলতানের সন্দেহ নিবারণের জন্য বহু সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তিনি ১২৯৫ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের পথে যাত্রা করিলেন।

যাদবরাজ রামচন্দ্র অতর্কিতে আক্রান্ত হইলেন; তাঁহার রাজধানীর সন্নিকটে মুসলমান বাহিনীর আগমন ছিল অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। ইলিচপুরে স্বল্পকাল বিশ্রাম লইয়া আলাউদ্দীন দেবগিরি হইতে ১২ মাইল দূরে লাসুরা নামক গিরিপথে উপস্থিত হইলেন। লাসুরার শাসনকর্তা তাঁহাকে বাধা দেন, কিন্তু প্রধানতঃ সৈন্যের সংখ্যাল্পতার জন্য তিনি পরাজিত হন। রামচন্দ্র দেবগিরির দুর্গে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহে অসমর্থ হন। আলাউদ্দীনের সহিত ৮,০০০ অশ্বারোহী ছিল; কিন্তু অবিলম্বে আরও বিপুলসংখ্যক সৈন্য তাঁহার সহিত যোগ দিতে আসিতেছে এইরূপ গুজব রটাইয়া তিনি তাঁহার শক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিলেন। হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল। আলাউদ্দীন নগর লুণ্ঠন করিয়া বহু অশ্ব ও হস্তী সংগ্রহ করিলেন। রামচন্দ্র সন্ধি করিলেন; বিজয়ী আক্রমণকারীকে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও রত্নাদি দেওয়া হইল।

রামচন্দ্রের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল এই যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংঘন আলাউদ্দীনের আক্রমণের সময় সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ লইয়া অন্যত্র গিয়াছিলেন। বিজয়ী আলাউদ্দীনের দেবগিরি ত্যাগের প্রাক্কালে সিংঘন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন

করিয়া তৎক্ষণাৎ আক্রমণকারীদের আক্রমণ করিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহাকে পরাজিত করিয়া পুনরায় দুর্গ অবরোধ করেন; রসদের অভাবে দুর্গরক্ষীগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। তখন আলাউদ্দীন ইলিচপুর প্রদেশ এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দাবী করিলেন। তাঁহার দাবী পূরণ করা হইল। 'লুণ্ঠিত ধনরত্নের পরিমাণ ছিল বিপুল, কিন্তু যে দুঃসাহসিক অভিযানের পুরস্কার স্বরূপ ইহা পাওয়া গিয়াছিল তাহার নজীর ইতিহাসে বিরল। আলাউদ্দীনের লক্ষ্য ছিল একটি শক্তিশালী রাজ্যের রাজধানী, তাঁহার ক্ষমতাকেন্দ্র হইতে উহা দুই মাসের পথ দূরে অবস্থিত ছিল; মধ্যে ছিল অজানা ভূখণ্ড, যাহার অধিবাসীদের পক্ষে তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করাই ছিল স্বাভাবিক।'

আলাউদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণ (১২৯৬)

ধনসম্পদ লইয়া আলাউদ্দীন পথিমধ্যে কোনরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন না হইয়াই কারায় ফিরিয়া আসিলেন। কারায় তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সুলতানের বিশ্বস্ত কর্মচারীরা সুলতানকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে আলাউদ্দীন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, তাঁহাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু সুলতান ঘোষণা করিলেন যে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিজ পুত্রের ন্যায় ভালবাসেন। আলাউদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উলুঘ খাঁ দিল্লীতে আলাউদ্দীনের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি মধুর বাক্যে সুলতানকে প্রীত করিয়া আলাউদ্দীনের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখায় তৎপর ছিলেন। উলুঘ খাঁ সুলতানকে বলিলেন যে আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য হইতে যে বিপুল সম্পদ আনিয়াছেন তাহা সুলতানকে দিবার জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি সুলতানকে তাঁহার বিজয়ী ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য কারায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। নিজ কর্মচারীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সুলতান কারায় গিয়া আলাউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর এক শোকাবহ ঘটনা ঘটিল; পূর্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী আলাউদ্দীনের ইঙ্গিতে দুই জন দুর্বৃত্ত সুলতানকে হত্যা করিল। তাঁহার মস্তক একটি বর্শাফলকে বিদ্ধ করিয়া আলাউদ্দীনের শাসনাধীন অঞ্চলে প্রদর্শন করা হইতে লাগিল। অতঃপর আলাউদ্দীন সুলতান রূপে ঘোষিত হইলেন। জালালউদ্দীনের পুত্র আরকালি খাঁকে পরাজিত করিয়া তিনি নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। যে সকল ওমরাহ অর্থলোভে আলাউদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইল, কারণ আলাউদ্দীনের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে যাহারা এক প্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের বিশ্বাস করা নিরাপদ নয়।

গুজরাট জয় (১২৯৯)

আলাউদ্দীন যখন দেখিলেন দিল্লীতে তাঁহার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন

তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর সুলতানী সাম্রাজ্যে কোন নূতন প্রদেশ সংযোজনার কোন যথার্থ প্রচেষ্টা হয় নাই। এজন্য বলবনের সাবধানী নীতি ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের অক্ষমতাই ছিল দায়ী। আলাউদ্দীন এই ঐতিহ্য ভঙ্গ করিলেন। দিল্লীর সৈন্যবাহিনী পুনরায় ঝঞ্ঝাবেগে দিগ্বিজয় ও লুণ্ঠন শুরু করিল।

আলাউদ্দীনের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হইল বাঘেলা (চৌলুক্য) বংশীয় কর্ণের শাসনাধীন সমৃদ্ধ গুজরাট রাজ্য। ১২৯৮ খ্রীস্টাব্দে উলুঘ খাঁ ও নসরৎ খাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যদলকে গুজরাটে প্রেরণ করিয়া রাজধানী অনহিলবাড়া অবরোধ ও অধিকার করা হইল। কন্যা দেবলা দেবীকে লইয়া কর্ণ বাগলানায় পলায়ন করিলেন। কর্ণের পত্নী কমলা দেবী আক্রমণকারীদের হস্তে বন্দিনী হইয়া শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দীনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর নসরৎ খাঁ সমৃদ্ধ ক্যাম্বে বন্দর লুণ্ঠন করিলেন। সেখানে তিনি কাফুর নামে এক ক্রীতদাসের সন্ধান পান। কাফুর পরে আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুজরাটে একজন মুসলমান শাসনকর্তা নিয়োগ করা হইল। বিজয়ী সৈন্যদল দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিল। কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির বণ্টনে বৈষম্য প্রদর্শনের ফলে 'নব মুসলমানগণ' পথিমধ্যেই বিদ্রোহ করে। অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত বিদ্রোহ দমন করা হয়; বিদ্রোহীদের অপরাধে তাহাদের নির্দোষ স্ত্রী-পুত্রকন্যাও শাস্তি পায়।

কতকগুলি অবাস্তব পরিকল্পনা

বারংবার সাফল্যের ফলে আলাউদ্দীন এতটা গর্বিত হইয়া উঠিলেন যে তিনি সাময়িকভাবে রাজনৈতিক বাস্তবতাবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি মনে করিলেন, তিনি আলেকজাণ্ডারের ন্যায় বিশ্ববিজয়, এমন কি মহম্মদের ন্যায় এক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম। তাঁহার মুদ্রায় এবং প্রার্থনাসভায় তিনি 'সিকন্দর সানি' (দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার) এই উপাধি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার দরবারে অন্ততঃ এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যাঁহার সত্য-ভাষণের সাহস ছিল। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্মচারী দিল্লীর কোতোয়াল আলা-উল-মুল্ক তাঁহাকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়; এবং ভারতের একটি বৃহদংশ যতদিন অবিজিত থাকিবে এবং রাজ্যে প্রতিনিয়ত মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিবে ততদিন বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন দেখা নির্বুদ্ধিতা। তিনি সুলতানকে মদ্যপান ও মৃগয়া পরিহার করিয়া রাজ-কার্যে অধিক সময় ব্যয় করিতে পরামর্শ দিলেন। আলাউদ্দীন কোতোয়ালের সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া মহম্মদ বা আলেকজাণ্ডারের অনুকরণ করার চেষ্টা পরিহার করিলেন।

রণথম্ভোর জয় (১২৯৯-১৩০১)

রণথম্ভোরের বিশাল দুর্গ এই সময় চৌহানবংশীয় রাজা হামীরের অধীনে ছিল। তিনি তৃতীয় পৃথীরাজের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। দুর্গের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বের জন্য উহা রাজপুতদের হস্তে ফেলিয়া রাখা দিল্লীর সুলতানদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। অধিকন্তু, হামীর কয়েকজন বিদ্রোহী 'নব মুসলমান'কে আশ্রয় দিয়া সুলতানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সুতরাং ১২৯৯ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দীন উলুঘ খাঁ ও নসরৎ খাঁকে রণথম্ভোর অধিকারের জন্য প্রেরণ করিলেন। রাজপুতরা নসরৎ খাঁকে বধ করে, উলুঘ খাঁ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। এই সংবাদ শুনিয়া আলাউদ্দীন স্বয়ং অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য দিল্লী হইতে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আকাৎ খাঁ তাঁহার জীবননাশের জন্য এক ব্যর্থ চেষ্টা করেন। আকাৎ খাঁ ধৃত ও নিহত হন। অতঃপর আলাউদ্দীন রণথম্ভোরে উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে উলুঘ খাঁ পুনরায় দুর্গটি অবরোধ করিয়াছিলেন। অবরোধ যখন চলিতেছে তখন আলাউদ্দীন সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার দুই ভাগিনেয়, আমীর ওমর ও মঙ্গু খাঁ, বদায়ুন ও অযোধ্যায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। সুলতানের কর্মচারীগণ বিদ্রোহ দমন করিয়া বিদ্রোহীগণকে রণথম্ভোরে প্রেরণ করিলেন; সেখানে তাঁহাদের অন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরে হাজি মৌলা নামক একজন বিক্ষুব্ধ কর্মচারীর নেতৃত্বে দিল্লীতে এক বিদ্রোহ শুরু হইল। এই সংবাদ শুনিয়াও বিচলিত না হইয়া আলাউদ্দীন দুর্গ অবরোধ অব্যাহত রাখিলেন। মালিক হামিদউদ্দীনকে বিদ্রোহ দমনের জন্য দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। তিনি হাজী মৌলাকে পরাজিত ও নিহত করেন। এক বৎসরব্যাপী অবরোধের পর হামীরের বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর সহায়তায় রণথম্ভোর অধিকৃত হয় (১৩০১ খ্রীস্টাব্দে)। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক পুরস্কারের পরিবর্তে ধূর্ত সুলতানের নিকট মৃত্যুদণ্ড লাভ করিলেন। যুদ্ধে হামীরের মৃত্যু হয়। উলুঘ খাঁর উপরে দুর্গের ভার দেওয়া হইল।

বিদ্রোহ নিবারণের ব্যবস্থা

অল্পকালের মধ্যে পরপর তিনটি বিদ্রোহের ফলে আলাউদ্দীন স্থির করিলেন যে ভবিষ্যতে এইরূপ গোলযোগ প্রতিরোধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে বিদ্রোহের চারটি প্রধান কারণ থাকে: (১) গুপ্তচর ব্যবস্থার যথোপযুক্ত প্রয়োগের অভাবে সুলতান সাম্রাজ্যের অবস্থা ও জনসাধারণের মনোভাব সম্বন্ধে সংবাদ পান না। (২) অত্যধিক মদ্যপানের ফলে লোকের বিচারশক্তি লুপ্ত হয় এবং রাজদ্রোহ প্রশ্রয় পায়। (৩) অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও ষড়যন্ত্রের সুযোগ সৃষ্ট হয়। (৪) জনসাধারণের

অবস্থা সচ্ছল থাকায় স্বপ্নবিলাসে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতে তাহদের সময়ের অভাব হয় না।

রণথম্ভোর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আলাউদ্দীন কয়েকটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ওমরাহ ও রাজকর্মচারীদের সঞ্চিত সম্পদের উপর প্রথমে আঘাত করা হইল। ধর্মস্থানগুলির যাবতীয় বৃত্তি রদ করা হইল, প্রায় সমস্ত নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করা হইল, এবং করসংগ্রহকারীদের যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। বরনী বলেন, 'দিল্লীতে মালিক, আমীর, রাজকর্মচারী, মুলতানী হিন্দু বণিক ও হিন্দু মহাজনদের গৃহ ব্যতীত অন্যত্র অতি সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ ই অবশিষ্ট রহিল।'

দ্বিতীয়তঃ, সংবাদ সংগ্রহের জন্য ব্যাপক আয়োজন করা হইল। গুপ্তচরগণ রাজকর্মচারী ও ওমরাহদের আচরণ ও আলাপ আলোচনার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত, এবং গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত সকল বিষয়ই স্থলতানের গোচরে আনিত। 'এইরূপ বিবরণ দানের ব্যবস্থা এতদূর ব্যাপক ছিল যে ওমরাহগণ প্রকাশ্য স্থানে মুখে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না, কিছু বলিবার প্রয়োজন হইলে আকার ইঙ্গিতে তাহা ব্যক্ত করিতেন।'

তৃতীয়তঃ, দিল্লীতে মদ্য বিক্রয় ও পান নিষিদ্ধ হইল। আলাউদ্দীন নিজেও মদ্যপান ত্যাগ করিলেন : 'মদ্যের ভাণ্ড ও পিপাগুলি প্রাসাদের মদ্যভাণ্ডার হইতে আনিয়া এমনই প্রভূত পরিমাণে বাহিরে ঢালিয়া ফেলা হয় যে তাহাতে স্থানটি বর্ষাকালের ন্যায় কর্দমাক্ত হইয়া যায়।' কিন্তু মদ্যপান এত প্রচলিত ছিল যে তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। কিছুদিন পর আলাউদ্দীন তাঁহার মূল আদেশ সংশোধন করিয়া ওমরাহগণকে নিজ গৃহে মদ্যপানের অনুমতি দেন, কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে মদ্য বিক্রয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে মদ্যপান পূর্ববৎ নিষিদ্ধ রহিল। 'আলাউদ্দীনের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক, নৈতিক নহে, এবং তাহা পূরণ করা সম্ভব হইয়াছিল।'

চতুর্থতঃ, স্থলতানের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন ওমরাহগণের পক্ষে তাঁহাদের গৃহে সামাজিক উৎসবের আয়োজন বা তাঁহাদের পরিবারবর্গের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হইল। এই অত্যাচারী ব্যবস্থা অমান্য করা যাইত না, কারণ স্থলতানের গুপ্তচরগণ সর্বত্র দৃষ্টি রাখিত।

রাজস্ব-ব্যবস্থা

ইলতুৎমিস ও গিয়াসউদ্দীন বলবন রাজস্ব-ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য বহু নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীর স্থলতানগণের মধ্যে আলাউদ্দীনই সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে এই সমস্যাটি সম্যকভাবে বিবেচনা করেন। তিনি তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দেশ জারি করেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মুসলমান

অভিজাতবর্গকে দুর্বল করিতে হইবে। হিন্দু ভূম্যধিকারীগণের সম্পদ ও প্রভাব হ্রাস করিতে হইবে। রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ইলতুৎমিস 'ইক্‌তা' (iqta) প্রথা প্রবর্তন করেন—কয়েকটি সর্তে জমি, অথবা জমি হইতে আয়, কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বৃহৎ 'ইক্‌তা'র অধিকারী ছিলেন। ছোট 'ইক্‌তা' অভিজাতদের, এমন কি সৈন্যদেরও, দেওয়া হইত। ইহারা প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলমান। এইভাবে ভূমি-রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হইতে রাষ্ট্র বঞ্চিত হইত। আলাদ্দীন 'কলমের এক আঁচড়ে' এই সকল জমির অধিকাংশকে 'খালিসা'য় (রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন জমিতে) পরিণত করিলেন। ইহাতে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠির শক্তিহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আয়বৃদ্ধি হইল।

ঐতিহাসিক বরনী আলাউদ্দীনের রাজস্ব-ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি দুই শ্রেণীর গ্রাম-প্রধানের উল্লেখ করিয়াছেন—'খুৎ' (khut) এবং 'মুকদ্দম' (Muqaddam)। গ্রাম-প্রধান অর্থে 'চৌধুরী' শব্দটিও ব্যবহৃত হইত। গ্রাম-প্রধানগণ উত্তরাধিকার সূত্রে নিযুক্ত হইত। তাহারা ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করিত এবং নিষ্কর ভূমি ও চারণভূমির অধিকার প্রভৃতি কয়েকটি সুবিধা পাইত। তাহাদের উপরে ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু নায়কগণ। বরনী ইহাদের 'রায়', 'রাণা' অথবা 'রাওয়াত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আলাউদ্দীন 'খুৎ' ও 'মুকদ্দম'গণকে আঘাত করিতে মনস্থ করিলেন, কারণ তাঁহার মতে তাহারা ছিল বিলাসপ্রিয়, তাহারা রাষ্ট্রের প্রাপ্য দিত না এবং সুলতানের কর্তৃত্ব অমান্য করিত। তিনি তিনটি পরিবর্তন করেন।

প্রথমতঃ রাষ্ট্রের প্রাপ্য ধার্য হইল উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ; অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে উহার কোন অংশ মকুব করা হইবে না। ইহাতে পূর্ববর্তী সুলতানগণের সময়ের তুলনায় রাজস্ব উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি পাইল। ইহার সহিত পশুচারণ কর ও গৃহকর (house tax) যুক্ত হওয়ায় কৃষকদের উপর বোঝা আরও ভারী হইল। নূতন ব্যবস্থায় 'খুৎ', 'মুকদ্দম', 'বালাহার' (সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর কৃষক) প্রভৃতি যাহারা জমি চাষ করিত তাহারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। দ্বিতীয়তঃ, রাজস্ব নির্ধারণে জমির মাপ এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ যাচাই করা হইত। ইহাতে কৃষকদের ক্ষতি হইলেও রাষ্ট্রের সুবিধা হইল। ভূমি পরিমাপে নিযুক্ত রাজস্ব দপ্তরের কর্মচারীগণ কৃষক ও চাষবাসের অবস্থার উপর নজর রাখিতে পারিত। তৃতীয়তঃ, 'খুৎ' ও 'মুকদ্দম'গণের সর্বপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা লোপ করা হইল, এবং তাহারা যে সকল জমি চাষ করিত তাহার জন্য নিয়মিত হারে (উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ) রাজস্ব আদায় করা হইতে লাগিল।

'খুৎ' ও 'মুকদ্দমগণ' আকস্মিকভাবে দারিদ্র্য ও সামাজিক অবনতির সম্মুখীন

হইল। বরনী বলেন, "তাহাদের বশ্যতা এরূপ চরমে উঠিল যে শহরের রাজস্ব দপ্তরের একজন 'চাপরাশী' (footman) কুড়ি জন 'খুৎ', 'মুকদ্দম' ও 'চৌধুরী'র গলদেশ একত্রে বন্ধন করিয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য তাহাদের পদাঘাত ও বেত্রাঘাত করিত। হিন্দুর পক্ষে মাথা তোলা অসম্ভব হইল। হিন্দুদের গৃহে স্বর্ণ, রৌপ্য, 'টঙ্কা', 'জিতল' (তাম্রমুদ্রা) অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যাদি অপ্রাপ্য হইল, এবং অর্থাভাবের দরুন 'খুৎ' ও 'মুকদ্দম'গণের পত্নীরা মুসলমানদের গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে লাগিল।'

বরনী বলেন, নূতন রাজস্ব-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল এই যে 'হিন্দুগণ পদদলিত হইবে, এবং অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ যে সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি, তাহা তাহাদের গৃহে থাকিবে না।' আলাউদ্দীনের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক, কিন্তু ধর্মীয় সমর্থন তাঁহার শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। সাম্রাজ্যে হিন্দুদের স্থান সম্পর্কে কাজী মুঘিসউদ্দীন তাঁহাকে এই অভিমত দিয়াছিলেন : 'তাহাদিগকে বলে খাজনাদার। রাজস্ব অধিকর্তা যখন তাহাদের নিকট রৌপ্য দাবি করিবেন, তখন তাহাদের উচিত বিনা প্রতিবাদে যৎপরোনাস্তি নম্রতা ও শ্রদ্ধার সহিত স্বর্ণ প্রদান করা। যদি রাজস্ব-আদায়কারীর এই ইচ্ছা হয় যে তিনি কোন হিন্দুর মুখে থুথু ফেলিবেন তবে বিনা দ্বিধায় তাহাকে মুখ ব্যাদান করিতে হইবে···আল্লাহ স্বয়ং তাহাদের সম্পূর্ণ অধঃ-পাতের আদেশ দিয়াছেন, কারণ তাহারাই পয়গম্বরের সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক শত্রু। পয়গম্বর বলিয়াছেন যে হয় তাহাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাহাদিগকে হত্যা করিতে অথবা দাসত্বে পরিণত করিতে হইবে, এবং তাহাদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে।' কাজী ভুল করিয়াছিলেন ; কোরাণে, অথবা পয়গম্বরের বাণীতে, হিন্দুদের কোন উল্লেখ নাই। তবে কাজী তৎকালীন উলেমাগণের সাধারণ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

'খুৎ' ও 'মুকদ্দম'গণের সুযোগ-সুবিধা লোপ পাওয়ায় তাহারা কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব-আদায়ের কর্তব্য হইতে অব্যাহতি পাইল। এই কার্যের জন্য সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হইল। তাহাদের মাধ্যমে কৃষকদের সহিত সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হইল। 'খুৎ' ও 'মুকদ্দম'দের অধীনে যে জমি ছিল তাহা প্রকৃতপক্ষে 'খালিসা'র অন্তর্ভুক্ত হইল। কিন্তু এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলেই চালু হইয়াছিল ; বাংলা, বিহার ও গুজরাট প্রভৃতি দূরবর্তী প্রদেশগুলি ইহার বাহিরে ছিল। আলাউদ্দীনের সহকারী উজিরের এক উক্তি বরনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সব প্রদেশগুলি 'একখানি গ্রামের ন্যায় একই রাজস্ব-ব্যবস্থার অধীন' হইল। এই কথা সত্য নহে।

কৃষকদের উপর আলাউদ্দীন গুরুতর বোঝা চাপাইয়াছিলেন। রাজস্ব আদায়-কারী দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের অত্যাচারের ফলে তাহাদের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সকল রাজকর্মচারী জনগণের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিল। বরনী বলেন

যে তাহাদের সহিত কেহই কন্যার বিবাহ দিতে চাহিত না। সমসাময়িক কবি আমীর খসরু কৃষকদের প্রকৃত অবস্থার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন : 'রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা দরিদ্র কৃষকদের অশ্রুপূর্ণ চক্ষু হইতে ক্ষরিত জমাট রক্তবিন্দু মাত্র।'

চিতোর জয় (১৩০৩)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মেবারের গুহিলোত রাজগণ এবং দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে বার বার সংঘর্ষ ঘটে, কিন্তু আলাউদ্দীনের পূর্ববর্তী কোন সুলতান প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি অধিকার করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। আলাউদ্দীন স্বয়ং মেবার আক্রমণ করিয়া চিতোর অবরোধ করেন, এবং ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে দুর্গটি অধিকার করেন। রাজপুত কাহিনীর বিখ্যাত লেখক টডের মতে, রাণা ভীমসিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করাই ছিল আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে রাণার নাম ছিল রতন সিংহ, এবং পাদ্মিনীর কাহিনী কাল্পনিক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, কেননা সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণাদি এ বিষয়ে নীরব। যাহা হউক, দিল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত একটি শক্তিশালী রাজ্য দখল করিবার স্বাভাবিক অভিপ্রায়েই হয়ত আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাও সম্ভব যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নববিজিত গুজরাট প্রদেশের সহিত যোগাযোগের পথের নিরাপত্তা বিধান। চিতোর আক্রমণকালে কবি আমীর খসরু আলাউদ্দীনের সঙ্গে ছিলেন, এবং তিনি এই যুদ্ধের এক মূল্যবান বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। রাজপুতগণ প্রাণপণে বাধা দিয়াও দুর্গ রক্ষা করিতে পারিল না। চিতোরের নাম রাখা হইল খিজিরাবাদ, এবং সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁকে ইহার শাসনভার দেওয়া হইল। কয়েক বৎসর পরে আলাউদ্দীন চিতোরের শাসনভার মালদেব নামক রাজপুত রাজার হস্তে অর্পণ করেন। মালদেবের হস্ত হইতে গুহিলোতবংশীয় রাণা হামীর পুনরায় চিতোর অধিকার করেন।

মালব জয় (১৩০৫)

রাজস্থানের দুইটি শক্তিশালী দুর্গ—রণথম্ভোর ও চিতোর—অধিকারের ফলে আলাউদ্দীনের দৃষ্টি পার্শ্ববর্তী মালব প্রদেশের দিকে আকৃষ্ট হয়। ১৩০৫ খ্রীস্টাব্দে আইন-উল-মুল্ক মুলতানীকে মালব জয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়। মহালকদেব নামে একজন হিন্দু রাজা তাঁহাকে বাধা দেন। প্রাচীন পরমারদের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা জানা যায় না। মুসলমানেরা বিজয়ী হয়, এবং মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ধার ও চন্দেরী অধিকৃত হয়। আইন-উল-মুল্ক মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

রাজস্থানে আধিপত্য বিস্তার

মালব জয় ও পরে দাক্ষিণাত্যে অভিযানের ফলে রাজস্থানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। রাজস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ইহার প্রধান কারণ। রাজস্থান মালবের সংলগ্ন এবং দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যে যাতায়াতের পথেই মালব অবস্থিত। তাই আলাউদ্দীনের পক্ষে রাজস্থানে আধিপত্য বিস্তারের প্রয়োজন ছিল।

১৩০৯ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দীন মারোয়াড়ের সুদৃঢ় সিওয়ানা দুর্গ অধিকার করেন। অতঃপর মারোয়াড়ে অবস্থিত ঝালোর দুর্গও অধিকৃত হইল। আলাউদ্দীনের উদ্দেশ্য ছিল প্রধান প্রধান দুর্গগুলি অধিকার করিয়া রাজস্থানে সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। টডের মতে, আলাউদ্দীনের সৈন্যদল বুন্দী, মাণ্ডোর ও টঙ্ক বিধ্বস্ত করে। কিন্তু রাজস্থানে দিল্লীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যথার্থ কোন চেষ্টা হয় নাই।

কাফুরের দাক্ষিণাত্যে প্রথম অভিযান (১৩০৭) : দেবগিরি

১৩০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর, নেপাল ও আসাম ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারতে আলাউদ্দীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতিপূর্বেই দাক্ষিণাত্যের সমৃদ্ধ শহর-গুলিতে সঞ্চিত ঐশ্বর্য তাঁহার কল্পনাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মালব জয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যের পথ খুলিয়া গেল, এবং প্রচুর কর দিতে সক্ষম ধনী হিন্দুরাজগণের উপর দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অভিযান প্রেরণ করা শুরু হইল।

রণথম্ভোরের পতনের অব্যবহিত পরেই উলুঘ খাঁ দাক্ষিণাত্যে অভিযানের জন্য কিছু আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু অভিযান শুরু করার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আলাউদ্দীন যখন মেবার অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তিনি তেলেঙ্গানা জয়ের উদ্দেশ্যে মালিক ছজ্জুর নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ছজ্জু বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্য দিয়া কাকতীয় রাজ্যের রাজধানী বরঙ্গলে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার সৈন্যদল পরাজিত হওয়ায় অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় (১৩০৩ খ্রীস্টাব্দ)।

১৩০৬-১৩০৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যে দুইটি অভিযানের পরিকল্পনা করেন। গুজরাটের ভূতপূর্ব রাজা কর্ণ বাগলানায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিতাড়িত করা, এবং দেবলা দেবীকে (যিনি ফার্সী গ্রন্থে 'দেওল রাণী' নামে উল্লিখিত) দিল্লীতে লইয়া আসার জন্য গুজরাটের শাসনকর্তা আলপ খাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কর্ণ পরাজিত হন এবং দিল্লীর সৈন্যদল তাঁহার অনুসরণ করে। তিনি দেবগিরির দিকে পলায়ন করেন এবং পরে বরঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেওল রাণীকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। সেখানে আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আমীর খসরু রচিত একটি কাব্যে দেওল রাণীর সৌন্দর্য ও খিজির খাঁর প্রতি

তাঁহার প্রেমের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার অপর পুত্র কুতবউদ্দীন মুবারক খিজির খাঁকে হত্যা করিয়া বলপূর্বক দেওল রাণীকে বিবাহ করেন। পরে কুতবউদ্দীন মুবারককে হত্যা করিয়া খসরু সিংহাসন অপহরণ করে এবং দেওল রাণীকে নিজ অন্তঃপুরে লইয়া যায়।

দ্বিতীয়—এবং বৃহত্তর—অভিযানের লক্ষ্য ছিল দেবগিরি। মালিক কাফুরকে সুলতান ইতিমধ্যে সকল রাজকর্মচারীর উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৩০৭ খ্রীস্টাব্দে সুলতান তাঁহাকে এক বিশাল সৈন্যদল সহ দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র পর পর তিন বৎসর দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করেন নাই; তাই তাঁহাকে বশীভূত করার নির্দেশ দিয়া মালিক কাফুরকে পাঠানো হয়। তিনি ইলিচপুরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন; মুসলমান রাজকর্মচারীদের উপর এই অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করা হয়। তিনি দেবগিরিতে উপস্থিত হইলে যাদবরাজ সবিনয়ে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। রামচন্দ্র দিল্লীতে যান এবং সুলতানকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'রায়-ই-রায়ান' (নায়কশ্রেষ্ঠ) উপাধি লাভ করেন। তাঁহাকে সামন্তরাজ রূপে সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করা হয়, এবং নাভাসরি জেলা তাঁহাকে ব্যক্তিগত জায়গীর রূপে দান করা হয়। তাঁহার এক কন্যার সহিত আলাউদ্দীনের বিবাহ হয়। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযানের সময় যাদব রাজ্যটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিকেন্দ্র রূপে ব্যবহৃত হয়।

দাক্ষিণাত্যে কাফুরের দ্বিতীয় অভিযান (১৩০৯-১৩১০): বরঙ্গল

যাদব রাজ্য ছিল দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে, পূর্বভাগে ছিল কাকতীয় রাজ্য। এই রাজ্যের রাজধানী বরঙ্গল একটি সুদৃঢ় প্রাচীর ও দুইটি গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কাকতীয়রাজ দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে মালিক ছজ্জুর অভিযান প্রতিহত করেন। কিন্তু মালিক কাফুরকে প্রতিহত করা তাঁহার পক্ষে কঠিনতর হইল। কাকতীয় রাজ্য অধিকার না করিয়া উহার ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের নির্দেশ সহ কাফুর ১৩০৯ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন।

তেলেঙ্গানার পথে কাফুর দেবগিরিতে বিশ্রাম করেন এবং রামচন্দ্রের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেন। যে দেশের মধ্য দিয়া তিনি অগ্রসর হইতে-ছিলেন তাহা বিধ্বস্ত করিতে করিতে কাফুর বরঙ্গলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপরুদ্রের ৯০০,০০০ তীরন্দাজ সেনা ও ২০,০০০ অশ্বারোহী ছিল বলিয়া শোনা যায়। তিনি তাঁহার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইলেন। দীর্ঘকাল অবরোধের পর দুর্গের বাহিরের রক্ষাবেষ্টনীর পতন হয় এবং ১৩১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন। অশ্ব, হস্তী ও মণিমুক্তা সহ প্রভূত উপঢৌকন দান করিয়া তিনি বার্ষিক করদানে সম্মত হন।

'সুদূর দক্ষিণে' কাফুরের অভিযান (১৩১০-১৩১১): হোয়সল ও পাণ্ড্য রাজ্য

দেবগিরি ও বরঙ্গল জয়ের ফলে আলাউদ্দীন প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হইলেন। ইহাতে তাঁহার মনে এক নূতন আস্থার উদ্রেক হইল; সমগ্র দক্ষিণ ভারত স্বীয় অধিকারে আনিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। ১৩১০ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় মালিক কাফুর ও খাজা হাজীকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ বিন্ধ্য পর্বতের পরপারে প্রেরণ করা হইল।

কাফুর পুনরায় দেবগিরির মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইলেন। বিশ্বস্ত যাদবরাজের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য লইয়া তিনি পরাক্রান্ত হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লালের রাজধানী দ্বারসমুদ্র অভিমুখে দ্রুত যাত্রা করিলেন। কর্নাটকের হাসান জেলায় হলেবিদে এখনও এই শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বর্তমান কালের সমগ্র কর্নাটক এবং অন্যান্য কয়েকটি জেলা লইয়া গঠিত এই রাজ্যটি কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দে রামচন্দ্র যেরূপ অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বীর বল্লালও সেইরূপ আক্রান্ত হইলেন। তিনি শান্তি প্রার্থনা করিয়া প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিলেন। ইহার মধ্যে একটি রত্ন ছিল, যাহাকে আমীর খসরু 'জগতে অতুলনীয়' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বীর বল্লাল দিল্লীর অধীন করদ রাজা হইলেন।

দ্বারসমুদ্র হইতে কাফুর 'সুদূর দক্ষিণে'র পাণ্ড্য রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই রাজ্য সমুদ্রতীরে কুইনল হইতে নেল্লোর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; মুসলমান লেখকগণ ইহাকে 'মাবার' বলিয়া অভিহিত করিতেন। কুলশেখরের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র সুন্দর পাণ্ড্য ও বীর পাণ্ড্যের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। হোয়সল ও পাণ্ড্যগণ কর্তৃক শাসিত অজ্ঞাত ও দুর্গম অঞ্চলের মধ্য দিয়া কাফুর কিরূপে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমীর খসরুর 'তারিখ'-ই-আলাই' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৩১১ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে পাণ্ড্য রাজ্যের অনেকগুলি ধনরত্নপূর্ণ মন্দির ধ্বংস করিয়া কাফুর মাদুরায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শহরটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। পাণ্ড্যরাজপুত্রদের পরাজিত বা বন্দী করিতে না পারিয়া তিনি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৩১১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি ৩১২ হস্তী, ২০,০০০ অশ্ব এবং ৫০০ মণ রত্ন লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা বলেন যে কাফুর রামেশ্বরে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। রাজনৈতিক দিক হইতে এই অভিযানের কোন ফল হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের অন্য হিন্দুরাজ্যগুলির ন্যায় পাণ্ড্য রাজ্যকে অধিকার বা বশীভূত করা সম্ভব হয় নাই।

দাক্ষিণাত্যে কাফুরের তৃতীয় অভিযান (১৩১৩): যাদব ও হোয়সল রাজ্য

১৩১১ খ্রীস্টাব্দে রামচন্দ্রের মৃত্যু হইলে সিংঘন সিংহাসন লাভ করেন। মুসলমানদের

অধীনে তিনি অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। কাফুর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি বার্ষিক কর প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেন। ১৩১৩ খ্রীস্টাব্দে কাফুর পুনরায় দেবগিরিতে উপস্থিত হইলেন। সিংঘন পরাজিত ও নিহত হইলেন; যাদব রাজ্য দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

অতঃপর পূর্ব দিকে কাকতীয় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কাফুর গুলবর্গা, রায়চুর ও মুদগল অধিকার করিলেন। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র ভূখণ্ড দিল্লীর অধিকারভুক্ত হইল। অতঃপর তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন, এবং হোয়সল রাজ্য পুনরায় বিধ্বস্ত করিয়া দাভোল ও চৌল নামক দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর অধিকার করেন। এইরূপে পাণ্ড্য রাজ্য ব্যতীত সমগ্র দক্ষিণ ভারত দিল্লীর পদানত হইল, এবং তুর্কী সাম্রাজ্য আয়তনে বৃহত্তম পরিণতি লাভ করিয়া ক্ষমতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করিল। ১৩১৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত কাফুর বরঙ্গল ও দ্বারসমুদ্র হইতে কর আদায় করিতে থাকেন। পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে প্রমাণিত হইল যে হিন্দু করদরাজগণের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারত শাসনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

মোঙ্গল আক্রমণ

আলাউদ্দীনকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বলবনের রাজত্বকালের ন্যায় এই যুগেও মোঙ্গলদের পরাক্রম আতঙ্কের বস্তু ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আলাউদ্দীন যে তাঁহার রাজ্যবিস্তারের নীতি পরিত্যাগ করেন নাই, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে বলবন অপেক্ষা তিনি অধিকতর কর্মক্ষম ও সাহসী শাসক ছিলেন। বলবনের রাজত্বকালে শের খাঁর ন্যায়, আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের প্রথম দিকে জাফর খাঁ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সুদক্ষ প্রহরী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাঁহার নাম দুর্ধর্ষ আক্রমণকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিত।

আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের প্রথম মোঙ্গল আক্রমণ (১২৯৭-৯৮ খ্রীস্টাব্দ) প্রতিহত করেন উলুঘ খাঁ। ১২৯৯ খ্রীস্টাব্দে কুতলুঘ খাজার নেতৃত্বে ২০০,০০০ মোঙ্গলের এক বাহিনী যমুনা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিয়া দিল্লীকে বিপন্ন করে। আলাউদ্দীনের পক্ষে ইহা ছিল এক অভূতপূর্ব সংকট, কারণ মোঙ্গলেরা এইবার কেবল লুণ্ঠন করিতে আসে নাই, তাহাদের লক্ষ্য ছিল রাজ্য অধিকার। তাহাদের প্রতিরোধ করিতে গিয়া জাফর খাঁ প্রাণ হারাইলেন। শেষ পর্যন্ত মোঙ্গলেরা পশ্চাদপসরণ করিল। স্পষ্টতঃই, চেঙ্গিজ খাঁ তাহাদের জন্য বীরত্বের যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহারা আর তাহার যোগ্য ছিল না।

আলাউদ্দীন যখন চিতোর অবরোধে ব্যস্ত ছিলেন (১৩০৩ খ্রীস্টাব্দ) তখন তর্গীর নেতৃত্বে এক বিশাল মোঙ্গল-বাহিনী ভারতে আসিয়া দিল্লীর নিকটে শিবির স্থাপন করে। তাহাদের আক্রমণ শুরু হওয়ার পূর্বেই আলাউদ্দীন দিল্লীতে

প্রত্যাবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন, তবে মোঙ্গলগণ উত্তর ভারতের জায়গীরদারগণকে সৈন্যসামন্ত লইয়া রাজধানীতে সুলতানের সহিত যোগদানে সাফল্যের সহিত বাধা দিয়াছিল। যথেষ্টসংখ্যক সৈন্যের অভাবে মোঙ্গলদের আক্রমণ করিতে না পারিয়া আলাউদ্দীন সিরি দুর্গে আশ্রয় লইলেন, এবং তাহাদের দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ লুণ্ঠন করিতে দিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ মোঙ্গলগণ অবরোধ তুলিয়া লইয়া পশ্চাদপসরণ করে; সম্ভবতঃ ইহার কারণ ছিল 'সুশৃঙ্খলভাবে অবরোধ চালাইয়া যাওয়ার ব্যাপারে তাহাদের অনভিজ্ঞতা'। তাহা ছাড়া, তাহারা মধ্য এশিয়া হইতে দীর্ঘকাল দূরে থাকিতে পারিত না।

এই বিপজ্জনক অভিজ্ঞতার ফলে আলাউদ্দীন পাঞ্জাব রক্ষার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হন। তিনি পুরাতন দুর্গের সংস্কার ও নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন এবং তথায় সৈন্য মোতায়েন করেন। সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, এবং সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়। গাজী মালিক (পরবর্তী কালে গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক নামে পরিচিত) কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত সীমান্ত রক্ষা করেন। তাঁহাকে পশ্চিম সীমান্তের রক্ষক নিযুক্ত করিয়া দীপালপুরের শাসনভার দেওয়া হয়।

১৩০৫ খ্রীস্টাব্দে আবার ভয়াবহ মোঙ্গল আক্রমণ হয়। চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর আলি বেগ এবং তার্তাগ ও তর্গী প্রভৃতি সেনাপতিদের নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চলগুলি বিধ্বস্ত করিতে করিতে আমরোহায় (উত্তর প্রদেশে) উপস্থিত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যকে পাঠানো হয়। আলি বেগ ও তার্তাগ সহ প্রায় ৮,০০০ মোঙ্গলকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাহাদের নির্দয়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়।

১৩০৬ খ্রীস্টাব্দে কাবাক, ইকবাল ও তাই বু নামক তিনজন নেতার অধীনে তিনটি মোঙ্গল সৈন্যদল সিন্ধু নদ অতিক্রম করে। 'তাহাদের সৈন্যগণ ছিল বালুকণার ন্যায় অগণ্য, এবং তাহারা তার্তাগ ও আলি বেগের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছিল।' সিন্ধুর কিয়দংশ, রাজস্থান এবং পাঞ্জাব লুণ্ঠিত হইল। কাবাক বন্দী হন; অপর দুই জন পলায়ন করেন। কাবাক ও অন্যান্য বন্দীগণকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলিয়া হত্যা অথবা শিরশ্ছেদ করা হয়। তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে দাস রূপে বিক্রয় করা হয়।

১৩০৭-১৩০৮ খ্রীস্টাব্দে ইকবালমন্দ নামে এক মোঙ্গল নায়ক সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন, কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের শেষ কয়েক বৎসরে মোঙ্গলগণ আর তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে সাহস করে নাই। মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে তাহারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

'নব মুসলমান'দের হত্যাকাণ্ড

আলাউদ্দীন ও তাঁহার সভাসদগণ 'নব মুসলমান'দিগকে (যে সব মোঙ্গল ইসলাম

ধর্ম গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করিতে থাকে তাহাদের) সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। তাহারা উচ্চ বেতনের চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত ছিল। তাহারাও বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের শেষদিকে (১৩১১ খ্রীস্টাব্দে) তাহারা সুলতানকে হত্যা করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করে। ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া যায়। দিল্লী ও অন্যান্য প্রদেশে যে সকল 'নব মুসলমান' বাস করিত তাহাদের সকলকে হত্যা করিবার জন্য আলাউদ্দীন নির্দেশ দেন। প্রায় ত্রিশ হাজার 'নব মুসলমান'কে হত্যা করা হয়।

অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ

১৩০৩ খ্রীস্টাব্দের মোঙ্গল আক্রমণের পর আলাউদ্দীন সীমান্ত ও রাজধানীর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী পোষণের প্রয়োজন অনুভব করেন। এই সৈন্যবাহিনী সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত হইবে এবং রাজকোষ হইতে নগদ বেতন পাইবে। কেবলমাত্র মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যই নহে, দক্ষিণ ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্যের সীমা প্রসারিত করা এবং বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যও একটি বিশাল স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। আলাউদ্দীন এই যুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং সামরিক প্রয়োজনে নানা সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁহার সৈন্যদলে ৪৭৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। সৈন্যদের বর্ণনা-মূলক তালিকা রাখা হইত, এবং জুয়াচুরি বন্ধ করার জন্য পরিদর্শনকালে তাহাদের অশ্বগুলিকে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা (branding system) প্রচলন করা হইয়াছিল।

এত বিশাল আয়তনের সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সামরিক ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন ছিল। সুলতান সৈন্যগণকে উচ্চ হারে বেতন দিতে পারিতেন না। তিনি প্রতি সৈন্যের বেতন ধার্য করেন ২৩৪ তঙ্কা। ইহার অধিক বেতন দিলে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দ্রব্যমূল্য হ্রাস না করিলে এই পরিমাণ অর্থে সৈন্যদের পক্ষে খরচ চালানো সম্ভব ছিল না। সৈন্যগণ যাহাতে তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে সেজন্য আলাউদ্দীন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং এইরূপে পরোক্ষভাবে সাধারণ জীবনযাত্রার ব্যয়ভার হ্রাস করেন।

সামরিক ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীন যে নির্দেশগুলি জারি করেন তাহাদের লক্ষ্য ছিল সম্ভবতঃ কেবল সৈন্যদের নহে, অন্য শ্রেণীর মানুষেরও উপকার করা। এই অনুমানের কারণ এই যে সৈন্যদের প্রয়োজন হয় না এমন কয়েকটি দ্রব্যেরও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাঁহার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের মধ্যে বিলি করার জন্য স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়া রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা। ভাল ফসল হইলে ব্যবসায়ীরা স্বল্পমূল্যে শস্য কিনিয়া

অধিক মূল্যে বিক্রয় করিত। ইহার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হইত তাহা সরবরাহ করিত হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ। বরনী বলেন যে 'মুসলমানদের গৃহ হইতে হিন্দুর গৃহে অর্থ চলিয়া যাইত।' কিন্তু অধিক মূল্যে জিনিস কিনিতে গিয়া হিন্দু জনসাধারণও ক্ষতিগ্রস্ত হইত, এবং তাহাদের অর্থও হিন্দু ব্যবসায়ীদের গৃহে চলিয়া যাইত।

সম্ভবতঃ উৎপাদন-খরচের (production cost) ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল। খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণই ছিল প্রধান ব্যবস্থা; ফলে স্বভাবতঃই অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যও প্রভাবিত হইত। গম, চাল, যব, ডাল ও ছোলা, চিনি, গুড়, তৈল, ঘি, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি অশ্ব ও গবাদি পশুর, এবং ক্রীতদাস ও পরিচারিকার মূল্যও এই সকল নিয়ম-কানুনের আওতায় আনা হয়। আইন ভঙ্গ করিলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক মূল্য চাহিলে দোকানীদের বেত্রাঘাত করা হইত। কেহ কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করিলে যে পরিমাণ দ্রব্য সে বেশী দামে বিক্রয় করিয়াছে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণের মাংস তাহার দেহ হইতে কাটিয়া লওয়া হইত। গুপ্তচরদের তৎপরতার ফলে আইনভঙ্গের সকল ঘটনাই সুলতানের কর্মচারীদের কানে যাইত।

দিল্লীতে 'শাহনা-ই-মণ্ডী' নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী শস্যের বাজার ('মণ্ডী') নিয়ন্ত্রণ করিতেন। দোয়াবের 'খালিসা' জমি হইতে নগদ টাকার পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের অংশ রাজস্ব হিসাবে সংগ্রহ করা হইত। এই উপায়ে সংগৃহীত শস্য খাদ্যাভাবের সময়ে সরবরাহ করার জন্য দিল্লীতে সরকারী শস্যাগারে মজুত রাখা হইত। শস্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত সকল ব্যবসায়ীকে সরকারী কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে আনা হইল। এতদিন পর্যন্ত খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে 'নায়ক'গণের এবং কাপড়ের ব্যবসায়ে মুলতানী ব্যবসায়ীদের প্রভুত্ব ছিল। আলাউদ্দীন তাহাদের উপরেও নিয়ন্ত্রণ চালু করিলেন।

দিল্লীতে চার শ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত বাজার ছিল: (১) একটি কেন্দ্রীয় শস্যের বাজার এবং শহরের নানা স্থানে উহার উপর নির্ভরশীল মুদীর দোকান; (২) বস্ত্র, চিনি, শুষ্ক ফল, মাখন, প্রদীপের তৈল ইত্যাদির জন্য একটি বাজার; (৩) অশ্ব, ক্রীতদাস ও গবাদি পশুর বাজার; (৪) অন্যান্য জিনিসের জন্য সাধারণ বাজার। বরনী বলেন যে দুর্ভিক্ষের সময়েও দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খাদ্যাভাব হইত না।

সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা দিল্লীতেই সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ সুলতানের সৈন্যবাহিনীর অবস্থান ছিল দিল্লীতে। দিল্লীর বাজারে যে সকল অঞ্চল হইতে দ্রব্য সরবরাহ করা হইত সেই সকল অঞ্চলেও এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ফিরিস্তা অবশ্য বলিয়াছেন যে আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলেই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

এই ব্যবস্থার ফলে সৈন্যগণ ও দিল্লীর অবস্থাপন্ন নাগরিকগণ উপকৃত হইয়াছিল, কারণ তাহারা নির্ধারিত মূল্যে দ্রব্য পাইত। দরিদ্র ব্যক্তিদের বিশেষ লাভ হয় নাই, কারণ তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল ; স্বল্পমূল্যে দ্রব্য কিনিবার মত অর্থও তাহাদের ছিল না। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; অনাবৃষ্টির জন্য উৎপাদন কম হইলেও শস্যের নির্ধারিত দাম বাড়ানো হইত না। উপরন্তু, নির্ধারিত মূল্যে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেও গ্রামাঞ্চলে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অতিরিক্ত মূল্যে কিনিতে হইত। সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার প্রসারে বিশেষ উৎসাহ রহিল না। গুপ্তচর দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ ও নিষ্ঠুর শাস্তির মাধ্যমে এই আইনগুলি কার্যকর করা হইত। কিন্তু কৃষিপণ্য উৎপাদনের উপর বৃষ্টিপাতের তারতম্যের প্রভাব এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির প্রভাব আলাউদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী কুতবউদ্দীন মুবারকের এই আইনগুলি চালু রাখিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা ছিল না। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য তিনি এই আইনগুলি বিলোপ করেন।

আলাউদ্দীনের শেষ জীবন

আলাউদ্দীন মালিক কাফুরকে 'মালিক নায়েব' (সুলতানের সহকারী বা রাজ-প্রতিনিধি) পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষ দিকে ভগ্নস্বাস্থ্য আলাউদ্দীন কাফুরের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। কাফুরের ষড়যন্ত্রের ফলে রাজদরবার ও অন্তঃপুরে এক ষড়যন্ত্র কলুষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী রাখা হয় ; তাঁহার মাতা পুরাতন দিল্লীতে বন্দিনী হইয়া থাকেন। খিজির খাঁর দলের সহিত যুক্ত ছিলেন, এই সন্দেহে গুজরাটের শাসনকর্তা আল্প্ খাঁকে হত্যা করা হয়। এই সকল অত্যাচারমূলক ব্যবস্থার পরিণাম হয় ভয়ানক। গুজরাটে আল্প্ খাঁর সৈন্যদল বিদ্রোহী হয়। দেবগিরিতে রামচন্দ্রের জামাতা হরপাল মুসলমানদের কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি অধিকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিদ্রোহীদের দমন করার কোন ব্যবস্থাই করা হইল না। ১৩১৬ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। অনেকের মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে কাফুর বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করিয়াছেন। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, 'ভাগ্য বরাবরের ন্যায় এইবারও নিজের চঞ্চলতা প্রমাণ করিল, এবং নিয়তি নিজ ছুরিকাঘাতে তাঁহাকে ধ্বংস করিল।'

আলাউদ্দীনের কৃতিত্ব

আলাউদ্দীন ছিলেন তৎকালীন যুগের শক্তিমান পুরুষের এক দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার

স্বভাব ছিল নির্মম, শত্রু-মিত্র কেহই তাঁহার দয়া প্রত্যাশা করিতে পারিত না। বরনী বলেন যে তিনি 'ফারাও অপেক্ষাও অধিক রক্তপাত ঘটাইয়াছিলেন।' (প্রাচীন মিশরের রাজগণকে 'ফারাও' বলা বলা হয়।) সেই বিশ্বাসঘাতকতা ও সংঘর্ষের যুগে নিষ্ঠুরতার কিছু প্রয়োজন অবশ্যই ছিল; কিন্তু আলাউদ্দীন সম্ভবতঃ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সাফল্যের মধ্যেই প্রতিক্রিয়ার বীজ নিহিত ছিল। রক্তপাত ও অস্ত্রপ্রয়োগের নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি সাম্রাজ্যের যে বিশাল সৌধটি নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা প্রায় তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই ধ্বসিয়া পড়ে, এবং তিনি অসহায়ভাবে 'সক্রোধে নিজের মাংস দংশন করিতে থাকেন।'

কিন্তু আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের তিনটি বৈশিষ্ট্য স্থায়ী গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। প্রথমতঃ, দিল্লীর মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতের বৃহত্তর অংশ লইয়া একটি সাম্রাজ্য গঠন করেন। বহু শতাব্দীর অনৈক্যের পর পুনরায় রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয় এবং বিন্ধ্য পর্বতের পরপারের ভারতবর্ষের সহিত উত্তরাঞ্চলের যোগসাধন হয়। দাক্ষিণাত্য তখনও ছিল সাম্রাজ্যের অনিচ্ছুক অংশীদার, কারণ স্থানীয় রাজবংশগুলির মূল ছিল দৃঢ় এবং মন্দির ধ্বংসের ফলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। তিনি বাহমনী রাজ্য স্থাপনের, এবং উহারই মাধ্যমে দাক্ষিণাত্যে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করিয়া যান। দ্বিতীয়তঃ, যে তুর্কী সাম্রাজ্য এতকাল ছিল কেবলমাত্র কতকগুলি 'সামরিক জায়গীরে'র সমবায়, আলাউদ্দীন তাহার শাসন-ব্যবস্থায় কিছু পরিমাণে সংহতি আনয়ন করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত সাম্রাজ্যস্রষ্টা, কারণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে তিনি কেবলমাত্র সামরিক শক্তির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নাই, যদিও স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টিও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। তৃতীয়তঃ, হিন্দুদের নির্মমভাবে দমন করিলেও তিনি রাষ্ট্রের সহিত 'শরিয়ত' বা ইসলামী আইনের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে নূতন এবং বলিষ্ঠ নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে রক্ষণশীল উলেমাদের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখেন, এবং সিদ্ধান্ত করেন যে ঐহিক ব্যাপারে ঐহিক বিবেচনাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। একজন উৎসাহী কাজীকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইহা আইনসম্মত অথবা বে-আইনী (অর্থাৎ ইহা ইসলামের বিধিসম্মত কিনা) তাহা আমি জানি না। আমি রাষ্ট্রের পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক, অথবা জরুরী অবস্থার পক্ষে উপযোগী, মনে করি সেইরূপ নির্দেশই দিয়া থাকি।' ইহা ছিল এক নূতন নীতি ঘোষণা; পরবর্তী কালে মহম্মদ বিন তুঘলুক যে নীতি অনুসরণ করিতেন, ইহা তাহারই পূর্বাভাস।

আলাউদ্দীন সম্ভবতঃ নিরক্ষর ছিলেন। বরনী বলেন, শিক্ষার সহিত তাঁহার 'কোন পরিচয় ঘটে নাই', কিন্তু ফিরিস্তা বলেন যে সিংহাসন লাভের পর তিনি ফার্সী পড়িতে শিখিয়াছিলেন। তবে সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল।

সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবি আমীর খসরু ও মীর হাসান দেহল্‌ভি উভয়েই তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। দুর্গ ও মসজিদ নির্মাণেও আলাউদ্দীনের বিশেষ উৎসাহ ছিল। পুরাতন দিল্লীর নিকটে তিনি সিরি নামে এক নূতন শহর নির্মাণ করেন। তাঁহার নির্মিত 'আলাই দরওয়াজা' 'প্রথম যুগের তুর্কী স্থাপত্যের সুন্দরতম ও নিখুঁত উদাহরণ।'

কুতবউদ্দীন মুবারক খলজী (১৩১৬-১৩২০)

মৃত্যুর পূর্বে আলাউদ্দীন খিজির খাঁকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজের নাবালক পুত্র শিহাবউদ্দীন ওমরকে উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করিয়া যান। মালিক কাফুরের প্রভাবেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নাবালক সুলতানকে সিংহাসনে বসাইয়া কাফুরই প্রকৃতপক্ষে শাসক হইয়া উঠিলেন। মৃত সুলতানের দেহরক্ষীগণ ('পাইক') তাঁহাকে হত্যা করে। অতঃপর মুবারক নামে আলাউদ্দীনের এক পুত্র শিহাবউদ্দীন ওমরের অভিভাবক হইলেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নাবালক সুলতানকে অন্ধ করিয়া তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে বসিলেন। তিনি 'খলিফতুল্লা' (ঈশ্বরের প্রতিনিধি) উপাধি গ্রহণ করেন।

মুবারকের রাজত্বের সূচনা হইয়াছিল শুভ। তিনি বহু বন্দীকে মুক্তি দেন, বাজেয়াপ্ত জমিজমা মালিকদের ফিরাইয়া দেন, এবং তাঁহার পিতার অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণাদেশগুলি রদ করেন। শাসন-ব্যবস্থার কঠোরতা হঠাৎ শিথিল হওয়ায় অরাজকতা প্রশ্রয় পায়। সুলতানের ব্যভিচারের ফলে অবস্থার আরও অবনতি হইল। তিনি খসরু নামে তাঁহার এক প্রিয়পাত্রের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হইলেন। খসরু পূর্বে 'বারাদু' নামক এক যুদ্ধজীবী জাতীয় হিন্দু ছিল। তাহাকে উজীরের পদে নিযুক্ত করা হইল।

আলাউদ্দীনের জীবনের শেষ দিকে গুজরাট ও দেবগিরিতে বিদ্রোহ হয়। কাফুর কর্তৃক আল্‌প্‌ খাঁর হত্যার প্রতিবাদে গুজরাটে সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমন করিয়া দিল্লীর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। দেবগিরিতে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন হরপাল নামে রামচন্দ্রের এক জামাতা। ১৩১৭ খ্রীস্টাব্দে মুবারক স্বয়ং বিদ্রোহ দমনের জন্য দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। সুলতান দেবগিরির নিকটে উপস্থিত হইলে হরপাল পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করা হইল।

কাকতীয়রাজ প্রতাপরুদ্র কয়েক বৎসর যাবৎ দিল্লীতে কর প্রেরণ করেন নাই। তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য দেবগিরি অভিযানের পর সুলতান খসরুকে প্রেরণ করিলেন। বরঙ্গল দ্বিতীয় বার অবরুদ্ধ হইল। হিন্দু রাজা পুনরায় আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি বার্ষিক কর দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বদরকোটের দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল সুলতানকে ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর খসরু 'মাবার'

আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হন। ১৩২০ খ্রীস্টাব্দে খসরুর অনুচর বারাদুগণ সুলতানকে হত্যা করিল।

অতঃপর খসরু সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার নাম হইল নাসিরউদ্দীন খসরু শাহ। খলজী বংশে আর কেহ জীবিত রহিল না। দেওল রাণীকে খসরুর অন্তঃপুরে লইয়া আসা হইল। বহু ওমরাহ ও পুরাতন রাজবংশের কর্মচারীর প্রাণ গেল। নূতন সুলতানের আত্মীয়স্বজন ও বারাদু অনুচরগণকে পুরস্কৃত করা হইল।

'প্রাসাদে বারাদুদের অভ্যুত্থানকে' বরনী হিন্দু প্রাধান্যের পুনঃস্থাপন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে; খসরু কয়েকজন মুসলমান ওমরাহকেও উচ্চপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কিন্তু মুসলমানেরা রাজশক্তির এই হস্তান্তর মানিয়া লইল না। দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিক মুসলমানগণ কর্তৃক বিশ্বাসঘাতক 'কাফের' বলিয়া অভিহিত খসরুর শাস্তি বিধানের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। বহু ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী ওমরাহ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন। দিল্লীর নিকটে তিনি খসরুকে পরাজিত করিলেন; এই ভাগ্যান্বেষীকে বন্দী করিয়া প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। সমবেত ওমরাহগণ বিজেতাকে সুলতান রূপে অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহার নাম হইল গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক শাহ। বরনী বলেন, 'ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হইল, এবং ইহাতে নবজীবনের সঞ্চার হইল। জন-সাধারণের মনে সন্তোষ এবং অন্তরে পরিতৃপ্তি দেখা দিল।'

৩. তুঘলুক বংশ

তুঘলুক বংশ

'তুঘলুক' একটি ব্যক্তিগত নাম; ইহা কোন উপজাতীয় বা পারিবারিক নাম নহে। কিন্তু এই রাজবংশ সচরাচর তুঘলুক বংশ নামেই পরিচিত।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক (১৩২০-১৩২৫)

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন ছিলেন সম্ভবতঃ তুর্কীদের করৌনা শাখার এক অখ্যাত বংশের সন্তান। ফিরিস্তা বলেন যে তাঁহার পিতা ছিলেন বলবনের একজন তুর্কী ক্রীতদাস এবং তাঁহার মাতা ছিলেন পাঞ্জাবের এক জাঠ নারী। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়া আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সময়ে তিনি পরিণতবয়স্ক এবং অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলেন। জমি ও চাকুরি বিতরণ করিয়া তিনি পুরাতন রাজকর্মচারীগণকে সন্তুষ্ট করেন। খসরু 'চিস্তি' সম্প্রদায়ভুক্ত বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়াকে যে প্রভূত পরিমাণ অর্থ দিয়াছিলেন, গিয়াসউদ্দীন তাহা উদ্ধার করিতে

চেষ্টা করেন ; কিন্তু নিজামউদ্দীন বলিলেন যে এই অর্থ সম্পূর্ণতঃই দান করা হইয়াছে। স্থলতান ও শেখের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হইয়া রহিল।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক সতর্ক শাসক ছিলেন। তিনি কৃষিকার্যে উৎসাহ দেন। সেচের জন্য অনেক খাল খনন করা হয়। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করা হইল। রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করা হইল। যে 'খূৎ', 'মুকাদ্দম' ও 'চৌধুরী'গণ আলাউদ্দীনের সময়ে অপসারিত হইয়াছিল তাহারা আবার রাজস্ব-আদায়ের ভার পাইল। কিন্তু তাহাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল, এবং এই নির্দেশ দেওয়া হইল : হিন্দুদের হাতে কেবল ততটুকুই রাখিতে দেওয়া উচিত যাহাতে তাহারা যেমন একদিকে ধনগর্বে উদ্ধত হইয়া উঠিতে না পারে, আবার অপর দিকে নৈরাশ্যবশতঃ জমিজমা ও কারবার ছাড়িয়া চলিয়া না যায়।' রাজস্ব আদায় ও হিসাব পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইল। বিচার-ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগেও সংস্কার করা হইল। ডাক আনা-নেওয়ার জন্য স্থন্দর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সৈন্য বিভাগে কঠোর শৃঙ্খলার প্রবর্তন এবং সামরিক কর্মচারী ও সৈন্যেরা যাহাতে সরকারকে প্রতারিত করিতে না পারে তাহার জন্যও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

কাকতীয় বংশের পতন

দাক্ষিণাত্যে বরঙ্গলের কাকতীয় রাজা প্রতাপরুদ্র নূতন রাজবংশের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই। স্থলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জৌনা খাঁ দুই বার বরঙ্গল আক্রমণ করিয়া প্রতাপরুদ্রকে তাঁহার পরিবার, পোষ্যবর্গ ও প্রধান প্রধান কর্মচারীগণের সহিত আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন (১৩২৩ খ্রীস্টাব্দ)। বরনী বলেন যে বরঙ্গলের নাম হইল স্থলতানপুর, এবং তেলেঙ্গানার শাসনভার মুসলমান রাজকর্মচারীদের উপর অর্পিত হইল। কিন্তু শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে প্রতাপরুদ্র ১৩২৬ খ্রীস্টাব্দেও রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

পাণ্ড্য রাজ্য ও জাজনগর

তেলেঙ্গানা অধিকারের পর জৌনা খাঁ মাদুরা জয় করেন এবং পাণ্ড্য রাজ্যটি সম্ভবতঃ স্থলতানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। জৌনা খাঁ অতঃপর জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করিয়া কয়েকটি হস্তী সংগ্রহ করেন (১৩২৪ খ্রীস্টাব্দ)।

বাংলায় বিদ্রোহ

গিয়াসউদ্দীনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং গুজরাটে বিদ্রোহ হয়। কিন্তু বাংলার বিদ্রোহ তদপেক্ষা অধিক গুরুতর ছিল।

বুঘরা খাঁ ও তাঁহার পুত্র রুকনউদ্দীন কায়কাউস ১৩০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন

ভাবে বাংলা শাসন করেন। অতঃপর শামসউদ্দীন ফিরোজ শাহ বাংলার শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়া ১৩২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার তিনপুত্র শিহাবউদ্দীন, নাসিরউদ্দীন ও গিয়াসউদ্দীনের মধ্যে কলহ শুরু হইল। গিয়াসউদ্দীন কয়েক বৎসর যাবৎ কার্যতঃ স্বাধীনভাবে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন; তিনি শিহাবউদ্দীনের নিকট হইতে লখ্নৌতি অধিকার করিলেন। এই সকল গোলযোগের প্রতি সুলতান গিয়াসউদ্দীনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৩২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বয়ং বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন। নাসির-উদ্দীন সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে লখ্নৌতি অধিকার করিয়াছিলেন; তিরহুতে (উত্তর বিহার) তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি দিল্লীর সুলতান কর্তৃক বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন; লখ্নৌতি তাঁহার রাজধানী হইল। গিয়াসউদ্দীনকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। পূর্ব বঙ্গ রাজধানী সোনারগাঁও এবং দক্ষিণ বঙ্গ রাজধানী সাতগাঁও দিল্লীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হইল। প্রভূত লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া সুলতান দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন; পথিমধ্যে তিনি তিরহুতের হিন্দু রাজাকে পরাজিত করেন।

গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যু (১৩২৫)

বাংলা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর গিয়াসউদ্দীন তুঘলুককে তাঁহার পুত্র জৌনা খাঁ দিল্লীর নিকটস্থ আফগানপুরে অভ্যর্থনা করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি শিবির নির্মিত হইয়াছিল। 'এমনভাবে উহার পরিকল্পনা করা হয় যেন বিশেষ একটি অংশে হস্তী-গাত্রের স্পর্শ লাগিলেই উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে।' পুত্রের অনুরোধে সুলতান বাংলা হইতে আনীত হস্তীগুলিকে শিবির প্রদক্ষিণ করাইবার অনুমতি দেন। শিবিরের দুর্বল অংশে হাতীর গায়ের ধাক্কা লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিবির ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং বৃদ্ধ সুলতান চাপা পড়িয়া নিহত হন। পর্যটক ইবন বতুতার মতে, আপাতদৃষ্টিতে দুর্ঘটনা মনে হইলেও ইহা ছিল জৌনা খাঁর সতর্ক পরিকল্পনার পরিণতি। জৌনা খাঁ পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

সুলতানের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার বিরোধী সূফী সন্ত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার, এবং তাঁহার অনুগৃহীত কবি আমীর খসরুর মৃত্যু ঘটে।

শাহ জাহান নির্মিত দিল্লী শহরের কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়াসউদ্দীন নির্মিত দুর্গ-রাজধানী তুঘলুকাবাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ইবন বতুতা বলেন, 'এই-খানেই ছিল তুঘলুকের ধনসম্পদ ও প্রাসাদগুলি, এবং স্বর্ণমণ্ডিত ইষ্টকে নির্মিত সেই বিশাল প্রাসাদ, যাহা সূর্যোদয়ে এমনই দীপ্তিমান হইয়া উঠিত যে কেহই সেদিকে চাহিতে পারিত না। সেখানে তিনি বিপুল সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। লোকে বলিত যে সেখানে তিনি এক চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে গলিত স্বর্ণ দ্বারা পূর্ণ করেন এবং তাহা এক বিশাল স্বর্ণস্তূপে পরিণত হয়।'

মহম্মদ বিন তুঘলুকের চরিত্র

গিয়াসউদ্দীন তুঘলুকের মৃত্যুর পর জৌনা খাঁ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে মহম্মদ বিন তুঘলুক নামে ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রচুর উপহার বিতরণ এবং সরকারী চাকুরি বণ্টন করিয়া তিনি জনগণ ও ওমরাহদের সন্তুষ্ট করিলেন।

নূতন সুলতান ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্রের ব্যক্তি। বরনী তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। তিনি বলেন, 'আমাকে বলিতেই হইবে যে সুলতান মহম্মদ ছিলেন সৃষ্টির অন্যতম আশ্চর্য। তাঁহার পরস্পরবিরোধী গুণাবলী সাধারণ জ্ঞান ও সহজ বুদ্ধির অগোচর ছিল।' বরনী কর্তৃক মহম্মদ বিন তুঘলুকের চরিত্র চিত্রণকে কেহ কেহ একপ্রকারের প্রহসন, অদ্ভুতরসাশ্রিত ব্যজস্তুতি মনে করেন। মহম্মদের সমসাময়িক হইলেও এই বিবরণী ঐতিহাসিকের ধর্মীয় গোঁড়ামি হইতে মুক্ত নহে।

সুলতান নিঃসন্দেহে প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন নিপুণ ক্রীড়াবিদ এবং সুদক্ষ যোদ্ধা। তিনি নিজেকে প্রায় সর্বক্ষণ সামরিক কাজকর্মে নিযুক্ত রাখিতেন। কিন্তু রাজনীতি ও যুদ্ধের নিষ্ঠুরতায় নিমগ্ন থাকিলেও তাঁহার অন্তরে কোমল অনুভূতি এবং সংস্কৃতির জন্য আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তাঁহার বদান্যতা কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছিল। বরনী বলেন যে হাতিমের ন্যায় দান-বীরেরা এক বৎসরে যাহা দান করিতেন তাহা ছিল তাঁহার এককালীন দান মাত্র। সেই মদ্যপান ও ব্যভিচারের যুগে তিনি এই সকল দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। রক্ষণশীল মুসলমান ধর্মশাস্ত্রবিদগণের রাজনৈতিক প্রভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনি বৈষয়িক ব্যাপার বৈষয়িক দৃষ্টিতে বিচার করিতেন এবং 'শরিয়ত' বা ইসলামের বিধানকে জাগতিক বিষয়ের পরিচালনা হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান সুন্নী, তবে তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা আওরঙ্গজেবের ন্যায় কঠোর ছিল না। তিনি সংস্কৃতিবান ও বিদ্বান ছিলেন; তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ, দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ ছিল। প্রাচীন পারসিক সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ফার্সী ভাষায় তিনি সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল। তিনি চমৎকার বক্তৃতা করিতে পারিতেন।

তাঁহার এই সকল আশ্চর্য গুণের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক পিতৃহত্যার অভিযোগ এবং যে নির্মম নৃশংসতা তাঁহার রাজত্বকালের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন। তাঁহার চরিত্রগত এই স্ববিরোধে বিমূঢ় হইয়া ইংরাজ ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কিছু পরিমাণে উন্মত্ততা রোগগ্রস্ত ছিলেন কি না। তাঁহার কোন কোন দুঃসাহসিক সামরিক কার্য এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে উন্মাদের কীর্তি

বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই অভিমত গ্রহণযোগ্য কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ একথা বলাই যুক্তিযুক্ত যে তাঁহার ভুলের কারণ ছিল তাঁহার উগ্র স্বভাব, বিরুদ্ধ মতামত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব। তাঁহার চরিত্রে সতর্কতার অভাব ছিল; তিনি পরিণাম বিচার না করিয়াই কাজ করিতেন। বিজ্ঞ ও স্থিরমস্তিষ্ক রাজনীতিবিদের যাহা প্রধান গুণ সেই বাস্তববুদ্ধি তাঁহার কম ছিল। এই জন্যই তিনি বিশাল ও গোলযোগপূর্ণ সাম্রাজ্যের ভার বহনে ব্যর্থ হন। তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তাঁহাকে আংশিকভাবে দায়ী করা হইয়াছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে তাঁহার দীর্ঘ শাসনের পরিণতি হইয়াছিল বিপর্যয়কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে রাজনৈতিক অধঃপতনের এমন অনেক গভীর কারণ ছিল যাহার উপর ব্যক্তিবিশেষের কোন হাত ছিল না।

দক্ষিণ ভারতে রাজ্য বিস্তার

সেই যুগে বিদ্রোহ যে কোন রাজার রাজত্বকালেরই সাধারণ ঘটনা ছিল। মহম্মদের রাজত্বকালেও বহু বার বিদ্রোহ হয়। প্রথম বিদ্রোহ করেন তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা বহাউদ্দীন গুর্শাস্প (১৩২৬-২৭ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি দাক্ষিণাত্যে গুলবর্গার নিকটে সবগরের জায়গীরদার ছিলেন। সুলতান স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে জীবন্ত অবস্থায় তাঁহার গাত্রত্বক মোচন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। তিনি বন্দী হইবার পূর্বে দুই জন প্রতিবেশী হিন্দু রাজা—কাম্পিলির রাজা ও হোয়সালরাজ তৃতীয় বল্লাল—তাঁহাকে কিছু সাহায্য দিয়াছিলেন। কাম্পিলি এক সময়ে দেবগিরির যাদব রাজ্যের অধীন সামন্ত রাজ্য ছিল। তাঁহাদের নির্বুদ্ধিতার শাস্তি পাইতে হইল। কাম্পিলি সুলতানী সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হইল। তৃতীয় বল্লাল সম্ভবতঃ বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজ পৈতৃক রাজ্যের একাংশ শাসন করার অনুমতি পাইলেন। সিংহগড়ের নিকটে কোণ্ডনা দুর্গের অধিপতি বিদ্রোহ করিয়াছিলেন; দুর্গটি অধিকার করা হইল।

তুঘলুকগণ দাক্ষিণাত্যে হিন্দু অধিকার উচ্ছেদ করার নীতি গ্রহণ করেন। মাদুরা ও বরঙ্গল ইতিপূর্বেই অধিকৃত হইয়াছিল; এখন কাম্পিলি ও হোয়সল রাজ্যের অধিকাংশই অধিকৃত হইল। মহম্মদ যুবরাজ থাকার সময় এবং সুলতান হইবার পরে এই বিজয় গৌরব অর্জন করেন। ইহার ফলে সুলতানী সাম্রাজ্যের সামরিক গৌরব সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু এই গৌরব স্থায়ী হয় নাই। মাদুরা অঞ্চলে ('মাবারে') একটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইল। দাক্ষিণাত্যে দিল্লীর অধীন ভূখণ্ডের অধিকাংশ বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত হইল।

দোয়াবে রাজস্বের হার বৃদ্ধি (১৩২৬-২৭)

বরনী বলেন যে দোয়াবে রাজস্বের পরিমাণ 'দশ এবং বিশ গুণ বৃদ্ধি পায়'। ইহার ফলাফল বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন: 'সুলতানের এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গিয়া তাঁহার কারকুনগণ এরূপ কর ধার্য করিল যে রায়তদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। এত কঠোরভাবে কর দাবি করা হইত যে রায়তগণ হৃতবল ও দরিদ্র হইয়া সর্বনাশের সম্মুখীন হইল। যাহাদের অবস্থা সচ্ছল এবং বিষয় সম্পত্তি ছিল তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জমিজমা নষ্ট হইয়া গেল, কৃষিকার্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইল। দূরদূরান্তরের রায়তরা, দোয়াবের অধিবাসীদের দুর্ভাগ্যের কথা অবগত হইয়া, তাহাদের নিকট হইতেও অনুরূপ কর দাবি করা হইবে এই ভয়ে বশ্যতা ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। কৃষিকার্যের অবনতি, প্রজাদের দুর্দশা, ও দূরবর্তী প্রদেশগুলি হইতে শস্যের আমদানি হ্রাসের ফলে দিল্লী ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং দোয়াবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।...এই সময় হইতেই মহম্মদের সাম্রাজ্যের গৌরব অস্তমিত হইতে থাকে।' এই বর্ণনা হয়ত অতিরঞ্জিত, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে দোয়াবের অধিবাসীদের উপর এমনই উৎপীড়ন হইতে থাকে যে নৈরাশ্যের বশবর্তী হইয়া তাহারা বিদ্রোহী হয়। বরনী বলেন যে সুলতান বন্য পশুর ন্যায় বিদ্রোহীদের শিকার করিয়াছিলেন। কৃষকদের বশীভূত রাখার জন্য সুলতান যে নির্দয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা হয়ত তাহার এক অতিরঞ্জিত বর্ণনা। কৃষকদের ঋণ দিয়া এবং সেচের জন্য কূপ খনন করিয়া তাহাদের দুর্দশা হ্রাসের জন্য সুলতান কিছু চেষ্টা করেন। তিনি রাজস্ব-ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন করেন নাই। কৃষির প্রসারের জন্য তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি ব্যর্থ হয়।

রাজধানী পরিবর্তন (১৩২৬-২৭)

মহম্মদের বহুনিন্দিত রাজনৈতিক পরীক্ষাগুলির মধ্যে দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর ছিল অন্যতম। দেবগিরির নূতন নাম হইল দৌলতাবাদ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তখন মোঙ্গলদের অধিকারে ছিল। সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে নিরাপদ দূরত্বে রাজধানী স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আলাউদ্দীন খলজীর সময়ে মোঙ্গলেরা দিল্লীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, দেবগিরি হইতে দক্ষিণ ভারতের নববিজিত হিন্দু রাজ্যগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজসাধ্য ছিল। নূতন রাজধানীর ভৌগোলিক গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া বরনী বলেন: 'এই স্থানটি সাম্রাজ্যের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল; এখান হইতে দিল্লী. গুজরাট, লখ্‌নৌতি, সাতগাঁও, সোনারগাঁও, তেলাঙ্গ, মাবার, দোরসমুদ্র ও কাম্পিলির দূরত্ব ছিল প্রায় সমান।' ইবন বতুতা অবশ্য বলেন যে দিল্লীর নাগরিকেরা সুলতানকে গালি দিয়া বেনামী চিঠি পাঠাইত বলিয়া তিনি তাহাদের উপর রুষ্ট

হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজধানী স্থানান্তরের ন্যায় গুরুতর সিদ্ধান্ত এইরূপ সামান্য কারণে গৃহীত হইয়াছিল, এইরূপ কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

সুলতান যখন রাজধানী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন দিল্লীর অধিবাসীগণকে—পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু, সকলকেই—তাহাদের সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া দৌলতাবাদে যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। এইরূপে স্থানত্যাগে বাধ্য হইয়া লোকজনকে স্বভাবতঃই যে সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহা যাত্রীদের সুবিধার্থ সুলতান যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা কিছু পরিমাণে লাঘব হইয়াছিল। দিল্লী-দৌলতাবাদের পথে বহু অস্থায়ী কুটীর নির্মিত হয়; সেই সকল কুটীর হইতে যাত্রিগণকে বিনামূল্যে খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হইত। ছায়ার জন্য পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। ইবন বতুতা বলেন যে একজন অন্ধ ও একজন খঞ্জ দিল্লী ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাহাদের সুলতানের কাছে ধরিয়া আনা হয়; খঞ্জ লোকটিকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইল এবং অন্ধ লোকটিকে দৌলতাবাদে টানিয়া লইয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। ফলে শেষ পর্যন্ত তাহার একটি মাত্র পা নূতন রাজধানীতে গিয়া পৌঁছায়। খুব সম্ভবতঃ এই সকল কাহিনী নিছক বাজার গুজব।

প্রাচীন ও মধ্য যুগে রাজধানী প্রায়ই পরিবর্তিত হইত, সুতরাং কেবলমাত্র দিল্লী ত্যাগের জন্য মহম্মদকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে দেবগিরিতে নূতন রাজধানী স্থাপনের কতকগুলি স্পষ্ট অসুবিধাও ছিল। ইহার ফলে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সুলতানের প্রতিরোধ-শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। দেবগিরি হইতে বাংলার ন্যায় দূরবর্তী প্রদেশগুলি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইত না। ইহা ছাড়া, দিল্লীর মুসলমান অধিবাসীদের বিরুদ্ধ মনোভাব—দাক্ষিণাত্যে হিন্দু পরিবেশে বসবাসে তাহাদের অনিচ্ছা—একটি গুরুতর বিবেচ্য বিষয় ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহম্মদ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। ফলে আবার দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত হইল (১৩৩১ খ্রীস্টাব্দ)। দিল্লীর যে সকল অধিবাসী দেবগিরিতে বাস করিতেছিল তাহাদের দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। দৌলতাবাদ নগর পরিত্যক্ত অবস্থায়—'শক্তির অপব্যবহারের নিদর্শনস্বরূপ'—পড়িয়া রহিল, আবার দিল্লীর পূর্ব সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিতেও বহু বৎসর কাটিয়া গেল।

আধুনিক কালের কোন কোন লেখকের মতে মহম্মদ দেবগিরিকে কেবলমাত্র দ্বিতীয় রাজধানী করিতে চাহিয়াছিলেন। দিল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেই—ওমরাহ, উলেমা, শেখ ও উচ্চশ্রেণীর নাগরিকবর্গকে—তিনি সেখানে যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে জোর করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণের কাহিনীই পল্লবিত হইয়া দিল্লীর যাবতীয় অধিবাসীকে নির্বিচারে অপসারণের কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। ইবন বতুতার পরিদর্শন কালে দিল্লীর সমৃদ্ধি ছিল। দিল্লী হইতে নির্বিচারে

লোকাপসরণ হইয়া থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না। তবে এই ঘটনায় নিঃসন্দেহে সুলতানের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

মোঙ্গল আক্রমণ (১৩২৮-২৯)

রাজধানী পরিবর্তনের পরেই এক গুরুতর মোঙ্গল আক্রমণ ঘটিল। সম্ভবতঃ সুলতান দিল্লী ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে সাহস পাইয়াই তার্মাশিরিন নামে এক মোঙ্গল নেতা পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া লাহোর ও মুলতান হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বিধ্বস্ত করেন। স্পষ্টই বুঝা যায়, মহম্মদ সীমান্ত রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করেন নাই; আক্রমণকারীদের বাধা দিবার মত উপযুক্ত সীমান্ত-রক্ষীরও অভাব ছিল। সম্ভবতঃ তার্মাশিরিনকে মূল্যবান উপহার ও উপঢৌকনের দ্বারা নিবৃত্ত করা হইয়াছিল। এই ভাবেই বলবন ও আলাউদ্দীনের নিরলস প্রতিরোধের নীতির পরিবর্তন হয়; যুদ্ধের পরিবর্তে উৎকোচ দানের দ্বারা সুলতান তাঁহার দুর্বলতা প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের ফলেই তিনি বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন, কারণ আক্রমণের সময় তাঁহার ওমরাহ ও কর্মচারীরা সেখানেই ছিলেন। দোয়াবে বিদ্রোহও ইহার একটি কারণ ছিল।

নিদর্শক মুদ্রা প্রবর্তন (১৩২৯-১৩৩০)

একজন আধুনিক মুদ্রাবিদ মহম্মদকে 'মুদ্রাসংস্কারকদের মধ্যে প্রধান' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ধাতব মুদ্রার সংস্কার করিয়া বিবিধ প্রকারের নূতন মুদ্রা প্রচলন করেন; পরিকল্পনায় ও শিল্পকার্যে সেগুলি ছিল অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। তবে তাঁহার সর্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ পরীক্ষা হইল নিদর্শক মুদ্রা (token currency) প্রবর্তন। পরীক্ষাটি অবশ্য তাঁহার পক্ষে ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং শেষ অবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ত্রয়োদশ শতকে চীন ও পারস্য দেশে নিদর্শক মুদ্রার প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ মহম্মদ তাহা জানিতেন। বরনী বলেন যে তিনি সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন দুইটি কারণে—সামরিক কারণে ক্রমবর্ধমান ব্যয় নির্বাহ এবং তাঁহার মুক্তহস্তে দানের ফলে রাজকোষে যে অভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পরিপূরণের প্রয়োজনীয়তা। জনৈক আধুনিক লেখক বরনীর এই অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, 'সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যাবৃদ্ধি করা। শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করা নয়।' অপর একজন আধুনিক লেখকের মতে, 'খোরাসান আক্রমণের পরিকল্পনা এবং কারাচিল অভিযানের ব্যর্থতার ফলে সুলতানকে যে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহার সহিত এই পরীক্ষার সম্পর্ক ছিল; উপরন্তু, ঐ সময়ে সমগ্র বিশ্বেই রৌপ্যের অভাব দেখা দেওয়ার ফলে রৌপ্যমুদ্রার ঘাটতি অবশ্যম্ভাবী হয়। হয়ত এই সমস্যার প্রতিকারের জন্যই নিদর্শক মুদ্রার প্রচলন করা হয়।'

মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই সুলতান তামা ও পিতলের নিদর্শক মুদ্রা প্রচলনের নির্দেশ দিয়া ঘোষণা করেন যে সকল প্রকার লেনদেনের কারবারেই তাহা রৌপ্যমুদ্রার ন্যায় ব্যবহৃত হইবে। কার্যতঃ, 'একটি জিতল (তাম্র মুদ্রা) একটি 'তঙ্কা' হইয়া দাঁড়াইল।' কিন্তু নকল মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করার জন্য সুলতান কোন ব্যবস্থা করিলেন না। বরনী বলেন, প্রত্যেক হিন্দুর গৃহই একটি টাঁকশাল হইয়া দাঁড়াইল। সকলেই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা মজুত করিয়া জাল মুদ্রায় রাজকর দিতে লাগিল। বিদেশী বণিকেরা নিদর্শক মুদ্রার বদলে জিনিস কিনিয়া বিদেশের বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া সোনা পাইতে লাগিল। বিদেশী জিনিসের আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া গেল, কারণ বিদেশী বণিকেরা নিদর্শক মুদ্রা লইতে অস্বীকার করিল। গোলযোগ যখন চরমে উঠিল তখন সুলতান তিন চার বৎসর প্রচলিত থাকার পর বাজার হইতে নিদর্শক মুদ্রা তুলিয়া লইলেন এবং সকলকে রাজকোষ হইতে তামা ও পিতলের মুদ্রার বদলে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। রাজকোষের ক্ষতি করিয়া লোকে অসম্ভব লাভ করিল ; রাজকোষে সঞ্চিত অর্থের প্রভূত অপচয় ঘটিল। পরিকল্পনাটির ত্রুটিবিচ্যুতি অপেক্ষা দুর্নীতি নিবারণের যথোপযুক্ত বন্দোবস্তের অভাবই নূতন ব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ইহা ছিল এক দুঃসাহসী ও অর্থক্ষয়ী পরীক্ষা।

খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা

রাজ্যলাভের কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহম্মদ খোরাসান, ইরাক ও অক্‌সাস নদীর ওপারের দেশ (Trans-Oxiana) জয়ের এক বিরাট পরিকল্পনা করিলেন। তার্মাশিরিনের আক্রমণের পর তিনি খোরাসান আক্রমণের জন্য এক বিরাট বাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার বিপুল বদান্যতায় আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন খোরাসানী ওমরাহ তাঁহার রাজসভায় আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই প্ররোচনায় তিনি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইহাও সম্ভব যে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল মোঙ্গলদের দমন করা। ইলতুৎমিসও একবার খোরাসান জয়ের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। হয়ত মহম্মদ মোঙ্গলশক্তির পতনের পরে যে অঞ্চলে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই অঞ্চলে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন।

বরনী বলেন যে ৩,৭০,০০০ লোককে সৈন্যদলে ভর্তি করিয়া পুরা এক বৎসর বেতন দেওয়া হইল ; কিন্তু তাহারা দিল্লীর বাহিরে গেল না। তারপর যখন দেখা গেল যে এত বৃহৎ সৈন্যদলের ব্যয়ভার বহন রাজকোষের পক্ষে অসম্ভব তখন সৈন্যদের বিদায় দেওয়া হইল। খোরাসানের রাজনৈতিক অবস্থা বৈদেশিক আক্রমণের পক্ষে প্রতিকূল না হইলেও গন্তব্যপথে অনেক দুরতিক্রমনীয় বাধা ছিল ; জয়াভিলাষী মহম্মদ সেদিকে যথোচিত দৃষ্টিপাত করেন নাই। 'তাঁহার রাজ্য এবং খোরাসান ও ইরাকের মধ্যে ছিল বিশাল পর্বতমালার ব্যবধান, এবং ছিল

বৈরমনোভাবাপন্ন উপজাতিগণ। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার মত সহায়সম্পদ তাঁহার ছিল না।' অভিযানের জন্য সংগৃহীত সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে বহু লোক কর্মহীন হইল এবং রাজনৈতিক নৈরাশ্য দেখা দিল।

উত্তর-পশ্চিমে রাজ্যজয় : কারাচিল অভিযান

তার্মাশিরিনের আক্রমণের পর মহম্মদ কালানৌর ও পেশোয়ার জয় করেন। সম্ভবতঃ ইহার উদ্দেশ্য ছিল মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সীমান্ত সুরক্ষিত করা।

পাঞ্জাবের কাংড়া অঞ্চলে একটি পর্বতের উপর অবস্থিত নগরকোট দুর্গ তখনকার দিনে অভেদ্য বলিয়া গণ্য হইত। ১৩৩৭ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ এই দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গ-প্রাকার ধূলিসাৎ করা হইল, কিন্তু সেখানকার হিন্দু রাজাকে দুর্গটি প্রত্যর্পণ করা হইল।

নগরকোট ও কারাচিলের বিরুদ্ধে অভিযান ছিল হিমালয়ের পাদদেশের রাজ্যগুলির উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব স্থাপনের ব্যাপক পরিকল্পনার অংশ মাত্র। সম্ভবতঃ বর্তমান উত্তর প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলির অন্তর্ভুক্ত হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলে কারাচিল অবস্থিত ছিল। কোন কোন লেখক কারাচিল অভিযানকে চীন অথবা পশ্চিম তিব্বত অধিকারের এক অবিবেচনাপ্রসূত ও বিপর্যয়কর প্রচেষ্টা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিকই বলেন নাই যে ইহার উদ্দেশ্য ছিল চীন বা তিব্বত জয়। বরনী ইহাকে খোরাসান জয়ের অভিযানের সহিত যুক্ত করিয়া ভুল করিয়াছেন। প্রত্যক্ষদর্শী ইবন বতুতা বলেন যে কারাচিল অভিযানের ফলে একজন পার্বত্য হিন্দু রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন। দিল্লী হইতে এক বিশাল বাহিনী যুদ্ধযাত্রা করে, কিন্তু পথের দুর্গমতা এবং পার্বত্য যুদ্ধের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সহিত পার্বত্য অঞ্চলে বর্ষাকালে স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক অবনতি যুক্ত হইয়া সুলতানের সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত করে।

চীনের সহিত সম্পর্ক

১৩৪১ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে মহম্মদের নিকট চীনের মোঙ্গল সম্রাট তোঘান তৈমুর একদল দূত প্রেরণ করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল হিমালয় অঞ্চলে কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য সুলতানের অনুমতি প্রার্থনা। কারাচিল অভিযান কালে এই মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হইয়াছিল। চীনা দূতগণ সুলতানের জন্য বহুমূল্য উপহার লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সুলতান সন্তুষ্ট হন। মুসলমান আইন অনুসারে জিজিয়া কর না দিলে মন্দিরগুলি পুনর্নির্মিত হইতে পারে না, ইহা জানাইবার জন্য তিনি ইবন বতুতাকে চীনদেশে প্রেরণ করেন। ইবন বতুতা চীন সম্রাটের জন্য যে সকল উপহার লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রদত্ত উপহার অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান ছিল। ১৩৪২ খ্রীস্টাব্দে যাত্রা করিয়া তিনি প্রায় চারি বৎসর পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইবন বতুতা

ইবন বতুতার জীবনকাহিনী মুসলমান জগতের ইতিহাসে এক বিশেষ কৌতূহলজনক অধ্যায়। ১৩০৪ খ্রীস্টাব্দে জাঞ্জিবারে তাঁহার জন্ম হয়। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং ১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, মক্কা, আলেপ্পো, দামাস্কাস, কাফ্‌ফা, কনস্টান্‌টিনোপল, বোখারা, কাবুল ও অন্যান্য বহু স্থান দর্শন করিয়া ১৩৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিন্ধুদেশে আসেন। দিল্লীতে আসিয়া তিনি সুলতানের নিকট হইতে একটি জায়গীর লাভ করেন এবং পরে রাজধানীর 'কাজী' নিযুক্ত হন। তিনি আট বৎসর সুলতানের অধীনে কাজে নিযুক্ত ছিলেন; দরবারেও তাঁহার বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি হয়। একবার সুলতানের কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি কর্মচ্যুত হন। ১৩৪১ খ্রীস্টাব্দে তিনি পুনরায় সুলতানের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং কয়েক মাস পরে তাঁহাকে চীনদেশে প্রেরণ করা হয়। দক্ষিণ ভারত ও বাংলায় দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া তিনি যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও পূর্ব ভারতীয় উপদ্বীপের পথে চীনদেশে যাত্রা করেন। তিনি চীনে উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি প্রেরিত হন তাহা সফল হয় নাই। তিনি কালিকটে প্রত্যাবর্তন করিয়া তথা হইতে জাহাজযোগে স্বদেশে যাত্রা করেন। ১৩৭৭-১৩৭৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বৃদ্ধ বয়সে ইবন বতুতা 'সফরনামা' নামে একটি গ্রন্থে তাঁহার ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। বর্তমানে প্রচলিত পুস্তকটি ঐ গ্রন্থের ইবন জুজ্জি কৃত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ইবন বতুতা বহুক্ষেত্রে ইতিহাসের সহিত গালগল্প মিশাইয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন একজন নিরপেক্ষ দর্শক। মহম্মদ বিন তুঘলুকের আমলের কোন কোন ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধানে তাঁহার সাক্ষ্য সাহায্য করে। তবে তাঁহার কালপঞ্জী বা ভৌগোলিক বর্ণনা সযত্নে পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ মন্তব্যগুলি ভারতীয় ঐতিহাসিকদের নিছক বিদ্রোহ এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিবরণের মূল্যবান পরিপূরক।

বিদ্রোহ: উত্তর ভারত

জনগণের নিকট অপ্রিয় বিভিন্ন সংস্কার এবং নৃশংসতার ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র গুরুতর বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ ও দক্ষিণ ভারতে প্লেগ মহামারীর ফলে জনগণের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পায়। নিদর্শক মুদ্রার প্রচলনের ফলে সর্বত্র গোলযোগের সৃষ্টি হয়। স্বভাবতঃই উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ সুলতানের অখ্যাতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

মুলতানে দুইবার বিদ্রোহ হয়। বিদ্রোহ দমন করা হইল। সিন্ধু প্রদেশে কমলপুর এবং সেওয়ানে বিদ্রোহ হয়। সুনাম ও সামানায় কৃষকেরা বিদ্রোহ করে।

আমীর হালাজুন নামে সুলতানের এক মোঙ্গল কর্মচারী পাঞ্জাবে বিদ্রোহী হইয়া লাহোরের শাসনকর্তাকে হত্যা করেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। খাজা জাহানের নেতৃত্বে সুলতানের সৈন্যবাহিনী হালাজুনকে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করে।

কারায় বিদ্রোহ হইলে তাহা সহজেই দমন করা হয়।

অযোধ্যার সফল ও জনপ্রিয় শাসনকর্তা আইন-উল-মুলক বিদ্রোহ করিয়া পরাজিত ও বন্দী হন।

১৩৪৩ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ খলিফার নিকট হইতে শাসক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে ইহাতে মুসলমান প্রজাদের দৃষ্টিতে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে এবং বিদ্রোহীগণ মনোবল হারাইবে।

বাংলা

অশান্ত বাংলা প্রদেশ স্বভাবতঃই সাম্রাজ্যের অন্যত্র গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করিল। বাংলার শাসনকর্তা বহরম খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁহার বর্মবাহক মালিক ফকরউদ্দীন স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া লখ্‌নৌতির শাসনকর্তা কাদের খাঁ সোনারগাঁওয়ের শাসনভার লাভ করেন। কিন্তু কাদের খাঁর সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া ফকরউদ্দীনের সহিত যোগ দিল। কাদের খাঁ নিহত হইলেন। ফকরউদ্দীন সোনারগাঁও অধিকার করিয়া লখ্‌নৌতি অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু আলি মোবারক নামে কাদের খাঁর এক কর্মচারী তাঁহাকে বাধা দেন। কিছুকাল পরে আলি মোবারক লখ্‌নৌতি নগরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার ধাত্রীর পুত্র মালিক হাজী ইলিয়াস তাঁহাকে হত্যা করিয়া লখ্‌নৌতির অধিপতি হন এবং সুলতান শামসউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। ১৩৫২-৫৩ খ্রীস্টাব্দে ইলিয়াস সোনারগাঁও অধিকার করিয়া ফকরউদ্দীনকে হত্যা করেন।

এইরূপে বাংলা মহম্মদ বিন তুঘলুকের 'নিমজ্জমান' সাম্রাজ্য হইতে ১৩৩৯-৪০ খ্রীস্টাব্দে নিজেকে পৃথক করিয়া লইল। সুলতানের শাসনকালের শেষ দ্বাদশ বৎসর বাংলা তাঁহার মারাত্মক প্রতিশোধের কবল হইতে নিরাপদ ছিল। ইলিয়াস শাহী রাজবংশ কয়েক পুরুষ ধরিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিল।

বিদ্রোহ : দক্ষিণ ভারত

বাংলার কথা বাদ দিলে, উত্তর ভারতের অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতের বিদ্রোহ সুলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষে অধিকতর ভয়াবহ ছিল। বিদর এবং গুলবর্গায় স্থানীয় মুসলমান কর্মচারীদের বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হয়। কিন্তু বাংলার ন্যায় 'মাবারে'র বিদ্রোহও সফল হইয়াছিল।

মাবারে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ইহার শাসনকর্তা, সৈয়দ জালালউদ্দীন আহসান শাহ। উত্তর ভারতে গোলযোগ এবং দিল্লী হইতে 'মাবারে'র দূরত্ব স্বভাবতঃই এই শক্তিশালী আমীরকে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করে। সুলতান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। দৌলতাবাদে তিনি জনগণের উপর কর বৃদ্ধি করিলেন, এবং মুসলমান ওমরাহ ও রাজকর্মচারীগণের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ দাবি করিলেন। অর্থদানে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করেন। অতঃপর সুলতান বিদর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ প্লেগ রোগের আক্রমণে সুলতানের সৈন্য শিবিরে বহু প্রাণহানি ঘটায় তিনি দৌলতাবাদে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি নিজেও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার 'মাবার' জয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল। 'মাবারে'র বিদ্রোহী শাসক নিরুপদ্রবে রহিলেন; দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশটি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল (১৩৩৪-৩৬ খ্রীস্টাব্দ)। ১৩৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দে 'মাবার' বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'মাবারে'র পরে বরঙ্গলে হিন্দুগণ বিদ্রোহী হয় (আনুমানিক ১৩৩৫ খ্রীস্টাব্দ)। ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পত্তন হইল। দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত সুলতানের কর্মচারীরা এই ক্রমবর্ধমান হিন্দু অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ফলে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল এবং অন্ধ্র প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল সুলতানী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে মুসলমান ওমরাহদের বিদ্রোহ

মহম্মদ দেবগিরি, মালব ও গুজরাটে 'সদা আমীর'দের (Sadah Amirs) বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্দেহ ছিল যে 'সদা আমীর'গণ বিদ্রোহীদের সমর্থক এবং লুণ্ঠনকারী। ইহার ফলে গুজরাটে 'সদা আমীর'গণ বিদ্রোহী হন। স্বয়ং বিদ্রোহীদের শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে মহম্মদ দিল্লী হইতে গুজরাট যাত্রা করেন (১৩৪৪ খ্রীস্টাব্দ)। দাভোলে, এবং নর্মদার তীরে, তাঁহার সৈন্যদল জয়লাভ করে। বহু বিদ্রোহী দেবগিরিতে পলায়ন করে। দৌলতাবাদের 'সদা আমীর'গণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য সুলতান কয়েকজন কর্মচারীকে প্রেরণ করিলে তাঁহাদের ব্যবহারে আমীরগণ অসন্তুষ্ট হইলেন। ইসমাইল মুখ আফগানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহারা দেবগিরি অধিকার করিলেন। দেবগিরিতে সঞ্চিত ধনরত্ন তাঁহাদের হস্তগত হইল। তাঁহারা ইসমাইল মুখকে রাজা নির্বাচন করিলেন; তাঁহার উপাধি হইল সুলতান নাসিরউদ্দীন।

সুলতান দেবগিরিতে আসিয়া অবস্থা প্রায় আয়ত্তের মধ্যে আনিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ গুজরাটে তাঘী বিদ্রোহ করায় তাঁহার পরিকল্পনা বানচাল হইয়া গেল। তিনি অবিলম্বে গুজরাট যাত্রা করিয়া তাঘীকে সিন্ধু প্রদেশের থাট্টায় আশ্রয় লইতে

বাধ্য করিলেন। তিন বৎসর গুজরাটে অবস্থান করিয়া তিনি শাসন-ব্যবস্থা পুনর্গঠন করিলেন, এবং গিরনার (বর্তমান জুনাগড়) অধিকার করিলেন। অতঃপর তিনি তাঘীর পশ্চাদ্ধাবন করিবার উদ্দেশ্যে সিন্ধু অভিমুখে যাত্রা করিলেন। থাট্টা অধিকার করার জন্য আয়োজন করা হইল, কিন্তু অকস্মাৎ সুলতানের মৃত্যু হইল (১৩৫১)। বদায়ুনী বলেন, 'এইভাবেই রাজা জনসাধারণের নিকট হইতে মুক্ত হইলেন, এবং তাহারাও রাজার নিকট হইতে মুক্তি পাইল।' 'মহম্মদ বিন তুঘলুকের নিকট দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ ছিল বেদনাদায়ক এক ক্ষতের ন্যায়; শেষ পর্যন্ত, ইহাই তাঁহার সর্বনাশের কারণ হয়।'

ফিরোজ তুঘলুকের সিংহাসনে আরোহণ (১৩৫১)

থাট্টা অবরোধকালে মহম্মদের মৃত্যুর ফলে সৈন্যবাহিনী বিব্রত হইয়া পড়ে। দেশ ছিল বিদ্রোহীগণের দ্বারা পরিপূর্ণ। তাঘীর অনুগামী ভাড়াটে মোঙ্গল সৈন্যগণ রাজকীয় শিবির লুণ্ঠন করিতে লাগিল। সুলতানী সৈন্যদল নিরাপদে দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিতে পারিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইল। এই সংকটকালে শিবিরে উপস্থিত ওমরাহগণ পরলোকগত সুলতানের জ্ঞাতিভ্রাতা ফিরোজ তুঘলুককে রাজপদ গ্রহণের অনুরোধ জানাইলেন। ফিরোজ তুঘলুক অনিচ্ছা সহকারে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি দেন। মনে হয়, মহম্মদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না, এবং তিনি ফিরোজকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন।

ফিরোজ তুঘলুকের চরিত্র

ফিরোজ ছিলেন গিয়াসউদ্দীন তুঘলুকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজবের পুত্র। তাঁহার মাতা ছিলেন এক রাজপুত দলপতির কন্যা। মহম্মদ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। তিনি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজনীতি ও শাসন পরিচালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে শাসকসুলভ কাঠিন্যের অভাব ছিল। সে যুগে রাজপদ লাভ এবং রাজকার্য পরিচালনার জন্য যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাহস ও নিষ্ঠুর রণোন্মাদনার প্রয়োজন হইত, তাঁহার চরিত্রে সে সকল গুণের একান্ত অভাব ছিল। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বরনী ও আফিফ তাঁহাকে আদর্শ মুসলমান রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নম্রতা, দয়া, ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং সত্যনিষ্ঠার তাঁহারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বহু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভ্রমে পতিত হন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষেত্রে কোরাণের অনুশাসন প্রবর্তন করা। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাদের পক্ষে কল্যাণকর ছিল না; কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর একজন শাসকের কাছে ইহা আশা করা যায় না যে তিনি 'আকবরের ন্যায় উপলব্ধি করিবেন যে হিন্দুস্থানের রাজার পক্ষে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রজার মঙ্গল করা উচিত।'

বাংলা অভিযান (১৩৫৩-৫৪, ১৩৫৯-৬০)

রাজ্যলাভের অল্পকাল পরেই ফিরোজ স্থির করিলেন যে বাংলাকে পুনরায় দিল্লীর শাসনাধীনে আনিবেন। শাম্‌স্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহ লখ্‌নৌতি ও সোনারগাঁও, উভয় অঞ্চল লইয়া একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তিরহুত আক্রমণ করিলে সুলতান এক বিশাল সৈন্যদল লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন (১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দ)। সুলতান নিকটবর্তী হইলে ইলিয়াস সুদৃঢ় একডালা দুর্গে (দিনাজপুর জেলায়) আশ্রয় গ্রহণ করেন। একডালা অধিকার করিতে না পারিয়া সুলতান পশ্চাদপসরণ করেন এবং ১৩৫৪ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তা ফকরউদ্দীনের জামাতা জাফর খাঁর অনুরোধে ১৩৫৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয়। ইলিয়াস শাহ কর্তৃক অন্যায়ভাবে অপহৃত পদ অধিকার করাই ছিল জাফর খাঁর উদ্দেশ্য। সুলতান বাংলায় উপস্থিত হইলে ইলিয়াসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সিকন্দর একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল অবরোধ ব্যর্থ হইলে সিকন্দর জাফর খাঁকে সোনারগাঁও ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন এবং সুলতানকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করেন। কিন্তু জাফর খাঁ দিল্লী ছাড়িয়া সোনারগাঁও শাসনের ঝুঁকি লইতে অসম্মত হন। অতঃপর প্রায় দুই শতাব্দীকাল বাংলার সুলতানেরা দিল্লীর অধীনতা ও আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন।

উড়িষ্যা অভিযান (১৩৬০)

বাংলায় অসম্পূর্ণ সাফল্যলাভের পর ফিরোজ জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন। হিন্দু রাজা রাজধানী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ফিরোজ পুরী অধিকার করিয়া প্রধান মন্দিরটি অপবিত্র করেন। জগন্নাথ দেবের মূর্তি হয় সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, নয় মসজিদের সিঁড়িতে রাখিয়া মুসলমানদের দ্বারা পদদলিত করাইবার জন্য দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। হিন্দু রাজা করস্বরূপ প্রতি বৎসর দিল্লীতে কুড়িটি হস্তী প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

নগরকোট জয় (১৩৬৫)

পাঞ্জাবে কাংড়া দুর্গ সহ নগরকোট শহর মধ্য যুগের ভারতবর্ষে অন্যতম শক্তিশালী সামরিক কেন্দ্র ছিল। মহম্মদ বিন তুঘলুকের নগরকোট অধিকারের ফল স্থায়ী হয় নাই। ১৩৬৫ খ্রীস্টাব্দে ফিরোজ এই দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। দীর্ঘকাল অবরোধের পর দুর্গটি অধিকার করা সম্ভব হইল না, কিন্তু ইহার হিন্দু শাসক সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন।

সিন্ধু অভিযান (১৩৬৫-৬৭)

মহম্মদ বিন তুঘলুকের প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশের জন্য সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত থাট্টার অধিবাসীদের শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে ফিরোজ ১৩৬৫ খ্রীস্টাব্দে ৯০,০০০ অশ্বারোহী ও ৪৮০ হস্তী লইয়া দিল্লী হইতে যাত্রা করেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও কচ্ছের রান অঞ্চলে পথের দুর্গমতার জন্য বহু সৈন্য নিহত হয়। অবশেষে থাট্টার শাসক বার্ষিক করদানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

বিদ্রোহ

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পর ফিরোজ রাজ্যবিস্তার নীতি পরিত্যাগ করেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে বিদ্রোহ দমন ভিন্ন অন্য কোন কারণে তিনি আর কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন না। এই প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করিয়াছিলেন। বাহমনী রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ আসিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন (১৩৬৫-৬৬ খ্রীস্টাব্দ)। গুজরাটের শাসনকর্তা শামস্‌উদ্দীন দামঘনি বিদ্রোহ করিয়া স্থানীয় ওমরাহগণের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। কাতেহরে বিদ্রোহ হইলে স্থলতান স্বয়ং নির্মমভাবে তাহা দমন করেন।

ফিরোজ তুঘলুকের শেষ জীবন

বৃদ্ধ বয়সে ফিরোজ ক্রমশঃ শারীরিক সামর্থ্য হারাইয়া মন্ত্রী খান-ই-জাহানের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া কলহ শুরু হয়। ১৩৮৮ খ্রীস্টাব্দে ৮৩ বৎসর বয়সে ফিরোজের মৃত্যু হয়।

ধর্মীয় নীতি

হিন্দু নারীর সন্তান এবং মহম্মদ বিন তুঘলুকের উদারনৈতিক ভাবধারায় শিক্ষিত হইলেও ফিরোজ ছিলেন ধর্মান্ধ মুসলমান ; কেবল হিন্দুগণ নহে, সুন্নী সম্প্রদায় হইতে পৃথক শিয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরাও তাঁহার হস্তে নির্যাতিত হয়। তাঁহার আত্মজীবনী 'ফুতুহাৎ-ই-ফিরোজশাহী' নামক গ্রন্থে তিনি সগর্বে বলিয়াছেন : 'অবিশ্বাসী যে সকল ধর্মীয় নেতা অপরকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিত তিনি তাহাদের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছেন'। তিনি আরও বলিয়াছেন যে হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন। ধর্মান্তরিতকরণে রাষ্ট্র সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল। ফিরোজ বলেন, 'পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী আমার প্রজাগণকে আমি পয়গম্বরের ধর্ম গ্রহণে উৎসাহ দিয়াছি, এবং যাহারা কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইবে তাহাদের সকলকেই জিজিয়া কর প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে, ইহা বারংবার ঘোষণা করিয়াছি। জন-সাধারণ এই সংবাদ অবগত হইল এবং বহু হিন্দু উপস্থিত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

করিল।' দিল্লীর সুলতানগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করেন।

ফিরোজের ধর্মান্ধতা নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছিল। শিয়া মুসলমানদের শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাহাদের পবিত্র গ্রন্থগুলি প্রকাশ্যে ধ্বংস করা হয়। মুল্‌হিদ-গণকে কারারুদ্ধ ও নির্বাসিত করা হয়, এবং তাহাদের 'ঘৃণ্য' কার্যাবলী নিষিদ্ধ হয়। মেহ্‌দিগণের উপরেও অনুরূপ ব্যবহার করা হইত। এমন কি, সুফীগণও নির্যাতন হইতে অব্যাহতি পায় নাই। সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালের পূর্বে এইরূপ অবিবেচনাপ্রসূত ধর্মীয় উন্মাদনার উদাহরণ আর দেখা যায় না।

সাড়ম্বরে খলিফার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজেকে তাঁহার প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণার দ্বারা ফিরোজ নিজের ধর্মপ্রাণতা প্রমাণ করেন। তাঁহার মুদ্রায় খলিফার —যিনি ছিলেন কায়রোর অধিবাসী এক ছায়ামূর্তি মাত্র, তাঁহার—নাম উৎকীর্ণ হইত। মুসলমান জগতের এই নামেমাত্র নেতার নিকট হইতে তিনি দুই বার হুকুমনামা ও অঙ্গাবরণ লাভ করিয়াছিলেন।

শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার

ফিরোজ শাসন-ব্যবস্থায় বহু সংস্কার প্রবর্তন করেন। আফিফ রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' নামক সমসাময়িক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। জায়গীরের নির্বিচার বণ্টন তাঁহার অদূরদর্শী সংস্কারগুলির অন্যতম। আলাউদ্দীন জায়গীর দানে অত্যন্ত সংযত ছিলেন। যে সকল সামরিক কর্মচারীকে জায়গীর দেওয়া হইত তাঁহারা কৃষকদের উপর অত্যাচার করিতেন এবং রাষ্ট্রকে প্রাপ্য রাজস্ব হইতে বঞ্চিত করিতেন। জায়গীরগুলি বংশগত সম্পত্তিতে পরিণত হইল, কারণ ফিরোজ সকল রাজপদই বংশানুক্রমিক করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল দুর্নীতি ও দক্ষতার অভাব।

ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি প্রজাদের পক্ষে মোটামুটি কল্যাণকর হইয়াছিল। স্বত্ব ও মালিকানা সম্বন্ধে তদন্তের পর জমির উপর কর ধার্য করা হইত। কর সংগ্রহের ব্যাপারে যে সকল দুর্নীতি ছিল তাহাও অনেকটা দমন করা হয়। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছয় বৎসর ধরিয়া রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া 'অনুসন্ধানের নিয়ম' অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করিতেন। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রাপ্য নির্ধারণে সর্বত্র একই নীতি অনুসৃত হইত বলিয়া মনে হয় না।

ফিরোজ তাঁহার আত্মজীবনীতে বহু বেআইনী কর তুলিয়া দিবার জন্য সগর্বে প্রশংসা দাবি করিয়াছেন। বস্তুতঃ কোরাণের অনুশাসন অনুসারেই কর ধার্য করা হইত। এই বিষয়ে যে মূলনীতি অনুসরণ করা হইত তাহা ছিল এই যে ইসলামের বিধানের দ্বারা অনুমোদিত নহে, এমন কোন করই রাষ্ট্র ধার্য করিতে পারিবে না। চারটি প্রধান কর আদায় করা হইত : খরজ (ভূমি-রাজস্ব), খাম্‌স্‌ (যুদ্ধে লুণ্ঠিত

দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ), জিজিয়া (অমুসলমানদের নিকট হইতে সংগৃহীত বিশেষ কর) এবং জাকাত (ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য সম্পত্তির উপর ধার্য কর)। ইহাদের সবগুলিই শরিয়তের দ্বারা অনুমোদিত ছিল। অপর একটি পঞ্চম করও আদায় করা হইত। যে সকল কৃষক সরকারী খালের জল সেচের জন্য ব্যবহার করিত তাহাদের কর দিতে হইত।

বিচার বিভাগে ইসলামের বিধিই ছিল সর্বোচ্চে। নিপীড়ন ও অমানবিক শাস্তিদানের প্রথা তুলিয়া দিয়া ফিরোজ জনসাধারণের অশেষ উপকার করেন। এইরূপ কয়েকটি সংস্কারের জন্য সুলতান সম্ভবতঃ তাঁহার দক্ষ উজীর খান-ই-জাহান মকবুলের নিকট ঋণী ছিলেন। মকবুল ছিলেন তেলেঙ্গানার একজন ধর্মান্তরিত হিন্দু।

কৃত্রিম প্রাদেশিক সীমারেখা ও আভ্যন্তরীণ শুল্ক তুলিয়া দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দেওয়া হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আফিফ বলেন যে 'জনসাধারণের গৃহ শস্য, সম্পত্তি, অশ্ব ও আসবাবে পূর্ণ ছিল।' তিনি ইহাও বলেন যে 'প্রত্যেকের প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য ছিল'। এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত।

সৈন্যবাহিনী

অপাত্রে ঔদার্য প্রদর্শন করিয়া ফিরোজ রাজ্যের সামরিক সংগঠন দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আফিফ বলেন যে তিনি এই মর্মে এক ঘোষণা করেন: 'কোন সৈন্য বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িলে তাহার পুত্র তাহার স্থান অধিকার করিবে; যদি তাহার পুত্র না থাকে তবে তাহার জামাতা, এবং জামাতাও না থাকিলে তাহার ক্রীতদাস, তাহার প্রতিনিধিত্ব করিবে।' দুর্নীতির ফলে অশ্বারোহী সৈন্যদের অশ্বগুলির বার্ষিক পরিদর্শনের ব্যবস্থায় কোন ফল হইত না। কখনও কখনও সুলতান নিজেও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের সামরিক অভিযানগুলির সহিত তাঁহার রাজত্বকালের অভিযানগুলির তুলনা করিলে, ফিরোজের শাসনকালে সৈন্যবাহিনীর যে কতদূর অবনতি হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়।

দাস প্রথা

ক্রীতদাসের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। সুলতানের প্রাসাদে ৪০,০০০ ক্রীতদাস ছিল; তাহারা পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধে ঐক্যবদ্ধ ছিল; সুলতানের প্রতি তাহাদের কোন আনুগত্য ছিল না। রাজকীয় ক্রীতদাসদের মোট সংখ্যা ছিল ১৮০,০০০। ক্রীতদাসদের যথাযথ পরিচালনার জন্য একটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করা হয়। তাহাদের বেতন দিবার জন্যও পৃথক রাজকোষ ছিল। দাস প্রথা পতনোন্মুখ সুলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপদের সম্ভাব্য কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

জনকল্যাণমূলক কার্য

নগর ও মসজিদ নির্মাণে ফিরোজ অতি উৎসাহী ছিলেন। তিনি জৌনপুর, ফিরোজাবাদ (যমুনার তীরে), ফতেহাবাদ ও হিসার ফিরোজা প্রভৃতি নগর স্থাপন করেন। মুসলমানদের সুবিধার জন্য বহু স্থানে মসজিদ ও সরাইখানা নির্মিত হইয়াছিল। দিল্লীর নিকটে নূতন নূতন উদ্যান নির্মাণ করা হয়। শহরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ছাড়াও এই নীতির মাধ্যমে ফলের উৎপাদন ও রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যমুনা নদীর তীরে ফিরোজাবাদের নিকটস্থ একটি গ্রাম হইতে, এবং মীরাট হইতে, অশোকের দুইটি শিলাস্তম্ভ দিল্লীতে আনা হয়। ফিরোজের সময়ে সরকারী তত্ত্বাবধানে ৩৬টি 'কারখানা' ছিল। এইগুলি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : মানুষ ও পশুর দৈনন্দিন আহার্যের ব্যবস্থা করার জন্য কারখানা, এবং মানুষের শ্রমজাত দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কারখানা।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ খাল খনন করিয়া কৃষির উন্নতি সাধন করা হয় : শতদ্রু হইতে ঘর্ঘরা নদী পর্যন্ত (৯৬ মাইল দীর্ঘ), সিরমুর পাহাড়ের পাদদেশ হইতে আরাসানি পর্যন্ত, ঘর্ঘরা হইতে ফিরোজাবাদ পর্যন্ত, এবং যমুনা হইতে হিসার পর্যন্ত (১৫০ মাইল দীর্ঘ)। এই খালগুলি খননের ফলে সেচ-ব্যবস্থার যে উন্নয়ন হইয়াছিল তাহাতে দোয়াব ও দিল্লীর নিকটস্থ অঞ্চলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এই সকল কল্যাণমূলক ব্যবস্থার সহিত এমন সকল সংস্কার-প্রচেষ্টাও যুক্ত ছিল, যাহাদের যথার্থই 'পিতামহী-সুলভ আইন' ('grand-motherly legislation') বলিয়া বর্ণনা করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সুলতান প্রতিষ্ঠিত বিবাহ-সংস্থা এবং কর্মসংস্থান-কেন্দ্রের উল্লেখ করা যায়।

শিক্ষার উন্নতিসাধন

গোঁড়া সুন্নী ফিরোজ স্বভাবতঃই ইসলামের অনুমোদিত শিক্ষার বিস্তারে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বহু মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া তাহাদের মুক্তহস্তে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। বহু ধর্মজ্ঞ ও পণ্ডিত মুসলমান তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে জালালউদ্দীন রুমি অন্যতম। ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল। ফিরোজের নামের সহিত জড়িত বরনী ও আফিফের রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ দুইটি তাঁহার রাজত্বকালেই রচিত হয়। তিনি স্বয়ং 'ফুতুহাৎ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থটি রচনা করেন। নগরকোটের পতনের পর এক বিশাল গ্রন্থাগার সুলতানের হস্তগত হয়। তাঁহার আদেশে ঐ গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ করা হয়।

ফিরোজ শাহের কৃতিত্ব

ফিরোজ শাহ্ তাঁহার অর্থনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার, শিক্ষানুরাগ এবং

জনকল্যাণকর কাজে উৎসাহের জন্য বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। মহম্মদের অশান্ত শাসনকালের পর তিনি মোটামুটি দীর্ঘকালের জন্য আভ্যন্তরীণ শান্তি ও কিছু সমৃদ্ধি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহী প্রদেশগুলিকে দিল্লীর অধীনে আনিতে পারেন নাই। ফলে সুলতানী সাম্রাজ্যের আয়তন সঙ্কুচিত রহিল। তিনি সৈন্যবাহিনী ও শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্বল করেন এবং এইভাবে সুলতানী সাম্রাজ্যকে পতনের দিকে আর এক ধাপ অগ্রসর করিয়া দেন। মহম্মদ বিন তুঘলুকের নীতির পরিবর্তন করিয়া তিনি সুলতানী সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিয়া শরিয়তের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই দুর্বল, অদূরদর্শী ও ধর্মান্ধ সুলতানের সহিত মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তিমান, দূরদর্শী, উদার প্রতিষ্ঠাতা আকবরের তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

ফিরোজ শাহের উত্তরাধিকারীগণ

ফিরোজ শাহের চার জন বংশধর ১৩৮৮-৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অতঃপর তুঘলুক বংশের শেষ সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ শাহ সিংহাসন লাভ করেন। কয়েকজন শক্তিশালী ওমরাহ তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার না করিয়া নসরৎ শাহ নামে ফিরোজের আর একজন পৌত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান রূপে ঘোষণা করিলেন। সুলতানী সাম্রাজ্য দ্রুত খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া পড়িল। 'সুলতান-ই-শর্ক' (পূর্বাঞ্চলের অধিপতি) এই উচ্চ উপাধিধারী মালিক সারওয়ার নামে জনৈক শক্তিশালী খোজা জৌনপুরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া শর্কী রাজবংশ স্থাপন করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খাঁও স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন।

তৈমুরের আক্রমণ (১৩৯৮-৯৯)

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য পতনোম্মুখ হইলে তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ১৩৩৪ খ্রীস্টাব্দে সমরকন্দের নিকটে এক অভিজাত চাঘতাই তুর্কী বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তেত্রিশ বৎসর বয়সে তৈমুর চাঘতাই তুর্কীদের দলপতি হন। ১৩৬০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তাঁহার ৩৬ বৎসর ব্যাপী রাজত্ব-কালের বৈশিষ্ট্য ছিল 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্য এবং বিশ্বব্যাপী হত্যাকাণ্ড।' পারস্য, আফগানিস্থান এবং মেসোপটেমিয়া অধিকার করিয়া অদ্বিতীয় নির্মম যোদ্ধা রূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার ভারত আক্রমণের অজুহাত ছিল পৌত্তলিকতার প্রতি দিল্লীর সুলতানদের সহিষ্ণু মনোভাব; তবে সম্ভবতঃ দিল্লী লুণ্ঠন করাই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে হিন্দুস্থানকে অন্তর্ভুক্ত করিবার কোন পরিকল্পনা তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না।

১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া তৈমুর পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া অগ্রসর

হইতে থাকেন। মোঙ্গলদের অত্যাচার স্মরণ করাইয়া দিবার মত ধ্বংসের দৃশ্য পশ্চাতে রাখিয়া ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি দিল্লীর নিকটে উপনীত হইলেন। দিল্লী আক্রমণের পূর্বে তৈমুর তাঁহার শিবিরে বন্দী প্রায় ১,০০,০০০ হিন্দুকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন, কারণ তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যুদ্ধের দিনে 'তাহারা তাহাদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাদের শিবির লুণ্ঠন ও শত্রুপক্ষে যোগদান করিতে পারে'। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, এই আদেশ এত কঠোরভাবে পালন করা হইল যে জীবনে একটি ক্ষুদ্র পক্ষীও হত্যা করেন নাই এমন একজন ধার্মিক মৌলানা ১৫ জন হিন্দুকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স্থলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ আক্রমণকারীকে অতি দুর্বল ভাবে বাধা দিলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইল, স্থলতান গুজরাটে পলায়ন করিয়া বিদ্রোহী শাসনকর্তা জাফর খাঁর আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। তৈমুর দিল্লী অধিকার করিলেন। দিল্লীর উলেমাদের মধ্যস্থতায় রাজধানীর অধিবাসীগণের প্রাণনাশ না করিতে তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল ধনসম্পদের সন্ধানে যে অত্যাচার চালায় হিন্দুরা তাহাতে বাধা দিতে বাধ্য হয়, এবং বাধা পাইয়া আক্রমণকারীরা ব্যাপক-ভাবে হত্যাকাণ্ড শুরু করে। দিল্লী, সিরি, জাহানপনা এবং পুরাতন দিল্লী—এই চারিটি শহর কয়েক দিনের মধ্যেই শ্মশান হইয়া উঠে। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, 'হিন্দুদের স্তূপীকৃত ছিন্নমুণ্ড দ্বারা উচ্চ মঞ্চ নির্মিত হইল, তাহাদের দেহগুলি হইল ক্ষুধার্ত পশু ও পক্ষীর খাদ্য।…অধিবাসীদের মধ্যে যে কয়েকজন প্রাণে বাঁচিয়াছিল তাহারা বন্দী হইল।' আমরা আরও জানিতে পারি যে 'অন্ততঃপক্ষে কুড়ি জন ক্রীতদাস যাহার নাই (তৈমুরের সৈন্যদলে) এমন দরিদ্র কেহ ছিল না।' প্রভূত ধনসম্পদ ও বহুসংখ্যক বন্দীকে আক্রমণকারীদের দেশে লইয়া যাওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে বহু কারিগর ছিল। সমরকন্দে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণের জন্য কয়েকজন ভারতীয় রাজমিস্ত্রীকে তথায় প্রেরণ করা হয়।

দিল্লীতে সৈয়দ খিজির খাঁ তৈমুরের সহিত যোগদান করেন। ১৩৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে মুলতানের শাসনকর্তার পদ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত তিনি তৈমুরের সঙ্গে গিয়াছিলেন। ১৩৯৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথমেই তৈমুর দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন এবং মীরাট, কাংড়া ও জম্মু অধিকার করেন। এই অভিযানকালে নিশ্চয়ই বহু-সংখ্যক হিন্দুকে হত্যা করা হয়। খিজির খাঁ মুলতান, লাহোর ও দীপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। 'অপর যে কোন বিদেশী আক্রমণকারীর একবারের অভিযানে ভারতবর্ষ যত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করিয়া' ১৩৯৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে তৈমুর সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন। ফিরোজ শাহের শেষজীবনে দিল্লীর যতটুকু ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল তাহাও নষ্ট হইয়া গেল। স্থলতানী সাম্রাজ্য একটি ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হইল।

তুঘলুক বংশের অবসান

তৈমুর দিল্লীকে শ্মশান করিয়া রাখিয়া যান। বদায়ুনী বলেন, 'শহরটি সম্পূর্ণ-রূপে বিনষ্ট হয়। যে সকল অধিবাসী অবশিষ্ট ছিল তাহাদেরও মৃত্যু হয়, এবং পুরা দুই মাসের মধ্যে দিল্লীতে একটি পাখী উড়িতেও দেখা যায় নাই।' স্থলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ ১৪০১ খ্রীস্টাব্দে গুজরাট হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার অধিকার দিল্লী, রোটাক, সম্ভল ও দোয়াব অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁহার মৃত্যুর (১৪১২ খ্রীস্টাব্দ) পর ওমরাহগণ দৌলত খাঁ লোদী নামক একজন আফগান ওমরাহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া খিজির খাঁ দিল্লী অধিকার করেন।

স্থলতানী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

নাসিরউদ্দীন মামুদের মৃত্যুকালে দিল্লীর স্থলতানী রাজ্যের পরিধি এইরূপে বর্ণনা করা হইত: 'বিশ্বের অধিপতির শাসন দিল্লী হইতে পালাম (দিল্লীর নয় মাইল দূরবর্তী একটি ছোট শহর) পর্যন্ত বিস্তৃত।' মহম্মদ বিন তুঘলুকের শাসনকালের প্রথম দিকে সাম্রাজ্যের যে বিশাল আয়তন ছিল, তাহার সহিত ইহার তুলনা বেদনাদায়ক। মহম্মদের শাসনকালেই সাম্রাজ্যের ধ্বংস শুরু হয়। তাঁহার চরিত্র ও নীতি এজন্য অনেকাংশে-দায়ী ছিল। দোয়াব অঞ্চলে তাঁহার অত্যাচারী নীতি, নিদর্শক মুদ্রার প্রচলন, রাজধানী স্থানান্তরকরণ এবং খোরাসান আক্রমণের অর্থক্ষয়ী পরিকল্পনার ফলে স্থলতানী সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। তুর্কী সাম্রাজ্য ছিল প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরাচারের একটি পূর্ণ নিদর্শন, এবং স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষে একজন শক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন হয়। মহম্মদ দুর্বল ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক বিজ্ঞতার অভাব ছিল। ব্যবহারিক কার্যের অনুপযোগী শক্তি নিষ্ঠুর অত্যাচারের ক্ষমতায় পরিণত হইয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফিরোজ দৃঢ় ও দক্ষ শাসক হইলে হয়ত সাম্রাজ্যের ভাগ্য পুনরুদ্ধার করা যাইত; কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত ধর্মান্ধ। তিনি যুদ্ধকে ভয় করিতেন এবং অকারণে উদারতা প্রদর্শন করিতেন। ফিরোজের উত্তরাধিকারীগণ আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। এই ধরনের শাসকেরা বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের এবং তৈমুরের আক্রমণের আঘাত সহ্য করার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন।

কিন্তু সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কেবলমাত্র স্থলতানদের দোষ-ত্রুটিকেই দায়ী করা চলে না। মুসলমান ওমরাহগণ তাঁহাদের ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিষ্ঠ পূর্ব পুরুষদের ন্যায় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন না। তাঁহারা আরামপ্রিয় ও বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন; যুদ্ধ অপেক্ষা ষড়যন্ত্রেই তাঁহাদের দক্ষতা অধিক ছিল। ইহা লক্ষণীয় যে চতুর্দশ শতাব্দীতে কুতবউদ্দীন, ইলতুৎমিস, বলবন, আলাউদ্দীন, কাফুর ও গিয়াসউদ্দীন তুঘলুকের ন্যায় কোন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে নাই। ফিরোজ শাহ

তুঘলুকের রাজত্বকালে ক্রীতদাসের যে প্রভূত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তাহা মুসলমান রাষ্ট্র ও মুসলমান সমাজের অন্তর্নিহিত অসারতার পরিচয় দেয়। কিন্তু স্থলতানের প্রাসাদের ৪০,০০০ ক্রীতদাসের মধ্যে একজনও ইলতুৎমিস, বলবন বা কাফুর ছিলেন না।

তৃতীয়তঃ; সেই শিথিল পরিবহন-ব্যবস্থার যুগে একটি মাত্র কেন্দ্র হইতে শাসন করার পক্ষে সাম্রাজ্যের আয়তন অত্যন্ত বেশী বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণ ভারত জয় সামরিক কীর্তি হিসাবে অসামান্য; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা মারাত্মক ভ্রম রূপে প্রতিপন্ন হয়। আলাউদ্দীনের সময় হইতেই দিল্লীর অধীনতা হইতে মুক্তি-লাভের জন্য দাক্ষিণাত্যে প্রায় নিয়মিতভাবে বিদ্রোহ ঘটিতে থাকে; ফলে সাম্রাজ্যের বিশেষ শক্তিক্ষয় হয়।

চতুর্থতঃ, স্থলতানগণ একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। যে প্রতিভাবলে আকবর সফল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের কাহারও ছিল না। একটি অখণ্ড ও স্থসংহত সাম্রাজ্যে পরিণত না হইয়া এই সাম্রাজ্য বহু মুসলমান শাসনকর্তা ও হিন্দু সামন্ত রাজা কর্তৃক শাসিত কয়েকটি খণ্ড খণ্ড রাজ্যের সমষ্টি হইয়া রহিল। সামরিক বলপ্রয়োগ ব্যতীত ইহাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ রক্ষার অন্য কোন উপায় ছিল না।

পরিশেষে, হিন্দুদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ পরবর্তী কালে আওরঙ্গজেবের পক্ষে যেমন বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল, স্থলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষেও তদপেক্ষা কম বিপর্যয়কর হয় নাই। রাজপুতদের বশে আনিতে পারা যায় নাই। রণথম্ভোরের ন্যায় একটি দুর্গকে স্থায়ীভাবে আয়ত্তে আনিতে মুসলমানদের এক শতাব্দী সময় লাগিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরা মুসলমান শাসনকে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লয় নাই। রাজধানীর অদূরবর্তী দোয়াবের হিন্দুরা স্থানীয় সরকারী কর্মচারী অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা দেখিলেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। ইহার প্রধান কারণ এই যে স্থলতানী রাষ্ট্র হিন্দুদের সম্বন্ধে কোন স্থসমঞ্জস নীতি গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহাদের তুষ্টিসাধন এবং শাসনকার্যে তাহাদের অংশীদার করিয়া লইবার জন্য কিছুই করা হয় নাই; বরং ধনসম্পদ ও ধর্মের জন্য অনেক সময় তাহাদের নির্যাতন করা হইত। সময়ের প্রভাবে এবং স্বাভাবিক প্রতিবেশীস্থলভ যোগাযোগের ফলে রাজ্যজয়কালের তিক্ততা কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইলেও শাসকগণ প্রকৃতপক্ষে শত্রুভাবাপন্ন দেশে সামরিক শিবিরের মধ্যেই বাস করিতেন।

৪. সৈয়দ ও লোদী বংশ

খিজির খাঁ (১৪১৪-২১)

খিজির খাঁ নিজেকে সৈয়দ বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন, কিন্তু এই দাবির সত্যতা সন্দেহের অতীত ছিল না। দৌলত খাঁ লোদীর পরাজয়ের পরে দিল্লীর সিংহাসন

অধিকার করিলেও তিনি রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি তৈমুরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী শাহ রুখের প্রতিনিধি রূপে রাজ্যশাসন করিতেছেন বলিয়া দাবি করিতেন। সম্ভবতঃ শাহ রুখের নিকট তিনি কখনও কখনও কর প্রেরণ করিতেন। দোয়াব অঞ্চলে বিদ্রোহী হিন্দুদের দমন করার জন্য তিনি প্রায়ই অভিযান প্রেরণ করিতেন, কিন্তু যে সকল প্রদেশ সুলতানী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল সেগুলি পুনরধিকারের কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। তাঁহার অধিকার দিল্লী, দোয়াব ও পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ ছিল।

পরবর্তী সৈয়দগণ (১৪২১-৫১)

খিজির খাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করেন। তিনি তের বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু পাঞ্জাবের খোক্কর উপজাতি এবং কাতেহর, মেওয়াট ও দোয়াবের হিন্দুদের বিরুদ্ধে কয়েকবার অভিযান প্রেরণের কাহিনীতেই তাঁহার রাজত্বকালের ইতিহাস সীমাবদ্ধ। ১৪৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁহার উজীর সারওয়ার-উল-মুল্‌কের ষড়যন্ত্রে নিহত হন।

নূতন সুলতান মহম্মদ শাহ ছিলেন মুবারকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি অন্যান্য ওমরাহদের সাহায্যে সারওয়ার-উল-মুল্‌ককে হত্যা করেন। মালবের শাসক মামুদ খলজী দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু গুজরাটের আহম্মদ শাহ কর্তৃক তাঁহার রাজধানী আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি অবিলম্বে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। সিরহিন্দের আফগান শাসনকর্তা বহলুল লোদী মালবের সুলতানের বিরুদ্ধে মহম্মদকে সাহায্য করেন। এজন্য সুলতান তাঁহাকে 'খান-ই-খানান' উপাধি দেন এবং প্রকাশ্যে তাঁহাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করেন। কিন্তু বহলুল লোদী উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের অধিকাংশ অধিকার করেন এবং খোক্করগণ তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্য প্ররোচনা দেয়। দিল্লী আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হইয়া তিনি পশ্চাদপসরণ করেন। কিন্তু সুলতানের কর্তৃত্ব সর্বত্রই লঙ্ঘিত হইতে থাকে; 'দিল্লী হইতে কুড়ি ক্রোশ দূরে অবস্থানকারী আমীরগণও (সুলতানের) আনুগত্য অস্বীকার করিয়া বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন।'

১৪৪৩ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার অকর্মণ্য ও দুর্বলচরিত্র পুত্র আলাউদ্দীন আলম শাহ সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক উজীরের সাহায্যে ১৪৫১ খ্রীস্টাব্দে বহলুল লোদী দিল্লী অধিকার করেন। আলম শাহ ইতিপূর্বেই বদায়ুনে বসবাস করিতেছিলেন। তিনি বিনা বাধায় সিংহাসন ত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকাল (১৪৭৮ খ্রীস্টাব্দ) পর্যন্ত বদায়ুনে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

লোদী বংশ

লোদীগণ আফগানজাতীয় ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁহারা অনেকেই সুলতানী সাম্রাজ্যের সৈন্যদলে যোগ দেন। খলজী ও তুঘলুক আমলে কোন কোন আফগান ওমরাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'সদা আমীর'গণের মধ্যে এক প্রধান অংশ ছিলেন আফগান জাতীয়। ফিরোজ শাহ তুঘলুকের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক আফগান জমিদারের অভ্যুত্থান হয়। মূলতান ও সিরহিন্দে লোদী বংশীয় অনেকে বাস করিতেন।

আফগানদের শাসন-ব্যবস্থা ছিল গণতান্ত্রিক। সকল আফগানই সমমর্যাদা দাবি করিত; অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের জন্য তাহারা নিজেদের মধ্যে কাহাকেও রাজা বলিয়া অভিবাদন করিত না।

বহলুল লোদী (১৪৫১-৮৯)

বহলুল লোদী যখন পতনোন্মুখ সৈয়দ বংশকে সিংহাসনচ্যুত করেন, তখন সুলতানী রাজ্য একটি প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। পাঞ্জাবের বৃহত্তর অঞ্চলে বহলুলের নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। দোয়াব কার্যতঃ স্বাধীন দলপতিদের অধিকারে ছিল। অন্যান্য প্রদেশগুলি অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল।

বহলুল লোদী দক্ষ ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু বিগত যুগের দিল্লীর সুলতানের শক্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা যে অসম্ভব তাহা উপলব্ধি করিবার মত বাস্তব বুদ্ধি তাঁহার ছিল। স্বাধীন প্রদেশগুলিকে জয় করা অসম্ভব ছিল। বলবন রাজতন্ত্রের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাহা পুনঃপ্রবর্তন করাও সম্ভব ছিল না। উদ্ধত আফগান ওমরাহগণ সুলতানকে নিজেদের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন। বহলুলকে 'সমকক্ষদের মধ্যে প্রধানে'র (First among equals) মর্যাদাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন : 'সামাজিক সভাসমিতিতে তিনি কখনও সিংহাসনে বসিতেন না, ওমরাহগণকেও কখনও দণ্ডায়মান থাকিতে দিতেন না। এমন কি, রাজসভাতেও তিনি সিংহাসনে না বসিয়া গালিচার উপর বসিতেন। ···তাঁহারা (ওমরাহগণ) কখনও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তিনি তাঁহাদের শান্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তিনি নিজে তাঁহাদের গৃহে গিয়া কটিদেশ হইতে তরবারি খুলিয়া বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্মুখে রাখিতেন; এমন কি, তিনি অনেক সময় স্বীয় মস্তকাবরণ খুলিয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেন। সকল আমীর ও সৈন্যদের সহিত তিনি ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন।' এই নীতি দিল্লীর তুর্কী সুলতানদের চিরাচরিত প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত; স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রে রাজার ক্ষমতার যথার্থ ব্যবহারের সহিত ইহার সামঞ্জস্য ছিল না।

বহলুল মুলতানের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে জৌনপুরের সুলতান মামুদ শর্কী দিল্লী আক্রমণ করেন। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র বহলুল অবিলম্বে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মামুদ শাহকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করেন। এই বিজয়ের ফলে লোদী বংশের শাসন সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং নূতন সুলতানের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

শর্কীদের এই আক্রমণের ফলে বহলুল বুঝিতে পারিলেন যে দিল্লীর সিংহাসনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দোয়াব দখল রাখা এবং জৌনপুর অধিকার করা প্রয়োজন। কয়েকটি শাস্তিমূলক অভিযান করিয়া তিনি মেওয়াট ও দোয়াবের বিদ্রোহী নায়কদের দমন করিলেন। অতঃপর জৌনপুরের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হইল। সুলতান হোসেন শাহ শর্কী পরাজিত হইলেন এবং জৌনপুর দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিছুকাল পরে বহলুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র বারবক শাহকে এই নূতন প্রদেশের শাসনভার দেওয়া হয়। মেওয়াট, এটাওয়া ও গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালিত হয়।

সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)

বহলুল লোদীর মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র নিজাম খাঁ সিকন্দর লোদী নামে ১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জৌনপুরের শাসনকর্তা বারবক শাহ, জৌনপুরে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধীনতা মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। জৌনপুরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হইলে বারবক শাহ বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সিকন্দর তাঁহার হাতেই জৌনপুরের শাসনভার রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার উচ্চাভিলাষ দমনের জন্য কয়েকজন বিশ্বস্ত আফগান ওমরাহকে প্রদেশের শাসনকার্যে তাঁহার সহিত যুক্ত রাখা হইল। জৌনপুরের ক্ষমতাশালী জমিদারগণ বারবক শাহকে অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহার অকর্মণ্যতায় অসন্তুষ্ট হইয়া সিকন্দর তাঁহাকে বন্দী করিলেন। জমিদারগণকে দমন করিবার জন্য সিকন্দর স্বয়ং জৌনপুরে উপস্থিত হইলে তাহারা বহলুল লোদী কর্তৃক বিতাড়িত ভূতপূর্ব শর্কী সুলতান হোসেন শাহকে সিংহাসন পুনরধিকারের জন্য আমন্ত্রণ জানাইল। হোসেন শাহ তখন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। সিকন্দর লোদীর সৈন্যদল বিহার অধিকার করিল। অতঃপর তিনি বাংলা আক্রমণ করিলেন (১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দ), কিন্তু হোসেন শাহের সহিত এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আর যুদ্ধ হয় নাই। মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানের কোন কোন অংশও অধিকৃত হইল।

জৌনপুর অধিকার ও বিহার জয় সামরিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে কম

কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল না। পূর্ব দিকে সুলতানী রাজ্যের সীমা বাংলার পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইল। সিকন্দর শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বিদ্রোহ দমন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনেন। উদ্ধত আফগানদেরও তিনি অব্যাহতি দেন নাই। ওমরাহগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহারা সুলতানের সমকক্ষ নহেন, তাঁহার ভৃত্য মাত্র। শাসন-ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার প্রবর্তন না করিলেও তিনি হিসাবপত্রের যথাযথ পরীক্ষার উপর জোর দিতেন, এবং হিসাবের গরমিল ও তহবিল তছরূপের জন্য এরূপ কঠোর শাস্তি দিতেন যাহা ফিরোজ তুঘলুককে হয়ত হতচকিত করিয়া তুলিত। দক্ষ গুপ্তচর বাহিনীর সাহায্যে সুলতান সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং প্রজাদের মনোভাব সম্বন্ধে অবগত হইতেন। শস্য কর ও ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে জনসাধারণের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল।

কিন্তু এক বিষয়ে সিকন্দর লোদীর অনুসৃত নীতি রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক ছিল না। ফিরোজ তুঘলুকের ন্যায় তাঁহার মাতাও হিন্দু ছিলেন; তাঁহার ন্যায় তিনিও ধর্মান্ধতার বশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ কয়েকজন মুসলমানের সম্মুখে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ধর্ম ইসলাম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে; এই অপরাধে ব্রাহ্মণ প্রাণ হারান। মথুরার মন্দিরগুলি ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হইল। দেবদেবীদের মূর্তিগুলি মাংস ওজনের কাজে ব্যবহারের জন্য কসাইদের দেওয়া হইল। হিন্দুদের যমুনা নদীতে স্নান করিতে দেওয়া হইত না। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ক্ষৌরকার্য না করার জন্য নাপিতগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

দরিদ্র ও পণ্ডিতগণের প্রতি সিকন্দর লোদী সদাশয় ছিলেন। মুসলমান পণ্ডিত ও সাধুদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পাইল। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ করার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। তিনি নিজেও 'গুলরুখি' ছদ্মনামে ফার্সী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। শিল্পকলারও তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুঘলদের আমলে যে শহরটি ভারতের জাঁকজমকের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, সেই আগ্রা শহরটি তিনি স্থাপন করেন। ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে এটাওয়া, বেয়ানা, কোল (আলিগড়), গোয়ালিয়র এবং ঢোলপুরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান চালাইবার জন্য সুবিধাজনক ঘাঁটি হিসাবে শহরটির পত্তন করা হয়। সিকন্দর লোদী তাঁহার শেষ জীবনে প্রায়ই আগ্রায় বাস করিতেন।

ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬)

সিকন্দর লোদীর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইব্রাহিম লোদী যতটা অত্যাচারী বা অযোগ্য ছিলেন, তদপেক্ষা অধিক ছিলেন বুদ্ধিহীন। আফগান ওমরাহগণ মনে করিতেন যে তাঁহাদের জায়গীরগুলি নিজেদের আইনসম্মত সম্পত্তি, এবং সেগুলি

'সুলতানের অনুগ্রহ বা দাক্ষিণ্যের পরিবর্তে নিজ তরবারির শক্তি দ্বারা অর্জিত।' ইব্রাহিম তাঁহাদের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফিরিস্তা বলেন, 'তাঁহার পিতামহ ও পিতার অনুসৃত নীতির পরিবর্তন করিয়া তিনি নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ও অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করিতেন না। আবার তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন যে রাজার কোন আত্মীয়স্বজন বা জ্ঞাতি থাকা উচিত নহে, সকল ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রের প্রজা ও ভৃত্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যে সকল আফগান ওমরাহ এতকাল সুলতানের সম্মুখে বসিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদিগকে যুক্ত করে সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত।' এই গর্বিত রাজা সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে স্বৈরাচারী রাজশক্তির অধিকারের সহিত আদর্শহীন ও অতি শক্তিশালী অভিজাত সম্প্রদায়ের দাবীর সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব, এবং এজন্য চেষ্টা করিলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে। তিনি রাজশক্তিকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি চরিত্রবলে অথবা সম্পদে বলবন বা আলাউদ্দীনের সমকক্ষ ছিলেন না; ওমরাহগণকে সম্পূর্ণ ভাবে সুলতানের কর্তৃত্বাধীন করিতে হইলে যে শক্তি প্রয়োজন তাহা তাঁহার ছিল না। দীর্ঘকাল বিশেষ মর্যাদা ভোগে অভ্যস্ত ওমরাহগণ বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহাদের অতিরঞ্জিত দাবীগুলি এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি ধ্বংস হইয়া উভয়েরই দোষগুলি প্রাধান্য পাইতেছে। ফলে ইব্রাহিম লোদী ও ওমরাহ-গণের মধ্যে তিক্ত বিরোধ শুরু হইল।

শাসন-ব্যবস্থার অবনতি এবং দুর্নীতির প্রসারের ফলে লোদী শাসনের পতন ত্বরান্বিত হইল। 'আদি গ্রন্থে'র অন্তর্ভুক্ত গুরু নানক রচিত কয়েকটি গাথায় এই অব্যবস্থা ও দুর্নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সিকন্দর লোদী এবং ইব্রাহিম লোদীর সমসাময়িক ছিলেন।

ইব্রাহিম কয়েকজন বিশিষ্ট ওমরাহকে শাস্তি দিয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিলেন। এক গুরুতর বিদ্রোহ দেখা দিলে সুলতানের সৈন্যদল বিদ্রোহ দমন করিল। অতঃপর মেবারের পরাক্রান্ত রাণা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করা হইল, কিন্তু তিনি বীরত্বের সহিত নিজ রাজ্য রক্ষা করিলেন। ওমরাহদের অসন্তোষ ক্রমে চরমে আসিয়া পৌঁছিল। দৌলত খাঁ লোদী বাবরকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হইলেন। দিল্লীতে সুলতানী আমলের অবসান ঘটিল। মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ

১. উত্তর ভারত

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নানা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সকল রাজ্যের প্রতিটিরই নিজস্ব ইতিহাস ছিল।

কাশ্মীর (১৩৩৯-১৫৮৮)

কাশ্মীর উপত্যকা কখনও দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তবে শাহ মীর নামক একজন ভাগ্যান্বেষী তথায় হিন্দু শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। ১৩৩৯ খ্রীস্টাব্দে শাম্‌স্‌উদ্দীন শাহ নাম লইয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অন্যতম উত্তরাধিকারী শিহাবউদ্দীন (১৩৫৬-৭৪) সফল যোদ্ধা এবং দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। সিকন্দর (১৩৮৯-১৪১৩) ছিলেন নিষ্ঠুর অত্যাচারী ও পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী। কাশ্মীরের হিন্দুগণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও নির্বাসন, ইহাদের যে কোনটি বাছিয়া লইতে বলা হইল। প্রসিদ্ধ মার্তণ্ড মন্দির সহ বহু মন্দির ধ্বংস করা হইল। কিন্তু জয়নাল আবেদীন (১৪২০-৭০) ছিলেন আকবরের ন্যায় উদারপন্থী। তিনি নির্বাসিত বহু হিন্দুকে ফিরাইয়া আনেন এবং বহু ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে পুনরায় পৈতৃক ধর্ম গ্রহণের অনুমতি দেন। তিনি উদার শাসক, বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার আনুকূল্যে মহাভারত ও 'রাজতরঙ্গিণী' সংস্কৃত হইতে ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে স্বাধীন কাশ্মীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির শীর্ষে উঠিয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ 'ক্ষমতাশালী দল ও ওমরাহগণ কর্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ও বিতাড়িত হইয়া ক্রীড়নকে পরিণত হন।'

১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে শাহ মীরের রাজবংশের পতন ঘটে, এবং চক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গাজী শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশের শেষ শাসক ১৫৮৮ খ্রীস্টাব্দে আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন।

জৌনপুর (১৩৯৪-১৪৭৯)

১৩৫৯ খ্রীস্টাব্দে ফিরোজ তুঘলুক মহম্মদ বিন তুঘলুক বা জৌনা খাঁর নামানুসারে জৌনপুর শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। শহরটির ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ইহা

বাংলা ও উড়িষ্যা আক্রমণের জন্য যাত্রাকেন্দ্র রূপে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তুঘলুক বংশের শেষ সুলতানের শাসনকালে মালিক সারওয়ার জৌনপুরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৩৯৪ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার অধিকার পশ্চিমে আলিগড় পর্যন্ত প্রসারিত হয়; পূর্ব দিকে তিরহুত তাঁহার অধীনে আসে। উত্তরে তাঁহার রাজ্য নেপালের সীমান্ত পর্যন্ত, এবং দক্ষিণে উজ্জয়িনী পর্যন্ত, প্রসারিত ছিল। তুঘলুক বংশের এক সুলতান তাঁহাকে 'সুলতান-ই-শর্ক' (পূর্বাঞ্চলের অধিপতি) উপাধি দেন বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য 'শর্কী' রাজ্য বলিয়া পরিচিত। ৮৫ বৎসর (১৩৯৪-১৪৭৯) কাল এই রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।

ইব্রাহিম শাহ (১৪০১-৪০) সংস্কৃতিবান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি কনৌজ অধিকার করেন, দিল্লী আক্রমণ করেন, এবং বাংলার রাজা গণেশকে তাঁহার ইসলাম ধর্মবিরোধিতার জন্য শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে বাংলা আক্রমণ করেন। তাঁহার পুত্র মামুদ শাহ মালব ও দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ (১৪৫৮-৭৯) উড়িষ্যার বিরুদ্ধে এক সফল অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু বহলুল লোদী তাঁহাকে পরাজিত করিয়া জৌনপুর অধিকার করেন। অতঃপর জৌনপুর দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শর্কী বংশের শাসনাধীনে জৌনপুর মুসলমান শিল্প ও বিদ্যাচর্চার প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হইয়া 'ভারতের শিরাজ' নামে পরিচিত হয়। (পারস্য দেশে শিরাজ শহর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র রূপে খ্যাত ছিল।)

মালব (১৪০১-২-১৫৬১)

দিলাবর খাঁ ঘোরী নামে একজন আফগান তুঘলুক বংশের শেষ সুলতানদের অধীনে মালবের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৪০১-২ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বাধীন মালব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধার তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র হোসাঙ্গ শাহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুজরাটের প্রথম মুজঃফর শাহ একবার তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। পরে তিনি দুই বার গুজরাটের বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান ও এক বার উড়িষ্যার বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সামরিক প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। তিনি মাণ্ডুতে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে খলজীগণ সিংহাসন অধিকার করেন।

প্রথম মামুদ খলজী গুজরাটের প্রথম আহম্মদ শাহের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্য তিনি একবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তিনি মেবারের পরাক্রান্ত রাণা কুম্ভের বিরুদ্ধে বারংবার যুদ্ধ করেন। বাহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন। মিশরের নামেমাত্র খলিফার নিকট হইতে তিনি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মালবের সুলতান-

গণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন, এবং তাঁহার রাজত্বকালেই এই রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি হয়। তিনি সতর্ক প্রশাসক ছিলেন, এবং কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন।

এই বংশের শেষ শাসক দ্বিতীয় মামুদ খলজী (১৫১১-৩১ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন দুর্বল এবং রাজপুত নায়কদের উপর নির্ভরশীল। মেবারের পরাক্রমশালী রাণা সংগ্রাম সিংহ তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। ১৫৩১ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের বাহাদুর শাহ মালব অধিকার করেন।

চার বৎসর পরে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন মালব অধিকার করেন, কিন্তু তাঁহার দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পর খলজী বংশের একজন ভূতপূর্ব কর্মচারী, মল্লু খাঁ, মাণ্ডুতে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করেন। ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে শের শাহ মালব অধিকার করিয়াছিলেন। ইসলাম খাঁ সুরের অধীনে সুজায়েৎ খাঁ মালবের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার পুত্র বাজ বাহাদুরকে পরাজিত করিয়া আকবর মালব অধিকার করেন। ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে মালব মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত হয়।

গুজরাট (১৩৯৭-১৫৭৩)

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের পরে যে সকল প্রাদেশিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সমৃদ্ধ গুজরাট প্রদেশের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাফর খাঁ ১৩৯১ খ্রীস্টাব্দ হইতে গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন এক ধর্মান্তরিত রাজপুতের পুত্র। ১৩৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। ১৪০৭-৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি সুলতান মুজঃফর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। মালবের হোসাঙ্গ শাহকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া তিনি কিছুকালের জন্য তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।

তাঁহার পৌত্র আহম্মদ শাহ (১৪১১-৪২ খ্রীস্টাব্দ) মালব, খান্দেশ এবং ইদর, দুঙ্গরপুর, ঝালোয়ার, কোটা ও বুন্দী প্রভৃতি কয়েকটি রাজপুত রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি আহম্মদাবাদ শহর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন চৌলুক্য রাজগণের রাজধানী অনহিলবাড়া হইতে এই শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই নূতন শহরের স্থাপত্যে জৈন ও মুসলমান রীতির মিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সম্ভবতঃ মামুদ শাহ (১৪৫৯-১৫১১ খ্রীস্টাব্দ)। ইনি সচরাচর 'বেগাড়া' (দুই দুর্গের অধিপতি) বলিয়া পরিচিত, কারণ ইনি রাজপুতদের অধিকৃত গিরনার ও চম্পানেরের শক্তিশালী দুর্গ দুইটি জয় করিয়াছিলেন। তিনি মালবের প্রথম মামুদ খলজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি জুনাগড় ও চৌল বন্দর জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে খান্দেশ, পূর্বে মাণ্ডু ও উত্তরে রাজস্থানের অন্তর্গত জালোর ও

-নাগোর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাঁহার অধীনে গুজরাট রাজ্যের সর্বাধিক প্রসার হয়। ১৫০৮ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের সৈন্যবাহিনী মিশরের সুলতানের প্রেরিত নৌবাহিনীর সাহায্যে চৌল বন্দরে পর্তুগীজদের একটি নৌবাহিনীকে পরাজিত করে। এই জয়ে কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজ রাজ-প্রতিনিধি দিউ বন্দরে গুজরাটের সৈন্যবাহিনী এবং তাহাদের মিত্রপক্ষ মিশরের নৌবাহিনীকে পরাজিত করেন। দিউতে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের স্থান দিয়া মামুদ পর্তুগীজদের সহিত সন্ধি করেন।

দ্বিতীয় মুজঃফর শাহ (১৫১১-২৬ খ্রীস্টাব্দ) বেগাড়ার পরে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি মালবের দ্বিতীয় মামুদ খলজীর মিত্ররূপে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই রাজপুত রাজ্যের সহিত শত্রুতার নীতি বাহাদুর শাহের (১৫২৬-৩৭ খ্রীস্টাব্দ) সময়েও অনুসৃত হয়। সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পরে তিনি চিতোর অধিকার করেন। বাহাদুর শাহ দাক্ষিণাত্যেও অভিযান প্রেরণ এবং মালব জয় করেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষ দিকে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন গুজরাট আক্রমণ করিয়া এই রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করেন; কিন্তু পূর্ব ভারতে শের শাহের অভ্যুত্থানের ফলে তাঁহার ক্ষমতা বিনষ্ট করার জন্য গুজরাট হইতে তিনি পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। বাহাদুর শাহ ছিলেন গুজরাটের শেষ পরাক্রান্ত স্বাধীন শাসক। পর্তুগীজগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অবাধ্য আমীরদের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। দিউ হইতে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করার জন্য কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে আকবর গুজরাট জয় করেন।

রাজস্থানের রাজ্যসমূহ

আলাউদ্দীন খলজী কর্তৃক চিতোর জয়ের কয়েক বৎসর পরে, তাঁহার রাজত্বকালের শেষ দিকে, সম্ভবতঃ হাম্মির (১৩২৬-৬৪ খ্রীস্টাব্দ) মেবারে গুহিলোত বংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাণা কুম্ভের (১৪৩৮-৬৮ খ্রীস্টাব্দ) অধীনে চিতোর একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তিনি বারংবার মালব ও গুজরাটের সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাঁহার সাফল্যের স্মারক রূপে চিতোরে একটি বিশাল স্তম্ভ নির্মাণ করেন। তিনি বহু মন্দির ও দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত এবং বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাণা সংগ্রাম সিংহ বা সঙ্গের রাজত্বকালে (১৫০৯-২৮ খ্রীস্টাব্দ) মেবারের প্রতিপত্তি শীর্ষস্থানে পৌঁছায়। মালব ও গুজরাটের সুলতানদের সহিত যুদ্ধে তিনি সফল হইয়াছিলেন। তিনি মালবের দ্বিতীয় মামুদ খলজীকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াও উদারতাবশতঃ তাঁহাকে তাঁহার সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করেন। ইব্রাহিম লোদীর প্রেরিত এক অভিযান তিনি প্রতিহত করেন, কিন্তু বাবরকে পরাজিত করার চেষ্টা

করিয়া তিনি ভীষণ ভাবে পরাজিত হন (খানুয়ার যুদ্ধ, ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দ)। মুঘলদের সহিত মেবারের যুদ্ধ ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। অতঃপর রাণা অমর সিংহ জাহাঙ্গীরের সহিত সন্ধি করেন।

রাঠোর বংশীয় রাজপুতগণ মারবাড় (বা যোধপুর) ও বিকানীর রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহারা অতি প্রাচীন বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন। টডের মতে কনৌজের গাহড়বালদিগের সহিত রাঠোরগণের সম্পর্ক ছিল। মারবাড়ের আধুনিক ইতিহাস শুরু হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে চুণ্ডার শাসনকাল (১৩৮৪-১৪২৩ খ্রীস্টাব্দ) হইতে। তাঁহার উত্তরাধিকারী যোধা (১৪৩৮-৮৯ খ্রীস্টাব্দ) মান্দোর দুর্গ ও যোধপুর শহর নির্মাণ করেন। মারবাড়ের প্রতিপত্তি সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় শের শাহের প্রতিদ্বন্দ্বী মালদেবের রাজত্বকালে (১৫৩২-৬৩ খ্রীস্টাব্দ)। বিকা বিকানীর শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মারবাড়ের রাজবংশের একটি কনিষ্ঠ শাখার বংশধর ছিলেন।

অম্বর (বা জয়পুর) রাজ্যের কচ্ছপঘাত (বা কচ্ছোয়া) শাসকগণ সূর্যবংশীয় বলিয়া দাবি করেন। টডের মতে দশম শতাব্দীতে অম্বর রাজ্যের পত্তন হয়। সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে এই রাজ্যটি কিছুটা রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে; কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত নিজেদের যুক্ত না করা পর্যন্ত অম্বরের রাজগণ প্রাধান্য লাভ করেন নাই। ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে অম্বররাজ বিহারীমল আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

মধ্য যুগের রাজপুত রাজ্যগুলির রাজনৈতিক ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের সাধারণতঃ সামন্ত প্রথার (Feudalism) নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা হয়। *Annals and Antiquities of Rajasthan* নামক গ্রন্থ রচয়িতা টড রাজস্থানে মধ্য যুগীয় ইয়োরোপের সামন্ত প্রথার অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত। মধ্য যুগে ইয়োরোপীয় সামন্ত ব্যবস্থার ভিত্তিতে ছিল এই ধারণা যে রাজাই জমির একমাত্র মালিক এবং তিনি তাঁহার সামন্তগণকে শর্তাধীনে ভূমি দান করেন। মধ্যযুগীয় রাজস্থানে জমির মালিক ছিল সমগ্র গোষ্ঠী (clan)। গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন রাজা, কিন্তু ভূমির উপর একক ভাবে তাঁহার কোন স্বত্ব ছিল না। যেমন, মেবারের ভূমির মালিক ছিল গুহিলোত গোষ্ঠী, এবং মারোয়াড়ে ভূমির মালিক ছিল রাঠোর গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর প্রধান রূপে শাসক বা রাজা ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিলেন। রাজা এবং গোষ্ঠীর প্রধান সদস্যেরা নিজ নিজ বংশগত অধিকারে ভূমির স্বত্ব পাইতেন, রাজার অনুগ্রহে নহে। প্রত্যেকের ভূমি ছিল তাঁহার 'বাপোতা', পিতৃ-পিতামহের সম্পত্তি। গোষ্ঠীর প্রধানেরা নির্দিষ্ট সুবিধার কতকগুলি অধিকারী ছিলেন,

এবং রাজার প্রতি কিছু দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকিতেন। তাঁহারা নিজেদের অধিকারভুক্ত ভূমি অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন।

গোষ্ঠী প্রথার ভিত্তিতে প্রতিটি রাজপুত রাজ্যে ভূমির বিভাগ করা হইত। ইহা ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সংগঠনের ভিত্তি। শাসক গোষ্ঠী সমাজে প্রাধান্য পাইত; তাহাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি। ব্যবসা-বাণিজ্য রাজপুত ভিন্ন অন্য জাতীয় অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। যুদ্ধের সময়ে শাসক প্রধানতঃ গোষ্ঠী প্রধানদের দ্বারা সংগৃহীত ও পরিচালিত সৈন্যদের উপর নির্ভর করিতেন।

বাংলা

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের অধীনে বাংলা একটি স্বাধীন সুলতানী রাজ্যে পরিণত হয়। ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭ খ্রীস্টাব্দ) এবং সিকন্দর শাহ (১৩৫৭-৮৯ খ্রীস্টাব্দ) ফিরোজ তুঘলুকের আক্রমণ প্রতিহত করেন। সিকন্দর শাহের রাজত্বকাল ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন দক্ষ ও দয়ালু শাসক। তিনি চীনদেশে দূত প্রেরণ করেন। প্রসিদ্ধ কবি হাফিজের সহিত তাঁহার পত্রালাপ ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলে রাজা গণেশ নামে উত্তর বঙ্গের এক ব্রাহ্মণ জমিদার অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, এবং শেষ পর্যন্ত সিংহাসন অধিকার করেন। কোন কোন লেখকের মতে তিনি দুই জন নামসর্বস্ব সুলতানের প্রতিনিধি রাজ্যশাসন করিতেন। বাংলায় হিন্দু শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিরক্ত হইয়া নুর কুতব-উল-আলম নামে এক প্রভাবশালী ফকির অন্যায়ভাবে সিংহাসন অপহরণকারীকে শাস্তি দিবার জন্য জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ শর্কীকে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু এই অভিযানের ফলে গণেশকে অপসারণ করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার পুত্র যদু। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ (১৪১৮-৩১ খ্রীস্টাব্দ) নামে পরিচিত হন। তিনি রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন। চীনদেশের সহিত তাঁহার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলে রাজা গণেশের বংশ লুপ্ত হয় এবং ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় (১৪৪২ খ্রীস্টাব্দ)। রুকনউদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৪ খ্রীস্টাব্দ) কামরূপ ও উড়িষ্যার রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে হাবসী ক্রীতদাসগণ রাজধানী গৌড়ে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে; ফলে অনিবার্য রূপে অরাজকতা ও কুশাসন দেখা দেয়।

সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ) হাবসীদের ক্ষমতা চূর্ণ করেন। তাঁহাকে মধ্য যুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ শাসক বলিয়া অভিহিত করা

যায়। স্বীয় রাজ্য হইতে বহলুল লোদী কর্তৃক বিতাড়িত জৌনপুরের হোসেন শাহকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন। হোসেন শাহ উড়িষ্যা ও কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি যে ভূখণ্ড জয় করিয়াছিলেন তাহার সীমা সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় না। কেবলমাত্র ইহাই জানা যায় যে 'উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের সামন্ত রাজগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন', এবং তাঁহার রাজত্বকালে কোথাও বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান ঘটে নাই। তিনি প্রজারঞ্জক শাসক এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন।

হোসেন শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২ খ্রীস্টাব্দ) দক্ষ ও পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। বাবরের আত্মজীবনীতে তিনি শক্তিশালী সৈন্য-বাহিনীর অধিনায়ক পাঁচ জন পরাক্রান্ত মুসলমান রাজার অন্যতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি তিরহুত অধিকার করেন। পানিপথের যুদ্ধের পর দিল্লীত্যাগী বহু আফগানকে তিনি আশ্রয় দেন। গুজরাটের বাহাদুর শাহের সহিত তিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পর্তুগীজরা বাংলায় প্রথম পদার্পণ করে। তিনি শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

নসরৎ শাহের উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ (১৫৩৩-৩৮ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন শাসক। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলা হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে শের শাহ গৌড় অধিকার করেন।

উড়িষ্যা

১৪৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যা পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গগণের (Eastern Gangas) শাসনাধীন ছিল। কিন্তু ১২৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম নরসিংহের মৃত্যুর পরে এই রাজবংশের গৌরবের যুগ শেষ হয়। দিল্লীর জৌনা খাঁ (মহম্মদ বিন তুঘলুক) এবং ফিরোজ তুঘলুক উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িষ্যা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জৌনপুর ও মালবের শাসকগণও উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। উড়িষ্যার রাজগণকে কোণ্ডবীড়ুর রেড্ডিগণ এবং ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার অধিকারী বিজয়নগর সাম্রাজ্যের আক্রমণও প্রতিরোধ করিতে হইয়াছিল।

১৪৩৫ খ্রীস্টাব্দে সূর্যবংশী বা গজপতি রাজবংশ গঙ্গ বংশকে অপসারিত করে। এই নূতন রাজবংশের প্রথম শাসক কপিলেন্দ্র (১৪৩৫-৬৭ খ্রীস্টাব্দ) সেই যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হিন্দু রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব উত্তরে দক্ষিণ গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান শত্রু ছিলেন বাংলার মুসলমান শাসক এবং বাহমনী সুলতানগণ। এই বংশের শেষ ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭-১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ)।

বাংলার সুলতান হোসেন শাহ এবং বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় তাঁহাকে পরাজিত করেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তক চৈতন্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য পূর্ব ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে তাঁহার নাম অমর হইয়া রহিয়াছে।

১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে ভোই রাজবংশ উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করে। ১৫৫৯ খ্রীস্টাব্দে মুকুন্দ হরিচন্দন এই বংশের উচ্ছেদ করেন। ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার অধিপতি সুলেমান কররানী উড়িষ্যাকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আকবরের রাজত্বকালে, ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে, উড়িষ্যা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আসাম

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কামরূপের হিন্দু রাজ্যের ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত; তবে বঙ্গদেশ হইতে মুসলমান আক্রমণের কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। আসামের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর বঙ্গের কোন কোন অঞ্চল লইয়া গঠিত কামতা রাজ্য আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময়ে বাংলার সুলতানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিশ্ব সিংহ এই রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উহা কোচবিহার নামে পরিচিত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আহোমগণ উত্তর ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া উহার পূর্বাঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুকাফা। সুখংফা কামতার সহিত যুদ্ধ করিয়া পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুদংফার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম আহোম সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। সুহুংমুং (১৪৯৭-১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দ) 'স্বর্গ-নারায়ণ' এই হিন্দু নাম গ্রহণ করেন। তিনি আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেন এবং তাঁহার উপজাতীয় প্রতিবেশীদের পরাজিত করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে আহোম রাজ্য মুঘল আক্রমণের সম্মুখীন হয়।

আহোমগণের নিজস্ব ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন ছিল। তাহারা ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বহু সামাজিক আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে।

'বুরঞ্জি' নামে পরিচিত আহোমদের ঐতিহাসিক বিবরণীগুলি হইতে তাহাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় এই জাতীয় বিবরণী রচিত হয় নাই।

২. দক্ষিণ ভারত

দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ভূগোল

মহম্মদ বিন তুঘলুকের রাজত্বকালের শেষ দিকে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের ফলে দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। যাদব, কাকতীয়, হোয়সাল ও পাণ্ড্য রাজ্য লুপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণা নদীর উত্তরে বাহমনী রাজ্য ও দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য এই শূন্য স্থান পূর্ণ করিল। উত্তর-পশ্চিমে খান্দেশের মুসলমান রাজ্য, এবং উত্তর-পূর্বে উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্য স্বতন্ত্র রহিল। দক্ষিণ-পূর্বে মাদুরার মুসলমান সুলতানী রাজ্য (মাবর) অপেক্ষাকৃত অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

সপ্তম শতাব্দী হইতে আরবগণ পশ্চিম উপকূলে বসতি স্থাপন করে এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে থাকে। আলাউদ্দীন খলজী ও মহম্মদ বিন তুঘলুকের বিজয় অভিযান, এবং দেবগিরিতে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্যতম রাজধানী স্থাপনের ফলে দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র হিন্দুগণ ইসলাম ধর্মের প্রভাবে আসিল। কিন্তু হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রহিল। বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি অংশতঃ মুসলমানগণের রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার ও ইসলাম ধর্মের প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।

বাহমনী রাজ্য ও তাহার উত্তরাধিকারী পঞ্চ রাজ্যের (বিজাপুর, আহম্মদ-নগর, গোলকুণ্ডা, বেরার, বিদর) সহিত বিজয়নগর রাজ্যের সুদীর্ঘ সংগ্রাম কেবল-মাত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দুই রাজ্যের মধ্যে ধর্মীয় সংগ্রাম নহে। বাহমনী সুলতান-গণ দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত (মাদুরা) পর্যন্ত অগ্রসর হইতে চাহিতেছিলেন। বিজয়নগরের রাজগণ তুঙ্গভদ্রার দিকে বাহমনী সুলতানের অগ্রগতিতে বাধাদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী সমৃদ্ধ রায়চুর দোয়াব ছিল এই সংগ্রামের কেন্দ্র। ইহা ছিল রাজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পদের জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কোন পক্ষই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থায়ী সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাটগণ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করেন।

খান্দেশ

খান্দেশ রাজ্য তাপ্তী নদীর উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। গুরুত্বপূর্ণ শহর বুরহানপুর এবং দুর্ভেদ্য দুর্গ আসীরগড় খান্দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফিরোজ তুঘলুকের মৃত্যুর পরে খান্দেশের শাসনকর্তা মালিক রাজা ফারুখি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। খান্দেশের সুলতানদের সহিত গুজরাট ও বাহমনী সুলতানের বহুবার যুদ্ধ হয়। ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে আসীরগড় দুর্গ আকবরের অধিকারে আসে এবং খান্দেশ মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

বাহমনী রাজ্য : গুলবর্গার যুগ

মহম্মদ বিন তুঘলুকের রাজত্বকালে সদা-আমীরগণ ইসমাইল মুখকে দেবগিরির স্থলতান নির্বাচিত করিয়াছিলেন। তিনি সাহসী সৈনিক হাসানের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। হাসান আবুল মুজঃফর আলাউদ্দীন বাহমন শাহ নাম লইয়া ১৩৪৭ খ্রীস্টাব্দে তথাকথিত বাহমনী রাজ্য স্থাপন করেন। গঙ্গু নামে একজন ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর সহিত হাসানের সম্পর্কের যে কাহিনী ঐতিহাসিক ফিরিস্তা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। হাসান পারস্যের রাজবংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন, এবং তাঁহার 'বাহমন শাহ' উপাধি গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই দাবি প্রতিষ্ঠা করা। তিনি গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করেন। প্রায় ১৪২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গুলবর্গা বাহমনী রাজ্যের রাজধানী ছিল।

মহম্মদ বিন তুঘলুকের মৃত্যুর পরে হাসান নিরাপদে রাজ্যের বিস্তার ও সংহতি সাধনে মনোযোগ দিতে সক্ষম হইলেন, কারণ দাক্ষিণাত্য জয়ের চেষ্টা করার ইচ্ছা ফিরোজ তুঘলুকের ছিল না। গোয়া, দাভোল, কোহলাপুর ও তেলেঙ্গানা অধিকৃত হইল। হাসানের মৃত্যুকালে (১৩৫৮ খ্রীস্টাব্দে) তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে দৌলতাবাদ হইতে পূর্বে তেলেঙ্গানায় ভোনলির এবং বেনগঙ্গা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দাভোল বাহমনী রাজ্যের সামুদ্রিক বন্দরে পরিণত হয়।

হাসানের উত্তরাধিকারী প্রথম মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৩৫৮-৭৫ খ্রীস্টাব্দ) বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের সূচনা হয়। বিজয়নগরের প্রথম বুক্ক এবং তেলেঙ্গানার কাপায় নায়ক যথাক্রমে রায়চুর দোয়াব ও কৌথালের দুর্গ সমর্পণের দাবি জানাইয়া মহম্মদ শাহের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক কারণেই এই সংগ্রামের সূচনা হইয়াছিল ; কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তারের জন্য পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য (Western Chalukyas) ও চোলগণের মধ্যে, এবং যাদব ও হোয়সলদের মধ্যে, যে সংগ্রাম চলিয়াছিল, ইহা তাহারই অনুরূপ। প্রকৃতপক্ষে বাহমনী-বিজয়নগর প্রতিদ্বন্দ্বিতা 'হিন্দু যুগের দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে প্রাচীন অর্থনৈতিক সংগ্রামের পুনরাবৃত্তি মাত্র।'

কাপায় নায়ক বাহমনী স্থলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিয়া, এবং গোলকুণ্ডা ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। কৌথালের যুদ্ধে (১৩৬৬ খ্রীস্টাব্দ) বুক্কের পরাজয়ের পর তাঁহার রাজ্যে চার লক্ষের অধিক হিন্দুকে হত্যা করা হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বুক্ক রায়চুর দোয়াবের অধিকাংশ নিজ অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন।

প্রথম মহম্মদ শাহ দক্ষ শাসক ছিলেন। শাসন-সংস্কারের দ্বারা তিনি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ অপেক্ষাকৃত ঐক্যবিহীন রাজ্যকে সুসংহত করেন। তিনি সামরিক বাহিনীকেও পুনর্গঠিত করেন।

মহম্মদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুজাহিদ (১৩৭৫-৭৮ খ্রীস্টাব্দ) বিজয়নগরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালে তিনি রাজধানী বিজয়নগর এবং আদোনি অবরোধ করিয়াও অধিকার করিতে পারেন নাই। উর্বর রায়চুর দোয়াবের অধিকার লইয়াই যথারীতি বিরোধের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ (১৩৭৮-৯৭ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন শান্তিপ্রিয়; যুদ্ধ অপেক্ষা সাহিত্য ও বিজ্ঞানেই তাঁহার অধিক অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু গোয়া সহ পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে বাহমনী রাজ্যের এক বৃহদংশ সম্ভবতঃ বিজয়নগরের অধিকারভুক্ত হয়।

ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২ খ্রীস্টাব্দ) পুনরায় বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি প্রচুর মদ্যপান করিতেন এবং তাঁহার হারেমে বহু নারী ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সঙ্গীত, সাহিত্য ও দর্শনের অনুরাগী ছিলেন। তিন বার বিজয়নগর আক্রমণ করিয়াও তিনি স্থায়ী কোন লাভ করিতে পারেন নাই। ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরের দ্বিতীয় হরিহর এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া রায়চুর দোয়ার আক্রমণ করেন। কিন্তু জনৈক মুসলমান রাজকর্মচারীর কৌশলে হিন্দুদের শিবিরে গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং হরিহর পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন। ফিরোজ শাহের সহিত খান্দেশ, গুজরাট ও মালবের মুসলমান শাসকদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না; তাঁহারা বাহমনী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য বিজয়নগরের রাজগণকে প্ররোচিত করেন। ১৪০৬ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। মুদ্গলের এক স্বর্ণকারের সুন্দরী কন্যাকে প্রথম দেব রায় হস্তগত করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাই ছিল যুদ্ধের অজুহাত। বিজয়নগর শহর আক্রমণ ব্যর্থ হইল, ফিরোজ নিজে পরাজিত ও আহত হইলেন। কিন্তু বাহমনী রাজ্যের এক সেনাপতি তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করিলেন। প্রথম দেব রায় অপমানজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। তিনি তাঁহার এক কন্যাকে ফিরোজ শাহের হারেমে প্রেরণ করিলেন, বাঁকাপুর ছাড়িয়া দিলেন, এবং প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিলেন। ১৪১৭ খ্রীস্টাব্দে ফিরোজ তেলেঙ্গানা জয় করেন। ১৪২০ খ্রীস্টাব্দে আবার বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ হইল; হিন্দুরা ফিরোজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত করিল এবং রায়চুর দোয়ার পুনরধিকার করিল। শেষ জীবনে ফিরোজ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও দুর্বল হইয়া পড়েন।

বাহমনী রাজ্য : বিদরের যুগ

ফিরোজের ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী আহম্মদ শাহ (১৪২২-৩৬ খ্রীস্টাব্দ) বিদরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি নূতন উদ্যমে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিলেন। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে রাজার নেতৃত্বে এক বিশাল হিন্দু বাহিনী শিবির স্থাপন করিল; কিন্তু অতর্কিত আক্রমণের ফলে তাহারা

বিমূঢ় হইয়া পড়ে এবং রাজা বিজয়নগরে পলায়ন করেন। আহম্মদ শাহ নির্মম ভাবে বিজয়নগর রাজ্য বিধ্বস্ত করিলেন, হাজার হাজার নিরপরাধ বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করিলেন, এবং হিন্দুদের ধর্মে আঘাত করিতে পারে এরূপ কোন কাজই বাকি রাখিলেন না। অতঃপর বিজয়নগর শহর অবরুদ্ধ হইল। দ্বিতীয় দেব রায় কর প্রদান করিয়া সন্ধি করিলেন। আহম্মদ শাহ বরঙ্গলের দুর্গ অধিকার করিয়া কাকতীয় রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করেন। তিনি মালবের হোসাঙ্গ শাহকে পরাজিত করেন, খান্দেশের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, এবং গুজরাটের সুলতান আহম্মদ শাহের সহিত যুদ্ধ করেন।

আলাউদ্দীন আহম্মদ শাহ (১৪৩৬-৫৮ খ্রীস্টাব্দ) ১৪৩৬ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে এক সফল অভিযান পরিচালনা করেন। মুসলমানদের দ্বারা বারংবার পরাজিত হইয়া দ্বিতীয় দেব রায় সামরিক নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হন। তাঁহাকে বুঝানো হইল যে অশ্বারোহী বাহিনীর নৈপুণ্য ও ধনুর্বিদ্যায় দক্ষতাই মুসলমানদের সাফল্যের কারণ। তিনি মুসলমানদের সৈন্যদলে নিযুক্ত করিলেন, তাহাদের জায়গীর দিলেন এবং তাহাদের উপাসনার জন্য বিজয়নগরে একটি মসজিদ নির্মাণ করিলেন। এই নবগঠিত সৈন্যবাহিনী লইয়া ১৪৪৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করেন এবং কিছু প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু আলাউদ্দীন আহম্মদ তাঁহাকে সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিলেন। নিয়মিত কর প্রদানে তিনি স্বীকৃত হইলেন। আলাউদ্দীন আহম্মদ খান্দেশের সুলতানকেও পরাজিত করেন। কিন্তু উড়িষ্যার রাজা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণে কাঞ্চী পর্যন্ত অঞ্চলে নিজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন।

হুমায়ুন (১৪৫৮-৬১ খ্রীস্টাব্দ) দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে 'জালিম' বা অত্যাচারী বলিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার নাবালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী নিজাম শাহের রাজত্বকালে (১৪৬১-৬৩ খ্রীস্টাব্দে) উড়িষ্যার হিন্দু রাজা ও মালবের মামুদ খলজী কর্তৃক বাহমনী রাজ্য আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়।

মামুদ গাওয়ান

সুলতান মুজাহিদ পারসিক ও তুর্কীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার সময়ে ব্যাপকভাবে বিদেশী সৈন্য নিয়োগ শুরু হয়; ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শেষ পর্যন্ত বাহমনী রাজ্যের পতনের কারণ হইয়া উঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাহমনী রাজদরবার ষড়যন্ত্রের লীলাভূমি হইয়া উঠে। 'দক্ষিণী' এবং 'আফাকি'গণ (বিদেশী) পরস্পরবিরোধী দুই দলে বিভক্ত হইলেন। তাঁহারা 'পূর্ববর্তী' (Old-comers) ও 'নবাগত' (New-comers) বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। আহম্মদ শাহের রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম এই দুইটি দল সুস্পষ্টভাবে পৃথক হইয়া যায়

ধর্মীয় বিরোধের ফলে রাজনৈতিক বিরোধ আরও তিক্ত হয়; 'দক্ষিণী'গণ ছিলেন সুন্নী, কিন্তু বিদেশীরা অধিকাংশই ছিলেন শিয়া।

আলাউদ্দীন আহম্মদের রাজত্বকালে (১৪৩৬-৫৮ খ্রীস্টাব্দ) মামুদ গাওয়ান নামে পারসিক জাতীয় একজন 'নবাগত' ক্রমশঃ খ্যাতি অর্জন করেন। হুমায়ুনের অধীনে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন, এবং দ্বিতীয় মহম্মদ শাহের রাজত্বকালেও ঐ পদটি তাঁহার অধিকারে থাকে। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি প্রশাসক রূপে বিশ্বস্তভাবে রাষ্ট্রের সেবা করেন।

সামরিক দিক হইতেও তিনি কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি কোঙ্কনের হিন্দু নায়কগণকে বশীভূত করেন এবং গোয়া জয় করেন। তাঁহার শাসনকালে অন্ধ্রদেশ ও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালিত হয়। বিজয়নগর আক্রমণকালে প্রসিদ্ধ কাঞ্চী নগর লুণ্ঠিত হয়। বাহমনী রাজ্য পূর্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত হইল। গোয়া পর্যন্ত কোঙ্কন অঞ্চল এবং গোদাবরী-কৃষ্ণা দোয়াব অধিকার করিয়া রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষিত করা হইল। এই বিস্তৃত রাজ্য পূর্বেকার চারটি প্রদেশের পরিবর্তে আটটি প্রদেশে বিভক্ত হইল। রাজস্ব-সংস্কার প্রবর্তিত হইল। 'নবাগত' ও 'পূর্ববর্তী'গণের মধ্যে বোঝাপড়ার নীতি অনুসরণ করা হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রী' (একজন মুসলমান ঐতিহাসিকের ভাষায়) 'দক্ষিণী' প্রতিদ্বন্দ্বীদের ষড়যন্ত্র হইতে অব্যাহতি পান নাই। তাঁহারা মামুদ গাওয়ানের বিরুদ্ধে তৃতীয় মহম্মদ শাহের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিলে তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ড দেন (১৪৮১ খ্রীস্টাব্দ)। 'তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের সকল সংহতি ও শক্তি তিরোহিত হয়'।

মামুদ গাওয়ান সরল জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ধর্মীয় আচার নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। বিদরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার জন্য তিনি একটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি সেই যুগের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই; তিনি হিন্দুদের নির্যাতন করিতেন।

বাহমনী রাজ্যের পতন

এই দক্ষ মন্ত্রীর হত্যার পরে বাহমনী রাজ্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার নিয়ন্ত্রণের অবসান হওয়ার পরে এমন আর কেহ ছিল না যে এই অন্তঃকলহে জর্জর রাজ্যের পতন রোধ করিতে পারে। তৃতীয় মহম্মদের উত্তরাধিকারী মামুদ শাহ (১৪৮২-১৫১৮ খ্রীস্টাব্দ) অকর্মণ্য ছিলেন। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন। ইউসুফ আদিল শাহ বিজাপুরে আদিল শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৪৯০ খ্রীস্টাব্দ)। আহম্মদ নিজাম শাহ আহম্মদনগরে নিজাম শাহী বংশ

স্থাপন করিলেন (১৪৯০ খ্রীস্টাব্দ)। ফতুল্লা ইমাদ শাহ বেরারে ইমাদ শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৪৯০ খ্রীস্টাব্দ)। কুলি কুতব শাহ গোলকুণ্ডায় কুতব শাহী রাজবংশ স্থাপন করিলেন (১৫১২ খ্রীস্টাব্দ)। বাহমনী রাজ্য বিদরে সীমাবদ্ধ রহিল ; ইহার প্রকৃত শাসক ছিলেন কাসিম বারিদ নামে একজন অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী প্রধানমন্ত্রী। ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দে, বাহমনী রাজ্যের শেষ সুলতান কলিমুল্লা বিজাপুরে পলায়ন করিলেন। তখন তাঁহার ক্ষমতাশালী মন্ত্রী, কাসিম বারিদের পুত্র আমীর বারিদ, বিদরে বারিদ শাহী রাজবংশ স্থাপন করিলেন। এইরূপে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাহমনী রাজ্যের পতন হইল।

বাহমনী রাজ্য : শাসন-ব্যবস্থা

সুলতান ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক, কিন্তু সকল সুলতানই দৃঢ়চরিত্রের অধিকারী ছিলেন না। ১৮ জন বাহমনী সুলতানের মধ্যে পাঁচ জনকে হত্যা করা হয়, দুই জন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের ফলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং তিন জনকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। মামুদ গাওয়ানের ন্যায় একজন মন্ত্রী অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিতে পারিতেন। কাসিম বারিদ ও আমীর বারিদ রাজক্ষমতা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন বিভিন্ন মন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীকে বলা হইত 'ভকীল-উস্-সুলতানাৎ' (সুলতানের প্রতিনিধি)।

মহম্মদ শাহ (১৩৬৮-৭৫) বাহমনী রাজ্যকে চারটি প্রদেশে ('আত্রফ') বিভক্ত করেন— দৌলতাবাদ, বেরার, বিদর ও গুলবর্গা (বিজাপুর সহ)। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের যথেষ্ট বেসামরিক ও সামরিক ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনী নিয়োগ ও পরিচালনা করিতেন, এবং নিজ নিজ প্রদেশের সকল বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারীদের নিযুক্ত করিতেন। কখনও কখনও তাঁহাদের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি সুলতানের দরবারে মন্ত্রীত্বও করিতেন। রাজ্যের সীমানা বিস্তারের ফলে মামুদ গাওয়ান প্রদেশের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আটটি প্রদেশ সৃষ্টি করেন।

আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার জন্য একটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনী ছিল। প্রধান সেনাপতির উপাধি ছিল 'আমির-উল-উমরা'। সেনাপতিদের বড় বড় জায়গীর দেওয়া হইত। কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী ছাড়া স্থানীয় সৈন্যবাহিনী ছিল। এই সব বাহিনী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অধীনে থাকিত।

বাহমনী রাজ্য : মুসলমান সংস্কৃতি

মহম্মদ বিন তুঘলুক যখন দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন তখন বহু মুসলমান পণ্ডিত তথায় গমন করেন। বাহমনী সুলতানদের মধ্যে মহম্মদ শাহ

(১৩৭৮-৯৭), ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২) এবং আহম্মদ শাহ (১৪২২-৩৬) মুসলমান শাস্ত্রচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পারস্য, আরব ও ইরাক হইতে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি বিদরে আগমন করেন। মামুদ গাওয়ান স্বয়ং পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তিনি বিদরে একটি মাদ্রাসা ও একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

নিকিতিন

১৪৭০ খ্রীস্টাব্দে রুশদেশীয় বণিক আথানাসিয়াস নিকিতিন(Athanasius Nikitin) বাহমনী রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী বিদর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'খোরাসানের অধিবাসীরা দেশ শাসন ও যুদ্ধ করে।' এখানে তিনি পারস্য দেশ হইতে আগত শিয়াদিগের আধিপত্যের কথা বলিয়াছেন। সৈন্যবাহিনী অতি বিশাল ছিল। সুলতান যখন শিকার করিতে যাইতেন, তখন ৬০,০০০ সৈন্য ও ২০০ হস্তী তাঁহার সঙ্গে যাইত। ওমরাহগণ অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। 'তাঁহারা রৌপ্য-নির্মিত পালঙ্কে যাতায়াত করিতে অভ্যস্ত। ইহার অগ্রভাগে থাকে স্বর্ণসজ্জায় সজ্জিত কুড়িটি অশ্ব, এবং পশ্চাতে থাকে তিন শত অশ্বারোহী, পাঁচ শত পদাতিক, শিঙ্গাবাদক, দশ জন মশালধারী, এবং দশ জন গীতবাদ্যকার।' জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে পর্যটক বলেন, 'দেশটি অতিশয় জনবহুল। পল্লীবাসীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, অথচ অভিজাতগণ প্রভূত বিত্তশালী, এবং বিলাসপ্রিয়।'

বিজাপুর

বাহমনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর যে সকল রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিজাপুরই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বিজাপুরের প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিল শাহ (১৪৯০-১৫১০ খ্রীস্টাব্দ) দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি একজন মারাঠী মহিলাকে বিবাহ করেন এবং হিন্দুদের উচ্চ পদে নিয়োগ করেন। বিজয়নগরের শালুব বংশীয় নরসিংহ ক্ষমতাহীন বাহমনী সুলতানের ক্ষমতাশালী মন্ত্রী কাসিম বারিদের প্ররোচনায় বিজাপুর আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। ইসমাইল আদিল শাহ (১৫১০-৩৪ খ্রীস্টাব্দ) বিজয়নগর, আহম্মদনগর, বিদর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আলি আদিল শাহ (১৫৫৭-৭৯ খ্রীস্টাব্দ) বিজয়নগরের সাহায্যে আহম্মদনগর রাজ্য বিধ্বস্ত করেন; কিন্তু পরে তিনি আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত যোগ দিয়া তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের শক্তি চূর্ণ করেন। দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ দক্ষ ও জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিদর বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৬১৮-১৯ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ আদিল শাহের রাজত্বকালে শাহ জাহানের সহিত বিজাপুরের সংঘর্ষ ঘটে। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব বিজাপুর জয় করেন।

গোলকুণ্ডা

বরঙ্গলের ভূতপূর্ব হিন্দুরাজ্যের অন্তর্গত তেলেঙ্গানায় গোলকুণ্ডা রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুলি কুতব শাহের রাজত্বকাল ছিল দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ (১৫১২-৪৩ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম তালিকোটার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু প্রজাদের প্রতি সহৃদয় ছিলেন। ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর মুঘলেরা গোলকুণ্ডা আক্রমণ করে। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা অধিকার করেন।

আহম্মদনগর

১৪৯০ খ্রীস্টাব্দে মালিক আহম্মদ আহম্মদনগর রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বারংবার বিজাপুরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রথম বুরহান নিজাম শাহ (১৫০৯-৫৩ খ্রীস্টাব্দ) বিজয়নগররাজ সদাশিবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া বিজাপুর আক্রমণ এবং শোলাপুর অধিকার করেন। পরে বিজাপুর শহর আক্রমণ করিয়া তিনি ব্যর্থ হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম হোসেন নিজাম শাহ (১৫৫৩-৬৫ খ্রীস্টাব্দ) বিজয়নগরের বিরুদ্ধে আলি আদিল শাহের সহিত যোগ দেন এবং তালিকোটার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ দুর্বল ছিলেন। ১৫৪৭ খ্রীস্টাব্দে বেরার আহম্মদনগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ জাহানের রাজত্বকালে আহম্মদনগর ক্রমে ক্রমে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিজয়নগরের অভ্যুত্থান

মহম্মদ বিন তুঘলুকের রাজত্বকালের গোলযোগের মধ্যেই বিজয়নগর রাজ্য স্থাপিত হয়। 'ইহা ছিল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দক্ষিণ ভারতে তুর্কী আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রবল হিন্দু প্রতিক্রিয়ার পরিণতি।' একটি শিলালিপিতে তুর্কী-শাসনে তেলেঙ্গানার হিন্দুদের অবস্থার এই বর্ণনা পাওয়া যায় : 'পারসিকগণ দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই অনেকে প্রাণত্যাগ করিত। ব্রাহ্মণগণকে তাহাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করিতে দেওয়া হইত না। মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হইত এবং পবিত্র বিগ্রহগুলি অপবিত্র ও ধ্বংস করা হইত।' মহম্মদ বিন তুঘলুকের ভ্রান্ত নীতির ফলে হিন্দুদের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের সুযোগ উপস্থিত হয়।

এই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় অন্ধ্রদেশের (তেলেঙ্গানার) উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। এই অঞ্চলে কাপায় নায়ক চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই সংগ্রাম পশ্চিমে কাম্পিলি অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়ে। মহম্মদ বিন তুঘলুক প্রথম হরিহরকে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন, কিন্তু হরিহর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা নদীর

দক্ষিণ তীরে বিজয়নগর শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিদ্যারণ্য। তাঁহাকে সচরাচর মাধবাচার্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা হয় তেলুগু অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা; কিন্তু কর্ণাটক বাসীদের দ্বারা এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঐতিহ্য আছে। তদনুসারে হোয়সলরাজ তৃতীয় বল্লাল বিজয়নগর শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার অধীন সামন্ত প্রথম হরিহর ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই শহরকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন।

শিলালিপি হইতে জানা যায়, সঙ্গম নামে সূর্যবংশীয় একজন যাদবের হরিহর ও বুক্ক প্রভৃতি পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁহাদের কর্মজীবনের আদিপর্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক-দের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারা কাকতীয়রাজ প্রতাপ-রুদ্রের কর্মচারী ছিলেন, এবং তাঁহার পতনের পর কাম্পিলিরাজের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পতনের পর তাঁহারা বন্দী হন। পরে অধিকৃত কাম্পিলিতে শান্তিরক্ষার জন্য মহম্মদ বিন তুঘলুক তাঁহাদের নিয়োগ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারা হোয়সলরাজ তৃতীয় বল্লালের অধীন সামন্ত ছিলেন, এবং মাদুরার মুসলমান শাসক হোয়সালরাজকে বন্দী করিয়া হত্যা করিলে তাঁহারা হোয়সল রাজ্য অধিকার করেন (১৩৪২ খ্রীস্টাব্দ)। যাহা হউক, প্রথমদিকে কাম্পিলি ও হোয়সল রাজ্যের একাধিক অঞ্চল হরিহরের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র হোয়সল রাজ্য তাঁহার অধীন হয়। বিদ্যারণ্য ও শৃঙ্গেরী মঠের গুরুগণ এই সফল উদ্যোগে মূল্যবান উপদেশ ও সহায়তা দান করেন।

সঙ্গম রাজবংশ (১৩৩৬-১৪৮৫)

এইরূপে বিজয়নগরে প্রথম রাজবংশের উৎপত্তি হয়; উহা সঙ্গম বংশ নামে পরিচিত। এই বংশের পররাষ্ট্র নীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল বাহমনী রাজ্যের সহিত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। প্রথম হরিহরের উত্তরাধিকারী, তাঁহার ভ্রাতা প্রথম বুক্ক (১৩৫৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দ) বাহমনী রাজ্য ও মাদুরায় সুলতানী রাজ্যের (মাবার) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মাদুরা তাঁহার অধিকৃত হয়। বাহমনী সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহ কৌথাল বা কৌতলমের যুদ্ধে (১৩৬৬) তাঁহাকে পরাজিত করেন, কিন্তু তিনি রায়চুর দোয়াবের অধিকাংশে নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ প্রায় সমগ্র অঞ্চল তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। ফিরিস্তা বলেন যে 'মালাবার, সিংহল, এবং অন্যান্য রাজ্যের রাজগণ তাঁহার দরবারে দূত পাঠাইয়া ছিলেন।'

বুক্কের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৭-১৪০৪) বাহমনী রাজ্যের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। আলাউদ্দীন মুজাহিদ বিজয়নগর ও আদোনি

অবরোধ করেন, কিন্তু কোন শহরই অধিকার করিতে পারেন নাই। ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে হরিহর রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি পশ্চাদ-পসরণ করিতে বাধ্য হন। হরিহরের শিলালিপি হইতে দেখা যায় যে তিনি বিভিন্ন দিকে রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি গোয়া অধিকার করিয়াছিলেন। গোয়া ও অন্যান্য বন্দরের মধ্য দিয়া ইয়োরোপ ও এশিয়ার সম্পদ বিজয়নগরে প্রবেশ করিত। এই রাজ্যটি 'পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম সমুদ্র' দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

প্রথম দেব রায়ের রাজত্বকালে (১৪০৬-২২ খ্রীস্টাব্দ) ফিরোজ শাহ বিজয়নগর অবরোধ করেন। অবরোধ ব্যর্থ হয়, কিন্তু বাহমনী রাজ্যের এক সেনাপতি তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন। দেব রায় অপমানজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি তাঁহার এক কন্যাকে ফিরোজ শাহের হারেমে প্রেরণ করিলেন, বাঁকাপুর ছাড়িয়া দিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দিলেন। পরে তিনি রায়চুর দোয়াব অধিকার করিয়া পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দেব রায় (১৪২২-৪৬ খ্রীস্টাব্দ) সঙ্গম বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তিনি প্রথম আহম্মদ শাহের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হন। সৈন্যবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি মুসলমানদের সৈনিক রূপে নিয়োগ করেন, তাহাদের জায়গীর দান করেন, এবং তাহাদের উপাসনা করিবার জন্য রাজধানীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি বাহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হইতে পারেন নাই। তিনি কোণ্ডবীডু অধিকার করেন। সিংহলের রাজা তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন।

দ্বিতীয় দেব রায়ের দুর্বল উত্তরাধিকারীগণের রাজত্বকালে উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র ত্রিচিনোপলি পর্যন্ত উপকূল অঞ্চল অধিকার করেন, এবং বাহমনী সুলতানদের আক্রমণে বিজয়নগর দুর্বল হইয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রায় লুপ্ত হইল। উচ্চাভিলাষী সামন্তগণ রাজ্যটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। এই দুরবস্থার সুযোগে নরসিংহ নামে শালুব বংশীয় জনৈক শক্তিশালী সামন্ত সিংহাসন অধিকার করেন (১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দ)।

শালুব রাজবংশ (১৪৮৬-১৫০৩)

নরসিংহের সিংহাসন আরোহণ 'প্রথম সিংহাসন অপহরণ' (First Usurpation) বলিয়া পরিচিত। সম্ভবতঃ রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা ইহাকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল।

নরসিংহ শালুব দক্ষ ও জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। তাঁহার ছয় বৎসরের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালে (১৪৮৬-৯১ খ্রীস্টাব্দ) তিনি দ্বিতীয় দেব রায়ের মৃত্যুর পরে বিজয়নগর হইতে শত্রুদের দ্বারা বিজিত ভূখণ্ডের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করেন,

কিন্তু উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র এবং বাহমনী সুলতান তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার দুই পুত্র পর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও ক্ষমতাশালী সেনাপতি নরস নায়ক রাজ্যের প্রকৃত শাসক হইয়া উঠিলেন। নরস নায়কের মৃত্যুর পরে ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার পুত্র বীর নরসিংহ সিংহাসন অধিকার করেন। ইহা 'দ্বিতীয়বারের সিংহাসন অপহরণ' (Second Usurpation) বলিয়া পরিচিত।

তুলুব রাজবংশ (১৫০৩-৬৯) : কৃষ্ণদেব রায়

বীর নরসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ তুলুব বংশ নামে পরিচিত। তাঁহার স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালের (১৫০৩-৯ খ্রীস্টাব্দ) পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-২৯ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ শাসক এবং ভারতীয় ইতিহাসের মধ্য যুগের অন্যতম বিখ্যাত রাজা। যোদ্ধা, প্রশাসক এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক রূপে তিনি স্মরণীয়।

কৃষ্ণদেব রায়ের সিংহাসন আরোহণকালে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে রাজ্যের অবস্থা সংকটজনক হইয়া উঠিয়াছিল। বাহমনী বংশের চিরাচরিত রীতির অনুসরণ করিয়া বিজাপুর বিজয়নগরের সহিত শত্রুতা করিতেছিল। নেল্লোর পর্যন্ত পূর্ব উপকূল তখনও উড়িষ্যার অধীনে ছিল। পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজগণ গোয়া অধিকার করিয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায় এই সকল সমস্যার সমাধানে সাফল্য লাভ করেন। তিনি পর্তুগীজদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন নাই। প্রথমে তিনি কর্ণাটকের কয়েকজন বিদ্রোহী সামন্তকে দমন করেন। ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে রায়চুর দোয়াব অধিকৃত হয়। গোলকুণ্ডা ও বিদরের সুলতানগণ উড়িষ্যারাজকে সাহায্য করিলেও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায়ের একাধিক অভিযান সফল হয়। তিনি ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। উড়িষ্যারাজ কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দেন এবং কৃষ্ণা নদীকে তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। বিজাপুরের সুলতান রায়চুর দোয়াব অধিকারের চেষ্টা করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুর রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া গুলবর্গার দুর্গ ধ্বংস করেন। পশ্চিমে দক্ষিণ কোঙ্কন, পূর্বে বিশাখাপত্তন এবং দক্ষিণে ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত তাঁহার অধিকার প্রসারিত হয়। সম্ভবতঃ ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপও তাঁহার প্রভাবাধীন ছিল। গোয়ার পর্তুগীজদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ভাটকলে তিনি আলবুকার্ককে একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন।

বিজয়নগরের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি বৈদেশিক পর্যটকগণের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল। পাএস বলেন : 'তিনি সর্বাপেক্ষা ভয়ের পাত্র এবং সকল রাজকীয় গুণে বিভূষিত···তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শাসক এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, তবে সময় সময়

তিনি অকস্মাৎ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠেন…তাঁহার বিপুল সৈন্যবাহিনী ও বিস্তৃত রাজ্যের জন্য তিনি অন্য যে কোন রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।'

কৃষ্ণদেব রায় কেবল মাত্র উদ্যমী বিজেতা ও সফল প্রশাসকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। তেলুগু ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'অমুক্তমাল্যদ' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁহার রাজত্বকালে তেলুগু সাহিত্যের ইতিহাসে নব যুগের সূচনা হয়। এই সময় সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণের পরিবর্তে 'প্রবন্ধ' নামে পরিচিত স্বাধীন রচনা শুরু হয়। তিনি ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব, কিন্তু তাঁহার অনুসৃত নীতিতে পরধর্ম বিদ্বেষের চিহ্নমাত্রও ছিল না। ভারতের চিরাচরিত কল্যাণকামী একনায়কত্বের তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি। 'অষ্ট দিগ্‌গজ' নামে পরিচিত আট জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন।

তালিকোটার যুদ্ধ (১৫৬৫ খ্রীঃ)

কৃষ্ণদেব রায়ের উত্তরাধিকারী হন তাঁহার ভ্রাতা অচ্যুত রায় (১৫৩০-৪২ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার দুর্বলতার ফলে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়; ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি হ্রাস পায়। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব (১৫৪৩-৬৮ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসন লাভ করেন, কিন্তু প্রকৃত শাসক ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী রাম রায়। এই দক্ষ কিন্তু রাজনৈতিকভাবে অদূরদর্শী মন্ত্রী বিজয়নগরের মর্যাদা ও শক্তি পুনরুদ্ধারের আশায় মুসলমান সুলতানদের পারস্পরিক কলহে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি বিজাপুরের বিরুদ্ধে আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া বারংবার আদিল শাহকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে বিজাপুরের সহিত যোগ দিলেন। আহম্মদনগর রাজ্য বিধ্বস্ত হইল। ফিরিস্তা বলেন, বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী 'মসজিদগুলি ধ্বংস করিল, এমন কি পবিত্র কোরাণেরও মর্যাদা রক্ষা করিল না।' ইসলামের এই অবমাননা এবং রাম রায়ের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের ফলে বেরারের সুলতান ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজারা সকলেই বিজয়নগরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তালিকোটার যুদ্ধে বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদরের সৈন্যবাহিনী বিজয়নগরের সৈন্যদলকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে। রাম রায় বন্দী হন, এবং আহম্মদনগরের সুলতান স্বহস্তে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করেন। ফিরিস্তা বলেন, 'লুণ্ঠন কার্য এত ব্যাপক হইয়াছিল যে মিত্রপক্ষের প্রতিটি সৈন্য স্বর্ণ, মণিমুক্তা, অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব ও ক্রীতদাসে প্রভূত ধনী হইয়া উঠিয়াছিল।' বিজয়নগর শহরটিকে নির্দয়ভাবে ধ্বংস করা হইল। ঐতিহাসিক সিউয়েল (Sewell) বলেন, 'অতি আকস্মিকভাবে একটি ঐশ্বর্যময়ী নগরীকে এইরূপে বিধ্বস্ত করার ঘটনা আর কখনো ঘটে নাই।'

তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িলেও ইহার ফলে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিনষ্ট হয় নাই। বিজয়নগরের সামরিক শক্তি হ্রাস পাইল, তাহার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিনষ্ট হইল এবং রাজনৈতিক অধিকার সংকুচিত হইল ; কিন্তু ইহার পরেও প্রায় এক শতাব্দী কাল এই রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় ছিল। সুলতানদের সামরিক সহযোগিতা স্থায়ী হয় নাই। তাঁহাদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষের ফলে বিজয়নগরের হৃত গৌরব কিছু পরিমাণে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। 'তালিকোটার যুদ্ধ বিজয়নগরের সাম্রাজ্যের বিপদ আনিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বিজয়নগরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই।'

আরবিড়ু রাজবংশ (১৫৬৯-১৬৭৮)

রাম রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা তিরুমল রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি সুলতানদের সহিত সন্ধি করেন। বিধ্বস্ত বিজয়নগরে পুনরায় জনবসতি সম্ভব না হওয়ায় তিনি পেনুগোণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি নামেমাত্র রাজা সদাশিবকে অপসারিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইহা 'তৃতীয় বারের সিংহাসন অপহরণ' (Third Usurpation) বলিয়া পরিচিত। তিনি আরবিড়ু বংশীয় ছিলেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম রঙ্গ (১৫৭২-৮৫ খ্রীস্টাব্দ) বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা কর্তৃক আক্রান্ত হন। তাহার ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ভেঙ্কট (১৫৮৬-১৬১৪ খ্রীস্টাব্দে) প্রথমে চন্দ্রগিরিতে, পরে ভেলোরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি রাজ্যের সংহতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তবে কর্নাটক রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিয়া তিনি বিভেদের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন (১৬১২)। তাঁহার মৃত্যুর পরে সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকারের যুদ্ধে রাজ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা তৃতীয় রঙ্গ ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বিদ্রোহী সামন্তগণকে দমন করিতে এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রাদেশিক নায়কদের মধ্যে রাজ্যখণ্ড অধিকারের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হইলে বিজয়নগর রাজ্যের পতন হয়।

বিজয়নগরে বৈদেশিক পর্যটকগণ

নিকোলো কোন্তি (Nicolo Conti) নামক ইতালীয় পর্যটক ১৪২০ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য পরিদর্শন করেন। বিজয়নগর শহরের বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন : 'নগরীর পরিধি ষাট মাইল বিস্তৃত। ইহার প্রাচীর পর্বত পর্যন্ত প্রসারিত, এবং পর্বতের পাদদেশে উপত্যকাগুলিকে বেষ্টন করিয়াছে। ...অস্ত্রধারণে সক্ষম প্রায় নব্বই হাজার লোক এই শহরে বাস করে।...ইহার রাজা ভারতের সকল রাজা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী।

পারসিক রাজদূত আবদুর রজ্জাক ১৪৪২-৪৮ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'এই রাজ্যের জনসংখ্যা এত বেশী যে স্বল্প পরিসরে তাহার সম্যক ধারণা দেওয়া যায় না। রাজার কোষাগারে প্রকোষ্ঠগুলিতে গর্ত খনন করিয়া তাহাতে গলিত স্বর্ণ ঢালিয়া জমানো হয়। দেশের উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল অধিবাসী, এমন কি বাজারের কারিগরগণ পর্যন্ত, কান, গলা, হাত ও আঙ্গুলে মণিমুক্তা ও স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করে। এই দেশটি মোটের উপর সুকর্ষিত, এবং অতি উর্বর।' এই দেশে ১১ লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী ছিল। এই রাজ্যে কালিকটের সমতুল্য ৩০০ বন্দর আছে, এইরূপ কথা শোনা যাইত। নগরীর সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'বিজয়নগরের ন্যায় একটি নগরী বিশ্বের অন্যত্র কোথাও আছে বলিয়া দেখা যায় নাই। একটির মধ্যে একটি, এইরূপে সাতটি প্রাচীর দ্বারা নগরীটি সুরক্ষিত ছিল।' তিনি বলেন যে ভারতবর্ষের কোন স্থানে বিজয়নগরের রাজার ন্যায় 'সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী' কোন শাসক ছিলেন না।

পর্তুগীজ পর্যটক পাএস (Paes) বলেন, 'বিশ্বের মধ্যে এই নগরী সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ; এখানে চাল, গম, শস্য. ভুট্টা, প্রচুর পরিমাণে যব, এবং নানা প্রকার ডাল, অশ্বের খাদ্য ও অন্যান্য শস্যবীজ প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। রাস্তাঘাট ও বাজারে অগণিত ভারবাহী বলদ দেখা যায়।' তিনি এই নগরে বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন জাতির মানুষ দেখিয়াছিলেন, কারণ বাণিজ্যের দিক হইতে এই রাজ্য অতি সমৃদ্ধ ছিল।

এডোয়ার্ডো বারবোসা (Eduardo Barbosa) নামে অপর একজন পর্যটক ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, বিজয়নগর ছিল 'বিশাল, জনবহুল এবং দেশীয় হীরা, পেগুর চুনী, চীন ও আলেকজান্দ্রিয়ার রেশম, এবং মালাবারের সিঁদুর, কর্পূর, কস্তুরী, গোলমরিচ ও চন্দনের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র।' তিনি কৃষ্ণদেব রায়ের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন: 'রাজা খ্রীস্টান, ইহুদী, মুর (মুসলমান) বা হিন্দু নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখানে যাওয়া আসা করিবার এবং বিনা বাধায় নিজ ধর্ম পালন করিয়া বসবাস করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন।'

বিজয়নগরের শাসন-ব্যবস্থা ও সৈন্যবাহিনী

মধ্য যুগের সকল রাজার ন্যায় বিজয়নগরের রাজাও ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক। অসামরিক, সামরিক ও বিচার বিভাগের উপর তাঁহার অবিসংবাদী কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু রাজার উপর শাসনতান্ত্রিক কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও তিনি প্রজাদের মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকিতেন। কৃষ্ণদেব রায় বলিয়াছেন, 'সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজার ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা উচিত।' রাজাকে সাহায্য করিতেন মন্ত্রীগণ। উচ্চ বংশের

ব্যক্তিদের মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা হইত। কখনও কখনও বংশপরম্পরায় মন্ত্রী নিয়োগ করা হইত।

রাজ্যটি কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশে একজন নায়ক বা রাজপ্রতিনিধি থাকিতেন। তাঁহাদের বেসামরিক, বিচার বিভাগীয় ও সামরিক কর্তব্য পালন করিতে হইত। তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, কিন্তু রাজারা যতদিন শক্তিশালী থাকিতেন ততদিন নায়কদের উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিত। প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব পরিষদ ছিল এবং প্রত্যেক গ্রাম ছিল স্বয়ংশাসিত একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র। রাজার আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। নুনিজ (Nuniz) বলেন যে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের নয় ভাগ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দিতে হইত, তাঁহারা আবার উহার অর্ধেক রাজাকে দিতেন। গুরু করভার এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ও স্থানীয় কর্মচারীদের অত্যাচারে ব্যাপক দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল। কখনও কখনও রাজা দয়াপরবশ হইয়া তাহা লাঘব করিতেন। মোটের উপর, রাজসভা ও অভিজাত শ্রেণীর জাঁকজমকের তুলনায় জনসাধারণের দুর্দশা অত্যন্ত মর্মান্তিক ছিল।

প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের জন্য বিজয়নগরে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করা হইত। পাএস বলেন যে কৃষ্ণদেব রায়ের ৭০০,০০০ পদাতিক, ৩২,৬০০ অশ্বারোহী এবং ৬৫১ হস্তী ছিল। ইহা ছাড়া শিবিরের অনুগামীর সংখ্যাও প্রচুর ছিল। পর্তুগীজরা পশ্চিম এশিয়া হইতে বিজয়নগরে অশ্ব সরবরাহ করিত। সামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন 'দণ্ডনায়ক' বা প্রধান সেনাপতি। শৃঙ্খলা ও রণকৌশলে বিজয়নগরের সৈন্যদল মুসলমান সুলতানদের সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল।

বিজয়নগরে ধর্ম ও সংস্কৃতি

দক্ষিণ ভারতে মুসলমানদের আক্রমণ হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া বিজয়নগর রাজ্য এক মহান ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিল। বিজয়নগরের রাজগণ কেবলমাত্র হিন্দুদের বহুল প্রচলিত ভাষা সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই; তেলুগু, তামিল ও কানাড়া প্রভৃতি স্থানীয় ভাষাও তাঁহাদের আনুকূল্য লাভ করিয়াছে। সঙ্গম বংশীয় রাজগণের উপদেষ্টা মাধব ও সায়ণ মধ্য যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কৃষ্ণদেব রায় সংস্কৃত ও তেলুগু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। আট জন তেলুগু কবি তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আরবিডুবংশের রাজগণও তেলুগু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বারবোসার মতে, বিজয়নগর রাজ্যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর কোনরূপ নির্যাতন করা হইত না। রাজার মুসলমান সৈন্যদের জন্য রাজধানীতে মসজিদ নির্মিত

হইয়াছিল। ধর্মের প্রতি রাজগণের অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহাদের নির্মিত বিশাল মন্দিরগুলিতে। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ এই মন্দিরগুলিকে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের নিখুঁত নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও পণ্ডিত ও শিল্পীদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

বিজয়নগর : অর্থনৈতিক অবস্থা

বিজয়নগর শহর নাগরিক জীবন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই শহরে বহু প্রাসাদ, বাজার, মন্দির ও একটি মসজিদ ছিল। বারবোসা, পাএস, আবদুর রজ্জাক প্রভৃতি বৈদেশিক পর্যটকগণের বিবরণ হইতে এই শহরের বিশাল আয়তন ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়নগরে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য স্থলপথ ব্যবহৃত হইত। তাহা ছাড়া, সমুদ্রের উপকূলে ছোট ছোট জাহাজে ও নৌকায় পণ্য বহনের ব্যবস্থা ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রপথ ব্যবহৃত হইত। আবদুর রজ্জাক বলেন, এই রাজ্যে ৩০০ সামুদ্রিক বন্দর ছিল। পশ্চিম উপকূলে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল মালাবার। পূর্বে ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলি, ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও চীন, এবং পশ্চিমে আরব, পারস্য, আফ্রিকা ও পর্তুগালের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। বিজয়নগর রাজ্যের নিজস্ব বহু জাহাজ ছিল। জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রচলিত ছিল; কিন্তু সম্ভবতঃ সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ করা হইত না। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল বস্ত্র, চাল, লোহা, সোরা, চিনি ও মশলা। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল অশ্ব, মুক্তা, তামা, পারদ, চীনের রেশম ও ভেলভেট।

তিন শ্রেণীর গ্রাম ছিল; গ্রামের উৎপাদন কিরূপে বিভক্ত হইত তাহার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ হইত। 'রাজকীয় গ্রামগুলিতে আয়ের কিছু অংশ রাজার দুর্গগুলি রক্ষণের জন্য ব্যয় করা হইত। অন্য এক শ্রেণীর গ্রামের আয়ের এক অংশ ব্রাহ্মণগণ ও মন্দিরগুলির জন্য ব্যয় করা হইত। অপর শ্রেণীর গ্রামের আয়ের অংশ যে সকল পরিবার গ্রামের সেবা করিত তাহাদের দেওয়া হইত। কুম্ভকার, কর্মকার, সূত্রধার, জল সরবরাহকারী এবং অন্যান্য যাহারা গ্রামবাসীদের কাজ করিত তাহারা কোন প্রত্যক্ষ পারিশ্রমিক পাইত না; তাহারা যে জমি চাষ করিত তাহা নিষ্কর ছিল।'

রাজস্ব ধার্য করার জন্য জমিকে উৎপাদিকাশক্তি অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইত: নরম বা জলসিক্ত জমি, শুষ্ক জমি, ফলের বাগান ও বন। নূনিজ বলেন যে কৃষকেরা উৎপন্ন শস্যের নয়-দশমাংশ তাহাদের প্রভুদের দিত; তাঁহারা উহার অর্ধাংশ রাজাকে দিতেন। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও কৃষকদের গোচারণ কর, বিবাহ কর ইত্যাদি কর দিতে হইত। উৎপন্ন শস্য অথবা নগদ অর্থে কর দেওয়া যাইত। করভার উচ্চ ছিল। রাজপ্রতিনিধি ও স্থানীয় রাজকর্মচারীগণ কৃষকদের উপর অত্যাচার করিতেন।

উচ্চ শ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল। জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশই সম্পদের মালিক ছিল। কিন্তু দ্রব্যমূল্য কম থাকায় সম্ভবতঃ সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না।

বিজয়নগরে সমাজ-ব্যবস্থা

সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সবার উপরে। ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে তাঁহারা কর্তৃত্ব করিতেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁহাদের প্রভাব ছিল। বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়ণ দ্বিতীয় হরিহরের মন্ত্রী ছিলেন। নুনিজ বলেন, ব্রাহ্মণেরা ছিলেন 'সৎ, চতুর এবং সুদক্ষ। তাঁহারা হিসাবের কাজে পটু ছিলেন। তাঁহাদের শরীর ছিল সুগঠিত কিন্তু কঠিন পরিশ্রমের অনুপযুক্ত।'

উচ্চ শ্রেণীর নারীরা সামরিক, সাংস্কৃতিক, এমন কি রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হইত না। নুনিজ বলেন যে রাজার অধীনে বহু মহিলা কুস্তিগীর, জ্যোতিষী ও হিসাবরক্ষক ছিলেন। তবে বহুবিবাহ, পণপ্রথা ও সতীদাহ প্রথার ফলে নারীদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণেরা নিরামিষাশী ছিলেন, তবে অন্য জাতীয় লোকেরা গোমাংস ভিন্ন অন্য সকল প্রকার মাংস আহার করিত।

চতুর্দশ অধ্যায়

সুলতানী যুগে ভারতের অবস্থা

১. শাসন-ব্যবস্থা

ইসলামীয় রাষ্ট্র

ইসলামীয় রাষ্ট্র ছিল একটি ধর্মতন্ত্র (theocracy); ইহার রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংগঠন ইসলামের বিধি হইতে উদ্ভুত এবং উহার দ্বারা অনুমোদিত ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই আদর্শের বহু পরিবর্তন হইয়াছিল। ভারতবর্ষে জনগণের অধিকাংশই ছিল অমুসলমান, এবং এখানে রাজনৈতিক অবস্থাও মুসলমান ব্যবস্থাপকদের ধারণা হইতে ভিন্ন ছিল। তাই এখানে ইসলামের সকল বিধি পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে পালন করা সম্ভব ছিল না।

নৈষ্ঠিক মুসলমান মতবাদ অনুসারে, রাজশক্তির ভিত্তি হইল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের দ্বারা নির্বাচন। কিন্তু ইসলামের জন্মভূমিতেও এই আদর্শ কার্যকর করা যায় নাই। দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন স্বীকৃত নীতি ছিল না; উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ দেখা দিলে তাহার সমাধানের জন্য ব্যবস্থাও ছিল না। নিছক সুবিধার জন্যই মৃত সুলতানের পরিবারের জীবিত ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই একজনকে নির্বাচিত করা হইত। বয়োজ্যেষ্ঠত্ব, কর্মক্ষমতা, মৃত সুলতানের মনোনয়ন ইত্যাদি বিষয় কখনও কখনও বিবেচনা করা হইত; কিন্তু কখনও কখনও আবার অভিজাত ব্যক্তিদের স্বার্থ অনুযায়ী তাঁহারা কাহাকেও নির্বাচন করিতেন।

ভারতের তুর্কী রাজগণ ও খিলাফৎ

আইনতঃ সমগ্র মুসলমান জগৎ খলিফার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইসলামে বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের মুসলমান শাসকদের নামে 'খুৎবা' পাঠ করিতে শুরু করিয়াছিল। আব্বাস বংশীয় খলিফাদের (Abbasids) সময়ে মুসলমান জগৎ 'বহু বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহারা যে কোন দিক দিয়া খলিফার অধীন ছিল তাহা নহে, প্রত্যেকটি অংশেরই ছিল নিজস্ব ইতিহাস।' ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে মোঙ্গল নায়ক হুলাগু বাগদাদ অধিকার করিয়া খলিফাকে হত্যা করেন। কার্যতঃ খিলাফতের অবসান হয়। 'কিন্তু মিশরে বিরাজ করিতে থাকে তাহার ছায়া—এক অলীক খলিফা বংশ, ক্ষমতাহীন নাম শেষ ছায়া মাত্র—যেন এক মরীচিকা।' বাগদাদের শেষ

খলিফার পিতৃব্য মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ঐ দেশের মামেলুক সুলতানগণ তাঁহাকে মুসলমান জগতের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা রূপে স্বীকৃতি দেন; কিন্তু তাঁহার কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মিশরীয় খলিফা বংশের অস্তিত্ব ছিল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে কনস্ট্যান্টিনোপলের অটোমান তুর্কী (Ottoman Turk) সুলতানেরা খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন।

বাগদাদের পতনের পর খলিফাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লুপ্ত হইলেও তাঁহাদের রাজনৈতিক মর্যাদা বিনষ্ট হয় নাই। ইসলামে বিশ্বাসীদের কাহারও মন হইতে এই ধারণা মুছিয়া যায় নাই যে পয়গম্বরের উত্তরাধিকারীই তাহাদের আনুগত্য লাভের প্রকৃত অধিকারী। ইসলামে বিশ্বাসীদের কাছে "তিনি ছিলেন সকল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস; রাজগণ এবং বিভিন্ন উপজাতীয় নায়কগণ তাঁহার অধীন, এবং একমাত্র তাঁহার অনুমোদনই তাঁহাদের সকলের ক্ষমতার ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি।" বাগদাদ ও মিশরের খলিফাদের সহিত দিল্লীর সুলতানদের সম্পর্ক এই আদর্শের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

গজনীর সুলতান মামুদ যখন সামানী বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন বাগদাদের খলিফা তাঁহার নূতন পদকে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। মহম্মদ ঘূরী দিল্লী হইতে প্রথম দিকে যে সব মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন তাহাতে খলিফার নাম উৎকীর্ণ ছিল। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিসই সর্বপ্রথম খলিফার নিকট হইতে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেন। ১২১৯ খ্রীস্টাব্দে খলিফার দূতগণ দিল্লীতে আসিয়া তাঁহাকে দিল্লীর সুলতান বলিয়া স্বীকৃতি দান করেন। বাগদাদের শেষ খলিফার মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরেও তাঁহার নাম দিল্লীর সুলতানদের মুদ্রায় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। হুলাগু কর্তৃক খলিফা পদের উচ্ছেদের সংবাদ দিল্লীতে অজ্ঞাত ছিল। মিষ্টভাষী সভাকবি আমীর খসরু আলাউদ্দীন খলজীকে খলিফা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু উৎকীর্ণ লিপি বা মুদ্রা হইতে এরূপ কোন আভাস পাওয়া যায় না যে তিনি এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পুত্র মুবারক খলজী প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে তিনিই হইলেন 'ইমামশ্রেষ্ঠ, খলিফা'। মহম্মদ বিন তুঘলুক তাঁহার রাজত্বকালের শেষ দিকে সাম্রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক বিদ্রোহ ও বিক্ষোভে বিব্রত হইয়া রাজকীয় কর্তৃত্ব দৃঢ়তর করার জন্য খলিফার সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। ১৩৪৩ খ্রীস্টাব্দে মিশরের খলিফার প্রতিনিধি দিল্লীতে উপস্থিত হন। বরনী সুলতানের আচরণ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন: 'তাঁহার মুদ্রা হইতে তিনি নিজের নাম ও উপাধি মুছিয়া দিয়া সেখানে খলিফার নাম ও উপাধি বসাইলেন। খলিফার উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন তাহা লিপি-বদ্ধ করা সম্ভব নহে।' ফিরোজ তুঘলুক আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন: 'ঈশ্বরের অনু-গ্রহে আমি যে মহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম গৌরব অর্জন করিয়াছি, তাহা এই যে পূত

পয়গম্বরের প্রতিনিধি খলিফার প্রতি আমার আনুগত্য ও ধর্মপ্রাণতা, মৈত্রী ও বশ্যতার বলে আমার কর্তৃত্ব তাঁহার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কেবল তাঁহার অনুমোদনেই রাজগণের শক্তি দৃঢ়তা লাভ করে; খলিফার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সেই পবিত্র সিংহাসন হইতে অনুমোদন লাভ না করা পর্যন্ত কোন রাজাই নিরাপদ হইতে পারেন না।' ফিরোজের কোন উত্তরাধিকারীই 'সেই পবিত্র সিংহাসন হইতে অনুমোদনের' উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নাই; এই ধর্মপরায়ণ শাসকের মৃত্যুর পর মিশর হইতে দৌত্যকার্যের জন্য দিল্লীতে কাহারও আগমন হয় নাই। কিন্তু খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকারের এই দীর্ঘস্থায়ী প্রথা সুলতানী রাজ্যের ধর্মতান্ত্রিক চরিত্রের পরিচয় দেয়।

ইসলামীয় রাষ্ট্রে হিন্দুদের অবস্থা

ইসলামীয় রাষ্ট্রে অমুসলমান প্রজাদের বলা হইত 'জিম্মি' (অর্থাৎ আশ্রিত জনগণ)। মুসলমানগণ যখন কোন অমুসলমান রাজ্য জয় করিত, তখন বিজিত জনগণকে তিনটি পন্থার একটি বাছিয়া লইতে বলা হইত— ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, জিজিয়া কর প্রদান, মৃত্যু বরণ। নিজ ধর্মের প্রতি যাহাদের অনুরাগ থাকিত তাহারা স্বভাবতঃই জিজিয়া কর প্রদান করিয়া বিজেতাদের সহিত আপোষ করিত। একজন মুসলমান আইনজ্ঞ বলেন, 'যে জিজিয়া কর দেয়, এবং মুসলমান রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিয়া চলে, তাহাকেই বলে জিম্মি।'

সিন্ধুর আরব বিজেতাগণ হিন্দুদের নিকট হইতে জিজিয়া কর আদায়ের প্রথা প্রচলন করেন। আকবর এই কর তুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত দিল্লীর শাসকগণ এই প্রথা অনুসরণ করেন। সাধু-সন্ন্যাসী, বিত্তহীন ব্যক্তি এবং ক্রীতদাসদের নিকট হইতে জিজিয়া কর আদায়ের প্রথা ছিল না। এই কর প্রদান ছিল অবমাননা-কর ও হীনতাজনক। কয়েক শতাব্দী যাবৎ ব্রাহ্মণগণ এই কর প্রদানের দায় হইতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু ফিরোজ তুঘলুক তাঁহাদের নিকট হইতেও জিজিয়া আদায় করেন।

কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমান মৌলানা হিন্দুদের শ্রমিক মজুরের পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে চাহিতেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের কাজী মুঘিসউদ্দীন তাঁহাদেরই একজন ছিলেন। ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রের জনৈক মিশরীয় টীকাকার ভারত ভ্রমণের সময় আলাউদ্দীন খলজীকে লিখিয়াছিলেন: 'আমি শুনিয়াছি যে আপনি হিন্দুদের এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছেন যে তাহাদের স্ত্রীপুত্রকন্যা মুসলমানদের দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া খায়। এইরূপ কার্যের ফলে আপনি ধর্মের যথেষ্ট সেবা করিতেছেন। আপনার এই একমাত্র পুণ্য কার্যের জন্য আপনার সকল পাপেরই মার্জনা হইবে।'

তবে এই অনমনীয় মনোভাব আইন ও শাসন-ব্যবস্থায় সব সময় প্রতিফলিত

হয় নাই। আলাউদ্দীন হিন্দুদের আর্থিক দুর্গতি ঘটাইয়াছিলেন। ফিরোজ তুঘলুক ও সিকন্দর লোদী তাহাদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু আলাউদ্দীন এবং মহম্মদ বিন তুঘলুক উলেমাগণের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করারও চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে কোন সময়ই হিন্দুদের উপর পরিকল্পিত ভাবে নির্যাতন, বা তাহাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করা হয় নাই। তবে কোন সুলতানই হিন্দুদের শাসন-ব্যবস্থার অংশীদার করিয়া সুলতানী সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেন নাই। সেই ধর্মীয় গোঁড়ামির যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা কেবলমাত্র শাসক সম্প্রদায়ের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। ফলে হিন্দুদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহাদের প্রকৃত আনুগত্য এবং প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থনের অভাবে সুলতানী সাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল। হিন্দুদের উচ্চ পদে নিয়োগ করা হইত না। মান সিংহ ও মীর্জা রাজা জয়সিংহ যেরূপে মুঘল সাম্রাজ্যের সেবা করিয়াছিলেন, কোন রাজপুত রাজা সেরূপে সুলতানী সাম্রাজ্যের সেবা করেন নাই। সুলতানদের সময়ে টোডর মলের ন্যায় কোন হিন্দু রাজস্ব-সংস্কারকের আবির্ভাব হয় নাই। নিম্ন শ্রেণীর নাগরিক রূপে হিন্দুদের অবস্থান হইতে প্রমাণিত হয় যে আধুনিক ভারতের ন্যায় সুলতানী সাম্রাজ্য এমন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল না, যেখানে সকল নাগরিক ধর্মনির্বিশেষে সমান মর্যাদার অধিকারী।

রাজতন্ত্র

ইসলামের ধর্মতত্ত্ব ও আইন অনুসারে, সার্বভৌমত্ব (sovereignty) আইন বা 'শর'-এর (Shar) মধ্যে নিহিত আছে। এই আইনের ভিত্তি হইল কোরান। আইনের সহিত সঙ্গতি বজায় রাখিয়া ইসলামীয় রাষ্ট্রের শাসক ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী ছিলেন। মুসলমান রাজগণের স্বেচ্ছাচারের উপর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল নির্বিচারে আইন ভঙ্গ করিতে তাঁহাদের অক্ষমতা। কিন্তু, শাস্ত্রানুসারে না হইলেও, কার্যতঃ তাঁহারাই ছিলেন আইনের প্রধান ব্যাখ্যাকার, এবং তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে ইহাকে উপেক্ষা করিয়া নিজেরা নতুন বিধি ঘোষণা করিতেন। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন খলজী ও মহম্মদ বিন তুঘলুক এই আইন ও উহার সনাতন ব্যাখ্যাকর্তা সুন্নী উলেমাদের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়া অংশতঃ সফল হইয়াছিলেন।

আমীর-ওমরাহ্‌দের পদমর্যাদা ও অধিকার ছিল রাজকীয় শক্তির নিরঙ্কুশ প্রয়োগের পথে আর একটি বাধা। 'ইলতুৎমিসের পরিবারের ইতিহাসের প্রধান শাসনতান্ত্রিক গুরুত্ব হইল প্রকৃত কর্তৃত্ব লাভের জন্য রাজা এবং অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ।' নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজ্যকালের ইতিহাসে ওমরাহ্‌দেরই জয় সূচিত হয়। সুলতান পদ লাভের পর বলবন অভিজাত শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া

রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এই নূতন ধারা মহম্মদ বিন তুঘলুকের আমল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মহম্মদ তাঁহার প্রজাদের স্থলতানের মহিমা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তাঁহার মুদ্রায় এই বাণী উৎকীর্ণ করাইতেন যে 'স্থলতান হইলেন আল্লার ছায়া।' ফিরোজ তুঘলুকের শিথিল শাসনে শুরু হয় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। 'শরিয়তে'র প্রতি সাড়ম্বরে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া তিনি ধর্মীয় শ্রেণীকে তুষ্ট করেন, আবার সামরিক শ্রেণীর ব্যক্তিদের বিনা বাধায় স্থবিধা উপভোগের ব্যবস্থাও অব্যাহত রাখেন।' লোদী স্থলতানদের আমলে ওমরাহগণ স্বয়ং স্থলতানের সমান মর্যাদা দাবি করেন। উদ্ধতস্বভাব ইব্রাহিম এই দাবি অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণ হারান।

দিল্লীর স্থলতানদের পরিচালনা, সহায়তা অথবা সংযত করার মত কোন সর্ব-স্বীকৃত শাসনতান্ত্রিক আইন ছিল না। সব কিছুই নির্ভর করিত রাজার ব্যক্তিত্বের উপর। আধুনিক অর্থে মন্ত্রীসভা, এমন কি নিয়মিত কোন মন্ত্রী পরিষদও ছিল না। রাজকার্য পরিচালনায় স্থলতানকে সাহায্য করিতেন তাঁহার নিজের ইচ্ছানুযায়ী নিযুক্ত মন্ত্রী ও কর্মচারীগণ। স্থলতান ব্যক্তিত্বশালী হইলে ইহারা সকলে 'সামান্য কর্মসচিবের ন্যায় খুঁটিনাটি ব্যাপারে রাজকীয় ইচ্ছা পালন করিয়া চলিতেন; কিন্তু বিনীত অনুরোধ এবং প্রচ্ছন্নভাবে সাবধানতার বাণী উচ্চারণ ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে তাঁহারা প্রভু কর্তৃক অনুসৃত নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন না।' পক্ষান্তরে, স্থলতান দুর্বলচেতা হইলে ইঁহারা তাঁহাকে ক্রীড়নকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

মন্ত্রী ও কর্মচারীবৃন্দ

স্থলতানী রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীকে বলা হইত উজীর, এবং তাঁহার উপরে যে বিভাগের ভার ছিল তাহাকে বলা হইত 'দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাৎ।' তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল; তিনি ছিলেন স্থলতান ও তাঁহার প্রজাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা-কারী। তাঁহার উপর সাধারণ শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল, এবং তিনিই ছিলেন অর্থ দপ্তরের প্রধান। কখনও কখনও তাঁহাকে সামরিক অভিযানও পরিচালনা করিতে হইত। স্থলতানী আমলে সামরিক ও বেসামরিক কাজের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হইত না।

উজীরের কর্তৃত্বাধীন বিভাগের পরেই ছিল 'দিওয়ান-ই-আরিজ'। ইহার প্রধান, 'আরিজ-ই-মামালিক,' সামরিক বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করিতেন। তৃতীয় দপ্তর, 'দিওয়ান-ই-ইন্শা,' স্থলতানের পত্রাদির বিলি-ব্যবস্থা করিত। 'দিওয়ান-ই-রসলাৎ' সম্ভবতঃ পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিত। 'সদর-উস্-সুদুর' ধর্মীয় দাতব্য বিভাগের প্রধান ছিলেন। বিচার বিভাগের ('দিওয়ান-ই কাজা') দায়িত্ব ছিল প্রধান কাজীর উপর।

সুলতান ইচ্ছামত মন্ত্রীগণকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতেন। তাঁহারা পৃথক-ভাবে তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতেন; যৌথভাবে কাজ করার বা সুলতানকে উপদেশ দিবার জন্য কোন মন্ত্রীসভা ছিল না। কখনও কখনও 'নায়েব' বা 'নায়েব-ই-মামালিক' নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। সুলতান দুর্বলচিত্ত হইলে তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইতেন। 'ভকীল-ই-দার'-এর অধীনে রাজকীয় গৃহকার্য-সংক্রান্ত দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্ম সম্পাদন করিত।

আয়ব্যয়

রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ছয়টি: (১) ভূমি-রাজস্ব, (২) জাকাত বা ধর্মীয় কর, (৩) জিজিয়া, (৪) যুদ্ধে লুণ্ঠিত সম্পদ, (৫) খনি ও গুপ্তধন, (৬) উত্তরাধিকারী-বিহীন সম্পত্তি। ভূমি-রাজস্বের মধ্যে প্রধান ছিল 'খারজ'। আলাউদ্দীন খলজী ও গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক রাজস্ব বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করেন। আলাউদ্দীনই সম্ভবতঃ জমি পরিমাপের বিধি প্রবর্তন করেন। ফলে কৃষক ও সরকারের মধ্যে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের ব্যবস্থা হয়। আলাউদ্দীনের সময়ে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের রাজস্ব দিতে উৎসাহ দেওয়া হইত, তবে বোধ হয় নগদ অর্থও লওয়া হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজস্বের হার ছিল সম্ভবতঃ উৎপন্ন শস্যের একপঞ্চমাংশ। আলাউদ্দীন তাহা বৃদ্ধি করিয়া উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ করিয়া দেন। তাঁহার পুত্রের রাজত্বকালে রাজস্বের উচ্চ হার কমাইয়া দেওয়া হয়। গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক নির্দেশ দেন যে সরকারের দাবি শতকরা দশ ভাগের বেশী বৃদ্ধি করা যাইবে না।

বিচার

সুলতানী সাম্রাজ্যে সুনির্দিষ্ট বিচার ক্ষমতার অধিকারী কোন সংগঠিত বিচার-ব্যবস্থা ছিল না। সুলতান ছিলেন ন্যায়বিচারের উৎস। তিনি স্বয়ং বিচার করিতেন। সুলতান যে সকল মামলার বিচার করিতেন না, সেই সকল মামলায় প্রধান কাজীই ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তাঁহাকে সাহায্য করিতেন একজন 'মুফ্‌তি' বা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাকর্তা। দিল্লী প্রভৃতি সকল বড় শহরে বিচারের জন্য একজন কাজী থাকিতেন। 'আমীর-ই-দাদ' নামে একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী কাজীদের রায় কার্যে পরিণত করিতেন। যে সকল মামলায় কেবল হিন্দুরা জড়িত থাকিত, পঞ্চায়েতে তাহাদের বিচার হইত। মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে বিবাদের বিচার করিতেন কাজীগণ। শহরগুলিতে পুলিশ বিভাগের প্রধান ছিলেন কোতোয়াল। শাসক রূপে অপরাধীকে কারাগারে প্রেরণের দায়িত্বও তাঁহারই ছিল। ফৌজদারী দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর;

যন্ত্রণাপ্রদান ও অঙ্গচ্ছেদ সাধারণ প্রথা ছিল। ফিরোজ তুঘলুক শাস্তি দানের কয়েকটি অমানুষিক প্রথা রদ করেন।

প্রাদেশিক শাসন

সুলতানী সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন কোন সামরিক জায়গীর (Iqta) আকারে প্রসারিত হইয়া প্রদেশে পরিণত হয়। মহম্মদ বিন তুঘলুকের সময়ে ২৩টি প্রদেশের নাম পাওয়া যায়ঃ (১) দিল্লী, (২) দেবগিরি, (৩) মুলতান, (৪) কুহ্‌রম, (৫) সামানা, (৬) সেওয়ান, (৭) উচ, (৮) হান্‌সি, (৯) সিরস্থতি, (১০) মাবার, (১১) তেলাঙ্গ, (১২) গুজরাট, (১৩) বদায়ুন, (১৪) অযোধ্যা, (১৫) কনৌজ, (১৬) লখ্‌নৌতি, (১৭) বিহার, (১৮) কারা, (১৯) মালব, (২০) লাহোর, (২১) কালানোর, (২২) জাজনগর, (২৩) দোরসমুদ্র। কোন কোন প্রদেশ বর্তমান কালের জেলার চেয়ে বড় ছিল না। আবার লখ্‌নৌতির ন্যায় কোন কোন প্রদেশ এত বড় ছিল যে একজন প্রাদেশিক শাসকের দ্বারা তাহাদের সুশাসন ছিল প্রায় অসম্ভব।

প্রাদেশিক শাসনকর্তার ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম ছিল না। সাধারণতঃ তিনি ছিলেন সামরিক ও অর্থ বিভাগের প্রধান। কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রাদেশিক রাজস্ব যথাসময়ে প্রেরণের জন্য তিনি উজীরের নিকট দায়ী থাকিতেন। পারসিক ইতিবৃত্তগুলিতে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাধারণতঃ 'ওয়ালি' (Wali) বা 'মুক্‌তি' (Muqti) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই দুইটি শব্দ একার্থবাচক কিনা তাহা জানা যায় না। আধুনিক একটি মত এই যে বিশেষ ক্ষমতাশালী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের 'ওয়ালি' বলিয়া অভিহিত করা হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্তার কর্তব্য ছিল প্রধানতঃ প্রশাসনিক, সামরিক নহে। সুলতান তাঁহাকে নিযুক্ত করিতেন এবং তাঁহাকে বদলি বা বরখাস্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার পদে তাঁহার কোনরূপ স্থায়ী বা উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ অধিকার ছিল না।

সম্ভবতঃ বৃহৎ প্রদেশগুলিকে কয়েকটি 'শিক'-এ (Shiq) ভাগ করা হইত, তাহাদের দায়িত্ব থাকিত 'শিকদার' নামে পরিচিত কর্মচারীর উপর। ইহার নিম্নে ছিল 'পরগণা' কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। সম্ভবতঃ পরগণা ও গ্রামগুলিতে হিন্দু নায়কগণ এবং নিম্নপদস্থ হিন্দু কর্মচারীগণ যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী ছিলেন ; কিন্তু প্রাদেশিক রাজধানীতে মুসলমানদেরই ছিল ক্ষমতা ও পদমর্যাদার একচেটিয়া অধিকার। সুলতানী আমলে কোনও হিন্দু কখনও প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন নাই।

মোটের উপর সুলতানের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন এই প্রদেশগুলি ব্যতীত হিন্দু রাজগণের শাসনাধীন নানা সামন্ত রাজ্য ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি ইহাদের

আনুগত্য ছিল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র।

সৈন্যবাহিনী

সেই যুগে স্থিতিশীল শাসন-ব্যবস্থা রক্ষা করিতে হইলে সর্বাগ্রে যাহার প্রয়োজন হইত তাহা হইল এক বিপুল এবং দক্ষ সৈন্যবাহিনী। সৈন্য দলে চারটি শ্রেণী ছিল: (১) স্থায়ী এবং নিয়মিত রাজকীয় সৈন্যদল, (২) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দ্বারা নিযুক্ত সৈন্যদল, যাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য জমি (ইকৃতা) দেওয়া হইত; (৩) যুদ্ধের সময় সংগৃহীত সৈন্য; (৪) ধর্মযুদ্ধ (জিহাদ) করার জন্য সংগৃহীত মুসলমান সেচ্ছাসেবক বাহিনী। সম্ভবতঃ ইলতুৎমিসই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের বেতনভুক একটি সৈন্যবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। আলাউদ্দীন একটি স্থায়ী সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন। সৈন্যবাহিনীর মেরুদণ্ড ছিল অশ্বারোহী সৈন্যদল, সুতরাং অশ্বের চাহিদা ছিল প্রচুর। হিন্দুদের অনুকরণে হস্তীর চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পদাতিক সৈন্যদের বলা হইত পাইক; তাহাদের স্থান ছিল সকলের নীচে। এক ধরণের গাদা-বন্দুকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, কিন্তু কামান অজ্ঞাত ছিল।

সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত সকল ব্যাপারের দায়িত্ব ছিল 'আরিজ-ই-মামালিকে'র উপর। তাঁহার দপ্তরে সকল সৈন্যের বর্ণনা সহ তালিকা (হুলিয়া) থাকিত। সৈন্যরা যাহাতে ভাল ঘোড়া বদল করিয়া খারাপ ঘোড়া না রাখে তাহার জন্য আলাউদ্দীন খলজী প্রত্যেকটি ঘোড়ার গায়ে দাগ দিবার ব্যবস্থা করেন। সামরিক কর্মচারীরা জায়গীর পাইতেন, কিন্তু সাধারণ সৈন্যদের নগদ বেতন দেওয়া হইত।

২. অর্থনৈতিক অবস্থা

ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশে স্বভাবতঃই বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল। দিল্লীর বিভিন্ন সুলতান বিভিন্ন রকমের অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেন। উপরন্তু, দেশের একটি বৃহদংশ সুলতানী সাম্রাজ্যের বাহিরে ছিল। তথাপি সমগ্র দেশের পক্ষে মোটামুটি ভাবে প্রযোজ্য কিছু সাধারণ তথ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কৃষি

ভূমি হইতে উৎপন্ন শস্য ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড, এবং গ্রামবাসী প্রাথমিক উৎপাদকেরাই জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। শহরবাসীরা কৃষিজাত

দ্রব্যের সরবরাহের জন্য তাহাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। কৃষকেরা তাহাদের পূর্বপুরুষের অনুসৃত চিরাচরিত প্রথায় শস্য উৎপাদন এবং খাদ্যের জন্য ব্যবহার করিত; উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করা হইত। সাধারণতঃ চাহিদা, যোগান, এবং মূল্যের ওঠা-নামা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক নিয়মগুলি তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। আলাউদ্দীন খলজীর আমলের কয়েক বৎসরের কথা বাদ দিলে রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করে নাই।

কৃষি ছিল পারিবারিক পেশা; গৃহকর্তাকে পরিবারের পুরুষ ও নারীরা সাহায্য করিত। প্রতি পরিবারের মালিকানাধীন জমির গড় পরিমাণ সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের অধিক। মহম্মদ বিন তুঘলুক ও ফিরোজ তুঘলুক কৃষির প্রসারের জন্য কিছু চেষ্টা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য পারস্য দেশীয় চাকার (Persian Wheel) ব্যবহারের ফলে পাঞ্জাবে কৃষিকার্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যাপক উৎপাদন সম্বন্ধে নানা স্থানে উল্লেখ দেখা যায়। বৈদেশিক পর্যটকগণ বহু প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইবন বতুতা বলেন যে প্রতি বৎসর দুই বার চাষ হইত। চৈনিক পর্যটক মা-হুয়ান পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশ পরিদর্শন করেন। তিনি এদেশে উৎপন্ন শস্য, শাকসবজী ও ফলের এক দীর্ঘ তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা গুজরাটে গম, যব এবং কড়াই শুঁটির উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্যের স্বল্পতা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তিনি বাহমনী রাজ্যে সুকর্ষিত বহু জমি দেখিয়াছিলেন। পাএস ও বারবোসা বিজয়নগর রাজ্যের কৃষিজ সমৃদ্ধির বর্ণনা দিয়াছেন। মালাবার ছিল 'গোল-মরিচের দেশ'।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে কোন নিয়মিত তথ্য পাওয়া যায় না। নানা কারণে দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত; যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিবর্তন, যোগাযোগ ও যাতায়াতের অসুবিধা, আলা-উদ্দীনের আমল ব্যতীত অন্য সময়ে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের অভাব, ইত্যাদি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্রব্যমূল্য সাধারণতঃ স্বল্প ছিল। বলবনের আমলে 'এমন কোন ভিক্ষুক ছিল না. যাহার তুলাভরা জামা নাই।' আলাউদ্দীন খলজী অর্থনৈতিক আদেশের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন। মহম্মদ বিন তুঘলুকের সময়ে দ্রব্যমূল্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল। ইব্রাহিম লোদীর সময়ে তাহা অতিরিক্ত হ্রাস পায়। ইবন বতুতা বলেন, তিনি যে সকল দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বাংলাদেশেই দ্রব্যমূল্য সর্বাপেক্ষা স্বল্প। দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে দিল্লীর মূল্যহারের হ্রাসবৃদ্ধির পরিবর্তে স্থানীয় ঘটনাবলী দ্বারাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হইত।

শিল্প

গ্রামাঞ্চলে কৃষির পরিপূরক ছিল কুটীর শিল্প। কেবলমাত্র মুসলমান কারিগরদের ক্ষেত্র ব্যতীত এই শিল্প জাতিগত ভিত্তিতে সংগঠিত হইত।

গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে ছিল বয়নশিল্প, ধাতুশিল্প, চিনি, নীল এবং কাগজ। উৎপাদনের জন্য কোন বড় কারখানা ছিল না। যে সকল ছোট শহর বা গ্রামে যাতায়াতের সুব্যবস্থা ছিল সেখানে কারিগরেরা বাস করিত। তাহারা উৎপন্ন দ্রব্য স্থানীয় মেলায় বা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিত। ব্যবসায়ীরা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহের বা বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করিত। কোন কোন ব্যবসায়ী তাহাদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য কারিগরদের নিয়োগ করিত। প্রধান রপ্তানীকারকেরা সাধারণতঃ বন্দরে এবং উপকূলবর্তী শহরে বাস করিত, এবং দেশের অভ্যন্তর হইতে রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিত।

দিল্লীতে সুলতানের 'কারখানা' নামে পরিচিত রাজকীয় উৎপাদনশালা ছিল। এখানে রাজপরিবারের ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুত করা হইত। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহাদের স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফিরোজ তুঘলুকের রাজত্বকালে একটি পৃথক প্রশাসনিক বিভাগের ('দিওয়ান') অধীনে ৩৬টি 'কারখানা' ছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি ছিল উৎপাদন কেন্দ্র, কয়েকটি ছিল দ্রব্য ক্রয়কারী সংগঠন।

সুতী বস্ত্রের উৎপাদন ও রপ্তানিতে বাংলা ও গুজরাটের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রদেশগুলির তুলনায় ইহাদের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ছিল। সমুদ্রকূলে অথবা নদীমুখে বন্দর ছিল এবং বিদেশের সহিত বাণিজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল। ধাতু শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। লৌহ, পারদ ও সীসার খনি ছিল; কিন্তু এগুলিতে অমনোযোগের সহিত কাজ করা হইত এবং উৎপাদন যথেষ্ট ছিল না। দক্ষ শিল্পীরা প্রস্তর, ইষ্টক ও কাষ্ঠের সাহায্যে গৃহ-নির্মাণে কৃতিত্ব দেখাইত। কাগজ প্রস্তুত হইত; কিন্তু উৎপাদন যথেষ্ট ছিল না, মানও উন্নত ছিল না। উত্তর ভারতের নানাস্থানে আখের চাষ হইত এবং নানা রকমের চিনি প্রস্তুত হইত। বাংলায় রপ্তানির জন্য ও দেশে ব্যবহারের জন্য চিনি উৎপন্ন হইত।

ব্যবসা-বাণিজ্য

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ব্যাপক ভাবে চলিত। গ্রামের 'মণ্ডী'গুলি ছিল প্রাথমিক বাণিজ্যকেন্দ্র, এবং দিল্লী ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলি ছিল প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। দেশের নানা স্থানে শিল্পের অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে দিল্লী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে জিনিস সরবরাহের সুব্যবস্থার প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়।

বাণিজ্যের অগ্রগতি ব্যবসায়ী ব্যতীত মালবাহক, দালাল, মহাজন ও শেঠগণের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল ছিল। রাজস্থানের বানজারাগণ এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে কৃষিজাত ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহের ব্যাপক ব্যবস্থা করিত। শেঠগণ ঋণ প্রদান করিয়া ও বন্ধক রাখিয়া মূলধন সরবরাহ করিত। মহাজনেরা প্রধানতঃ হিন্দু ছিল; তাহারা শেঠদের মতই মূলধন সরবরাহের কাজ করিত।

বৈদেশিক বাণিজ্য চলিত স্থলপথে ও জলপথে। উত্তর-পশ্চিমে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে তুর্কীস্থান ও খোরাসানের সহিত বাণিজ্য ব্যাহত হইলেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। রপ্তানি দ্রব্যাদি স্থলপথে মেসোপটেমিয়া হইয়া ভূমধ্য সাগরের উপকূলে চালান যাইত। আর একটি ছিল সমুদ্রপথ—লোহিত সাগরের বন্দর-গুলিতে পৌঁছিবার জন্য। সেখান হইতে স্থলপথে মিশরের মধ্যে দিয়া ভূমধ্য সাগরের উপকূলে পৌঁছিতে হইত। আলেকজাণ্ড্রিয়া বন্দর হইতে ভারতীয় পণ্য-দ্রব্য ভারতবর্ষে ইতালীয় বণিকদের মাধ্যমে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে পৌঁছিত। ওর্মুজ, এডেন ও জেড্ডা ছিল পশ্চিমে ভারতীয় দ্রব্যের প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র। প্রধানতঃ মালাবারের বন্দরগুলি হইতে দ্রব্যাদি চালান যাইত, তবে গুজরাটে ক্যাম্বে বন্দরের স্থানও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পূর্ব আফ্রিকার সহিত ক্যাম্বে বন্দরের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনা জাহাজগুলি মালাবারের বন্দরগুলিতে নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মলক্কা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বন্দরের স্থান লাভ করে। ইহার পরেই ছিল পেগুর স্থান। ক্যাম্বে এবং বাংলার একটি বন্দর (বিদেশীদের কাছে 'বেঙ্গালা শহর' নামে পরিচিত) ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলির সহিত বাণিজ্য করিত।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগীজগণ সমুদ্রের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্বকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত ভারতে বসবাসকারী বিদেশী মুসলমান বণিকেরা, উত্তর ভারতের হিন্দু বণিকেরা নহে। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য হিন্দু ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত হয় নাই। কান্নানোর হইতে হিন্দু ব্যবসায়ীরা নিজস্ব জাহাজে ওর্মুজে যাতায়াত করিত। করোমণ্ডলের চেট্টিগণ ব্রহ্মদেশ ও মলক্কার সহিত বাণিজ্য করিত। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত উড়িষ্যার সহিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমৃদ্ধ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল সূতী বস্ত্র, কার্পেট, ঔষধ, মূল্যবান প্রস্তর ইত্যাদি; আমদানি হইত তাম্র, স্বর্ণ, রঙ্গীন মখমল, জাফরান ইত্যাদি।

৩. সমাজ-ব্যবস্থা

হিন্দু সমাজ

আল-বিরুণী গজনীর সুলতান মামুদের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম ও দর্শন তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন: "সকল শ্রেণীর বিদেশীর বিরুদ্ধেই তাহাদের অন্ধ বিদ্বেষ। তাহারা বিদেশীদের বলে 'ম্লেচ্ছ' অর্থাৎ অপবিত্র, এবং বিদেশীদের সহিত সর্ব প্রকার সম্বন্ধ— বৈবাহিক বা অন্য কোন পারিবারিক সম্পর্ক, এমন কি একত্রে উপবেশন বা পানাহার—তাহাদের নিকট নিষিদ্ধ, কারণ তাহারা মনে করে যে উহাতে তাহারাও অপবিত্র হইবে।" তাহারা 'অপর জাতির সহিত সংমিশ্রণ' এড়াইয়া চলিত। তাহারা সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের সঙ্কীর্ণ বিশ্বাসের শিকার হইয়া পড়িয়াছিল। আল-বিরুণী বলেন, 'হিন্দুরা মনে করে যে তাহাদের দেশের ন্যায় আর কোন দেশ নাই, তাহাদের রাজার ন্যায় অপর রাজা নাই, তাহাদের বিজ্ঞানের ন্যায় অপর বিজ্ঞান নাই।'

হিন্দু সমাজ গ্রীক, শক, কুষাণ ও হূণ প্রভৃতি পূর্ববর্তী অনুপ্রবেশকারীদের যে রূপে নিজ সমাজভুক্ত করিয়াছিল, মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে তাহা করিতে পারে নাই। মুসলমানগণ যে ধর্মে গোঁড়া বিশ্বাসী ছিল; তাহারা মূর্তি পূজাকে পাপ বলিয়া মনে করিত। তাহাদের সামাজিক আচারগুলিকে জাতিভেদ প্রথার গণ্ডীতে বাঁধিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার এই মৌলিক পার্থক্যের ফলে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর উঠিল।

জাতিভেদ প্রথাই ছিল হিন্দু সমাজের ভিত্তি। হিন্দুরা যাহাতে মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া অপবিত্র না হয় তাহার জন্য সমাজ-রক্ষক ব্রাহ্মণেরা নানা কঠিন নিয়ম প্রবর্তন করিলেন। কবীর, নানক প্রভৃতি মধ্যযুগীয় ধর্ম সংস্কারক জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ফলে হিন্দু সমাজ কিছুই নমনীয় হইল, কিন্তু জাতিভেদ প্রথা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ পূর্বের ন্যায় নিষিদ্ধ রহিল।

নারীগণের সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রের পুরাতন নিয়মগুলি প্রচলিত ছিল। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে তাহাদের উপর কিছু বাধানিষেধ ছিল। তাহারা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল। তাহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের অধিকারও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। উচ্চ জাতির বিধবারা 'সতী' হইত।

মুসলমান প্রচারকদের প্রচারকার্য, জমি ও কাজকর্মের সুযোগের প্রলোভন ও বলপ্রয়োগের ফলে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যুদ্ধে বন্দী হিন্দু সৈন্যদের সাধারণতঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইত।

মুসলমান রাজগণের অধিকৃত অঞ্চল ভিন্ন অন্যত্র হিন্দু ধর্মের প্রাচীন শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। যাহারা জন্মসূত্রে হিন্দু নয়—যেমন, আদিবাসীরা—তাহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিত। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আহোম রাজ্যে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা অনুপ্রবেশ করে।

মুসলমান সমাজ

ভারতে যে সকল মুসলমান আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বহু জাতির মানুষ ছিল: তুর্কী, আফগান, মোঙ্গল, পারসিক, আরব, হাবসী। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দুগণ ক্রমশঃ মুসলমান জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। এই সকল ভিন্ন জাতীয় মানুষ এক ধর্ম, বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং মোটামুটি এক ধরণের সামাজিক আচারের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

মুসলমান সমাজের ভিত্তি ছিল সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ, কিন্তু বাস্তবে সমাজে বহু শ্রেণী ছিল। বরনী উচ্চবংশজ ও নিম্নবংশজ মুসলমানগণের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। সাধারণতঃ, বিদেশাগত মুসলমানদের সামাজিক সম্মান বেশী ছিল।

মুসলমান সমাজে দুইটি সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল: 'উমারা' বা অভিজাত, এবং 'উলেমা' বা ধর্মশাস্ত্রবিদ। অভিজাতগণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইত: 'খান', 'মালিক' ও 'আমীর'। সকল উচ্চ রাজপদ তাঁহাদের অধিকারে ছিল; তাঁহারা বড় বড় জায়গীর পাইতেন। 'উলেমা' শ্রেণী শাস্ত্রবিদ, 'সৈয়দ' ও 'পীর'গণকে লইয়া গঠিত ছিল। অভিজাত ও উলেমাদের সামাজিক সম্মান উচ্চ ছিল। অভিজাতগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতেন এবং বিলাসী জীবন যাপন করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে উলেমাদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

সুবিধাভোগী শ্রেণীদের নিম্নে ছিল মধ্যবিত্তগণ। ইহাদের আয়ের উৎস ছিল জমি, নিম্ন শ্রেণীর রাজকার্য অথবা অভিজাতগণের অধীনে কর্ম। এই শ্রেণীর উদ্যমী ব্যক্তিরা অনেক সময় অভিজাত শ্রেণীতে প্রবেশের সুযোগ পাইত। সর্বনিম্নে ছিল কৃষকগণ, কারিগর, গৃহভৃত্য ও ক্রীতদাসগণ। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। প্রকাশ্য বাজারে ক্রীতদাসদের বিক্রয় করা হইত। তাহাদের সাধারণতঃ গৃহকার্যে নিয়োগ করা হইত; কৃষি বা শিল্পে ক্রীতদাসদের নিয়োগ করা হইত না। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তাহাদের অবদান অতি সামান্য ছিল।

মুসলমান নারীদের সম্পত্তিলাভের অধিকার ছিল। হিন্দু বিবাহের ন্যায় মুসলমান বিবাহের বন্ধন অচ্ছেদ্য ছিল না। নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথাও মুসলমান সমাজে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বহুবিবাহের বহুল প্রচলন ছিল, পর্দা প্রচলিত ছিল।

বিদেশাগত মুসলমানদের সামাজিক জীবনে ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের প্রভাব পড়িতেছিল। ভারতে স্থায়ী বসবাসের ইহা ছিল অবশ্যম্ভাবী ফল। তাহাদের খাদ্য, পোষাক ও আমোদপ্রমোদ হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছিল। হিন্দুরাও তাহাদের পোষাক ও সামাজিক রীতি-নীতির অনুকরণ করিত। এইরূপে প্রতিবেশী দুই সমাজের মধ্যে ব্যবধান অংশতঃ হ্রাস পায়।

৪. স্থাপত্য শিল্প

হিন্দু ও মুসলমান শিল্পাদর্শের সম্মিলন

স্যার জন মার্শ্যাল (Sir John Marshall) বলেন, হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার মিলনের ফলে সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব হয়। এই স্থাপত্য শিল্পের কতখানি ভারতবর্ষের অবদান, এবং কতখানি ইসলামের, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই অসুবিধার একটি প্রধান কারণ এই যে 'মুসলমানেরা এশিয়ায়, আফ্রিকায় বা ইয়োরোপে, যেখানেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেখানেই প্রচলিত শিল্পরীতিকে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষে আসিয়া পেঁৗছিবার পূর্বেই সারাসেনীয় (Saracenic) স্থাপত্য শিল্প এইরূপে একটি বহুজাতিক শিল্পে পরিণত হয়, এখানে আসিয়া তাহা অভিনব উপাদানরাশি আত্মসাৎ করিয়া অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করে।' হিন্দুদের নিকট হইতে গৃহীত এই সকল উপাদানের মধ্যে দৃঢ়তা (strength) ও সৌন্দর্যের কোমলতাকে (grace) মার্শ্যাল সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়াছেন।

দিল্লীতে অনুসৃত রীতি

হিন্দু-সারাসেনীয় (Indo-Saraceinc) স্থাপত্যরীতি স্বভাবতঃই পূর্ণ ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য লইয়া বিকশিত হয় ভারতে মুসলমান শক্তি ও সভ্যতার কেন্দ্র দিল্লী নগরীতে। ১১৯৩ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী জয়ের স্মারক রূপে কুতবউদ্দীন আইবক কুয়াৎ-উল-ইসলাম মসজিদ নির্মাণ করেন। তাহার প্রারম্ভিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ছিল মূলতঃ হিন্দু রীতির অনুসারী; কিন্তু পরবর্তী কালে তাহাতে কয়েকটি বিশিষ্ট মুসলমান উপাদান যোগ করা হয়। ইলতুৎমিস এবং আলাউদ্দীন ইহার আয়তনের প্রসার করেন। কুতব মিনার ছিল প্রথমে এরূপ একটি স্তম্ভ যেখান হইতে মুয়াজ্জিন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের নামাজে যোগদানের জন্য আহবান জানাইতে পারিবেন, কিন্তু অচিরেই ইহা একটি বিজয়স্তম্ভ রূপে পরিগণিত হইতে থাকে। কুতব মিনারের নির্মাণকার্য শুরু করেন কুতবউদ্দীন, সমাপ্ত করেন ইলতুৎমিস। ফার্গুসন (Fergusson) ইহাকে বিশ্বের মধ্যে নিখুঁততম স্তম্ভের নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মার্শ্যাল বলেন, 'এই গম্ভীরদর্শন সুবিশাল

সৌধ অপেক্ষা মুসলমান শক্তির অধিকতর মর্মগ্রাহী ও যথাযথ প্রতীক যে আর কিছুই হইতে পারে না, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।' তাঁহার মতে ইহার 'সুপ্রচুর অথচ সংযত কারুকার্য অপেক্ষা সুন্দরতরও আর কিছুই হইতে পারে না।' ইহা অবশ্য সম্পূর্ণরূপে মুসলমান স্থাপত্য শিল্পের একটি নিদর্শন ; এই ধরণের স্তম্ভ হিন্দুদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। কুতবউদ্দীনই নির্মাণ করেন আজমীরের প্রসিদ্ধ আড়াই-দিন-কা ঝোঁপড়া নামক মসজিদ ; ইলতুৎমিস পরে উহাতে একটি জাফরির প্রাচীর যুক্ত করিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন।

ইলতুৎমিসের মৃত্যু এবং আলাউদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণের মধ্যবর্তী সময়ে দিল্লীতে কোন উল্লেখযোগ্য সৌধ নির্মিত হয় নাই। ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে হিন্দু প্রভাবের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তাহার চরম পরিণতি ঘটে। নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধির উপর আলাউদ্দীন যে মসজিদ নির্মাণ করেন, তাহা 'সম্পূর্ণরূপে মুসলমান ভাবধারা অনুযায়ী নির্মিত ভারতের সর্বপ্রথম মসজিদ' রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আলাউদ্দীনের আমলে নির্মিত আর একটি চিত্তাকর্ষক সৌধ আলাই দরওয়াজা ; ইহা 'ইসলামী স্থাপত্যরীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন'। আলাউদ্দীন সিরি নগরী নির্মাণ এবং হাউজ-ই-খাস সরোবর খনন করেন। সিরির ধ্বংসাবশেষ হইতে সে যুগের সামরিক স্থাপত্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়।

খলজী আমলের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য অলঙ্করণের বাহুল্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রাচুর্য। তুঘলুক যুগের সৌধাবলী 'শুচিশুদ্ধ সংযমের' জন্য মনোরম। এই ভাবটিই ক্রমে কঠোর শুচিতাগ্রস্ত সারল্যে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের আংশিক কারণ অর্থের অপেক্ষাকৃত অপ্রাচুর্য, কিন্তু মহম্মদ বিন তুঘলুক ও ফিরোজ তুঘলুকের ধর্মনিষ্ঠাও ইহার জন্য দায়ী।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক তুঘলুকাবাদ শহর নির্মাণ করেন। ইহার ধ্বংসাবশেষ এখন দর্শকের চিত্তে 'অটল শক্তি ও বিষণ্ণ মহিমার ভাব' সঞ্চার করে। এই নগর প্রাকারের পাদদেশে সুলতান নিজের জন্য যে সমাধিভবন নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা সারল্য ও দৃঢ়তায় অপরূপ। মহম্মদ বিন তুঘলুক আদিলাবাদের দুর্গ ও জাহানপনা শহর নির্মাণ করেন। ফিরোজ শাহও ছিলেন প্রখ্যাত সৌধনির্মাতা। তিনি দিল্লীতে ফিরোজাবাদের প্রাসাদ-দুর্গ নির্মাণ করেন।

সৈয়দ ও লোদী সুলতানগণের বিশাল সৌধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবল ছিল না। এই যুগের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সুলতান ও আমীরগণের সমাধি ভবন। তুঘলুক যুগের প্রতিক্রিয়ার অবসান হইয়া তখন লোদী স্থাপত্যে 'হিন্দু প্রতিভার ইন্দ্রজাল স্পর্শে প্রাণের ও ভাবের' সঞ্চার ঘটিয়াছিল। এই ধারাই মুঘল যুগে অব্যাহত থাকে। মুঘলদের স্থাপত্য শিল্পের উপর লোদী সুলতানদের স্থাপত্যরীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বিবিধ প্রাদেশিক রীতি

বহু প্রাদেশিক শাসকও দিল্লীর সুলতানদের মত শিল্পানুরাগী ছিলেন; কোন কোন প্রদেশে বিশিষ্ট শিল্পরীতির উদ্ভব হয়। বাংলায় গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ এখনও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। পাণ্ডুয়ায় সিকন্দর শাহ কর্তৃক নির্মিত আদিনা মসজিদ মুসলমান জগতের অন্যতম বৃহত্তম মসজিদ। গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা 'ইষ্টক ও পোড়ামাটির মাধ্যমে কি সৃষ্টি করা যাইতে পারে তাহারই এক অপূর্ব নিদর্শন'। মোটের উপর অবশ্য গৌড়ের শিল্পরীতি গুজরাটের রীতির তুলনায় অপকৃষ্ট। এই পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশে মামুদ বেগাড়ার সময়ে স্থাপত্য শিল্পের চরম উন্নতি ঘটে। আহম্মদনগরে আহম্মদ শাহ কর্তৃক নির্মিত জামি মসজিদ এবং চম্পানেরে মামুদ বেগাড়ার বৃহৎ মসজিদ মুসলমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌধগুলির মধ্যে পরিগণিত। গুজরাটের শিল্পরীতিতে তখনও পর্যন্ত প্রচলিত হিন্দু রীতির অসামান্য প্রভাব ছিল; কিন্তু মালবে মুসলমান প্রভাবই ছিল প্রধান। মার্শ্যাল বলেন, 'ভারতের দুর্গশহরগুলির মধ্যে মাণ্ডু সর্বোত্তম।' দিল্লী ও মাণ্ডুর স্থাপত্যরীতির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রসিদ্ধ জামি মসজিদ, এবং হিন্দোলা মহল নামক প্রকাণ্ড দরবার গৃহ 'মহৎ ভাবের দ্যোতনায়' দিল্লীর সৌধাবলীর মধ্যেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। উত্তর ভারতে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের আর একটি কেন্দ্র ছিল জৌনপুর। জৌনপুরী রীতির সর্বাপেক্ষা সুচারু নিদর্শন আটালা মসজিদ ১৪০৮ খ্রীস্টাব্দে ইব্রাহিম শাহ শর্কী কর্তৃক নির্মিত হয়।

দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শিল্পকলা নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য প্রভূত চেষ্টা করে; 'ভারতের অন্য কোথাও দেশীয় শিল্পরীতির আত্মীকরণের গতি দাক্ষিণাত্যের ন্যায় মন্থর ছিল না।' বাহমনী সুলতানদের সামরিক স্থাপত্যে ইয়োরোপীয় ও পারসিক প্রভাব সহজেই লক্ষণীয়। দৌলতাবাদে মহম্মদ বিন তুঘলুকের রাজধানী 'মধ্যযুগীয় জগতে দুর্গনির্মাণের অন্যতম আশ্চর্য উদাহরণ।' বাহমনী সুলতানদের নির্মিত বিবিধ মসজিদ ও সমাধিভবন গুলবর্গা ও বিদরে দেখা যায়।

হিন্দু স্থাপত্য শিল্প

মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষের সর্বত্র বিশাল সৌধাবলী নির্মাণ করিতেছিল, তখনও স্বাধীন হিন্দু রাজগণ তাঁহাদের চিরাচরিত ঐতিহ্যগত শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বিরত হন নাই। উত্তর ভারতে এই যুগের হিন্দু স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি দেখা যায় রাজস্থানে। মেবারের রাণা কুম্ভ চিতোরে এক বিশাল জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। বিজয়নগরের পরাক্রান্ত রাজগণ শিল্পকলার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা বিবিধ সভাগৃহ, সরকারী ভবন, প্রাসাদ, মন্দির এবং বাঁধ নির্মাণ করেন; এই সব স্থাপত্যকীর্তি বৈদেশিক পর্যটকদের

বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায় যে প্রসিদ্ধ বিঠল মন্দির নির্মাণের সূচনা করেন, ফার্গুসন তাহাকে 'দক্ষিণ ভারতে এই শ্রেণীর সৌধাবলীর মধ্যে সর্বোত্তম' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৫. সাহিত্য

ফার্সী সাহিত্য

জনৈক প্রথিতযশা ইয়োরোপীয় সমালোচক বলেন, "ভারতবর্ষে রচিত ফার্সী সাহিত্যে সত্যকার পারসিক রসের সন্ধান বড় একটা পাওয়া যায় না। ঐ রস একান্তভাবে পারস্যদেশে রচিত সাহিত্যেরই সম্পদ।" কিন্তু দীর্ঘ মুসলমান শাসন-কালে যে বিপুলসংখ্যক পারসিক কবি ভারতবর্ষে বাস করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকজন প্রকৃত সৌন্দর্যমণ্ডিত কাব্যই রচনা করিয়াছেন এবং তাহা সাধারণভাবে ফার্সী সাহিত্যের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমীর খসরু ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

বৈদেশিক বংশোদ্ভূত মুসলমান আমীর খসরুর জন্ম হয় ভারতে, ১২৫৩ খ্রীস্টাব্দে। কবি রূপে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব ঘটে বলবনের রাজত্বকালে। তাহার প্রথম জীবনের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ। জালালউদ্দীন খলজীর সিংহাসন লাভের পর তিনি সভাকবি রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তাঁহার এই সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। আলা-উদ্দীনের রাজত্বকালের কুড়ি বৎসর আমীর খসরুর কবিজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় এবং ভারতে ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ যুগ। আমীর খসরু নিজাম-উদ্দীন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি রাজকীয় অনুগ্রহ উপভোগ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে আমীর খসরু ৯৯টি গ্রন্থ রচনা করেন। বাস্তবিকই তিনি এতগুলি গ্রন্থ রচনা করুন বা না করুন, এ কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে তাঁহার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হারাইয়া গিয়াছে, কিংবা এখনও পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ কাব্যগুণ ছাড়াও মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস। তাঁহার একটি গদ্যগ্রন্থে আলাউদ্দীনের দিগ্বিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। অপর একটি গ্রন্থে তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক অবস্থার আকর্ষণীয় বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার রচনা হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে তাঁহার সময়ে বিজিত হিন্দুদের জ্ঞানানুশীলনে উদ্যম অব্যাহত ছিল। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে আমীর খসরুর আগ্রহ ছিল। তিনি হিন্দুদের এই মৌলিক ধারণা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে তাহারা যে সকল বিগ্রহ ও অন্যান্য বস্তুর পূজা করিয়া থাকে, তাহা ঈশ্বরের শক্তি ও মহিমার প্রতীক মাত্র।

মীর হাসান দেহ্‌লভী নামে অপর একজন খ্যাতনামা ফার্সী কবি আমীর খসরুর সমসাময়িক ছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলুকের রাজত্বকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচনাবলী 'গীতিধর্মী ও পরম মনোহর' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ফার্সী ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ

সুলতানী যুগে ফার্সী ভাষায় কয়েকটি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়। সুলতানী আমলের ইতিহাস রচনায় আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মিনহাজউদ্দীনের 'তবকৎ-ই-নাসিরী,' বরনীর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী,' শামস্-ই-সিরাজ আফিফের 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী,' এবং ইয়াহিয়া বিন আহম্মদের 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন।

উর্দু ভাষার উদ্ভব

দৈনন্দিন জীবনে বিবিধ প্রয়োজনে হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পরের সাহচর্যে আসিতে হইত। ইহার ফলে একটি সাধারণ ভাষার উদ্ভব হয়। এই ভাষাই উর্দু ভাষা বলিয়া অভিহিত হয়। 'উর্দু মূলতঃ ছিল দিল্লী ও মীরাট অঞ্চলে বহু শতাব্দী যাবৎ কথিত পশ্চিমাঞ্চলীয় হিন্দীর এক প্রাদেশিক রূপ মাত্র; ইহা সৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত।' এই প্রধানত হিন্দু ভাষাটি মুসলমানদের সরাসরি আগমনের পর ক্রমশঃ ফার্সীর প্রভাবে নানা অভিনব বৈশিষ্ট্য লাভ করে। বিদ্যানুরাগী সাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যে আমীর খসরুই প্রথম উর্দুকে কবির কল্পনা রূপায়ণের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করেন।

হিন্দু সাহিত্য

হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের অবসান হইলেও তাহাদের সাহিত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। রামানুজ, পার্থসারথি মিশ্র, দেব সুরি, জীব গোস্বামী, বিজ্ঞানেশ্বর, জীমূতবাহন, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম, দর্শন ও ব্যবহার-বিধি (অর্থাৎ আইন) সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তবে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের মান অবনত হইতে থাকে; নানা শ্রেণীর কাব্য রচিত হইলেও তাহাদের কাব্যগুণের মান ছিল নিম্নগামী। মুসলমানদের মধ্যে স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়।

এই যুগের সাহিত্যের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিবিধ প্রাদেশিক ভাষার বিকাশ। এই যুগে হিন্দী কাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 'পৃথ্বীরাজ-রাসো'। ইহা চাঁদ বরদাই রচিত বলিয়া পরিচিত। কবীরের দোঁহাগুলি, এবং শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেবে'র বৃহদাংশ, হিন্দী ভাষায় রচিত। ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে

বাংলা, অসমীয়া, পাঞ্জাবী ও মারাঠী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্যের বিকাশের পথ খুলিয়া যায়। ভিল্লিপুত্তুর রচিত মহাভারতের তামিল সংস্করণ 'ভারত' এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয়। এরপ্রগড তেলুগু ভাষায় রামায়ণ, এবং মহাভারতের অংশবিশেষ, রচনা করেন। কানাড়ী ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণ অনূদিত হয়। কেরালায় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত 'রামচরিতম্' মালয়ালম ভাষার জন্ম সূচনা করে।

৫. ধর্মীয় আন্দোলন

ভক্তি আন্দোলন : দক্ষিণ ভারত

চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যে প্রবল হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোড়িত করে তাহার মূল কথা ছিল 'ভক্তি' (ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধা)। বৈদিক সাহিত্যে ভক্তির আদর্শের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। 'গীতা' ও 'বিষ্ণু পুরাণে' এই আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ধর্মবিশ্বাস রূপে ইহার পূর্ণ বিবর্তন সুস্পষ্ট রূপে লক্ষ্য করা যায় 'ভাগবত পুরাণে' (আনুমানিক ৯০০ খ্রীস্টাব্দ)। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অলৌকিক কাহিনীগুলি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে 'আলবার' (Alvar) ও 'আদিয়ার' (Adyar) নামে পরিচিত সাধক-কবিদের ধর্ম প্রচারের ফলে তামিল দেশে ভক্তি ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মে বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত করিয়া জনসাধারণকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা'র পূজার প্রতি আকৃষ্ট করা। এই 'শ্রেষ্ঠ দেবতা' আলবারদের নিকটে ছিলেন বিষ্ণু এবং আদিয়ারদের নিকটে শিব। ইঁহাদের কেহ কেহ নিম্ন জাতীয় ছিলেন, এবং একজন ছিলেন অণ্ডাল নাম্নী এক নারী। তাঁহারা জনগণের কথ্য ভাষায় রচিত ভক্তি-গীতির মাধ্যমে জনগণকে প্রভাবিত করিতেন। তাঁহারা সামাজিক সাম্য ও জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

দশম শতাব্দীতে নাথমুনি আলবারদের ভক্তিগীতিগুলি সংকলন ও শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই সংকলন 'নলরীয় প্রবন্ধম' নামে পরিচিত। ইহার চারটি খণ্ডের একটি — নাম্মালভারের 'তিরুভায়মযী'—বেদের ন্যায় পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়। আদিয়ারগণের রচনাগুলি দশম শতাব্দীতে 'তিরু-মুরাই' নামে পরিচিত একাদশটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এই সাধককবিগণ তাঁহাদের গাথাগুলি জনগণের ভাষা তামিলে রচনা করিয়াছিলেন।

মানুষ এবং তাঁহার স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্কের মূল প্রশ্নটিতে আলবার ও আদিয়ার-

গণের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। উভয় সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করিত যে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হইল 'ভক্তি'। উভয়ের নিকটেই একেশ্বরবাদ প্রধান বিষয়। পার্থক্য কেবল ভক্তিভাজন দেবতার নামে; এক সম্প্রদায়ের নিকট ইনি বিষ্ণু, অপর সম্প্রদায়ের নিকট ইনি শিব।

দক্ষিণ ভারতীয় দার্শনিকগণ

দক্ষিণ ভারতের প্রয়োজন ছিল এক ব্যক্তিগত ঈশ্বরের, মুক্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তার এবং প্রার্থনার জন্য নির্দেশের। আলবার ও আদিয়ারগণ এই প্রয়োজন পূরণ করেন। তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস ছিল দ্বৈতবাদী, অর্থাৎ তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না যে 'ভক্তে'র আত্মা এবং ঈশ্বর একই। এই দ্বৈতবাদের বিরোধিতা করিয়া শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। প্রাচীন পৌরাণিক ঋষিদের কথা বাদ দিলে শঙ্করাচার্যই ছিলেন ভারতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক। মালাবারের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। গুপ্ত যুগে বৌদ্ধ ধর্মের যে অধঃপতনের সূচনা হয় শঙ্করাচার্য তাহা সমাপ্ত করেন, এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যুক্তিসঙ্গত ও যথাযথ দার্শনিক ব্যাখ্যা দেন। একেশ্বরবাদের উপর তিনি যে গুরুত্ব দিয়াছিলেন তাহাতে কোন কোন আধুনিক লেখক ইসলামের প্রভাবের চিহ্ন দেখিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে ব্রহ্মই পরম শক্তি এবং জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ নাই। মানুষ এবং তাহার স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্যকে অস্বীকার করিয়া শঙ্করাচার্য্য ভক্তিবাদের মূলতত্ত্বকেই অস্বীকার করেন। জনগণের ভাষা ব্যবহার না করিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। যে সকল সামাজিক সমস্যা হিন্দুদের দুর্বল করিতেছিল, তাহাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

রামানুজ নামক অপর এক ব্রাহ্মণ দার্শনিক একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের বিরোধিতা করিয়া মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে ভক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কাঞ্চী ও শ্রীরঙ্গম ছিল তাঁহার প্রচারকার্যের আদি কেন্দ্র, কিন্তু চোলগণের বিরোধিতার ফলে তিনি হোয়সলরাজ্যে গমন করিয়া সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব (শর্তাধীন অদ্বৈতবাদ) মূলতঃ দ্বৈতবাদের একটি বিশিষ্ট রূপ। ইহা আলবারগণের ভক্তিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রথাগত ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রতিবাদও তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই। ঈশ্বরের অনুরাগীদের মধ্যে বিভেদ না রাখিয়া তিনি স্বীকার করেন যে ভক্তি সকল মানুষকে সমান করিয়া দেয়। তিনি মেলকোটের মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের অধিকার দিয়াছিলেন। তিনি 'সত্তনী' নামে

অভিহিত এক শ্রেণীর শূদ্রকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তবে তিনি বলিতেন যে উচ্চ তিনটি জাতির ব্যক্তিদেরই কেবল ধর্মাচরণের স্বাধীনতা আছে, অন্য জাতীয় ব্যক্তিদের পুণ্যকার্যের মাধ্যমে পরজন্মে ধর্মীয় উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রাচীনপন্থীর দার্শনিক হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের জন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া দেন। শঙ্করাচার্যের ন্যায় তিনিও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রতি ভক্তি প্রচার করিতেন।

পরবর্তী কালে যে সকল দক্ষিণ ভারতীয় দার্শনিক বিবিধ ধরণের দ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিম্বার্ক (একাদশ শতাব্দী), মাধব (দ্বাদশ শতাব্দী), বেদান্ত দেশিক (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং বল্লভ (পঞ্চদশ শতাব্দী)। ইতিমধ্যে ভক্তিবাদ উত্তর ভারতেও প্রসারিত হইয়াছিল।

রামানন্দ

ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই সাধারণ মানুষের জীবনে হিন্দু ধর্মকে একটি সজীব, সক্রিয় শক্তিতে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কারণ ইতিমধ্যেই ইসলাম উত্তর ভারতে হিন্দু সমাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে উপস্থিত হইয়াছিল। ভক্তি ধর্ম এই বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিল। রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত রামানন্দ ইহাকে উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছিলেন 'উত্তর ও দক্ষিণের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে সেতুস্বরূপ।' সম্ভবতঃ তিনি এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করিয়া বারাণসীতে শিক্ষালাভ করেন। তিনি স্থানীয় হিন্দী ভাষায় রাম ও সীতার প্রতি ভক্তি প্রচার কবিতেন। তিনি পূজাবিধির সরলীকরণ এবং সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরতা হ্রাস করেন। সে যুগের ধর্মীয় সমস্যা সমাধানে ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। অনেকের মতে এই সকল অভিনবত্ব ইসলামের প্রভাবের ফল; কিন্তু এই মত বিশ্বাসযোগ্য নহে।

রামানন্দের সাফল্য ছিল সীমাবদ্ধ। তাঁহার শিক্ষার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সেতুবন্ধের সূত্রপাত হয় নাই। মুসলমানগণ রাম-সীতার উপাসনা গ্রহণ করে নাই। কবীর সম্ভবতঃ তাঁহার শিষ্য ছিলেন; কিন্তু একটি কিংবদন্তী অনুসারে কবীর মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামানন্দের আরও অনেক শিষ্য ছিল; কিন্তু তিনি কোন সম্প্রদায় গঠন করেন নাই, তাঁহার চিন্তাধারাকে লিখিত রূপ দেন নাই। তাঁহার প্রবর্তিত উদার আন্দোলন ধীরে ধীরে সনাতন ভাবধারায় চাপা পড়িয়া যায়। তাঁহার বর্তমান অনুবর্তীদের প্রায় সকলেই অত্যন্ত কঠোরতার সহিত বর্ণাশ্রম পালন করে।

কবীর

কবীর ছিলেন মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা উদারপন্থী সংস্কারক। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 'কবীর যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সকল ধর্মের লোকই তাহা গ্রহণ করিতে পারে। সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া অধ্যয়ন করিলে তাহা সকলের পক্ষেই মুক্তির পথ সুগম করিবে। ঈশ্বরের নামোচ্চারণে কবীরের এমনই নিষ্ঠা ছিল যে তাহার সহিত তুলনায় তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধিনিষেধ এবং হিন্দু ও মুসলমানের বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতেন।' বারাণসীতে তিনি সাধারণ গৃহস্থের অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। অতীন্দ্রিয়বাদ (mysticism) তাঁহার রচিত দোহাগুলির প্রধান বিশেষত্ব হইলেও সংস্কারক রূপে তাঁহার ছিল স্বচ্ছ ব্যবহারিক দৃষ্টি। মধ্য যুগের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতৃবর্গের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসমানের ঐক্যসাধনে ব্রতী হন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন : 'হিন্দুরা রামকে ডাকে, মুসলমানেরা ডাকে রহিমকে। উভয়ে উভয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া উভয়কে হত্যা করে, সত্যের সন্ধান কেহই জানে না।' স্পষ্টতঃই তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বানে বিশেষ সাড়া পান নাই। তাঁহার রচনাবলী হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার অনুগামীগণ 'কবীরপন্থী' নামে পরিচিত।

চৈতন্য

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় ধর্মজীবনের স্রোত নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। 'জাতিভেদ প্রথার বিধিনিষেধ কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিল। জাতিভেদের ফলে মানুষে মানুষে ব্যবধান বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিম্ন বর্ণের লোকেদের সম্মুখে শিক্ষার দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ; তাহাদের স্বেচ্ছাচারে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা আর্তনাদ করিতেছিল। আচারবহুল পৌরাণিক ধর্ম ব্রাহ্মণকুলের একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছিল।' চৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ইহার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

চৈতন্যের আবির্ভাব পশ্চিম বঙ্গের নবদ্বীপে, ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে, তিরোভাব পুরীতে, ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে। তিনি রাধা ও কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। এই গুরুশ্রেষ্ঠ ছিলেন জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যে সকল ক্রিয়াকলাপ একান্ত অপরিহার্য মনে করিতেন, তিনি তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি শিক্ষা দেন যে ভক্তিই প্রকৃত পূজা। শিষ্য গ্রহণে তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার প্রভাবে সংগঠিত নূতন ধর্মসম্প্রদায়ে মুসলমানের স্থান হইল। বৈষ্ণব ধর্ম নিম্নশ্রেণীর মানুষের সম্মুখে এক নূতন আধ্যাত্মিক জীবন ও জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। তিনি গ্রন্থ অথবা গাথা রচনা

করেন নাই, কিন্তু তাঁহার প্রভাবে এক নূতন বৈষ্ণব দর্শনের এবং বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।

চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' নামে পরিচিত। তাঁহার অনুগামীরা এই ধর্মের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার নাম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন'।

মহারাষ্ট্রের সংস্কারকগণ

মহারাষ্ট্রে কয়েকজন উদ্যমী সংস্কারক হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সেতু রচনার চেষ্টা করেন। রাণাডে (Ranade) বলেন, তাঁহারা 'জনগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে রাম ও রহিম অভিন্ন; জনগণ যাহাতে আচার-অনুষ্ঠানের ও জাতিভেদ প্রথার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, এবং মানবপ্রেম ও ভগবদ্বিশ্বাসে একত্র সম্মিলিত হয়, তাহার জন্যও তাঁহারা চেষ্টা করেন।' মহারাষ্ট্রে ভক্তি ধর্মের কেন্দ্র ছিল ভীমা নদীর তীরে পণ্ঢরপুরে অবস্থিত বিঠোবার (বিষ্ণুর) মন্দির। এই আন্দোলনের সহিত যুক্ত সাধকদের মধ্যে জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব (ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী) একনাথ ও তুকারাম (পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী) এবং রামদাসের (সপ্তদশ শতাব্দী) নামে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নামদেবের একটি বিশিষ্ট বাণী হইল : 'ব্রত, উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই; তীর্থযাত্রারও আবশ্যক নাই। হৃদয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সতত হরিনাম গান কর।'

এই সকল ধর্মসংস্কারকের রচনা ও উপদেশাবলী শিবাজীর ন্যায় পরবর্তী কালের নেতৃবর্গের রাজনৈতিক লক্ষ্যের আধ্যাত্মিক পটভূমি রচনা করিয়াছিল। 'যে সুপ্রাচীন অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার এতকাল কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া জনসাধারণের অনধিগম্য হইয়াছিল, তাহাকে ইঁহারা জনসাধারণের নিকট বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী মারাঠি পদ্যে, প্রায়শঃই সুর সংযোগ করিয়া, প্রকাশ করেন। অধিকন্তু উৎপীড়িত জনগণের পক্ষ লইয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার মাধ্যমে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট এই আকুল আকুতি নিবেদন করেন যে মুসলমানের নির্যাতন হইতে তাহারা যেন অব্যাহতি লাভ করে।' ইহাই রাজনৈতিক ইতিহাসে মারাঠা ধর্মসংস্কারকদের অবদান। তাঁহাদের চেষ্টায় 'সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে এক নূতন জাতীয় জীবনের হৃৎস্পন্দন শুরু হয়।' উত্তর ভারতে রামানন্দ ও কবীরের প্রচারের ফলে, বা বাংলায় চৈতন্য প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে, এইরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই।

শিখ ধর্ম

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর

জেলার তালবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দে লোকান্তরিত হন। প্রথম জীবনে তিনি পাঞ্জাবে সুলতানপুরের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদীর অধীনে সামান্য কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সুগভীর ধ্যানের মাধ্যমে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, এবং পরে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। তিনি ভারতের মধ্যে এবং ভারতের বাহিরে নানা স্থানে, এমন কি মক্কা, মদিনা ও বাগদাদে ভ্রমণ করেন। শেষ জীবনে তিনি পাঞ্জাবে কর্তারপুরে বসবাস করিতে থাকেন। সেখানেই তিনি ধর্মোপদেশ দান এবং নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নানকের বাণীর সার তত্ত্ব তিনটি : এক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর, ধর্মজীবনের নায়ক গুরু, এবং মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নাম কীর্তন। তিনি কঠোর একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি বেদ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের কর্তৃত্ব, প্রচলিত ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে পুণ্য লাভের সম্ভাবনা এবং জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করেন। এই কারণে কোন কোন লেখক বলেন যে তিনি ছিলেন 'একজন বিপ্লবী ; যে সমাজে তাঁহার জন্ম, তাহার সযত্নরক্ষিত যাবতীয় বিধিবিধান ধূলিসাৎ করিয়া এক সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টির পর সেই ধ্বংসস্তূপের উপর এক নব বিধান সৃষ্টিই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।' অপর মত এই যে তিনি 'প্রাচীন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টার পরিবর্তে যুগধর্মের প্রয়োজন অনুসারে উহার সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন।' তাঁহার শিক্ষায় নিঃসন্দেহে নূতন ধর্ম ও সামাজিক ধারণাভিত্তিক এক নূতন সমাজের উদ্ভব সম্ভব হয়। তিনি বহু ধর্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইহারা পরে গুরু কর্তৃক অর্জুন সংকলিত 'গ্রন্থ সাহেবে'র অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গাথাগুলি তাঁহার কবিপ্রতিভার পরিচয় দেয়। এই গাথাগুলিই পাঞ্জাবী ভাষার ও সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করে।

নানকের উত্তরাধিকারীগণ

নানক শিখ ধর্মের প্রথম গুরু তিনি তাঁহার তিরোধানের পূর্বে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনয়ন না করিয়া গেলে তাঁহার শিষ্যবর্গসম্ভবতঃ রামানন্দ ও কবীরের ন্যায় অন্যান্য সংস্কারকগণের শিষ্যবর্গের মতই বিশাল হিন্দু সমাজে লীন হইয়া যাইত। তিনি তাঁহার অনুগত শিষ্য অঙ্গদকে গুরুপদে মনোনীত করেন। শিখ ধর্মের ইতিহাসে ইহা অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কারণ ইহার ফলে শিখ সম্প্রদায়ের ঐক্য ও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই রূপে 'শিখ পন্থের' জন্ম হয়।

শঙ্করদেব

আসামের শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেব (১৪৪৯-১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দ) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও উত্তর বঙ্গে ভক্তি ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার বাণীর মূলকথা ছিল বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের উপাসনা। নানকের ন্যায় তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি

বর্ণাশ্রম ধর্মের নিন্দা করেন এবং জনসাধারণের নিকট মাতৃভাষায় ধর্মপ্রচার করেন। বাংলার বৈষ্ণবদের সহিত তাঁহার দুই বিষয়ে পার্থক্য ছিল। তিনি মূর্তিপূজা করিতেন না, এবং তিনি রাধাকে কৃষ্ণের সঙ্গিনী বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহার শিষ্যগণ 'মহাপুরুষিয়া' নামে পরিচিত ছিলেন।

ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল

ভক্তি ধর্ম আন্দোলনের তিনটি প্রধান ফল বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, ধর্মগুরুগণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ দূর করার চেষ্টা করিয়া আকবরের উদার নীতির পথ প্রস্তুত করেন। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরতা অংশতঃ শিথিল হয়। রামানন্দ ব্যতীত ভক্তি আন্দোলনের অন্যান্য নেতারা অব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং প্রসিদ্ধ 'ভগত'দের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন নীচজাতীয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের নিন্দা তাঁহাদের বাণীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। অতএব ধর্মীয় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দিক ছিল। তৃতীয়তঃ, ভক্তি ধর্ম প্রচার হইতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য অনুপ্রেরণা লাভ করে। ধর্মসংস্কারকদের প্রায় সকলেই স্থানীয় ভাষাকেই উপদেশ বিতরণের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করেন; ফলে এই ভাষাগুলি নবীন মর্যাদায় বিভূষিত হইয়া উঠে। বাংলার বৈষ্ণবগণ অবহেলিত লৌকিক ভাষায় গীতিকাব্যের এক বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি করেন। মহারাষ্ট্রে নামদেব ও একনাথ প্রভৃতি সংস্কারকের রচিত পদাবলী মারাঠী সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন করে। পাঞ্জাবে নানক পাঞ্জাবী কথ্যভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ স্থানীয় ভাষায় তাঁহাদের উপদেশাবলী সংকলন করেন, এবং 'গুরুমুখী' নামে এক নূতন লিপির উদ্ভব হয়। শঙ্করদেবের রচনাবলী অসমীয়া সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতের ধর্মজীবনে 'দেবভাষা' (সংস্কৃত) 'লোকভাষা'র (জনগণের ভাষা) অনুপ্রবেশ সহ্য করিতে বাধ্য হয়।

সুফী মতবাদ

সুফীবাদ (Sufism) ছিল মধ্য যুগে ইসলামের এক বিশিষ্ট রূপ। ইহা স্থলতানী আমলে উত্তর ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই মত-বাদের অনুগামীগণ দারিদ্র্যের নিদর্শন রূপে 'সুফ' বা মোটা পশমের বস্ত্র পরিধান করিতেন বলিয়া তাঁহারা সুফী নামে পরিচিত হন। তাঁহারা অতীন্দ্রিয়বাদী (mystic) ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের একটি মাত্র সম্প্রদায় ছিল না। তাঁহাদের ধর্মীয় মতবাদ ও আচার আচরণও একই প্রকারের ছিল না। তাঁহাদের মতবাদ ও আচরণের পার্থক্যের কারণ ছিল ইসলামী, খ্রীষ্টীয়, গ্রীক নব-প্লেটোনিক, (Neo-Platonic), জোরোয়ার্মিয় (Zoroastrian) পারস্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের

পূর্বে ঐ দেশে প্রচলিত অগ্নি-উপাসনা ভিত্তিক ধর্ম, বৌদ্ধ ও হিন্দু মতবাদের বিচিত্র সংমিশ্রণ।

প্রথম দিকে সুফীবাদের সার তত্ত্ব ছিল ঈশ্বরের সহিত একাত্মবোধ, অথবা ভক্তির মাধ্যমে পরমাত্মার নিকটবর্তী হওয়া। ভক্তি ধর্মের সহিত ইহার মোটামুটি সাদৃশ্য ছিল। অধিকাংশ সুফীই ইসলামের ধর্মীয় আচার পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন না। স্বভাবতঃই প্রথাগত আচার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান এবং ইসলামীয় ভাবধারা আচরণ ও সম্পূর্ণ রক্ষা করার পক্ষপাতী উলেমাগণ সুফীগণকে পছন্দ করিতেন না।

মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই পাঞ্জাবে সুফীবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তী আজমীরে বসবাস শুরু করেন এবং সুফীগণের চিস্তী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে সুরাবর্দী সম্প্রদায় প্রভাব বিস্তার করে। অতঃপর, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে, মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও সাহিত্যচর্চায় এই দুইটি সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। তবে তাহাদের মধ্যে দুইটি গুরুতর প্রভেদ ছিল। চিস্তীগণ অর্থসম্পদকে ধর্মজীবনে উন্নতির পথে প্রবল বিঘ্ন বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু সুরাবর্দী সম্প্রদায় এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিল না। আবার চিস্তীগণ রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতেন, কিন্তু সুরাবর্দী সম্প্রদায় রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পক্ষপাতী ছিল। ধর্মীয় আচরণের ব্যাপারেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে তিনটি নূতন সুফী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়—কাদিরি, শাত্তারি ও নক্শবন্দী সম্প্রদায়। সকল সুফী সম্প্রদায়ই সাধারণভাবে শরিয়ৎ (ইসলামের বিধি)-কে মান্য করিত; কিন্তু কালন্দর প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায় শরিয়তকে সাধারণভাবে অগ্রাহ্য করিত।

হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারে সুফীদের ভূমিকা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সুফী সন্তগণের কৃচ্ছ্রসাধন, নীচ জাতীয় হিন্দুদের প্রতিও তাঁহাদের ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার এবং ধর্মান্তরিত হিন্দুদের মুসলমান সমাজে সামাজিক সাম্যের প্রতিশ্রুতি বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করিয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু এমন কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও, সুফীগণ বহু ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রসিদ্ধ চিস্তী সাধক নিজমাউদ্দীন আউলিয়া দেখিয়াছিলেন যে হিন্দুরা তাহাদের পিতৃপিতামহের ধর্ম ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আফগান ও মুঘল

১. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

বাবর : প্রথম জীবন

জাহিরউদ্দীন মহম্মদ বাবর ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেন এবং ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন পিতার দিক হইতে তৈমুরের এবং মাতার দিক হইতে চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর। তাঁহার পরিবার ছিল তুর্কীদের চাঘ্‌তাই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—চাঘ্‌তাই ছিলেন চেঙ্গিজ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র। কিন্তু বাবর এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সাধারণভাবে 'মুঘল' নামে পরিচিত।

বাবরের পিতা ওমর শেখ মীর্জা ছিলেন মধ্য এশিয়ায় তৈমুরের বিরাট রাজ্যের একটি অংশ ফরগনা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক। ১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দে বাবরের জন্ম হয়। ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি ফরগনার শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র এগারো।

ফরগনার সীমানার বাহিরে ছিল তৈমুরলঙের রাজধানী সমরখন্দ। এই বিরাট শহর অধিকার করিতে বাবর আগ্রহী ছিলেন। ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি এই শহর দখল করেন এবং তৈমুরের সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিন মাস পরে ইহা তাঁহার হস্তচ্যুত হয় এবং ফরগনাতেও বিদ্রোহের ফলে তাঁহার অধিকার নষ্ট হয়। পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি ফরগনা ও সমরখন্দ কয়েকবার পুনরুদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল নিজের অধিকার রক্ষা করিতে পারেন নাই। উজবেগ নেতা শৈবানী খাঁ ছিলেন তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। পারস্যের সাফাভী বংশীয় শাহদের এবং মধ্য এশিয়ার উজবেগদের মধ্যে পড়িয়া তৈমুর বংশীয় রাজারা দুর্বল হইয়া পড়েন।

ফরগনা এবং সমরখন্দ হইতে বিতাড়িত হইয়া বাবর আফগানিস্থানে প্রবেশ করেন এবং ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে কাবুলের অধিপতি হন। ১৫০৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি কান্দাহার দখল করেন, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইহা তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। সেই বৎসরই তিনি 'পাদশাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা নিম্নতর মর্যাদাসূচক 'মীর্জা' উপাধি ব্যবহার করিতেন। 'পাদশাহ' উপাধি তাঁহার ক্রম-বর্ধমান শক্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করে।

সাফাভী-উজবেগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাবরের পক্ষে নূতন সুযোগ আনিয়া দেয়।

১৫১০ খ্রীস্টাব্দে শৈবানী খাঁ পারস্যের শাহ ইসমাইল সাফাভী কর্তৃক পরাজিত হন ও প্রাণ হারান। মধ্য এশিয়ায় হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বাবর শাহ ইসমাইলের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন এবং ১৫১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার সাহায্যে সমরখন্দ, বোখারা এবং খোরাসান দখল করেন। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পারস্যের শাহকে সন্তুষ্ট করিতে বাবর নিজ রাজ্যে শিয়া মতবাদ প্রবর্তন করেন। ইহা সহ্য করিতে উজবেগরা প্রস্তুত ছিল না। দুই বৎসর সংঘর্ষের পর ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে বাবর কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। তৈমুরের উত্তরাধিকারী হিসাবে মধ্য এশিয়ায় অধিকার স্থাপনের জন্য তাঁহার যে স্বপ্ন ছিল তাহা শেষ পর্যন্ত ভাঙিয়া যায়।

বাবর : ভারতবর্ষ আক্রমণ

বাবরের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এইবার ভারতের দিকে পরিচালিত হইল; তিনি পশ্চিমের পরিবর্তে পূর্বেই রাজ্যবিস্তারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন : 'আমার সর্বদাই মনের ইচ্ছা ছিল হিন্দুস্থান অধিকার করার। যেহেতু এই সব দেশ একসময় তুর্কীদের অধীন ছিল সেইজন্য আমার মনে হইত যে এইগুলি আমারই অধিকারভুক্ত। সুতরাং আমি হিন্দুস্থান শান্তিপূর্ণ উপায়ে অথবা বলপ্রয়োগে, যে ভাবেই হউক, দখল করার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলাম'।

যদিও লোদী রাজ্য দুর্বল ছিল তবু শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দুস্থান দখল করা সম্ভব ছিল না। বাবর সতর্ক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১৫২২ খ্রীস্টাব্দে কান্দাহার দখল করিয়া তিনি আফগানিস্থানের উপর তাঁহার অধিকার সুদৃঢ় করিলেন। উজবেগ, মোঙ্গল, পারসিক এবং তুর্কীদের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি নিজের সামরিক রীতির উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার ভারতীয় অভিযানসমূহে তিনি দ্রুতগামী অশ্বারোহীর সহিত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ওস্তাদ আলী এবং মুস্তাফা নামক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে সুদক্ষ দুই জন তুর্কীকে নিজের সৈন্যদলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ওস্তাদ আলীকে তিনি আগ্নেয়াস্ত্র বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

বাবরের ভারতে অভিযানগুলির সঠিক বিবরণ দেওয়া কঠিন, কারণ ঘটনার পারম্পর্য ও তারিখ এবং আক্রান্ত অঞ্চলের ভূগোল সম্বন্ধে অস্পষ্টতা আছে; তবে মোটামুটি ঘটনাগুলি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি পূর্ব দিকে হিন্দুস্থানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ইব্রাহিম লোদীর দরবারে এক দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে আফগান বংশীয় লোদী সুলতানেরা যে রাজ্য অধিকার করিয়াছেন তাহা পূর্বে তুর্কীদের অধিকারে ছিল, সুতরাং তাহা তুর্কীদিগকে প্রত্যর্পণ করা উচিত। তিনি নিজে

তুর্কীবংশীয় ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রেরিত এই বার্তার উদ্দেশ্য ছিল লোদী রাজ্যের উপর তাঁহার নিজ দাবি ঘোষণা করা। কিন্তু তাঁহার দুত দিল্লীতে পেঁাছিতে পারে নাই, সুতরাং ইব্রাহিম লোদী তাঁহার দাবির কথা জানিতে পারেন নাই।

১৫২০ খ্রীস্টাব্দে বাবর পাঞ্জাবে শিয়ালকোট অধিকার করেন। আফগানিস্থানের গোলযোগ তাঁহাকে কিছুকাল ব্যস্ত রাখে। কান্দাহার দখলের পরই তিনি হিন্দুস্থানের দিকে আবার দৃষ্টি দিবার সুযোগ পান। ইতিমধ্যেই ইব্রাহিম লোদীর নীতি শক্তিশালী আফগান অভিজাতদের অসন্তুষ্ট করিয়াছিল। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী এবং সুলতানের খুল্লতাত ও দিল্লীর সিংহাসনের জন্য দাবিদার আলম খাঁ লোদী বাবরকে ভারতবর্ষে আসার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদের আশা ছিল যে আক্রমণকারী তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষা করিবেন। বাবর ১৫২৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। লাহোর ও দীপালপুর লুণ্ঠন করা হয়।

বাবর দিল্লীর সিংহাসনে আলম খাঁ লোদীর দাবি স্বীকার করেন; তিনি কেবলমাত্র পাঞ্জাবের উপর সম্পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা লাভে সন্তুষ্ট থাকিতেই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আলম খাঁ লোদী বিশ্বাসের যোগ্য ছিলেন না। সুতরাং কাবুল রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্তির সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে বাবরের মনে দেখা দিল আরও বিরাট উদ্দেশ্য। তাঁহার লক্ষ্য হইল সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রভুত্ব লাভ। সুতরাং বাবরের শেষ অভিযান (১৫২৫-২৬) পূর্ববর্তী অভিযানগুলির তুলনায় উদ্দেশ্যের দিক হইতে ভিন্ন ছিল।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)

চূড়ান্ত অভিযান শুরু হইল ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। বাবর পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া দৌলত খাঁ লোদী এবং আলম খাঁ লোদীর আনুগত্য লাভ করিলেন এবং দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সম্ভবতঃ মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত যোগ দিবার প্রস্তাব দেন। ইব্রাহিম লোদী আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইবার জন্য দিল্লী হইতে অগ্রসর হইলেন। দুইটি বিরোধী সৈন্যদল ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের ২১ এপ্রিল পানিপথে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। ইব্রাহিম লোদী যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেন। তিনিই ছিলেন দিল্লীর একমাত্র সুলতান যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হইল। বাবর বলিয়াছেন দিল্লীর শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী অর্ধদিবসেই ধুলিতে পরিণত হইল।

বাবর বলিয়াছেন যে লোদী বাহিনীতে এক লক্ষ সৈন্য ছিল, কিন্তু সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে; সম্ভবতঃ ইব্রাহিম লোদীর ৪০,০০০ সৈন্য ছিল। বাবর যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ছিল ১২,০০০; কিন্তু পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া তাঁহার বিজয় অভিযানের সময় বহু বেতনভোগী ভারতীয়

সৈন্য সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত যোগদান করে। যাহাই হউক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে দিল্লীর সৈন্যবাহিনী সংখ্যায় ছিল অধিক শক্তিশালী, কিন্তু বাবর সেনাপতি হিসাবে ইব্রাহিম লোদীর তুলনায় অনেক বেশী দক্ষ ছিলেন। ইব্রাহিম সম্বন্ধে বাবর বলিয়াছেন যে তিনি 'একজন অনভিজ্ঞ যুবক, চলাফেরায় অসংযত, যিনি বিনা হিসাবেই অগ্রসর হন, বিনা পদ্ধতিতেই থামেন অথবা অবসর নেন, এবং দূরদৃষ্টি ছাড়াই যুদ্ধে লিপ্ত হন।' বাবরের প্রধান শক্তি ছিল তাঁহার গোলন্দাজ বাহিনী—যাহা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন ওস্তাদ আলী এবং মুস্তাফা। ইব্রাহিম লোদীর গোলন্দাজ বাহিনী ছিল না এবং তাঁহার সৈন্যবাহিনী জানিত না কিভাবে আগ্নেয়াস্ত্রের সুনির্দিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা যায়।

পানিপথ লোদী বংশের এবং দিল্লীতে আফগান শাসনের অবসান সূচিত করে। কয়েক বৎসর পরে আফগান শাসন পুনরুদ্ধার করেন শের শাহ্। কিন্তু মুঘলদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও সুদূরপরাহত ছিল না, এবং ইতিহাসের দৃষ্টিতে আফগান শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল একটি মধ্যবর্তী ব্যবস্থা। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মুঘল শাসন প্রবর্তনের সূচনা করে।

সংগ্রাম সিংহ: খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭)

পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের পরেই দিল্লী এবং আগ্রা দখল করা হইল। এই অঞ্চলের আফগানদের সম্পূর্ণভাবে দমন করিবার পূর্বেই বাবরকে এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইতে হয়। দিল্লী, আগ্রা এবং গোয়ালিয়রে সঞ্চিত সম্পদ বাবরের অনুগামীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বণ্টন করা হয়। ফরগনা, খোরাসান এবং ইরানে তাঁহার বন্ধুদের মূল্যবান উপহার প্রেরণ করা হয়। মক্কা, মদিনা, হিরাট এবং সমরখন্দের তীর্থ অঞ্চলে ভক্তির অর্ঘ্য রূপে অর্থ প্রেরিত হইল। কিন্তু অতিরিক্ত গ্রীষ্মে পীড়িত হইয়া এবং অশ্বের খাদ্যের অভাবে সৈন্যদলের অনেক প্রধান ব্যক্তি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইলেন। বাবর বলিলেন, 'এমনকি কোন গুরুতর অসুবিধা আছে যাহার জন্য আমাদের বিজিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে?' তাঁহার এই আবেদন ব্যর্থ হইল না।

সে যুগে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজপুত রাজা ছিলেন মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ। মালব এবং গুজরাটের সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। রাজস্থানের বহু ছোট রাজা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি বাবরের আক্রমণগুলিকে লুণ্ঠন বলিয়া মনে করেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে তৈমুরের মত তিনিও লুণ্ঠিত ধনরত্ন লইয়া ভারত ত্যাগ করিবেন। সম্ভবতঃ ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে যৌথ আক্রমণ সম্বন্ধে বাবরের সহিত তাঁহার চুক্তি ছিল যে যখন বাবর দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইবেন তখন রাণা

আগ্রার দিকে একটি অভিযান পরিচালনা করিবেন। পানিপথের পরে বাবর অভিযোগ করেন যে রাণা তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। রাণা অভিযোগ করেন যে বাবর আগ্রা অঞ্চলে কলপী, ঢোলপুর এবং বেয়ানা দখল করেন: যেগুলি চুক্তি অনুসারে তাঁহার অংশের মধ্যে ছিল।

দিল্লীর নূতন শাসকের সঙ্গে বিরোধ আসন্ন মনে করিয়া সংগ্রাম সিংহ বেয়ানা দখল করেন, কয়েকজন রাজপুত এবং আফগান নেতার সহযোগিতা অর্জন করেন, এবং ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদীকে দিল্লীর সিংহাসনে ইব্রাহিম লোদীর ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করেন। বাবর তাঁহার সহিত সংঘর্ষের জন্য অগ্রসর হন। ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে ফতেপুর সিক্রীর কাছে খানুয়ায় একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ ঘটে। বাবর জয়ী হন। প্রধান কৃতিত্ব ছিল মুঘল গোলন্দাজ বাহিনীর। রাজপুতদের সাহস এবং সংখ্যার তুলনায় এই বাহিনী বেশী শক্তিশালী প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

খানুয়ার যুদ্ধ বাবরের বিরুদ্ধে রাজপুত-আফগান জোটের অবসান ঘটাইল এবং রাণা সংগ্রাম সিংহের শক্তি ও সম্মানের প্রতি গুরুতর আঘাত রূপে প্রতিপন্ন হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত অবস্থায় তিনি মেবারে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কয়েকমাস পরে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৫২৮)। রাজপুতদের বিরোধিতার দিক হইতে নূতন মুঘল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত হইল। মধ্যযুগীয় রাজস্থানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শাসকের এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি উত্তর ভারতে রাজপুত আধিপত্য স্থাপনের সকল সম্ভাবনার অবসান ঘটাইল।

আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা : গোগ্রার যুদ্ধ (১৫২৯)

খানুয়ার পর বাবরকে অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হইল। পূর্ব ভারতের আফগানদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করার প্রয়োজন ছিল। তাহাদের সম্মুখীন হইবার পূর্বে বাবর মেওয়াটে প্রবেশ করিয়া রাজধানী আলোয়ার দখল করিলেন। রাণা সংগ্রাম সিংহের শক্তিশালী সহযোগী মেদিনী রায়ের নিকট হইতে মধ্য ভারতে চান্দেরী দখল করা হইল। সম্ভবতঃ পূর্বে অধিকৃত, কিন্তু পরে হস্তচ্যুত, চান্দওয়ার এবং এটাওয়া পুনর্দখল করা হইল।

ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদী খানুয়ার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে আফগানরা সংগঠিত হইল। তিনি বিহারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের সমর্থন সংগ্রহ করিলেন, এবং একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করিলেন। বাবর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে পাটনার নিকট গঙ্গা ও গোগ্রা নদীর সঙ্গম-স্থলে আফগানদের পরাজিত করিলেন। তিনি নসরৎ শাহের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিলেন; প্রত্যেকেই অপরের সার্বভৌমিকতা মানিয়া চলিতে প্রতিশ্রুতি

দিলেন। নসরৎ শাহ বাবরের শত্রুদের আশ্রয় না দিবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। আফগানরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। গোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিশেষতঃ লোহানী এবং লোদীদের মধ্যে প্রবল ঈর্ষা, তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া ফেলিল।

বাবর : শাসন-ব্যবস্থা

১৫৩০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর বাবরের মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষের বাহিরে তাঁহার অধিকার বদখ্‌শান ও আফগানিস্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে তিনি সিন্ধুনদ হইতে বিহারের পশ্চিম অংশ এবং হিমালয় হইতে মধ্য ভারতের অন্তর্গত গোয়ালিয়র এবং চান্দেরী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁহার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে তাঁহার রাজ্য মধ্য এশিয়া ও ভারতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল। মধ্য এশিয়ার সহিত এই যোগসূত্র তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের শাসনকালে উত্তর-পশ্চিমে মুঘল বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ভৌগোলিক দিক ছাড়াও বাবরের কৃতিত্ব 'লুণ্ঠনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যতন্ত্র, তৈমুর লঙ্‌ এবং আকবরের মধ্যে যোগসূত্র' স্থাপন করিয়াছিল। বাবর কখনও তৈমুরের মত লুণ্ঠনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই; তাঁহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাবে শাসন স্থাপন করা, কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাবলী সমগ্র লোদী রাজ্য দখলকে তাঁহার লক্ষ্যে পরিণত করে। আকবরের মতই তাঁহার লক্ষ্য ছিল বিজিত রাজ্য শাসন করা—লুণ্ঠন করা নয়। এই জন্যই পানিপথের পরে তিনি তাঁহার শক্তির কেন্দ্র কাবুল হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। শেষ পর্যায়ে আগ্রা ছিল লোদী ক্ষমতার কেন্দ্র। সেখানে তিনি নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর মর্যাদা সম্বন্ধে বাবরের ধারণা মূলতঃ আফগানদের ধারণা হইতে ভিন্ন ছিল। তাঁহার মতে অভিজাতরা যতই শক্তি-শালী এবং উচ্চবংশজাত হউক না কেন, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাজা তাঁহাদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ক্ষুদ্র কাবুল রাজ্যের শাসক থাকার সময়েও তিনি নিজেকে 'পাদশাহ' বলিয়া অভিহিত করিতেন! পানিপথের পরে এই রাজকীয় উপাধিতে তাঁহার দাবির ভিত্তি ছিল ভারতবর্ষে তাঁহার রাজ্যজয় এবং ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের মধ্যে একটি রাজনৈতিক যোগসূত্র স্থাপন করা।

কিন্তু একটি কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন করিবার মত সময় বা যোগ্যতা বাবরের ছিল না। কৃতী সৈনিক হইলেও তিনি দক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন না। পানিপথ হইতে গোগ্রা পর্যন্ত ভারতবর্ষে তাঁহার প্রথম তিন বৎসর ছিল যুদ্ধ ও অনিশ্চয়তার যুগ। রাজপুত এবং আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে মুক্ত হইয়া এই দেশের শাসন-ব্যবস্থা সংগঠিত করার জন্য তিনি মাত্র দুই বৎসরেরও

কম সময় পান এই দেশের সম্পর্কে তাঁহার অথবা তাঁহার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের সমগ্র রাজ্যের জন্য কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। একটি সুপরিকল্পিত কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোর পরিবর্তে তিনি সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে বিজিত অঞ্চলগুলি বিভক্ত করেন। ইহাদের মর্যাদা ছিল প্রায় স্বাধীন শাসকের মত। 'পাদশাহ'ই ছিলেন তাহাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। নবপ্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুশাসিত রাজ্যের পরিবর্তে ছিল এক শাসকের অধীনে কয়েকটি ছোট রাজ্যের সমষ্টি।

বাবর : চরিত্র এবং আত্মজীবনী

তুর্কী ভাষায় লিখিত এবং পরে ফার্সি ভাষায় অনূদিত বাবরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-বাবরী'তে উল্লিখিত বিস্তৃত বর্ণনার মাধ্যমে বাবরের চরিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। এই রচনাটির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। এটি একটি নিষ্প্রাণ ঐতি-হাসিক গ্রন্থ নহে; সাহিত্যিক রচনার এটি একটি মূল্যবান নিদর্শন। 'রচনাশৈলী সরল, বলিষ্ঠ, জীবন্ত, এবং বর্ণনাসমৃদ্ধ। তাঁহার দেশবাসী এবং সমকালীন ব্যক্তিদিগের চেহারা, ব্যবহার, কাজকর্ম এখানে আয়নার মত প্রতিফলিত হইয়াছে।' এখানে 'একজন বিখ্যাত তাতার (Tartar) রাজা'র ছবি পাওয়া যায় যাঁহার জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং মতামত অন্তরাবেগের স্বাভাবিক প্রগল্ভতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। কিছু গোপন করিবার, কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার চেষ্টা নাই, অকপটতা এবং স্পষ্টবাদিতার আতিশয্য প্রদর্শনেরও বিন্দু-মাত্র দুশ্চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাবর ছিলেন মূলতঃ একজন সৈনিক। সৈনিকদের কষ্টে তিনি অংশ নিতেন, তাহারা অতিরিক্ত অনিয়ম করিলে নিষ্ঠুর ভাবে শাস্তি দিতেন। বন্ধুদের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার বাল্যকালের এক বন্ধুর জন্য কাঁদিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি কখন কখন নিজেকে একাকী এবং স্বদেশ হইতে নির্বাসিত মনে করিতেন এবং অশ্রু বিসর্জন করিতেন। তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি তাঁহার নিজের দোষত্রুটি, গুণ এবং কৃতিত্বের কথা স্পষ্ট-ভাবে বলিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা কেবল তাঁহার আত্মজীবনীতেই নহে, তুর্কী ও ফার্সি ভাষায় লিখিত তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যেও প্রতিফলিত। ধর্মে তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নী, কিন্তু তাঁহার মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা ছিল না। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি রাণা সংগ্রাম সিংহ এবং মেদিনী রায়ের বিরুদ্ধে অভিযানগুলিকে ধর্মীয় যুদ্ধ (জিহাদ) বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক কারণেই কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে সৈনিকের গুণ এবং কূটনীতির মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। 'তিনি যেভাবে সুলতান ইব্রাহিমের বিদ্রোহী আমীরদের একজনকে

অস্ত্রের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইয়াছিলেন তাহা মেকিয়াভেলীর কূটনীতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।' বিপদের সময়ও রোমাঞ্চকর অভিযানপ্রিয় অনুগামীদের আনুগত্যলাভে তিনি সক্ষম ছিলেন। তাঁহার সামরিক অভিযানগুলি ছিল সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দেশিত।

যদিও বাবর ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুঘল শাসন প্রবর্তন করেন তথাপি তাঁহাকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা রূপে গণ্য করা যায় না। তিনি তাঁহার পুত্রকে এমন একটি শিথিল ভাবে গঠিত রাজ্য দিয়া যান যাহা কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ রাখা যাইত যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই—শান্তির সময়ে যাহা ছিল দুর্বল, কাঠামোহীন, মেরুদণ্ডহীন। আফগানিস্থান এবং উত্তর ভারতে তাঁহার অধিকৃত অঞ্চলগুলি একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ছিল না। তাঁহার এই রকম উচ্চস্তরের রাজনৈতিক প্রতিভা ছিল না যাহা তাঁহার পৌত্র আকবরকে একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ এবং কৃষ্টিসম্পন্ন সাম্রাজ্য স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিল।

২. আফগান-মুঘল সংঘর্ষ

হুমায়ুনের চরিত্র

বাবরের পরে সিংহাসনে বসেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত; তিনি কয়েকটি ভাষা জানিতেন এবং অঙ্কশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে আগ্রহী ছিলেন। যুদ্ধের কিছু অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল; তিনি পাণিপথ এবং খানুয়ার যুদ্ধে আফগানদের সহিত কয়েকটি সংঘর্ষে যোগ দেন। বদখ্শানের শাসনকর্তা রূপে তিনি কাজ করেন। কিন্তু তাঁহার পিতার চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। সমস্যার সম্মুখীন হইলে তিনি স্থির চিত্তে তাহার সমাধান করিতে পারিতেন না। তিনি কোন বিষয়ে সুসংহত প্রয়াসের অযোগ্য ছিলেন। একবার জয়ের পর তিনি হারেমে আমোদ-প্রমোদে গা ঢালিয়া দিতেন এবং মূল্যবান সময় অহিফেনসেবীদের সাহচর্যে নষ্ট করিতেন। শত্রুরা দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের শাস্তিদানের পরিবর্তে ক্ষমা করিতেন। তিনি ছিলেন মিশুকে প্রকৃতির মানুষ, কাজ করিবার তুলনায় তিনি আমোদ-প্রমোদ বেশী পছন্দ করিতেন। তাঁহার চরিত্র মানুষকে আকর্ষণ করিত, কিন্তু মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিত না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন মানুষের উৎসাহী সঙ্গী এবং যথার্থ ভদ্রলোক; কিন্তু রাজা হিসাবে তিনি ছিলেন দুর্বল।

হুমায়ুনের বাধাবিঘ্ন

নিজের আত্মীয়দিগের মধ্যেই হুমায়ুনের একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন: কামরান, আসকারী এবং হিন্দাল। তাঁহাদের

রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু যোগ্যতা বা চরিত্রের জোর ছিল না। ইহা ছাড়াও ছিল মীর্জা নামে পরিচিত তৈমুরের উত্তরাধিকারীরা। তাহারা বাবরের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবি করিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিংহাসন লাভের জন্য আগ্রহী ছিল।

বাবরের শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রশাসনিক সংযোগ ছিল না, সেগুলি ছিল প্রায় স্বাধীন দলপতি দ্বারা শাসিত কতকগুলি ছোট রাজ্যের সমাবেশ। তুর্কী, পারসিক, আফগান এবং ভারতীয়দের লইয়া গঠিত সৈন্যবাহিনীতেও ঐক্য বা প্রকৃত সংযোগ ছিল না। বাবরের মত রণনিপুণ শাসকের নেতৃত্ব দ্বারাই ইহাকে কার্যকরী শক্তি হিসাবে রক্ষা করা যাইত। দুর্বলতার আর একটি কারণ ছিল অভিজাতদের প্রতি বাবরের অতিরিক্ত উদারতার ফলে নিঃশেষিত রাজকোষ।

মুঘল সীমানার বাহিরেও হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক শক্তি ছিল। সুযোগের অপেক্ষাকারী পূর্ব ভারতের আফগান নেতারা বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের সমর্থনে অস্ত্রধারণ করিতে পারিত। বাংলার সুলতান মনে করিতেন যে বাবরের সহিত তাঁহার চুক্তি বাবরের মৃত্যুর সহিতই শেষ হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম দিকে রাজস্থানে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল, কিন্তু রাজপুত রাজাদের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষমতাশালী ছিলেন গুজরাটের শক্তিশালী শাসক বাহাদুর শাহ। তিনি মালবের সুলতানী রাজ্যটি দখল করেন (১৫৩১) এবং রাজস্থানে চিতোর অবরোধ করেন (১৫৩৩)।

রাজ্যের ভাগ

দৃঢ়তা এবং দূরদৃষ্টি সহ এইসব সমস্যার সম্মুখীন হইবার পরিবর্তে হুমায়ুন একটি বিরাট ভুল দ্বারা শাসন শুরু করিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মীর্জাদের একজনকে তিনি বদখ্‌শানের দায়িত্ব দিলেন। কাবুল ও কান্দাহার কামরানের অধিকারে রহিল; উপরন্তু তাঁহার পাঞ্জাব ও হিসার ফিরুজা (দিল্লীর পশ্চিমে) দখল ক্ষমা করা হইল। এইভাবে হুমায়ুন মধ্য এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। মধ্য এশিয়া ছিল মুঘল বাহিনীর জন্য সৈন্য সংগ্রহের আদর্শ স্থান। ঐ অঞ্চলের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসূত্র না থাকায় হুমায়ুন সামরিক দিক হইতে দুর্বল হইলেন। আবার হিসার ফিরুজায় কামরানের কর্তৃত্বের ফলে দিল্লী এবং পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাঁহার নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হইল। আসকারীকে দেওয়া হইল সম্ভল জেলা। হিন্দাল পাইলেন মেওয়াট (আলোয়ার এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল)। বাবরের রাজ্য নানা ভাগে বিভক্ত হইল। অভিজাতদের দেওয়া জায়গীরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। হুমায়ুন এক বিচ্ছিন্ন রাজ্যের অধিপতি হইলেন।

হুমায়ুন এবং আফগানগণ : প্রথম পর্ব (১৫৩২)

আফগানদের বিরুদ্ধে হুমায়ুনের সংঘর্ষের প্রথমপর্ব কালঞ্জরের (বুন্দেলখণ্ডে) সুরক্ষিত দুর্গ দখলের চেষ্টা। দুর্গটি তখন ছিল জনৈক আফগান সমর্থক হিন্দু নেতার অধীনে। মুঘল বাহিনী কর্তৃক দুর্গের অবরোধ ব্যর্থ হইল ; হুমায়ুন প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ পাইয়া সন্তুষ্ট রহিলেন এবং মামুদ লোদীর অধীনে যে আফগানেরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্ম পূর্ব দিকে যাত্রা করিলেন। দাদরার (উত্তর প্রদেশের বড়বাঁকী জেলা) যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিভ্রান্ত হইয়া তাহারা বিহারের দিকে পশ্চাদপসরণ করিল (১৫৩২)। অতঃপর শের খাঁ নামক জনৈক উদীয়মান আফগান নেতার অধীন সুদৃঢ় দুর্গ চুনারের দিকে হুমায়ুন অগ্রসর হইলেন। চারিমাস অবরোধের পর শের খাঁ মুঘল সম্রাটের প্রতি মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং নিজের সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ তাঁহার অধীনে রাখিলেন। হুমায়ুন আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। শের খাঁকে বিহারে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও অধিকার সুসংহত করিবার সুযোগ দেওয়া হইল।

হুমায়ুন এবং বাহাদুর শাহ (১৫৩৫-৩৬)

হুমায়ুনের প্রাথমিক ভুল ছিল রাজ্য ভাগ, কালঞ্জরে ব্যর্থ অভিযান এবং শের খাঁর লোক দেখানো আনুগত্য গ্রহণ। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল তাঁহার একটি মারাত্মক ভুল : বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে দেরী করা। হুমায়ুন আগ্রা ও দিল্লীতে এক বৎসরের অধিককাল ব্যয়বহুল উৎসবে কাটাইলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা হইল দুর্বল এবং গুজরাটের উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুলতান রাজস্থানে এবং মালবে রাজ্যবিস্তার সম্পূর্ণ করার সুযোগ পাইলেন।

মহম্মদ জমান মীর্জা নামে জনৈক বিদ্রোহী মুঘল অভিজাতকে এবং বেয়ানা দখলকারী আফগানদের বাহাদুর শাহ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহাই হুমায়ুনের সহিত তাঁহার বিরোধের প্রত্যক্ষ কারণ। ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে হুমায়ুনের সৈন্যবাহিনী বেয়ানা পুনরুদ্ধার করে। হুমায়ুন নিজে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বাহাদুর শাহ তখন চিতোর অবরোধে ব্যস্ত ছিলেন। বিধর্মীর বিরুদ্ধে আক্রমণ-রত কোন মুসলমান রাজাকে আক্রমণ করা ইসলাম ধর্মের অনুমোদিত ছিল না। তাই মুঘল সম্রাট চিতোরের পতন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এইভাবে তিনি বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে রাজপুতদের সাহায্য করিয়া তাহাদের সন্তুষ্ট করার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন। তাঁহার সেই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল না যাহার সাহায্যে পরবর্তী-কালে তাঁহার পুত্র সাহসী রাজপুতদিগকে সাম্রাজ্যের স্তম্ভে পরিণত করেন।

চিতোরের পতনের পর (১৫৩৫) হুমায়ুন মান্দাসোরে বাহাদুর শাহকে বাধা দিলেন ; কিন্তু বাহাদুর শাহ পলাইয়া গিয়া মাণ্ডু দুর্গে আশ্রয় লইলেন। মুঘলরা তাঁহাকে অনুসরণ করিলে তিনি চম্পানিরে পলাইয়া যান। সমগ্র মালব

দখলের পর হুমায়ুন চম্পানির অবরোধ করিলেন। বাহাদুর প্রথমে ক্যাম্বেতে, এবং পরে দিউতে পলাইয়া গেলেন। হুমায়ুন ক্যাম্বে পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া চম্পানিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চম্পানির দখল করা হইল; সেখানে সঞ্চিত সম্পদ হুমায়ুনের হস্তগত হইল। আহম্মদাবাদ দখল করা হইল। আসকারী গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল, এবং তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল হুমায়ুনের স্বার্থের বিরোধী। বাহাদুর শাহ গুজরাটে কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন (১৫৩৬)। মাণ্ডুতে অপেক্ষাকারী হুমায়ুন মালবে বিদ্রোহ দমন করিতে ব্যর্থ হইয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন (১৫৩৬)।

মাণ্ডু, চম্পানির এবং আহম্মদাবাদ দখল করিলেও হুমায়ুন মালব ও গুজরাটে নিয়ন্ত্রণ রাখিতে ব্যর্থ হইলেন। ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর বাহাদুর শাহ বেশি দিন জীবিত ছিলেন না; পর্তুগীজদের সহিত এক সংঘর্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু পূর্ব দিকে শের খাঁর অধীন আফগানদিগের সহিত সংঘর্ষ হুমায়ুনকে আবার পশ্চিমের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধা দিল।

শের খাঁর উত্থান

প্রথমে ফরিদ, পরে শের খাঁ নামে পরিচিত, স্থর গোষ্ঠিভুক্ত আফগান বীরের জন্ম হয় পাঞ্জাবে হোসিয়ারপুরের নিকটে ১৪৭২ (অথবা ১৪৮৬) খ্রীস্টাব্দে। তাঁহার পিতা হাসান স্থর বিহারে আসিয়া সাসারামের জায়গীর লাভ করেন। ফরিদের বাল্যকাল এবং প্রথম যৌবন স্থখের ছিল না; তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে ঈর্ষা করিতেন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে অবহেলা করিতেন। ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি সাসারাম ত্যাগ করেন এবং জৌনপুরে যান। জৌনপুরে তখন ছিল ইসলামীয় শিক্ষার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। সেখানে তিনি আরবি ফার্সি অধ্যয়নে কয়েক বৎসর কাটাইয়া ঐ দুইটি ভাষায় দক্ষতা লাভ করেন। কিছুকাল পরে পিতার সহিত তাঁহার মিলন হইল, তিনি সাসারামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর প্রায় কুড়ি বৎসর (১৪৯৭-১৫১৮) তিনি তাঁহার পিতার জায়গীরের তত্ত্বাবধান করেন। এই সময়টি ছিল কার্যকরী শিক্ষানবীশীর সময়; তিনি প্রশাসনিক এবং বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং নিজের অজান্তেই একটি বিরাট সাম্রাজ্য শাসনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। কিন্তু তাঁহার বিমাতার ঈর্ষা আবার তাঁহাকে সাসারাম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। তিনি ইব্রাহিম লোদীর রাজসভায় গেলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর স্থলতান সাসারামের জায়গীর তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। তিনি জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই তাঁহার দাবির বিরোধিতা করেন। তখন তিনি দক্ষিণ বিহারের স্বাধীন শাসক বাহার খাঁ লোহানীর অধীনে চাকুরি লইলেন (১৫২২)। তাঁহার এই নূতন প্রভু একটি শিকার অভিযানে একা একটি বাঘ মারিবার জন্য তাঁহাকে 'শের খাঁ' উপাধি দিলেন।

শের খাঁর ক্ষমতার বৃদ্ধিতে বহু শত্রুর সৃষ্টি হইল। তাহারা বাহার খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল। তিনি বিহাব ত্যাগ করিয়া মুঘলদের অধীনে চাকুরি লইলেন (১৫২৭)। বিহারের আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি বাবরের কাছে তাঁহার যোগ্যতা দেখাইলেন। পুরস্কার হিসাবে সাসারামের জায়গীর তাহাকে পুনরায় দেওয়া হইল (১৫২৮)। কিন্তু শীঘ্রই তিনি মুঘলদেব অধীনতা ত্যাগ করিয়া বাহার খাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী জালাল খাঁর অভিভাবক হইলেন। মুঘলদের সহিত তাঁহার স্বল্পকালীন যোগাযোগের ফলে তাহাদের সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাব অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল। ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাববের বিরুদ্ধে মামুদ লোদীর সহিত যোগ দেন, কিন্তু যখন আফগানদের সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট হয় তখন জালাল খাঁ সহ বাবরের নিকট আত্মসমর্পণ কবেন।

নাবালক জালাল খাঁ নামে মাত্র শাসক রহিলেন, শের খাঁ দক্ষিণ বিহারের প্রকৃত প্রভু হইলেন। বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইল। তাঁহার আফগান প্রতিদ্বন্দ্বী লোহানীদের ষড়যন্ত্র তাঁহাকে অসুবিধার সম্মুখীন করিয়াছিল। জালাল খাঁ পলায়ন করিয়া বাংলায় আশ্রয় লইলেন। কোন রাজকীয় উপাধি ধারণের পবিবর্তে শের খাঁ 'হজবৎ-ই-আলা' উপাধি লইয়া জালাল খাঁর বাজ্য শাসন কবিতে থাকেন। ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে বিবাহসূত্রে চুনাবেব সুদৃঢ় দুর্গটি তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি একটি সামরিক দিক হইতে অজেয় দুর্গের এবং সেখানে রক্ষিত প্রচুর সম্পদের মালিক হইলেন।

হুমায়ুন এবং শের খাঁ

দাদার যুদ্ধে হুমায়ুন মামুদ লোদী এবং বিহারের আফগানদের পরাজিত কবেন (১৫৩২)। শের খাঁ অনিচ্ছুক ভাবে এই যুদ্ধে আফগানদের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। মুঘল সম্রাট ইহার পর চুনার অভিমুখে অগ্রসর হন। চারি মাস অবরোধেব পর শেব খাঁ অনিচ্ছার সহিত হুমায়ুনের আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সৈন্যবাহিনীর এক অংশ হুমায়ুনের অধীনে রাখিলেন।

হুমায়ুনের আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের পবে শের খাঁ বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহেব সহিত মোকাবিলা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। গিয়াসউদ্দীন তাঁহার শত্রু বিহারের লোহানী নেতাদিগের সহিত জোটবদ্ধ ছিলেন। ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে শের খাঁ সুরজগড়ের (বিহারে কিউল নদীব তীরবর্তী) যুদ্ধে এই মিত্রসঙ্ঘকে পরাজিত করিলেন। তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনে এই জয়লাভ একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখা। লোহানীদের পরাজয়ে বিহারে তাঁহার শত্রুরা দুর্বল হইয়া পড়িল। বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য-সম্পদ, হস্তী ইত্যাদি এবং গোলন্দাজ বাহিনী তাঁহার হস্তগত হইল। তাঁহার খ্যাতি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইল।

যখন হুমায়ুন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন বাংলায় শের খাঁর সুযোগ উপস্থিত হয়। ১৫৩৬-৩৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি দুই বার বাংলা আক্রমণ করিয়া রাজধানী গৌড়ের ওপর আঘাত হানিলেন। গিয়াসউদ্দীন পর্তুগীজদিগের নিকট সাহায্য চাহিলেন এবং পরে হুমায়ুনের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইলেন। শের খাঁর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা সম্পর্কে মুঘল সম্রাটের সন্দেহ ছিল। শের খাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের স্বার্থের দিক হইতে বিপদ রূপে গণ্য করিতেন। আগ্রা হইতে তিনি চুনার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে কৌশলে এই বিখ্যাত দুর্গটি হস্তগত করা হইল। ছয় মাস তিনি সেই চেষ্টায় কাটাইলেন; কিন্তু এই সাফল্য তাঁহাকে সামান্যই সামরিক সুবিধা আনিয়া দিল, কারণ চুনার বাংলায় যাইবার স্থলপথে অবস্থিত ছিল না। তিনি বারাণসীতে আসিলেন এবং শের খাঁর সহিত আলোচনা শুরু করিলেন। শের খাঁ গৌড় অধিকার করিয়া তাঁহার ক্ষমতা বাড়াইলেন (১৫৩৮)। তিনি বিহারে শোন নদীর তীরে অবস্থিত রোটাসগড়ের সুদৃঢ় দুর্গ দখল করিলেন।

গৌড়ের পতনের পর গিয়াসউদ্দীন হুমায়ুনের পক্ষে যোগ দেন। হুমায়ুন বাংলার দিকে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। পথে কিছুকাল তেলিয়াগড়ির গিরিবর্ত্মে শের খাঁ তাঁহাকে অবরুদ্ধ রাখিলেন। এই সময়ে শের খাঁ গৌড়ের সম্পদ রোটাসগড়ে সরাইয়া নিলেন। ইহার পর মুঘল সম্রাট বিনা বাধায় গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং সেখানে নয় মাস সময় উৎসবে অতিবাহিত করিলেন। শের খাঁ বারাণসী এবং জৌনপুর অধিকার করিয়া এবং কনৌজ পর্যন্ত অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া আগ্রার সহিত মুঘল বাহিনীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলেন।

অসুবিধা উপলব্ধি করিরা হুমায়ুন গৌড় ত্যাগ করিলেন এবং আগ্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শের খাঁ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন এবং তাহাকে পর্যুদস্ত করিলেন। চৌসার (বিহারে বক্সারের নিকটে) যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হইলেন (১৫৩৯)। সমগ্র মুঘল বাহিনী ধ্বংস হইল। হুমায়ুন নিজে পলায়ন করিলেন, কিন্তু হারেমের মহিলারা (প্রধানা মহিষী সহ) পিছনে রহিয়া গেলেন।

চৌসার যুদ্ধে জয়লাভ কেবলমাত্র বাংলা ও বিহারে নয়, জৌনপুরেও শের খাঁর নবলব্ধ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। এক বৎসর পূর্বেও তিনি মুঘলদের অধীনে একজন শাসক হিসাবে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন। কিন্তু চৌসার পরে তিনি সামরিক ক্ষমতাবলে ব্যাপক অঞ্চলের অধিকারী হইলেন এবং আইনসঙ্গত-ভাবে সম্রাটের সহিত সমতা দাবি করিতে পারিতেন। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পাইল। প্রথমেই তিনি রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করিলেন। 'শের খাঁ' হইলেন শের 'শাহ' (১৫৩৯)। তাঁহার নিজস্ব মুদ্রা প্রচলিত হইল এবং তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ করা হইল।

চৌসায় পরাজয়ের পর হুমায়ুন আগ্রা পৌঁছিলেন। সৈন্য সংগ্রহ করিয়া

শের শাহের সহিত আবার শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি পূর্ব দিকে অগ্রসর হইলেন। শের শাহ তখন পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। কনৌজের কাছে গঙ্গার তীরবর্তী বিলগ্রামে দুই বাহিনীর সংঘর্ষ হইল (১৫৪০)। তাড়াতাড়িতে মুঘল গোলন্দাজ বাহিনীর পূর্ণ ব্যবহার করা গেল না, কারণ আফগান আক্রমণ ছিল আকস্মিক। এই পরাজয় হুমায়ুনের ক্ষমতা রক্ষার রাজনৈতিক সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দিল; ভারতবর্ষে বাবরের কাজ অসমাপ্ত রহিল এবং আফগান শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

হুমায়ুনের পলায়ন

হুমায়ুন আগ্রার দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইলেন, কিন্তু আফগানরা তাঁহার অনুসরণ করায় তিনি দ্রুত লাহোরের দিকে চলিয়া গেলেন। এই সঙ্কটেও তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহার পাশে দাঁড়াইতে প্রস্তুত ছিলেন না। যাহাতে পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর উপর আধিপত্য রাখিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কামরান শের শাহের সদিচ্ছা চাহিতেন। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে হুমায়ুনের কাশ্মীরের দিকে যাত্রায় বাধা দিতে তিনি সামরিক ব্যবস্থা করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। বিশ্বাস-ঘাতক কামরানের আচরণ হুমায়ুনকে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া বদখ্শানে যাইবার পথেও বাধা দিল। শরণার্থী সম্রাট হিন্দালের সহিত সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে ভাক্কর এবং সেহান অবরোধে তিনি বৃথা সময় ব্যয় করিলেন। তাহার পর তিনি রাঠোর রাজা মালদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মারবারে গেলেন। মালদেব তাঁহাকে এক বৎসর পূর্বে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজপুত রাজা তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া শের শাহকে অসন্তুষ্ট করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মালদেব মুঘল ও আফগানের সংঘর্ষে নিরপেক্ষ মনোভাব গ্রহণ করিলেন। তিনি হুমায়ুনকে সাহায্য করিলেন না, তিনি তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য শের শাহের অনুরোধও রক্ষা করিলেন না। সিন্ধু জয় করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টার পর হুমায়ুন ভারতবর্ষের সীমানা পার হইলেন। কামরানের বিরোধিতার জন্য আফগানিস্থানেও আশ্রয় পাওয়া গেল না। সুতরাং তিনি পারস্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেইখানে শাহ তমাস্প তাঁহাকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিলেন (১৫৪৪)।

হুমায়ুনের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ

হুমায়ুনের চরিত্রের ত্রুটিগুলিই ছিল তাঁহার ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য মূলতঃ দায়ী। রাজনৈতিক এবং সামরিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাব গ্রহণে তিনি ছিলেন অক্ষম। আমোদ-প্রমোদে সময়, উৎসাহ এবং অর্থ ব্যয় করিবার

ফলে উৎসাহপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রচেষ্টা ব্যাহত হইত। বাহাদুর শাহ এবং শের শাহের সহিত যুদ্ধে তাঁহার কার্যকলাপে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার সামরিক সাফল্যের ফল সুদৃঢ় করিতে মালব এবং গুজরাটে তিনি দৃঢ় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। পশ্চিম ভারত তাঁহার দখলে আসে, কিন্তু তিনি তাহা অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। পূর্ব ভারতে শের খাঁর যোগ্যতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল তিনি তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হন। বিহারে এবং বাংলায় শের খাঁর শক্তি উচ্ছেদ করিতে তিনি কোন দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, এবং তাঁহার অভিযানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি-পূর্ণ ছিল। তাঁহার মন্ত্রীরা এবং সেনানায়কেরা তাঁহার নেতৃত্বগুণের অভাবের জন্য মত বিরোধের ফলে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ভ্রাতাদের প্রতি তাঁহার উদারতা তাঁহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। কূটনীতিতে এবং সামরিক ব্যাপারে শের খাঁর মত একজন শক্তিশালী ও দুঃসাহসী প্রতিপক্ষকে অতিক্রম করিবার পক্ষে তিনি ছিলেন অযোগ্য।

শের শাহ : রাজ্য বিস্তার

বিলগ্রামের যুদ্ধের পর শের শাহ হুমায়ুনকে লাহোর পর্যন্ত অনুসরণ করিলেন। পথে তিনি আগ্রা এবং দিল্লী দখল করিলেন। হুমায়ুন সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হইলেন ; কামরান পাঞ্জাব ত্যাগ করিলেন এবং কাবুলে গেলেন। লাহোরে ক্ষমতা অধিকার করিয়া শের শাহ কয়েকজন বালুচি নেতার আনুগত্য লাভ করিলেন। তারপর তিনি ঝিলামের উত্তরাংশ ও সিন্ধু নদের মধ্যবর্তী গক্‌খার অঞ্চল বিধ্বস্ত করিলেন। সেখানে তিনি একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন, এবং বিহারে রোটাস দুর্গের নাম অনুসারে ইহার নাম দেন রোটাস। কাশ্মীরে হস্তক্ষেপের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কিন্তু সিন্ধু ও মূলতান অধিকার করা হয়।

পাঞ্জাব হইতে বিজয়ী বীর বাংলার দিকে দ্রুত অগ্রসর হন। উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় শাসনকর্তা খিজির খাঁর বিদ্রোহ দমন। দোষী শাসনকর্তাকে শাস্তি দেওয়া হইল। বারবার বিদ্রোহ বাংলার একটি স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছিল। তাহা বন্ধ করিতে শের শাহ বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একজন সামরিক শাসনকর্তার হাতে প্রদেশের দায়িত্ব দিবার পুরানো ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়। প্রদেশটিকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি একজন 'শিকদার-ই-শিকদারান' নামক কর্মচারীর অধীনে আনা হয়। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই কর্মচারীদের প্রত্যেকের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি ছোট সৈন্যদল ছিল। তাহাদের কার্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য, কেন্দ্রীয় কোষাগারে প্রাদেশিক রাজস্ব নিয়মিত দিবার ব্যাপারে দেখাশুনার জন্য, এবং বিদ্রোহী মনোভাবের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য 'কাজী ফজিলত' নামে একজন

বেসামরিক কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। 'হাকিম-ই-বাংলা'র পরিবর্তে তাঁহার উপাধি ছিল 'আমিন-ই-বাংলা'। এই উপাধি তুলনামূলক ভাবে কম মর্যাদা-সূচক ছিল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে প্রাদেশিক শাসন-পদ্ধতির সামরিক চরিত্র পরিবর্তিত হয়। নীতির দিক হইতে নূতন এবং কাজের দিক হইতে দক্ষ একটি সম্পূর্ণ নূতন শাসন-যন্ত্র সৃষ্টি করা হয়।

ইহার পরে শের শাহ মধ্য ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী কর্তৃক দীর্ঘ অবরোধ প্রতিরোধ করার পরে গোয়ালিয়র আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। স্বাধীন শাসক কাদির শাহের নিকট হইতে মালব অধিকার করা হয় (১৫৪২)। রণথম্ভোর দুর্গ আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু রায়সিনের শক্তিশালী রাজপুত রাজা, চান্দেরীবিজয়ী পুরণমল শের শাহের সৈন্যদলকে প্রবলভাবে বাধা দিলেন। চারি মাস অবরোধের পরও দুর্গটি দখল করা গেল না। পরে পুরণমল এবং তাঁহার অনুগামীদের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করা হয় এবং দুর্গটি দখল করা হয় (১৫৪৩)।

অতঃপর রাজস্থানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা মারবারের অধিপতি মালদেবের বিরুদ্ধে শের শাহ অভিযান পরিচালনা করেন। মালদেব হুমায়ুনকে বিনা বাধায় সিন্ধু অঞ্চলে পশ্চাদপসরণ করার সুযোগ দেন। এই ঘটনা ছাড়াও মালদেবের মত একজন শক্তিশালী শাসকের অস্তিত্ব সহ্য করা ছিল শের শাহের দিক হইতে রাজনৈতিক-ভাবে অবাঞ্ছিত। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ছিল দিল্লী হইতে সামান্য দূরে নাগোর, আজমীর এবং ঝজ্জুর প্রভৃতি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দে শের শাহ ৮০,০০০ সৈন্যসহ মারবারে উপস্থিত হইলেন। ইহা ছিল তাঁহার নেতৃত্বাধীন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সৈন্য বাহিনী। মালদেব ৪০,০০০ সৈন্য সহ অগ্রসর হইলেন। কোন সংঘর্ষ ঘটিল না। দুই সৈন্যবাহিনী একমাস মুখোমুখি অবস্থান করিল। আফগানরা মানুষের খাদ্য এবং পশুর খাদ্যের অভাবে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হইল। শের শাহ কৌশলে এই সমস্যার সমাধান করিলেন। কয়েকজন রাজপুত সর্দারের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে মালদেবকে সন্দিগ্ধ করিবার জন্য জাল চিঠি ব্যবহার করা হইল। রাঠোর শাসক যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন; কিন্তু যে সকল সর্দারকে তিনি জাল চিঠির ভিত্তিতে সন্দেহ করিলেন তাঁহারা আফগানদিগকে আক্রমণ করিয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করিয়া তাঁহাদের ক্ষত্রিয়োচিত সম্মান রক্ষা করিলেন। মালদেব তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যবাহিনী আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তিনি প্রথমে যোধপুরে এবং পরে সিওয়ানাতে পশ্চাদপসরণ করিলেন। শের শাহ তাহার রাজ্যের এক বিরাট অংশ দখল করিলেন এবং যোধপুরে একজন আফগান শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। শের শাহের মৃত্যুর (১৫৪৫) অতি অল্প সময় পরে মালদেব তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন।

খাতুয়ার যুদ্ধের পর মেবার তাহার ইতিহাসের অন্যতম অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের মধ্যে ছিল। মারবার হইতে শের শাহ চিতোরে গেলেন। বিনাযুদ্ধে বিখ্যাত দুর্গটি আত্মসমর্পণ করিল। নাবালক শাসক, রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র উদয় সিংহ, আফগান আধিপত্য স্বীকার করিলেন। চিতোর আফগান শাসনকর্তাদের আবাসস্থলে পরিণত হইল; রাণার বাসস্থান হইল কুম্ভলগড়। সুর বংশের প্রতি মেবারের আনুষ্ঠানিক আনুগত্য সম্ভবতঃ ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বীকৃত হইত।

রাজস্থানের যে সব অঞ্চল শের শাহের নিয়ন্ত্রণে আসে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে— যেমন, আজমীর, চিতোর, যোধপুর এবং আবু পর্বতে— সৈন্য-বাহিনী রাখা হয়; কিন্তু স্থানীয় শাসকদের উচ্ছেদ করিতে অথবা তাহাদের অনুগত করিতে কোন চেষ্টা করা হয় নাই। চতুর আফগান সম্রাটের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় শাসকদের মধ্যে রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা রক্ষা করা— যাহাতে দিল্লীর বিরুদ্ধে যুক্ত প্রতিরোধের সম্ভাবনা সহজেই নিবারণ করা যায়।

শের শাহের শেষ সামরিক অভিযানের লক্ষ্য ছিল বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালঞ্জরের সুদৃঢ় দুর্গ দখল করা। এই অবরোধের সময় একটি আকস্মিক বিস্ফোরণে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, কিন্তু দুর্গটি অধিকার করা হয়।

শের শাহ: বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা

যদিও শের শাহের জীবন অকস্মাৎ অকালে সমাপ্ত হইয়াছিল তবুও তিনি একটি বিরাট সাম্রাজ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ছিল কাশ্মীর, গুজরাট এবং আসাম ছাড়া সমগ্র উত্তর ভারত। তাঁহার ক্ষমতা উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর-পশ্চিমে গক্খরদের অধ্যুষিত অঞ্চল পর্যন্ত, পশ্চিমে জয়সলমীরের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত, এবং পূর্বে বাংলার সোনারগাঁও পর্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত ছিল।

যদিও শের শাহ ছিলেন আফগান তবুও তিনি লোদীদের মত অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী অভিজাতদের ওপর সীমাবদ্ধ আধিপত্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাজশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল প্রায় বাবরের ধারণার মত। বাবর বাদশাহী মর্যাদা ও ক্ষমতা দাবি করিতেন, কিন্তু তিনি এবং হুমায়ুন এমন প্রশাসনিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই যাহার মাধ্যমে এই উচ্চ ধারণাকে বাস্তবে প্রকাশ করা যায়। শের শাহ সেই প্রশাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যাহার উপরে আকবরের প্রতিভা একটি বিরাট কেন্দ্রীয় কাঠামো গড়িয়া তুলিয়াছিল।

ঐতিহাসিকেরা একটি মূল প্রশ্ন সম্পর্কে বিরোধী সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন: প্রশাসনের ক্ষেত্রে শের শাহ কি আবিষ্কারক অথবা সংস্কারক ছিলেন? তিনি যে মধ্য যুগের ভারতবর্ষের বিখ্যাত সংস্কারকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তাহাতে

কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখা যায় যে সমসাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন না করিয়া নূতন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির সামঞ্জস্য সাধনের দিকেই তিনি বেশী দৃষ্টি দিয়াছিলেন। এইরূপ সামঞ্জস্য সাধনের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভা নিহিত ছিল।

কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কার্যতঃ কোন প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন করা হয় নাই। সম্রাট নিজে ছিলেন প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি সকল বেসামরিক ও সামরিক ক্ষমতা নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করেন। সুলতানী যুগের অনুকরণে চারিটি বিভাগের জন্য শের শাহের চারি জন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন: (১) 'দেওয়ানি-ই-ওয়াজিরত'; (২) 'দেওয়ান-ই-আরিজ'; (৩) 'দেওয়ান-ই-রসালত'; (৪) 'দেওয়ান-ই-ইন্‌শা'। প্রধান কাজী এবং সংবাদ বিভাগের প্রধানের মর্যাদা ছিল প্রায় মন্ত্রীদের মর্যাদার অনুরূপ। মন্ত্রীরা সম্রাট কর্তৃক নির্বাচিত এবং নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদের কাজ ছিল তাঁহার আদেশ পালন করা।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শের শাহের আমলে বৃহত্তম আঞ্চলিক বিভাগ ছিল 'সরকার'; 'সুবা' অথবা প্রদেশগুলি পরে আকবর সৃষ্টি করেন। একথা সত্য যে সুলতানী যুগে এবং শের শাহের শাসনকালে 'সুবা' শব্দটি ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু সুলতানী যুগের 'ওয়ালিয়ত' এবং 'ইক্‌তা' নামে দুই শ্রেণীর আঞ্চলিক বিভাগ ছিল এবং তাহাদের রাজনৈতিক এবং সামরিক গুরুত্বের মধ্যে পার্থক্য ছিল। শের শাহের আমলে মালব এবং পাঞ্জাবের মত সুবৃহৎ প্রশাসনিক অঞ্চল এক একজন সামরিক শাসনকর্তার শাসনাধীন ছিল। বাংলায় তিনি প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার একটি নূতন রূপ প্রবর্তন করেন। ইহার ভিত্তি ছিল প্রদেশটিকে ১৯টি 'সরকারে' ভাগ করা। এই বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক বিভাগগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন 'আমিন-ই-বাংলা' নামক একজন বেসামরিক কর্মচারী। এই ব্যবস্থা শের শাহের প্রদেশিক শাসন-পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ ভাবে প্রত্যেক প্রদেশ কয়েকটি 'সরকারে' বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক 'সরকারে' দুই জন কর্মচারী ছিলেন—'শিকদার-ই-শিকদারান' (প্রধান শিকদার), 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান' (প্রধান মুনসিফ)। প্রথম জন একটি ছোট বাহিনীর সাহায্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, স্থানীয় বিদ্রোহের মোকাবিলা করিতেন এবং পরগণার ভারপ্রাপ্ত 'শিকদার'দের কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন। দ্বিতীয় জন প্রধানতঃ ছিলেন দেওয়ানী মামলার বিচারক। ইহা ছাড়াও একজন প্রধান 'কাজী' ছিলেন; তিনি মামলার বিচার করিতেন। একটি 'সরকার', কয়েকটি 'পরগণা' লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেকটি 'পরগণা' আবার কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেক 'পরগণা'য় কয়েকজন কর্মচারী ছিলেন: একজন 'শিকদার', একজন 'আমিন' (জমির অনুসন্ধান করিবার ভারপ্রাপ্ত), একজন

'ফোতদার' (কোষাধ্যক্ষ), দুই জন 'কারকুন' (হিসাব রক্ষক—একজন ফার্সি ভাষায় এবং অপর জন হিন্দীতে)। ইহা ছাড়াও একজন 'কানুনগো' (ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্রের রক্ষক) ছিলেন। এই ব্যবস্থা নূতন ছিল না। শের শাহ প্রচলিত ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করেন এবং তাহাকে নূতন শক্তি দেন। প্রকৃত নূতনত্ব ছিল শাসন-ব্যবস্থার নিম্নতম স্তরে নূতন কর্মোদ্যোগ। সুলতানী যুগে তাঁহার পূর্বসূরীদের মত উচ্চতম স্তরে শাসন-ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি নিম্নতম স্তর হইতে সুষ্ঠু প্রশাসন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বাতন্ত্র্যভোগী গ্রাম্য গোষ্ঠী (autonomous village community) পূর্বেই বর্তমান ছিল। শের শাহ 'পাটোয়ারী' এবং 'চৌকিদার'দের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন।

শের শাহ : রাজস্ব-ব্যবস্থা

প্রশাসনিক সংস্কারক হিসাবে শের শাহের খ্যাতি বিশেষভাবে নির্ভর করে তাঁহার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার উপরে। তিনি সাসারামের জায়গীরে তাঁহার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া ইহাকে রূপ দেন। তিনি দিল্লীর পূর্ববর্তী সুলতানদের নিকট ঋণী ছিলেন। আবুল ফজল বলিয়াছেন যে তিনি শুধু আলাউদ্দীন খলজীর নির্দেশগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার রাজস্ব-ব্যবস্থায় কোন নূতনত্ব ছিল না।

একটি নির্দিষ্ট নিয়মে জমি জরিপ করা হইত। প্রত্যেক গ্রামের চাষযোগ্য জমি নির্দিষ্ট করা হইত। প্রতি বিঘার গড় উৎপাদন নির্ধারিত হইত। এই উদ্দেশ্যে জমি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইত—ভাল, মাঝারি এবং খারাপ। সরকারী দাবি ছিল মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ। এই অংশ নগদে বা শস্যে দেওয়া যাইত। শস্যের চলতি মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া নগদ অর্থ স্থির করা হইত। প্রত্যেক উৎপাদক সরকার (Government) হইতে একটি 'পাট্টা' (মালিকানা স্বত্বের দলিল) পাইত। এই দলিল জমিতে তাহার অধিকার স্বীকার করিত এবং তাহার দেয় রাজস্ব নির্দিষ্ট করিত। প্রত্যেক উৎপাদককে একটি 'কবুলিয়ত' (চুক্তির দলিল) স্বাক্ষর করিতে হইত। এই দলিল নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান করিতে তাহার সম্মতি সূচিত করিত। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও প্রত্যেক উৎপাদককে দুইটি কর দিতে হইত: 'জরিবানা' (জমি জরিপকারীর প্রাপ্য অর্থ) এবং 'মহসীলানা' (কর সংগ্রাহকের অর্থ)। ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে সরকারী দাবির পরিমাণ যাহা হইত তাহার ভিত্তিতে এই কর দুইটি নেওয়া হইত। সাধারণত: শতকরা ২½ ভাগের কম অথবা ৫ ভাগের বেশী নেওয়া হইত না। ইহা ছাড়া একটি অতিরিক্ত কর (শতকরা ২½ ভাগ) দিতে হইত শস্যে—নগদ টাকায় নয়।

এইভাবে সংগৃহীত শস্য সরকারী শস্য ভাণ্ডারে জমা রাখা হইত এবং দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কম দামে বিক্রয় করা হইত।

রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে কর্মচারীদিগকে সুবিবেচক এবং উদার হইবার জন্য শের শাহ নির্দেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাঁহার রাজস্ব-ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। তাঁহার স্বল্পকালীন রাজত্বকালে জমি জরিপের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। রাজস্ব সম্বন্ধে সরকারের দাবির হার ছিল খুব বেশী। প্রতি বৎসর নূতন ভাবে কর ধার্য করার ব্যবস্থা উৎপাদকদের এবং রাজকর্মচারীদের পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি করিত। দুর্নীতির অস্তিত্ব সরকারী ভাবে স্বীকার করা হইত। রাজস্ব সংগ্রহের চাকুরিতে বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে বেশী লাভ করিবার সুযোগ দিবার জন্য কর্মচারীদের ঘনঘন স্থানান্তরিত করা হইত। জায়গীর ব্যবস্থাকে গুরুত্ব না দেওয়া হইলেও তাহা বজায় ছিল। জায়গীরের রায়তদের অবস্থা সুখের ছিল না। 'ওয়াকফ' (মুসলমানদের ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত) জমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়া হইত না। শের শাহের উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদক এবং সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা; যতদূর সম্ভব তিনি মধ্যবর্তী শ্রেণীর বিলোপ করেন। কয়েক ক্ষেত্রে তিনি আকবরের কর নির্ধারণ এবং কর সংগ্রহের ব্যবস্থার পূর্বগামী ছিলেন।

শের শাহ : বিচার-ব্যবস্থা এবং পুলিশ

শের শাহ ছিলেন বিচার বিভাগের কঠোর এবং পক্ষপাতহীন পরিচালক। অন্যান্য মধ্যযুগীয় শাসকদের মত তিনি অনেক সময় নিজেই মামলার বিচার করিতেন। সেকালের লেখকদের কাহিনীতে দেখা যায়, আত্মীয় বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা দোষী প্রমাণিত হইলে তিনি তাহাদিগকেও রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি বিচার-ব্যবস্থায় কোন প্রাতিষ্ঠানগত নূতনত্ব প্রবর্তিত করেন নাই। বিভিন্ন পদমর্যাদার অধিকারী কাজীরা বিচারকের কাজ করিতেন এবং ইসলামীয় আইন প্রয়োগ করিতেন।

কোন পৃথক পুলিশ সংগঠন ছিল না; 'শিকদার-ই-শিকদারান' এবং 'শিকদার'গণকে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইত। শের শাহ যে একটি নূতনত্ব প্রবর্তন করিয়াছিলেন—তাহা হইল স্থানীয় মানুষের দায়িত্বের নীতি। কোন গ্রামে কোন অপরাধের ঘটনা ঘটিলে গ্রামপ্রধানকে অপরাধীকে হাজির করিতে, অথবা চুরি বা ডাকাতির ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করিতে হইত।

সংবাদ সংগ্রহের দিকে শের শাহ বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খলজীর সংবাদ সংগ্রহ ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত হয়। 'দারোগা-ই-চৌকী' নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সংবাদ সংগ্রহ ব্যবস্থার ভার দেওয়া হয়। সমগ্র

রাজ্যে কার্যরত সংবাদ সংগ্রাহকেরা এবং গুপ্তচরেরা শের শাহকে সকল রকমের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত রাখিত।

শের শাহ যে শান্তি রক্ষা করিতে এবং জনগণকে নিরাপত্তা দিতে সফল হইয়াছিলেন তাহাতে সামান্যই সন্দেহ আছে। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন: শের শাহের শাসনকালে 'একজন জরাপীড়িত বৃদ্ধা মহিলা স্বর্ণালঙ্কার পূর্ণ একটি পেটিকা মাথায় লইয়া ভ্রমণ করিতে পারিতেন এবং কোন চোর অথবা ডাকাত শের শাহের ব্যবস্থায় কঠোর শাস্তির ভয়ে তাহার নিকটে আসিত না।' 'তবকৎ-ই-আকবরী'তে বলা হইয়াছে যে শের শাহের শাসনকালে একজন বণিক তাহার বাণিজ্যদ্রব্য চুরি যাইবার ভয় না করিয়াই নির্জন মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতে ও নিদ্রা যাইতে পারিত।

শের শাহ: মুদ্রা ও বাণিজ্য

শের শাহের মুদ্রা সংস্কার উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ছিল খুচরা পয়সার অভাব, প্রচলিত মুদ্রার মানের অবনতি, বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট অনুপাতের অভাব, বাজারে পূর্ববর্তী রাজাদের মুদ্রার প্রচলন। বহুসংখ্যক নূতন রৌপ্য মুদ্রা (দাম) প্রবর্তন করিয়া এবং সমস্ত পুরাতন এবং মিশ্রিত ধাতুর মুদ্রার বিলোপ ঘটাইয়া তিনি এই অব্যবস্থা দূর করার চেষ্টা করেন। তাঁহার রৌপ্য মুদ্রা ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তী ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিণত হইয়াছিল। শের শাহের শাসনকাল 'ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ।'

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে উৎসাহ দিবার জন্য শের শাহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শুল্ক ও করের বিলোপ সাধন করেন এবং সরকারের দাবি দুইটি করে সীমাবদ্ধ রাখেন। একটি সীমান্তে দ্রব্য প্রবেশের সময়ে, অপরটি বিক্রয়ের স্থলে আদায় করা হইত। তাঁহার নির্মিত প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ রাজপথগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং সাধারণ পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধা করিত। প্রধান দুইটি, সড়ক ছিল (১) 'সড়ক-ই-আজম,—দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০০ ক্রোশ, সোনারগাঁও (বর্তমানে বাংলাদেশে) হইতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত; (২) আরেকটি সড়ক, যাহা আগ্রাকে দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুরের সঙ্গে যুক্ত করিত। সড়কগুলির পার্শ্বে ১৭০০টি সরাই নির্মিত হইয়াছিল— যেখানে হিন্দু, মুসলমান এবং শান্তি রক্ষাকারী পুলিশ কর্মচারীদের জন্য পৃথক জায়গা ছিল। রাস্তায় ছায়াদানকারী বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। সড়কগুলি সামরিক দিক হইতেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল—সৈন্যরা দ্রুত চলাচল করিতে পারিত। এই সড়কগুলিকে যথার্থই 'সাম্রাজ্যের প্রকৃত 'ধমনী' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

শের শাহ : সৈন্যবাহিনী

শের শাহের একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। আফগান সম্রাটের সৈন্যদলে স্বভাবতঃই আফগানদের প্রাধান্য ছিল। সামন্ত সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া তিনি সরকারের কর্তৃত্বাধীন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্য আলাউদ্দীন খলজীরনীতি অনুসরণ করেন। এই সৈন্যবাহিনীতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত যোদ্ধারা স্থান পাইত এবং সরকার হইতে তাহাদের বেতন দেওয়া হইত নগদে অথবা জায়গীরে। অশ্বারোহী বাহিনীতে দুর্নীতি বন্ধ করিবার জন্য তিনি আলাউদ্দীনের আমলে প্রচলিত অশ্ব চিহ্নিত করার প্রথা (branding of horses) পুনরায় প্রবর্তন করেন। তিনি সৈন্যদের একটি তালিকা রাখিতেন। কেহ সামরিক পর্যবেক্ষণ এবং যুদ্ধের সময় নিজে উপস্থিত না থাকিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে পাঠাইতে না পারে তাহা এই তালিকার সাহায্যে লক্ষ্য করা হইত। প্রত্যেক পর্যায়ে দক্ষতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত। তাঁহার সামরিক সংগঠন আকবরের মনসবদারী ব্যবস্থার পথ প্রস্তুত করে।

সৈন্যবাহিনীর সর্বাপেক্ষা বড় বিভাগ ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। পদাতিক বাহিনীর বন্দুক ছিল। একটি শক্তিশালী গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ৪৭টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকিত। তাহা ছাড়া রাজধানীতে ১৫০,০০০ অশ্বারোহী, ২৫,০০০ পদাতিক, ৫০০০ হস্তী এবং একটি গোলন্দাজ বাহিনী ছিল।

শের শাহ : শিল্প

ঝিলামের তীরে শের শাহ কর্তৃক নির্মিত রোটাসগড় দুর্গ সামরিক প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দিল্লীর পুরানো কিল্লার নির্মাণ-কার্য তিনিই করিয়াছেন বলিয়া বলা হয়। ইহার অভ্যন্তরে নির্মিত হইয়াছিল 'কিলা-ই-কুহনা' মসজিদ ; ইহার গঠনরীতি 'আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সময়ের শিল্পের গঠনরীতির পূর্বগামী'। সাসারামে শের শাহের নিজের সমাধি ভবনে আমরা তাঁহার স্থাপত্যশিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন পাই। কানিংহাম তাজমহলের তুলনায় ইহাকেই পছন্দ করিয়াছেন। স্মিথের মতে, এইটি হইল 'ভারতের শিল্পের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপরিকল্পিত এবং সুন্দর। তুঘলুকদের স্থাপত্য শিল্পে অলঙ্করণের প্রাচুর্য না থাকায় একটু কাঠিন্য দেখা যায়। শাহ জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-কীর্তি তাজমহলের গৌরব অসামান্য কমনীয়তা। শের শাহের স্থাপত্য শিল্প ছিল এই দুই রীতির মাঝামাঝি।' আর একজন শিল্প সমালোচক বলিয়াছেন, 'শের শাহের সমাধি ভবন একটি জলবেষ্টিত ভূখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া আছে—ধূসর ও ধ্যানমগ্ন। ভারতীয় সমাধি সৌধগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ এটি সর্বাপেক্ষা বেশী ভাবোদ্রেককারী'।

শের শাহ : ধর্মীয় নীতি

বলা হইয়াছে যে অন্যান্য শাসকদের মত হিন্দু ধর্মের প্রতি শের শাহের মনোভাব কেবলমাত্র ঐ ধর্মকে সহ্য করার মত ছিল না, তাহাকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। এই মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া সুন্নী, তাঁহার ধর্মীয় কর্তব্য তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করিতেন। তিনি এমন কোন কার্য করেন নাই যাহাতে হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা যায়। তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তিনি নিঃসন্দেহে হিন্দু প্রজাদের প্রতি সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে 'জেহাদ' ঘোষণা করিতে এবং মন্দির ধ্বংস করিতে (যেমন, যোধপুরে) বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু সুলতানী যুগে তাঁহার কয়েকজন পূর্বসূরীর তুলনায় তাঁহার সাধারণ নীতি ছিল অনেক বেশী সহনশীল। তিনি জিজিয়ার বিলোপ সাধন করেন নাই; কিন্তু তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্যাতন বা অপমান করিতে চাহেন নাই। তাহাদের প্রথাগত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে হস্তক্ষেপ করা, অথবা ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকের ধর্মীয় কর্তব্যের অঙ্গ হিসাবে দেবমূর্তি এবং মন্দির ধ্বংস করা তাঁহার শাসননীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তিনি ফিরোজ তুঘলুক বা সিকন্দর লোদী ছিলেন না। তাঁহার পদাতিক সৈন্যের একটি বড় অংশ হিন্দুদের লইয়া গঠিত ছিল। ব্রহ্মজিৎ গৌড় নামে তাঁহার একজন বিশ্বস্ত হিন্দু সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি আকবর ছিলেন না, এবং তাঁহার নীতিতে হিন্দুদের প্রতি মুসলমান রাষ্ট্রগুলির প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন মূলগত পরিবর্তন দেখা যায় না।

শের শাহ : কৃতিত্ব বিচার

শের শাহের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দশ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন। তিনি কেবলমাত্র একটি ছোট জায়গীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন; মৃত্যুর সময়ে তিনি যে রাজ্য রাখিয়া যান তাহা ছিল বাংলা হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি সম্পদ বা সামরিক শক্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে পান নাই, কিন্তু তিনি দুই লক্ষের বেশী সৈন্য দ্বারা শক্তিশালী একটি বাহিনী সংগঠিত করেন। সামরিক নেতা হিসাবে তিনি তাঁহার জীবন শুরু করেন নাই, কিন্তু তিনি অভাবনীয় সামরিক তৎপরতায় একজন শক্তিশালী ও সফল সেনাপতির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীতে ছয় বৎসরেরও কম সময় শাসন করেন, এবং এই সময়ে তাঁহার দৃষ্টি প্রায়শঃই যুদ্ধের দিকে নিবদ্ধ থাকিত। কিন্তু তিনি এমন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংগঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যাহা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। এই সব দিক হইতে তাঁহার সহিত তুলনীয় ব্যক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসে খুব কমই

আছেন। আকবর তাঁহার বিরাট কার্য সম্পূর্ণ করিতে অর্ধ শতাব্দী সময় পাইয়াছিলেন; শের শাহ কম সৌভাগ্যশালী ছিলেন। শের শাহের তৈরী রাজনৈতিক কাঠামো যে স্থায়ী হয় নাই তাহার জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না। তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের জন্য একটি সুশাসিত সাম্রাজ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন; ইহা সামরিক দখলাধীন কয়েকটি অঞ্চলের সমষ্টি ছিল না। তাঁহারা এই মূল্যবান উত্তরাধিকার রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রা-ব্যবস্থা এবং তাঁহার নির্মিত রাজপথগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার স্থাপত্য কীর্তিগুলি মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পের চূড়ান্ত পর্যায় সূচিত করে।

শের শাহের উত্তরাধিকারীগণ

শের শাহের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খাঁ। তিনি ইসলাম শাহ উপাধি নিয়া নয় বৎসর শাসন করেন (১৫৪৫-১৫৫৪)। তিনি কয়েকজন পুরাতন অভিজাত ব্যক্তিকে এবং হুমায়ুনের মিত্র গক্কখরদিগকে দমন করেন। তিনি কাশ্মীর সীমান্তে মানকোট নামে একটি দুর্গশ্রেণী নির্মাণ করেন। তিনি কাশ্মীর পর্যন্ত তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেন এবং পূর্ব বাংলা তাঁহার নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিনি শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি করেন। সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়।

শের শাহের এক আত্মীয় মুবারিজ খাঁ ইসলাম শাহের নাবালক পুত্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন এবং মহম্মদ আদিল শাহ উপাধি গ্রহণ করেন (১৫৫৪-১৫৫৬)। তিনি ছিলেন দুর্বল, অযোগ্য এবং বিলাসী। হিমু নামক জনৈক নিম্নবংশীয় হিন্দুকে তিনি তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে গ্রহণ করেন। আফগান অভিজাতদের শক্তিশালী প্রতিনিধিরা তাঁহার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন, ইব্রাহিম খাঁ সুর, দিল্লী এবং আগ্রা অধিকার করেন। আদিল শাহ চুনারে পলায়ন করিয়া সেখানেই তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। অপর এক জন আফগান অভিজাত, আহম্মদ খাঁ সুর, সিকন্দার শাহ উপাধি গ্রহণ করেন এবং আগ্রার নিকটে ইব্রাহিমকে পরাজিত করেন। এই বিরোধের ফলে শের শাহের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। চূড়ান্ত আঘাত হানে মুঘলরা।

হুমায়ুনের প্রত্যাবর্তন

১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের শাহ তমাস্প কাবুল এবং কান্দাহার জয়ে হুমায়ুনকে সামরিক সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইলেন এই শর্তে যে, সফল হইলে তিনি শিয়া ধর্ম মানিয়া চলিবেন, 'খুৎবা'তে শাহের নাম ঘোষণা করিবেন, এবং কান্দাহার পারস্যকে ফিরাইয়া দিবেন। হুমায়ুন আসকারীর নিকট হইতে কান্দাহার দখল

করিলেন, কিন্তু তাহা পারস্যকে দিলেন না। কাবুলও দখল করা হইল; সেখানকার শাসক কামরানকে বন্দী করা হইল। বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতাদের নিদারুণ শত্রুতা হইতে হুমায়ুন অবশেষে মুক্ত হইলেন।

ভারতবর্ষে তাঁহার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সুযোগ উপস্থিত হইল ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে (১৫৫৪)। পেশোয়ারে উপস্থিত হইলে বৈরাম খাঁ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এই তুর্কোমান সেনাপতি হুমায়ুনের অনুগামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। বিনা বাধায় ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে লাহোর দখল করা হইল। প্রায় তিন মাস পরে একটি আফগান সৈন্যবাহিনী মচ্ছিওয়ারায় (পাঞ্জাবে, লুধিয়ানার নিকটে) পরাজিত হইল। সরহিন্দে বৈরাম খাঁ সিকান্দর শাহকে পরাজিত করিলেন। ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। আগ্রা দখল করা হইল। অবশিষ্ট আফগান প্রতিরোধ ধ্বংস করার কাজ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হইল। কিন্তু ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গ্রন্থাগারের সিঁড়ি হইতে আকস্মিক পতনের ফলে হুমায়ুনের মৃত্যু হইল। 'তিনি সারা জীবন হোঁচট খাইয়াই চলিয়াছিলেন, এবং হোঁচট খাইয়াই তাঁহার জীবন শেষ হইল।'

ষোড়শ অধ্যায়

আকবর

১. রাজ্য বিস্তার

বাল্যকাল

হুমায়ুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং উত্তরাধিকারী আকবরের জন্ম হয় ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর অমরকোটে (সিন্ধুদেশ)। তাঁহার মাতার নাম ছিল হামিদাবানু। যখন এই বালকের জন্ম হয় তখন রাজ্যহারা সম্রাট সিন্ধুদেশে থাট্টা এবং ভাক্করের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করিতেছিলেন।

আকবর বাল্যকালে ছিলেন অসুখী। যখন তাঁহার বয়স এক বৎসর তখন তাঁহার পিতামাতা তাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার খুল্লতাত আসকারী তাঁহাকে গ্রহণ করেন এবং কান্দাহারে লইয়া যান। সেখানে আসকারীর পত্নী ভালভাবে তাঁহার দেখাশুনা করেন। তারপর তাঁহাকে কাবুলে লইয়া যাওয়া হয় এবং কামরান তাঁহাকে পালন করেন, যতদিন না তাঁহার পিতামাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার ধাত্রীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মাহম অনগ। পড়াশুনা অপেক্ষা খেলাধূলা এবং শারীরিক কলাকৌশলে তিনি বেশী আগ্রহী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষকেরা তাঁহাকে পড়াইতে এবং লিখিতে শিখাইতে ব্যর্থ হন।

সিংহাসন লাভ (১৫৫৬)

আকবরের কাছে যখন হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি ছিলেন কলানৌরে (পাঞ্জাবে, গুরুদাসপুরের নিকটে)। তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খাঁ সেখানে তাঁহাকে সম্রাট রূপে ঘোষণা করেন (১৪ ফেব্রুয়ারী ১৫৫৬)। কেবলমাত্র পাঞ্জাবের একটি অংশ নাবালক বাদশাহ এবং তাঁহার অভিভাবকের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণে ছিল।

হিমু : পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬)

হুমায়ুনের মৃত্যুর সময় আফগান প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইয়া মহম্মদ আদিল শাহ বিহারের অন্তর্গত চুনারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল আফগান প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস করা এবং ভারতবর্ষ হইতে মুঘলদের বিতাড়িত করা। তাঁহার এই দ্বিমুখী কার্যে তাঁহার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা এবং প্রধান সামরিক সহযোগী ছিলেন হিমু নামক জনৈক নিম্নবংশজাত হিন্দু।

প্রথমে তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের অন্তর্গত রেওয়ারীতে একজন লবণ বিক্রেতা। পরে তিনি আফগান সরকারের চাকুরি গ্রহণ করেন। যোগ্যতার বলে ক্রমশ তাঁহার পদোন্নতি হয়। ইসলাম শাহের শাসনকালে তিনি রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা লাভ করেন। মহম্মদ আদিল শাহের অধীনে তিনি কার্যতঃ প্রধান মন্ত্রী এবং সেনাপতির ভূমিকা নেন। সেনাপতি হিসাবে তিনি অসাধারণ সামরিক যোগ্যতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্রাহিম স্থর এবং বাংলার শাসনকর্তা মহম্মদ খাঁ স্থরকে পরাজিত করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর স্থযোগে তিনি আগ্রা বিনা বাধায় দখল করেন। ইহার পর তিনি দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। সেখানে মুঘল শাসনকর্তা তার্দি বেগ খাঁ দুর্বল প্রতিরোধের পর পরাজিত হন (অক্টোবর, ১৫৫৬)।

দিল্লীর পতনের পর মধ্য ভারত এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশ হিমুর নিয়ন্ত্রণে আসে। বলা হয় যে তিনি নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। এই মতের সমর্থনে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নাই। অন্যদিকে আমরা আবুল ফজলের পরিষ্কার উক্তি পাই যে 'দূরদৃষ্টিবশতঃ তিনি আদিলের নামেমাত্র সার্বভৌমিকতা রক্ষা করেন এবং তাঁহার বিরোধীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেন।' তাঁহার প্রকৃত পরিকল্পনা যাহাই হউক না কেন, নিঃসন্দেহে হিমু ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন এক রাজনৈতিক ভাগ্যন্বেষী।

আগ্রা এবং দিল্লীর পতনের সংবাদ পাইবার পর বৈরাম খাঁ আকবরের সম্মতি সহ স্থির করিলেন যে অবিলম্বে রাজধানী এই দুইটি শহর পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। কয়েকজন মুঘল সেনাপতি হিমুকে বিশেষ শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা বৈরাম খাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। যাঁহারা হিমুর সম্মুখীন না হইয়া ভয়ে পশ্চাদপসরণ পছন্দ করিতেন তাঁহাদিগকে নীরব করাইতে বৈরাম খাঁ তার্দি বেগের প্রাণদণ্ড করিলেন এবং হিমুর সহিত সম্মুখ সমরের জন্য অগ্রসর হইলেন। দুই সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ ঘটিল পানিপথে (৫ নভেম্বর ১৫৫৬)। হিমু সাহসের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু হঠাৎ একটি তীর তাঁহার চক্ষুতে আঘাত করিল এবং তিনি জ্ঞান হারাইলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী আতঙ্কে পলায়ন করিল। জনৈক মুঘল কর্মচারী তাঁহাকে বন্দী করিয়া আকবরের নিকটে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। নাবালক সম্রাট তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খাঁর নির্দেশে এই নিষ্ঠুর ও কাপুরুষের মত কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়। কিন্তু ইহা অনেক বেশী সম্ভব যে আকবর অচৈতন্য বন্দীকে হত্যা করিতে অস্বীকার করিলে বৈরাম খাঁ নিজেই এই কাজটি করেন।

হিমুর মৃত্যু আফগানদের সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট করিল; নবস্থাপিত মুঘল আধিপত্য আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার সময় পাইল। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধটি প্রথম যুদ্ধ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ ইহা আফগানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুঘলদের চূড়ান্ত সাফল্য নিশ্চিত করিল। বিজয়ীরা দিল্লী এবং আগ্রা দখল করিল।

সিকন্দর সূর ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। দুই বৎসর পরে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে বাংলায় বাসকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। মহম্মদ আদিল শাহ মুঙ্গেরে (বিহারে) ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে এক যুদ্ধে নিহত হন। ইব্রাহিম সূর উড়িষ্যায় আশ্রয় নেন। হিমুর পতনের মৃত্যুর পর দুই বৎসরের মধ্যে আফগান শক্তির পুনরভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়াছিল।

বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব (১৫৫৬-৬০)

পারস্যের বাসিন্দা তুর্কোমান জাতীয় বৈরাম খাঁ বাবরের ভারতবর্ষে প্রবেশের আগেই তাঁহার অধীনে চাকুরিতে যোগ দেন। হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবনে সর্বদা তিনি তাঁহার অনুগত ও বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। বারবার ভাগ্য বিপর্যয়েও তিনি নিরুদ্যম হন নাই, শের শাহের অধীনে চাকুরীর লোভনীয় প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। পারস্যে হুমায়ুনের নির্বাসনের সময়ে বৈরাম তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। আফগানিস্থানে এবং ভারতবর্ষে হুমায়ুনের প্রত্যাবর্তনের পর পাঞ্জাবে, তাঁহার অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলে তিনি আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পরেও তিনি এই পদে আসীন রহিলেন। প্রকৃতপক্ষে আকবরের রাজত্বকালের প্রথম চারি বৎসর তিনিই ছিলেন মুঘল রাজ্যের প্রকৃত শাসক। তাঁহার সাহস ও দূরদৃষ্টির ফলেই আকবরকে হিমু এবং আফগানদের হাতে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া কাবুলে পশ্চাদপসরণ করিতে হয় নাই। হিমুর বিরোধিতার সম্মুখীন হইবার উপর গুরুত্ব দিয়া বৈরাম ভারতবর্ষে নবগঠিত মুঘল রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের পরে মুঘল সরকার প্রশাসনের কাজে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিল। তখন যাঁহারা বৈরাম খাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁহারা শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত নানা কারণে তিনি জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন শিয়া, রাজপরিবার এবং শক্তিশালী অভি-জাতরা ছিলেন সুন্নী। তিনি গদাই নামক জনৈক শিয়াকে 'সদর-উস্-সুদুর' পদে নিযুক্ত করেন। ইহা তাঁহার পক্ষে মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। এই পদটি ছিল ধর্মীয়। যিনি এই পদে আসীন হইতেন তিনি আইন ও বিচার বিভাগের কর্ম-চারীদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জমি দানের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেন। এই পদের দায়িত্ব একজন শিয়াকে দেওয়া সুন্নী মনোভাবের এবং স্বার্থের বিরোধী ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি হুমায়ুনের এক আত্মীয়া সেলিমা বেগমকে বিবাহ করিয়া রাজপরিবারের আত্মীয় হন। তাঁহার এইরূপ সামাজিক প্রতিপত্তি ঈর্ষার উদ্রেক করে। তৃতীয়তঃ, তিনি ছিলেন উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী এবং বিরোধীদের সম্পর্কে অসহিষ্ণু। যুবক প্রভুর নিকটে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপস্থিতি তিনি পছন্দ করিতেন না। তার্দি বেগের মৃত্যুদণ্ড এবং আবুল মালির (যিনি আকবরের

রাজ্যাভিষেক দরবারে উপস্থিত হইতে আপত্তি জানাইয়াছিলেন) বন্দীদশা বহু ব্যক্তিকে আঘাত দিয়াছিল। এই দুইটি কাজের জন্য দায়ী ছিলেন বৈরাম খাঁ।

যুবক সম্রাটের চারি পার্শ্বে এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা এই অতিরিক্ত শক্তিশালী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকের হাত হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন তাঁহার মাতা হামিদা বানু, তাঁহার প্রধান ধাত্রী এবং পালিকা-মাতা মাহম অনগ। এই ধাত্রীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁহার পুত্র আধম খাঁ এবং তাঁহার আত্মীয় দিল্লীর শাসনকর্তা শিহাবউদ্দীন। আকবরের নিজেরও কিছু অভিযোগ ছিল। তাঁহার নিজস্ব খরচের জন্য কোন নির্দিষ্ট অর্থ ছিল না। বৈরাম খাঁ ও তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার চেয়ে বেশী জাঁকজমকে বাস করিতেন। উপরন্তু, যতই তাঁহার বয়স বৃদ্ধি হইতেছিল এবং তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছিলেন ততই আকবরের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা স্বাভাবিক ছিল।

১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে ১৮ বৎসর বয়সে আকবর মাহম অনগ এবং তাঁহার অনু-গামীদের চাপে বৈরাম খাঁকে জানাইলেন যে তিনি শাসনভার নিজ হাতে লইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। বৈরামকে মক্কায় যাইবার পরামর্শ দেওয়া হইল এবং তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য একটি জায়গীর দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। তিনি এই আদেশ মানিয়া লইলেন, নিজের সকল দায়িত্ব ত্যাগ করিলেন এবং তীর্থযাত্রার প্রস্তুতি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দরবারে তাঁহার বিরোধী দল দ্রুত তাঁহাকে সরাইতে চাহিলেন। বৈরাম এই অপমানে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং সশস্ত্র বাধা দিলেন। তিনি পরাজিত এবং বন্দী হইলেন এবং তাঁহাকে আকবরের নিকটে উপস্থিত করা হইল। আকবর তাঁহাকে মক্কার দিকে অগ্রসর হইবার অনুমতি দিলেন। মক্কার পথে গুজরাটের অনহিলবাড়ায় জনৈক আফগান ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাকে হত্যা করিল (১৫৬১)। এইভাবে এক অসামান্য নেতৃত্বগুণের অধিকারী ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হইল। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বদায়ুনী বলিয়াছেন 'হিন্দুস্থানের দ্বিতীয় বার বিজয় এবং সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার অদম্য চেষ্টা, শৌর্য এবং বিজ্ঞজনোচিত নীতির দ্বারা।'

হারেম দলের শাসন (১৫৬০-৬২)

বৈরাম খাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-ব্যবস্থার উপর আকবরের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হইল না। মাহম অনগ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিলেন ; তিনিই হইলেন প্রকৃতপক্ষে 'কার্যকরী প্রধানমন্ত্রী' তাঁহার পুত্র আধম খাঁ মালবে নির্যাতন আরম্ভ করিলেন এবং দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীকে হত্যা করিলেন। আকবরের আদেশে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। ছয় সপ্তাহ পরে মাহম অনগ ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন।

আকবর নিজের হাতে শাসনভার গ্রহণ করিলেন (১৫৬২)। তিনি তাঁহার মাতা হামিদা বানুকে যথোচিত শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু শাসনসংক্রান্ত নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে তাঁহাকে কখনও সুযোগ দিতেন না।

ব্যক্তিগত শাসনের সূত্রপাত : প্রাথমিক সংস্কারসমূহ

হারেম দলের, অথবা অন্তঃপুরের শাসন (Pethicoat government) ছিল অব্যবস্থার যুগ। ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে আকবরের ব্যক্তিগত শাসন শুরু হয়। তাঁহার বিশ বৎসর বয়সে তিনি নিজ রাজ্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

১৫৬২ এবং ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নূতন শাসক তিনটি সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে তাঁহার জ্ঞানদীপ্ত মনোভাব প্রকাশ করিলেন। প্রথমটি ছিল যুদ্ধে বন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করিবার পুরাতন প্রথার বিলোপ। ইহা কেবলমাত্র একটি মানবিক ব্যবস্থা ছিল না; ইহা হিন্দু বন্দীদের ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর-করণের হাত হইতে রক্ষা করে। ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দে আকবর সমগ্র রাজ্যে হিন্দুদের উপর তীর্থকর বিলোপ করেন। তাঁহার মতে হিন্দুদের আরাধনার পদ্ধতি ভ্রান্ত হইলেও ভগবানের আরাধনার উপর কর আরোপ করা অন্যায়। ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়: জিজিয়া করের বিলোপসাধন। আকবর ইসলামীয় রাষ্ট্রের একটি মূল ধারণা হইতে সরিয়া আসিলেন এবং প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞজনোচিত নীতির সুফল হইল হিন্দু প্রজাদের সদিচ্ছা ও আনুগত্য লাভ।

রাজ্যজয় নীতি

আকবর বলিয়াছেন : 'একজন রাজা সর্বদা যুদ্ধজয়ের দিকে দৃষ্টি দিবেন, নতুবা তাঁহার প্রতিবেশীরা তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিবে।' আবুল ফজল তাঁহার রাজ্যজয়ের পিছনে একটি উচ্চ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন : ছোট ছোট রাজাদের কুশাসনে নিপীড়িত জনতার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নের ইচ্ছা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে রাজ্যজয়ে ব্যস্ত রাখিবার ব্যাপারে আকবরের একটি সামরিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন : 'সৈন্যবাহিনী সর্বদা যুদ্ধে অভ্যস্ত থাকিবে, নতুবা অভ্যাসের অভাবে তাহারা আরামপ্রিয় হইয়া ওঠে।'

আকবরের যুদ্ধ এবং রাজ্যজয়ের পিছনে কোন নির্দিষ্ট দর্শন খুঁজিবার চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে মালবের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় হইতে ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে আসিরগড়ের পতন পর্যন্ত—৪০ বৎসর সময়ে—তিনি রাজ্যবিজেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনে সাফল্য লাভ করেন। রাজ্যজয়ের দিক হইতে বিচার করিলে আকবরের তুলনায় ব্রিটিশ আমলের লর্ড ডালহৌসীর কৃতিত্ব নিষ্প্রভ হইয়া যায়। যুদ্ধ এবং রাজ্যজয়ের দ্বারা দেশে রাজনৈতিক

ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইয়াছিল। আকবরের নীতিতে কোন নূতনত্ব ছিল না। প্রাচীন কালে এবং সুলতানী আমলে পরাক্রান্ত রাজারা রাজ্যবিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতেন। আকবরের নীতি তাঁহার তিন জন উত্তরাধিকারী অনুসরণ করিয়াছিলেন। যখন সাম্রাজ্য আর বোঝা বহন করিতে সক্ষম হইল না তখন এই নীতি ত্যাগ করা হয়।

প্রথম যুগের রাজ্যবিস্তার

রাজ্যবিস্তারের প্রথম পর্ব শুরু হয় বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বের সময়। গোয়ালিয়র, আজমীর এবং জৌনপুর দখল করা হয়; মোটামুটি আকারের রাজ্যের অধিকার পান নূতন শাসক।

হারেম দলের শাসনের সময়েই ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে মালব জয় সম্পন্ন হয়। মালবের স্বাধীন সুলতান বাজ বাহাদুর রাজনীতি এবং যুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন; গান এবং আমোদ-প্রমোদেই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আধম খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। সারঙ্গপুরের কাছে একটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাজ বাহাদুর পলায়ন করেন। আধম খাঁর নিষ্ঠুরতা ও অন্যান্য কুকার্যের কথা শুনিয়া আকবর সারঙ্গপুরে যান এবং নববিজিত প্রদেশটির দায়িত্ব দেন পীর মহম্মদের উপর। নূতন শাসনকর্তার অত্যাচার স্থানীয় জনগণকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে এবং বাজ বাহাদুরের পক্ষে তাঁহার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করার সুযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহাকে অনুসরণ করিতে গিয়া পীর মহম্মদ জলে ডুবিয়া যান। বাজ বাহাদুরকে বিতাড়িত করিবার জন্য আকবর আবদুল্লা খাঁ উজবেগকে পাঠান। ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে বাজ বাহাদুরের আত্মসমর্পণের ফলে সংঘর্ষের অবসান হয়। আকবরের দরবারে তিনি মনসবদার রূপে গৃহীত হন।

মহম্মদ আদিল শাহের পুত্র শের খাঁর নেতৃত্বে আফগানদের এক আক্রমণে জৌনপুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আক্রমণকারীদের প্রতিহত করিবার পর স্থানীয় শাসনকর্তা খাঁ জমান বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করেন। আকবর সেখানে গেলে তিনি আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁহাকে ক্ষমা করা হয়। আফগানদের নিকট হইতে চুনার দখল করিবার জন্য আসফ খাঁর অধীনে সৈন্য পাঠানো হয়। চুনার পূর্বাঞ্চলে মুঘল সামরিক সীমান্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয় (১৫৬১)।

১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে আসফ খাঁ স্বাধীন হিন্দু রাজ্য গড় কাতাঙ্গা জয় করেন। ইহা ছিল গণ্ডদের রাজ্য, বর্তমান মধ্য প্রদেশের উত্তর জেলাগুলি লইয়া গঠিত। রাজা বীরনারায়ণ ছিলেন নাবালক। তাঁহার মাতা, চন্দেল্ল রাজ বংশের কন্যা, রাণী দুর্গাবতী রাজপ্রতিনিধি রূপে রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি শৌর্য এবং দৃঢ়তার সহিত আসফ খাঁর শক্তিশালী বাহিনীকে বাধা দিলেন। যখন পরাজয়

নিশ্চিত হইল তখন তিনি এবং তাঁহার পুত্র আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার জীবনাবসান ছিল তাঁহার কর্মময় জীবনের মতই গৌরবময়। রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

রাজপুত রাজ্যগুলির বশ্যতা স্বীকার

বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বের সময় রাজস্থানের কয়েকটি অঞ্চল মুঘল অধিকারে আসে। রাজস্থানে আকবরের প্রথম উল্লেখযোগ্য জয় বিনা রক্তপাতে সম্পূর্ণ হয়। ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম তীর্থযাত্রা করেন আজমীরে সুফী সাধক শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তির সমাধিতে। পথে অম্বরের (পরবর্তী কালে জয়পুর নামে পরিচিত) রাজা ভার মলের (অথবা বিহারী মল) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁহার কন্যার সহিত আকবরের বিবাহের প্রস্তাব দেন। এই রাজকন্যাই ছিলেন জাহাঙ্গীরের মাতা। ভার মল পাঁচ হাজারী মনসবদার হন। তাঁহার পোষ্যপুত্র ভগবান দাস এবং পৌত্র মান সিংহ মুঘল সরকারে উচ্চ পদ লাভ করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে মান সিংহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় অনুগ্রহে ক্ষুদ্র অম্বর রাজ্য রাজস্থানে গুরুত্ব লাভ করে এবং মারবার (যোধপুর নামেও পরিচিত) এবং মেবারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়।

মেবারের এক অনুগত শাসক দ্বারা শাসিত (মারবারের অন্তর্গত) মেরতা নামক সুদৃঢ় দুর্গ ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে অল্পদিন অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করে। মেবারের অনুগত বুন্দীর হাড়া রাজপুত শাসকের শাসিত রণথম্ভোর দুর্গ চার মাস অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করে (১৫৬৯)। ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে আকবর মারবার এবং বিকানীরের শাসকদের আনুগত্য লাভ করেন ; ভগবান দাস মধ্যস্থের ভূমিকা নেন। বুন্দীও একটি চুক্তি সম্পাদন করে। অম্বরের মতই এই সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই।

যে সকল রাজপুত রাজ্য আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল তাহাদের প্রতি তাঁহার নীতি সম্বন্ধে বুন্দীর সহিত আকবরের চুক্তির সর্তগুলি হইতে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়। এগুলি টড তাঁহার *Annals and Antiquities of Rajasthan* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বুন্দীর শাসকদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে জিজিয়া প্রদান করিতে, মুঘল হারেমে তাঁহাদের পরিবারের কন্যাদের প্রেরণ করিতে, দিল্লীর নওরোজ বাজারে তাঁহাদের মহিলা আত্মীয়াদিগের অংশগ্রহণে সম্মতি দিতে, কেন্দ্রীয় বাহিনীতে কাজের সময় আটক পার হইতে, কোন হিন্দু রাজার অধীনে কাজ করিতে, তাহাদের অশ্বকে বাদশাহী দাগে চিহ্নিত করিতে (branding) হইত না। তাঁহাদের মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইত। দিল্লীর লাল দরওয়াজা পর্যন্ত তাহাদের দামামা

বাজাইবার এবং সম্রাটের 'দেওয়ান-ই-আমে' সম্পূর্ণ সশস্ত্র অবস্থায় প্রবেশের সুবিধাও তাঁহারা পাইতেন।

রাজপুত রাজ্যগুলির অবস্থা

রাজপুত রাজ্যগুলির সহিত মুঘল সাম্রাজ্যের সম্পর্ক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়াছেন টড। আরও সম্পূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট চিত্র পাওয়া যায় আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে। রাজস্ব-ব্যবস্থার দিক হইতে এই করদ রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যের 'সুবা'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজমীর 'সুবা'র মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি 'সরকার' মুঘল কর্মচারীদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হইত; অবশিষ্টগুলির মধ্যে ছিল রাজপুত রাজ্যগুলি। ইহাদের প্রত্যেকটি সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় রাজকোষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ এককালীন জমা দিত। রাষ্ট্রপ্রধানের (অর্থাৎ বংশগত রাজপুত শাসকের) দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করা। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা ছিল না। আজমীরের সুবাদার নিজ এক্তিয়ারভুক্ত রাজপুত রাজাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর সংগ্রহ করিতেন, তাঁহাদের কাজকর্মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, এবং রণথম্ভোরের মত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলিতে ফৌজদার এবং কিল্লাদার নিযুক্ত রাখিতেন। রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার কোন অধিকার ছিল না। রাজাদের পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করিতেন।

নীতিগতভাবে উত্তরাধিকার বিষয়ে সম্রাটের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। পৈতৃক গদীতে আনুষ্ঠানিক অভিষেক হইবার পূর্বে প্রত্যেক নূতন রাজার নিকট হইতে তিনি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ও উপহার গ্রহণ করিতেন। সরকারী কাজকর্মের দিক হইতে প্রত্যেক রাজপুত রাজ্যকে একটি জায়গীর হিসাবে গণ্য করা হইত; ইহা সম্রাট তাঁহার মনোনীত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিতেন। কার্যতঃ রাজপুত রাজবংশগুলিতে যে উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাই অনুসরণ করা হইত। রাজাদের প্রধান দায়িত্ব থাকিত নিয়মিত কর দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীতে নিয়মিত সৈন্য প্রেরণ করা। তাঁহাদের ক্ষমতার উপর প্রধান শৃঙ্খল ছিল নিজ নিজ রাজ্যে মুঘল মুদ্রা ব্যবহারের দায়িত্ব। কোন রাজপুত রাজাকে নিজ নামে মুদ্রা প্রচারের অনুমতি দেওয়া হইত না।

মুঘল সাম্রাজ্যের মনসবদার হিসাবে রাজপুত রাজারা যুদ্ধে এবং কূটনীতিতে অনুগতভাবে এবং দক্ষতার সহিত কেন্দ্রীয় স্বার্থে কাজ করিতেন। মুঘল সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত অশ্বারোহী সৈন্যদের এক-তৃতীয়াংশ তাঁহারা দিতেন। আকবর যে আপোষমূলক রাজপুত নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন ইহা তাহার ফল। দিল্লীর সুলতানদের মত রাজপুতদের ধ্বংস করিবার নীতির পরিবর্তে এই মহান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সম্রাট তাঁহাদের সাম্রাজ্যের স্তম্ভে পরিণত করিয়াছিলেন। টড

যথার্থই আকবরকে 'রাজপুত স্বাধীনতার প্রথম সফল বিজেতা' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বিজিতদের স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

চিতোরের পতন (১৫৬৮)

একটিমাত্র রাজপুত রাজ্য আকবরের স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করে। ইহার নাম মেবার।

সংগ্রাম সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র রাণা উদয় সিংহ সম্ভবতঃ শের শাহ এবং ইসলাম শাহের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৫৫১ খ্রীস্টাব্দে অথবা তাহার নিকটবর্তী সময়ে তিনি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন এবং পুনর্জীবিত মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান লক্ষ্য করেন। মালবের বাজ বাহাদুর এবং মারবারের বিদ্রোহী শাসককে আশ্রয় দিয়া তিনি আকবরকে অসন্তুষ্ট করেন। এই দুইটি বিষয় ছাড়াও মেবারকে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আনিবার জন্য আকবরের চেষ্টার পিছনে গুরুতর সামরিক এবং রাজনৈতিক কারণও ছিল। মারবারের মেরতা, বুন্দীর রণথম্ভোর এবং মেবারের চিতোর—এই তিনটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল রাণার এক্তিয়ারভুক্ত। গুজরাটে যাইবার পথে ছিল মেবারের অবস্থিতি। মেবারের আনুগত্য লাভ ছাড়া এই সমৃদ্ধিশালী প্রদেশটিকে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন ও রক্ষা করা সহজ ছিল না। উপরন্তু, সামাজিক সম্মান এবং ঐতিহ্যের দিক হইতে রাণা ছিলেন রাজস্থানের শীর্ষস্থানীয় রাজা। সুতরাং যতদিন তিনি মুঘল আধিপত্য স্বীকার না করিতেন ততদিন রাজপুত রাজাদিগের উপর আকবরের আধিপত্য অসম্পূর্ণ থাকিত।

মেবারের বিরুদ্ধে আকবরের আক্রমণ সতর্কভাবে পরিকল্পিত হইয়াছিল। মেরতা দখল (১৫৬২) ছিল একটি প্রাথমিক আঘাত। আকবরের ব্যক্তিগত পরিচালনায় ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দে চিতোর অবরোধ শুরু হয়। উদয় সিংহ আরাবল্লী পর্বতে আশ্রয় নেন, দুর্গটি রক্ষার দায়িত্ব পড়ে জয়মল রাঠোর এবং পত্তা নামক দুই সাহসী যোদ্ধার উপরে। ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ দুর্গের পতন হয়; স্বয়ং আকবরের একটি গুলিতে জয়মল নিহত হন এবং রাজপুতদের প্রাণপণ প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়। যোদ্ধারা যুদ্ধে প্রাণ হারান; মহিলারা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য আগুনে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন। ইহার নাম জহর ব্রত। দুর্গে প্রবেশ করিয়া আকবর একটি অবাধ হত্যাকাণ্ডের আদেশ দেন। ৩০,০০০ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়।

চিতোর দখল একটি তুলনাবিহীন সামরিক ঘটনা নয়; আকবরের আগে আলাউদ্দীন খলজী এবং গুজরাটের বাহাদুর শাহ এই কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। দুর্গ অধিকারের ফলে মেবারের সমতলভূমি মুঘল নিয়ন্ত্রণে আসে; ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাণারা পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিরোধ চালাইয়া যান। কিন্তু মোটামুটি ভাবে মেবারে জয়লাভ আকবরের গুজরাট জয়ের পথে একটি বাধা দূর

করিল এবং সম্ভবতঃ অপর রাজপুত রাজাদের নীতির উপর ইহার কিছু প্রভাব ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই রণথম্ভোর আত্মসমর্পণ (১৫৬৯) এবং মারবার ও বিকানীর আনুগত্য স্বীকার করে (১৫৭০)। নামে মাত্র প্রতিরোধের পর মধ্য ভারতের কালঞ্জর দুর্গ আত্মসমর্পণ করে।

রাণা প্রতাপ সিংহ (১৫৭২-৯৭)

১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে রাণা উদয় সিংহের মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী প্রতাপ সিংহের জন্য একটি দুর্বল উত্তরাধিকার রাখিয়া যান। টড বলিয়াছেন: 'প্রতাপ এক বিখ্যাত পরিবারের উপাধি এবং সম্মান উত্তরাধিকার সূত্রে পান, কিন্তু তাঁহার কোন রাজধানী ও কোন সম্পদ ছিল না। তাঁহার আত্মীয় এবং গোষ্ঠী পরাজয়ে হতাশাগ্রস্ত ছিল। তবুও তিনি তাঁহার জাতির মহান চারিত্রিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি চিতোর উদ্ধার, তাঁহার পরিবারের রাজনৈতিক মর্যাদা হরণের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং রাজকীয় ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন।' তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই অপর সকল রাজপুত রাজা আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সম্রাট রাণার স্বাধীন মনোভাব সহ্য করিতে রাজী ছিলেন না। রাণা অন্যান্য রাজপুত রাজাদের মত নতি স্বীকার না করিলে তাঁহাকে আঘাত করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার নীতি ছিল। কিন্তু এই নীতি ব্যর্থ হয়। 'শতাব্দীকালের এক-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া' প্রতাপ সিংহ একা বিরাট মুঘল 'সাম্রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিরোধ করিতে থাকেন; কখনও তিনি পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া সমভূমি বিধ্বস্ত করিতেন, কখনও বা পলায়ন করিতেন পর্বত হইতে পর্বতান্তরে। তাঁহার জন্মভূমির পার্বত্য ফলমূলই ছিল তাঁহার পরিবারের ভক্ষ্যবস্তু।'

১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে হলদীঘাটের (অথবা গোগুণ্ডার) যুদ্ধে প্রতাপ সিংহ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। মুঘল সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন অম্বরের মান সিংহ। রাণা বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। একটি দীর্ঘ এবং একটানা যুদ্ধ মেবার ধ্বংস করিল। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে (১৫৯৭) চিতোর, আজমীর এবং মণ্ডলগড় ছাড়া প্রায় সমগ্র মেবারের উপর তিনি কার্যতঃ নিজের কর্তৃত্ব পুনরধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী অমর সিংহের উপর। তিনিও মুঘলের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। রাজস্থানের অন্যান্য অঞ্চলে আকবরের অভূতপূর্ব সাফল্য সত্ত্বেও মেবারে তাঁহার উদ্দেশ্য অপূর্ণ রহিল।

গুজরাট জয় (১৫৭২-৭৩)

গুজরাটে যাইবার যে পথ হুমায়ুন অধিকার করেন ও হারান তাহা চিতোর, রণথম্ভোর এবং কালঞ্জর জয়ের পর আবার আকবরের অভিযানের জন্য উন্মুক্ত

হইয়াছিল। গুজরাট ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ। পশ্চিম এশিয়া এবং ইয়োরোপের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের একটি বড় অংশ এই প্রদেশের বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং বন্দর হইতে পরিচালিত হইত। গুজরাটের মধ্য দিয়াই হজ তীর্থযাত্রীরা মক্কার দিকে যাত্রা করিতেন। আক্রমণকারীর পক্ষে গুজরাটের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সুবিধাজনক। ইহা সাতটি যুদ্ধরত অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির উপর সুলতান মুজঃফরের কর্তৃত্ব খুবই সীমিত ছিল। একজন আঞ্চলিক শাসক আকবরকে গুজরাটের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন।

১৫৭২ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে আকবর নিজে গুজরাটের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করিলেন। আহম্মদাবাদের পতন ঘটিল। মুজঃফরকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইল। আকবর ক্যাম্বের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে বিদেশী বণিকদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং পর্তুগীজদের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা হজ তীর্থযাত্রীদের নিরাপদে যাতায়াতের ব্যবস্থা হইল। সুরাট দখল করা হইল (১৫৭৩)। নব বিজিত প্রদেশের ভার এক শাসনকর্তার হস্তে অর্পণ করিয়া সম্রাট তাঁহার তৎকালীন রাজধানী ফতেপুর সিক্রীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অল্পদিন পরেই বাদশাহী পরিবারের আত্মীয় মীর্জাদের মধ্যে একজন গুজরাটে বিদ্রোহ করিলেন। আকবর এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন। মাত্র ১১ দিনে ৬০০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করা হয়। সম্রাট আহম্মদাবাদে বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন (১৫৭৩)। এই অভিযানটিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তাহার মধ্যে ক্ষিপ্রতম অভিযান রূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে।

এই অভিযানের পর গুজরাট মুঘল সাম্রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। সম্রাটের মন্ত্রী টোডর মল অর্থ-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করেন এবং রাজস্ব-ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করেন। এই প্রদেশ কেন্দ্রীয় কোষাগারের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করে। কেন্দ্রীয় সরকার সমুদ্র গমনের সরাসরি পথ এবং পশ্চিম উপকূলে সুরাট ও অন্যান্য বন্দরের মধ্য দিয়া পরিচালিত বাণিজ্যের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ লাভ করে। পর্তুগীজদের সহিত যোগাযোগের ফলে আকবরের মনে নূতন ধর্মীয় প্রভাব পড়ে; কিন্তু তিনি তাহাদের উদাহরণ অনুসরণ করিয়া সমুদ্রে শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন নাই। এইভাবে সমুদ্রপথে বাণিজ্য ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে রহিল এবং মুঘল সাম্রাজ্য একটি স্থলশক্তি হিসাবে সঙ্কুচিত হইল।

বিহার, বাংলা এবং উড়িষ্যা জয়

শের শাহের শাসনকালের শেষদিকে বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন সুলেমান কররানী।

নামক জনৈক আফগান। সুর বংশের পতনের পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, বাংলা ও উড়িষ্যা তাঁহার শাসনাধীনে আনেন, এবং গৌড় হইতে তাঁড়াতে (Tanda) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৫৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি রোটাস অবরোধ করেন, কিন্তু একটি মুঘল বাহিনীর আগমনে তিনি বাংলায় পশ্চাদপসরণ করেন। আকবরের বিরোধিতা করিবার পরিবর্তে তিনি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াজিদ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। অল্পকালের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু হয়। পরবর্তী শাসক ছিলেন সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ। তিনি ছিলেন শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ' এবং 'অপদার্থ। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় ঘাঁটি জামানিয়া দুর্গ (উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলা) আক্রমণ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে মুঘল কর্তৃত্বের বিরোধিতা করিলেন।

দাউদকে শাস্তি দিবার জন্য আকবর মুনিম খাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্য-বাহিনী পাঠাইলেন। গুরুত্ব সহকারে যুদ্ধের পরিবর্তে বৃদ্ধ সেনাপতি উদার শর্তে শান্তি স্থাপন করিলেন। আকবর স্বয়ং বিহারে আসিলেন এবং দাউদকে পাটনা ও হাজীপুর হইতে বিতাড়িত করিলেন (১৫৭৪)। মুনিম খাঁ এবং টোড়র মলের উপর যুদ্ধ চালাইবার দায়িত্ব দিয়া তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। মুঘল বাহিনী মুঙ্গের, ভাগলপুর, কোলগাঁও এবং বাংলা ও বিহারের মধ্যবর্তী তেলিয়াগড়ী গিরিপথ দখল করিল। দাউদ উড়িষ্যায় আশ্রয় নিলেন, কিন্তু তুকারয়ের (উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলা) এক চূড়ান্ত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন (১৫৭৫)। তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। মুনিম খাঁর নিকট হইতে কয়েকটি সুবিধাজনক শর্ত লাভ করিয়া তিনি উড়িষ্যার একটি অংশ অধিকারে রাখিতে সক্ষম হইলেন। মুনিম খাঁর মৃত্যুর পরে দাউদ বাংলা পুনরায় অধিকারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাজমহলের নিকটে একটি যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। বাংলা শেষ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইল, কিন্তু এই প্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চল দীর্ঘকাল 'বার ভুঁইঞা' নামে পরিচিত শক্তিশালী হিন্দু এবং মুসলমান সামন্ত শাসকদের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে রহিল। যাঁহারা পূর্ব বাংলায় ব্যাপক অঞ্চলের অধিকারী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঈশা খাঁ, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য এবং কন্দর্প নারায়ণ। ঈশা খাঁর আধিপত্য ছিল ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে। কেদার রায়ের কর্তৃত্ব ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। প্রতাপাদিত্য যশোহরে এবং কন্দর্প নারায়ণ বাকলায় (বাখরগঞ্জে) আধিপত্য করিতেন।

দাউদের পতনের চারি বৎসর পরে বাংলা এবং বিহারের মুঘল কর্মচারীরা বিদ্রোহী হইল। সম্ভবতঃ তাহাদের সঙ্গে আকবরের রাজ্যলোভী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা মহম্মদ হাকিমের যোগ ছিল। আকবরের উদার ধর্মীয়

নীতির বিরোধীরা এই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সুতরাং এই বিদ্রোহ ছিল একটি গুরুতর সঙ্কট; ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক নানাবিধ সমস্যা ইহার সহিত জড়িত ছিল। আকবর দৃঢ়হস্তে বিদ্রোহ দমন করিলেন। ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহের আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়া গেল।

১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে আফগানদের নিকট হইতে মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করেন, ইহা বাংলা সুবার একটি অংশ রূপে শাসিত হইতে লাগিল।

উত্তর-পশ্চিম

যদি আকবরের ক্ষমতা সুসংহত করিবার প্রাথমিক চেষ্টাগুলিকে ধরা না হয় তবে ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দকেই আকবরের শাসনকালের 'সর্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক সময়' বলিয়া গণ্য করা যায়। দিল্লীর নামেমাত্র সার্বভৌমিকতা স্বীকার করিলেও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর্জা মহম্মদ হাকিম প্রকৃতপক্ষে কাবুলের স্বাধীন শাসক ছিলেন। দুর্বল-চরিত্র, মদ্যপায়ী, দূরদৃষ্টিহীন হাকিম ছিলেন আকবরের তুলনায় খুবই সাধারণ মানুষ। তিনি বাংলা এবং বিহারের বিদ্রোহী কর্মচারীদের এবং সাম্রাজ্যের দেওয়ান শাহ মনসুরের নেতৃত্বে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিকল্পনা ছিল গোঁড়া সুন্নী মতবাদে অবিশ্বাসী আকবরের পরিবর্তে ঐ মতবাদে বিশ্বাসী হাকিমকে সিংহাসনে বসানো।

১৫৮১ খ্রীস্টাব্দে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ আকবর কাবুলে উপস্থিত হইলেন। শাহ মনসুরকে ফাঁসী দেওয়া হইল। হাকিম আনুগত্য স্বীকার করিলেন। তাঁহাকে ক্ষমা করা হইল। ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কাবুল শাসন করেন। ইহার পরে কাবুল একটি 'সুবা' হিসাবে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৫৮১ খ্রীস্টাব্দের সঙ্কটে আকবরের সাফল্য 'তাঁহাকে বাকী জীবনের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিশ্চিন্তভাবে কাজ করিবার সুযোগ দেয় এবং ইহাকে তাঁহার রাজ্যকালের চূড়ান্ত সময় বলিয়া গণ্য করা যায়।' নিজের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 'তিনি অপরের মতামত উপেক্ষা করিয়া' নিজের ইচ্ছামত নীতি নির্ধারণ এবং রূপায়ণ করিতে লাগিলেন।

কাবুলের সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির ফলে আকবরের পক্ষে প্রয়োজন হইল পাঞ্জাব এবং আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপজাতীয় এলাকার উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা। ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দে, যখন নূতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি কাবুলে যাইতেছিলেন তখন, সম্রাট জাইন খাঁ, রাজা বীরবল এবং হাকিম আবুল ফত্তেকে সীমান্ত অঞ্চলের ইউসুফজাই এবং মান্দার উপজাতিকে দমন করিবার জন্য পাঠাইলেন। এই অভিযান সফল হইল না, বীরবল নিহত হইলেন। পরে রাজা টোডর মল এবং মানসিংহ অনেক বেশী সফল হইলেন।

অস্ত্রের দ্বারা দুর্দান্ত উপজাতিগুলিকে দমন করা কঠিন হইল। তখন আকবর তাহাদের দলপতিদিগকে নিয়মিত বৃত্তি দিয়া শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

আকবরের প্রেরিত এক বাহিনীর কাছে কাশ্মীরের স্বাধীন সুলতান ইউসুফ খাঁ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইল এবং কাবুল 'সুবা'র একটি 'সরকার' রূপে গণ্য হইল (১৫৮৬)।

সিন্ধুপ্রদেশে একটি নদীর দ্বীপে অবস্থিত ভাক্করের দুর্গ ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দে অধিকৃত হয়। সামরিক দিক হইতে সিন্ধু প্রদেশের গুরুত্ব ছিল। সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশের দখল ছাড়া উত্তর-পশ্চিমের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, সিন্ধুর পশ্চিম সীমান্তে বোলান ও গোমাল গিরিবর্ত্ম কান্দাহারের সহিত সিন্ধুকে যুক্ত করিত। আকবর পারস্যের নিকট হইতে কান্দাহার বিজয়ে আগ্রহী ছিলেন। ১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে থাট্টার তুর্কোমান শাসক পরাজিত হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইভাবে সিন্ধুপ্রদেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে আকবরের সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরাজিত হইয়া পানি আফগানরা মাকরানের উপকূল অঞ্চল সহ সমগ্র বালুচিস্থান আকবরকে সমর্পণ করিলেন।

উজবেগদের দ্বারা উত্যক্ত হইয়া পারস্যের শাহের অধীন কান্দাহারের শাসন-কর্তা মুজঃফর হোসেন মীর্জা দুর্গটি আকবরের প্রেরিত এক কর্মচারীর হাতে তুলিয়া দিলেন (১৫৯৫)। কান্দাহার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নিরাপত্তা এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। শাহ জাহানের শাসনকাল পর্যন্ত কান্দাহারের আধিপত্য পারস্য এবং মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে বিরোধের একটি কারণ ছিল।

দক্ষিণে রাজ্যজয়

উড়িষ্যা বিজয়েরও পূর্বে আকবর দক্ষিণ ভারতের মুসলমান রাজ্যগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন। দক্ষিণে নর্মদা-তাপ্তী-গোদাবরী অঞ্চলে তিনি তাঁহার রাজ্য জয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমিত রাখিয়াছিলেন; 'সুদূর দক্ষিণ তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টির বাহিরে ছিল এই কারণে যে এই অঞ্চল তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র উত্তর ভারত হইতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল'। দক্ষিণে পাঁচটি স্বাধীন সুলতানী রাজ্য ছিল : খান্দেশ এবং বাহমনী রাজ্যের উত্তরাধিকারী চারিটি রাজ্য (আহম্মদনগর, বিজাপুর, বিদর এবং গোলকুণ্ডা)। আকবর এই রাজ্যগুলিকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে অগ্রসর হইলেন দুইটি কারণে। প্রথমতঃ বিন্ধ্য পর্বতমালার অপর পারে সাম্রাজ্য বিস্তার। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের ঘাঁটি সুসংহত করিতে বাধা দেওয়া।

১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে আকবর খান্দেশ, আহম্মদনগর, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সুলতানদের নিকট চারিটি প্রতিনিধিদল পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে আকবরের

সার্বভৌমিক আধিপত্য স্বীকার করিতে এবং তাঁহাকে বার্ষিক কর দিতে বলা হইল। খান্দেশ রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যের ঠিক দক্ষিণেই অবস্থিত ছিল এবং ইহাই ছিল মুঘলদের দাক্ষিণাত্যে যাইবার পথ। উপরন্তু, ইহার অন্তর্গত ছিল সাতপুরা পর্বতের উপরে অবস্থিত দুর্ভেদ্য আসিরগড় দুর্গ। ইহার শাসক রাজা আলি খাঁ আকবরের আনুগত্য স্বীকার করিলেন, কিন্তু অপর তিন জন সুলতান তাহা করিলেন না।

খান্দেশের দক্ষিণে ছিল আহম্মদনগর। ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে আকবর আহম্মদনগর শক্তি প্রয়োগে বশীভূত করিবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ এবং আবদুর রহিম খাঁন খানানকে প্রেরণ করিলেন। মুঘল বাহিনী আহম্মদনগর অবরোধ করিল। অসামান্য সাহস ও বীরত্বের সহিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন বিজাপুরের রাজমাতা এবং আহম্মদনগরের সুলতানের আত্মীয়া চাঁদ বিবি। আবদুর রহিম এবং মুরাদের মধ্যে বিরোধের ফলে মুঘলরা দুর্বল হইয়া পড়িল। ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে শান্তি স্থাপিত হইল। বেরার প্রদেশ আকবরকে দেওয়া হইল এবং আহম্মদনগরের সুলতান তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

এই শান্তি স্থায়ী হইল না। আহম্মদনগরের সুলতান ছিলেন নাবালক। রাজনৈতিক দলাদলির জন্য রাজদরবার দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। চাঁদ বিবিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হইল। চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বেরার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হইল। আবদুর রহিম পুনরায় সামরিক তৎপরতা শুরু করলেন এবং গোদাবরীর তীরে সুপার যুদ্ধে আহম্মদনগর এবং বিজাপুরের সংযুক্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিলেন (১৫৯৭)। ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে মুরাদের মৃত্যু হয়। চূড়ান্ত ফল লাভের জন্য আকবর স্বয়ং বুরহানপুরে যান। তাঁহার আগমনের পূর্বেই দৌলতাবাদের পতন ঘটে। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে আহম্মদনগর শহর দখল করা হইল। যুবক সুলতান বন্দী হইয়া গোয়ালিয়রের কারাদুর্গে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু অভিজাতদের সমর্থনে নিজাম শাহী বংশের এক ব্যক্তি আহম্মদনগর রাজ্যের এক অংশ শাসন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে খান্দেশের সুলতান মীরণ বাহাদুর শাহ মুঘল সার্বভৌমিকতা অস্বীকার করেন এবং নিরাপত্তার জন্য আসিরগড়ে আশ্রয় নেন। ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে আকবর খান্দেশে প্রবেশ করিয়া রাজধানী বুরহানপুর দখল করেন এবং আসিরগড় অবরোধ করেন। ভৌগোলিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানে দুর্গটি অবস্থিত ছিল। তাহা ছাড়া এখানে গোলন্দাজ বাহিনী, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম এবং রসদ যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। কিন্তু ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে দুর্গটি আত্মসমর্পণ করিল। জেসুইট পাদ্রীদের মতে আকবর উৎকোচ দানের দ্বারা এই দুর্গটি দখল করেন।

বেরার, আহম্মদনগর এবং খান্দেশের ভার অর্পিত হইল সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র ও প্রতিনিধি দানিয়েলের হস্তে। এই বিরাট অঞ্চলের সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের কেবল-

মাত্র আনুষ্ঠানিক সংযুক্তি ঘটিল। মুঘল সৈন্যবাহিনীর অধিকৃত অঞ্চলে সুসংহত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল না।

বৈদেশিক নীতি

কান্দাহার অধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা আকবরের সহিত পারস্যের সম্পর্ক তিক্ত করিয়াছিল ; কিন্তু দুই রাজসভার মধ্যে নিয়মিত কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় ছিল। শিয়া মতবাদের প্রতি আকবরের সহনশীলতা এবং পারস্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে আকবরের প্রশংসা পারস্যবাসীদের বিরোধিতা হ্রাস করিয়াছিল। তিনি পারস্য দেশ হইতে আগত বহু ব্যক্তিকে সামরিক ও প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত করেন। পারস্যদেশীয় বহু পণ্ডিত ও শিল্পী তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

মধ্য এশিয়ায় আকবরকে শক্তিশালী উজবেগদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে হইয়াছিল। তাহাদের প্রধান দলপতি আবদুল্লা খাঁ বদখ্‌শান দখল করেন। সম্ভবতঃ হিন্দুকুশ পর্বতকে তাঁহার রাজ্য এবং মুঘল-শাসিত কাবুলের মধ্যে সীমারেখা হিসাবে স্বীকার করা হয়।

মুঘল সম্রাটেরা 'খলিফা' নামে পরিচিত তুরস্কের সুলতানদের ধর্মীয় কর্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই। ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে আকবর 'ইমাম' এবং 'খলিফা' উপাধি নেন। তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে তিনি পারস্যের শাহ এবং উজবেগ দলপতি আবদুল্লা খাঁর সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহার সঙ্গে, এবং স্পেনের রাজার সঙ্গে, তিনি তুরস্কবিরোধী মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলি সফল হয় নাই।

গুজরাট উপকূলে আকবর পর্তুগীজদের সংস্পর্শে আসেন। পর্তুগীজ জাহাজগুলি আরব সাগরে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। আকবর গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তার সহিত চুক্তি করেন যাহাতে মুসলমান তীর্থযাত্রীরা আরবের পবিত্র অঞ্চলে সমুদ্রপথে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে। ইহার পর তিন জন জেসুইট পাদ্রী আকবরের রাজসভায় আসেন। আসিরগড় অবরোধের সময় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য তাঁহার অনুরোধ পর্তুগীজরা রক্ষা করে নাই। দাক্ষিণাত্যে মুঘল শক্তি প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনার পিছনে আকবরের একটি উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের শক্তি নিয়ন্ত্রিত করা। তিনি প্রকাশ্য যুদ্ধে তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার নৌশক্তি ছিল না।

আকবরের শেষ জীবন

আকবরের রাজ্যজয়ের ইতিহাসে চূড়ান্ত ঘটনা ছিল আসিরগড় দখল। তাঁহার শেষ জীবন ছিল দুর্ভাগ্যজনক। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম বিদ্রোহী হন এবং আবুল ফজলকে হত্যার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করেন এবং

তাঁহাকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যেই মুরাদের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে দানিয়েলের মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ সম্রাট ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

২. ধর্ম

আকবরের ধর্মবিশ্বাস

আশাতীত পার্থিব সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও আকবর ছিলেন একজন যথার্থ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। ধর্মীয় বিষয় এবং জাগতিক বিষয়ের মধ্যে কোন সাধারণ ভিত্তি আছে কিনা, তাঁহার মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তাঁহার ধর্মীয় চেতনা শুরু হয় তাঁহার প্রথম যৌবনে। তিনি বলিয়াছিলেন যে কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি মানসিক অস্থিরতা অনুভব করেন এবং পরকালের জন্য কোন ধর্মীয় ব্যবস্থা করিতে না পারায় তাঁহার মন অতিশয় দুঃখিত হয়। গোঁড়া সুন্নী, এবং আকবরের বিরুদ্ধ সমালোচক, ঐতিহাসিক বদায়ুনী বলিয়াছেন যে বহু প্রত্যুষে তিনি প্রাসাদের নিকট একটি নির্জনস্থানে মাথা নত করিয়া প্রার্থনারত এবং বিষাদাচ্ছন্ন থাকিতেন এবং সেই প্রশান্ত সময়ের আশীর্বাদ অনুভব করিতেন। জাহাঙ্গীর বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতা কখনও এক মুহূর্তের জন্যও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হন নাই। পরবর্তী জীবন সূর্য, অগ্নি এবং আলোকের প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি দৈনিক চারি বার প্রার্থনা করিতেন। তিনি বলিতেন, সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র আছে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহার মতে কল্পনাশক্তির দ্বারাই নিরাকারকে অনুমান করা যায়।

ধর্মমত গঠনে বিভিন্ন প্রভাব

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ধর্ম ও সমাজকে উদার করার ক্ষেত্রে ভক্তি আন্দোলনের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। সুফীবাদ গোঁড়া সুন্নী মতবাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চার শতাব্দী ধরিয়া উত্তর ভারতে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে দৈনিক যোগাযোগের ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উন্নতি ঘটিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ভক্তির প্রধান প্রবক্তা তুলসীদাস আকবরের শাসনকালে বিখ্যাত হিন্দী কাব্য 'রাম-চরিত-মানস' রচনা করেন।

যে পরিবেশে আকবর জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম জীবন কাটান তাহা বিভিন্ন প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। প্রথম জীবনে তিনি কাবুলে সুফীবাদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার পিতা ছিলেন মধ্য এশিয়ার সুন্নী, তাঁহার মাতা ছিলেন পারস্যদেশীয় শিয়া, তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খাঁও ছিলেন পারস্যদেশীয় শিয়া। তাঁহার শিক্ষক আবুল লতিফ ছিলেন উদারমনা এবং তিনি তাঁহাকে 'সুল-ই-কুল'

(সার্বজনীন শান্তি অথবা সহিষ্ণুতা)-এর আদর্শে শিক্ষা দেন। পরিণত বয়সে তাঁহার রাজপুত পত্নী এবং হিন্দু সভাসদগণের নিকট হইতে তিনি ধর্ম সম্পর্কে এমন ধারণা লাভ করেন যাহা তাঁহার পৈত্রিক বিশ্বাসের বিরোধী ছিল। জেসুইট (Jesuit) সম্প্রদায়ভুক্ত রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা তাঁহাকে খ্রীস্ট ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত করেন। এই সকল বিভিন্ন প্রভাব তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মনকে উত্তেজিত করে এবং গভীর আধ্যাত্মিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে।

আকবরের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা

আকবর যে প্রথম যৌবনেই উদার ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর হইতে কর বিলোপে (১৫৬৩) এবং জিজিয়া কর বিলোপে (১৫৬৪)। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহু বৎসর—সম্ভবতঃ ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত—গোঁড়া সুন্নী মতের প্রতি অনুগত ছিলেন। এমন কি বদায়ুনী বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার ধর্মীয় কর্তব্যগুলি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন, মুসলমান সাধুসন্তদের সাহচর্য কামনা করিতেন এবং প্রত্যেক বৎসর আজমীরে শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তির সমাধিভবনে তীর্থযাত্রা করিতেন।

কিন্তু কেবলমাত্র আচার অনুষ্ঠান পালন করিয়া এবং ধর্মের গোপন রহস্য উপলব্ধি না করিয়া তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন সন্তুষ্ট হয় নাই। শেখ মুবারক এবং তাঁহার দুই পুত্র ফৈজী এবং আবুল ফজলের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি যুক্তিবাদের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি রাজধানী ফতেপুর সিক্রীতে 'ইবাদতখানা' (আরাধনা গৃহ) নামক একটি হর্ম্য নির্মাণ করেন। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেখানে ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হইত। প্রথমে তাহা শুধু মুসলমানদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ; অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন শেখ, সৈয়দ, উলেমা এবং মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ যাঁহারা ধর্মীয় ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। প্রধান 'সদর' আবদুন নবীর নেতৃত্বে গোঁড়া সুন্নীরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। তার্কিকরা প্রায়ই মেজাজ হারাইতেন। বদায়ুনী বলিয়াছেন যে একবার সে যুগের উলেমারা গলার রগ ফুলাইয়া চীৎকার করেন এবং প্রচণ্ড গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এইসব দৃশ্যে আকবর অসন্তুষ্ট হইলেন। উপরন্তু, তিনি এই ধারণায় বিশ্বাসী হইলেন যে একটি ব্যাপক ভিত্তি ছাড়া ধর্মীয় আলোচনা ফলপ্রসূ হইতে পারে না। তাই তিনি 'ইবাদত-খানা'র দ্বার হিন্দু, জৈন জরথুস্ট্রিয় (Zoroastrian) এবং খ্রীস্টানদিগের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে আকবর তথাকথিত 'অভ্রান্ততার নির্দেশনামা' (Infallibility Decrce, 'মাহজার') জারি করিলেন। ইহার মর্ম এই : ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত সকল প্রশ্নে সম্রাটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে—যদি 'মুজতাহিদ' বা ধর্মীয় পণ্ডিতেরা সেই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে একমত হইতে না পারেন। এই নির্দেশনামা প্রস্তুত করেন

শেখ মুবারক। ইহার উদ্দেশ্য ছিল 'ঈশ্বরের গৌরব ঘোষণা করা এবং ইসলামের প্রচার করা।' ইহার দ্বারা আকবরকে খ্রীস্টানদের ধর্মগুরু পোপের (Pope) মত মুসলমানদের ধর্মগুরু অথবা ইসলামের প্রধান করা হয় নাই। ইহার দ্বারা তিনি ধর্ম-সংক্রান্ত বিরোধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পাইলেন বটে, কিন্তু এই অধিকারের সঙ্গে এই ব্যবস্থাও ছিল যে তাঁহার সিদ্ধান্ত কোরান দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে।

'ইবাদতখানা'য় আনুষ্ঠানিক আলোচনা ছাড়াও আকবর বিভিন্ন ধর্মের সাধুসন্ত এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের সহিত ব্যক্তিগত বৈঠক করিতেন। তিনি মুসলমান শিয়া ও সুফী, হিন্দু সাধু, জৈন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি, জরথুস্ত্রীয় সাধু এবং খ্রীস্টান পাদ্রীদের সহিত দীর্ঘ আলোচনা চালাইতেন। যে সকল সম্মানিত জৈন শিক্ষকের সহিত তিনি আলোচনা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন হীর বিজয় সুরী (যাহাকে 'জগৎ গুরু' উপাধি দেওয়া হয়) এবং জিন চন্দ্র সুরী। তিনি অহিংসার জৈন নীতি এবং জরথুস্ত্রীয় অগ্নি উপাসনার নীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। জরথুস্ত্রীয় ধর্মের নীতি ও প্রথা তিনি শিক্ষা করেন মহিয়ারজী রাণার নিকট হইতে। জেসুইট সম্প্রদায়-ভুক্ত ক্যাথলিক খ্রীস্টান পাদ্রীদের তিনটি প্রতিনিধিদল (Jesuit Missions) তাঁহার সভায় আসেন এবং তাঁহাদের ধর্মের তত্ত্ব তাঁহার কাছে ব্যাখ্যা করেন। প্রথমটির নেতৃত্ব দেন আকুয়াভিভা (Aquaviva) এবং মন্‌সেরাত (Monserate) দ্বিতীয়টির নেতা ছিলেন দুয়ার্ত লোটিও (Duarte Lotio)। তৃতীয়টির নেতা ছিলেন জেরোম জেভিয়ার (Jerome Xavier) এবং ইম্যানুয়েল পিনহেরো (Emmanuel Pinheiro)। জেসুইটরা মনে করিয়াছিলেন যে আকবর খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করিবেন।

সত্য নির্ণয়ের জন্য আগ্রহ এবং যুক্তিবাদে বিশ্বাসের প্রবণতা আকবরকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বদায়ুনী বলিয়াছেন : 'সম্রাট বিভিন্ন পর্যায়ের এবং সকল রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে যাহা পাওয়া যায় তাহা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তত্ত্ব নির্বাচন সম্বন্ধে তিনি যে পদ্ধতি বাছিয়া লইয়াছেন তাহা ইসলামীয় নীতির বিরোধী।' এইরূপ ইসলাম-বিরোধী অনুসন্ধানের ফলে আকবর এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সত্য 'ইসলামের মত একটি ধর্মে সীমাবদ্ধ নাই—যে ধর্ম অন্য ধর্মের তুলনায় নূতন এবং যাহা মোটামুটি মাত্র হাজার বৎসরের পুরানো।'

দীন ইলাহী

১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে আকবর তাঁহার সভাসদ এবং কর্মচারীদের এক পরিষদে 'দীন ইলাহী' ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য দূর করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য তিনি নির্দেশ করেন : 'একটি ধর্মে যাহা ভাল তাহা যেন না হারাইতে হয় ; সঙ্গে সঙ্গে অপরটিতে যাহা ভাল তাহা যেন লাভ করা যায়।'

ইহার অন্তর্নিহিত নীতি ছিল 'সুল-ই-কুল' (সার্বজনীন সহিষ্ণুতা)। এই মতবাদের ভিত্তি ছিল এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ; কিন্তু ইহার সঙ্গে হিন্দু, জৈন এবং জরথুস্ট্রীয় ধর্মের কিছু কিছু নীতি যুক্ত হইয়াছিল। ইহাকে বলা হয় 'তাওয়া হিদ-ই-ইলাহী' (Divine Monotheism)।

'দীন ইলাহী'র প্রকৃত রূপ ও অর্থ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। স্মিথ ইহাকে একটি নূতন ধর্ম হিসাবে গণ্য করেন। তাহার মতে ইহা 'আকবরের মূর্খতার পরিচায়ক, বিজ্ঞতার নয়।' তিনি লিখিয়াছেন যে ইহা একজন স্বেরাচারী শাসকের হাস্যকর আত্মম্ভরিতার পরিচায়ক। অপর একটি মত এই যে আকবর ছিলেন সাদী, রুমী, হাফিজ প্রভৃতির মত একজন উদারপন্থী সুফী, এবং 'দীন ইলাহী' হইল প্রকৃত পক্ষে 'ইসলামের একটি সুফী রূপ।' একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত হইল এই যে ইহা সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি উদার ব্যবস্থা ; ইহার ভিত্তি ভ্রাতৃত্ব-বোধ, যাহার উদ্দেশ্য হইল দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

'দীন ইলাহী'র নিজস্ব অনুষ্ঠান ও আচার-বিচার ছিল। আবুল ফজল ছিলেন ইহার প্রধান পুরোহিত। ইহার অনুগামীদের জন্য ভক্তির চারিটি স্তর ছিল : সম্রাটের স্বার্থে সম্পত্তি, জীবন, সম্মান এবং ধর্ম উৎসর্গীকরণ। (অর্থাৎ নিম্নতম স্তরের সভ্য সম্রাটের জন্য সম্পত্তি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবেন, পরবর্তী স্তরগুলির সভ্যেরা যথাক্রমে জীবন, মান মর্যাদা এবং ধর্ম বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।) সভ্যপদ গ্রহণ স্বেচ্ছামূলক ছিল। কয়েক হাজারের বেশী সদস্য ছিল না। প্রধান সদস্যদের মধ্যে (সংখ্যায় ১৮ জন) একজন মাত্র ছিলেন হিন্দু—রাজা বীরবল। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে 'দীন ইলাহী'কে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে সেতু হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য আকবরের ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পরে ইহার অস্তিত্ব ছিল না।

আকবর এবং ইসলাম

আকবর কি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ? যাঁহারা এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেন তাঁহারা প্রধানতঃ বদায়ুনী এবং খ্রীস্টান পাদ্রীদের রচনা হইতে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করেন। বলা হয় যে আকবর ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, পুনর্জন্ম এবং শেষ বিচার সম্বন্ধে ইসলামীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তিনি ইসলাম সম্বন্ধে নির্যাতনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন অভিযোগও করা হয়। তিনি কয়েকটি হিন্দু ও জৈন ধর্মীয় ধারণা (যেমন, কর্মফল এবং আত্মার পুনর্জন্ম) গ্রহণ করেন। জরথুস্ট্রীয় সম্প্রদায়ের কোন কোন প্রথাও (যেমন, আলোর উৎস রূপে অগ্নির উপাসনা) তিনি গ্রহণ করেন। স্মিথ ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁহার বিরাগের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'দীন ইলাহী'র প্রতি আনুগত্যর অর্থ ই ছিল ইসলাম পরিত্যাগ

আকবর যে সুন্নী গোঁড়ামির সমুদয় নির্দেশ পালন করেন নাই তাহাতে সন্দে নাই। ষোড়শ শতাব্দীর কোন মুসলমান ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে সত্যে অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু আকবর কখনও এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোরানের নির্দেশ পালনের আবশ্যকতা এবং মহম্মদের পয়গম্বর (ঈশ্বর প্রেরিত ধর্মগুরু) পদ অস্বীকার করেন নাই। আবদুল্লা খাঁ উজবেগের কাছে লিখিত তাঁহার পত্রে (১৫৮৬) তিনি নিজেকে একজন মুসলমান হিসাবে বর্ণনা করেন ইহা ইসলামের প্রতি অন্ততঃ তাঁহার মৌখিক আনুগত্য প্রমাণ করে। তাঁহার প্রবর্তিত কয়েকটি নিয়মকে বদায়ুনী ইসলাম-বিরোধী বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন কিন্তু ইহাতে ঐ গোঁড়া সুন্নী ঐতিহাসিকের কুসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় মোটামুটি বলা যায় যে, আকবরের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ইসলামকে আরবী প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা। পারস্যের মুসলমানেরা নিজের জাতীয় প্রতিভার সে ইসলামকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে শিয়া মতের উদ্ভব করিয়াছিল। আকবরও ভারতের অবস্থা ও প্রয়োজনের সঙ্গে ইসলামের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করিয়া ছিলেন। এই ধরনের মৌলিক পরিবর্তন গোঁড়া সুন্নী ধর্মের সীমা অতিক্রম না করিয়া করা সম্ভব ছিল না।

আকবর এবং হিন্দু ধর্ম

প্রজাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতি আকবরের মনোভাব মুখ্যতঃ নির্ধারিত হইয়াছিল তাঁহার তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির দ্বারা। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম দিকের সংস্কারগুলি (হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর কর এবং জিজিয়া করের বিলোপ) প্রবর্তিত হইয়াছিল সেই সময় (১৫৬৩-৬৪) যখন ইসলামীয় গোঁড়ামির প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত আনুগত্য যুক্তিবাদের প্রভাবে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উপরন্তু, এই ব্যবস্থাগুলি তিনি নিজের বুদ্ধি অনুসারেই প্রবর্তন করেন ; সেই সময় তাঁহার কোন যোগ্য মন্ত্রী ছিল না। রাজপুতদের প্রতি নীতি ১৫৬২-৭০ খ্রীস্টাব্দে নির্দিষ্ট রূপ নিয়াছিল তখনও তিনি কোন মন্ত্রীর উপদেশে চালিত হন নাই। তাঁহার সাম্রাজ্যে বিশ্বস্ত সহযোগীর মর্যাদা এবং দায়িত্ব দিয়া তিনি সাহসী ও রণনিপুণ রাজপুতদের সমর্থন লাভ করেন। মনসবদারদের তালিকায় ভগবান দাস, মান সিংহ প্রভৃতি রাজপুত প্রধানদের উচ্চ মর্যাদা ছিল। মারবারের রাজকন্যা তাঁহার পত্নী ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার পরিবর্তে তাঁহাকে নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

ধর্মীয় সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা এবং সত্যকে মানিয়া লইবার জন্য আগ্রহ আকবরকে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। হিন্দু পণ্ডিত এবং সাধুদিগের সহিত তিনি দীর্ঘ এবং ঘনিষ্ঠ আলোচনা করিতেন। তিনি কর্মফল এবং আত্মার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা গ্রহণ করেন। তিনি দশেরা, দেওয়ালী প্রভৃতি হিন্

উৎসব পালন করিতেন এবং কপালে তিলক কাটিতেন। তাঁহার মাতার মৃত্যুতে তিনি কয়েকটি হিন্দু শোক অনুষ্ঠান পালন করেন। বিধর্মীদের বিশ্বাসের প্রতি তাঁহার এইরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সঙ্গে তুলনীয় কোন উদাহরণ মধ্য যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই।

৩. আকবরের কৃতিত্ব বিচার

আকবরের রাজকীয় চেহারা এবং গুণ ছিল। মন্‌সেরাত নামে একজন জেসুইট পাদ্রী তাঁহাকে ভালভাবে জানিতেন। তিনি লিখিয়াছেন : 'মুখ এবং আকৃতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রাজার মর্যাদার উপযোগী। যে কেহ প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে সহজে রাজা বলিয়া চিনিতে পারিতেন।' অপর একজন জেসুইটের মতে তাঁহার চক্ষু ছিল 'সূর্যের আলোয় দীপ্ত সমুদ্রের মত জীবন্ত।' তিনি অসামান্য সাহস এবং শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। শিকারে ও যুদ্ধে সাহস প্রদর্শন করিলেও প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন মানবিক গুণ সম্পন্ন এবং শান্ত। তাঁহার আচার ব্যবহার ছিল মনোমুগ্ধকর; কিন্তু রাগের সময় তিনি ছিলেন 'ভীতিপ্রদ গাম্ভীর্যপূর্ণ'। সাধারণ লোকের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি সর্বদাই তাহাদের অভাব অভিযোগ মনোযোগের সহিত শুনিবার সময় পাইতেন এবং তাহাদের অনুরোধে সদয়ভাবে সাড়া দিতে পারিতেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রতি যথোপযুক্ত আচরণ করিতেন।'

তিনি ছিলেন সম্ভবতঃ নিরক্ষর। কিন্তু আবুল ফজল বলিয়াছেন : 'আকবরকে বুদ্ধি বিবেচনা যত্ন করিয়া শিক্ষা করিতে হয় নাই, তাহা ঈশ্বরের দান।' জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব এবং কবিতা তাঁহাকে বিশেষ আকৃষ্ট করিত। ধর্মে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হইলেও আকবর একই সঙ্গে ছিলেন যুক্তিবাদী এবং সত্যের অনুরাগী। 'আকবরের অসীম কর্মোদ্যম ছিল, কিন্তু অফুরন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সর্বদাই ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন থাকিতেন।'

আকবরের রাজ্য বিস্তারের আক্রমণাত্মক নীতি এমন একটি সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা প্রায় দুই শতাব্দী স্থায়ী হয়। তিনি নিজেই ছিলেন একজন যোগ্য সেনাপতি এবং সামরিক সংগঠক। মালব অভিযান, চিতোর অবরোধ, গুজরাট অভিযান, বিহার বাংলা অভিযান এবং কাবুল অভিযানের ইতিহাসে ইহা প্রমাণিত। অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরিপূরক ছিল কূটনীতি। গুজরাট, খান্দেশ এবং কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায়। তাঁহার কূটনীতির চূড়ান্ত জয় ছিল মেবার ছাড়া সকল রাজপুত রাজ্যের শান্তিপূর্ণ বশ্যতা স্বীকার।

অস্ত্র দ্বারা সৃষ্ট একটি সাম্রাজ্য কেবলমাত্র একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা দ্বারাই

সুসংহত করা যায়। তিনি এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা সংগঠিত করিয়াছিলেন যাহা হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের ব্রিটিশ উত্তরাধিকারীরা অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার আপোষমূলক মনোভাব সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করে। ধর্মীয় ব্যাপারে উদারতার দ্বারা তিনি একটি নূতন সাংস্কৃতিক রূপ রেখা অঙ্কন করেন যাহা স্থায়ীভাবে ভারতীয় জীবন যাত্রাকে প্রভাবিত করে।'

'রাজ্য বিজেতা, শাসক, শিল্প ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক এবং ধর্মীয় আদর্শবাদী রূপে আকবর ছিলেন মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং ইতিহাসে পরিচিত শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম।' ইতিহাসে তাঁহার মহান্ ব্যক্তিত্ব, নূতন নূতন ধারণা এবং অসাধারণ কৃতিত্ব স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি

১. জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭)

খসরুর বিদ্রোহ (১৬০৬)

আকবর তাঁহার জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র জীবিত পুত্র সেলিমকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। পাদশাহী দরবারে দুইটি দল ছিল; একটি সেলিমের দাবি সমর্থন করিত, অপরটি তাঁহার পরিবর্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিত। খসরুর শক্তিশালী সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন তাঁহার মাতুল রাজা মান সিংহ এবং তাঁহার শ্বশুর মীর্জা আজিক কোকা। আকবরের শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসরে ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহার উদারতার বিরুদ্ধে একটি গোঁড়া স্নুন্নী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ইহার নেতৃত্ব দেন স্নুফী নকসবন্দী গোষ্ঠীর শেখ আহম্মদ সিরহিন্দী, এবং কয়েকজন প্রভাবশালী অভিজাত ইহা সমর্থন করেন। এই দল উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধে এই শর্তে সেলিমকে সমর্থন করেন যে তিনি আকবরের ধর্মীয় নীতির পরিবর্তন করিবেন এবং ইসলামীয় গোঁড়ামি পুনরুদ্ধার করিবেন। সেলিমের সমর্থকগণই বেশী শক্তিশালী ছিল। তাই তিনি বিনা বাধায় আকবরের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে সিংহাসনে আরোহণ করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণ করিলেন।

ছয় মাস পরে খসরু বিদ্রোহ করিলেন। ১২,০০০ সশস্ত্র অনুগত ব্যক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়া তিনি লাহোর দুর্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু দখল করিতে পারিলেন না। জাহাঙ্গীর তাঁহার সৈন্যদল পাঠাইলেন এবং নিজে লাহোরের দিকে অগ্রসর হইলেন। লাহোরের নিকটে ভৈরবালে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া খসরু কাবুলের দিকে পলায়ন করিলেন, কিন্তু পথে ধরা পড়িলেন। তাঁহাকে বন্দী করা হইল এবং তাঁহার সমর্থকদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইল। পরে তাঁহাকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা খুররমের হেফাজতে বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

গুরু অর্জুনের মৃত্যুদণ্ড

লাহোরের দিকে অগ্রসর হইবার সময় খসরু শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুনের সহিত মিলিত হন। এই বৈঠকে কি ঘটে তাহা স্পষ্ট নয়। জাহাঙ্গীর নিজে তাঁহার আত্মজীবনীতে ('তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী') লিখিয়াছেন : 'তিনি খসরুর সহিত বিশেষ

ব্যবহার করেন ('behaved in certain special ways') এবং তাঁহার কপালে নিজের অঙ্গুলি দিয়া জাফরানের একটি চিহ্ন আঁকিয়া দেন। এই চিহ্ন সৌভাগ্য-জনক বলিয়া মনে করা হয়।' সম্রাট আদেশ দেন যে তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। কঠোর শারীরিক নির্যাতন করিয়া গুরুকে হত্যা করা হইল।

এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রকাশ্য কারণ ছিল গুরুর পক্ষে একটি রাজনৈতিক অবিবেচনার কাজ—বিদ্রোহী খসরুর সহিত যোগাযোগ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক কারণে এই ঘটনা ঘটে নাই; ইহা ছিল কঠোর ধর্মীয় অত্যাচারের একটি ঘটনা। জাহাঙ্গীর নিজেই বলিয়াছেন যে গুরু অর্জুন বহু সরলমনা হিন্দুদের, এমন কি অজ্ঞ এবং নির্বোধ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের, তাঁহার ব্যবহার দ্বারা নিজের পক্ষে টানিয়া লইয়াছেন। সম্রাট আরও বলেন: 'বার বার আমার মনে হইয়াছে যে এই কাজ বন্ধ করিতে এবং তাহাকে ইসলামের জনগণের মধ্যে আনিতে (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে) হইবে।' জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে যে মুসলমান গোঁড়ামির পুনর্জন্ম জড়িত ছিল তাহার সহিত গুরুর শাস্তির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

শিখ সম্প্রদায়ের সংগঠনের ইতিহাসে গুরু অর্জুনের হত্যাকাণ্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখা। শিখ ধর্মের শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের যুগ শেষ হইল, সামরিক গোষ্ঠী হিসাবে শিখদের বিকাশ শুরু হইল গুরু অর্জুনের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী হরগোবিন্দের (১৬০৬-৪৫) আমলে। তাঁহাকে জাহাঙ্গীর কয়েক বৎসর গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন।

নূর জাহান

১৬১১ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসা নামে এক বিধবাকে বিবাহ করেন। তাঁহাকে প্রথমে নূর মহল এবং পরে নূর জাহান উপাধি দেওয়া হয়। তাঁহার পিতামাতা ভাগ্যান্বেষণে পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার প্রথম স্বামী ছিলেন আলি কুলি ইস্তাজলু। তিনি একা একটি বাঘ মারিবার জন্য শের আফকুন উপাধি পান। তিনি বাংলার অন্তর্গত বর্ধমানের ফৌজদার ছিলেন। বিদ্রোহসূচক কাজকর্মের সন্দেহে সুবাদার কুতুবউদ্দীন খাঁ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান; এই বৈঠকে এক হাতাহাতির ফলে উভয়ের মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীরের আদেশে শের আফকুনের বিধবা পত্নী এবং কন্যাকে পাদশাহী মহলে আনা হয়। সেখানে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দেখেন এবং বিবাহ করেন। শের আফকুনের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটে।

মেহেরউন্নিসার সহিত জাহাঙ্গীরের বিবাহ ঐতিহাসিক বিতর্কের বিষয়। বলা হয় যে বিবাহের পূর্বেই তিনি যুবরাজ সেলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহাকে

বিবাহ করিবার জন্য সেলিমের ইচ্ছা আকবর অনুমোদন করেন নাই। তাহার পর শের আফকুনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সিংহাসনে আরোহণের পর জাহাঙ্গীর শের আফকুনকে হত্যা করিবার এবং মেহেরউন্নিসাকে পাদশাহী মহলে আনিবার ব্যবস্থা করেন। আধুনিক গবেষণায় এই রোমান্টিক কাহিনীর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে।

সৌন্দর্যই নূর জাহানের একমাত্র সম্পদ ছিল না। তাঁহার ছিল মনোমুগ্ধকর ব্যবহার এবং অসাধারণ বুদ্ধি। তিনি মোটামুটি শিক্ষিত ছিলেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। বিবাহের পর ধীরে ধীরে তাঁহার সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'পাদশাহ বেগমে'র (প্রধান সম্রাজ্ঞী'র) মর্যাদা পান। ইহার পর হইতে তিনি রাজধানীর নারী সমাজের প্রধান এবং বাদশাহী পরিবারের কর্ত্রী হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। ক্ষমতাপ্রিয় নূর জাহান জাহাঙ্গীরের মনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেন। সম্রাটের বয়স এবং আয়েসপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাবও বৃদ্ধি পায়। জাহাঙ্গীরের নামের সহিত নূর জাহানের নাম যুক্ত করিয়া নূতন মুদ্রা প্রবর্তন করা হয়। তাঁহার আত্মীয়রা উচ্চ পদ পান। তাঁহার পিতা প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রী হন এবং ইতিমতউদ্দৌলা উপাধি পান। তাঁহার ভ্রাতা আসফ খাঁ বাদশাহী পরিবারের কাজকর্ম পরিচালনার ভার নিলেন। তাঁহার কন্যা মমতাজ মহলের সহিত সম্রাটের তৃতীয় পুত্র খুরমের বিবাহ হয়।

পিতা ও ভ্রাতার প্রভাব এবং খুরমের সহযোগিতার ফলে নূর জাহানের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার আধিপত্য ১৬২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত রহিল। পরে ইতিমদউদ্দৌলার মৃত্যু তাঁহার দলকে দুর্বল করিয়া দেয়। উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া তাঁহার সহিত খুরমের বিচ্ছেদ ঘটিল। এই দুইটি পরিবর্তনের ফলে নূর জাহানের ক্ষমতা আংশিকভাবে খর্ব হয়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর (১৬২৭) পর যে বিরোধ শুরু হয় তাহাতে খুরম জয়ী হইলেন। এই পরাজয়ের অর্থ ছিল রাজনীতি হইতে নূর জাহানের নির্বাসন। ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অবসর জীবনযাপন করেন।

মেবারের বশ্যতা স্বীকার (১৬১৫)

জাহাঙ্গীরের শাসনকালের প্রথম রাজনৈতিক সাফল্য ছিল মেবারের রাণা অমর সিংহের আনুগত্য স্বীকার। ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে রাণা প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার এই পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। আকবরের রাজ্যবিস্তারের নীতির অনুসরণে জাহাঙ্গীর রাণাকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য কয়েকটি অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। যুদ্ধের গতির প্রতি নিজে দৃষ্টি রাখার জন্য ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট স্বয়ং আজমীর যান।

তাঁহার তৃতীয় পুত্র খুররমকে অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি কঠোর ভাবে রাণার রাজ্য বিধ্বস্ত করেন, গ্রাম এবং শহর পোড়াইয়া দেন, পাহাড়ে লুক্কায়িত রাজপুতদের সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। অল্প সামান্য সম্পদ এবং হতাশাগ্রস্ত অনুগামীদের লইয়া আর বিরোধিতা চালানো রাণার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি খুররমের সহিত আলোচনা শুরু করেন এবং শান্তি স্থাপন করেন।

মুঘল-রাজপুত সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরের সহিত অমর সিংহের চুক্তি (১৬১৫) একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাণা সম্রাটের সার্বভৌমিকতা স্বীকার করেন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীতে এক হাজার অশ্বারোহী সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। বিনিময়ে তাঁহাকে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। আকবরের সময় হইতে মুঘলরা মেবারের যে অংশ অধিকার করিয়াছিল তাহা তাঁহাকে ফেরৎ দেওয়া হয়; কিন্তু চিতোর দুর্গ সুরক্ষিত করা, এমনকি সংস্কার করা, নিষিদ্ধ হইল। অন্য দুইটি বিষয়ে রাণা বিশেষ সুবিধা পাইলেন। স্থির হইল যে অন্যান্য অনুগত রাজপুত রাজাদের মত রাণাকে ব্যক্তিগতভাবে পাদশাহী দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে না; তাঁহার প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত হইবেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং এই প্রতিনিধি পাঁচ হাজারী মনসবদার হইবেন। অন্যান্য রাজপুত রাজাদের মত রাণাকে বাদশাহী পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে না। রাণার পুত্রকে প্রচুর উপহার দেওয়া হইল। এই ব্যাপারে জাহাঙ্গীরের উদারতা ইংলণ্ডের রাজদূত স্যার টমাস রো'র (Sir Thomas Roe) মনে এই ধারণার সৃষ্টি করে যে এই শান্তি জয়ের পরিবর্তে ক্রয় করা হইয়াছে। ('bought rather than won')—অর্থাৎ যুদ্ধ দ্বারা রাণাকে শান্তি স্থাপন করিতে বাধ্য করা হয় নাই, উপহারের দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করা হইয়াছে। জাহাঙ্গীরের এই আপোষ-মূলক নীতি যে রাজনৈতিক দিক হইতে বিজ্ঞজনোচিত ছিল তাঁহার প্রমাণ এই যে শান্তি ৬০ বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। রাণাদের দীর্ঘকালের নিপীড়িত রাজ্য ঐতিহ্যগত স্বাধীনতার পরিবর্তে মুঘল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিরাপত্তা পাইয়াছিল। রাণা প্রতাপ সিংহের স্বাধীনতার আদর্শ ত্যাগ করা ছাড়া অমর সিংহের উপায়ান্তর ছিল না।

বাংলা

আকবরের বাংলা জয়ের পরেও বিধ্বস্ত আফগানদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয় নাই। মুঘল কর্তৃত্ব সুসংহত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রতিরোধ চালাইয়া যাইতেছিল। কুতুলু খাঁ, ঈশা খাঁ, এবং সুলেমানের মত যোগ্য নেতা তাহাদের পরিচালনা করিতেন। পরপর মুঘল সুবাদারেরা (মান সিংহ, কুতুবউদ্দীন, জাহাঙ্গীর কুলি এবং ইসলাম খাঁ) তাঁহাদের কার্যকালে লক্ষ্য করেন

যে আফগান নেতাদের দমন করা সহজ নয়। ইসলাম খাঁ বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন ; ঢাকার নাম হয় জাহাঙ্গীর নগর। রাজধানীর স্থানান্তর করণ দুইটি কারণে প্রয়োজন ছিল : পূর্ব বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব সুসংহত করা এবং আরাকানের মগ এবং পর্তুগীজদের জলপথে আক্রমণ প্রতিহত করা। বাংলার শেষ উল্লেখযোগ্য আফগান নেতা উসমান ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে নৈকুজ্যলের (ঢাকা অঞ্চলে) যুদ্ধে পরাজিত হন এবং আহত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। নেতৃবিহীন আফগানরা মুঘল চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ; তাহাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যায়।

বাংলার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত হিন্দু রাজ্য কোচ হাজো মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহার পূর্ব দিকে ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আহোম রাজ্য। এই রাজ্যটি মুঘলেরা আক্রমণ করিল। সংঘর্ষ চলিতে লাগিল।

কাংড়ার আত্মসমর্পণ (১৬২০)

সামরিক দিক হইতে জাহাঙ্গীরের শাসনকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিযান ছিল কাংড়ার সুদৃঢ় দুর্গ দখল। আকবরের শাসনকালে টোড়র মল পার্শ্ববর্তী ঝিলাম এবং ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের পার্বত্য নেতাদের দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্গটি দখল করা হয় নাই। ২৩টি বহির্বেষ্টনী (bastion) এবং ৭টি তোরণ (gate) সহ ইহা ছিল একটি ভয়োদ্রেককারী সামরিক কাঠামো। দীর্ঘ অবরোধের পর ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে ইহার পতন ঘটে।

কান্দাহার

পারস্যের সাফাভী বংশীয় শাসকেরা মুঘলদের কান্দাহার দখলকে (১৫৯৫) একটি স্থায়ী ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯) ছিলেন সাফাভী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। আকবরের মৃত্যু এবং খসরুর বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া তিনি খোরাসানী নেতাদের কান্দাহার আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন, কিন্তু মুঘল সৈন্যবাহিনী তাহাদের বিতাড়িত করে (১৬০৬-৭)।

এইরূপ শত্রুতা সত্ত্বেও পারস্য এবং মুঘল দরবারের মধ্যে প্রকাশ্য বন্ধুত্ব অটুট ছিল। ১৬১১ এবং ১৬২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পারস্যের চারটি প্রতিনিধি দল দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, পারস্যের শান্তিপূর্ণ সদিচ্ছা সম্বন্ধে মুঘলদের বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখা। কিন্তু শাহ আব্বাস সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। নূরজাহান ও খুরমের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের সময় তিনি বাঞ্ছিত সুযোগ পাইলেন। ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে একটি পারসিক সৈন্যবাহিনী কান্দাহার দখল করিল। কান্দাহার উদ্ধারের জন্য জাহাঙ্গীর একটি বিরাট অভিযানের পরিকল্পনা

করিলেন এবং খুরমকে তাহার নেতা মনোনীত করিলেন। এই পরিকল্পনা নষ্ট হইল, কারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী খুরম ভারতের বাহিরে যাইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারের ভবিষ্যৎ বিঘ্নিত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তার

আকবরের শাসনকালে আহম্মদনগরের সুলতানী রাজ্যের একটি অংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং একটি 'সুবা' রূপে গণ্য হয়। অপর অংশটি নিজাম শাহী বংশের শাসনাধীনই থাকে। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে এই বংশের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করিতেন মালিক অম্বর নামক জনৈক মন্ত্রী। তাঁহার তিনটি অসাধারণ গুণ ছিল: সামরিক প্রতিভা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষমতা। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন আবিসিনীয়। তখন নিজাম শাহী রাজ্যটি আভ্যন্তরীণ বিভেদের ফলে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সকল দলের সমর্থন সহ ক্ষমতার অধিকারী হন এবং মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যটি রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। আহম্মদনগরের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত মারাঠাদের তিনি গেরিলা যুদ্ধে শিক্ষিত করিয়া ভবিষ্যতে মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে একটি শক্তি সমবায় সংগঠন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। টোডর মলের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তিনি একটি নূতন রাজস্ব-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া তাহাদের সমর্থন লাভ করেন। উচ্ছেদের সম্মুখীন খণ্ড-বিখণ্ড নিজাম শাহী রাজ্যের অভিভাবকের পক্ষে এইগুলি ছিল অসাধারণ কৃতিত্ব।

জাহাঙ্গীরের দাক্ষিণাত্য নীতি ছিল কেবল নর্মদার অপর পারে রাজ্য বিস্তারের জন্য তাঁহার পিতার পরিকল্পনারই অনুসরণ। প্রথম লক্ষ্য ছিল অর্ধবিজিত এবং আপাতদৃষ্টিতে টলায়মান আহম্মদনগরের সুলতানী রাজ্য। একটি দীর্ঘকালব্যাপী ঢিলেঢালাভাবে পরিচালিত যুদ্ধের সফল অবসান ঘটান খুরম (১৬১৭)। মালিক অম্বর মুঘলদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া সম্পূর্ণ বালাঘাট অঞ্চল মুঘলদের ফিরাইয়া দেন। আহম্মদনগর দুর্গ এবং কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি মুঘলদিগকে সমর্পণ করা হয়। পূর্ববর্তী মুঘল সেনাপতিদের অভিযানের রাজনৈতিক সুফল সংগ্রহে খুরমের সাফল্যের পুরস্কার হিসাবে তাঁহাকে 'শাহ জাহান' (বিশ্বের রাজা) উপাধি দেওয়া হয়।

আহম্মদনগরের সুলতানী রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়া গেল; মালিক অম্বর পরাজিত হইলেও তাঁহার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইল না। বহু অর্থব্যয় এবং লোক-ক্ষয় সত্বেও মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের সীমার এক মাইলেরও বেশী অগ্রসর হইল না। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সমর্থনে শক্তিশালী হইয়া, ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে মালিক অম্বর ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দের চুক্তি মানিতে অস্বীকার করেন। আবার

মুঘল সৈন্যবাহিনী উপলব্ধি করে যে সম্মুখ যুদ্ধে সাফল্য গেরিলা যোদ্ধাদের ধ্বংস করিতে পারিবে না। মালিক অম্বরের বাহিনী বুরহানপুর অবরোধ করে এবং মালবের অন্তর্গত মাণ্ডু পর্যন্ত আক্রমণ চালাইয়া যায়। সম্রাটের আদেশে শাহ জাহান পুনরায় দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হন। একটি মারাত্মক আক্রমণের ফলে মালিক অম্বর আত্মসমর্পণ করেন (১৬২১)। মুঘলদের যে সকল অঞ্চল তিনি দখল করিয়াছিলেন সেগুলি ছাড়াও কয়েকটি সংলগ্ন জেলাও তিনি ছাড়িয়া দেন। আহম্মদনগর ১২ লক্ষ টাকা কর দিতে রাজী হয়। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডাও করদ রাজ্যে পরিণত হয় এবং যথাক্রমে ১৮ লক্ষ এবং ২০ লক্ষ টাকা কর দিতে সম্মত হয়।

১৬২৩ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত একটি চুক্তি দ্বারা বিজাপুর এবং মুঘলদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। বিজাপুর বাহিনীর উপর আক্রমণে মালিক অম্বর গোলকুণ্ডার সহিত যোগ দেন। মুঘল সৈন্যবাহিনী বিজাপুরকে সাহায্য করে। কিন্তু শাহ জাহান তখন ছিলেন জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। তিনি মালিক অম্বরের সহিত যোগ দেন। জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র পরভেজ এবং সেনাপতি মহাবৎ খাঁ সম্রাটের আদেশে দাক্ষিণাত্যে আসিলে শাহ জাহান পিতার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দে মালিক অম্বরের মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁহার অসমাপ্ত কার্যের দায়িত্ব পড়ে হামিদ খাঁ নামক অপর এক যোগ্য আবিসিনীয় নায়কের উপরে। তিনি মুঘল সেনাপতি খাঁ জাহান লোদীর নিকট হইতে আহম্মদনগর পর্যন্ত সমগ্র বালাঘাট অঞ্চল দখল করেন। নিজাম শাহী রাজ্য জয়ের পূর্বেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয় (১৬২৭)। তাঁহার দাক্ষিণাত্য নীতি আহম্মদ নগরের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইলেও বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার ক্ষেত্রে ইহা অংশিকভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

শাহ জাহানের বিদ্রোহ (১৬২৩-২৬)

বিশের দশকে জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্য খারাপ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুকে ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে গোপনে হত্যা করা হয়। তিন জন জীবিত পুত্রের (পরভেজ, শাহ জাহান, শাহরিয়ার) মধ্যে শাহ জাহান ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্য। কিন্তু শাহরিয়ার ছিলেন রাজনৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী, কারণ তিনি ছিলেন নূর জাহানের জামাতা (তাঁহার প্রথম বিবাহের কন্যা লাড্‌লী বেগমের স্বামী)। শাহ জাহান তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী মমতাজ মহলকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন নূর জাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা। কয়েক বৎসর নূর জাহান এবং শাহ জাহানের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল, কিন্তু বিশের দশকের প্রথমে বিরোধ বাঁধে। তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হইল। ইহার কারণ ছিল জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরেও তাঁহার রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য নূর জাহানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। শাহ জাহান ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব-

সম্পন্ন। স্বভাবতঃই তিনি সিংহাসন দখল করিতে সফল হইলে নূর জাহানের সহিত ক্ষমতা ভাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্যদিকে শাহরিয়র ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল চরিত্র। তিনি সিংহাসন লাভ করিলে শ্বাশুড়ীর নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিবেন, ইহাতে সন্দেহ ছিল না। সুতরাং নূর জাহান তাঁহাকে সিংহাসনের দাবিদার করিবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই ভাবে আধিপত্য রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সম্রাজ্ঞী নিজেকে শাহ জাহানের প্রত্যক্ষ বিরোধীতে পরিণত করিলেন।

যখন পারস্যের সৈন্যবাহিনী কান্দাহার দুর্গ অবরোধ করিল (১৬২২) তখন শাহ জাহানকে কান্দাহারের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রেরিত অভিযানের নেতৃত্ব করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। সেই সময় তিনি দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। তখন তাঁহার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত; তাঁহার সিংহাসন লাভের আশা সফল হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ ছিল। এই সঙ্কটকালে দেশ ত্যাগে অনিচ্ছুক শাহ জাহান কান্দাহার যাত্রা সম্বন্ধে কয়েকটি সর্ত দিলেন। সম্রাট এই সব সর্ত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। নূর জাহানের ষড়যন্ত্র তখন এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল যে শাহ জাহান বিদ্রোহ করা ছাড়া অন্য কোন পথ দেখিলেন না। তিনি মালবের অন্তর্গত মাণ্ডুতে তাঁহার মূল কেন্দ্র স্থাপন করিলেন; কিন্তু সম্রাটের সৈন্যদল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করায় তিনি বারবার প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইলেন। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন এবং মালিক অম্বরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহযোগীদের দলত্যাগ এবং মৃত্যুর ফলে তাঁহার সামরিক সংগঠন দুর্বল হইয়া পড়িল এবং তাঁহার সম্পদ নষ্ট হইল। তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে ক্ষমা করা হইল (১৬২৬)। এই বিদ্রোহের ফলে কান্দাহার উদ্ধারের জন্য সামরিক কার্যকলাপ বাধাপ্রাপ্ত হইল।

মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ (১৬২৬)

একজন প্রধান অভিজাত মহাবৎ খাঁর সামরিক দক্ষতা এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের জন্যই শাহ জাহানের বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের পরিবর্তে নূর জাহান তাঁহার সম্বন্ধে সন্দিহান এবং তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার রাজনৈতিক পরিকল্পনায় এমন কোন শক্তিশালী ব্যক্তির স্থান ছিল না যাহাকে নিয়ন্ত্রণাধীন যন্ত্র রূপে ব্যবহার করা কঠিন ছিল। অন্য দিকে মহাবৎ খাঁ নূর জাহানকে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য অপছন্দ করিতেন এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পরভেজকে সমর্থন করিতেন।

নূর জাহানের আপোষহীন মনোভাবের ফলে মহাবৎ খাঁ প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইলেন। ঝিলাম নদীর তীরে এক ঘাঁটির উপর তিনি আকস্মিক ভাবে আক্রমণ করেন এবং জাহাঙ্গীরকে বন্দী করিয়া নিজ ঘাঁটিতে লইয়া যান।

শক্তি প্রয়োগে সম্রাটকে মুক্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টার পর নূর জাহান স্বেচ্ছায় মহাবৎ খাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর সহিত মিলিত হইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

জাহাঙ্গীর এবং নূর জাহানকে হেফাজতে রাখিয়া এবং সম্রাটের সৈন্যদলকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনিয়া মহাবৎ খাঁ কাবুলের দিকে অগ্রসর হন। ফিরিবার পথে নূর জাহান কৌশলে জাহাঙ্গীরকে মুক্ত করেন। একটি কঠিন অবস্থায় পড়িয়া মহাবৎ খাঁ শাহ জাহানের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। এই সময় শাহ জাহানের সৌভাগ্য লক্ষ্য করা যায়। ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দে পরভেজের মৃত্যু হয়। এক বৎসর পরে জাহাঙ্গীরেরও মৃত্যু হয়।

ইংরাজ প্রতিনিধিগণ

১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজরা দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হয়। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাণী প্রথম এলিজাবেথের নিকট হইতে সনদ (Charter) লাভ করে। ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স্ (Hawkins) জাহাঙ্গীরকে লেখা ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের (James I) এক পত্র নিয়া সুরাটে উপস্থিত হন। এই পত্রে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়। তিনি সম্রাটের দরবারে আসেন, তাঁহার সহিত তুর্কী ভাষায় কথা বলেন এবং বহু-মূল্য দ্রব্যাদি উপহার দেন। ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে সুরাট হইতে উইলিয়ম এডওয়ার্ডস্ (William Edwards) সম্রাটের দরবারে আসেন রাজা প্রথম জেমসের একটি পত্র সহ। এই বেসরকারী প্রতিনিধিগণের পরে সরকারী প্রতিনিধি রূপে আসিলেন স্যার টমাস রো (Sir Thomas Roe)। তিনি ছিলেন প্রথম জেমসের নিকট হইতে জাহাঙ্গীরের নিকট সরকারী পরিচয়পত্র সহ প্রেরিত রাজদূত। এই সরকারী দৌত্যের উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক একটি চুক্তির ব্যবস্থা করা। তিনি আজমারে জাহাঙ্গীরের সভায় আসেন (১৬১৬)।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র

এডওয়ার্ড টেরী (Edward Terry) নামক জনৈক ইংরাজ ধর্মযাজক স্যার টমাস রোর সঙ্গী ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : 'এই রাজার চরিত্র আমার কাছে সর্বদাই কোমলে-কঠোরে গঠিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, কেননা সময় সময় তিনি নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেন, আবার সময় সময় তাঁহাকে মনে হইত অতিশয় অনুকূল ও মৃদুস্বভাব।' ঐতিহাসিক স্মিথ বলিয়াছেন : ক্রুদ্ধ হইলে, বিশেষতঃ সিংহাসনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে, তিনি নিষ্ঠুর হইতে পারিতেন। তিনি জীবন্ত মানুষের চামড়া তুলিয়া নিতেন, শূলে দিতেন, হাতী দ্বারা টুকরা টুকরা করাইতেন, অথবা অন্যভাবে নিপীড়ন করিয়া হত্যা করিতেন।

হকিন্‌স্‌ এবং রো এই বর্বরতায় বিশেষভাবে বিরক্ত হইয়াছিলেন। সুবিচারের প্রতি তাঁহার অনুরাগের জন্য তিনি গর্ববোধ করিতেন। দোষী ব্যক্তির মর্যাদার হিসাব না করিয়া তিনি সমানভাবে সকলের বিচার করিতেন। তাঁহার চরিত্রের নরম দিক প্রতিফলিত হইয়াছে তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্বে—তাঁহার আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' রচনায়—এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগে। তিনি অঙ্কন ও চিত্রকলার সমজদার এবং সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা এবং উদারতা উত্তরাধিকার সূত্রে পান নাই। তবে কখনও কখনও তিনি খ্রীস্টান পাদ্রী, হিন্দু পণ্ডিত এবং মিয়া মীরের মত উদারপন্থী সুফীদের সহিত ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের আগে তিনি তাঁহার রাজনৈতিক সমর্থকদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তিনি ইসলামকে রক্ষা করিবেন। এক অর্থে তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ আকবরের ধর্মীয় উদারতার বিরুদ্ধে ইসলামের সমর্থক প্রতিক্রিয়া মোটামুটি সূচিত করে। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। তিনি কয়েকটি মন্দির ধ্বংস করেন এবং কয়েক ক্ষেত্রে গির্জা বন্ধ করিয়া দেন; কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হিন্দু, জৈন ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করেন নাই। তাঁহার স্মৃতিতে সর্বাপেক্ষা বড় কলঙ্ক গুরু অর্জুনের নিষ্ঠুর হত্যা। তিনি গুজরাটের জৈনদের উপর অত্যাচার করেন। তিনি হিন্দু সমাজে সতীদাহ বন্ধ এবং শিশু হত্যা বিলোপ করার চেষ্টা করেন। তাঁহাকে এমন এক শাসক রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে যাঁহার 'লক্ষ্য ছিল ভাল কাজ করা, কিন্তু যিনি বুদ্ধির অভাবে মহান শাসকদের মর্যাদা লাভ করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।'

২. শাহ জাহান (১৬২৮-৫৮)

সিংহাসনে আরোহণ

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর (১৬২৭) পরে শাহরিয়রকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য নূর জাহানের চেষ্টা ব্যর্থ করেন তাঁহার ভ্রাতা আসফ খাঁ। তিনি ছিলেন শাহ জাহানের পত্নী মমতাজ মহলের পিতা। লাহোরে শাহরিয়র নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করেন। আসফ খাঁ তাঁহাকে পরাজিত বন্দী ও অন্ধ করেন। শাহ জাহান তখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, তিনি আগ্রায় পৌঁছিয়া ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূর জাহানকে বৃত্তি দিয়া লাহোরে অবসর জীবন-যাপনে পাঠানো হয়। সেখানে ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হুগলী দখল (১৬৩২)

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে পূর্ব ভারতে পর্তুগীজ বাণিজ্যের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল

হুগলী (কলিকাতার নিকটে)। পর্তুগীজগণ শান্তিপ্রিয় বণিক ছিল না ; বাণিজ্যিক কার্যকলাপ এবং খ্রীষ্ট ধর্মের বিস্তারে তাঁহারা ছিল আক্রমণমুখী। পণ্য দ্রব্যের ব্যাপারে তাহাদের অতিরিক্ত লাভের প্রয়াসে স্থানীয় বণিকেরা নির্যাতিত হইত। গ্রামে লুটপাটের সময় তাহারা শিশুদের লইয়া যাইত এবং নিজেদের ধর্মে তাহাদের ধর্মান্তরিত করিত। তাহাদের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ ছাড়াও, তাহারা দুইটি নির্দিষ্ট ব্যাপারে শাহ জাহানকে অসন্তুষ্ট করেন। তাঁহার পিতার শাসনকালে শাহ জাহানের বিদ্রোহের সময় পর্তুগীজরা তাঁহাকে সাহায্য করে নাই এবং তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁহারা তাঁহাকে উপযুক্ত উপহার পাঠায় নাই, সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের দুইজন ক্রীতদাসীকে নিয়ে একটি নৌকায় যাইতেছিল। নৌকাটি তাহারা অপহরণ করিয়াছিল।

শাহ জাহানের আদেশে বাংলার সুবাদার কাসিম খাঁ হুগলী অবরোধ এবং দখল করেন। পর্তুগীজ বন্দীদের আগ্রাতে পাঠানো হয়। সেখানে তাহাদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরীকরণ অথবা বন্দীদশা—এই দুইটির মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হয়।

বিদ্রোহ

দাক্ষিণাত্যের আফগান শাসনকর্তা খাঁ জাহান লোদী আহম্মদনগরের নিজাম শাহী সুলতানের সহিত মিত্রতা করেন এবং মুঘল সরকারের স্থানীয় বাহিনীকে পরাজিত করেন। শাহ জাহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যান। খাঁ জাহানকে পরাজিত ও হত্যা করা হয়। তিন বৎসরের উপর (১৬২৮-৩১) এই বিদ্রোহ নূতন সম্রাটকে উৎকণ্ঠিত করিয়া রাখে, কারণ এই ঘটনা নিজাম শাহী বংশের সহিত যুক্ত ছিল এবং দাক্ষিণাত্যে মুঘল শাসনের প্রতি ইহা একটি আঘাত স্বরূপ হইয়াছিল।

খাঁ জাহান লোদীর বিদ্রোহের সমকালে বুন্দেলখণ্ডের জুঝর সিংহ বিদ্রোহ করেন (১৬২৮-২৯)। বুন্দেলখণ্ডের পর্বত এবং বনাঞ্চলে বুন্দেলা দলপতিরা মুঘলদের নিকট নতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যখন যুবরাজ সেলিম আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন তাঁহার প্ররোচনায় বীর সিংহ বুন্দেলা আবুল ফজলকে হত্যা করেন। জুঝর সিংহ ছিলেন তাঁহার পুত্র। শাহ জাহানের বাহিনীকে প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হইয়া তিনি আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি পুনরায় বিদ্রোহ করেন। শাহ জাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বাধীন একটি বাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করে। জুঝর সিংহ পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার এক আত্মীয়কে তাঁহার রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু কিছু বুন্দেল দলপতি তাঁহার কর্তৃত্ব মানিয়া নিতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই স্থানীয় প্রতিরোধ বিদ্রোহে পরিণত হয়। শাহ জাহানের কঠোরতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি—বুন্দেলা রাজধানীতে মন্দির ধ্বংস—বুন্দেলখণ্ডকে একটি বারুদের স্তূপে পরিণত করে।

আহম্মদ নগরের পতন (১৬৩৩)

শাহ জাহানের শাসনকালে আহম্মদনগরের নিজাম শাহী বংশের গৌরবহীন অবসান ঘটে (১৬৩৩)। ইহার জন্য মুঘল আক্রমণ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ বিরোধও কম দায়ী ছিল না। মালিক অম্বরের মৃত্যুর পর (১৬২৬) আহম্মদনগরের রাজনীতিতে স্থায়িত্বের অবসান ঘটে। তাঁহার অযোগ্য পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ফতে খাঁ সুলতান দ্বিতীয় মুরতাজাকে হত্যা করেন। ইহার পর তিনি সুলতানের পরিবারের এক নাবালককে সিংহাসনে বসান এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে মুঘল আনুগত্য স্বীকার করেন। মুঘলদের প্রতি তাঁহার নূতন আনুগত্য যথার্থ ছিল না। একটি মুঘল বাহিনী তৎকালীন নিজাম শাহী রাজধানী দৌলতাবাদ অবরোধ করিল এবং সেখানে সঞ্চিত গোলাবারুদ এবং অস্ত্র সহ নগরটি দখল করিল। নাবালক সুলতান বন্দী হইলেন। ফতে খাঁকে বৃত্তি দেওয়া হইল।

আহম্মদনগর সুলতানী রাজ্যের পশ্চিমের কয়েকটি জেলা কয়েক বৎসর প্রকৃতপক্ষে মারাঠা নিয়ন্ত্রণে রহিল। একজন প্রধান মারাঠা দলপতি, শিবাজীর পিতা শাহজী, এক পুতুল নিজাম শাহী সুলতানের নামে শাসন চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার কার্যকরী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিজাপুরের সুলতান।

গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুরের বশ্যতা স্বীকার (১৬৩৬)

নিজাম শাহী রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার যে নীতি আকবর প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার সফল পরিণতি ঘটাইয়াছিলেন শাহ জাহান। অতঃপর দাক্ষিণাত্যের অপর দুইটি সুলতানী রাজ্য—বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা—মুঘল রাজ্যবিস্তার নীতির লক্ষ্যে পরিণত হইল। একটি অতিরিক্ত সমস্যা ছিল শাহজীর নেতৃত্বাধীন মারাঠাদের দমন করা। দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক এবং সামরিক ব্যাপারে শাহজীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে ঘটনাস্থলে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিয়া মুঘল তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করিতে শাহ জাহান দাক্ষিণাত্যে আসিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দুইটি : বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার দুই সুলতানকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করাইয়া আনুগত্যের চিহ্ন হিসাবে কর দিতে, এবং পুতুল নিজাম শাহী সুলতানের নামে কার্যরত মারাঠাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করা। গোল-কুণ্ডার আবদুল্লা কুতবশাহ বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করিলেন (১৬৩৬)। ইহা যে কোন রাজার পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর কাজ। তিনি বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা কর দিতে, শাহ জাহানের সার্বভৌমিকতা স্বীকার করিতে সম্রাটের নামে খুৎবা পাঠ করিতে, এবং বিজাপুরের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনীর অভিযানে সাহায্য করিতে রাজী হইলেন। যদিও সুলতান ছিলেন শিয়া, তাঁহাকে খুৎবা হইতে শিয়া ধর্ম সমর্থক অংশ বাদ দিতে হইল।

বিজাপুরের সুলতান এত সহজে আত্মসমর্পণ করিলেন না। তিন দিক হইতে তিনটি মুঘল বাহিনী তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিল। সামরিক তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর লুটপাট চলিল। মুঘল সৈন্যবাহিনী 'সকলবৃক্ষ ধ্বংস করিল, গৃহগুলি পোড়াইয়া ফেলিল, গবাদি পশু বিতাড়িত করিল, গ্রামবাসীদের হত্যা করিল অথবা ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিবার জন্য তাহাদিগকে ধরিয়া লইল।" আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য প্রতিরোধ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। সুলতানকে সন্ধি করিতে হইল (১৬৩৬)। তিনি মুঘল সার্বভৌমিকতা স্বীকার করিলেন এবং ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিলেন; কিন্তু কোন বার্ষিক কর দিবার সর্ত রহিল না। পৈতৃক রাজ্য অধিকারে রাখা ছাড়াও তিনি পুনা জেলা এবং উত্তর কোঙ্কন সহ পুরাতন আহম্মদনগর রাজ্যের একটি অংশ পাইলেন। এই অঞ্চলের বার্ষিকরাজস্ব ছিল ৮০ লক্ষ টাকা। আরও দুইটি শর্ত রহিল। মুঘল সম্রাজ্যের প্রতি অনুগত গোলকুণ্ডা রাজ্য তিনি আর আক্রমণ করিবেন না। উপরন্তু, যতদিন শাহজী তাঁহার দখলীকৃত নিজাম শাহী দুর্গগুলি সমর্পণ না করিবেন ততদিন তিনি তাঁহাকে কোন পদে নিয়োগ করিবেন না এবং আশ্রয় দিবেন না।

এই ব্যবস্থার পরে শাহজাহান উত্তর ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু মুঘল বাহিনী শাহজীর বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রাখিল। মুঘল এবং বিজাপুরীদের প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হইয়া শাহজী বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনি পুতুল নিজামশাহ, এবং মারাঠা দখলীকৃত নিজাম শাহী দুর্গ এবং অঞ্চল ছাড়িয়া দিলেন। তারপর তিনি বিজাপুরের সুলতানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন এবং পুনা জেলায় একটি জায়গীর পাইলেন।

'এইভাবে চল্লিশ বৎসর সংঘর্ষের পর (১৫৯৫-১৬৩৬) দাক্ষিণাত্যে সমস্যার সমাধান হইল। সম্রাটের মর্যাদা সুনিশ্চিত হইল এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলির উপর তাঁহার সার্বভৌম অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হইল।'

মুঘলদের দিক হইতে ১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দের অভিযানগুলি চমৎকার সুফল আনিল। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা বশ্যতা স্বীকার করিল এবং মারাঠা প্রতিরোধ কার্যতঃ ব্যর্থ হইল। ইহা ছাড়া প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগৃহীত হইল। আহম্মদনগর রাজ্যের যে অংশগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত অন্তর্ভুক্ত হইল তাহাদের বার্ষিক রাজস্ব ছিল এককোটি।

দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেব

১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে মুঘলশাসনাধীন অঞ্চলে চারিটি 'সুবা'তে ভাগ করা হইল: (১) খান্দেশ (বুরহানপুরে রাজধানী এবং আসিরগড়ে দুর্গ সহ); (২) বেরার (ইলিচ পুরে রাজধানী সহ); (৩) তেলেঙ্গানা (নন্দোর রাজধানী সহ) (৪) আহম্মদনগর। দক্ষিণাত্যে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে এই চারিটি 'সুবা'র

ভার শাহজাহান আওরঙ্গজেবের উপর দিলেন। তাঁহার মূল কেন্দ্র হইল খড়কীতে। ইহার নূতন নাম করা হইল আওরঙ্গাবাদ। ইহা দৌলতাবাদ হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, এই বিরাট অঞ্চলে ৬৪টি দুর্গ ছিল এবং রাজস্ব ছিল ৫ কোটি।

আওরঙ্গজেবের প্রথম প্রতিনিধিত্বের কাল ছিল আট বৎসর (১৬৩৬-৪৪)। এই সময়ে তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিযানের ফল ছিল মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মধ্যে পর্বতাঞ্চলে বাগলানা নামে একটি ছোট রাজ্য জয় (১৬৩৮)।

কয়েক বৎসর গুজরাটে শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করিয়া এবং বল্‌খ ও কান্দাহারে অভিযানে অংশ লইয়া আওরঙ্গজেব পুনরায় রাজপ্রতিনিধি হিসাবে দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসিলেন ১৬৫৩ খ্রীস্টাব্দে। তাঁহার এই দ্বিতীয় কার্যকাল চলে ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। রাজনৈতিক দিক হইতে মুঘল অধিকৃত দাক্ষিণাত্য কয়েক বৎসর শান্তিপূর্ণ রহিল, কিন্তু শাসন-ব্যবস্থায় অরাজকতা দেখা গেল প্রধানতঃ অর্থবিভাগের অব্যবস্থার জন্য।

১৬৩০-৩২ খ্রীস্টাব্দে একটি মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দাক্ষিণাত্য এবং গুজরাট বিধ্বস্ত করিল। শাহ জাহানের শাসনকালের সরকারী ইতিহাস লেখক আবদুল হামিদ লাহোরী লিখিয়াছেন : 'একটি পাতরুটির জন্য জীবনব্যাপী দাসত্ব স্বীকারের প্রস্তাব করা হইত, কিন্তু কিনিবার কেহ ছিল না ; এক টুকরা পিষ্টকের জন্য মান মর্যাদা বিক্রীত হইত, কিন্তু কেহ তাহা গ্রাহ্য করিত না···যে সকল জমি উর্বরতা এবং প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল তাহাদের উর্বরতার আর কোন চিহ্ন ছিল না।' দুর্ভিক্ষের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল সামরিক অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লুটতরাজ। সতর্ক এবং প্রজাহিতৈষী শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা এই ক্ষতি দূর করার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ফলে চাষবাস কমিয়া যায় এবং কেন্দ্রীয় রাজস্বের সামান্য অংশও সংগ্রহ করা যায় নাই। আয় কমিয়া যাইবার ফলে জায়গীরদারগণ তাঁহাদের দায়িত্বপালনে অক্ষম হন। তবুও একটি বিরাট সামরিক বাহিনী পোষণ করিতে হয়, কারণ বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা তখনও সম্পূর্ণ জয় করা যায় নাই। বাদশাহী কোষাগার হইতে সাহায্যের জন্য রাজ-প্রতিনিধির অনুরোধে শাহ জাহানের দিক হইতে কোনরূপ সহানুভূতিপূর্ণ উত্তর পাওয়া গেল না। তাঁহার প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার পরামর্শে তিনি সাধারণভাবে আরঙ্গজেবের কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব গ্রহণ করিতেন।

এই সঙ্কটে আওরঙ্গজেব সৌভাগ্যবশতঃ মুর্শিদকুলি খাঁ নামক একজন অতি যোগ্য রাজস্ব সম্পর্কিত কর্মচারীর সাহায্য লাভ করেন। তিনি পারস্য হইতে আসিয়া দাক্ষিণাত্যে মুঘল সরকারের রাজস্ব বিভাগে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং আনুগত্য ও দক্ষতার দ্বারা দাক্ষিণাত্যের 'দেওয়ান' পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অরাজক অবস্থাকে সুশৃঙ্খল করেন এবং অস্থায়ীভাবে রাজস্ব নির্ধারণের রীতির

যথা সম্ভব পরিবর্তন করিয়া তোড়র মলের জমি পরিমাণ ও রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। যে সকল অঞ্চলে এই প্রথা প্রবর্তন করা সম্ভব নহে সেখানে তিনি পুরাতন ব্যবস্থাকে (যেমন, প্রত্যেক কর্ষিত ক্ষেত্রের জন্য একটি থোক অর্থ নির্দিষ্ট করা অথবা শস্য কৃষক ও সরকারের মধ্যে ভাগ করা) নিয়মিত ভাবে গ্রহণ করেন। উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কৃষকদিগকে ঋণ দেওয়া হয়। পরিত্যক্ত গ্রামগুলিতে লোকজনদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দাক্ষিণাত্যে মুর্শিদকুলি খাঁর কাজ মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

গোলকুণ্ডার সহিত যুদ্ধ (১৫৫৬)

দাক্ষিণাত্যে শান্ত শাসকের ভূমিকাতে আওরঙ্গজেব সন্তুষ্ট হইতে চাহেন নাই। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার প্রতি আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। মুঘল নীতির সাধারণ পরিণতি ছিল এই দুইটি সুলতানী রাজ্যের পতন; আওরঙ্গজেবের পরিকল্পনায় কোন নূতনত্ব ছিল না। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার এবং তাঁহার সমর্থকদের জন্য এই সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির সঞ্চিত ধনরত্ন এবং অন্যান্য সম্পদ লাভ করা। গোলকুণ্ডা কেবলমাত্র কৃষিজ সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিল না; ইহা ছিল বিশ্বের হীরা ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র বিজাপুর রাজ্য আরবসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ছিল। এই দুই সুলতান শিয়া ছিলেন। শিয়া মত আওরঙ্গজেব এবং শাহ জাহান, উভয়েরই সুন্নী গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ছিল।

কর্মদক্ষ এবং কৌশলী আরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণের জন্য তিনটি নির্দিষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাইলেন। ১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে সুলতান সম্রাটকে বার্ষিক কর দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। মুঘল সরকারের হিসাবরক্ষকদের হিসাব মত সুলতানের দেয় অর্থ বাকি ছিল। রাজনৈতিক দিক হইতে সুলতান কর্ণাটক (কৃষ্ণা নদীর পার্শ্ববর্তী) অঞ্চলে রাজ্য জয় করিয়া মুঘল সরকারকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। মুঘলদের যুক্তি ছিল এই যে কোন করদ রাজা সম্রাটের অনুমতি ছাড়া নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন না। এই সকল বিষয় ছাড়া সঙ্কটের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সুলতানের শক্তিশালী মন্ত্রী মীর জুমলার প্রতি তাঁহার ব্যবহার।

মীর মহম্মদ সৈয়দের জন্ম হইয়াছিল পারস্য দেশে। তিনি এক রত্ন ব্যবসায়ীর ভৃত্যরূপে গোলকুণ্ডায় আসেন এবং প্রভুর মৃত্যুতে তাঁহার সম্পত্তি লাভ করিয়া নিজেই একজন ধনী ব্যবসায়ী হন। বলা হয় যে তিনি ২০ মণ হীরা লাভ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, তিনি ছিলেন বিরাট ধনী। হীরার ব্যবসায়ে সাফল্য রাজনীতিতে সাফল্যের পথ প্রস্তুত করে। গোলকুণ্ডার সুলতান তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং 'মীর জুমলা' উপাধি দেন। যে মর্যাদা নামেমাত্র সুলতানের

তুলনায় নীচু ছিল তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী নিজস্ব একটি বিশাল বাহিনী সংগঠিত করেন। এই বাহিনীর অন্তর্গত গোলন্দাজ দল বিশেষ শক্তিশালী ছিল। ইহার সাহায্যে মীর জুমলা কর্ণাটকে নিজস্ব একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তোলেন। এইভাবে গোলকুণ্ডার দুর্বল সুলতানের রাজ্যের মধ্যে এক অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী প্রজা নিজস্ব একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। সুলতান এবং মন্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া উঠিল। সুলতান তাঁহাকে ধ্বংস করিতে চান, এই সন্দেহে মীর জুমলা বিজাপুর, পারস্য এবং আওরঙ্গজেবের সহিত ষড়যন্ত্র করিলেন। অবাধ্য ব্যবহারের অভিযোগে তাঁহার পুত্রকে সুলতান বন্দী করিলেন (১৬৫৫)।

আওরঙ্গজেব শাহ্ জাহানকে সকল ঘটনা জানাইলেন এবং গোলকুণ্ডা আক্রমণের জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট সুলতানকে লিখিত এক পত্রে মীর জুমলার পরিবারকে মুক্তি দিতে নির্দেশ দিলেন। একই সঙ্গে তিনি আওরঙ্গজেবকে অস্ত্রধারণের ক্ষমতা দিলেন—যদি সুলতান তাঁহার নির্দেশ অমান্য করেন। সুলতানকে সম্রাটের পত্র বিবেচনার কোন সুযোগ না দিয়া আওরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিলেন। ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিবার জন্য তিনি তাঁহার পুত্র মহম্মদ সুলতানকে নির্দেশ দিলেন, গোলন্দাজ বাহিনী দ্বারা সুলতানের প্রাসাদ ঘিরিয়া ফেলিতে হইবে, এবং যদি সম্ভব হয় তবে তাঁহার 'মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন' করিতে হইতে। যে ঘটনা ঘটিল তাহা ছিল প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ, শাহ জাহানের নীতির প্রয়োগ নহে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল কুতব শাহী রাজবংশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ।

আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত নির্দেশে গোলকুণ্ডার অবরোধ শুরু হইল (১৬৫৬)। শাহ জাহানের সহিত চিঠিপত্রে তিনি গোলকুণ্ডা রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন জানাইলেন, কারণ এই ধরণের স্বর্ণপ্রসূ রাজ্যের সমতুল আর কোন রাজ্য সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল না। কিন্তু বাদশাহী দরবারে সুলতানের প্রতিনিধি দারা এবং জাহানারার (সম্রাটের প্রিয় জ্যেষ্ঠা কন্যা) সমর্থন লাভ করিলেন। তাঁহারা গোলকুণ্ডার অবরোধ তুলিয়া লইবার এবং ঐ রাজ্য হইতে মুঘল সৈন্য বাহিনী সরাইয়া লইবার আদেশ জারি করিতে সম্রাটকে প্ররোচিত করিলেন। আওরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। তিনি অবরোধ তুলিয়া লইলেন এবং শান্তি স্থাপন করিলেন (১৬৫৬)। সুলতান প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিলেন এবং একটি জেলা ছাড়িয়া দিলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ সুলতানের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইল। এই অভিযানে আওরঙ্গজেবের প্রধান সহযোগী মীর জুমলা মুঘল রাজকার্যে যোগদান করিলেন এবং সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ (১৬৫৭)

গোলকুণ্ডার পরে আওরঙ্গজেবের আক্রমণাত্মক নীতির লক্ষ্য হইল বিজাপুর।

মহম্মদ আদিল শাহের শাসনকালে (১৬২৬-৫৬) বিজাপুরে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। তিনি ছিলেন যোগ্য শাসক। তিনি ভালভাবে শাসন করিতেন এবং মুঘল সরকারের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় আলি আদিল শাহ্। এই পরিবর্তনে আভ্যন্তরীণ অশান্তি দেখা দিল। নিজ উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব এই সুযোগ কাজে লাগাইতে চাহিলেন। তিনি শাহ জাহানকে মিথ্যা সংবাদ দিলেন, যুবক সুলতান তাঁহার পূর্ববর্তী সুলতানের পুত্র নহেন, তাঁহার জন্ম পরিচয় অজ্ঞাত। শাহ জাহান আওরঙ্গজেবকে ক্ষমতা দিলেন: 'তিনি যাহা উপযুক্ত মনে করেন সেই ভাবেই বিজাপুরের ব্যাপার মীমাংসা করিবেন।' এই নির্দেশে একটি সম্পূর্ণ অন্যায় যুদ্ধের অনুমোদন করা হইয়াছিল। 'বিজাপুর একটি অধীন করদ রাজ্য ছিল না; ইহা ছিল মুঘল সম্রাটের একটি স্বাধীন এবং সমমর্যাদাভুক্ত মিত্র রাজ্য। বিজাপুরের উত্তবাধিকার অস্বীকার বা ঐ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিবার আইনসঙ্গত অধিকার মুঘল সম্রাটের ছিল না।' মুঘল হস্তক্ষেপের প্রকৃত কারণ ছিল যুবক সুলতানের অসহায় অবস্থা এবং তাঁহার কর্মচারীদের মধ্যে বিরোধ। এই অবস্থা বিজাপুর রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার একটি সুবর্ণ সুযোগ দিয়াছিল। আওরঙ্গজেব এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গোলকুণ্ডার মত বিজাপুরের ক্ষেত্রেও মীর জুমলা ছিলেন আওরঙ্গজেবের প্রধান সহকারী। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিদর এবং কল্যাণী মুঘল আক্রমণের ফলে আত্মসমর্পণ করে এবং বিজাপুর রাজ্যের কিছু অংশ নিষ্ঠুর ভাবে ধ্বংস করা হয়। সরাসরি বিজাপুর আক্রমণের পথ উন্মুক্ত হয়। এই অবস্থায় শাহ জাহান হস্তক্ষেপ করেন। বাদশাহী দরবারে আদিল শাহী প্রতিনিধি দারার মাধ্যমে এই হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করেন। দারা দাক্ষিণাত্যে তাঁহার ভ্রাতার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। সম্রাটের আদেশে আওরঙ্গজেবকে শান্তি স্থাপন করিতে হইল। সুলতান বিদর, কল্যাণী এবং পারেন্দা ছাড়িয়া দিতে এবং এক কোটি টাকা সুদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই শাহ জাহান অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং একটি উত্তরাধিকার যুদ্ধের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় বিজাপুরীরা পারেন্দা ছাড়িতে অস্বীকার করে।

বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা ১৬৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দের সঙ্কট কাটাইয়া উঠিল। আওরঙ্গজেবের আক্রমণকে বাধা দিতে এই দুই সুলতানী রাজ্যের সামর্থ্য ইহার কারণ নয়। ইহার কারণ ছিল মুঘল বাদশাহী দরবারের নীতি। আওরঙ্গজেব সম্পর্কে দারার ঈর্ষা দ্বারা ঐ নীতি প্রভাবিত হইয়াছিল। সম্রাট সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের পর উত্তর ভারতের সমস্যা লইয়া আওরঙ্গজেব দীর্ঘকাল ব্যপ্ত ছিলেন। ফলে এই দুই সুলতানী রাজ্য আরও তিন দশক টিঁকিয়া থাকিবার সুযোগ পায়, কিন্তু তাহাদের

রাজনৈতিক গুরুত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে প্রকৃত শক্তি ছিল নবজাগ্রত মারাঠা জাতি।

মধ্য এশিয়া : বদখ্‌শান এবং বল্‌খ (১৬৪৬-৪৭)

মধ্য এশিয়া ছিল মুঘলদের পৈতৃক বাসভূমি এবং কয়েক প্রজন্ম ধরিয়া ইহার স্মৃতি তাহাদের নূতন ভারতীয় বাসভূমিকে তাহাদের মনে জাগ্রত ছিল। তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দ সম্বন্ধে বাবর, এমন কি হুমায়ুনের কিছু দুর্বলতা ছিল। আকবর এবং জাহাঙ্গীর ভারতীয় সমস্যা লইয়া এত বেশী জড়িত ছিলেন যে তাঁহারা মূল মধ্য এশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নাই এবং কান্দাহারেই তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইয়াছিল। শাহ জাহানও যথেষ্ট ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি বদখ্‌শানের পার্বত্য অঞ্চল এবং হিন্দু কুশ ও অক্ষু নদীর মধ্যবর্তী সুদূর বল্‌খ প্রদেশ জয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাদশাহী দরবারের ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরী বলিয়াছেন যে বাবর তাঁহার পূর্ব পুরুষদের নিকট হইতে এই অঞ্চলগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পান এবং সমরকন্দে যাইবার পথেই ছিল ইহাদের অবস্থিত।

উজবেগদের একর দলপতি নজর মহম্মদ ১৬২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দে কাবুলে অভিযান চালাইয়া শাহ জাহানকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ১৬৪৫-৪৬ খ্রীস্টাব্দে উজবেগদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ নজর মহম্মদকে মুঘল সাহায্য নিতে বাধ্য করিল। ৫০,০০০ অশ্বারোহী এবং ১০,০০০ পদাতিক বাহিনী সহ শাহ জাহান তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদকে মধ্য এশিয়ায় মুঘল পতাকা উড়াইবার জন্য পাঠাইলেন। তিনি বদখ্‌শান এবং বল্‌খ অধিকার করিলেন (১৬৪৬)। কিন্তু বিজিত অঞ্চলের উপর মুঘল আধিপত্য সুসংহত করিবার পরিবর্তে আমোদ প্রিয় বাদশাহ পুত্র মধ্য এশিয়ার অসুবিধাজনক আবহাওয়া এড়াইবার জন্য ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। শাহ জাহান মধ্য এশিয়ায় দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার লাভের জন্য মুরাদের পরিবর্তে আওরঙ্গজেবকে পাঠাইলেন (১৬৪৭)। উজবেগ সৈন্যরা সংখ্যায় ছিল বেশী এবং তাহাদের বিশিষ্ট যুদ্ধরীতি ('Cossack tactics') মুঘলদের শক্তিক্ষয় করিল। আওরঙ্গজেব জয়লাভের অদম্য বাসনা প্রকাশ করিলেন এবং বহু বাধা-বিপত্তি স্বত্বেও অটুট থাকিয়া যুদ্ধ করিলেন। তিনি একটি সরাসরি যুদ্ধে উজবেগদের পরাজিত করিলেন, কিন্তু কোন প্রকৃত চূড়ান্ত ফল লাভ করা গেল না। ইতিমধ্যে নজর মহম্মদ মুঘলদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পারস্যে পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

সামরিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল। মধ্য এশিয়ার কঠোর আবহাওয়া আমোদপ্রিয় মুসলমান অভিজাতদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদিগকে 'মসলিনের ঘাঘরা পরা পাণ্ডুর পুরুষ' ('pale persons in muslin petticoats') রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মুঘলদের পক্ষে তখন শান্তির প্রয়োজন

ছিল। নজর মহম্মদ তাঁহার পৌত্রদের মাধ্যমে নামে মাত্র শাহ জাহানের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। বল্‌খ তাহাদের হস্তে দেওয়া হইল (১৬৪৭)।

এই অভিযানটি ছিল একটি বিশেষ ক্ষতিকর ব্যর্থতা। 'এক ইঞ্চি জমিও দখল করা যায় নাই, স্থানীয় রাজবংশের কোন পরিবর্তন হয় নাই, এবং বল্‌খের সিংহাসনে শত্রুর পরিবর্তে মিত্রকে বসানো যায় নাই।' দুই বৎসরে চার কোটি টাকা ব্যয় হয়; বিজিত অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ২২½ লক্ষ টাকা। এই ধরনের অভিযান শুরু করিবার কোন বাস্তব যুক্তি ছিল না, কারণ যদি বদখ্‌-শান এবং বল্‌খ জয় করিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইত তথাপি ঐ অঞ্চল হইতে কোন মূল্যবান লুণ্ঠিত দ্রব্য, কোন উর্বর জায়গীর, কোন বাসযোগ্য সুন্দর গৃহ সরবরাহ পাওয়া যাইত না। ইহা ছিল শাহ জাহানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ব্যর্থ স্বপ্ন। সাম্রাজ্যের সম্পদে এবং সভাসদদের চাটুকারিতায় শাহ জাহানের মতিভ্রম ঘটিয়াছিল।

পারস্য : কান্দাহার (১৬৪৮-৫৩)

১৬২২ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের সৈন্যবাহিনী কান্দাহার দখল করে। ইহার উদ্ধারের জন্য জাহাঙ্গীর একটি অভিযান পাঠাইতে পারেন নাই। শাহ জাহানের শাসনকালে কান্দাহারের ভারপ্রাপ্ত পারস্য সরকারের জনৈক অসন্তুষ্ট কর্মচারী আলি মর্দান খাঁ বিনা যুদ্ধে দুর্গটি মুঘলদের হাতে সমর্পণ করেন (১৬৩৯)। তিনি মুঘল রাজকার্যে যোগ দিয়া উচ্চ পদ লাভ করেন। কান্দাহার ও তাহার নিকটবর্তী স্থানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য এবং সখদ্রব্যাদি গোলাবারুদ সরবরাহ করিবার জন্য শাহ জাহান প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

মধ্য এশিয়ায় মুঘল অভিযান ব্যর্থ হইবার পর কান্দাহার উদ্ধারের জন্য পারস্যের সুযোগ উপস্থিত হয়। এই ব্যর্থতা মুঘল সৈন্যবাহিনীর সামরিক খ্যাতি নষ্ট করিয়াছিল। ১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে পারস্যরাজ দ্বিতীয় শাহ আব্বাস কান্দাহার অবরোধ করেন। শাহ জাহান আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন এবং তাঁহাকে কান্দাহারের পথে অগ্রসর হইবার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি কান্দাহারে পৌঁছিবার পূর্বেই দুর্গটি পারস্যরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

মুঘল সাম্রাজ্যের উজীর সাদুল্লা খাঁর সহিত ৫০,০০০ সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব লইয়া আওরঙ্গজেব কান্দাহারে উপস্থিত হন এবং দুর্গটি অবরোধ করেন (১৬৪৯)। মুঘলদের সংগঠন ছিল ত্রুটিপূর্ণ, সরবরাহ এবং অস্ত্রশস্ত্র ছিল অপ্রচুর। দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য আবশ্যকীয় কামানেরও অভাব ছিল। কান্দাহার হইতে কিছু দূরে শাহ মীরের যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেও মুঘল বাহিনীকে কয়েক মাস পরে অবরোধ তুলিয়া লইতে হয় (১৬৪৯)।

১৬৫২ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব এবং সাদুল্লা খাঁ পুনরায় কান্দাহার অবরোধ

করেন। ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দের ব্যর্থতা মুছিয়া ফেলিবার জন্য শাহ জাহান ব্যাপক প্রস্তুতি করিয়াছিলেন; একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীকে অবরোধের অস্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। কিন্তু পারস্যের গোলন্দাজ বাহিনী ছিল আরও শক্তিশালী। এই সময়ে গজনী আক্রমণের ভয় দেখাইয়া উজবেগরা নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক মাস পরে অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয় (১৬৫২)।

কান্দাহার দখলের উদ্দেশ্যে তৃতীয় এবং শেষ অভিযানের নেতৃত্ব দেন দারা (১৬৫৩)। তিনি কিছু প্রাথমিক সাফল্য লাভ করেন। তাঁহার কৃতিত্ব ছিল আওরঙ্গজেবের তুলনায় বেশী; কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র খাদ্য এবং সরবরাহ কম হওয়ায় এবং শীতের আগমনের ফলে অবরোধ পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হইল।

এই পরপর ব্যর্থতা মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইয়াছিল। প্রায় ১২ কোটি অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। কান্দাহার পারস্যের অধিকারে রহিল। দুর্গের চারিপার্শ্বে কিছু অঞ্চলও পারস্যের অধিকারে রহিল। মুঘলদের সামরিক খ্যাতি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইল। 'ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনীর বারংবার পরাজয় চূড়ান্তভাবে পারস্যের সামরিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করিল।' সামরিক পরাজয়ের সহিত রাজনৈতিক সম্মানহানিও জড়িত ছিল। শাহ জাহানের শাসনের দুর্বলতা মধ্য এশিয়ায় এবং কান্দাহারে প্রকাশ পাইল। 'বহু বৎসর পরেও ভারতের পশ্চিম সীমান্তে কাল মেঘের মত দুলিতে থাকে পারসিক আতঙ্ক।'

ধর্মীয় নীতি

যদিও শাহ জাহানের মাতা ছিলেন রাজপুত এবং বাল্যকালে শাহ জাহান উদার-পন্থী আকবরের প্রিয় ছিলেন, তবুও ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি পিতামহের উদারতা উত্তরাধিকার সূত্রে পান নাই। তিনি ধর্মীয় কারণ খ্রীস্টান, হিন্দু এবং শিয়া মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেন। হুগলীর পর্তুগীজদের এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া সুলতানদের প্রতি তাঁহার নীতি কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বারা নির্ধারিত হয় নাই, ধর্মীয় নীতি দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিল। শিয়ারা উপলব্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে আকবর এবং জাহাঙ্গীরের আমলের সহনশীলতার যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদের পক্ষে বোঝা ছিল আরও প্রত্যক্ষ এবং ভারী। শাহ জাহান তীর্থ কর পুনঃপ্রবর্তন করেন, নূতন মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন, এবং আদেশ দেন যে বারাণসী এবং অন্যান্য অঞ্চলে নির্মীয়মাণ সকল মন্দির ধ্বংস করা হইবে। হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ করার ব্যাপারে সরকারী উৎসাহ দেওয়া হইল। অসহিষ্ণু পিতা নানাভাবে তাঁহার আরও অসহিষ্ণু পুত্র আওরঙ্গজেবের নীতির ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি আরও মূর্তিপূজা বিরোধী মনোভাব দেখাইতেন যদি ধর্ম সম্বন্ধে দারার উদারতা তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার না করিত;

'মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উৎকর্ষ'

শাহ জাহানের শাসনকালকে 'মুঘল রাজবংশ এবং সাম্রাজ্যের চরম উৎকর্ষ' ('Climax of the Mughal dynasty and empire') রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। তাঁহার শাসনকালে সম্রাটের কর্তৃত্ব কেহ সরাসরি অস্বীকার করে নাই এবং কোন বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে নাই। আহম্মদনগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুরের উপর বাদশাহী আধিপত্য স্থাপিত হইল। এগুলি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কৃতিত্ব। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে শাহ জাহানের রাজত্বকাল একটি স্বর্ণময় যুগ।

তবুও ভাঙ্গনের সুস্পষ্ট চিহ্ন শাহ জাহানের সময়েই দেখা গিয়াছিল। মধ্য এশিয়ায় ব্যর্থতা মুঘল বাহিনীর সম্মান হানি করে। কান্দাহার ছিল মুঘল সামরিক অযোগ্যতা এবং পারস্যের সামরিক দক্ষতার পরিচায়ক। ইহা সত্য যে ভারতের অভ্যন্তরে কান্দাহারের ব্যর্থতার ফল প্রত্যক্ষ ফল ছিল সামান্য; ইহার পরেও সৈন্যবাহিনীর শক্তি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী ছিল। কিন্তু কান্দাহারের শিক্ষা ছিল আশঙ্কাজনক; ইহা ভারতবর্ষে পারস্যের আক্রমণের সম্ভাবনা সূচিত করিয়াছিল। কয়েকজন ঐতিহাসিক মনে করেন যে সামরিক দক্ষতার অবনতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একমাত্র কারণ না হইলেও অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। এই মারাত্মক অবনতির লক্ষণ শাহ জাহানের শাসনকালেই প্রকাশ পায়। মুঘল অভিজাতেরা ছিলেন সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ; কিন্তু তাঁহারা ইতিমধ্যেই 'মসলিনের ঘাঘরা পরা পাণ্ডুর পুরুষে' পরিণত হইয়াছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে শাহ জাহানের অসহিষ্ণুতা সেইসব শক্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল যাহারা আওরঙ্গজেবের শাসনকালে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সংহতি বিনষ্ট করিয়াছিল।

শাসন-ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপের দিকে চলিতেছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব অটুট ছিল, কিন্তু প্রশাসনিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা দেখা গিয়াছিল। বার্ণিয়ে লক্ষ্য করেন যে জনগণ স্থানীয় শাসনকর্তাদের স্বৈরাচারী অত্যাচারে কষ্ট ভোগ করিতেছে। তিনি বলিয়াছেন, কৃষক এবং শিল্পীরা জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস হইতে বঞ্চিত। বাদশাহী দরবারের জাঁকজমক, বড় বড় শহরগুলির সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং একটানা সামরিক অভিযানের জন্য তাহাদের অর্থ যোগাইতে হয়। বার্ণিয়ের করুণ উক্তিতে কিছুটা সত্য ছিল: 'ধ্বংস ('ruin and devastation') সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল'। বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল সমৃদ্ধ, কিন্তু ইহার আয় ভোগ করিত একটি ছোট গোষ্ঠী।

শাহ জাহানের পুত্রগণ

শাহ জাহানের চারি পুত্রের মধ্যে দারা সিকো ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তিনি ছিলেন সম্রাটের প্রিয়, এবং উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহার মনোনীত। তিনি ছিলেন

মধ্য যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র। তিনি আকবরের উদার মনোভাব উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন, হিন্দু এবং খ্রীস্টান শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, এবং অথর্ব বেদ ও কয়েকটি উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদার মনোভাবের ফলে গোঁড়া সুন্নীদের তিনি অপ্রিয় হন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা আওরঙ্গজেব এই জন্যই তাঁহাকে ইসলাম ত্যাগ করার দায়ে অভিযুক্ত করিবার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন নাই; তিনি ইসলামের মূল নীতিগুলি অস্বীকার করেন নাই, তবে ইহার কয়েকটি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তিনি প্রথাগত শ্রদ্ধা দেখান নাই।

রাজনৈতিক ব্যাপারে দারার প্রতি শাহ জাহানের অনুরাগ প্রথমে সম্পদ বলিয়া গণ্য হইলেও পরিণামে তাহা একটি বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। তিনি ছিলেন মনোনীত উত্তরাধিকারী এবং চল্লিশ হাজারী মনসবদার। তিনি তাঁহার সহকারীদের মাধ্যমে তিনটি 'সুবা' (পাঞ্জাব, মূলতান এবং এলাহবাদ) শাসন করিতেন। তিনি ছিলেন সম্রাটের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। সম্রাটের শেষ জীবনে তাঁহার নীতির ক্ষেত্রে দারার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কিন্তু এই উচ্চ পদে থাকার ফলে তিনি রাজধানীতে বাস করিতেন, বিভিন্ন প্রদেশের শাসক রূপে সামরিক এবং বেসামরিক বিষয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের সুযোগ পান নাই। 'তিনি কখনও যুদ্ধ এবং প্রশাসনিক কার্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন নাই; বিপদ এবং অসুবিধার মধ্যে মানুষের আচরণ দেখিয়া তাহাকে বিচার করিতে শেখেন নাই; এবং যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীর সহিত তিনি যোগাযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।' উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় এই সকল ত্রুটি তাঁহাকে আওরঙ্গজেবের অসম প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত করিয়াছিল।

শাহ জাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজার বুদ্ধি এবং সামরিক গুণ ছিল; কিন্তু তিনি ছিলেন 'দুর্বল, অলস, কাজকর্মে অমনোযোগী, দীর্ঘকাল কোন কাজ করার পক্ষে অযোগ্য।' তাঁহার চরিত্রে সদাজাগ্রত সতর্কতার অভাব ছিল। রাজ্য শাসন এবং সৈন্য পরিচালনা প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল না। যখন উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয় তিনি তখন বাংলার সুবাদার ছিলেন। এই পদে তিনি দীর্ঘ ১৭ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শাহ জাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব সামরিক যোগ্যতা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং চরিত্রবলের দিক হইতে তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে যোগ্যতম ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে সাফল্য অর্জন করেন এবং বল্‌খে দৃঢ়তা দেখান; তিনি কান্দাহারে ব্যর্থ হন। শান্ত, সতর্ক, নিষ্ঠুর আওরঙ্গজেব ছিলেন 'মনের ভাব গোপন করিয়া প্রতিপক্ষকে পরাজিত করায় একজন সুনিপুণ ব্যক্তি।' ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন গোঁড়া এবং কঠোর সুন্নী। যে সকল অভিজাত এবং উলেমা দারার উদারতার

বিরোধী ছিলেন তাঁহাদিগকে নিজের পক্ষে আনিতে তিনি তাঁহার গোঁড়ামিকে রাজনৈতিক সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করেন। যখন উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ শুরু হয় তখন তিনি দাক্ষিণাত্যে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন।

ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মুরাদের ব্যক্তিগত সাহস ছিল ; কিন্তু তিনি ছিলেন নির্বোধ এবং আমোদপ্রিয়। সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সাম্রাজ্যের বোঝা বহন করিবার পক্ষে তিনি অনুপযুক্ত ছিলেন। যখন উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি ছিলেন গুজরাটের সুবাদার।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৬৫৭-৫৯)

মুঘল সিংহাসনে উত্তরাধিকার কোন স্বীকৃত আইন অথবা গৃহীত নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত না। হুমায়ুন এবং আকবর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু। শাহ জাহানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহরিয়ার। আবার জাহাঙ্গীর আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং শাহ জাহান জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এই দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তি করেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন : 'পিতার প্রতি শত্রুতার ফলে যে রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহার স্থায়িত্ব কতদূর হইতে পারে তাহা আমার জানা আছে।' নিজের অপরাধ সম্পর্কে ইহা এক অপরাধীর ইহা একটি অভূতপূর্ব উক্তি।

শাহ জাহানের শেষ জীবনে যে এই কুৎসিত পারিবারিক ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে তাহা অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাঁহার চারি পুত্র তাঁহার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—যাহাতে তাঁহারা সিংহাসনের জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করিতে পারেন। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাটের অসুস্থতার সুযোগে এই দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া গেল।

আগ্রাতে দারা শাহ জাহানকে অসুস্থ অবস্থায় দেখাশুনা করিতেন এবং তাঁহার নামে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি সিংহাসন অধিকারের জন্য অযথা তাড়াহুড়া করিলেন না, কিন্তু নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তিনি রাজনৈতিক এবং সামরিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিলেন। অসুস্থ অবস্থায় শাহ জাহান কয়েকজন প্রধান পরিষদ এবং কর্মচারীদের সম্মুখে দারাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করিলেন। প্রাসাদের বাহিরে গুজব রটিল যে সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে এবং দারা সিংহাসনে নিজের অধিকার সুসংহত করিবার উদ্দেশ্যে খবরটি চাপিয়া রাখিয়াছেন।

অন্যান্য ভ্রাতারা অপেক্ষা করিলেন না। গুজরাটের সুবাদার মুরাদ ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আহম্মদাবাদে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বাংলার সুবাদার সুজা রাজমহলে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং

১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া রাজধানীর পথে বারাণসীতে পোঁছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেব এই ধরনের কোন খোলাখুলি ব্যবস্থা নিলেন না। তিনি সাম্রাজ্য ভাগ করার জন্য মুরাদের সহিত একটি চুক্তি করিলেন এবং কৌশল ও দূরদৃষ্টির সহিত নিজের সামরিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করিলেন। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সুলতানদের সন্তুষ্ট করা হইল। ইয়োরোপীয় গোলন্দাজ সৈন্য সহ মীর জুমলার একটি ভাল গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। তাঁহার সহযোগিতা পাওয়া গেল। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নিজ নিজ ঘাঁটি হইতে শুরু করিয়া মুরাদ এবং আওরঙ্গজেব এপ্রিলে উজ্জয়িনীর নিকটে মিলিত হইলেন। চম্বলের উপনদী গম্ভীরার পশ্চিম পাড়ে ধর্মত (Dharmat) গ্রামে দুই সৈন্যবাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করিল।

ইতিমধ্যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি শাহ জাহান অসুস্থতা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ফলে ভ্রাতৃবিরোধ প্রভাবিত হইল না। প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ ঘটিল ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বারাণসীর সন্নিকটে বাহাদুরপুরে। দারার পুত্র সুলেমান সিকো এবং অম্বরের মীর্জা রাজা জয়সিংহের নেতৃত্বে দারার বাহিনী সুজাকে পরাজিত করিল। সুজা দ্রুতগতিতে বাংলার দিকে পশ্চাপসরণ করিলেন।

আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য মারবাড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ এবং কাসিম খাঁর নেতৃত্বে দারার অপর এক বাহিনী মধ্য ভারতের দিকে অগ্রসর হইল। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দুইটি বিরোধী সৈন্যবাহিনী ধর্মতে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। দারার সৈন্যবাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হইল। তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তাঁহার কয়েকজন সেনানায়ক আওরঙ্গজেবের সহিত গোপনে জোট বাঁধিয়া ছিলেন, এবং সেনাপতি হিসাবে যশোবন্ত সিংহ আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন না। এই যুদ্ধের ফলাফল ছিল চূড়ান্ত। আওরঙ্গজেব বহু সম্পদ এবং যুদ্ধসামগ্রী লাভ করিলেন। তাঁহার সামরিক খ্যাতি বৃদ্ধি পাইল। 'তাঁহার অনুগামীদের কাছে এবং সাধারণ জনগণের কাছে ধর্মতের যুদ্ধ ধর্মাত তাঁহার ভবিষ্যৎ সাফল্যের ইঙ্গিত দিল। দাক্ষিণাত্যের গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধের নায়ক এবং ধর্মতের যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী ভারতে অতুলনীয় সামরিক মর্যাদার অধিকারী হইয়া সিংহাসন লাভের পথে দ্রুত অগ্রসর হইলেন।

ধর্মত হইতে আওরঙ্গজেব আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। দারার অগ্রসররত বাহিনী রাজধানীর সন্নিকটে সামুগড়ে ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে মে মাসে পরাজিত হইল। এখানে দারা ছিলেন নিজেই তাঁহার সৈন্যবাহিনীর নেতা এবং তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫০,০০০। আওরঙ্গজেব চূড়ান্ত জয়লাভ করিলেন। দুইটি কারণে— সৈন্য পরিচালনায় তাঁহার অসামান্য যোগ্যতা এবং দারার সহযোগী এক প্রধান

আভিজাত্যের বিশ্বাসঘাতকতা। দারার সৈন্যবাহিনী কতকগুলি বিক্ষিপ্ত দলে বিভক্ত হইল; তাঁহার কয়েকজন প্রধান' সেনানায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার ঘাঁটি এবং কামানগুলি আওরঙ্গজেবের হস্তগত হইল। দারা আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন এবং অবর্ণনীয় বিধ্বস্ত অবস্থায় তিনি সেখানে পৌঁছিলেন।

উত্তরাধিকার যুদ্ধের মূল প্রশ্ন সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রহিল না। আওরঙ্গজেব আগ্রায় পৌঁছিলেন এবং ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে আগ্রা দুর্গের দখল নিলেন। শাহ জাহানকে কড়া পাহারায় রাখা হইল। একটি দরবারে আওরঙ্গজেব বাদশাহী শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের আনুগত্য লাভ করিলেন। তাহার পর তিনি দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথে মথুরাতে তিনি কৌশলে মুরাদকে বন্দী করিলেন। প্রথমে গোয়ালিয়রের কারাদুর্গে তাঁহাকে আটক করা হইল, পরে সেখানেই তাঁহাকে হত্যা করা হইল। (ডিসেম্বর ১৬৬১)। দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি নিজেকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং 'আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে দারা পাঞ্জাবে পলায়ন করিয়া আবাব যুদ্ধ করিবার জন্য লাহোরে প্রস্তুতি শুরু করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তাঁহার সম্মুখীন হইবার সামর্থ্য না থাকায় দারা সিন্ধুর মধ্য দিয়া গুজরাটে এবং পরে রাজস্থানের অন্তর্গত আজমীরে পলায়ন করিলেন। মারবাড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ দারার সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার কাছে দারা সাহায্যের আশা করিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব রাজাকে নিজদলে আনিলেন, আজমীরে আসিলেন এবং ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে দেওরাই-এর যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করিলেন। দারা গুজরাটের দিকে পশ্চাদপসরণ করিলেন, কিন্তু সেখানে আশ্রয় পাইলেন না। তখন তিনি বোলান গিরিপথের ৯ মাইল পূর্বে অবস্থিত দাদার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মালিক জীয়ন নামে এক বালুচির জীবন তিনি কয়েক বৎসর আগে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার কাছে সাহায্য লাভের আশায় তিনি দাদারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি দুর্ভাগ্যপীড়িত যুবরাজকে আওরঙ্গজেবের অনুচরদের নিকট সমর্পণ করিল। দিল্লীতে আনিবার পর ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। আওরঙ্গজেবের শাসনকালের সরকারী ইতিহাসে বলা হইয়াছে 'ধর্ম এবং পবিত্র আইন রক্ষার প্রয়োজনীয়তায়, এবং রাষ্ট্রের কারণে' ইহা করা হইয়াছিল। দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান সিকোকে ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে গাড়ওয়ালে তাহার আশ্রয় হইতে বন্দী করা হইল এবং ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে গোয়ালিয়র দুর্গে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইল।

সুজার শেষ জীবনও ছিল শোকাবহ। বাহাদুরপুরের যুদ্ধের পর তিনি তাঁহার অবস্থার উন্নতি করিতে উদ্যোগী হন, কিন্তু আওরঙ্গজেব খাজোয়ায় (ফতেপুর জেলা, উত্তরপ্রদেশ) যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করেন ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী

মাসে। তিনি বাংলায় পলায়ন করেন এবং সেখানে তিনি আওরঙ্গজেবের সুবাদার মীর জুমলার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যান। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে অল্প কয়েকজন অনুচরসহ তিনি আরাকানে চলিয়া যান। ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে সেখানে মগেরা তাঁহাকে হত্যা করে।

খাজোয়া এবং দেওরাই-এর যুদ্ধের পরে, ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে আওরঙ্গ-জেবের আনুষ্ঠানিক অভিষেক হয়। শাহ জাহানকে তাঁহার শেষ জীবন প্রহরী বেষ্টিত বন্দী হিসাবে আগ্রা দুর্গে কাটাইতে হইয়াছিল। বৃদ্ধ সম্রাট ধর্ম হইতে সান্ত্বনা লাভ করেন এবং অনিবার্য নিয়তিকে মানিয়া নেন। 'যে শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়ে তাঁহার মতই তিনি অবস্থা সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করিতেন না।' ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শাহ জাহানের চরিত্র

স্যার টমাস রো শাহজাহানকে তাঁহার যৌবনে (যখন তিনি খুরম নামে পরিচিত) দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন : 'আমি কখনও এইরকম স্থির মুখ দেখি নাই, এমন মানুষও আর দেখি নাই যিনি সর্বদা গাম্ভীর্য রক্ষা করেন, কখনও হাসেন না, অথবা মুখে অন্য মানুষ সম্পর্কে কোন শ্রদ্ধা বা সম্মান দেখান না, কিন্তু যাঁহার মুখে চূড়ান্ত গর্ব এবং সকলের প্রতি ঘৃণা প্রতিফলিত হয়।' এই গম্ভীর এবং গর্বিত রাজপুত্র এক নির্দয় এবং অত্যাচারী সম্রাটে পরিণত হন। তিনি বুন্দেলা রাজধানী ধ্বংস করেন, বিজাপুর রাজ্য বিধ্বস্ত করেন, এবং যোগ্যতর উত্তরাধিকারী আওরঙ্গজেবের অনুসৃত দেবমূর্তি ভাঙ্গার নীতির সূচনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার চরিত্রের কোমল দিক প্রকাশিত হইয়াছিল মমতাজ মহল দারা এবং জাহানারার প্রতি স্নেহে। তিন পুত্রের হত্যা এবং স্বামীর বন্দীদশা দেখার আগে মমতাজের মৃত্যু (১৬৩১) তাঁহাকে মর্মান্তিক আঘাত হইতে রক্ষা করিয়া-ছিল। তাঁহার প্রিয় স্বামী তাঁহাকে স্মরণীয় করিবার জন্য এমন এক ব্যবস্থা (তাজমহল নির্মাণ) করেন যাহা পৃথিবীর অন্য কোন নারীর ভাগ্যে ঘটে নাই। শিল্পের প্রতি অনুরাগে শাহ জাহান ভারতীয় রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতিনিধিত্ব করেন।

আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণ

শাহ জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মনোনীত উত্তরাধিকারী দারারই সিংহাসনে সর্বা-পেক্ষা জোরালো দাবি ছিল। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের জন্য কোন নির্দিষ্ট আইন বা প্রথা ছিল না। যুদ্ধ এবং প্রশাসন সম্পর্কে দারার অনভিজ্ঞতা ছিল তাঁহার বড় দুর্বলতা ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী ছিলেন শাহ জাহান। তিনি প্রিয় পুত্রকে রাজধানীতে নিজের পার্শ্বে রাখিতেন, সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করা

এবং প্রদেশ শাসন করার সুযোগ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতেন। দারার অপর দুর্বলতা ছিল ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহার উদারতা। অভিজাতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গোঁড়া সুন্নীরা এবং মুসলমান জনগণের বিরাট অংশ এই ব্যাপারে তাঁহার কঠোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে একমাত্র আওরঙ্গজেবই ভারতে ইসলামকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

সিংহাসনের জন্য যুদ্ধের পক্ষে সুজা এবং মুরাদ অযোগ্য ছিলেন। আওরঙ্গজেবের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দারা। তাঁহাকে তিনি নিজের রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি ও সামরিক দক্ষতা দ্বারা ধ্বংস করেন। কোন সন্দেহ নাই যে আওরঙ্গজেব ছিলেন শাহ জাহানের পুত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য এবং সিংহাসনের জন্য সর্বপেক্ষা উপযুক্ত প্রার্থী। সৈন্যদল সংগঠনে, অভিযান এবং কুটনীতি দ্বারা অনুগত সহযোগী সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁহার ভ্রাতারা কেহ তাঁহার সহিত তুলনীয় ছিলেন না। উপরন্তু, সকল সুন্নী তাঁহার গোঁড়ামির জন্য তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ইহা ছিল একটি বড় 'রাজনৈতিক সম্পদ।' একদিক হইতে বিচার করিলে বলা যায়, উত্তরাধিকার যুদ্ধটি ছিল ইসলামীয় গোঁড়ামি এবং ধর্মীয় উদারতার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব। ইসলামীয় গোঁড়ামির যে আন্দোলন আহম্মদ সিরহিন্দী আকবরের শাসনকালের শেষদিকে শুরু করেন তাহা আওরঙ্গজেবের সমর্থন লাভ করিয়া শক্তিশালী হইয়াছিল।

৩. আওরঙ্গজেব

শাসনকালের দুই ভাগ

মুহীউদ্দীন মহম্মদ আওরঙ্গজেবের জন্ম হয় ১৬১৮ খ্রীস্টাব্দে; তাঁহার দীর্ঘ শাসনকাল (১৬৫৮-১৭০৭) শুরু হয় ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে, কিন্তু তাহার আনুষ্ঠানিক অভিষেক হয় ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে। শাসনকালের প্রথম ভাগে, প্রায় ২৩ বৎসর (১৬৫৮-৮১), উত্তর ভারতের সমস্যাগুলির উপর তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এই সময় দক্ষিণের ঘটনাবলী শিবাজীর অধীনে মারাঠা শক্তির উত্থানের ঘটনাকে ঘিরিয়া কেন্দ্রীভূত হইতেছিল এবং সম্রাট সেনাপতিদের মাধ্যমে তাহার মোকাবিলা করিতেছিলেন। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণের সমস্যা এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছিল এবং স্বয়ং ইহার সম্মুখীন হইবার জন্য আওরঙ্গজেব উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর (১৬৮২-১৭০৭) মারাঠাদিগকে দমন করিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ইহার জন্য নিজেকে এবং সাম্রাজ্যকে নিঃশেষিত করেন। তিনি আর উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই; দক্ষিণেই তাঁহার মৃত্যু হয় ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে।

উত্তর-পূর্ব ভারত : কোচবিহার এবং আসাম

আওরঙ্গজেবের শাসনকালে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালিত হয় উত্তর-পূর্ব ভারতে দুইটি হিন্দু রাজ্য কোচবিহার এবং আসামের বিরুদ্ধে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলার উত্তরাঞ্চলের একটি অংশ এবং আসামের পশ্চিমাঞ্চলের একটি অংশ লইয়া গঠিত কোচবিহারের হিন্দু রাজ্য দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল। পূর্ব অংশ শাসক পরিবারের একটি শাখার অধীন ছিল। মুসলমান লেখকেরা ইহাকে কোচ হাজো বলিয়াছেন, বর্তমান আসামের গোয়ালপাড়া এবং কামরূপ জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে বাংলা হইতে প্রেরিত একটি মুঘল বাহিনী কোচ হাজো জয় করে; এই রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কোচ হাজোর পূর্ব সীমানা নির্ধারিত করিত বর নদী নামক একটি নদী। এই নদীর অপর পারে ছিল মধ্য এবং পূর্ব আসামের আহোম রাজ্য। আহোমরাজ স্নসেনফার (হিন্দুনাম প্রতাপসিংহ) রাজত্বকালে (১৬০৩-৪১) মুঘলদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম চলিয়াছিল। ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হয়। বর নদী মুঘল অধিকারের সীমারূপে নির্ধারিত হয়।

শাহ জাহানের পুত্রগণের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ উত্তর-পূর্ব ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় শূন্যতা সৃষ্টি করিল। বাংলার সুবাদার সুজা ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সৈন্যদলসহ উত্তর ভারতের দিকে যাত্রা করেন। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে আহোমগণ গৌহাটি দখল করে; মুঘল ফৌজদার ইতিমধ্যেই পলায়ন করিয়াছিলেন। আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহের শাসনকালে (১৬৪৮-৬৩) এই ঘটনা ঘটে।

মীর জুমলার অভিযান (১৬৬১-৬৩)

উত্তরাধিকার যুদ্ধ শেষ হইবার পর পূর্ব ভারতের উপর দিল্লীর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন আওরঙ্গজেব। দুইটি অঞ্চলে কঠোর সামরিক তৎপরতার প্রয়োজন ছিল। প্রথমতঃ, কোচ এবং আহোম রাজ্যে হস্তক্ষেপের বিশেষ আবশ্যক ছিল। দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী আরাকানের মগ দস্যুদের ঐ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করার প্রয়োজন ছিল। ইতিমধ্যেই তাহাদের লুটপাটের ফলে ব্যাপক অঞ্চল জনবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। 'তাহাদের আকস্মিক আক্রমণ, মারাত্মক নিষ্ঠুরতা, বীভৎস চেহারা, বর্বরোচিত আচরণ, ধর্ম ও জাতিভেদ প্রথার অভাব, এবং অপরিষ্কার প্রাণী আহার করিবার অভ্যাস—এই সকল কারণে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার সকল মানুষ তাহাদিগকে আতঙ্ক ও ঘৃণার চক্ষে দেখিত।'

মীর জুমলা বাংলার মধ্য দিয়া আরাকানে সুজার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হইল। এই আদেশ সহজে তিনি 'এই

প্রদেশের, বিশেষত আসাম এবং মগ (আরাকান) অঞ্চলের আইন অমান্যকারী জমিদারদের শাস্তি দিবেন।' তিনি শহর ও দুর্গ অবরোধের উদ্দেশ্যে গোলন্দাজ বাহিনী এবং নদীপ্লাবিত অঞ্চলে যাতায়াত ও যুদ্ধের জন্য রণতরীসহ এক বিরাট নৌবাহিনী লইয়া ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা হইতে যাত্রা করিলেন। উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া, তিনি বিনা বাধায় কোচবিহারের রাজধানী দখল করিলেন। ইহার পর তিনি পূর্ব আসামের জঙ্গল এবং নদীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন এবং ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে গৌহাটি পৌঁছিলেন। আরও পূর্বে অগ্রসর হইবার সময় তিনি ব্রহ্মপুত্র নদীতে আহোম নৌবাহিনী ধ্বংস করিলেন এবং আহোম রাজধানী বর্তমান শিব সাগর জেলার গড়গাঁওতে উপস্থিত হইলেন। জয়ধ্বজ সিংহ ইতিমধ্যেই শহর ত্যাগ করিয়াছিলেন। বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য আক্রমণকারীর হস্তগত হইল।

বর্ষাকালে মুঘল সৈন্যবাহিনী তাহাদের শিবিরে ফিরিয়া গেল ; কিন্তু তাহাদের বিশ্রাম অথবা শান্তি ছিল না। তাহারা জনবেষ্টিত ছোট ছোট দ্বীপের মত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বাস করিত। আহোমগণ তাহাদের সরবরাহ ব্যবস্থা ছিন্ন করিল এবং দিনরাত্রি তাহাদিগকে উত্যক্ত করিল। গড়গাঁওতে একটি আহোম আক্রমণ প্রতিহত করা হইল, কিন্তু আরও মারাত্মক শত্রু উপস্থিত হইল মারাত্মক একটি মড়কের রূপে।

বর্ষার পরে মীর জুমলা পুনরায় আক্রমণ শুরু করিলেন (১৬৬২)। কয়েকজন আহোম অভিজাতকে দলে টানা হইল এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনকে পূর্ব আসামে মুঘল রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু মীর জুমলা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। 'নামরূপের অজানা এবং ব্যাধিসঙ্কুল পাহাড়' অঞ্চলে জয়ধ্বজ সিংহ আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেদিকে অগ্রসর হইতে মুঘল সৈন্যদল অস্বীকার করিল। একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (১৬৬২)। আহোম রাজা তাঁহার এক কন্যা এবং কয়েকজন জামিনদারকে মুঘল রাজসভায় প্রেরণ করিতে, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে, ২০টি হস্তীর বার্ষিক কর হিসাবে দিতে, এবং হস্তীসমৃদ্ধ দারাঙের একটি অংশ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন।

মীর জুমলা ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন ; কিন্তু পথেই ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। মুঘলরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিল এবং ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাহাদের যুদ্ধের সুফল বজায় রহিল। পরে জয়ধ্বজ সিংহের উত্তরাধিকারী চক্রধ্বজ সিংহ (১৬৬৩-৭০) গৌহাটি অধিকার করিলেন এবং পশ্চিম দিকে মনাস নদী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তার করিলেন (১৬৬৭)। ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব এক বিরাট মুঘল সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে জয়পুরের রাম সিংহকে আসামে পাঠাইলেন। তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী অবস্থান (১৬৬৯-১৬৭৬) মুঘল বাহিনীর পক্ষে কোন সাফল্য আনিল না। ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে একজন অসন্তুষ্ট আহোম কর্মচারী গৌহাটি মুঘলদের হাতে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তুলিয়া দিল ; কিন্তু গদাধর সিংহ

(১৬৮৯-৯৬) শহরটি পুনরায় অধিকার করিলেন। আসামে মীর জুমলার সামরিক সাফল্য হইতে কোন স্থায়ী রাজনৈতিক ফল পাওয়া গেল না।

১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে, যখন মীর জুমলা আসামে ব্যস্ত ছিলেন তখন, কোচবিহারের রাজা তাঁহার রাজ্য হইতে মুঘল সৈন্যদের বিতাড়িত করিলেন। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি মীর জুমলার পরবর্তী বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং ক্ষতিপূরণ দিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এই রাজ্যকে দুর্বল করে, এবং ইহার সুযোগ লইয়া মুঘলরা রংপুরের (বাংলা দেশে) এবং আসামের অন্তর্গত কামরূপের কয়েকটি অংশ দখল করে।

ম্ম (১৬৬৬)

আসাম হইতে ফিরিবার পথে মীর জুমলার মৃত্যু হওয়ায় তিনি আরাকানের মগদিগকে শাস্তি দিতে পারেন নাই। বাংলার পরবর্তী সুবাদার শায়েস্তা খাঁ এই অসমাপ্ত কার্যের ভার নেন। তিনি ৩০০টি নৌকা নির্মাণ করিয়া একটি নূতন নৌবাহিনী গঠন করেন এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধবর্তী নৌপথে অবস্থিত সন্দীপ দ্বীপটি অধিকার করে। আরাকানের মগ রাজার অধিকারভুক্ত চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে একটি অভিযানকারী দল পাঠানো হয়। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামের দুর্গের পতন ঘটে। মগরা হাজার হাজার বাঙালী কৃষককে ধরিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছিল। তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইল। মগদের ক্রমাগত লুণ্ঠনের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ায় নিম্ন বঙ্গের জলসিক্ত অঞ্চলে চাষবাস বৃদ্ধি পাইল। চট্টগ্রামে একজন মুঘল ফৌজদার নিযুক্ত করা হইল।

উত্তর-পশ্চিম : পাঠান উপজাতিসমূহ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফ্রিদি, ইউসুফজাই এবং খট্টক প্রভৃতি পাঠান উপজাতি সমূহ ভারত এবং আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী উপত্যকা অঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে বাস করিত। তাহারা ছিল স্বাধীনতা প্রিয়, সাহসী এবং হিংস্র। কোন সুসংগঠিত সরকারও তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত না। আকবরের শাসনকালের শেষ দিকে এবং জাহাঙ্গীর ও শাহ জাহানের শাসনকালে মুঘল সরকার উপজাতীয় নেতাদের বৃত্তি দিয়া এবং তাহাদের লুটপাটের ব্যাপারে উদাসীন থাকিয়া মোটামুটি শান্তি রক্ষা করেন। মুঘল নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথে নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং নিম্নস্থ উপত্যকায় শান্তি বজায় রাখা।

১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে ইউসুফজাইগণ মারাত্মক বিদ্রোহ করে। এই উপজাতি সোয়াত এবং বাজৌর উপত্যকায় এবং পেশোয়ারের সমতল উত্তরাঞ্চলে বাস করিত। ভগু নামে ইহাদের একজন নেতা ইহাদের পুরাতন শাসকদের উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকারের এক দাবীদার এক ব্যক্তিকে মহম্মদ শাহ নামে

সিংহাসনে বসান, একটি সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করেন, সিন্ধু নদ পার হন, মুঘল অঞ্চলে লুটপাট করেন এবং কাবুল ও কাশ্মীরের সহিত দিল্লীর যোগাযোগ ছিন্ন করেন। এই বিদ্রোহ দমনের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একটি স্বাধীন রাজতন্ত্র স্থাপনে তাহাদের ব্যর্থ চেষ্টার পর ইউসুফজাইদের শান্ত রাখিতে কঠোর আঘাত কার্যকরী হয়। তাহাদের উপর সর্বদা নজর রাখিবার জন্য আওরঙ্গজেব যোধপুরের যশোবন্ত সিংহকে জামরুদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির ভার দেন।

১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে খাইবারের আফ্রিদিরা আকমল খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। আকমল খাঁ নিজেকে রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। অন্যান্য পাঠান উপজাতিদের তাঁহার পতাকার নীচে একত্রিত হইতে আমন্ত্রণ জানাইয়া তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কাবুলের মুঘল সুবাদার তাঁহাকে শাস্তি দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। আফ্রিদিগণ ১০,০০০ লোককে হত্যা করে, ২০,০০০ পুরুষ এবং নারীকে বন্দী করিয়া মধ্য এশিয়ায় বিক্রীর জন্য পাঠাইয়া দেয় এবং দুই কোটি টাকার বেশী অর্থ লুট করে। আকমল খাঁর খ্যাতি পার্বত্য অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীতে নূতন লোককে আকৃষ্ট করে।

খট্টকগণ পেশোয়ার, কোহাট এবং বান্নু জেলার অংশবিশেষে বাস করিত। তাহারা আফ্রিদিদের সহিত যোগদান করিল। তাহাদের নেতা খুস-হল খাঁ ছিলেন একাধারে যোদ্ধা এবং কবি। 'তিনি সীমান্ত অঞ্চলে জাতীয় বিরোধিতার প্রধান নেতা হইলেন। উপজাতিদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে তাঁহার তরবারি অপেক্ষা তাঁহার লেখনী কম কার্যকর হয় নাই। মুঘলদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন।' কান্দাহার হইতে আটক পর্যন্ত পাঠানদের অধ্যুষিত সমগ্র অঞ্চল এই আন্দোলনে প্রভাবিত হয়। নিজস্ব পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে যুদ্ধরত শক্তিশালী পার্বত্য জাতিগুলিকে দমন করা মুঘলদের পক্ষে একটি সামরিক সমস্যা ছিল।

১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সুজায়েত খাঁ নামে একজন সেনাপতি পাঠান। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে কাবুলের দিকে অগ্রসর হইবার সময় করপা গিরিপথে তিনি নিহত হন এবং তাঁহার হাজার হাজার অনুগামী প্রাণ হারায়। এই ব্যর্থতার পর মুঘল বাদশাহীর মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আওরঙ্গজেব স্বয়ং রাওয়ালপিণ্ডি এবং পেশোয়ারের মধ্যবর্তী হাসান আবদাল নামক স্থানে যান এবং দেড় বৎসর আক্রমণ পরিচালনা করেন। তিনি যে কেবলমাত্র একটি বিরাট সৈন্যদল এবং গোলন্দাজবাহিনী ব্যবহার করেন তাহা নহে; তিনি কূটনীতির সূক্ষ্ম অস্ত্রও প্রয়োগ করেন। প্রচুর উপহার এবং নানারকম সুবিধা দিয়া বহু গোষ্ঠীকে দলে আনা হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঘটিলেও অবস্থার এমন উন্নতি হয় যে ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দের শেষে সম্রাট দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। বহু বৎসর খুস-হল খাঁ খট্টক একটি বীরত্বপূর্ণ কিন্তু ব্যর্থ সংগ্রাম

চালাইয়া যান ; কিন্তু তাঁহার নিজের পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে মুঘলদের নিকট সমর্পণ করে।

পরবর্তী দুই দশক কাল আওরঙ্গজেব আফগানদের প্রতি একটি আপোষমূলক নীতি অনুসরণ করেন। তাঁহার পরিকল্পনা ছিল উপজাতি নেতাদের অর্থ সাহায্য দিয়া এবং এক গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লাগাইয়া তাহাদের শান্ত রাখা। এই নীতি খাইবার গিরিপথ উন্মুক্ত রাখে এবং মুঘল অঞ্চলকে উপজাতীয় লুণ্ঠনের হাত হইতে রক্ষা করে।

কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আওরঙ্গজেবের নীতির উপর আফগান যুদ্ধ বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যখন রাজপুত যুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি আফগান সৈন্য ব্যবহার করিতে পারেন নাই, কারণ তাহাদের আনুগত্যে পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, মুঘল সৈন্যবাহিনীর একটি শ্রেষ্ঠ অংশকে উত্তর-পশ্চিমে মোতায়েন রাখিতে হইয়াছিল। ইহা ১৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণে শিবাজীর যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য লাভের অন্যতম কারণ। তৃতীয়তঃ, আফগান যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ের জন্য কেন্দ্রীয় রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছিল।

ধর্মীয় নীতি : ইসলামীয় গোঁড়ামি

কোন মুসলমান শাসক আওরঙ্গজেবের তুলনায় বেশী ধার্মিক এবং ইসলাম-ভক্ত ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সতর্কভাবে সকল সুন্নী রীতিনীতি পালন করিতেন। সিংহাসনের জন্য যুদ্ধে নিজের দাবির সমর্থনে তিনি এই যুক্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন যে তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নী এবং দারা ছিলেন বিধর্মী—ইসলাম-বিরোধী রীতিনীতির সমর্থক। সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার পর (১৬৫৯) তিনি গোঁড়া ইসলামকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে, এবং মুসলমান প্রজাদের জীবন সুন্নী মতবাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ কবার জন্য, কয়েকটি নির্দেশ জারি করেন। তিনি মুদ্রাতে 'কলিমা' (ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি) ছাপিবার প্রথা বিলোপ করেন। আকবর নওরোজ প্রথা পালনের রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব তাহা নিষিদ্ধ করেন, কারণ ইহা জরথুস্ট্রীয় পঞ্জিকার সহিত যুক্ত ছিল। মদ্যপান, জুয়াখেলা প্রভৃতি হজরত মহম্মদ কর্তৃক নিষিদ্ধ প্রথা বন্ধ করার জন্য একজন 'মুহতাসিব' (নীতিরক্ষার জন্য পরিদর্শক) নিযুক্ত করা হয়। সকল পুরাতন মসজিদ সংস্কার করা হয় এবং তাহাদের দেখাশুনা করিবার জন্য নিয়মিত বেতনে কর্মচারী (ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাতিব) নিয়োগ করা হয়। শেষ জীবনে সম্রাট গোঁড়ামিতে আরও কঠোর হন। রাজদরবারে সঙ্গীত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়। দরবারে যে সকল প্রথা এবং উৎসবে হিন্দু ধর্মের কিছু প্রভাব ছিল সে সকল বিলুপ্ত করা হয়।

'কিন্তু মানুষের নৈতিক উন্নতি করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।'

সমগ্র জনগণের মনোভাবের বিরোধী হওয়ায় তিনি তাহার কঠোরতা হ্রাস করেন এবং পরে তাহা একেবারে তুলিয়া দেন। মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এই সব কুপ্রথা চলিতে থাকে। একবার সম্রাট নিজেই বলিয়াছিলেন যে 'সমগ্র হিন্দুস্থানে দুই জনের বেশী মানুষ পাওয়া যাইবে না যাহারা মদ্য পান করেন না। তাঁহারা হইলেন তিনি নিজে এবং প্রধান কাজী।'

আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামির জন্য প্রয়োজন ছিল উদারপন্থী মুসলমান, শিয়া এবং সুফীদের শাস্তি দেওয়া। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন শারমাদ। তিনি ছিলেন জন্মসূত্রে ইহুদী। তিনি সুফী রূপে খ্যাতিলাভ করেন। দারার সহিত তাঁহার কিছু যোগাযোগ ছিল। তিনি বিধর্মী—এই অজুহাতে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

ধর্মীয় নীতি : হিন্দু ধর্মের প্রতি অত্যাচার

আওরঙ্গজেব মুসলমান হিসাবে তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস এবং এক বিরাট দেশ —যেখানে জনগণের এক বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল অ-মুসলমান—সেখানকার শাসক হিসাবে তাঁহার কর্তব্য এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ইসলামে তাঁহার গভীর বিশ্বাস তাঁহাকে একটি সুন্নী রাষ্ট্রের শাসকের ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল। এই দিক হইতে তাঁহার কর্তব্য হইয়াছিল 'জিম্মি' শ্রেণীভুক্ত হিন্দুদিগকে দমন করা, যথাসম্ভব কঠোরভাবে তাহাদের সহিত ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা। এই পদ্ধতিতে 'দার-উল-হারব' (অ-মুসলমান দেশ) ক্রমশঃ একটি 'দার-উল-ইসলামে' (ইসলামের দেশ) পরিণত হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার নীতির সম্ভাব্য পরিণতি। আকবরের ধর্মীয় উদারতা তাঁহার ছিল না।

হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে সম্রাটের জেহাদ বিভিন্ন পর্বে রূপ লাভ করে। তাঁহার শাসনকালের প্রথম বৎসরে তিনি বারাণসীর পুরোহিতদের জানান যে তাঁহার ধর্ম (ইসলাম) নূতন মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেয় না, কিন্তু পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসেরও প্রয়োজন নাই। কয়েক বৎসর পর উড়িষ্যার মুঘল কর্মচারীদের আদেশ দেওয়া হয়, বিগত দশ অথবা বার বৎসরে নির্মিত সকল মন্দির ধ্বংস করিতে হইবে এবং কোন পুরাতন মন্দির সংস্কারের অনুমোদন দেওয়া যাইবে না। ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে একটি সাধারণ আদেশ দেওয়া হয় : 'বিধর্মীদের সকল বিদ্যালয় এবং মন্দির ধ্বংস করিতে হইবে এবং তাহাদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং রীতিনীতি দমন করিতে হইবে।' যে সকল মন্দির ধ্বংস করা হয় তাহাদের মধ্যে ছিল কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির যাহা সারা ভারতের হিন্দুরা শ্রদ্ধা করিত—যেমন, সোমনাথের দ্বিতীয় মন্দির, বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির এবং মথুরার কেশব রায় মন্দির। মন্দির ধ্বংসের এই ব্যবস্থা ছিল আওরঙ্গজেবের পুরাতন রীতিরই অনুসরণ। বহু বৎসর পূর্বে, যখন

তিনি গুজরাটের সুবাদার ছিলেন তখন, তিনি পুরাতন ও নূতন বহু মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন।

১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে আকবর জিজিয়া কর বিলোপ করেন। ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাহা পুনঃপ্রবর্তন করেন। সরকারী ঐতিহাসিকের উক্তি অনুসারে ইহার উদ্দেশ্য ছিল 'ইসলামের বিস্তার করা এবং অবিশ্বাসী রীতিনীতি বন্ধ করা।' সম্রাটের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছিল। এই কর যে কেবলমাত্র সরকারী আয় বৃদ্ধি করিত তাহা নহে; কর এড়াইবার জন্য বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মানুচি বলিয়াছেন : 'বহু হিন্দু যাহারা এই কর দিতে অক্ষম তাহারা কর-সংগ্রাহকদের অপমানজনক আচরণের ভয়ে তাহা হইতে মুক্তির জন্য মুসলমান হইল। আওরঙ্গজেব আনন্দিত হইলেন'। শিবাজী এবং মেবারের রাণা রাজ সিংহ জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তনের প্রতিবাদ জানাইলেন।

হিন্দুদিগের উপর বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে মুসলমান ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শুল্ক কর ধার্য হয় শতকরা ২½ ভাগ এবং হিন্দু প্রতিযোগীদের ক্ষেত্রে তাহা হয় শতকরা ৫ ভাগ। ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে মুসলমান ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শুল্ক কর সম্পূর্ণ বিলোপ করা হয়, কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে পুরাতন হারেই ইহা বজায় থাকে। হিন্দুদের চাকুরীর সুযোগও কমিয়া গেল। ১৬৭১ খ্রীস্টাব্দে একটি নির্দেশ জারি করা হয় যে রাজকীয় জমির (খালিসা) রাজস্ব সংগ্রাহকদের পদে কেবলমাত্র মুসলমান নিযুক্ত হইবে। সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং তালুকদারদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাহাদের হিন্দু পেশকারদের এবং হিসাবরক্ষকদের কর্মচ্যুত করিতে এবং তাহাদের পরিবর্তে মুসলমানদের নিযুক্ত করিতে হইবে। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতদের বন্দীদশা হইতে মুক্তি, সরকারী কার্যে নিযুক্তি এবং বিতর্কিত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রভৃতি বহু সুবিধা দেওয়া হইত।

১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে রাজপুত ছাড়া সকল হিন্দুদের পালকী চড়া, হাতী অথবা ভালো জাতের ঘোড়ায় চড়া এবং অস্ত্রবহন করা নিষিদ্ধ হইল। যুদ্ধে রাজপুতদের সাহায্য দরকার, এজন্য তাহারা এই অপমানজনক নির্দেশের আওতা হইতে বাদ পড়িল। হিন্দুদের পবিত্র স্থানের নিকটে মেলা বসানো নিষিদ্ধ হইল। ইহা ছিল হিন্দু ধর্মীয় মনোভাবের প্রতি একটি আঘাত। যে সকল হিন্দু বণিক মেলায় দোকান বসাইত তাহাদের লাভের প্রতি ইহা ছিল একটি অর্থনৈতিক আঘাত। দেওয়ালী এবং হোলি উৎসব অনুষ্ঠানের অধিকার নানারকম নিষেধাজ্ঞা দ্বারা সঙ্কুচিত করা হইল।

জাঠ বিদ্রোহ

এই সকল অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা হিন্দুদের মধ্যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। ধর্মীয় গোঁড়ামির রাজনৈতিক ফলাফল সম্পর্কে আওরঙ্গজেব অন্ধ ছিলেন।

১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিলপতের জমিদার গোকলার নেতৃত্বে মথুরা অঞ্চলে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু বিদ্রোহ ঘটিল। বিদ্রোহীরা ছিল জাঠ কৃষক। মুঘল বাহিনী তাহাদের দমন করে। গোকলাকে বন্দী ও হত্যা করা হয় এবং তাহার পরিবারকে জোর করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়।

কয়েক বৎসর শান্তির পর ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে জাঠরা পুনরায় রাজারাম নামক এক জমিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। আগ্রার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাহারা লুটপাট চালায় এবং সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিভবন লুণ্ঠন করে। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে রাজারামকে হত্যা করা হয় এবং তাঁহার প্রধান ঘাঁটি ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে দখল করা হয়। তাঁহার দায়িত্ব পড়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চূড়ামনের হাতে। তিনি আওরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষ দিকে জাঠদের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন।

জাঠ বিদ্রোহ শুরু হয় ধর্মীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে। কয়েক-বার দমন করা হইলেও জাঠরা ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়। তাহাদের নেতারা ছিলেন জমিদার; তাঁহারা সশস্ত্র অনুগামীদের এক বিরাট দল গঠন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি জাঠ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

বুন্দেলা বিদ্রোহ

মধ্য ভারতের একটি রাজপুত গোষ্ঠী বুন্দেলারা শাহ জাহানের শাসনকালে জুঝর সিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের সময়ে তাহারা যোগ্য নেতা হিসাবে পায় ছত্রসালকে। তাঁহার পিতা চম্পৎ রায় ১৬৫৯-৬১ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং বন্দীদশা এড়াইতে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। যুবক ছত্রসাল কয়েক বৎসর মুঘলদের অধীনে চাকুরি করেন। তিনি শিবাজীর সংস্পর্শে আসেন এবং শিবাজী তাঁহাকে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করিতে পরামর্শ দেন। মন্দির ধ্বংস সম্বন্ধে আওরঙ্গজেবের নীতি বিদ্রোহের একটি সুযোগ উপস্থিত করিল। মুঘল অত্যাচারে অসন্তুষ্ট বুন্দেলারা হিন্দু ধর্মের রক্ষক এবং রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামের নেতা রূপে ছত্রসালকে অভিনন্দিত করিল। তিনি বহু বৎসর মধ্য ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সন্ধি করেন এবং তাঁহাকে ৪০০০ হাজারী মনসবদারী দেন। এই শান্তি অবশ্য ছিল স্বল্পস্থায়ী। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে ছত্রসাল মুঘল সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রাম পুনরায় শুরু করেন। তিনি মারাঠাদের মিত্র হন এবং ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে নিজের জন্য মালবে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে সফল হন।

সৎনামী বিদ্রোহ

বুন্দেলা বিদ্রোহ ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণের ফল। সৎনামী বিদ্রোহে ধর্ম এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক অসন্তোষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

সৎনামীগণ ফকিরদের মত বেশ ধারণ করিত, কিন্তু কৃষিজীবী এবং ছোট ব্যবসায়ীদের মত জীবনযাপন করিত। তাহাদের ঘাঁটি ছিল নারনোল (দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম) এবং মীরাট। ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে এক সৎনামী কৃষকের সহিত এক মুঘল পাহারাদারের বিরোধ ধর্মীয় রূপ নিল এবং হিন্দুদের মুক্তির জন্য একটি স্থানীয় সংগ্রামে পরিণত হইল। সৎনামীগণ ইহাকে 'হিন্দু ধর্মের ধ্বংসকারীর বিরুদ্ধে একটি পবিত্র যুদ্ধ' হিসাবে গণ্য করিল। তাহারা নারনোল দখল ও লুণ্ঠন করিল। এই বিদ্রোহ দমন করিতে একটি বিরাট মুঘল বাহিনী পাঠানো হইল। একটি দুর্ধর্ষ যুদ্ধে ২০০০ সৎনামীর মৃত্যু হইল এবং পশ্চাদ্ধাবনের সময় অন্য বহু সৎনামীকে হত্যা করা হইল।

গুরু নানকের পরে শিখ সম্প্রদায়

গুরু নানকের মৃত্যুর (১৫৩৯) পরে তাঁহার শিষ্যরা খুব সম্ভবতঃ রামানন্দ এবং কবীরের শিষ্যদের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজের সহিত মিশিয়া যাইত। কিন্তু তিনি অঙ্গদকে উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করিয়া এই সম্ভাবনা রোধ করিয়াছিলেন। একজন গুরুর নেতৃত্বে তাঁহার শিষ্যেরা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় রূপে গঠিত হইবার সুযোগ পাইল। অঙ্গদ (১৫৩৯-৫২) পাঞ্জাবী ভাষার জন্য গুরুমুখী বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। এই বর্ণমালা শিখদের মধ্যে ঐক্যের একটি সূত্রে পরিণত হয়। ('শিখ' শব্দের অর্থ 'শিষ্য'। গুরু নানকের শিষ্যবৃন্দকে বুঝাইতে এই শব্দটি প্রচলিত হইল)। অঙ্গদ দ্বিতীয় গুরু। তাঁহার উত্তরাধিকারী, তৃতীয় গুরু অমর দাসের (১৫৫২-৭৪) অধীনে শিখ সম্প্রদায় যথেষ্ট উন্নতি করে। শিখদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাহারা নূতন ধর্মীয় প্রথা এবং সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, তাহাদের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হইল। চতুর্থ গুরু রাম দাস (১৫৭৪-৮১) ছিলেন অমর দাসের শিষ্য ও জামাতা। তিনি আকবরের দেওয়া একটি জমিতে অমৃতসর শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে অমৃতসর শিখদের পক্ষে তীর্থযাত্রার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পবিত্র কেন্দ্রে পরিণত হয়।

পঞ্চম গুরু অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬) ছিলেন রাম দাসের পুত্র। প্রথম তিন গুরু শিষ্যদের মধ্য হইতে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন, নিজেদের পুত্রদের মনোনীত করেন নাই। অর্জুনকে মনোনীত করিয়া রাম দাস গুরুপদে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের নীতি প্রবর্তন করিলেন।

অর্জুন বিভিন্ন ভাবে শিখ সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ এবং শক্তিশালী করিলেন। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য সংগঠক। বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী শিখদের নিকট হইতে ধর্মীয় কার্য ও দানের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি 'মসন্দ' নামে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এইভাবে শিখগণ ক্রমে নিজেদের এক ধরণের শাসন-ব্যবস্থা

সংগঠিত করে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে কার্যতঃ একটি অর্ধস্বাধীন সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তখনও অবশ্য তাহাদের কোন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। এই সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ চরিত্র ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে থাকে যখন যুদ্ধপ্রিয় জাঠ হিন্দুরা বহু সংখ্যায় শিখ ধর্ম গ্রহণ করে। এই পরিবর্তনের ফলে শিখেরা একটি সংগ্রামী সম্প্রদায় রূপে সংগঠিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

গুরু অর্জুনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ছিল 'গ্রন্থ সাহিব' সংকলন (১৬০৪)। ইহা শিখদের পবিত্র গ্রন্থ। ইহাতে প্রথম পাঁচ জন গুরুর রচিত ধর্মীয় সঙ্গীত লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তী কালে নবম গুরু তেগ বাহাদুরের রচিত কয়েকটি গান দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ ইহার অন্তর্ভুক্ত করেন। 'গুর-বাণী' নামে পরিচিত এই গানগুলি হইতে গুরুদের ধর্মীয় ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। 'গ্রন্থ সাহিবে' 'গুর-বাণী' ছাড়া হিন্দু ভক্ত এবং মুসলমান সাধুদের রচিত বহু ধর্ম সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত আছে।

১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের নির্দেশে গুরু অর্জুনকে হত্যা করা হয়। শিখদের ইতিহাসে এই বিষাদজনক ঘটনা একটি নূতন পর্বের সূচনা করে। অর্জুনের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের (১৬০৬-৪৫) নেতৃত্বে তাহারা একটি সামরিক গোষ্ঠিতে পরিণত হয়। বলা হইয়াছে যে শহীদ গুরু অর্জুন মৃত্যুকালে পুত্রকে তাঁহার সিংহাসনে বসিতে এবং সশস্ত্র একটি সৈন্যবাহিনী রাখিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। মুঘল সরকার হরগোবিন্দকে কিছুদিন বন্দী করিয়া রাখে। মুক্তির পর জাহাঙ্গীরের শাসনকালে তিনি সেই সরকারের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। কিন্তু শাহ জাহানের শাসনকালে বিরোধিতা দেখা দেয়। গুরু যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তিদের সংগ্রহ করেন এবং একটি বাহিনী গঠন করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির প্রকাশ্য বিরোধিতা করার কথা চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না, কিন্তু মুঘল সরকারের প্রতি বিরোধী ভাব দেখাইবার সম্ভাবনা হরগোবিন্দের কার্যকলাপে প্রকাশিত হইল।

সপ্তম গুরু হর রায় (১৬৪৫-৬১) ছিলেন হরগোবিন্দের পৌত্র। পিতামহের পরামর্শ অনুসারে তিনি ২,০০০ সৈন্য দ্বারা গঠিত একটি বাহিনী রাখিতেন। তাঁহার দরবারে একটি প্রায় স্বাধীন সামরিক নেতার জাঁকজমক প্রতিফলিত হইত। কিন্তু মুঘল সরকারকে অস্বীকার করিবার পরিবর্তে তিনি শান্তিপূর্ণ কার্যে মনোনিবেশ করেন। বলা হয় যে শাহ জাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধে তিনি দারার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। দারার পরাজয়ের পর আওরঙ্গজেবের নির্দেশে তাঁহাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রায়কে প্রতিভূ রূপে মুঘল দরবারে পাঠাইতে হইয়াছিল।

অষ্টম গুরু হরকৃষণ (১৬৬১-৬৪) ছিলেন হর রায়ের দ্বিতীয় পুত্র। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতার উত্তরাধিকারী হন। রাম রায়ের দাবি উপেক্ষা করিয়া হর রায় তাঁহাকে গুরু মনোনীত করেন এই কারণে যে রাম রায় মুঘল দরবারে

থাকিয়া বাদশাহী প্রভাবে শিখ ধর্মের বিরোধী আচরণ করিয়াছিলেন। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপার মীমাংসা করিবার জন্য হরকৃষণকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠানো হয়। সেখানে বসন্ত রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র তেগ বাহাদুর (১৬৬৪-৭৫)।

শিখগুরু তেগ বাহাদুর

বলা হইয়াছে যে তেগ বাহাদুর গুরুর গদীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহাকে 'ক্ষমতা লাভের জন্য অভিলাষী এবং শান্তি ভঙ্গকারী' হিসাবে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠানো হয়, কিন্তু জয়পুরের রাজার হস্তক্ষেপে তিনি শাস্তি এড়াইয়া যান। একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন—এবং অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য—শিখ সূত্রে আমরা জানিতে পারি যে গুরু তাঁহার পত্নী এবং কয়েকজন অনুচরসহ পূর্ব ভারত পর্যটনে যাত্রা করেন এবং আসামের গৌহাটি পর্যন্ত যান। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে পাটনায় তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়। বলা হয় যে আহোমদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের প্রেরিত জয়পুরের রাজা রাম সিংহের যুদ্ধে তিনি যুক্ত ছিলেন। যাহা হউক, পূর্ব ভারত হইতে তেগ বাহাদুর পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তাঁহাকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠানো হয় এবং সেখানে আওরঙ্গজেবের আদেশে ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

তেগ বাহাদুরের হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসাবে দুইটি ভিন্ন মত আছে। একটি হইল এই যে তিনি 'ধর্মগুরুর মনোভাব অপেক্ষা রাজকীয় মনোভাব বেশী দেখাইয়াছিলেন' এবং 'লুটপাটের দ্বারা তাঁহার এবং তাঁহার অনুচরদিগের ভরণপোষণ করিতেন।' এক কথায় তিনি ছিলেন শান্তি বিনষ্টকারী এবং রাজনৈতিক কারণে তাঁহার শাস্তি হইয়াছিল। শিখ সূত্র অনুসারে অবশ্য তিনি ধর্মের জন্য শহীদ হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের জোর করিয়া ধর্মান্তরকরণের নীতির বিরুদ্ধে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণরা প্রতিবাদ করেন এবং তেগ বাহাদুর এই প্রতিবাদের সমর্থন করেন। এই অপরাধে তাঁহাকে দিল্লীতে ডাকা হইলে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিতে অস্বীকার করেন। এইভাবে ধর্মের কারণে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। গুরু গোবিন্দ সিংহের আত্মজীবনীতে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। এই উক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। নবম গুরুর নিষ্ঠুর মৃত্যু আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার একটি নিষ্ঠুর উদাহরণ।

শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ

তেগ বাহাদুরের শহীদ হিসাবে আত্মদানের (১৬৭৫) পরে গুরুর পদ লাভ করেন তাঁহার নাবালক পুত্র গোবিন্দ রায়। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। এই নূতন গুরুকে একটি বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়।

তেগ বাহাদুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আওরঙ্গজেবের বিরোধিতার অবসান ঘটিবে, এমন আশা করার কোন কারণ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলের হিন্দু রাজারা শিখবিরোধী ছিলেন। তৃতীয়তঃ, শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙনের বিপজ্জনক লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। জাতিগত এবং উপজাতীয় মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। 'মসন্দ'গণ (দান সংগ্রাহকগণ) দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাদের লোভ ও অবাধ্যতা গুরুর কর্তৃত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল।

বয়সে বালক হইলেও গোবিন্দ রায় তাঁহার পিতামহ হরগোবিন্দের নীতি অনুসরণ করেন এবং একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। আত্মরক্ষার জন্য তাঁহার ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না; তাঁহার সম্পদও ছিল সীমিত। নিরাপত্তার জন্য তিনি পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। এই অঞ্চলে তাঁহার উপস্থিতি স্থানীয় হিন্দু রাজাদের মনঃপূত ছিল না। তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার সামরিক কার্যকলাপের বর্ণনা আছে তাঁহার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'বচিত্র নাটকে'। মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও তিনি সামরিক কার্যকলাপে জড়িত হইয়া পড়েন।

১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি কেশগড়ে একটি বড় সভা আহ্বান করেন এবং সংস্কার প্রবর্তন করেন। এই সংস্কারগুলিকে তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শিখ সম্প্রদায়ের আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতিতে এমন একটি পরিবর্তন আনা যাহা তাহাকে পার্বত্য রাজাদের এবং মুঘল সরকারের বিরোধিতার ফলে উদ্ভূত সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে সাহায্য করিবে। 'বচিত্র নাটকে' তাঁহার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ঘোষণা করেন যে ধর্ম বিস্তার, সাধুসন্তদের রক্ষা এবং সকল অত্যাচারীর উচ্ছেদ করিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার শিষ্যদের একটি যোদ্ধা সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। ইহাকে বলা হয় 'খালসা' (১৬৯৯)। দুর্জনের শাস্তিদানকারী ঈশ্বরকে তিনি তরবারির সহিত তুলনা করেন, কারণ তরবারি দুর্জনের শাস্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। পূর্বতন গুরুদের মূল শিক্ষা হইতে বিচ্যুত না হইয়া তিনি দীক্ষার জন্য 'পাহুল' নামে একটি নূতন প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি সকল শিখকে চুল ও দাড়ি না কাটিতে, ছুরি-চিরুনি-বালা রাখিতে এবং খাটো পায়জামা পরিতে নির্দেশ দেন। ব্যক্তিগত নামের শেষে ব্যবহৃত উপাধিগুলি জাতিভেদ এবং সামাজিক বৈষম্যের পরিচয় দেয়। এজন্য তিনি নির্দেশ দেন যে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল শিখ একটিমাত্র উপাধি ব্যবহার করিবে—'সিংহ'। তিনি নিজে গোবিন্দ রায় নামের পরিবর্তে গোবিন্দ সিংহ নামে পরিচিত হন। জাতিভেদ প্রথার চূড়ান্ত বিলোপের উপর তিনি গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক শিখের কর্তব্য হইল 'যুদ্ধের জন্য এবং ধর্মের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা।' তিনি ব্যক্তিগত গুরুর পদ বিলোপ করেন। তিনি ছিলেন দশম ও শেষ গুরু, তাঁহার

কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। ধর্মীয় ব্যাপারে গুরুর স্থান দেওয়া হইল 'আদি-গ্রন্থ'কে। এই পবিত্র গ্রন্থ 'গুরুগ্রন্থ' নামে পরিচিত হইল। জাগতিক ব্যাপারে কর্তৃত্বের ভার দেওয়া হইল 'পঞ্চ'কে (অর্থাৎ সমগ্র শিখ সমাজের মুখপাত্রদিগকে)। 'মসন্দ' শ্রেণীকে বিলোপ করা হইল। যাহারা গুরুদের মতকে বিকৃত করিয়াছিল সেই সকল গোষ্ঠীকে (মীনা, ধীরমলিয়া, রামরাইয়া) শিখ সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে শিখ সম্প্রদায়ে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

গুরু গোবিন্দের প্রবর্তিত সংস্কারগুলির ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ধর্ম এবং অস্ত্র ব্যবহারের দিক হইতে শিখগণ একটি দৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ হয়। 'শিখদের শেষ গুরু একটি পরাজিত জনগোষ্ঠির সুপ্ত প্রতিভা কার্যকরীভাবে জাগ্রত করেন এবং গুরু নানক প্রচারিত উপাসনার শুদ্ধতার সহিত যুক্ত সামাজিক স্বাধীনতা এবং জাতীয় প্রাধান্য সম্পর্কে একটি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেন।' ধর্মের সঙ্গে সামাজিক সাম্য, অস্ত্র ব্যবহারের প্রবণতা এবং রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মিশ্রণ ঘটিল।

পার্বত্য রাজা এবং মুঘল কর্মচারীদের সহিত গুরু গোবিন্দ সিংহের বিরোধিতা খালসা সৃষ্টির পরও চলিতে থাকে। তিনি পরাজিত হইয়া ভ্রাম্যমাণ জীবন গ্রহণ করেন। সরহিন্দের মুঘল ফৌজদার নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার দুই নাবালক পুত্রকে হত্যা করেন। ইহার পরে গুরু গোবিন্দ আওরঙ্গজেবকে একটি পত্র (জাফরনামা) লেখেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করেন, কিন্তু তাঁহার যাত্রা পথে থাকাকালীন সম্রাটের মৃত্যু হয়। অতঃপর সিংহাসনে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে গুরু গোবিন্দ বাহাদুর শাহের পক্ষে যোগ দেন। বাহাদুর শাহের জয়লাভের পর তিনি দাক্ষিণাত্যে নূতন সম্রাটকে অনুসরণ করেন। সেখানে নান্দের নামক স্থানে ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে জনৈক পাঠান তাঁহাকে হত্যা করে।

গুরু গোবিন্দ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক মহান নেতা। ধর্মীয় নেতা রূপে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রতিটি সঙ্কটে তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া অবিচলিত থাকিতেন। 'দশম পাদশা কা গ্রন্থ' নামক পুস্তকে সংগৃহীত তাঁহার বহু রচনায় তাঁহার ধর্মীয় উৎসাহ এবং সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। (এই গ্রন্থের সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য গুরু অর্জুন কর্তৃক সঙ্কলিত 'গ্রন্থসাহিব'কে 'আদি গ্রন্থ' বলা হয়।) তিনি পাঞ্জাবের মালোয়া অঞ্চলে শিখ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সামরিক যোগ্যতাও ছিল উচ্চস্তরের। খালসা সৃষ্টি করিয়া তিনি একটি নূতন শক্তির উত্থানের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি একটি উচ্চ স্থান অধিকারের দাবি রাখেন।

রাজস্থানে যুদ্ধ : মারবাড়

আওরঙ্গজেবের নীতি রাজস্থানে একটি দীর্ঘ যুদ্ধের সূচনা করে। ইহা ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চলে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে শেষ হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জামরুদের সামরিক নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ সেখানে ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি কোন পুত্রসন্তান রাখিয়া যান নাই। সম্রাট তাঁহার রাজ্যটি (মারবাড়) সরাসরি মুঘল নিয়ন্ত্রণে আনিলেন, কিন্তু মৃত মহারাজার এক আত্মীয়কে এই রাজ্যের অধীনস্থ শাসক রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। ইতিমধ্যে, যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার দুই পুত্রের জন্ম হয় (১৬৭৯)। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একজনের মৃত্যু হয়; অপর জন, অজিত সিংহ, জীবিত থাকেন। আওরঙ্গজেব যে কেবল সিংহাসনে তাঁহার দাবি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন তাহাই নহে; তিনি আদেশ দিলেন যে মুঘল হারেমে তাহাকে লালন-পালন করা হইবে। ইহার অর্থ ছিল রাঠোর শাসক পরিবারের কার্যতঃ উচ্ছেদ। দুর্গাদাস নামক জনৈক সাহসী রাঠোর নেতা নাবালক শিশু এবং তাঁহার মাতাকে নিরাপদে যোধপুরে লইয়া যাইতে সক্ষম হইলেন (১৬৭৯)। এই নবজাত শিশুর নামে রাঠোরগণ ঐক্যবদ্ধ হইল এবং মুঘল শাসন হইতে তাহাদের রাজ্যকে মুক্ত করিতে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিবার প্রতিজ্ঞা করিল। সকল প্রতিরোধ দমন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প সম্রাট আজমীরে তাঁহার ঘাঁটি স্থাপন করিলেন (১৬৭৯)। তাঁহার পুত্র মহম্মদ আকবরের নেতৃত্বে একটি বিরাট মুঘল বাহিনী মারবাড় দখল করিল। পাহাড়ে এবং মরুভূমিতে তাহাদের ঘাঁটি হইতে রাঠোরগণ গেরিলাযুদ্ধ চালাইয়া গেল, কিন্তু শহরে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। সামরিক দখলের সহিত যুক্ত হইল ধর্মের উপর আক্রমণ। বহু মন্দির ধ্বংস করা হইল এবং সে সকল স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা হইল।

মারবাড়ের মরুভূমি অঞ্চল রাজস্ব উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসাবে লোভনীয় ছিল না, কিন্তু এই রাজ্যের মধ্য দিয়াই ছিল দিল্লী এবং আগ্রা হইতে সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্র আহম্মদাবাদে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ক্যাম্বে বন্দরে যাইবার সর্বাপেক্ষা সহজ পথ। উপরন্তু, রাজস্থানের মধ্যস্থলে অবস্থিত মারবাড়ে প্রত্যক্ষ বাদশাহী কর্তৃত্ব স্থাপনের ফলে রাজস্থান দুইটি ভাগে বিভক্ত হইল। প্রয়োজন হইলে সমগ্র রাজস্থান জয় করা সহজ হইল। বাণিজ্যিক এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্ব ছাড়াও মারবাড় ছিল সেই সময় উত্তর ভারতের প্রধান হিন্দু রাজ্য। রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইহার গুরুত্ব হ্রাস আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির প্রতি হিন্দু প্রতিরোধকে দুর্বল করিবে, ইহার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। উত্তরাধিকারের জন্য অজিত সিংহের দাবি মানিয়া লইতে তাঁহার অস্বীকৃতি ছিল রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের নীতির প্রত্যাখ্যান।

রাজস্থানে যুদ্ধ : মেবার

মারবাড়ে সাফল্য ছিল আওরঙ্গজেবের মেবার আক্রমণের ভূমিকা। মহারাণা রাজ সিংহকে তাঁহার রাজ্যে জিজিয়া কর সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে যদি রাজপুতদের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করিতে হয় তবে রাঠোরদের সহিত সহযোগিতা জরুরী প্রয়োজন। উপরন্তু, অজিত সিংহের মাতা ছিলেন মেবার রাজবংশের কন্যা ; আত্মীয় এবং যোদ্ধা হিসাবে মহারাণা নাবালকের অধিকার রক্ষার জন্য তাঁহার আবেদন উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। রাঠোর-শিশোদিয়া মিত্রতা রাজস্থানে মুঘল কর্তৃত্বের পক্ষে এক বিপজ্জনক আশঙ্কা হইয়া দাঁড়াইল (১৬৮০)।

রাজসিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রথম আঘাত একটি মুঘল বাহিনী প্রতিহত করিল। ইউরোপীয় গোলন্দাজগণ কর্তৃক পরিচালিত মুঘল গোলন্দাজ বাহিনীর সম্মুখীন হইতে না পারিয়া তিনি রাজধানী (উদয়পুর) এবং সমতল ভূমি পরিত্যাগ করিলেন। প্রজাদিগকে লইয়া তিনি পাহাড়ে আশ্রয় লইলেন। মুঘল সৈন্যবাহিনী উদয়পুর ও চিতোর অধিকার করিল এবং ২০০টিরও বেশী মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহাদের সাফল্য উপলক্ষ্যে উৎসব করিল।

সামগ্রিক সামরিক অবস্থা অবশ্য প্রকৃতপক্ষে মুঘলদের পক্ষে যতখানি সুবিধা-জনক মনে করা হইয়াছিল ততখানি সুবিধাজনক ছিল না। মুঘল ঘাঁটিগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন, তাহাদের নিরাপত্তা রক্ষা করা যাইত না। আরাবল্লী পর্বতমালা মারবাড় এবং মেবারে যুদ্ধরত মুঘল বাহিনীকে দুইটি দলে ভাগ করিয়াছিল। আরাবল্লীর চূড়াতে রাজ সিংহের নিরাপদ স্থান ছিল। সেখান হইতে তিনি দুই দিকে মুঘল বাহিনীর উপর আকস্মিকভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেন। সমতলভূমির সহিত রাজপুতগণ পরিচিত ছিল, মুঘলগণ ছিল আগন্তুক। স্থানীয় জনগণ আক্রমণকারীদের প্রতি বিরোধীমনোভাবাপন্ন ছিল। আরাবল্লীর পূর্বে বিচ্ছিন্ন মুঘল ঘাঁটিগুলির নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে আকবরের বাহিনী সংখ্যার দিক হইতে যথেষ্ট ছিল না।

রাজস্থানে যুদ্ধ : আকবরের বিদ্রোহ

কয়েক মাস ধরিয়া আকবরের সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত হয়। আকবর নিজেই বলেন, যে ভয়ে সৈন্যেরা নিশ্চল হইয়াছে। ক্ষুব্ধ সম্রাট তাঁহাকে মারবাড়ে পাঠাইয়া চিতোরের দায়িত্ব দেন তাঁহার অপর পুত্র আজমের হাতে। মারবাড়েও আকবর মেবারের তুলনায় বেশী সাফল্য অর্জন করিতে পারিলেন না। তিনি চারিদিকে ভ্রাম্যমাণ রাঠোর যোদ্ধাদের ধ্বংস করিতে ব্যর্থ হইলেন। বারবার ব্যর্থতার জন্য সম্রাট তাঁহার কঠোর সমালোচনা করেন। তখন এই বুদ্ধিহীন যুবক বাদশাহী সিংহাসন দখলের জন্য রাজপুতদের লোভনীয় আমন্ত্রণের কাছে নতি স্বীকার করিলেন। রাজ সিংহ এবং দুর্গাদাস তাঁহাকে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

যখন আলোচনা চলিতেছিল তখন রাজ সিংহের মৃত্যু হয় (১৬৮০)। বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসে তাঁহার বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী জয় সিংহ আকবরকে সাহায্য করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিজের সৈন্য বাহিনীর অর্ধেক পাঠাইতে রাজী হন। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিন আকবর নিজেকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি অলসভাবে এবং আমোদ-প্রমোদে মূল্যবান সময় নষ্ট করেন। এদিকে আওরঙ্গজেব সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁহার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য অন্যান্য প্রস্তুতি করেন। সামরিক শক্তির সহিত সম্রাট কৌশল যুক্ত করেন। রাজপুত দলে সন্দেহ সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি আকবরকে একটি মিথ্যা চিঠি পাঠাইলেন। এই চিঠিতে রাজপুতদের প্রলুব্ধ করিয়া ফাঁদে ফেলিবার জন্য, এবং মুঘল বাহিনীর আওতার মধ্যে তাহাদের আনিবার জন্য, আকবরকে প্রশংসা করা হয়। সম্রাটের পরিকল্পনা অনুযায়ী পত্রটি দুর্গাদাসের হাতে পড়ে। রাজপুতগণ প্রতারিত হইল। তাহারা দ্রুতবেগে মারবাড়ে পলায়ন করিল। আকবরকে তাঁহার ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করা হইল। আকবরের সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আশ্রয়ের আশায় মারবাড়ে পলায়ন করেন। সেখানে মুঘল বাহিনী তাঁহাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করে। দুর্গাদাস সম্রাটের কৌশল বুঝিতে পারিয়া আকবরকে আশ্রয় দিলেন। যখন মারবাড় আকবরের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হইয়া উঠিল তখন দুর্গাদাস তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া মারাঠা রাজা শম্ভাজীর দরবারে যান (১৬৮১)।

রাজস্থানে যুদ্ধ : শেষ পর্যায়

আকবরের দাক্ষিণাত্যে পলায়নের পরে মেবার এবং সম্রাটের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি হয় (১৬৮১)। মুঘল বাহিনী চূড়ান্ত সামরিক সাফল্য লাভ করে নাই; কিন্তু বিধ্বস্ত মেবারের অনিশ্চিতকাল ধরিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার শক্তি ছিল না। জয় সিংহ জিজিয়ার পরিবর্তে তাঁহার রাজ্যের এক অংশ ছাড়িয়া দেন এবং পাঁচ হাজারী মনসবদার হন। মুঘল সৈন্যবাহিনী মেবার ত্যাগ করে।

মারাঠা রাজসভায় আকবরের উপস্থিতি সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক বিপজ্জনক ছিল। এই বিপদ রোধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল দাক্ষিণাত্যে মুঘল বাহিনী কেন্দ্রীভূত করা, এমন কি, সেখানে সম্রাটের ব্যক্তিগত উপস্থিতি। সুতরাং মারবাড়ের উপর মুঘলদের চাপ কমানো হইল, কিন্তু ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল। প্রধান শহরগুলি এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মুঘল দখলে রহিল; রাঠোরগণ পাহাড়ে এবং মরু অঞ্চলে আশ্রয় লইল। মাঝে মাঝে সমতলভূমিতে তাহারা মুঘল বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইত। এক প্রজন্ম ধরিয়া 'তরবারি এবং মহামারী সেই অঞ্চলকে জনশূন্য করিল।' ইহা ছিল একটানা বিরোধ, দখল এবং পুনর্দখলের যুগ। সংখ্যার দিক হইতে ক্ষুদ্র জনগণের দেশপ্রেম দীর্ঘকাল এক বিরাট সাম্রাজ্যের

শক্তি ও সম্পদকে বাধাদান করিল। বৈধ শাসক অজিত সিংহ এবং বীর নায়ক দুর্গাদাস রাঠোরদের নেতৃত্ব দিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর ঠিক পরেই অজিত সিংহ যোধপুর দখল করিলেন (১৭০৭)। বাহাদুর শাহের শাসনকালে, ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে, দিল্লীর সহিত আনুষ্ঠানিক শান্তি স্থাপিত হইল।

'চূড়ান্ত রাজনৈতিক অবিবেচনার' ফলে আওরঙ্গজেব রাজস্থানে রাঠোরদিগকে যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়াছিলেন। ইহার কুফল মারবাড় এবং মেবারে সীমাবদ্ধ ছিল না। আগে কয়েকটি রাজপুত গোষ্ঠি হইতে, বিশেষতঃ মারবাড়ের রাঠোরদের মধ্য হইতে, বহু দক্ষ এবং সর্বাপেক্ষা অনুগত সৈন্য মুঘল বাহিনীতে পাওয়া যাইত। এখন সামরিক শক্তির সেই সূত্র হইতে বাদশাহ বঞ্চিত হইলেন। উপরন্ত, রাজস্থানের অরাজকতা মালবে ছড়াইয়া পড়িল এবং উত্তর ভারত হইতে দাক্ষিণাত্যে যাইবার সরকারী রাস্তা বিপজ্জনক হইয়া পড়িল।

দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেব : প্রথম যুগ (১৬৮১-৮৯)

১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে আকবর শম্ভাজীর রাজসভায় আশ্রয় লাভ করেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁহাকে অনুসরণ করেন সম্রাট। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শম্ভাজী এবং আকবরের মধ্যে সহযোগিতার বিপদকে ব্যক্তিগতভাবে মোকাবিলা করা। ভাগ্য ফিরাইবার জন্য কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পরে আকবর ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের উদ্দেশ্যে সমুদ্র-পথে যাত্রা করেন। দীর্ঘকাল পরে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিবাজীর জীবনে শেষ দশ বৎসরে (১৬৭০-৮০) তাঁহার সামরিক সাফল্য, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সুলতানগণের সহিত তাঁহার বোঝাপড়া এবং মুঘল রাজপ্রতিনিধি যুবরাজ শাহ আলমের দুর্বলতার জন্য দাক্ষিণাত্যে মুঘল শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য সেনাপতিদের নেতৃত্বাধীন একটি বিরাট বাহিনীসহ সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে ব্যক্তিগত উপস্থিতি মুঘল যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নূতন শক্তি সঞ্চার করিবে বলিয়া স্বাভাবিকভাবেই আশা করা হইয়াছিল। মারাঠা রাজা এবং বিজাপুর গোলকুণ্ডার সুলতানগণ আওরঙ্গজেবের আক্রমণের লক্ষ্য হইলেন। এই দুই সুলতানী রাজ্য ১৬৮৬-৮৭ খ্রীস্টাব্দে অধিকৃত হইল। শম্ভাজীকে বন্দী করা হইল এবং ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে হত্যা করা হইল। ১৬৮১-৮৯ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের নীতি উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হইয়াছিল।

বিজাপুর রাজ্য অধিকার (১৬৮৬)

১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের চুক্তির সর্ত পালনের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য বিজাপুরের সুলতান শাহ জাহানের পুত্রগণের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের সুযোগ লইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম দিকে, শিবাজীর বিরুদ্ধে জয় সিংহের অভিযানের

সময়, বিজাপুর মারাঠা বীরের সহিত একটি গোপন মিত্রতা করেন এবং তাঁহাকে সাহায্য দেন। পুরন্দরের চুক্তি দ্বারা (১৬৬৫) শিবাজী মুঘলদের বিজাপুর আক্রমণে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু জয় সিংহের বিজাপুর আক্রমণ (১৬৬৫-৬৬) ব্যর্থ হইল ; কোন খণ্ড রাজ্য অধিকার করা দূরে থাকুক, তিনি যুদ্ধের কিছু ক্ষতিপূরণও করিতে পারেন নাই।

বিজাপুরের ইতিহাসের শেষ পর্ব ক্রমাগত গৃহযুদ্ধের দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব চূড়ান্ত আঘাত হানিলেন। ১৫ মাস অবরোধের পর বিজাপুর শহর আত্মসমর্পণ করে। শেষ আদিল শাহী সুলতান বন্দী হন ; তাঁহার রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

গোলকুণ্ডা রাজ্য অধিকার (১৬৮৭)

শেষ কুতব শাহী সুলতান আবুল হাসান ছিলেন তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী মদন্নার হাতের পুতুল। জয় সিংহের নেতৃত্বে (১৬৬৫-৬৬) মুঘল আক্রমণের সময় গোলকুণ্ডা বিজাপুরকে সাহায্য করিতে প্রকাশ্যে সৈন্য পাঠাইয়াছিল। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে শিবাজীর আগ্রা হইতে পলায়নের পর গোলকুণ্ডা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। দুই জন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর (মদন্না এবং তাঁহার ভ্রাতা আক্কান্না) নিয়োগ গোলকুণ্ডা রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দুদের আধিপত্যের ইঙ্গিত দিয়াছিল।

এই সব অভিযোগে গোলকুণ্ডাকে শাস্তি দিতে আওরঙ্গজেব দৃঢ়সংকল্প হইলেন। ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে হায়দরাবাদ দখল করিয়া তিনি দাবি করেন হিন্দু মন্ত্রীদের পদচ্যুতি এবং বার্ষিক কর। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে মদন্না এবং আক্কান্নাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু ইহা সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিল না। বিজাপুরের পতনের পরে তিনি গোলকুণ্ডা অবরোধ করেন ; উৎকোচের দ্বারা শহরটি অধিকার করা হয় (১৬৮৭)। আবুল হাসানকে বন্দী করা হয়। বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য লওয়া হয় এবং রাজ্যটিকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে দাক্ষিণাত্যের এই দুইটি মুসলমান রাজ্যকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা আওরঙ্গজেবের পক্ষে ভুল হইয়াছিল. কারণ ইহারা মারাঠাদের দমন করিতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিত। বলা হইয়াছে যে এই দুইটি রাজ্যের পতন মারাঠাদের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয় হইতে মুক্ত করিয়া শক্তিশালী করিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণে মারাঠাদের বিরুদ্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত কার্যকরী বন্ধু হইবার পক্ষে বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা ছিল খুবই দুর্বল। উপরন্তু, মারাঠাদের সহিত তাহাদের পুরাতন সম্পর্ক বিচার করিলে ইহা আশা করা কঠিন ছিল যে তাহারা মুঘলদের স্বার্থ প্রকৃতই রক্ষা করিবে। 'বিজাপুর অথবা গোলকুণ্ডা এবং মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে মানসিক ঐক্য স্থাপন ছিল মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে অসম্ভব।' এই দুই রাজ্যের শিয়া সুলতানের সহিত

পারস্যের শিয়া শাসকদের ধর্মীয় যোগাযোগ ছিল। পারস্যের শাসকেরা ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কারণে স্থন্নী মুঘল সম্রাটগণের বিরোধী ছিলেন।

আওরঙ্গজেবের নীতির পক্ষে একটি যুক্তি এই যে বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা ছিল সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। বিজাপুরের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ১৩ কোটি টাকা এবং গোলকুণ্ডার বার্ষিক রাজস্ব ছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা। সর্বশেষে, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা অধিকার ছিল মুঘল ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি। আকবর হইতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত চার প্রজন্ম ধরিয়া মুঘল সম্রাটেরা দাক্ষিণাত্যে রাজ্য-বিস্তারের নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী চেষ্টার ফলে এই নীতি চরম পরিণতি লাভ করিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি

১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে শম্ভাজীর প্রাণদণ্ড হইল এবং আপাতদৃষ্টিতে মারাঠা শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িল। 'মুঘল চন্দ্রকলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিল।' মুঘল সাম্রাজ্য আফগানিস্থান হইতে বাংলা এবং কাশ্মীর হইতে কর্নাটক পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে (মহারাষ্ট্র, কানাড়া, মহীশূর এবং পূর্ব কর্নাটক) মুঘল কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী ছিল না, কারণ স্থানীয় রাজারা তাহা অস্বীকার করিত। এই অঞ্চলগুলিকে 'দো-আমলি' (দুই শক্তির অধীন) বলিয়া বর্ণনা করা হইত।

আওরঙ্গজেবের সময় সাম্রাজ্যের মোট ভূমি-রাজস্ব ছিল ৩৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। ইহা ছিল সর্বোচ্চ সরকারী দাবি ; বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ কম হইত। ইহা ছাড়া, আয়ের অন্যান্য সূত্র ছিল — যেমন, 'জাকত' (মুসলমানদের বার্ষিক আয়ের এক-চল্লিশাংশ, যাহা কেবলমাত্র ধর্মীয় দানে ব্যয় করা হইত), জিজিয়া, এবং বাণিজ্য-শুল্ক। আকবরের শাসনকালে জমি হইতে আফগানিস্থান বাদে অন্যান্য সুবায় সরকারের সর্বোচ্চ দাবি ছিল ১৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা।

আওরঙ্গজেবের শেষ জীবন : দাক্ষিণাত্যে দুষ্ট ক্ষত (১৬৯০-১৭০৭)

জীবনের শেষ কয়েক বৎসরে আওরঙ্গজেব উপলব্ধি করিলেন তিনি যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই পতনের বীজ নিহিত ছিল। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দের পরে ঘটনার ঢেউ তাঁহার বিরুদ্ধে যায়। "ইহা ছিল তাঁহার পতনের শুরু। তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক এবং সর্বাপেক্ষা নিরাশার যুগ আরম্ভ হইল। একজন ব্যক্তি অথবা একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে শাসন করিবার পক্ষে মুঘল সাম্রাজ্য অত্যধিক বিরাট আকার ধারণ করিয়াছিল···চারিদিকে তাঁহার শত্রু দেখা দেয় ; তিনি তাহাদের পরাজিত করিতে পারিলেও চিরকালের মত ধ্বংস করিতে পারেন নাই···

মারাঠাদের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার যুদ্ধ কখন শেষ হইবে তাহা অনিশ্চিত ছিল। এই যুদ্ধ তাঁহার কোষাগার শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল; সরকার দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছিল; বেতন বাকি পড়ায় সৈন্যরা বিদ্রোহ করিয়াছিল···প্রথম নেপোলিয়ন বলিতেন, 'স্পেনীয় দুষ্ট ক্ষতই (Spanish ulcer) আমাকে ধ্বংস করিয়াছে।' দাক্ষিণাত্যের দুষ্ট ক্ষত (Deccan ulcer) আওরঙ্গজেবকে ধ্বংস করিল।"

দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ যে ব্যাপক ও ভয়াবহ আর্থিক ক্ষতি করিল তাহা কেবলমাত্র ভারতের ঐ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রহিল না, সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও ছড়াইয়া পড়িল। মানুচি বলিয়াছেন, মারাঠা দেশ 'বৃক্ষশূন্য এবং শস্য-শূন্য হইয়া পড়িল, তাহাদের স্থান নিল মানুষ ও পশুর হাড়।' দুই বৎসরে (১৭০২-১৭০৪) প্লেগ ও মহামারীতে প্রায় দুই লক্ষের বেশি লোকের মৃত্যু হইল। ভীমসেন নামক প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন: 'সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রাজ্য জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। কৃষকেরা কৃষি-কার্য ত্যাগ করিয়াছে; জায়গীরদারগণ তাঁহাদের জায়গীর হইতে সামান্য অর্থও পান না।' কৃষকেরা অস্ত্র এবং ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া মারাঠা আক্রমণকারীদের সহিত যোগ দিয়াছিল।

'দাক্ষিণাত্যের দুষ্ট ক্ষত' উত্তর ভারতের শাসন-ব্যবস্থা এবং অর্থনীতিকে প্রভাবিত করিল। দাক্ষিণাত্যে এবং মারবাড়ে দীর্ঘদিনের যুদ্ধবিগ্রহ এবং ক্রম-বর্ধমান ব্যয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরাইল। জনসাধারণের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইল। সাম্রাজ্যের পুরাতন এবং প্রশাসনের দিক হইতে স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী প্রদেশগুলি হইতে বহু মানুষ, প্রচুর অর্থ এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে দক্ষিণ ভারতে টানিয়া লওয়া হইল। তাহাদের শ্রেষ্ঠ সৈন্য, উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সকল সংগৃহীত রাজস্ব দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হইল। হিন্দুস্থানের সুবাগুলি নিম্নস্তরের কর্মচারী কর্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। সম্রাটের প্রতিনিধির কর্তৃত্ব রক্ষা করার পক্ষে তাঁহাদের সৈন্যবাহিনী ছিল অপ্রচুর এবং আয়ও যথেষ্ট ছিল না। সকল শ্রেণীর আইন অমান্যকারী ব্যক্তিরা তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে শুরু করিল।

রাজস্থানে এলোমেলোভাবে রাঠোরদের সহিত যুদ্ধ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত চলিল। জাঠগণ আগ্রা অঞ্চলে আক্রমণ চালাইতে লাগিল। লুণ্ঠনকারী মারাঠা দল মালব এবং গুজরাটে প্রবেশ করিল। কয়েকজন রাজপুত জমিদার মালবে অশান্তি সৃষ্টি করিল। পাঞ্জাবে গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখগণ একটি যোদ্ধা সম্প্রদায়ে পরিণত হইল এবং মুঘল কর্তৃত্বের প্রতিরোধ করিল। বাংলায় ইংরেজ বণিক এবং মুঘল কর্মচারীগণের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইল। ইহার পরিণতিতে দেখা গেল যুদ্ধ (১৬৮৬-৮৯)। স্বেচ্ছায় দাক্ষিণাত্যে নির্বাসন গ্রহণ করিয়া সম্রাট দূরবর্তী প্রদেশগুলির শাসন-ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব হারাইলেন।

আওরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষ দিকে মুঘল সাম্রাজ্যে 'এক নিরাশাব্যঞ্জক পতনোন্মুখ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। শাসন-ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক জীবন, সামরিক শক্তি এবং সামাজিক সংগঠন—সব কিছুই চূড়ান্ত পতন ও ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত দিতেছিল।' বৃদ্ধ সম্রাট পুত্র আজমকে লিখিত তাঁহার শেষ পত্রে বলেন: 'আমি রাজ্যে (প্রকৃত) শাসন করি নাই, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারি নাই। সৈন্যেরা অসহায়, বিভ্রান্ত, আমার মতই চিন্তিত বোধ করিতেছে। দূরদৃষ্টির অভাব হতাশা ছাড়া অন্য কোন ফল আনে না।'

পুত্রদের সহিত আওরঙ্গজেবের সম্পর্ক সুখের ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতানকে তাঁহার শাসনকালের প্রথমেই বন্দী করা হয়, কারণ তিনি সুজার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। রাজপুতদের সাহায্যে মহম্মদ আকবর সিংহাসন দাবি করিয়া শেষ পর্যন্ত পারস্যে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। অপর এক পুত্র শাহ আলম ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত ষড়যন্ত্র করেন; এজন্য তাঁহাকে সাত বৎসর বন্দী করিয়া রাখা হয়। অপর দুই পুত্র, আজম এবং কামবক্স, মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানে একান্তভাবে সাহায্য করেন নাই, কারণ বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের জন্য যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল এবং সেই যুদ্ধে উভয়েই মারাঠাদের সমর্থন লাভের প্রত্যাশী ছিলেন। এই সম্ভাবনা মনে রাখিয়াই আওরঙ্গজেব পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া একটি উইল প্রস্তুত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল 'সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধ এবং জীবহত্যা' নিবারণ করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

আওরঙ্গজেব আহম্মদনগরে এক শুক্রবারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী)। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার অঙ্গুলি ছিল জপমালার উপর এবং মুখে 'কলিমা'র অস্পষ্ট উচ্চারণ। 'তিনি সর্বদাই ইচ্ছা করিয়াছিলেন মুসলমানের পক্ষে পবিত্র দিন শুক্রবারে যেন তাঁহার মৃত্যু হয়। দয়ালু ঈশ্বর তাঁহার অন্যতম প্রকৃত ভৃত্যের এই প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন।'

আওরঙ্গজেবের কৃতিত্ব বিচার

আওরঙ্গজেব কয়েকটি অসাধারণ ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে ব্যক্তিগত সাহস, স্থির মেজাজ এবং নির্ভুল বিবেচনাশক্তির সম্মিলন ঘটিয়াছিল। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে কোন সঙ্গী ছাড়াই তিনি একটি ভয়ঙ্কর উন্মত্ত হস্তীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ৮৭ বৎসর বয়সে ওয়াজিঙ্গেরা অবরোধের সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার ধীশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি অনেক বই পড়িয়া পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ফার্সী কবিতা এবং আরবী ভাষায় রচিত ধর্মতত্ত্বমূলক সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। ভারতবর্ষে

লিখিত ইসলামীয় আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কলন 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' তাঁহার নির্দেশে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তিনি অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতেন এবং সমস্ত বিলাসের ক্ষেত্রে কঠোর নৈতিকতা পালন করিতেন। তাঁহার সমসাময়িকগণ বৃথাই তাঁহাকে 'রাজকীয় পোষাকে সজ্জিত দরবেশ' বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। একবার দেখা কোন মুখ বা একবার শোনা কোন কথা তিনি কখনও ভুলিতেন না। তাঁহার প্রশাসনিক কর্তব্য তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া সম্পাদন করিতেন। তিনি প্রত্যহ একবার দরবারে বসিতেন, কখনও দিনে দুইবারও বসিতেন। তিনি সপ্তাহে একবার বিচার করিতেন। তিনি চিঠিপত্র ও আবেদনের উপরে নিজ হাতে আদেশ লিখিতেন এবং সরকারী চিঠির উত্তরের ভাষা বলিয়া দিতেন। ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে ইতালীয় চিকিৎসক গেমেলি (Gemeli) তাঁহাকে বিনা চশমায় নিজ হাতে আবেদন অনুমোদন করিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার আনন্দিত হাসি মুখ ('cheerful smiling countenance') প্রমাণ করিত যে তিনি এই রকম কাজে ক্লান্তিবোধ না করিয়া খুসি হইতেন।

এইসব গুণ আওরঙ্গজেবকে এমন একজন সৎ পরিশ্রমী শাসকে পরিণত করিয়াছিল যিনি অতিরিক্ত কেন্দ্রীয়করণ পছন্দ করিতেন এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ নষ্ট করিয়াছিলেন। প্রশাসন ও যুদ্ধের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছোট ছোট বিষয়গুলিরও তিনি নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। ফলে তাঁহার কর্মচারীরা 'নির্জীব পুতুলে' পরিণত হইয়াছিল ; তাহারা 'রাজধানী হইতে তাহাদের প্রভু সুতা ধরিয়া টানিলে কাজ করিত'। বিরাট এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রশাসনের এই রকম ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল।

ছোটখাট বিষয়ে অত্যধিক মনোযোগী, কঠোরপ্রকৃতি এবং জেদী এই সম্রাট এমন এক দূরদর্শী 'রাজনীতিবিদে পরিণত হইতে পারেন নাই যিনি নূতন নীতি এবং আইন প্রবর্তন করিয়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন ও চিন্তার গতি নির্ধারণ করিতে পারেন।' তাঁহার চরিত্রে উদারতা, ঔদার্য এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞতার অভাব ছিল। তিনি রাজপুত এবং মারাঠাদিগকে বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহাদের প্রতিরোধের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সাম্রাজ্যের পতন ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। একটি অবাস্তব ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণে তিনি হিন্দুদের প্রতি আকবরের উদার ও বিজ্ঞ নীতির পরিবর্তন ঘটাইয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে আঘাত হানিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কোন পারসিক বা আফগান বাহিনী আতঙ্কের সৃষ্টি করে নাই, কোন ইয়োরোপীয় শক্তি ইহা দখলের জন্য লোভীর মত দৃষ্টি দেয় নাই, বৈদেশিক বণিকগোষ্ঠি ভারতে রাজ্যবিস্তারের কল্পনা করে নাই। তথাপি তিনি তাঁহার বিরাট উত্তরাধিকার ধ্বংসের গ্রাসে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান

১. শিবাজী

মহারাষ্ট্র দেশ এবং জনগণ

পশ্চিম ভারতের যে অংশকে মহারাষ্ট্র বলা হয় তাহার তিনটি আঞ্চলিক ভাগ আছে। পশ্চিম ঘাট এবং ভারত মহাসাগরের মধ্যে আছে 'কোঙ্কন'। কোঙ্কনের পূর্বে আছে 'মাভল' নামে পরিচিত এক সরু ভূখণ্ড। এই মালভূমি আঁকা বাঁকা উপত্যকা দ্বারা বিভক্ত। আরও পূর্বে আছে 'দেশ'—দাক্ষিণাত্যের মধ্য স্থলে অবস্থিত সমতল ভূমি। 'দেশ'ই বিশাল ঢেউ খেলানো কালো মাটির মহারাষ্ট্রে জনগণের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ফলে জনগণ কঠোর অথচ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলের রুক্ষতা, জমির অনুর্বরতা, বৃষ্টির অপ্রাচুর্য এবং কৃষি সমৃদ্ধির অভাব অধিবাসীদের চরিত্রে আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায়, সাহস প্রভৃতি গুণ সঞ্চার করিয়াছে। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন, মারাঠারা 'গর্বিত-মনোভাবসম্পন্ন এবং যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী, তাহারা অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ এবং অপরাধের জন্য প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষী'। ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মারাঠারা বিভিন্ন রাজ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিত। 'এই বিচ্ছিন্ন দলগুলিকে একটি জাতিতে পরিণত করা এবং দাক্ষিণাত্যে মুঘল শাসিত অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করার উপযোগী করা—এই দুইটি কাজের জন্য একজন প্রতিভাশালী নায়কের প্রয়োজন ছিল। শিবাজী ছিলেন এই নায়ক।

মুসলমান শাসনে মহারাষ্ট্র

বহু শতাব্দী ধরিয়া মারাঠারা মুসলমান শাসনাধীন ছিল, কিন্তু উত্তর ভারতের হিন্দুদের তুলনায় তাহাদের অবস্থা ভাল ছিল। মধ্য এশিয়া, পারস্য এবং আবিসিনিয়া হইতে যে সকল মুসলমান ভারতে আসিত তাহাদের আদি বাসস্থান হইতে উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারত বেশী দূরে অবস্থিত ছিল। এই জন্য উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে বিদেশী মুসলমান আগন্তুকদের সংখ্যা কম ছিল। দুই শতাব্দী ধরিয়া বিজয়নগর রাজ্য দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে হিন্দু আধিপত্য রক্ষা করিয়াছিল। মুসলমান সুলতানী রাজ্যগুলিতে গ্রামাঞ্চলে রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাব ফার্সী বা উর্দুর পরিবর্তে স্থানীয় অধিবাসীদের মাতৃভাষায় লেখা হইত। হিন্দুরা রাজস্ব সংক্রান্ত শাসন-ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল।

সৈন্যবাহিনীতে হিন্দুদের একটি স্বীকৃত স্থান ছিল। বাহমনী সুলতানদের দ্বারা নিযুক্ত কয়েকজন মারাঠা মনসবদারের কথা ফিরিস্তা উল্লেখ করিয়াছেন। রানাডে বলিয়াছেন: সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমান রাজাগুলির সুলতানগণ 'প্রকৃতপক্ষে বেসামরিক এবং সামরিক, উভয় বিভাগেই মারাঠা কূটনীতিবিদ এবং মারাঠা যোদ্ধাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেন এবং পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা সংলগ্ন দুর্গগুলি এবং পার্বত্য অঞ্চল মারাঠা জায়গীরদারগণের হস্তে ছিল। এই সকল জায়গীরদার নামে মাত্র মুসলমান রাজাদের অধীন ছিলেন।' এই যুগে নেতৃস্থানীয় মারাঠা নেতাগণ যে রাজনৈতিক এবং সামরিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার গুরুত্ব ব্যক্ত হইয়াছে শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলের জীবনীতে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে মুঘল শক্তি দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করে; ক্রমে তাহা আহম্মদনগর গ্রাস করে এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার উপর বার বার আঘাত হানে। নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন এই দুই সুলতানী রাজ্য শিবাজী এবং শম্ভাজীকে মিত্র হিসাবে পাইল, কারণ তাহাদের সকলের এক শত্রু ছিল মুঘলেরা। এইভাবে বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার অস্তিত্ব শিবাজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূতন মারাঠা রাজ্যের স্থায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়ে। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার পতন (১৬৮৬-৮৭) মারাঠা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সংকটের ইঙ্গিত দেয় (শম্ভাজীর পরাজয় ও প্রাণদণ্ড, ১৬৮৯)। এই দুই সুলতানী রাজ্যের পতনের পরে যে সকল মারাঠা নায়ক তাঁহাদের পুরাতন মর্যাদা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন তাঁহারা মারাঠা রাজ্যে আশ্রয় এবং কর্মের সুযোগ লাভ করেন।

রাজনৈতিক দিক হইতে বলিতে গেলে, শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থানের দুইটি প্রধান কারণ উল্লেখ করা যায়: দক্ষিণের সুলতানী রাজ্যগুলির অধীনে মারাঠাদের তুলনামূলক ভাবে সুবিধাজনক অবস্থা, এবং মুঘল সাম্রাজ্যের রাজ্য দখল নীতির ফলে বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার উপর আঘাত। সামরিক দিক হইতে অনেকাংশে মারাঠা রাজ্যের নিরাপত্তার ভিত্তি ছিল সহজে আত্মরক্ষার উপযুক্ত পার্বত্য দুর্গগুলি। এই সকল দুর্গ থাকার ফলে অশ্বারোহী বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে, এমনকি এক বৎসরের অভিযানেও মারাঠা রাজ্য জয় করা সম্ভব হইত না। বিশাল মুঘল বাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে সহজে নড়াচড়া করিতে পারিত না।

সন্ত এবং লেখকগণ

মারাঠাদের জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ ও রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রের সন্ত এবং লেখকগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্তগণের মধ্যে জ্ঞানেশ্বর এবং নামদেব (ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী), একনাথ এবং তুকারাম (পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী) এবং রামদাসের (সপ্তদশ শতাব্দী) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের সুখপাঠ্য রচনা এবং ভাষণ রাজনৈতিক কার্যকলাপের

ধর্মীয় পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। তাঁহারা জাতিভেদ প্রথাকে দুর্বল করেন এবং সামাজিক সংহতি শক্তিশালী করেন। রামদাস তাঁহার 'দাসবোধ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে যে সকল বাণী লিপিবদ্ধ করেন তাহা মারাঠা জাতির আত্মপ্রকাশের পথ প্রস্তুত করে। মঠে কার্যরত তাঁহার শিষ্যরা তাঁহার বাণী জনগণের নিকট বহন করিয়া লইয়া যায়। বলা হইয়াছে যে শিবাজী তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া প্রথম দিকের 'বখর' (ঐতিহাসিক বিবরণী) এবং প্রশস্তি-গুলির লেখকেরা বলিয়াছেন যে শিবাজীর উত্থান ছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য জনগণের প্রার্থনার উত্তরে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রকাশ। বলা হইয়াছে যে ভগবান বিষ্ণু আওরঙ্গজেবের দ্বারা নির্যাতিত ব্রাহ্মণদের রক্ষা করিবার জন্য একটি নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটি সমৃদ্ধ ভাষা এবং ধর্মভাবে আপ্লুত এক সমৃদ্ধ সাহিত্য চিন্তা এবং ধর্মীয় আদর্শের ক্ষেত্রে ঐক্য স্থাপন করিয়াছিল। এই ঐক্যের ফলে হিন্দু শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়াছিল।

শাহজী ভোঁসলে

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে পুনা জেলার ভোঁসলে পরিবার আহম্মদনগর রাজ্যে সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করে। আহম্মদনগরের নেতৃস্থানীয় হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে অন্যতম লাখজী যাদব রাও-এর কন্যা জিজাবাঈকে বিবাহ করেন শাহজী ভোঁসলে। মুঘল আক্রমণের ফলে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা যখন অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল সেই সময় তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তিনি আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে মালিক অম্বরের সহিত মতবিরোধের ফলে তিনি ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দে বিজাপুরের সুলতানের অধীনে ভাগ্যের সন্ধান করেন। মালিক অম্বরের মৃত্যুর পরে বিশৃঙ্খলার সময়ে তিনি নিজাম শাহী রাজ্যে চাকুরিতে ফিরিয়া আসেন (১৬২৮)। দুই বৎসর পরে তিনি মুঘলদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন (১৬৩০)। ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে তিনি আহম্মদনগরে ফিরিয়া আসেন এবং এক পুতুল নিজাম শাহী সুলতানকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। ১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি পুনরায় বিজাপুরের চাকুরিতে যোগ দেন। শাহজীর জীবনের এই সকল ঘটনা হইতে দক্ষিণ ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ তাঁহার পুত্র শিবাজীর জীবনের সহিত যুক্ত। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিবাজী : প্রথম জীবন

শাহজী এবং জিজাবাঈ-এর দ্বিতীয় পুত্র শিবাজীর জন্ম হয় ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দের ৬ এপ্রিল (অথবা ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারী) তারিখে, শিবনেরের (মারেরজু

নিকট) পার্বত্য দুর্গে। ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে মতপার্থক্যের ফলে শাহজী তাঁহার শ্বশুর পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং জিজাবাঈ স্বামীর উপেক্ষিতা স্ত্রী রূপে অসুখী জীবন যাপন করিতেন। বিজাপুরের চাকুরিতে যোগদানের পরে (১৬৩৬) শাহজী মহারাষ্ট্র ত্যাগ করেন এবং আদিল শাহী সুলতানের পক্ষে রাজ্য জয় করিবার জন্য কর্নাটকে যুদ্ধে নিজেকে জড়িত রাখেন। তাঁহার প্রিয় পত্নী তুকাবাঈ এবং তাঁহার পুত্র ব্যাঙ্কোজী তাঁহার সঙ্গে যান। জিজাবাঈ এবং শিবাজীকে পুনাতে দাদাজী কোণ্ডদেবের অভিভাবকত্বে রাখা হয়। ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে হইতে ১৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে দাদাজীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে রাজগড়ে তাঁহারা স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। এই দশ বৎসর তাঁহারা পুণাতেই বসবাস করেন।

ধর্মের প্রতি অনুরক্ত এবং পৌরাণিক কাহিনীতে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন জিজাবাঈ ছিলেন তাঁহার পুত্রের সদাসতর্ক অভিভাবিকা। উপেক্ষিত অবস্থায় শাহজী হইতে বিচ্ছিন্নভাবে একত্রে বাস করিবার ফলে মাতা এবং পুত্রের মধ্যে একটি অপূর্ব ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া ওঠে। শিবাজী রামায়ণ এবং মহাভারতে বর্ণিত বীরত্বের কাহিনীগুলির সহিত পরিচিত হন। কিন্তু তাঁহাকে পড়িবার এবং লিখিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। শারীরিক কলাকৌশল এবং রোমাঞ্চকর অভিযানের প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ঘোড়ায় চড়া এবং যুদ্ধবিদ্যায় তিনি বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করেন। মাভল নামে পরিচিত পার্বত্য অঞ্চলের পরিশ্রমী কৃষকদের সহিত যোগাযোগের ফলে তিনি নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। মাভলের কৃষকেরা পরবর্তী কালে তাঁহার সর্বাপেক্ষা অনুগত এবং দক্ষ সৈন্যে পরিণত হয়। শাহজীর পুনা জায়গীরের ভারপ্রাপ্ত দাদাজী কোণ্ডদেবের নিকট হইতে শিবাজী প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন।

১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে মাতা এবং অভিভাবকের সহিত শিবাজী বাঙ্গালোরে শাহজীর কাছে যান। একটি স্বতন্ত্র দরবার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পিতা পুত্রকে দেন। শাহজীর জীবনকালে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে পূর্ণ মালিক হিসাবে, পুনা জায়গীরের ভার আনুষ্ঠানিক ভাবে শিবাজীর উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে দাদাজীর মৃত্যুর পরে শিবাজী পুনা জায়গীরে প্রকৃত শাসকে পরিণত হন।

শিবাজী : প্রাথমিক অভিযান

শিবাজীর প্রাথমিক অভিযানে বিজাপুর রাজ্য আক্রান্ত হয়। আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিনা যুদ্ধে তোর্ণা দুর্গ দখল করেন। ইহার পাঁচ মাইল পূর্বে তিনি রাজগড় নামে একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন। চাকন এবং কোণ্ডানা (সিংহগড়) দুর্গগুলি দখল করা হয়। ক্রমে তিনি একটি মোটামুটি বৃহৎ অঞ্চল নিজ নিয়ন্ত্রণে আনিলেন। এই অঞ্চলটি কতকগুলি পার্বত্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করা হইল।

১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে শাহজীকে বন্দী করা হয় এবং তাঁহার সকল সম্পত্তি ও সৈন্য জিঞ্জির (দক্ষিণ আর্কট জিলা, তামিল নাড়ু) বিজাপুরী সেনাপতি দখল করেন। জিঞ্জি অবরোধের সময় বিজাপুরের সুলতানের আনুগত্য অস্বীকার করিবার জন্য তিনি এই শাস্তি পান। কেন্দ্রীয় মুঘল সরকারের হস্তক্ষেপে পিতার মুক্তি আদায় করিবার জন্য শিবাজী দাক্ষিণাত্যে মুঘল রাজপ্রতিনিধি শাহ্‌ জাহানের পুত্র মুরাদের সহিত যোগাযোগ করেন। সম্রাট আদিল শাহের উপরে কোন চাপ সৃষ্টি করিতে অস্বীকার করেন। ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে জনৈক বিজাপুরী অভিজাত ব্যক্তির মধ্যস্থতায় শাহজী মুক্তি লাভ করেন। প্রতিদানে বাঙ্গালোর, কোণ্ডানা এবং কন্দর্পীর দুর্গগুলি সুলতানকে দিতে হয়।

পরবর্তী ছয় বৎসর শিবাজী বিজাপুরকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করেন নাই, কারণ তাঁহার পিতার মুক্তি হইয়াছিল এই সর্তে যে তিনি (শিবাজী) বিজাপুর সম্বন্ধে ভাল ব্যবহার করিবেন। কিন্তু তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করেন : মারাঠা ব্রাহ্মণ অধিকারীদের নিকট হইতে পুরন্দরের পার্বত্য দুর্গ (১৬৪৮), জাভলী নামক মারাঠা রাজ্য, এবং মো'রে বংশীয় মারাঠা অধিকারীদের নিকট হইতে রায়গড় দুর্গ (১৬৫৬)। পুরন্দর এবং জাভেলীতে শিবাজী কার্যকরী অস্ত্র হিসাবে বিশ্বাসঘাতকতার পথ নেন। 'তাঁহার ক্ষমতা তখন ছিল শৈশব অবস্থায়, এবং নিজেকে শক্তিশালী করিবার জন্য উপায় খুঁজিবার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।' জাভলী দখলের ফলে দক্ষিণে এবং পশ্চিমে রাজ্যবিস্তারের পথে বাধা দূরীভূত হয়। শিবাজীর সৈন্যবাহিনীতে মাভল অঞ্চল হইতে পদাতিক বাহিনী সংগ্রহ করার পথও ইহার দ্বারা প্রসারিত হয়।

শিবাজী এবং মুঘলগণ : প্রথম পর্ব (১৬৫৭)

পতনোন্মুখ বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিবার সময় শিবাজী সতর্কতার সহিত মুঘলদের সহিত শান্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু হইল। তখন দাক্ষিণাত্যে মুঘল রাজপ্রতিনিধি আওরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি শুরু করিলেন। শিবাজী আওরঙ্গজেবের সহিত বোঝাপড়া করিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে সুবিধাদানের অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিলেন। শিবাজী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের অধিকৃত অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ লুণ্ঠন করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের গতি বিজাপুরের অনুকূলে পরিবর্তন করা। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি জুন্নার লুণ্ঠন করিলেন এবং তাঁহার সেনানায়কগণ দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের প্রধান কেন্দ্র আহম্মদ-নগরের দ্বার পর্যন্ত লুটপাট চালাইল। তখন মারাঠাদের উপর আওরঙ্গজেবের প্রতিশোধমূলক চাপ খুব কঠিন হইল এবং বিজাপুরের সুলতান তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। শিবাজী অসুবিধায় পড়িয়া আওরঙ্গজেবের কাছে প্রতিনিধি

পাঠাইলেন আওরঙ্গজেব তাঁহাকে 'ক্ষমা' করিলেন, কারণ তিনি নিজে বাদশাহী সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতের দিকে যাত্রা শুরু করিতে-ছিলেন। দৃঢ়চেতা মারাঠা বীরকে ধ্বংস করিবার সময় তাঁহার ছিল না।

শিবাজী এবং বিজাপুর : আফজল খাঁ (১৬৫৯)

উত্তর ভারতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ এবং দক্ষিণে বিজাপুরী অভিজাতদের মধ্যে বিরোধের সুযোগ লইয়া শিবাজী 'দেশে' (সাতারা জেলার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত) এবং উত্তর কোঙ্কনে (মাহুলি হইতে মাহাদের কাছাকাছি জায়গা পর্যন্ত) রাজ্য বিস্তার করিলেন। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে মুঘল আক্রমণ হইতে মুক্ত বিজাপুরের সুলতান এক উচ্চপদস্থ অভিজাত আফজল খাঁর অধীনে শিবাজীর বিরুদ্ধে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠাইলেন। ইংরাজ বণিকদের লিখিত তথ্য হইতে জানা যায় যে আফজল খাঁকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, শিবাজীর সহিত 'বন্ধুত্বের ভাণ' করিয়া তাঁহাকে বন্দী বা হত্যা করার জন্য। বিজাপুরী সেনাপতি একটি বন্ধুত্বসূচক সংবাদ সহ শিবাজীর নিকট এক প্রতিনিধি পাঠাইলেন, একটি বৈঠকের জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইলেন, এবং তাঁহার অধিকৃত অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শিবাজী সংবাদ সংগ্রহ করিলেন যে আফজল খাঁ বিশ্বাসঘাতকতার কথা চিন্তা করিতেছেন। প্রতাপগড় দুর্গের নীচে তিনি বিজাপুরী সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার অস্ত্র না থাকিলেও তাঁহার অঙ্গুলিতে এবং হাতে অস্ত্র লাগানো ছিল। শিবাজীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিবার সময় আফজল খাঁ একটি ছুরিকা দ্বারা শিবাজীর পার্শ্বদেশে আঘাত করেন। শিবাজী আহত হইলেন না, কারণ গুপ্ত বর্ম দ্বারা তাঁহার দেহ সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার গোপন অস্ত্র দ্বারা আফজল খাঁকে আঘাত করিলেন এবং আফজল খাঁ নিহত হইলেন। ইহা ছিল মারাঠা বীরের পক্ষে আত্মরক্ষামূলক কার্য, বিশ্বাসঘাতকতামূলক হত্যা নয়। পূর্ব-পরিকল্পিত সঙ্কেত অনুসারে তাঁহার সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিজাপুরী সৈন্যদের হত্যা করিল এবং বহুল পরিমাণে লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করিল (১৬৫৯)।

পরবর্তী কয়েক মাসে (১৬৫৯-৬০) মারাঠাগণ দক্ষিণ কোঙ্কন এবং কোলাপুর জেলায় প্রবেশ করে; পানহালার দুর্গ-টি দখল করা হয়, কিন্তু একটি বিজাপুরী সৈন্যবাহিনী তাহা পুনরায় দখল করে।

শিবাজী এবং মুঘলগণ : দ্বিতীয় পর্ব (১৬৬০-৬৫)

বাদশাহী সিংহাসনে নিশ্চিতভাবে নিজের অধিকার স্থাপন করিয়া আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার মাতুল, দক্ষ ও অভিজ্ঞ সেনাপতি শায়েস্তা খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। শিবাজীকে দমন করিবার জন্য তাঁহাকে ১৬৬০

খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে নির্দেশ দেওয়া হইল। শিবাজীর বিরুদ্ধে একটি যৌথ মুঘল-বিজাপুরী অভিযান শুরু হইল। মুঘল বাহিনী উত্তর হইতে এবং বিজাপুরীগণ দক্ষিণ হইতে অগ্রসর হইল। শায়েস্তা খাঁ পুনা, চাকা এবং উত্তর কোঙ্কন দখল করিলেন। শিবাজী বিজাপুরের সহিত সন্ধি করিলেন এবং মুঘলদের প্রতিরোধের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি পুনাতে রাত্রিকালে এক আকস্মিক আক্রমণে শায়েস্তা খাঁকে তাঁহার শয়নকক্ষে আহত করিলেন এবং তাঁহার এক পুত্রকে হত্যা করিলেন। এই সাফল্যে তাঁহার সম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। ব্যর্থ রাজপ্রতিনিধিকে শাস্তিস্বরূপ বাংলায় বদলি করা হইল।

১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে শিবাজী একটি ভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার সাহসের পরিচয় দিলেন। তিনি সুরাটের সমৃদ্ধ বন্দর লুট করিলেন এবং এক কোটি টাকার বেশী মূল্যের লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। ইংরাজ বণিকেরা লিখিয়াছেন যে তিনি 'পার্শ্ববর্তী সকল রাজাদের নিকট সন্ত্রাসস্বরূপ ছিলেন।'

শায়েস্তা খাঁর ব্যর্থতায় এবং সুরাটের বিপর্যয়ে দুঃখিত আওরঙ্গজেব তাঁহার সর্বাপেক্ষা যোগ্য সেনাপতি জয়পুরের মীর্জা রাজা জয় সিংহ এবং দিলীর খাঁকে শিবাজীকে দমন করিবার জন্য পাঠাইলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে দীর্ঘদিন কর্ম সূত্রে এই রাজপুত রাজা যুদ্ধ এবং কূটনীতি সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণাবলীর মধ্যে ছিল 'দূরদৃষ্টি, রাজনৈতিক চতুরতা, মধুর বাক্য ও সুচিন্তিত নীতি। তিনি ছিলেন কৌশল এবং ধৈর্যের অধিকারী, মুসলমানদের আনুষ্ঠানিক সৌজন্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, উর্দু এবং রাজস্থানী ভাষা ছাড়াও তুর্কী এবং ফার্সীতে জ্ঞানসম্পন্ন। এই সকল গুণের জন্য তিনি ছিলেন মুঘল সম্রাটদের পতাকা বহনকারী আফগান এবং তুর্কী, রাজপুত এবং হিন্দুস্থানীদের মিশ্রিত বাহিনীর এক আদর্শ নায়ক।'

জয়সিংহ সম্রাটের নিকট হইতে পূর্ণ বেসামরিক ও সামরিক ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তিনি বিজাপুরের সুলতানকে পক্ষে আনিবার জন্য, শিবাজীর শত্রুদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য, এবং তাঁহার কর্মচারীদের প্রলুব্ধ করিয়া বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করিবার জন্য কূটনীতি প্রয়োগ করিলেন।

জয়সিংহ পুরন্দর অবরোধ করিলেন (১৬৬৫) এবং মারাঠা গ্রামগুলিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য একটি দ্রুতগামী সৈন্যদল পাঠাইলেন। এইভাবে তাঁহার অভিযান শুরু হইল। যখন পুরন্দরের পতন আসন্ন হইয়া উঠিল তখন শিবাজী শান্তি স্থাপন করাই বিজ্ঞজনোচিত কার্য বলিয়া মনে করিলেন। তিনি জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল (১৬৬৫)। শিবাজী ২৩টি দুর্গ এবং বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা আয়ের ভূখণ্ড ছাড়িয়া দিলেন। রাজগড় সহ ১২টি দুর্গ এবং ৪ লক্ষ টাকা আয়ের ভূখণ্ড তাঁহার অধিকারে রহিল এই সর্তে

যে তিনি সম্রাটের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার প্রতি অনুগত থাকিবেন। তিনি নিজে বাদশাহী দরবারে উপস্থিত থাকিবার দায় হইতে মুক্তি চাহিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহার পুত্র পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সহ দরবারে উপস্থিত থাকিবেন। এই ব্যবস্থাও করা হইল যে যদি তিনি নিজ সৈন্যের দ্বারা বিজাপুর রাজ্যের এক অংশ দখল করিবার অনুমতি পান তবে তিনি সম্রাটকে প্রচুর অর্থ দিবেন। বিজাপুর এবং মারাঠাগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির জন্য কূটবুদ্ধি জয়সিংহ এই বন্দোবস্ত করিলেন।

আগ্রায় শিবাজী (১৬৬৬)

শিবাজীর সহিত মীমাংসার পর জয়সিংহ বিজাপুর আক্রমণ করিলেন এবং শিবাজী মুঘল পতাকাতলে যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু এই অভিযান সামরিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল (১৬৬৫-৬৬)। সম্রাট অসন্তুষ্ট হইলেন। জয়সিংহকে দরবারে ডাকিয়া পাঠানো হইল; ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে আগ্রার পথে তাঁহার মৃত্যু হইল। ইতিমধ্যে তিনি আগ্রায় বাদশাহী দরবারে যাইবার জন্য শিবাজীকে প্ররোচিত করেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এক হাজার কৌশল প্রয়োগ করেন। তিনি শিবাজীকে আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি দেন এবং বাদশাহী দরবারে তাঁহার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার শপথ গ্রহণ করেন।

মাতা জিজাবাঈকে প্রতিনিধি রাখিয়া শিবাজী ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভাজী, কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং ২৫০ সৈন্য সহ আগ্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। আগ্রাতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দরবারে সম্রাটের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। সম্রাট তাঁহার সহিত কোন কথা বলিলেন না এবং তাঁহাকে সম্মানসূচক পোষাক দিলেন না। শিবাজী যে ধরণের সম্বর্ধনা আশা করিয়াছিলেন তাহা তিনি পাইলেন না। দরবার হইতে বাহির হইবার পরেই তিনি বন্দী হইলেন; গোলন্দাজ বাহিনী সহ সৈন্যগণ তাঁহার বাসগৃহ পাহারা দিল। যখন জয়সিংহ এই খবর শুনিলেন তখন তিনি তাঁহার পুত্র, এবং দরবারে তাঁহার প্রতিনিধি রাম সিংহকে শিবাজীর নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য নির্দেশ পাঠাইলেন। সম্রাটের পরিকল্পনা ছিল যে ইউসুফজাই এবং আফ্রিদি বিদ্রোহীগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শিবাজীকে উত্তর-পশ্চিমে পাঠানো হইবে; কিন্তু তাঁহাকে পথেই হত্যা করা হইবে এবং এই হত্যাকাণ্ডকে আকস্মিক ঘটনা হিসাবে অথবা শত্রুর একটি ফাঁদের পরিণতি হিসাবে প্রচার করা হইবে।

শিবাজীর বুদ্ধিবলে আওরঙ্গজেবের এই কূট পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল। তিনি কৌশলে আগ্রা হইতে পলায়ন করিলেন এবং রাজগড়ে পৌঁছিলেন (১৬৬৬)। মুঘলেরা যাহাতে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে না পারে সেজন্য তিনি আগ্রা হইতে সরাসরি মহারাষ্ট্রে যাইবার যে পথ ছিল সেই পথে না গিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত

পথে গিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহার শেষ উইলে শিবাজীর পলায়নের জন্য তাঁহার নিজের অসতর্কতাকে দায়ী করিয়াছেন।

শিবাজী এবং মুঘলগণ : তৃতীয় পর্ব (১৬৭০-৭৫)

আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে শাসন ব্যবস্থা সংগঠিত করিতে, দুর্গগুলিকে শক্তিশালী করিতে, এবং বিজাপুর ও জঞ্জিরার সিদ্দিগণের নিকট হইতে পশ্চিম উপকূলে রাজ্য উদ্ধার করিতে শিবাজীর সময়ের প্রয়োজন ছিল। তিন বৎসর তিনি মুঘলদের সহিত বিরোধ এড়াইয়া যান। জয় সিংহের বদলে যে সকল মুঘল সেনাপতি আসিয়াছিলেন—তাঁহারা সম্রাটের পুত্র মুয়াজ্জম, যশোবন্ত সিংহ এবং দিলীর খাঁ—পারস্পরিক বিরোধে লিপ্ত ছিলেন এবং মারাঠাগণের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অনুসরণ করিতে পারেন নাই। উপরন্তু, উত্তর-পশ্চিমে ইউসুফজাই-গণের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের সামরিক সম্পদ নষ্ট করিয়াছিল। উভয় পক্ষের স্বার্থেই একটি সমঝোতার প্রয়োজন ছিল। আওরঙ্গজেব শিবাজীর 'রাজা' উপাধি স্বীকার করিলেন (১৬৬৮), কিন্তু তাঁহার কোন দুর্গ ফিরাইয়া দিলেন না।

১৬৭০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে শান্তি ভঙ্গ হইল। পুরন্দরের সন্ধির দ্বারা শিবাজী যে সকল দুর্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহার কয়েকটি তিনি পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহার মধ্যে কোণ্ডানাও ছিল। সুরাটের ইংরাজ কুঠির কর্তারা লিখিয়াছেন : 'শিবাজী এখন পূর্বের ন্যায় তস্করের মতন অগ্রসর হন না, কিন্তু জাঁকজমক সহ ৩০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী সহ রাজ্য জয় করিতে করিতে অগ্রসর হন, এবং বাদশাহ-পুত্র মুয়াজ্জম তাঁহার কাছাকাছি উপস্থিত থাকিলেও বাধাপ্রাপ্ত হন না।' ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বার সুরাট লুণ্ঠিত হইল। ৬৬ লক্ষ টাকার লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করা হইল। বাগলানা, খান্দেশ এবং বেরার লুণ্ঠন করা হইল। পরপর মুঘল সেনাপতিগণ—দাউদ খাঁ, মহাবৎ খাঁ, বাহাদুর খাঁ—শিবাজীর সাফল্যের ঢেউকে প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইলেন। বিজাপুরের দুর্বলতার সুযোগে তিনি পানহালা এবং সাতারার দুর্গ দখল করিলেন (১৬৭৩)। মুঘলদের বিরুদ্ধে সফল তৎপরতা চলিতে লাগিল, কিন্তু ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে শান্তিস্থাপনের জন্য মৌখিক আলোচনা দ্বারা শিবাজীর অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইল।

শিবাজীর অভিষেক

১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে রায়গড়ে শিবাজীর অভিষেক অনুষ্ঠিত হইল ; তিনি 'ছত্রপতি' উপাধি সহ রাজা হইলেন। ইহা একটি শূন্যগর্ভ অনুষ্ঠান ছিল না ; ইহার সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। বিজাপুরের দিক হইতে দেখিতে গেলে এতদিন শিবাজী ছিলেন 'অধীনস্থ জায়গীরদারের বিদ্রোহী পুত্র'। মুঘল সরকার তাঁহাকে কেবলমাত্র জমিদার হিসাবে দেখিত। অবশ্য ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব

তাঁহার 'রাজা' উপাধি স্বীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই যুগে বহু জমিদার এবং উচ্চপদস্থ মুঘল কর্মচারী এই উপাধি ব্যবহার করিতেন। আকবরের যুগে তোডর মল এবং আওরঙ্গজেবের প্রথম যুগের বাদশাহী দেওয়ান রঘুনন্দনের রাজা উপাধি ছিল। একটি স্বাধীন রাজ্যের কার্যকরী শাসক হইলেও শিবাজীর একজন সার্বভৌম শাসকের মর্যাদা এবং রাজকীয় বিশেষ অধিকার ছিল না। তিনি জনগণের আনুগত্য, অন্যান্য শাসক রাজাদের সহিত সম-মর্যাদায় চুক্তি স্বাক্ষরের অধিকার, এবং একটি আইনসঙ্গত স্থায়ী ভিত্তিতে জমি দান করিবার অধিকার দাবি করিতে পারিতেন না। এই অভিষেক এই সকল রাজনৈতিক অসুবিধা দূর করিল।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে, রাজশক্তি ছিল ক্ষত্রিয়দের একচেটিয়া অধিকার। শিবাজী ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কিন্তু তখনকার জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত, ধর্মশাস্ত্রবিদ এবং তার্কিক, বারাণসীর গগভট্ট শিবাজীকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। তিনি একটি কল্পিত ভোঁসলে বংশাবলী গ্রহণ করিয়া উহার ভিত্তিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ভোঁসলেগণ ছিলেন মেবারের রাণার বংশধর। মেবারের রাণাগণ প্রাচীন সূর্য বংশীয় ছিলেন। ১১ হাজার ব্রাহ্মণ অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠান 'পুরাতন আর্য ঐতিহ্যের অনুকরণে সম্পন্ন করা হয়।'

কর্নাটক জয়

শিবাজীর পূর্ব (অথবা বিজাপুরী) কর্নাটক আক্রমণকে (১৬৭৭-৭৮) 'তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অভিযান' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি এই অঞ্চলের সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্র ছিল উর্বর, খনিজ সম্পদ ছিল প্রচুর ; তাহা ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে বহুল পরিমাণে রাজস্ব সংগৃহীত হইত। 'কর্নাটক সমতল ভূমি অথবা মাদ্রাজ উপকূল সেই যুগে স্বর্ণাঞ্চল নামে পরিচিত ছিল।' এই অঞ্চল রক্ষা করিবার পক্ষে বিজাপুর ছিল খুবই দুর্বল। স্থানীয় মুঘল সেনাপতির সহিত সন্ধি করিয়া শিবাজী মুঘলদের নিরপেক্ষতার ব্যবস্থা করেন। তিনি গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতা করেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে মারাঠাদের সাহায্য লাভের জন্য কুতব শাহের হিন্দু মন্ত্রী মদন্না ৪ লক্ষ টাকার বার্ষিক কর দিতে রাজী হন। ইহার পরে শিবাজী স্বয়ং কুতব শাহের নিকটে যান। কুতব শাহ ৪½ লক্ষ টাকা মাসিক সাহায্য হিসাবে দিতে এবং ৫,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী দিতে সম্মত হন।

১৬৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দে শিবাজী জিঞ্জি এবং ভেলোরের দুর্গ দুইটি দখল করেন, এবং 'মারাঠা আক্রমণের বন্যায় কর্নাটকের সমতলভূমি প্লাবিত হয়।' তিনি মহীশূরের মধ্য দিয়া মহারাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করেন ; পথে সমতল ভূমির উত্তর,

পূর্ব এবং মধ্য অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি দখল করা হয়। এই অভিযানের সময় যে সকল অঞ্চল অধিকার করা হইয়াছিল তাহার বার্ষিক আয় ছিল ৮০ লক্ষ টাকা, এবং ইহার মধ্যে ছিল ১০০টি দুর্গ। সেই সময়ে এই অভিযানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল প্রচুর ধনসম্পদ লাভ। ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজদের কুঠি হইতে লিখিত পত্রে বলা হইয়াছে: 'স্পেনে সীজারের (Julius Caesar) মত সুখী সাফল্য সহ, তিনি (শিবাজী) আসেন, দেখেন এবং জয় করেন ('came, saw and conquered')। তিনি স্বর্ণ, হীরা, পান্না, চুণী ও প্রবালের এত সম্পদ সংগ্রহ করিলেন যাহা ভবিষ্যতে তাঁহার বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখিতে তাঁহার বাহুতে শক্তি সঞ্চার করিল।'

শিবাজী : শেষ জীবন

কর্নাটক অভিযান হইতে ফিরিবার পরে শিবাজীর সহিত গোলকুণ্ডা এবং মুঘলদের বিরোধ হয়। কুতব শাহ ক্ষুব্ধ হন, কারণ যে বিজয় অভিযানের জন্য তিনি অর্থ, সৈন্য এবং গোলন্দাজ বাহিনী দিয়াছিলেন সেই অভিযানে লুণ্ঠিত দ্রব্যের তিনি কোন অংশ পান নাই। মুঘলগণ বিজাপুরের বিরুদ্ধে নূতন অভিযান শুরু করে (১৬৭৯)। শিবাজী বিজাপুরের পক্ষ নেন এবং মুঘল অধিকৃত দাক্ষিণাত্যের এক বিরাট অংশ লুট করেন। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দের ৩ এপ্রিল শিবাজীর মৃত্যু হয়।

শিবাজী এবং ইয়োরোপীয় বণিকগণ

পশ্চিম উপকূলে শিবাজীর সহিত ইংরাজ এবং পর্তুগীজ বণিকদের কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। ১৬৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে রাজাপুরের বন্দর উপলক্ষ করিয়া ইংরেজদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। সুরাটে তাঁহার আক্রমণের সময়েও (১৬৬৪, ১৬৭০) ইংরাজদের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। হেনরী অক্সিনডেনের (Oxinden) নেতৃত্বে একটি ইংরাজ প্রতিনিধি দল আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে রায়গড়ে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পর্তুগীজদের সহিত শিবাজীর বিরোধের প্রধান কারণ ছিল ভারত মহাসাগরে তাহাদের আধিপত্য করিবার দাবি। তাহারা দাবি করিত যে এই মহাসাগরে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে তাহাদের সকলকেই পর্তুগীজ সরকারকে অর্থ দিয়া অনুমতিপত্র নিতে হইবে। তাহাদের বাণিজ্যে শিবাজীর কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ এবং তাহাদের কর্তৃত্বাধীন দখল অঞ্চলে তাঁহার চৌথের দাবির তাহারা প্রতিবাদ করিত। এই সকল বিরোধ অবশ্য সংঘর্ষে পরিণত হয় নাই। বিজাপুর এবং মুঘলদের সহিত শিবাজীর যুদ্ধের সময় পর্তুগীজগণ নিরপেক্ষ থাকিত।

শিবাজী এবং সিদ্দিগণ

পশ্চিম ঘাট হইতে উপকূলবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত শিবাজীর ক্ষমতার বিস্তৃতির ফলে তাঁহার সহিত পর্বতসঙ্কুল উপদ্বীপ জঞ্জিরা এবং দণ্ড রাজাপুরীর সিদ্দিদের যোগাযোগ হয়। তাহারা ছিল আবিসিনিয়া হইতে আগত মুসলমান। তাহাদের নৌশক্তি তাহাদিগকে উপকূলবর্তী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং উপকূলবর্তী অঞ্চল লুটপাট কবিতে সাহায্য করিত। শিবাজী তাহাদের লুটপাট নিয়ন্ত্রিত করেন, কিন্তু তিনি জঞ্জিরা দখল করিতে ব্যর্থ হন।

শিবাজী : রাজ্যের বিস্তৃতি

শিবাজী একটি বিরাট রাজ্য রাখিয়া যান। পশ্চিম দিকে ইহা উত্তরে রামনগর (সুরাট অঞ্চলে ধরমপুর) হইতে দক্ষিণে কারওয়ার (পর্তুগীজ, ইংরাজ এবং সিদ্দি অধিকৃত অঞ্চল ছাড়া) বিস্তৃত ছিল। পূর্ব দিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাগলানা, নাসিক-পুনা-কোলাপুর জেলাগুলির কোন কোন অংশ এবং সমগ্র সাতারা জেলা। এই অঞ্চলে ছিল তাঁহার 'স্বরাজ' (নিজ রাজ্য) অথবা 'মুল্ক-ই-কাদিম' ('পুরাতন অঞ্চল')। দ্বিতীয় অঞ্চল ছিল পশ্চিম কর্নাটক—অর্থাৎ বেলারী জেলার অপর দিকে, বেলগাঁও হইতে তুঙ্গভদ্রার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত, কানাড়ী ভাষী অঞ্চল। তৃতীয় অঞ্চলের মধ্যে ছিল পূর্ব কর্নাটক, মহীশূরের উত্তর মধ্য-পূর্ব অংশ এবং বেলারী-চিত্তুর-আর্কট জেলাগুলির কয়েকটি অংশ। চতুর্থ অঞ্চলে তাঁহার অধিকার ছিল বিতর্কিত : দক্ষিণ ধারওয়ার, সুন্দা এবং বেদনুর সহ কানাড়া উচ্চভূমি। এই চারিটি অঞ্চলের বাহিরে ছিল 'একটি বিস্তৃত এবং সদা পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ভূমিখণ্ড যাহা তাঁহার ক্ষমতার অধীন কিন্তু সার্বভৌম আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না'। এই অঞ্চল হইতে চৌথ আদায় করা হইত, কিন্তু ইহা তাঁহার শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

চৌথ এবং সরদেশমুখী

চৌথ শব্দটির অর্থ নির্ধারিত ভূমি-রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ। মারাঠাদিগকে এই অর্থ দিয়া সাধারণ লোকের বিশেষ কোন সুবিধা হইত না। তাহারা মারাঠা সৈন্যদের লুটপাট হইতে মুক্তিলাভ করিত, কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণ অথবা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব মারাঠা রাষ্ট্র গ্রহণ করিত না। চৌথ ছিল একটি শত্রুকে শান্ত রাখিবার একটি ব্যবস্থা, সকল শত্রুর বিরুদ্ধে একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নহে। বিজিত অঞ্চল হইতে আদায়ীকৃত কর হিসাবে ইহাকে বর্ণনা করা সম্ভবতঃ সঠিক নহে। মুঘল এবং বিজাপুরী শাসনাধীন অঞ্চলগুলি হইতে অর্থ আদায়ের জন্য শিবাজী এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলগুলি তিনি লুটপাট করিতে পারিতেন, কিন্তু দখল করিতে পারেন নাই।

কয়েকটি অঞ্চলে তিনি 'সরদেশমুখ' নামে পরিচিত ভূমি-রাজস্বের একটি অতিরিক্ত শতকরা দশভাগ কর আরোপ করিতেন। তাঁহার যুক্তি ছিল যে তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের বংশানুক্রমিক প্রধান (সরদেশমুখ)। এই কর যাহারা দিত তাহারা বিনিময়ে কোন রকম সুবিধা পাইত না।

বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা

শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী অন্যান্য শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ। তাঁহার শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসরে তিনি আট জন মন্ত্রীর ('অষ্ট প্রধান') সাহায্যে রাজ্য শাসন করেন। মন্ত্রীগণের মধ্যে প্রধান (মুখ্য প্রধান) ছিলেন 'পেশোয়া'। তিনি সাধারণ শাসন-ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করিতেন এবং রাজার অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতেন। তিনি অবশ্য আধুনিক অর্থে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না (অর্থাৎ অন্যান্য মন্ত্রীরা তাঁহার দ্বারা মনোনীত এবং নিয়ন্ত্রিত ছিলেন না)। 'মজমুয়াদার' অথবা 'অমাত্য' (হিসাবপরীক্ষক) সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা কবিতেন। 'ওয়াকিয়ানবিস' অথবা 'মন্ত্রী' (তথ্য লেখক) রাজার কার্যকলাপ, রাজসভার ঘটনা প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। 'সুরুনবিশ' অথবা 'সচিব' রাজকীয় চিঠিপত্রের খসড়ার তত্ত্বাবধান করিতেন এবং 'মহল' ও 'পরগণা' গুলির হিসাব পরীক্ষা করিতেন। 'দবীর' অথবা 'সুমন্ত' (বৈদেশিক সচিব) বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে রাজাকে পরামর্শ দিতেন, অন্যান্য রাষ্ট্র সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করিতেন এবং বিদেশী দূতদিগকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতেন। 'সর-ই-নৌবত' (সেনাপতি) ছিলেন সামরিক বাহিনীর প্রধান। 'পণ্ডিতরাও' আবার 'দানাধ্যক্ষ'ও ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ-দিগকে পুরস্কৃত করিতেন, ধর্মীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন এবং ধর্ম ও নৈতিক চরিত্র সংক্রান্ত অপরাধ দিতেন। 'ন্যায়াধীশ' (প্রধান বিচারপতি) দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন। 'পণ্ডিতরাও' এবং ন্যায়াধীশ ব্যতীত অন্যান্য সকল মন্ত্রীকে বিশেষ প্রয়োজন হইলে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বভার নিতে হইত। তাঁহাদের সাধারণ কর্তব্যের সহিত এই সামরিক দায়িত্ব পালন করিতে হইত। উপরন্তু, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ তিন জনকে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্বেও রাখা হইত।

'চিৎনিস' নামে এক উচ্চ পর্যায়ের রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি রাজার চিঠিপত্রের খসড়া করিতেন। তাঁহাকে মন্ত্রী রূপে গণ্য করা হইত না। মন্ত্রীগণ ছিলেন রাজার ভৃত্য; রাজা তাহাদের ইচ্ছামত নিযুক্ত ও বরখাস্ত করিতে পারিতেন। মন্ত্রীগণ সকল বিষয়েই রাজার আদেশ পালন করিতেন। মন্ত্রীরা সম্মিলিত হইয়া যৌথ ভাবে নীতি নির্ধারণ করিবেন এমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। মন্ত্রীগণকে লইয়া আধুনিক ধরনের মন্ত্রীসভা (Council of

Ministers গঠিত হইত না। নিজ কার্যের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রীর একক দায়িত্ব ছিল রাজার কাছে ; সকল মন্ত্রীর মিলিত ভাবে যৌথ দায়িত্ব (Collective responsibility) ছিল না।

শিবাজী তাঁহার রাজ্যকে আটটি প্রদেশে ('প্রান্ত' , বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি প্রদেশ আবার 'পরগণা' এবং 'তরফে' বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন একজন রাজপ্রতিনিধি। তাঁহাকে সাহায্য করিতেন আট জন প্রধান কর্মচারী। কর্নাটকের রাজপ্রতিনিধির অন্যান্যদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ছিল।

রাজস্ব-ব্যবস্থা

আহম্মদনগর রাজ্যে মালিক অম্বর যে সকল নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া শিবাজীর রাজস্ব-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাঁচ হাতের সঙ্গে পাঁচ 'মুঠি' যোগ করিলে যতটা দূরত্ব হয় সেই দূরত্ব অনুযায়ী একটি দণ্ড জমি মাপিবার জন্য ব্যবহার করা হইত। কোঙ্কনে সতর্কভাবে জমি মাপিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

প্রথমে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৩ শতাংশ কর হিসাবে নির্দিষ্ট হয়। পরে এই হার বাড়াইয়া শতকরা ৪০ ভাগ করা হয়, কিন্তু বাণিজ্য শুল্ক ব্যতীত অপর সকল প্রকার কর বিলোপ করা হয়। নগদে বা শস্যে এই কর দেওয়া যাইত। ভূমি-রাজস্ব হইতে আয়ের পরিপূরক ছিল চৌথ এবং সরদেশমুখী হইতে আয়। মহারাষ্ট্রের পার্বত্য অঞ্চল ভূমি-রাজস্বের দিক হইতে তুলনামূলকভাবে অনুৎপাদক ছিল। টাঁকশাল হইতে সামান্য আয় হইত। প্রধান বন্দরগুলি নিয়ন্ত্রণ করিত বিদেশী বণিকেরা, তাই বাণিজ্য-শুল্ক হইতে আয় বেশী হইত না। শিবাজীর মোট আয় ছিল প্রায় সাত কোটি টাকা।

শিবাজীর নীতি ছিল বংশানুক্রমিক প্রথা অনুসারে রাজস্ব কর্মচারী (যেমন, গ্রামাঞ্চলে 'পাতিল' এবং 'কুলকার্নী' এবং জেলায় 'দেশমুখ' এবং 'দেশপাণ্ডে') নিয়োগের পদ্ধতি বাতিল করা। মুসলমান শাসনের যুগে এই সকল কর্মচারী 'মিরাসদার' নামে পরিচিত ছিলেন ; তাঁহারা ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, কৃষকদের কাছ হইতে যাহা পছন্দ তাহা নিতেন এবং রাষ্ট্রকে একটি সামান্য অংশ দিতেন। তাঁহারা ধনী হইয়াছিলেন, দুর্গ নির্মাণ করিতেন, সৈন্য সংগ্রহ করিতেন এবং এত ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন যে রাজা তাঁহাদিগকে সহজে দমন করিতে পারিতেন না। শিবাজী তাঁহাদের জন্য ভূমি-রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করেন, কিন্তু সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীগণের উপর রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মিরাসদারগণকে আর দুর্গ নির্মাণ করিতে দেওয়া হইল না ; তাঁহাদের সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্মচারীগণের মাধ্যমে শিবাজী সরকার এবং

শস্যোৎপাদনকারী কৃষকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইহাতে পূর্বে প্রচলিত ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইল ; কিন্তু রাজস্ব কর্মচারীদের দুর্নীতি-পরায়ণতার জন্য ইহার সুফল কিছুটা পরিমাণে বাতিল হইয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উপহার এবং উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। শিবাজীর নিয়মকানুন এই সকল দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে ব্যর্থ হয়। শিবাজীর শাসনকালের শেষ দিকে শিবাজীর রাজ্যে ভ্রমণকারী ফ্রায়ার (Fryer) নামক জনৈক বিদেশী পর্যটক বলিয়াছেন যে কর্মচারীগণ জনকল্যাণের অথবা সাধারণ সততার জন্য নহে, কেবল মাত্র তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কাজ করেন।

কিছু কিছু কর্মচারীকে নগদ বেতন দেওয়া হইত না, বেতনের পরিবর্তে কয়েকটি অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব তাঁহাদের প্রাপ্য রূপে নির্দিষ্ট করা হইত, কিন্তু কৃষকগণের উপর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব স্থাপনের ক্ষমতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইত না। সামরিক বিভাগের কর্মচারীদের কোন গ্রামের উপর মালিকানার অধিকার দেওয়া হইত না। ভূমি-রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ তাঁহাদের জন্য বরাদ্দ করা হইত, অথবা রাজকোষ হইতে নগদ অর্থের দ্বারা তাঁহাদের পাওনা প্রদান করা হইত। এই ভাবে শিবাজী মুঘলদের জায়গীরদারী ব্যবস্থার কুফলগুলি এড়াইয়া যান।

সৈন্যবাহিনী এবং নৌবাহিনী

অস্ত্র ব্যবহারের দ্বারা শিবাজী একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই যুদ্ধে জড়িত থাকিতেন। মানুচি বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার সৈন্যদের তরবারিকে বিশ্রাম নিবার সুযোগ দিতেন না। স্বাভাবিকভাবেই সৈন্যবাহিনী ছিল রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখা। রাজা ছিলেন ইহার কার্যকরী নেতা। তাঁহার অধীনে ছিলেন 'সেনাপতি'। তিনি ছিলেন একজন মন্ত্রী। 'সেনাপতি' ছাড়া অপর পাঁচজন মন্ত্রী প্রয়োজনমত যুদ্ধে অংশ নিতেন। 'সাব্‌নিস' নামক কর্মচারীগণ মুঘল সাম্রাজ্যের বক্সীগণের মত সৈন্যবাহিনীর নামের তালিকা এবং বেতনের হিসাব প্রস্তুত করিতেন।

শিবাজী একটি সুসংগঠিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যে দুইটি ভাগ ছিল : 'বার্গীর' এবং 'শিলাদার'। প্রথমটি ছিল রাষ্ট্রের প্রকৃত অশ্বারোহী বাহিনী (পাগা)। শিলাদারেরা রাষ্ট্রের নিকট হইতে ঘোড়া ও অস্ত্র পাইত। বারগীরেরা নিজস্ব ঘোড়া এবং অস্ত্র সংগ্রহ করিত। শিলাদারদের তুলনায় বারগীরদের স্থান ছিল নিম্নে। উভয় দলই অবশ্য একই 'সর-ই-নৌবতে'র অধীন ছিল। 'সর-ই-নৌবতে'র নিম্নে ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের সেনানায়কগণ ('হাবলদার', 'জুমলাদার', 'হাজারী', 'পঞ্চহাজারী')। মৃত্যুর সময়ে শিবাজীর সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৪৫,০০০ বার্গীর এবং ৬০,০০০ শিলাদার। পদাতিক বাহিনীর নিজস্ব 'সর-ই-নৌবত' ছিল এবং তাঁহার অধীনে

ছিল বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী। বাছাই করা মাভল পদাতিক সৈন্য দ্বারা গঠিত একটি রক্ষা বাহিনী ছিল। ইহা সরকারী খরচে 'সুসজ্জিত এবং সশস্ত্র' থাকিত। পদাতিক বাহিনী এবং দ্রুতগতিতে চলিতে অভ্যস্ত অশ্বারোহী বাহিনী গেরিলা যুদ্ধ এবং পার্বত্য যুদ্ধের জন্য সুশিক্ষিত হইত। শিবাজীর একটি হস্তী বাহিনী ও একটি গোলন্দাজ বাহিনী ছিল।

শিবাজীর সামরিক ব্যবস্থায় দুর্গগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁহার রাজ্যে ২৪০টি দুর্গ ছিল। প্রত্যেক দুর্গ সমমর্যাদার তিন জন কর্মচারীর দায়িত্বে রাখা হইত, 'নচেৎ একজন বিশ্বাসঘাতক শত্রুর হস্তে দুর্গটি তুলিয়া দিতে সক্ষম হইবে।' এই তিন জন কর্মচারী ('হাবলদার', 'সরনিস', 'সর-ই-নৌবত') যৌথ ভাবে কাজ করিতেন ; প্রত্যেকেই অপরের কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতেন। উপরন্তু, প্রত্যেক সৈন্যদলে কর্মচারীগণের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ছিল। এই রকম সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থার ফলে শিবাজীর সৈন্যদলে বিশ্বাসঘাতকতা বা বিদ্রোহ ছিল না।

সৈন্যবাহিনীর কার্য ছিল প্রত্যেক বৎসর আট মাস পার্শ্ববর্তী শাসকগণের রাজ্যে অভিযান চালানো। এই ভাবে সৈন্যেরা নিজেদের খাদ্য এবং রাজকোষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিত। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর ব্যবহার বিধি ছিল। কোন মহিলা, ক্রীতদাসী অথবা নর্তকীকে সৈন্যবাহিনীর সহিত যাইবার অনুমতি দেওয়া হইত না। কোন নারী অথবা শিশুকে বন্দী করা যাইত না। ব্রাহ্মণদিগের কোন রকম অনিষ্ট করা হইত না। মুক্তিপণের জামিন হিসাবে কোন ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করা হইত না। সামরিক নিয়মকানুন ভঙ্গ করিবার জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত।

শিবাজীর রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য মূলতঃ দায়ী ছিল তাঁহার সৈন্যগণের দক্ষতা, সাহস এবং নিয়মানুবর্তিতা। তাঁহার অশ্বারোহী বাহিনীর সহিত মালপত্র কম থাকিত। তাঁহার সুদক্ষ দ্রুতগতি পদাতিক বাহিনী ছিল। অপর দিকে মুঘল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে প্রচুর মালপত্র এবং তাহা বহন করিবার জন্য বহুসংখ্যক জীবজন্তু থাকিত। তাই শিবাজীর সৈন্যবাহিনীর তুলনায় মুঘল সৈন্যবাহিনী শ্লথগতি ছিল। উপরন্তু, মুঘলদের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সুসংহত ছিল না। তাহাদের মধ্যে ঐক্যেরও অভাব ছিল, কারণ সৈন্যবাহিনীতে বিভিন্ন জাতির লোক ছিল এবং তাহারা যে সকল সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করিত তাঁহারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিতেন। মারাঠা সৈন্যবাহিনী এই সকল দুর্বলতা হইতে মুক্ত ছিল।

মহারাষ্ট্রে একটি দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল ছিল। সুতরাং এই অঞ্চলের শাসক নৌশক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে উদাসীন হইতে পারিতেন না। কোঙ্কন অধিকারের পর শিবাজী সমুদ্রবক্ষে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন। তাঁহার দুইজন নৌ-প্রধান ছিলেন, একজন মুসলমান এবং একজন হিন্দু। তাঁহাদের পরিচালনাধীন ৪০০টি রণতরীর এক নৌবাহিনী তিনি সংগঠিত করেন। রণতরীগুলি বিভিন্ন ধরনের

এবং আকারের ছিল ; কিছু যুদ্ধের জন্য এবং কিছু বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। সমুদ্রোপকূলবর্তী প্রতিবেশী ইংরাজ এবং পর্তুগীজ বণিক এবং জঞ্জিরার সিদ্দিদের সঙ্গে তাঁহার শত্রুতার সম্পর্ক ছিল। তিনি মহারাষ্ট্রে যে নৌ-ঐতিহ্য স্থাপন করেন তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অঙ্গ্রিয়া সর্দারেরা উন্নত করেন।

শিবাজীর কৃতিত্ব

শিবাজীর চরিত্রে ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক এবং সামরিক গুণাবলীর এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার মাতার প্রতি অনুগত এবং তাঁহার পরিবারের সকলের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। সাধারণভাবে মধ্যযুগীয় শাসকগণের চরিত্রে যে সকল ত্রুটি থাকিত তিনি সেইগুলি হইতে মুক্ত ছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রকৃত সন্তান শিবাজীর সকল ধর্মের সাধুসন্তদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সকল ধর্মের প্রতি পূর্ণ সহনশীলতা ছিল। ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক জীবনে তিনি যে নিয়মানুবর্তিতা মানিয়া চলিতেন তাহা সৈন্যগণের উপরও আরোপ করিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক কাফি খাঁ আওরঙ্গজেবের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিরোধী এই হিন্দু রাজার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : 'যখনই পবিত্র কোরানের একটি প্রতিলিপি তাঁহার (শিবাজীর) হস্তে আসিত, তিনি তাহা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার মুসলমান অনুগামীদের মধ্যে কাহাকেও দিয়া দিতেন।' ধর্মীয় ব্যাপারে আওরঙ্গজেবের অনুদারতার পরিপ্রেক্ষিতে শিবাজীর উদারতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুসলমান সুলতানগণের অধীন এক জায়গীরদারের পুত্রের পক্ষে একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন এবং একজন ছত্রপতির সম্মান লাভ মোটেই সহজ ছিল না। তিনি বিজাপুরের সুলতান এবং মুঘল সাম্রাজ্যের একটানা বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্য তখন ছিল শক্তির শীর্ষে। তাঁহার সাফল্যের মূলে প্রধানতঃ ছিল কয়েকটি অসাধারণ গুণ। প্রথমতঃ, বাস্তব রাজনীতি সম্পর্কে তাঁহার স্পষ্ট ধারণা ছিল ; অসংখ্য অসুবিধার মধ্যে তাঁহার পক্ষে কি করা সম্ভব তিনি তাহা জানিতেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ছিলেন মানব চরিত্রের একজন সুদক্ষ বিচারক। যে সকল ব্যক্তিকে তিনি বেসামরিক অথবা সামরিক কার্যের জন্য মনোনীত করিতেন তাহাদের মনে তিনি আনুগত্য সঞ্চার করিতেন। বিশ্বাসঘাতকতা উচ্চপদস্থ মুঘল কর্মচারীগণের মধ্যে ছিল সাধারণ ঘটনা, কিন্তু শিবাজীর কোন সেনাপতি তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। তৃতীয়তঃ, একটানা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি তাঁহার প্রজাগণের জন্য একটি সুদক্ষ এবং উদার শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, তিনি নিজেই তাঁহার সৈন্যবাহিনী গঠন করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ইহার নেতৃত্ব দেন। তিনি কোন বৈদেশিক সেনানায়কের সাহায্য গ্রহণ করেন

নাই। পরবর্তী কালে রণজিৎ সিংহ ইয়োরোপীয় সেনানায়কদের সাহায্যে সৈন্য-দল গঠন করেন। শিবাজীর সৈন্যগণকে শিক্ষা দিতেন মারাঠা সেনানায়কেরা; এই কাজের জন্য তিনি কোন ইউরোপীয় সেনানায়ক নিযুক্ত করেন নাই।

শিবাজী কেবল একটি রাজ্য স্থাপন করেন নাই; তিনি এমন একটি জাতি গঠন করিয়াছিলেন যাহা প্রায় চারি দশক ধরিয়া আওরঙ্গজেবের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার যোগ্য হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যগুলিতে মারাঠারা দীর্ঘকাল 'অ্যাটমের ন্যায় বিচ্ছিন্ন' ছিল। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে একটি শক্তিশালী জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করেন। মহারাষ্ট্রে জাতীয় পুনর্জাগরণের ক্ষেত্র শিবাজীর উত্থানের পূর্বে সন্তগণের শিক্ষা এবং আঞ্চলিক সাহিত্যের উন্নতির দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভাই মারাঠা জনগণের সম্মুখে এক উদ্দীপনামূলক আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিল এবং তাহা পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদিগকে যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় নেতৃত্ব প্রমাণ করিয়াছিল যে 'হিন্দু ধর্ম রাজনৈতিক দাসত্বের শতাব্দীব্যাপী ধ্বংসাত্মক ভাব এবং শাসন-ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতা ও অত্যাচারের মধ্যেও আত্মরক্ষা করিতে পারে, নব জীবন লাভ করিতে পারে এবং আকাশে মাথা তুলিতে পারে।' তিনি হিন্দু ধর্ম হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এমন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (secular State) স্থাপন করিয়াছিলেন যেখানে ইসলাম ধর্ম যথেষ্ট সম্মান পাইত এবং ইহার অনুগামীদের নিম্ন শ্রেণীর নাগরিক রূপে গণ্য করা হইত না। অথচ সেই যুগেই আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যে হিন্দু ধর্ম এবং ইহার অনুগামীরা নানা ভাবে উৎপীড়িত হইত। ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শিবাজী মারাঠা জাতি গঠন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও ধর্মীয় উদারতায় বলীয়ান এই জাতি টিকিয়া থাকে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাঁহার জীবনকালে এবং মৃত্যুর পরেও তাঁহার নাম একটি মন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। 'এই মন্ত্র মারাঠা জাতিকে একটি নূতন জীবনে আহ্বান করে।' বহু রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাতার কৃতিত্ব ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু জাতি-প্রতিষ্ঠাতার সংখ্যা খুবই কম। শিবাজী এই উভয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই জন্যই তিনি ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

২. শিবাজীর উত্তরাধিকারীগণ

শম্ভাজী (১৬৮০-৮৯)

শিবাজীর উত্তরাধিকারী হন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভাজী। সাহসিকতা ছাড়া তাঁহার অন্য সকল গুণের অভাব ছিল, এবং তাঁহার দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে পানহালা দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার

উত্তরাধিকার বিনা বাধায় স্থির হয় নাই ; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারামকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পরেও ষড়যন্ত্র চলে। এই ষড়যন্ত্রগুলি দমন করা হয় এবং ইহাদের সহিত জড়িত ব্যক্তিগণকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের পুরাতন কর্মচারীগণের অবিশ্বাস-ভাজন হওয়ায় তিনি এক কনৌজী ব্রাহ্মণকে বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁহাকে তিনি 'কবিকলশ' (কবিচূড়ামণি) উপাধি দেন। তাঁহার হস্তে শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় ; আমোদপ্রিয় রাজা বিলাসে দিন কাটাইতেন, মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত সামরিক অভিযান পরিচালনা করিতেন।

আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবর দুর্গাদাসের সহিত ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে শম্ভাজীর নিকট আশ্রয় পান। আওরঙ্গজেব স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন ; তাঁহার তিন পুত্র এবং সকল যোগ্য সেনাপতিও তাঁহাকে অনুসরণ করেন। সাম্রাজ্যের সকল সামরিক সম্পদ সম্রাটের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে দাক্ষিণাত্যে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এই বিপদের গুরুত্ব মারাঠা রাজসভায় গণ্য করা হইল না। শম্ভাজী জঞ্জিরার সিদ্দিগণের এবং গোয়ার পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন, কিছু সাফল্যও অর্জন করিলেন ; কিন্তু ইহার কোন স্থায়ী মূল্য ছিল না। বাদশাহী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিতে না পারিয়া আকবর ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আওরঙ্গজেব শম্ভাজীর ক্ষমতা ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইংরাজ কুঠির কর্মচারীরা ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে লিখিয়াছেন : 'মারাঠা রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার এইরূপ আক্রোশ যে তিনি তাঁহার পাগড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে যতদিন না তাঁহাকে হত্যা অথবা বন্দী করিবেন অথবা তাঁহার রাজ্য হইতে তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবেন ততদিন তিনি আর পাগড়ি গ্রহণ করিবেন না।'

কিন্তু মারাঠাগণের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনীর প্রাথমিক আক্রমণগুলি বিশেষ সফল হয় নাই। আওরঙ্গজেব তখন তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তি বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন। এই দুইটি সুলতানী রাজ্যের পতন ঘটে ১৬৮৬-৮৭ খ্রীস্টাব্দে। আকবর ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। মারাঠাগণের সম্মুখীন হইবার জন্য সম্রাট তখন সম্পূর্ণ সুযোগ পান। শম্ভাজী সুলতানী রাজ্যগুলিকে তাহাদের বিপদের সময় সাহায্য করিবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। এখন তিনি রাজনৈতিক ও সামরিক দিক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ষড়যন্ত্র, দুর্বল ও দুর্নীতিপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে মুঘল আক্রমণের কার্যকরী প্রতিরোধ করার শক্তি তাঁহার রাজ্যের ছিল না।

১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে শম্ভাজী এবং কবিকলশকে একজন মুঘল সেনাপতি বন্দী

করেন। নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের হত্যা করা হয়। রায়গড়ে মারাঠা মন্ত্রীগণ রাজারামকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন, কারণ শম্ভাজীর পুত্র শাহু ছিলেন সাত বৎসরের বালক এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিবার পক্ষে খুবই অল্পবয়স্ক। ইহার পর মুঘলগণ রায়গড় অধিকার করে। সেইখানে শাহু সহ শম্ভাজীর পরিবারের সকলকে মুঘলগণ বন্দী করে। রাজারাম অবশ্য ইতিমধ্যেই পূর্ব উপকূলে জিঞ্জিতে পলায়ন করিয়াছিলেন। মারাঠা রাজপরিবারের মহিলাগণকে মুঘল শিবিরে বন্দী রাখা হইল, কিন্তু তাঁহাদিগকে যথোচিত শ্রদ্ধা দেখানো হইল। শাহুকে 'রাজা' উপাধি এবং সাত হাজারী মনসবদারের মর্যাদা দেওয়া হয়; কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মুঘল শিবিরে বন্দী ছিলেন। এইভাবে ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। দুইটি সুলতানী রাজ্যের পতন ঘটে এবং মারাঠাগণ প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বহীন হইয়া পড়ে।

রাজারাম (১৬৮৯-১৭০০)

এগার বৎসর ধরিয়া রাজারাম ছিলেন মারাঠাদের নামেমাত্র শাসক। ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। যুদ্ধ বা প্রশাসন, কোন ক্ষেত্রেই নেতৃত্বের যোগ্যতা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞ পরামর্শদাতা ছিলেন রামচন্দ্র পন্থ এবং প্রহ্লাদ নিরাজী, আর সাহসী যোদ্ধা ছিলেন শান্তাজী ঘোরপাড়ে এবং ধনাজী যাদব।

রাজারামের রাজসভা ছিল জিঞ্জিতে। পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই দুর্গটি সেই অঞ্চলে তাঁহার কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়। পশ্চিমে মহারাষ্ট্রে মারাঠা সেনাপতি এবং কর্মচারীগণ তাঁহাদের নিজ উদ্যোগে এবং সম্পদে মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করেন। নিয়মিতভাবে সংগঠিত কোন কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকায় এই প্রতিরোধ 'জন যুদ্ধে'র রূপ নেয়। মুঘলদের বিধ্বংসী কার্যকলাপের প্রতিশোধ নিবার বাসনায় উত্তেজিত হইয়া মারাঠা দলগুলি মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল, মুঘল সৈন্যবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিল, তাহাদের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিল, তাহাদের অস্ত্র ও সম্পদ লুণ্ঠন করিল এবং জনগণের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিল। মুঘলগণ কার্যকরীভাবে এই সব আক্রমণের মোকাবিলা করিতে পারিল না; তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ করিতে পারিত (যাহা মারাঠাগণ এড়াইয়া যাইত) এবং দুর্গ অবরোধ করিতে পারিত। মুঘলগণ একটি দুর্গ দখল করিলে সাধারণতঃ মারাঠাগণ তাহা পুনরুদ্ধার করিত, আবার মুঘলগণ তাহা দখল করিত। আওরঙ্গজেব কোন চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না, এমন কোন রাষ্ট্রীয় বাহিনী অথবা মারাঠা সরকার ছিল না যাহা তিনি ধ্বংস করিতে পারিতেন।

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে মারাঠাগণ একজন নেতৃস্থানীয় মুঘল সেনাপতিকে বন্দী করে। ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দে তাহারা মুঘলদের হাত হইতে পানহালা উদ্ধার করে। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে শাস্তাজী দুইজন উচ্চপদস্থ মুঘল সেনাপতিকে পরাজিত এবং হত্যা করেন। গেরিলা যুদ্ধের এই অভিজ্ঞ নায়ক মুঘলদের মধ্যে এমন এক আতঙ্ক সৃষ্টি করেন যে কোন মুঘল সেনাপতি তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু তিনি কটুভাষী এবং অহঙ্কারী ছিলেন; এইজন্য তিনি রাজারামের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ধনাজী যাদব তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রু ছিলেন। ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। মারাঠাদের সংগ্রামের প্রতি ইহা ছিল একটি বড় আঘাত, কিন্তু তাহাদের তখনও আত্মরক্ষা করার মত যথেষ্ট জীবনীশক্তি ছিল।

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে জুলফিকর খাঁ নামে একজন নেতৃস্থানীয় মুঘল সেনাপতি জিঞ্জি অবরোধ শুরু করেন, কিন্তু ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের আগে এই বিখ্যাত পার্বত্য দুর্গের পতন ঘটে নাই। মুঘলগণ বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য পাইল, কিন্তু রাজারামকে বন্দী করিতে পারিল না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই পলাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সাতারায় যান, কোঙ্কনের দুর্গগুলি পরিদর্শন করেন এবং খান্দেশ ও বেরারে একটি ব্যাপক আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা করেন। এই অভিযান অবশ্য কার্যকরী হয় নাই। ইহার অল্প দিন পরেই রাজারামের মৃত্যু হয় (১৭০০)।

তৃতীয় শিবাজী (১৭০০-১৭১২): তারা বাঈ

রাজারামের মৃত্যুর পরে তাঁহার পত্নী তারা বাঈ-এর পুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে বসানো হয়। অপর পত্নী রাজস বাঈ-এর পুত্র দ্বিতীয় শম্ভাজীকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা বাঈ-এর শক্তি এবং যোগ্যতা তাঁহাকে মারাঠা রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসকে পরিণত করে; তিনি তাঁহার নাবালক পুত্রের নামে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। রামচন্দ্র পন্থ এবং ধনাজী যদিব তাঁহার বিরোধিতা করেন। তাঁহারা শাহুকে মুঘল শিবির হইতে তাঁহার পিতার রাজ্য শাসনের জন্য ফিরাইয়া আনিতে চান। এইরূপ বিরোধিতা সত্ত্বেও তারাবাঈ যে কেবলমাত্র নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখেন তাহা নহে, তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও যোগ্য নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিক কাফি খাঁ তাঁহার রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, প্রশাসনিক যোগ্যতা এবং সৈন্যবাহিনীতে জনপ্রিয়তা প্রশংসা করিয়াছেন।

১৬৯৯ হইতে ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মুঘলগণ সাতারা, পার্লি, পানহালা, খেলনা, কোণ্ডানা, রাজগড়, তোর্না, ওয়াগিনজেরা প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করে। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে মারাঠাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল। তাহা ছাড়া মহামারী ও দুর্ভিক্ষে দুই লক্ষের বেশী মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব আহম্মদনগরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৭০৭

খ্রীস্টাব্দে সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে মারাঠাগণকে ধ্বংস করিতে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। মারাঠাগণ কয়েকটি দুর্গ হারাইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক ভীমসেন বলিয়াছেন : 'সমগ্র রাজ্যে তাহারা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাশালী হয় এবং পথ বন্ধ করে।' তাহারা কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যে ছয়টি মুঘল সুবা বিধ্বস্ত করে নাই, মালব এবং গুজরাটও বিধ্বস্ত করে। মৃত্যুপথ-যাত্রী সম্রাট তাঁহার পিছনে রাখিয়া গেলেন ধ্বংস এবং অরাজকতা।

১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দ হইতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত মুঘল শিবিরে শাহুকে সম্মানের সহিত বন্দী রাখা হয়। সম্রাটের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আজম সিংহাসনের জন্য ভ্রাতাদের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রস্তুতির সময়ে মুঘল শিবির হইতে শাহুর পলায়ন মানিয়া নেন। আশা করা হইয়াছিল যে মারাঠা রঙ্গমঞ্চে শাহুর উপস্থিতি মারাঠাদের ঐক্য দুর্বল করিয়া এবং তারাবাঈকে ক্ষমতা হইতে সরাইয়া দিয়া মুঘলদিগকে সাহায্য করিবে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু এবং শাহুর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের (১৭০৮) সহিত মারাঠা স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান হয়।

মারাঠা স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল

মহারাষ্ট্রের দীর্ঘ এবং তিক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল 'দাক্ষিণাত্যের দুষ্ট ক্ষত' যাহা আওরঙ্গজেবের শক্তিতে চরম আঘাত হানিয়াছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। ইহা ছিল 'স্পেনীয় দুষ্ট ক্ষতে'র (উপদ্বীপের যুদ্ধ) মত, যাহা নেপোলিয়নকে ধ্বংস করিয়াছিল। ইহা মুঘল রাজকোষ শূন্য করিয়াছিল। ইহা মুঘল সৈন্যবাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা এবং সাহস ক্ষুণ্ণ করিয়া-ছিল। মানুচি বলিয়াছেন যে ইহার ফলে দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলিতে সমতল-ভূমি 'বৃক্ষ ও শস্য শূন্য' হইয়া পড়িয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের সকল সম্পদ এবং সম্রাটের দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ পরিচালনা মারাঠাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে নাই। তাহারা যে কেবল নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল তাহা নহে; তাহারা দাক্ষিণাত্যে বিশেষ প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। সম্রাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতি এবং দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের জন্য বহু সৈন্য ও প্রচুর অর্থ আনিবার ফলে উত্তর ভারতের প্রদেশগুলিতে শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের সময় বহু নূতন মনসবদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কারণ সৈন্যদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। কিন্তু এত বেশী সংখ্যক মনসবদারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জায়গীর পাওয়া সম্ভব ছিল না। এইভাবে মুঘল সামরিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি, অর্থাৎ মনসবদারী ব্যবস্থা, একটি সঙ্কটের সম্মুখীন হইল।

কিন্তু এই সকল 'জনযুদ্ধ' মারাঠাদের জন্য কয়েকটি কঠিন সমস্যা রাখিয়া গেল। শিবাজীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ঐক্য এই দীর্ঘ যুদ্ধের চাপে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

শান্তাজী ঘোরপাড়ে এবং ধনাজী যাদবের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ এক ধরনের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য প্রকাশ করে, যাহা জাতীয় ঐক্যকে আঘাত করিয়াছিল। ইহা ছাড়াও নেতৃস্থানীয় মারাঠা বংশগুলির কয়েকটি জাতীয় স্বার্থ ত্যাগ করে এবং মুঘলদের সহিত যোগ দেয়। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সামরিক নেতাদের জমি দান করিবার পুরাতন প্রথা পুনরায় প্রচলিত হয়। শিবাজী এই ব্যবস্থার অবসান করিয়াছিলেন এবং নগদ বেতন দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজারামের সময়ে নগদ টাকার অভাব ছিল। উপরন্তু, মারাঠা অভিজাতশ্রেণীর আনুগত্য লাভের জন্য আওরঙ্গজেব মারাঠা সেনানায়কদিগকে জমি দিবার ব্যবস্থা করেন। এই কারণে মারাঠা সরকারের পক্ষেও মারাঠা সেনানায়কদিগকে একই ধরণের সুবিধা দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং মারাঠা সেনাপতি এবং সৈন্যদের জমি দখল করিতে বলা হইত এই সর্তে যে যখন মারাঠা শাসন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন এই সকল জমি তাহাদের বংশানুক্রমিক সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করা হইবে। এইভাবে জায়গীর প্রথার উদ্ভব ঘটে। ভবিষ্যতে এই প্রথা মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু এই সামরিক জায়গীরগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব জাগরিত করে এবং মারাঠা রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুষ্ট ক্ষতে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মুঘল আক্রমণের সম্ভাবনা হঠাৎ অপসারিত হওয়ায় মারাঠা সেনাপতি এবং সৈন্যদের যুদ্ধ করিবার মত শত্রু রহিল না। এক প্রজন্ম ধরিয়া তাহারা যুদ্ধ ও লুণ্ঠন করিয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে সাধারণ সামাজিক জীবনের বাঁধাধরা নিয়মের সহিত তাহারা নিজেদের বিশেষ খাপ খাওয়াইতে পারিল না। সৈন্যবাহিনীতে এতদিন ঐক্য ছিল, নেতৃত্ব ছিল, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। এখন তাহারা নেতৃত্বহীন ও লক্ষ্যহীন হইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সিংহাসনের জন্য শিবাজীর বংশধরগণের মধ্যে যুদ্ধের ফলে এই বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়া গেল। এই গৃহযুদ্ধ শুরু হইল ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে। মুঘল শিবির হইতে পলায়নের পরে শাহু তাঁহার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার দাবি করিলেন এবং তারা বাঈ তাঁহার বিরোধিতা করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগ

১. শাসন-ব্যবস্থা

সাম্রাজ্যের উপযোগী শাসন-ব্যবস্থা

রাজনৈতিক দিক হইতে বলিতে গেলে মুঘলদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ছিল প্রকৃত অর্থে একটি সাম্রাজ্যের উপযোগী শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন। মুঘল পাদশাহ এবং তুর্ক-আফগান সুলতান রাজতন্ত্রের দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। চার প্রজন্ম ধরিয়া—আকবরের গঠনমূলক যুগ হইতে আওরঙ্গজেবের শাসনে পতনের সূত্রপাত পর্যন্ত—মুঘল সাম্রাজ্য শক্তি, মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের একটি উজ্জ্বল প্রতীক রূপে বর্তমান ছিল। ইহার পতনের পরেও ইহার স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহী সিপাহীদের একজন সম্রাটের প্রয়োজন হইলে এই স্মৃতির প্রেরণায় তাহারা দিল্লীতে লাল কেল্লায় ছুটিয়া গিয়াছিল—যেখানে আওরঙ্গজেবের কপর্দকহীন উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইতেন।

ঐক্য

শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটগণ ভারতে এমন এক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যাহা এই বিশাল উপ-মহাদেশ অশোকের সময়ের পরে আর উপলব্ধি করে নাই। তাঁহাদের হুকুমনামা কাবুল হইতে গৌহাটি এবং কাশ্মীর হইতে 'সুদূর দক্ষিণ' পর্যন্ত বলবৎ হইত। তাঁহারা এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, এবং এক শতাব্দীর বেশী সময় অক্ষুণ্ণ রাখেন, যাহা কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য ও প্রদেশের সমষ্টিমাত্র ছিল না, দূরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নামে মাত্র কর দিয়া তাহারা বাস্তব স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিত না। মুঘল সুবাগুলি একই প্রস্তরখণ্ড হইতে তৈরী (monolithic) একটি স্তম্ভের মত রাজনৈতিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল যাহা একজন ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইত। শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছিল। একটি সুসংহত প্রশাসনিক ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'যাহা পূর্বে করা হয় নাই তাহা করা হইবে না' (জাবিতা নস্ত)—এই রীতি সরকারী কার্য পরিচালনায় প্রধান নীতিতে পরিণত হইয়াছিল। একটি সরকারী ভাষা (ফার্সী) সাম্রাজ্যের সকল অংশে ব্যবহৃত হইত। এক ধরণের মুদ্রাই সকল প্রদেশে আইনসঙ্গত মুদ্রার কাজ করিত। আঞ্চলিক পার্থক্যের স্বীকৃতি ছিল; সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে

আইন ও প্রশাসনিক প্রথার একটি সাধারণ মিল ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থা এইরূপ ভাবে পরিকল্পিত ও রূপায়িত হইয়াছিল যাহাতে ভারতীয় জনগণের মনে একই রকমের শাসন এবং একই ধরণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দাগ কাটিয়া দেওয়া যায়।

মুঘল শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে আকবরের স্থান

বাবর অথবা হুমায়ুন, কাহারও শাসন-ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিবার সময় অথবা ক্ষমতা ছিল না। আকবর ছিলেন সাম্রাজ্যের উপযোগী শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা হিসাবে আকবরের কৃতিত্ব কেবলমাত্র যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে রাজ্য দখলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার অন্যতম কৃতিত্ব ছিল বিজিত অঞ্চলগুলিতে মোটামুটি একই ধরণের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া তাহাদিগকে এক কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা। স্বাভাবিকভাবেই তিনি দিল্লীর পূর্বতন শাসকগণের, বিশেষতঃ শের শাহের, প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর উপরেই নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার দিক হইতে সেই বিখ্যাত আফগান শাসক সুলতানী আমলের শাসকদের নিকট ঋণী ছিলেন। আবুল ফজল বলিয়াছেন যে তিনি কেবলমাত্র আলাউদ্দীনের নির্দেশগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসকেরাও বহুল পরিমাণে আকবরের রাজস্ব-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্য এবং আধুনিক যুগের ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার বিবর্তনে আকবরের শাসনকাল প্রকৃতপক্ষে একটি কেন্দ্রবিন্দু। যে ব্যবস্থা তিনি মূল্যবান সম্পদ হিসাবে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার তিন উত্তরাধিকারী কোন কাঠামোগত পরিবর্তন আনেন নাই; তাঁহারা কেবলমাত্র কয়েকটি ছোটখাট পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

রাজশক্তি সম্পর্কে আকবরের ধারণা

আপাতদৃষ্টিতে আকবরের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া আবুল ফজল লিখিয়াছেন: 'রাজশক্তি ঈশ্বরের একটি দান এবং যতক্ষণ না বহু সহস্র প্রয়োজনীয় গুণ এক ব্যক্তির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ততক্ষণ এই দান দেওয়া হয় না। জাতি, সম্পদ এবং জনসমাবেশ (অর্থাৎ জনগণের সমর্থন) এই মহান মর্যাদার পক্ষে যথেষ্ট নয়।' আকবর বলিয়াছিলেন: 'রাজাকে দর্শন করাই ঈশ্বরের আরাধনার একটি অংশ। চিরকালই রাজারা ঈশ্বরের ছায়া (জিল-ই-আলহী) রূপে পরিচিত এবং তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা।'

রাজার মর্যাদা তাঁহার উপর অনেক দায়িত্ব অর্পণ করে। আকবর বলিয়াছিলেন: 'রাজাদের পক্ষে ঈশ্বরের আরাধনার নিহিত অর্থ তাঁহাদের ন্যায় বিচার এবং সুশাসন-ব্যবস্থা।' তিনি আরও বলিয়াছেন: 'অত্যাচার প্রত্যেকের পক্ষেই ধর্ম-

বিরোধী আচরণ—বিশেষতঃ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর পক্ষে, যিনি নিজেই পৃথিবীর অভিভাবক।' আকবরের আদর্শ অনুসারে রাজা ছিলেন তাঁহার প্রজাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অভিভাবক; তাঁহার কর্তব্য ছিল প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করা—যেমন পিতা তাঁহার সন্তানদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন।

দৈবস্বত্ব অধিকারের (Divine Right) নীতি এইভাবে পিতৃতান্ত্রিক সরকারের (Paternal Government) ধারণার সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। এই ধরনের সরকারের প্রয়োজনীয় গুণগুলির মধ্যে একটি ছিল 'সকলের সঙ্গে শান্তি'র (সুল-ই-কুল) নীতি গ্রহণ এবং উহার উন্নতি করা। ইহার অর্থ ছিল ধর্মীয় সহনশীলতা। আবুল ফজল বলিয়াছেন: 'সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এই উচ্চ পদের যোগ্য হইতে পারেন না যদি তিনি সার্বজনীন শান্তির (সহনশীলতার) সূচনা না করেন, যদি তিনি সকল অবস্থার মানুষকে এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে সমদৃষ্টিতে না দেখেন। কাহারও প্রতি মাতার মত এবং কাহারও প্রতি বিমাতার মত আচরণ করিবেন না, ইহা উপলব্ধি না করিলে তিনি এই উচ্চ মর্যাদার উপযুক্ত হইবেন না।'

'উচ্চ মর্যাদা'র অর্থ হইল চূড়ান্ত বা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা। উলেমাদের নিয়ন্ত্রণ হইতে এবং 'মিলাতে'র (মুসলমান জনসাধারণের) প্রভাব হইতে আকবরের মুক্তি সূচিত হইয়াছিল ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে তথাকথিত 'অভ্রান্ততার নির্দেশনামা' (মহজর, Infallibility Decree) ঘোষণার মাধ্যমে। নেতৃস্থানীয় মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা এই নির্দেশনামা স্বাক্ষরিত হয়। ইহাতে সম্রাটের একটি বিশেষ অধিকার প্রবর্তন করা হয়। তিনি মুসলমান আইনজ্ঞদের পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করিতে এবং অবিতর্কিত বিষয়ে যে কোন ব্যবহারবিধি বা নীতি অনুসরণ করিতে পারিবেন, যদি তাহা কোরানের কোন বাণী দ্বারা সমর্থিত হয়। কার্যতঃ, ইসলামের ধর্মীয় এবং প্রশাসনিক ব্যাপার সংক্রান্ত সকল বিতর্কিত বিষয়ে সম্রাট চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। কয়েকজন ইয়োরোপীয় লেখক বলেন যে আকবর ধর্মগুরু (Pope) এবং রাজার যুক্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। দিল্লীর সুলতানগণ ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক, কিন্তু ইসলামের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা তাঁহারা দাবি করেন নাই।

আকবরের কার্যপদ্ধতি

অন্যান্য বহু প্রজাহিতৈষী শাসকের ন্যায় আকবর তাঁহার রাজতান্ত্রিক কর্তব্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবুল ফজল বলিয়াছেন যে তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যের জন্য দিনে তিন বার উপস্থিত হইতেন। প্রত্যূষে, 'ঝরোখা দর্শনে'র সময়, তিনি সাধারণ লোকের অভিযোগ শুনিতেন। পরে বসিত প্রকাশ্য রাজসভা—যাহা সাধারণভাবে সাড়ে চার ঘণ্টা স্থায়ী হইত। সেখানে বহু লোকের সমাবেশ ঘটিত,

আবেদন পত্র গ্রহণ করা হইত এবং সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইত। অন্যান্য ধরনের কাজও, যেমন মনসবদারগণের সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন, সেই সময় করা হইত। বৈকালে 'দেওয়ান-ই আম' কক্ষে একটি পূর্ণ দরবার অনুষ্ঠিত হইত। সেখানে নিয়মিত কাজ—যেমন, সৈন্যবাহিনী এবং কারখানা সংক্রান্ত বিষয় নির্ধারণ, বিভিন্ন পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি, জায়গীর দান, ইত্যাদি করা হইত। সন্ধ্যায় সম্রাট 'দেওয়ান-ই-খাস' কক্ষে তাঁহার মন্ত্রী, পরামর্শদাতা এবং কর্মচারীগণের সহিত মিলিত হইতেন এবং আভ্যন্তরীণ শাসন এবং বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিতেন। রাত্রিতে তিনি সুবক্তা, দার্শনিক, সুফী, সন্ত এবং 'নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের' সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

আকবর একটি কঠোর কার্যসূচী অনুসরণ করিতেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেকে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ রাখিতেন; তিনি খুঁটিনাটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না যেমন আওরঙ্গজেব পরবর্তী কালে করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন: 'রাজা সেই সকল কর্তব্য নিজে গ্রহণ করিবেন না যাহা প্রজাগণের (অর্থাৎ কর্মচারীদের) দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। তাঁহার কাজ হইল অপরের ত্রুটি সংশোধন করা, কিন্তু তাঁহার নিজের ত্রুটি কে সংশোধন করিতে পারে?'

কেন্দ্রীয় সরকার: মন্ত্রীগণ

আকবর এবং তাঁহার তিন উত্তরাধিকারীর আমলে সম্রাট নিজেই নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। মন্ত্রীদের কাজ ছিল তিনি যখন তাঁহাদের পরামর্শ চাহিবেন তখন পরামর্শ দেওয়া এবং তাঁহার নির্দেশগুলি কার্যে পরিণত করা। তিনি নিজের ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতেন। তাঁহারা ছিলেন তাঁহার কর্মচারী মাত্র; আধুনিক কালের মন্ত্রীসভার (Cabinet) মত তাঁহারা যৌথভাবে শাসনসংক্রান্ত বিষয় আলোচনা অথবা শাসনসংক্রান্ত কাজ করিবার অধিকারী ছিলেন না। ছোট-খাট ব্যাপারে তাঁহাদের প্রভূত কর্তৃত্ব ছিল, কিন্তু সাধারণতঃ নীতি নির্ধারণের বিষয়ে তাঁহাদের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। তাঁহারা সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ছিলেন বটে, তবে 'তুর্কী সাম্রাজ্যের শিবির নির্মাণে ব্যবহৃত স্তম্ভের মত তাঁহারা শিবিরের ভার ধারণ করিয়া থাকিতেন না, তাজমহলের স্তম্ভের মত তাঁহারা কেবল সাম্রাজ্যের গাম্ভীর্য, মহত্ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেন।' মোটামুটি বলা যায়, মন্ত্রীরা মুঘল সাম্রাজ্যের আভরণের মতই ছিলেন, ইহার ভার বহনের প্রকৃত দায়িত্ব তাঁহাদের উপর অর্পিত হয় নাই।

প্রধান মন্ত্রীর উপাধি ছিল 'ভকিল' বা 'ভকিল-ই-মুতলক।' আকবরের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে এই পদে নিযুক্ত ছিলেন বৈরাম খাঁ। তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পদচ্যুতির পর একই মন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় নাই। গুরুত্বপূর্ণ অর্থ দপ্তরটি পৃথক ভাবে

'দেওয়ান' বা 'উজীর' নামে পরিচিত অপর এক মন্ত্রীর হাতে দেওয়া হইল। শাহ জাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত ভকিলের পদটি বর্তমান ছিল, কিন্তু ইহার গুরুত্ব ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইয়াছিল।

রাজস্ব এবং সরকারী ব্যয় সংক্রান্ত সকল বিষয়ের দায়িত্ব ছিল দেওয়ান বা উজীরের হাতে। তাঁহার নির্বাচিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ সুবাগুলির দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা তাঁহার নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকিয়া নিজ নিজ কাজ করিতেন। আকবরের আমলের দেওয়ানগণের মধ্যে টোডর মলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সামরিক বিভাগের অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর উপাধি ছিল 'মীর বক্সী।' তিনি মনসবদারদের তালিকা প্রস্তুত করিতেন, সামরিক কর্মচারীদের বেতন দিতেন এবং সৈন্য নিয়োগ, সৈন্যদল সংগঠন ও যুদ্ধের আয়োজন সংক্রান্ত নানা রকম কাজ করিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা তাঁহার সাধারণ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

'সদর-উস-সুদুর' (প্রধান 'সদর') ছিলেন ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে সম্রাটের পরামর্শদাতা এবং সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রধান বিচারপতি। বিচারপতি রূপে তাঁহার স্থান ছিল সম্রাটের ঠিক নীচে। ধর্মীয় কার্য এবং শিক্ষার জন্য সরকারী কোষাগার হইতে অর্থ বিতরণের দায়িত্ব তিনি পালন করিতেন। আকবরের ধর্মনীতি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে এই পদের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে ইহা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

আকবরের রাজত্বকালে মন্ত্রী রূপে গণ্য না হইলেও 'মীর সামান' দুইটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন : সম্রাটের অন্তঃপুর (হারেম) এবং সরকারী 'কারখানা'।

কেন্দ্রীয় সরকার : প্রধান কর্মচারীগণ

'মুহতাসিব' নামে পরিচিত কর্মচারীরা জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন এবং 'শরিয়ত' বা ইসলামের বিধিসমূহের বিরোধী কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করিতেন। 'দারোগা-ই-ঘুসলখানা' সম্রাটের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। এই পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 'আরজ-ই-মুকাররর' সম্রাটের নির্দেশগুলি নথিভুক্ত করিতেন। 'দারোগা-ই-ডাকচৌকি' ছিলেন সরকারী চিঠিপত্র বিভাগের অধ্যক্ষ। 'মীর আরজ' ছিলেন দরখাস্ত বিভাগের অধ্যক্ষ। মুদ্রা নির্মাণের কারখানার অধ্যক্ষ ছিলেন এক 'দারোগা।' 'মীর মাল' ছিলেন সম্রাটের খাস তহবিলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। 'মুস্তৌফী' ছিলেন হিসাব বিভাগের অধ্যক্ষ। সরকারী কারখানার পরিচালকের পদবী ছিল 'নাজির-ই-বায়ুতাত'। 'মীর বার' ছিলেন বন বিভাগের পরিচালক। রাজস্ব বিভাগের সচিব ছিলেন 'মুস্রিফ।' দরবারের আদবকায়দা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন 'মীর তোজক'।

সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের ফলে কতকগুলি রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। এগুলিকে 'জাবিতা' বলা হইত। 'জাবিতা' লঙ্ঘন করিয়া কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল।

দেশের বিভিন্ন অংশের অবস্থা এবং ঘটনাবলী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সংবাদ সংগ্রাহক এবং গুপ্তচর নিয়োগ করিত।

আইন ও বিচার

আকবর নানা বিষয়ে ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামি হইতে মুক্ত হইলেও ইসলামের আইনকে বিচার-ব্যবস্থার ভিত্তি রূপে রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এই আইনের প্রয়োগ শিথিল করিয়াছিলেন। যেমন, কোন মুসলমান স্বধর্মত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম বা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিলে এই আইনে তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু আকবর এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতেন না। যে সকল মোকদ্দমায় কেবলমাত্র হিন্দুরাই জড়িত ছিল তাহাদের বিচারের ভার হিন্দু বিচারকদের উপর দেওয়া হইত। হিন্দুদের উত্তরাধিকার, বিবাহ প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করা হইত হিন্দু আইন অনুসারে। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা মোটামুটি কার্যকর ছিল।

জাহাঙ্গীর ১২টি আইনসংক্রান্ত নির্দেশ জারি করেন। আওরঙ্গজেবের নির্দেশে এবং তত্ত্বাবধানে 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' নামে মুসলমান আইনের এক সংক্ষিপ্তসার (digest) প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মুঘল সম্রাটেরা আইনের কোন পূর্ণাঙ্গ সংহিতা (code) প্রস্তুত করেন নাই। 'কাজী' এবং 'মুফ্‌তী'রা মুসলমান আইন অনুযায়ী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। পূর্ববর্তী কালের প্রখ্যাত আইনজ্ঞদের মত ('ফতোয়া'), সম্রাটদের আইনসংক্রান্ত নির্দেশ ('কানুন'), এবং তাঁহারা আইনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা, বিশেষ গুরুত্ব পাইত।

স্বয়ং সম্রাট ছিলেন বিচার-বিভাগের শীর্ষে। সাধারণতঃ তিনি নিম্নতন বিচারকদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের বিচার করিতেন, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তিনি প্রাথমিক স্তরের মামলারও বিচার করিতেন। সাধারণতঃ অন্য কোন বিচারক কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দিলে তাহা সম্রাটের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। এই কারণে তিনি প্রধানতঃ ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন।

মোকদ্দমার বিচার যাহাতে তাড়াতাড়ি হয় এবং সকলেই যাহাতে ন্যায় বিচার পায়, সেদিকে মুঘল সম্রাটদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। একজন ইয়োরোপীয় লেখক বলিয়াছেন যে বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আকবর বিশেষ উৎসাহী এবং সতর্ক ছিলেন। প্রজারা যাহাতে সরাসরি সম্রাটের কাছে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে, আকবর ও জাহাঙ্গীর সেইরকম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের প্রাসাদের বাহিরে শিকল সহ কয়েকটি ঘণ্টা টাঙানো ছিল। বাহিরে কেউ ঘণ্টা টানিলেই সম্রাট জানিতে

পারিতেন যে কোন প্রজা দরখাস্ত দাখিল করিতে চায়। শাহ জাহান প্রত্যহ সকালে প্রজাদের নালিশ শুনিতেন এবং প্রতি বুধবার মোকদ্দমার বিচার করিতেন।

সাধারণ অবস্থায় বিচারালয়গুলির শীর্ষে ছিল প্রধান 'কাজী'র ('কাজী-উল-কুজত') আদালত। তিনি নিজে মোকদ্দমার বিচার করিতেন। বিভিন্ন প্রদেশে, জেলায় এবং শহরে তিনি 'কাজী' নিযুক্ত করিতেন, তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সম্রাটের অনুমোদন দরকার হইত। সৈন্যবাহিনীর জন্য একজন পৃথক 'কাজী' ছিলেন। 'কাজী'রা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেন। 'কাজী'দের কাজকর্ম সম্বন্ধে অপবাদ সুপ্রচলিত ছিল। 'মুফতী'রা মুসলমান আইনের ব্যাখ্যা করিয়া এবং 'ফতোয়া' দিয়া 'কাজী'দের বিচারকার্যে সহায়তা করিতেন। গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে 'মুহতাসিব'গণ ধর্মীয় আইন অনুযায়ী মদ্যপান এবং জুয়া খেলা প্রভৃতি অপরাধ দমন করিতেন। প্রদেশগুলিতে ফৌজদারী মামলার প্রধান বিচারক ছিলেন 'সুবাদার' এবং রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার প্রধান বিচারক ছিলেন 'দেওয়ান।'

বিচার-ব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ ত্রুটি ছিল। কোন মামলার বিচার কোন আদালতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট ছিল না। একই ধরনের মামলার বিচার বিভিন্ন আদালতে হওয়া সম্ভব ছিল। কোন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপীল করা যাইবে তাহাও নির্দিষ্ট ছিল না। বিচারবিভাগ প্রশাসন বিভাগ হইতে পৃথক ছিল না। বিচারকগণের স্বাধীনতা রক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। 'কাজী'দের জেল পরিদর্শন করিতে এবং 'ওয়াকফ' সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে হইত। মুসলমান আইনে সাক্ষীদের জেরা করার এবং মৌখিক সাক্ষ্য ছাড়া অন্য রকম সাক্ষ্য (দলিলপত্র ইত্যাদি) গ্রহণ করার ব্যবস্থা ছিল।

প্রাদেশিক সরকার

আকবর সমগ্র সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বা 'সুবা'য় ভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষ ভাগে ১৫টি সুবা ছিল : (১) কাবুল (কাশ্মীর এবং কান্দাহার সহ); (২) লাহোর ; (৩) মুলতান (থাট্টা বা সিন্ধু দেশের দক্ষিণাংশ সহ); (৪) আহম্মদাবাদ (গুজরাট); (৫) মালব ; (৬) আজমীর (রাজপুত রাজ্যগুলি সহ); (৭) দিল্লী ; (৮) আগ্রা ; (৯) এলাহাবাদ ; (১০) অযোধ্যা ; (১১) বিহার ; (১২) বাংলা (উড়িষ্যা সহ) ; (১৩) বেরার ; (১৪) খান্দেশ ; (১৫) আহম্মদনগর। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের দ্বিতীয়ার্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের বিপুল প্রসার ঘটিয়াছিল। তখন সুবা ছিল ২১টি : (১) কাবুল ; (২) কাশ্মীর ; (৩) লাহোর ; (৪) দিল্লী ; (৫) মুলতান ; (৬) থাট্টা (সিন্ধু) ; (৭) গুজরাট ; (৮) আজমীর ; (৯) মালব ; (১০) আগ্রা ; (১১) এলাহাবাদ ; (১২) অযোধ্যা ; (১৩) বিহার ; (১৪) বাংলা ; (১৫) উড়িষ্যা ; (১৬) বেরার ; (১৭) খান্দেশ ; (১৮) আওরঙ্গাবাদ ; (১৯) বিজাপুর ; (২০) হায়দরাবাদ ; (২১) বিদর।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার আদর্শেই সুবার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক সুবায় একজন প্রধান প্রশাসক থাকিতেন। তাঁহার পদবী ছিল 'নাজিম', 'সিপাহ্ সালার' অথবা 'সুবাদার।' তিনি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। সামরিক, প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগীয় ব্যাপারে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার অধীনে একটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনী থাকিত। তিনি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, 'ফৌজদার' প্রভৃতি কর্মচারীদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতেন এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতেন।

সুবাদারের প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন 'দেওয়ান।' কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ানের সুপারিশ অনুযায়ী সম্রাট তাঁহাকে নিয়োগ করিতেন। তিনি নিজের কাজকর্মের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ানের কাছে দায়ী থাকিতেন। তিনি রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী ছিলেন; দেওয়ানী মামলার বিচার-ব্যবস্থাও তাঁহার কর্তৃত্বাধীন ছিল। সুবার প্রশাসন ব্যাপারে সুবাদার এবং দেওয়ান সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহারা নানা ভাবে পরস্পরের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করিতেন। সুবার উচ্চাভিলাষী শাসকদের সংযত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুগত রাখিবার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

সুবার প্রধান কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন 'ফৌজদার', 'আমাল গুজার', প্রাদেশিক 'কাজী', প্রাদেশিক 'বক্সী', 'কোতোয়াল' এবং 'মীর বহর'। ফৌজদার ছিলেন একটি 'সরকার' বা জেলার ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী। তিনি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, স্থানীয় বিদ্রোহ দমন করিতেন এবং রাজস্ব সংগ্রহের কাজে আমাল গুজারকে সাহায্য করিতেন। ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থাতেও তাঁহার কিছু অংশ ছিল। আমাল গুজারের কাজ ছিল রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ এবং তাহা আদায় করা। হিসাব রাখার জন্যও তিনি দায়ী ছিলেন। প্রাদেশিক কাজী ছিলেন সুবার প্রধান বিচারক। 'সদর'-এর দায়িত্বও তাঁহাকে পালন করিতে হইত। সুবার সৈন্যদলে নিয়োগ, সংগঠন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন প্রাদেশিক বক্সী। কোতোয়ালের প্রধান কাজ ছিল শহরাঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাও তাঁহাকে করিতে হইত। বর্তমান কালের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যে সব কাজ করে তাহার কিছু কিছু তাঁহাকে করিতে হইত। গ্রামাঞ্চলে কোন কোন জায়গায় গ্রাম প্রধান চৌকিদারের সাহায্যে শান্তি রক্ষা করিতেন। বন্দর, নৌকা, বাণিজ্য শুল্ক, জলপথে যাতায়াতের জন্য কর প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন মীর বহর।

প্রত্যেক সুবা 'সরকার' নামে পরিচিত কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সরকারে ছিল কয়েকটি 'পরগণা'। পরগণার প্রধান কর্মচারী ছিলেন 'সিকদার'। গ্রামের ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিত 'পঞ্চায়েত'। কেবলমাত্র রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের যোগাযোগ

খুবই কম ছিল। মুঘল রাজকর্মচারীরা শহরাঞ্চলে বাস করিতেন; গ্রামগুলি অবহেলিত ছিল।

অধিকাংশ সুবা এবং দিল্লীর মধ্যে দূরত্ব ছিল খুব বেশী; যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুবই অনুন্নত ছিল। তথাপি মুঘল সম্রাটেরা প্রাদেশিক শাসন মোটামুটি কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেন। আকবর তাঁহার পুত্রদিগকে সুবাদার নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার তিন উত্তরাধিকারী এই রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। সম্রাটের পুত্রগণ ছাড়া কেবলমাত্র বিশ্বস্ত এবং সুদক্ষ মনসবদারগণকেই সুবাদার পদে নিয়োগ করা হইত। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ানের নিকট দায়ী প্রাদেশিক দেওয়ানগণ সুবাদারদের কাজকর্ম নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেন। সুবাদারগণ এবং দেওয়ানগণ এক সুবা হইতে অন্য সুবায় বদলি হইতেন, কখন কখন বরখাস্তও হইতেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সংবাদ-সংগ্রাহক এবং গুপ্তচরদের সংগৃহীত সংবাদের ভিত্তিতে সম্রাট সুবাদার ও দেওয়ানদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন।

রাজস্ব-ব্যবস্থা: রাজস্বের হার নির্ধারণ

আদর্শ রাজস্ব-ব্যবস্থার মূল নীতি সম্বন্ধে আবুল ফজল বলিয়াছেন: বিভিন্ন দেশে জমির প্রকৃতি ও গুণের মধ্যে পার্থক্য থাকে; সুতরাং এই বিষয় বিবেচনা করিয়া ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্তব্য।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার ফলে শের শাহের রাজস্ব-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন রীতি-নীতি এবং কর নির্ধারণ ও আদায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সময় তিন শ্রেণীর জমি ছিল: (১) 'খালসা' (সরকারের খাস জমি, যেখানে সরকারী কর্মচারীরা প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিত); (২) 'জায়গীর' (যে জমি রাজস্ব-সংগ্রহকারীগণকে দেওয়া হইত, তাহারা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া সরকারের প্রাপ্য অংশ সরকারকে দিত এবং বাকি অংশ নিজেরা রাখিত); (৩) 'সয়ুরখল' (নিষ্কর জমি)। রাজস্ব-ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ নির্ধারণের পূর্বে আকবর ১৫৭৩ এবং ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ১৫৮২ সালে টোড়র মল দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং তখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করা হয়।

টোড়র মলের ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থার মূলনীতি নীচে বর্ণিত হইল:

জমি জরিপ করিয়া প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক কৃষকের হাতে কত পরিমাণ চাষযোগ্য জমি আছে তাহা নির্ধারণ করা হইত। জরিপের সুবিধার জন্য 'ইলাহী গজ' (৩৩ ইঞ্চি লম্বা) ব্যবহার করা হইত। চাষযোগ্য জমি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইত: (১) 'পোলজ' (যে জমি প্রতি বৎসর চাষ করা যায়); (২) 'পরৌতি' (যে জমি উর্বরতা রক্ষার জন্য এক বা দুই বৎসর অকর্ষিত রাখা হয়); (৩) 'চাচার'

(যে জমি তিন বা চার বৎসর অকর্ষিত রাখা হয়) ; (৪) 'বঞ্জর' (যে জমি চার বা পাঁচ বৎসর অথবা আরও বেশী সময় অকর্ষিত রাখা হয়)। (অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি প্রতি বৎসর চাষ করিলে তাহার ফলন কমিয়া যায়।) বিগত দশ বৎসরে কোন শ্রেণীর জমিতে প্রতি বিঘায় কোন শস্য গড়ে কত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা হইত। এক একটি পরগণায় ভিন্ন ভাবে হিসাব করা হইত (অর্থাৎ গড় নির্ধারণের জন্য একাধিক পরগণাকে এক সঙ্গে ধরা হইত না)। যে জমি চাষ করা হইয়াছে কেবলমাত্র সেই জমির উৎপাদন হিসাবেই কর ধার্য করা হইত। আকবরের রাজস্ব-ব্যবস্থায় জমি অধিকার করার ভিত্তিতে রাজস্ব দিতে হইত না, রাজস্ব ধার্য হইত জমির উৎপাদনের হিসাবে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে রাজস্ব নির্ধারণের (assessment) জন্য বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল। (১) 'ঘল্লাবকৃশী', 'বাতাই', 'ভাওলি'—অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের অংশ গ্রহণ। এই নীতি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে (কাশ্মীরে, সিন্ধু দেশের দক্ষিণ অংশে এবং কাবুলের এক অংশে) প্রচলিত ছিল। (২) 'কাঙ্কুত'—অর্থাৎ কর্ষিত জমি পরিদর্শন করিয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের আনুমানিক ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ। (৩) 'জাব্‌তি'—অর্থাৎ জমি জরিপের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ। লাহোর সুবা হইতে এলাহাবাদ সুবা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রথমে কেবলমাত্র খালসা জমিতে ইহা প্রয়োগ করা হইত; পরে জায়গীর জমির ক্ষেত্রেও ইহা প্রসারিত করা হয়। (৪) 'নাসক' প্রথা প্রচলিত ছিল বাংলা দেশে। একবার রাজস্ব নির্ধারিত হইলে তাহাই দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত থাকিত; প্রতি বৎসর জমি জরিপ ও রাজস্ব নির্ধারণ হইত না। বাংলায় সুলতানী আমলের 'কানুনগো' নামে পরিচিত কর্মচারীদের দ্বারা রক্ষিত কাগজপত্রের ভিত্তিতে টোডর মল এই নববিজিত সুবার রাজস্ব নির্ধারণ করেন। জরিপ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবপত্র প্রস্তুত করার সময় তাঁহার ছিল না। (প্রত্যেক পরগণায় একজন কানুনগো থাকিতেন। তিনি রাজস্ব নির্ধারণ এবং রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করিতেন। প্রত্যেক গ্রামে একজন 'পাটোয়ারী' বা হিসাবরক্ষক থাকিতেন।)

আবুল ফজল বলিয়াছেন, রাজাকে অর্থপ্রদান সম্বন্ধে প্রজার যে দায়িত্ব আছে তাহার কোন নৈতিক সীমা নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে, জমিতে উৎপন্ন শস্যের একটি অংশই রাজস্ব রূপে নেওয়া হইত। আকবরের সময়ে এই অংশ ছিল এক তৃতীয়াংশ; তবে যে সকল অঞ্চলে 'ঘল্লাবকৃশী' এবং 'কাঙ্কুত' প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানে ইহার ব্যতিক্রম ছিল। আকবরের আমলে সরকারের প্রাপ্য অংশ দেওয়া প্রজার পক্ষে কষ্টকর ছিল, কিন্তু শের শাহের আমলে আরও বেশী দিতে হইত (উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ, তাহা ছাড়া 'জরিবানা', 'মহসিলানা' এবং শতকরা আড়াই টাকা অতিরিক্ত কর বা cess)। আওরঙ্গজেবের আমলে প্রজার উপর চাপ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ নেওয়া হইত। ভূমি-রাজস্ব ছাড়া নানা রকম

কর ('উজুহত') দিতে হইত—যেমন, কোন কোন ব্যবসায়ের উপর কর, বাজারের উপর কর, মালপত্র আনা-নেওয়ার উপর কর, ইত্যাদি। জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তনের ফলে হিন্দুদের উপর নূতন ধরনের চাপ পড়িল।

যে সকল ইয়োরোপীয় পর্যটক ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন যে সম্রাটই জমির একমাত্র মালিক। কিন্তু আবুল ফজলের মতে, কৃষক এবং বণিকেরা সম্রাটকে যে অর্থ দিত তাহা সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিরাপত্তা এবং সুবিচারের প্রতিদান ('remuneration of sovereignty'), সম্রাটের সম্পত্তি (অর্থাৎ জমি) ব্যবহারের জন্য কর নয়। আকবর জমি ভোগ করার জন্য রাজস্ব দাবি করিতেন না, রাজস্ব দাবি করিতেন জমিতে উৎপন্ন শস্য ভোগ করার জন্য। স্থায়ী ভাবে, এবং উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে, কৃষক জমি ভোগ করিত ; তাহার এই অধিকার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু জমি ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র যাইবার অধিকার তাহার ছিল না, এবং এই স্বাধীনতার অভাবে সে প্রকৃতপক্ষে অর্ধদাস ('near-serf') হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল অঞ্চলে 'রায়তী' প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানে জমি এবং উৎপন্ন শস্যের উপর অধিকার সম্বন্ধে নানা রকম পার্থক্য ছিল। ফলে জমির উপর পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব সম্রাটেরও ছিল না, প্রজারও ছিল না। যে সকল অঞ্চলে জমিদারী প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানে জমিদারেরা অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিতেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রাম সমিতি (village community) ছিল, কিন্তু এই সকল সমিতি সভ্যদের প্রতিনিধি রূপে জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিত না।

রাজস্ব-ব্যবস্থা : জমিদার

'জমিদার' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'জমির রক্ষক'। সামাজিক ও আর্থিক দিক হইতে তাহারা ছিল কৃষক শ্রেণী হইতে ভিন্ন এবং উচ্চ স্তরের একটি শ্রেণী। গ্রামাঞ্চলে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুঘল আমলে 'জমিদার' শব্দটি সামন্ত রাজাদের সম্বন্ধেও ব্যবহার করা হইত। যেমন, জয়পুর ও যোধপুরের রাজপুত রাজাদেরও 'জমিদার' বলা হইত। অনেক ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তির অধিকারী, যিনি সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিতেন, 'জমিদার' আখ্যা পাইতেন।

বাংলায় জমিদারেরা সাধারণতঃ নিজেদের অধিকারভুক্ত গ্রামগুলির জন্য সরকারকে নির্ধারিত কর দিত এবং প্রজাদের নিকট হইতে প্রচলিত হারে, অথবা নিজেদের নির্দিষ্ট হারে, খাজনা আদায় করিত। সরকারের প্রাপ্য কর দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা তাহাদের নিজস্ব আয় বলিয়া গণ্য হইত। অন্যান্য প্রদেশে জমিদারেরা এই সুবিধা পাইত না। সেখানে তাহাদিগকে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায় করিতে হইত এবং সাধারণতঃ আদায়ীকৃত অর্থের এক-দশমাংশ

তাহাদের প্রাপ্য হইত। এই অংশকে 'মালিকানা' বলা হইত। তবে 'মালিকানা' বাদে তাহাদের আয়ের অন্য সূত্র ছিল। তাহারা প্রজাদের নিকট হইতে মাথা-পিছু কর, জন্ম-মৃত্যুর উপর কর, ঘরের উপর কর ইত্যাদি আদায় করিত। তাহারা প্রজাদিগকে বেগার খাটাইত। মোটের উপর জমিদারেরা ছিল একটি শোষণকারী শ্রেণী।

সাধারণভাবে জমিদারেরা ছিল একটি শক্তিশালী শ্রেণী। তাহারা উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি লাভ করিত। জমিদারী ক্রয় এবং বিক্রয় করা যাইত। তাহারা নিজ নিজ জমিদারীতে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ভোগ করিত। তাহারা দুর্গ নির্মাণ করিত এবং নিজস্ব সৈন্যদল পোষণ করিত। আবুল ফজল বলিয়াছেন যে জমিদারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৪৪ লক্ষের বেশী। জমিদারেরা ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের কাজে সরকারকে সাহায্য করিত, কিন্তু অনেক সময় সুবাদারদের সহিত তাহাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ থাকিত না। জমিদারদের শক্তি মোটের উপর আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে বাধা স্বরূপ ছিল। অনেক সময় তাহারা সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ঠিকমত দিত না। আবার অনেক সময় সরকারী কর্মচারীরা জমিদারদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিত।

মানুচি (Manucci) বলিয়াছেন: 'মুঘল সাম্রাজ্যে রাজা এবং জমিদারদের বিদ্রোহ লাগিয়াই আছে।' বিদ্রোহী জমিদারেরা অনেক সময় কৃষকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিয়া তাহাদের সহায়তা লাভ করিত। কোন কোন বিষয়ে জমিদার এবং কৃষকের মধ্যে সহযোগিতা স্বাভাবিক ছিল। জাঠ এবং মারাঠাদের বিদ্রোহের নেতারা ছিল জমিদার—অথবা জমিদার হইতে চায় এমন সাহসী পুরুষ। মুঘল রাজকর্মচারীদের তুলনায় এই সকল বিদ্রোহী নেতার একটি বিশেষ সুবিধা ছিল। তাহারা স্থানীয় অবস্থার এবং স্থানীয় লোকজনের সহিত সুপরিচিত ছিল।

জায়গীরদারী প্রথা

যে জমির রাজস্ব সরকারী কর্মচারীরা সাক্ষাৎভাবে প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিত তাহার নাম ছিল 'খালসা'। সাম্রাজ্যের যে সব অঞ্চলে জমি খুব উর্বর ছিল, এবং যেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, সেগুলি খালসার অন্তর্ভুক্ত করা হইত। শাহ্ জাহান এবং আওরঙ্গজেব খালসার আয়তন এবং রাজস্ব বৃদ্ধি করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশে ভূমি-রাজস্ব এবং অন্যান্য কর সংগ্রহের অধিকার সরকার নিজের হাতে না রাখিয়া নির্বাচিত ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করিত। এইভাবে হস্তান্তরিত অঞ্চলের নাম ছিল 'জায়গীর'। যাহারা জায়গীর ভোগ করিত তাহা-দিগকে বলা হইত 'জায়গীরদার'। তাহারা গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের নিকট হইতে ভূমি-রাজস্ব ছাড়া 'আবওয়াব' (অতিরিক্ত কর) এবং নানা রকম ছোটখাট কর আদায় করিত। সাধারণতঃ মনসবদারগণকে নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গীর দেওয়া হইত।

জায়গীরদারী প্রথা সাধারণতঃ মনসবদারদের পক্ষে লাভজনক এবং কৃষকদের পক্ষে উৎপীড়ন ভোগের কারণ হইয়াছিল। জমিদারদের সঙ্গে জায়গীরদারদের একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। জমিদারেরা উত্তরাধিকারসূত্রে জমিদারী ভোগ করিত; সুতরাং জমিদারীর অবস্থা এবং প্রজাদের অবস্থা যাহাতে বিপর্যস্ত না হয় সেদিকে তাহারা লক্ষ্য রাখিত। কিন্তু জায়গীরদারেরা বেশী দিন একই জায়গীর ভোগ করিত না। তাহারা এক জায়গীর হইতে অন্য জায়গীরে বদলি হইত; অনেক সময় সরকার জায়গীর কাড়িয়া লইত। সুতরাং কোন জায়গীরে তাহাদের স্থায়ী স্বার্থ থাকিত না, কোন জায়গীরের প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখা তাহাদের পক্ষে আবশ্যক ছিল না। কৃষকদের নিপীড়ন করিয়া বেশী অর্থ সংগ্রহ করার জন্যই জায়গীরদারেরা চেষ্টা করিত; সেচের বন্দোবস্ত বা অন্য কোন উপায়ে কৃষির উন্নতি করার আগ্রহ তাহাদের ছিল না। তাহারা নিজেদের কর্মচারীর মাধ্যমে জায়গীর পরিচলনা করিত এবং অনেক সময় অত্যাচারী প্রভুর ভূমিকা গ্রহণ করিত। বের্নিয়ে (Bernier) এবং হকিন্স্ (Hawkins) প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পর্যটকেরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে জায়গীরদারদের এক জায়গীর হইতে অন্য জায়গীরে বদলি করার প্রথা কৃষকদের শোষণ কঠোরতর করিয়াছিল।

জায়গীরদারী প্রথায় সঙ্কট

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে জায়গীর প্রথায় এক গভীর সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সময় মনসবদারদের সংখ্যা অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল, কারণ সৈন্যদল সম্প্রসারণের ফলে সৈন্যাধ্যক্ষদের সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছিল। জায়গীরের সংখ্যা ছিল সীমিত। ফলে অনেক সৈন্যাধ্যক্ষ (মনসবদার) বৎসরের পর বৎসর জায়গীর পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইত। জায়গীর না পাওয়া পর্যন্ত তাহারা নিজেদের ব্যয়ের জন্য এবং তাহাদের অধীন সৈন্যদের বেতন দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার হইতে পাইত না। সৈন্যেরা নিয়মিত বেতন না পাইয়া বিক্ষুব্ধ হইত। যখন দক্ষিণ ভারতে জায়গীর পাওয়া যাইত তখনও জায়গীর হইতে আশানুরূপ আয় হইত না, কারণ দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত দক্ষিণ ভারতে শস্যোৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। মানুচি দেখিয়াছিলেন যে দক্ষিণ ভারতের সমতল ভূমি তরুহীন ও শস্যহীন হইয়া গিয়াছে।

জায়গীরদারী প্রথার এই সঙ্কট রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অশুভ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জায়গীর ভোগ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল উত্তর ভারতের মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের একাধিপত্য ছিল। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা জয়ের পর ঐ দুই রাজ্যের অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের জায়গীর দিতে হইল। তাহারা 'দখিনী' নামে পরিচিত হইল। মারাঠা সৈন্যদের অধিনায়কদিগকে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিত্যাগ

করিয়া মুঘল পক্ষে যোগদান করিতে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে জায়গীর দেওয়া হইল। উত্তর ভারতের প্রাচীন জায়গীরদারেরা নূতন 'দখিনী' এবং মারাঠা জায়গীরদারদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইল। ফলে মুঘল সৈন্যবাহিনীতে রেষারেষির উৎপত্তি হইল।

মনসবদারী প্রথা

মনসবদারী (Mansabdari) প্রথা মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। 'মনসব' শব্দের অর্থ সরকারী পদ অথবা সরকার প্রদত্ত মর্যাদা। 'মনসবদার' এমন এক ব্যক্তি যে সরকারী চাকুরিতে একটি সুনির্দিষ্ট মর্যাদা ভোগ করে। মনসবদারগণ একটি বিশিষ্ট শ্রেণী রূপে মুঘল সাম্রাজ্যের অভিজাত শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইত।

ইয়োরোপের অভিজাত শ্রেণীর মত মুঘল সাম্রাজ্যের অভিজাত শ্রেণী বংশানুক্রমিক মর্যাদা ভোগ করিত না। ইংলণ্ডে ব্যারনের (Baron) পুত্র ব্যারন হয়, কিন্তু মনসবদারের পুত্র জন্মসূত্রে মনসবদার হইত না। এক মনসবদারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রকে সম্রাট মনসবদারী না দিলে সে মনসবদার রূপে গণ্য হইত না। ইংলণ্ডে অভিজাতগণ (Peers) সম্মিলিতভাবে রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিত; মনসবদারদের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। ইংলণ্ডে অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষ সরকারী কর্মচারী নয়, কিন্তু মনসবদারগণ সকলেই ছিল সরকারী কর্মচারী। তাহারা সামরিক এবং বেসামরিক—দুই রকমের সরকারী কাজই করিত।

কোন মনসবদারের মৃত্যু হইলে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি সরকারের সম্পত্তি রূপে গণ্য হইত। সম্রাট অনুগ্রহ করিয়া সেই সম্পত্তির কিছু অংশ তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে দিতেন। 'বৈৎ-উল-মাল' নামক এক প্রশাসনিক বিভাগ বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিত। এই ব্যবস্থার ফলে কোন বংশানুক্রমিক ঐশ্বর্যশালী শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হয় নাই।

মধ্য এশিয়ায় মনসবদারী প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই প্রথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কোন ব্যবস্থা আলাউদ্দীন খলজী এবং শের শাহের আমলে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে মোঙ্গল আক্রমণের সময় দিল্লীর সুলতানেরা মোঙ্গলদের সৈন্যদল সংগঠনের রীতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই রীতির প্রভাবে সুলতানী সৈন্যবাহিনীতে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। পরে বাবর তৈমুরের সৈন্যদল গঠনের পদ্ধতি ভারতে প্রবর্তন করেন।

মনসবদারী প্রথার আনুষ্ঠানিক সংগঠন করেন আকবর। তিনি দেখিলেন যে শের শাহের মৃত্যুর পর হইতে অশ্বারোহীদের ঘোড়ায় দাগ দেওয়ার (branding) রীতি ঠিকমত পালন করা হয় না। অধিকন্তু, যে আমীর বা মনসবদারের যত জন অশ্বারোহী রাখার কথা, তিনি তত জন অশ্বারোহী রাখেন না। কাগজপত্রে উল্লিখিত

(আমীর বা মনসবদারের) দায়িত্ব এবং বাস্তব অবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়া তিনি মনসবগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন : (১) 'জাত' (Zat) ; (২) 'সওয়ার' (Sawar)। প্রত্যেক মনসবদারকে উভয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইত।

'জাত' এবং 'সওয়ার' এই শব্দ দুইটি সংখ্যাসূচক, কিন্তু ইহাদের অর্থ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, 'জাত' অর্থ যত জন অশ্বারোহী কোন নির্দিষ্ট মনসবদার রাখিবে বলিয়া আশা করা হয়, আর 'সওয়ার' অর্থ যতজন অশ্বারোহী প্রকৃত পক্ষে তাহার অধীনে আছে। (যেমন, যাহার 'জাত' মর্যাদা ৫,০০০ এবং 'সওয়ার' মর্যাদা ৩,০০০, সে প্রকৃতপক্ষে ৩,০০০ অশ্বারোহী রাখিত।) আর এক মতে, 'জাত' শব্দ মনসবদারেব অধীন অশ্বারোহীর বাস্তব সংখ্যা বুঝাইত, 'সওয়ার' শব্দ অতিরিক্ত সম্মান বুঝাইত। তৃতীয় মতে, যত সংখ্যক সৈন্য প্রকৃত পক্ষে রাখিতে হইবে তাহা 'সওয়ার' শব্দ দ্বারা বুঝাইত, আর 'জাত' শব্দ যে সব ঘোড়া, হাতী, ভারবাহী পশু এবং মালবাহী গাড়ী রাখিতে হইবে তাহাদের সংখ্যা বুঝাইত। শব্দ দুইটির প্রকৃত অর্থ যাহাই হউক না কেন, এই শ্রেণী বিভাগ প্রবর্তন করিয়া আকবর মনসবদারী প্রথায় যে শৈথিল্য প্রবেশ করিয়াছিল তাহা সংযত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। তাঁহার বংশধরদের আমলে এই শৈথিল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আকবর মনসবদারদিগকে ৩৩টি স্তরে (grades) ভাগ করেন। সর্ব নিম্ন মনসব ছিল ১০ ; সর্বোচ্চ মনসব ছিল ১২,০০০। প্রথমে কেবলমাত্র সম্রাটের পুত্রদিগকেই পাঁচ হাজারের বেশী মনসব দেওয়া হইত। পরে রাজা মান সিংহ এবং অন্যান্য কয়েকজনকে সাত হাজারী মনসব দেওয়া হয়। আকবরের আমলে যাহাদের মনসব দুই শতের নীচে তাহাদিগকে 'আমীর' বলা হইত না।

জাহাঙ্গীরের আমলে কোন মনসবদারের অধীনে প্রকৃত পক্ষে কতজন অশ্বারোহী আছে সেই বিষয়ে কোন রকম অনুসন্ধান করা হইত না। নির্দিষ্ট সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের চেয়ে কম অশ্বারোহী রাখিয়াও মনসবদার নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহীর পূর্ণ বেতন পাইত। উচ্চ স্তরের মনসবদারদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইল : 'সি আস্‌প্য', 'দু আস্‌প্য', 'ইয়াক প্য' (তিন ঘোড়া, দুই ঘোড়া, এক ঘোড়া)। এই তিনটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

শাহ জাহান মনসবদারদিগকে নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী রাখিতে বাধ্য করিতে পারেন নাই। তখন ব্যবস্থা করা হইল, কোন মনসবদার যদি সেই সুবাতে কর্মরত থাকে যেখানে তাহার জায়গীর আছে, তবে তাহাকে তাহার মনসবের জন্য নির্দিষ্ট অশ্বারোহী-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অশ্বারোহী রাখিতে হইবে। কিন্তু কোন মনসবদার যদি সেই সুবাতে কর্মরত থাকে যেখানে তাহার জায়গীর নাই (অর্থাৎ তাহার জায়গীর যদি অন্য কোন সুবাতে অবস্থিত হয়), তবে তাহাকে তাহার মনসবের জন্য নির্দিষ্ট অশ্বারোহীসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ

অশ্বারোহী রাখিতে হইবে। ফলে মনসবদারেরা নির্দিষ্ট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ অশ্বারোহী রাখিয়াই পূর্ণ সংখ্যার জন্য বেতন পাইত।

আওরঙ্গজেবের আমলে মনসবদারী প্রথায় কোন রকম সাংগঠনিক পরিবর্তন করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের শেষ ভাগে দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধের ফলে এই প্রথা এক গভীর সঙ্কটে পড়িয়াছিল। মনসবদারদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, কিন্তু জায়গীরের সংখ্যা সীমিত থাকায় তাহাদের মধ্যে সকলকে সময়মত জায়গীর দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

মনসবদারেরা সাধারণতঃ নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গীর পাইত। জায়গীরের আয় হইতে তাহাদের নিজস্ব খরচ এবং তাহাদের অধীন অশ্বারোহীদের বেতন মিটাইতে হইত। ঘোড়া এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম তাহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইত। তাহারা উচ্চহারে বেতন পাইত। নগদ বেতন না দিলে ঐ বেতনের সমান আয় হইতে পারে এমন জায়গীর দেওয়া হইত। যাহার মনসব ৫০০ সে মাসিক অন্যূন ১৮,০০০ টাকা বেতন পাইত। মনসবদারেরা মুখ্যতঃ সামরিক কর্মচারী ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করাই তাহাদের প্রধান কর্তব্য ছিল। তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা জায়গীর পাইত তাহারা রাজস্ব আদায়ে এবং স্থানীয় প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিত।

কোন কোন মনসবদার নিজেরা সৈন্য সংগ্রহ না করিয়া খাস সরকারী সৈন্য পরিচালনা করিত। এই সকল সৈন্যের মধ্যে অশ্বারোহী এবং পদাতিক ছিল; তাহারা 'দাখিলী' নামে পরিচিত ছিল। 'আহাদিস' নামে পরিচিত আর এক শ্রেণীর সৈন্য ছিল। তাহাদের পরিচালক ছিল তাহাদের শ্রেণীর বহির্ভূত কোন মনসবদার। এই সৈন্যদের দক্ষতা এবং বিশ্বস্ততার জন্য খ্যাতি ছিল। তাহারা উচ্চহারে বেতন পাইত।

অধিকাংশ মনসবদারই ছিল বিদেশী বা বিদেশীর বংশধর। তাহাদের মধ্যে আদি বাসভূমি অনুযায়ী তিনটি শ্রেণী ছিল—মধ্য এশিয়া হইতে আগত তুর্কী, পারস্য হইতে আগত পারসিক, এবং আফগানিস্থান হইতে আগত আফগান (বা পাঠান)। মনসবদারদের মধ্যে ভারতীয় মুসলমান এবং রাজপুতের সংখ্যা খুব কম ছিল না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে উচ্চ পদের অধিকারীর সংখ্যা কম ছিল। মনসবদারেরা নিজ নিজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যোদ্ধাকে নিজের সৈন্যদলে নিযুক্ত করিত, তাই সামগ্রিক-ভাবে মুঘল সৈন্যবাহিনীতে জাতিগত ঐক্য ছিল না। মনসবদারদের মত সাধারণ সৈনিকেরাও তুর্কী, পারসিক, আফগান, ভারতীয় মুসলমান, রাজপুত প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে ঐক্যের একমাত্র সূত্র ছিল পদোন্নতি এবং সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা। ঐক্যের অভাবে সাম্রাজ্যের সামরিক বল ক্ষুণ্ণ হইত, কিন্তু রাজনৈতিক দিক হইতে এই ব্যবস্থা সম্রাটের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল। মনসবদারেরা কখনও ঐক্যবদ্ধ হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিত না।

মনসবদারেরা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের শাসকশ্রেণী (bureaucracy); তাহারা সামরিক দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্বও বহন করিত। মুঘল শাসনব্যবস্থায় এই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে কোন সীমারেখা ছিল না। সামরিক এবং প্রশাসনিক বিভাগের প্রত্যেক কর্মচারীই সৈন্যদলে মনসবদার রূপে পরিগণিত হইত। এমন কি, বিচারক, শুল্ক বিভাগের কর্মচারী এবং হিসাবরক্ষকও ছিল মনসবদার—যদিও সামরিক কাজের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাহাদের পদোন্নতি হইলে তাহাদের মনসব বৃদ্ধি করা হইত। যেমন, একজন এক হাজারী বিচারকের পদোন্নতি হইলে তিনি দুই হাজারী মনসবদার হইতেন।

সৈন্যবাহিনী

সৈনিকেরা চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : (১) যাহাদিগকে সামন্ত রাজারা নিযুক্ত করিতেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনা করিতেন ; (২) যাহাদিগকে মনসবদারেরা নিযুক্ত করিত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনা করিত ; (৩) যাহারা সাক্ষাৎভাবে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইত এবং সরকারী কোষাগার হইতে বেতন পাইত (দাখিলী); ভদ্রলোক শ্রেণীর সৈনিক, যাহারা স্বয়ং সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইত (আহাদিস)।

সৈন্যবাহিনীর চারিটি শাখা ছিল: (১) অশ্বারোহী; (২) পদাতিক; (৩) গোলন্দাজ (artillery): (৪) সমুদ্রে এবং নদীতে যুদ্ধের জন্য নাবিক (flotialla)। অশ্বারোহীদের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী, কিন্তু পদাতিকদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। যুদ্ধে হাতী এবং উট ব্যবহার করা হইত। সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল না।

মুঘল সৈন্যবাহিনী সংখ্যার দিক হইতে সুবৃহৎ হইলেও যুদ্ধক্ষেত্রে ইহার দক্ষতা ছিল নিম্ন শ্রেণীর। বিভিন্ন মনসবদারদের অধীন সৈনিকদের মধ্যে মনের দিক হইতে ঐক্য ছিল না। তাহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজপোষাকের মধ্যে পার্থক্য ছিল, সামরিক শৃঙ্খলার দিক হইতে তারতম্য ছিল। সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে ভিন্ন ভিন্ন দলে (regiment) ভাগ করা হইত না। এক শাখা হইতে অন্য শাখায় —যেমন, অশ্বারোহীকে গোলন্দাজ বিভাগে—বদলি করার রীতি ছিল না। যুদ্ধযাত্রার সময় সৈনিকদের সঙ্গে যাইত অনেক বেসামরিক মানুষ (non-combatants)। সৈনিকদের ছাউনিতে বাজার বসিত। প্রচুর লোক সমাগম এবং যানবাহনের বাহুল্যের ফলে সৈন্যবাহিনীর গতির ক্ষিপ্রতা নষ্ট হইত। সামরিক ছাউনি ছিল একটি অতিকায় চলমান শহরের মত। সৈনিকদের পক্ষে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া শত্রুকে আক্রমণ বা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করা সম্ভব হইত না।

নানা জাতির মানুষ লইয়া সংগঠিত মুঘল সৈন্যবাহিনীতে ভারতের জন্য কোন মমত্ববোধ থাকিত না। সকলেই অর্থলোভে যুদ্ধ করিত। সম্রাটের প্রতি আনুগত্য অপেক্ষা প্রত্যক্ষ বেতনদাতা মনসবদারের প্রতি আনুগত্য ছিল বেশী।

২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

কৃষি

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষি-ব্যবস্থা প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী পরিচালিত হইত। পূর্ববর্তী কালে কৃষির জন্য যে সকল যন্ত্র (implements) ব্যবহৃত হইত সেগুলি মুঘল যুগেও প্রচলিত ছিল। তবে পারস্য দেশীয় চাকা (Persian wheel) ব্যবহারের ফলে পাঞ্জাব প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলে শস্যের উৎপাদন বাড়িয়াছিল। খাদ্যশস্য ছাড়া চিনি, নীল, তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। জাহাঙ্গীরের আমলে তামাকের চাষ শুরু হয়।

চাল, তরিতরকারী, দুধ, মাংস প্রভৃতি সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য জিনিষের দাম খুব কম ছিল। পর্যটক এডওয়ার্ড টেরী (Edward Terry) সারা দেশে খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাভার্নিয়ে (Tavernier) বলিয়াছেন যে গ্রামেও প্রচুর পরিমাণে ময়দা, চিনি এবং মিঠাই পাওয়া যাইত। মানুচি লিখিয়াছেন যে বাংলায় ফল, ডাল, মসলিন, রেশমী বস্ত্র, সোনার কাজ-করা বস্ত্র প্রভৃতি জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জমি উর্বর ছিল, উৎপাদন ছিল প্রচুর। কিন্তু জিনিসপত্র সস্তা দরে বিক্রয় হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল শহরের মানুষের জন্য কম দামে জিনিসপত্র সরবরাহের বন্দোবস্ত করা। গ্রামে যাহারা জিনিসপত্র উৎপাদন করিত তাহাদের নগদ টাকার প্রয়োজন ছিল। তাই তাহারা বণিকদের নির্দিষ্ট দামে তাহাদের কাছে জিনিসপত্র বেচিতে বাধ্য হইত। নগদ টাকা ছিল বণিকদের হাতে। উৎপাদকেরা উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য দাম পাইত না, কারণ তাহারা মূলধনের অভাবে ঐ দ্রব্য তাড়াতাড়ি বেচিয়া ফেলিত।

কৃষকদের অবস্থা

কৃষকদের উচ্চ হারে কর দিতে হইত। তাহারা শোচনীয় অবস্থার মধ্যে বাস করিত। বাবর দেখিয়াছিলেন যে তাহারা সম্পূর্ণ নগ্নপদে চলাফেরা করিত। আগ্রার ইংরেজ বণিকেরা দেখিয়াছিল যে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় চলাফেরা করিত। আবুল ফজল বলিয়াছেন, বাংলার বহু পুরুষ ও স্ত্রীলোক গাছের পাতা দিয়া অঙ্গাবরণ ('coverings') তৈরী করে। রাজস্থানের মানুষ বাঁশের তৈরী কুটিরে বাস করিত। উত্তর প্রদেশের দোয়াব অঞ্চলে সাধারণ মানুষের বাসগৃহের দেয়াল মাটিতে তৈরী ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কৃষকেরা যে খাদ্যশস্য উৎপাদন করিত তাহার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অংশ নিজেদের পরিবারের ব্যবহারের জন্য রাখিত।

সরকারী নীতি কৃষকদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিত। উচ্চ হারে ভূমি-রাজস্ব নির্দিষ্ট

হইত। লাহোর অঞ্চলের কৃষকেরা ভূমি-রাজস্ব পরিশোধের জন্য মহাজনের নিকট হইতে ধার নিত; এজন্য তাহাদের স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে বন্ধক রাখিতে হইত। উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য কৃষকেরা পাইত না; ফলে তাহাদের দারিদ্র্য ঘুচিত না। অনেক ভূমিহীন কৃষক ছিল। তাহারা পরের জমি চাষ করিয়া প্রাণ বাঁচাইত। তাহাদের অবস্থা প্রায় দাসত্বের স্তরে পৌঁছিয়াছিল।

অত্যাচারের ফলে কৃষকেরা মাঝে মাঝে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইত। অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগের সঙ্গে সময় সময় ধর্ম এবং সামাজিক ব্যাপার সংক্রান্ত অভিযোগের সংমিশ্রণ ঘটিত। সাধারণতঃ বিদ্রোহের অর্থ ছিল খাজনা না দেওয়া, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহ হইত। সাধারণতঃ জমিদারেরা বিদ্রোহী কৃষকদের নেতৃত্ব করিতেন, কারণ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে জমিদারদের নানা রকম অভিযোগ থাকিত। জাঠদের বিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তাহাদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য। বিদ্রোহী জাঠ জমিদারদের নেতৃত্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি শক্তিশালী জাঠ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। মুঘল সম্রাটদের বিরুদ্ধে শিখদের সংগ্রামের মূলে ছিল ধর্ম। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল।

মুঘল আমলে বারবার দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। জনসাধারণ চরম দুর্গতি ভোগ করিয়াছিল, কারণ দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ অতি সামান্য সরকারী সাহায্য (relief) পাইত, খাজনা মকুব করার ব্যবস্থাও ছিল না। ১৫৫৪-৫৬ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ ঘাস ও গরুর চামড়া খাইত। ঐতিহাসিক বদায়ুনী লিখিয়াছেন, তখন মানুষ মানুষের মাংস খাইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে গুজরাট দুর্ভিক্ষে নিপীড়িত হইয়াছিল। ১৬৩০-৩২ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটে এবং দাক্ষিণাত্যে ভয়াবহ বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। মুঘল যুগে ইহার তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষ গরুর চামড়া এবং কুকুরের মাংস খাইত। মরা মানুষের হাড়ের চূর্ণ ময়দার সঙ্গে মিশাইয়া রুটি তৈরী হইত। শেষ পর্যন্ত মানুষ মানুষের মাংস খাইতে লাগিল। শাহ জাহান দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য কয়েকটি লঙ্গর খোলার ব্যবস্থা করেন, দেড় লক্ষ টাকা তাহাদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং ভূমি-রাজস্বের অর্ধাংশ মকুব করেন। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে এক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; সিন্ধু এবং গুজরাটে ইহার প্রকোপ ছিল বেশী। দাক্ষিণাত্যে ১৭০২ সালের দুর্ভিক্ষে কুড়ি লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। বাংলায় কোন গুরুতর দুর্ভিক্ষ হয় নাই। মালব দুর্ভিক্ষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

শিল্প (Industry)

মুঘল যুগে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে, সমসাময়িক ইয়োরোপীয় পর্যটকদের লেখা বইতে, এবং ইয়োরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যকুঠিগুলির কাগজপত্রে। ভারত শিল্পের দিক হইতে সমৃদ্ধ ছিল ; কিন্তু কারিগরি বিদ্যার (technology) কোন উন্নতি হয় নাই, দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচিত যন্ত্রগুলিই উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইত। শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি : দেশের ধনী মানুষের প্রয়োজন পূরণ, এবং এশিয়া ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে যে সব বণিক এদেশে আসিত তাহাদের চাহিদা পূরণ। সূতী বস্ত্র উৎপাদন ছিল প্রধান শিল্প। পেলসের্ট (Pelsaert) লিখিয়াছেন, পূর্ব বাংলায় সকলেই বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে এবং যে বস্ত্র তৈরী হয় তাহার গুণ ও খ্যাতি যথেষ্ট। বের্নিয়ে (Bernier) বলিয়াছেন : "বাংলায় (Bengale) এত বেশী পরিমাণ তুলা এবং রেশম আছে যে এই রাজ্যকে শুধু ভারতের বা মুঘল সাম্রাজ্যের নয়—সমুদয় প্রতিবেশী রাজ্যের, এমন কি, ইয়োরোপের—এই দুইটি দ্রব্যের ভাণ্ডার (store-house) বলা যায়।" গুজরাটে, খান্দেশে, উড়িষ্যায়, বিহারে, উত্তর প্রদেশে এবং বাংলায় সূতী বস্ত্র উৎপাদনের বহু গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। সূতী বস্ত্র নানা রঙে রঞ্জিত করা একটি বিশিষ্ট শিল্প ছিল। টেরী (Terry) বলিয়াছেন যে মোটা কাপড়ে রঙ লাগানো হইত অথবা নানারকম রঙীন ফুল বা মূর্তির ছবি ছাপা হইত।

সূতী বস্ত্র বয়ন অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ হইলেও রেশমী বস্ত্র বয়ন একটি বিশিষ্ট শিল্প ছিল—বিশেষতঃ বাংলায়। মানুচি লিখিয়াছেন যে বাংলা ছিল রেশমের ভাণ্ডার। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রতি বৎসর বাংলায় প্রায় ২৫ লক্ষ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইত। লাহোর, আগ্রা এবং গুজরাটে রেশমী বস্ত্র বয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল।

বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষতঃ বিহারে—বারুদ তৈরী হইত। গোলকুণ্ডায় লোহা তৈরী হইত। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এবং সরকারী কর্মচারীরা শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদকদের নানাভাবে শোষণ করিত। তাহারা কম দামে তাহাদের তৈরী জিনিস বেচিতে বাধ্য হইত। বেআইনী হইলেও তাহাদের উপর আবওয়াব (অতিরিক্ত কর) ধার্য করা হইত।

সুলতানী আমলে শিল্প দ্রব্য তৈরীর জন্য সরকারী 'কারখানা' ছিল। আকবরের রাজত্বকালে 'কারখানা'গুলির প্রসার ঘটিয়াছিল। সরকারের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল জিনিসই এই সকল 'কারখানা'য় তৈরী হইত। আবুল ফজল বলিয়াছেন, সম্রাটের প্রাসাদের (Imperial Household) সহিত সংশ্লিষ্ট এক শতেরও বেশী অফিস এবং শিল্পদ্রব্য তৈরীর কেন্দ্র (workshop) ছিল। রাজধানী ছাড়া লাহোর, আগ্রা, ফতেপুর, আহম্মদাবাদ এবং বুরহানপুরে এইরূপ কেন্দ্র ছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্য

স্থলপথে এবং জলপথে বিদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি এবং বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানি করা হইত। প্রধান স্থলপথগুলি ছিল উত্তর-পশ্চিমে—লাহোর হইতে কাবুল এবং মুলতান হইতে কান্দাহার। বৃহত্তর বিদেশী বাজারের সহিত সংযোগ ছিল জলপথে। পশ্চিম উপকূলে প্রধান বন্দর ছিল লাহোরী বন্দর (সিন্ধুদেশে); সুরাট, ব্রোচ ও ক্যাম্বে (গুজরাটে); বেসিন, চৌল ও দাভোল (মহারাষ্ট্রে); (পর্তুগীজদের অধীন) গোয়া; কালিকট ও কোচিন (কেরলে)। পূর্ব উপকূলে প্রধান বন্দর ছিল নেগাপটম (তামিল নাড়ুতে); মসুলিপটম (অন্ধ্র প্রদেশে); সপ্তগ্রাম (সাতগাঁও), শ্রীপুর, চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁও (বাংলায়)।

মুঘলদের শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছিল না; দেশীয় বণিকেরা ছোট জাহাজে পণ্যদ্রব্য চালান দিত। এই কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই ইয়োরোপীয় (পর্তুগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ) বণিকদের দখলে ছিল। তাহাদের বৃহৎ ও সুদৃঢ় সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল। পশ্চিম ইয়োরোপে ভারতীয় সূতীবস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল, কিন্তু ইয়োরোপে তৈরী মূল্যবান দ্রব্যের চাহিদা ভারতে খুব কম ছিল। ফলে ইয়োরোপীয় বণিকেরা সোনা ও রূপা দিয়া ভারতীয় পণ্যদ্রব্য কিনিয়া ইয়োরোপে চালান দিত। ইয়োরোপের সোনা ও রূপা ভারতে আসিত। ভারত হইতে রূপা বিদেশে চালান করা মুঘল সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিল।

রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল বস্ত্র, মরিচ, নীল, এবং আফিম ও অন্যান্য ঔষধ। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল সোনা ও রূপা, কাঁচা রেশম, ঘোড়া, নানা রকম ধাতু, হাতীর দাঁত, নানারকম মূল্যবান ধাতু, কারুকার্যভূষিত বস্ত্র, সুগন্ধি দ্রব্য, ঔষধ, চীনা মাটির বাসন এবং আফ্রিকার ক্রীতদাস। আমদানি এবং রপ্তানি শুল্কের হার কমই ছিল। সুরাট বন্দরে শুল্কের হার ছিল শতকরা ৩½ মাত্র।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

ভারতের অভ্যন্তরে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে কৃষিজাত পণ্য এবং শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য নিয়া যাওয়া হইত। কিন্তু এই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির পথে দুইটি প্রধান বাধা ছিল। প্রথমতঃ, পণ্য পরিবহনের জন্য গরুর গাড়ী, ভারবাহী ষাঁড়, উট এবং নৌকা ব্যবহৃত হইত। এই ব্যবস্থায় অনেক সময় নষ্ট হইত, খরচও বেশী হইত। দ্বিতীয়তঃ, নানা স্থানে শুল্ক দিতে হইত। ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইত।

গ্রামের মানুষ সাধারণতঃ নিজেদের উৎপন্ন শস্য, গ্রামের তাঁতিদের তৈরী কাপড় প্রভৃতি দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন মিটাইত। গ্রামে উৎপন্ন শস্যের উদ্বৃত্ত অংশ শহরাঞ্চলে চালান দেওয়া হইত। শহরে শিল্প দ্রব্য তৈরীর জন্য কাঁচা মাল গ্রাম হইতে যোগান দেওয়া হইত।

জীবনধারণের মান

চাল, তরিতরকারি, মসলা, দুধ, মাংস প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম খুব সস্তা ছিল। টেরী বলিয়াছেন, 'সমগ্র দেশে খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য রহিয়াছে এবং প্রত্যেকেই অতি সহজে রুটি পাইতে পারে।' কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় এত কম ছিল যে তাহারা ভাল খাদ্য ও বস্ত্র সংগ্রহ করিতে এবং বাসগৃহ নির্মাণ করিতে পারিত না। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পেলসের্ট (Pelsaert) লিখিয়াছেন, সাধারণ মানুষ এমন দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিত যে তাহাদের জীবন ছিল 'ভয়াবহ দুঃখের আবাস' ('dwelling place of bitter woe')।

অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা এমন বিলাসদ্রব্যে তাহাদের বিপুল আয় ব্যয় করিত যাহা অর্থ নৈতিক দিক হইতে অনুৎপাদক এবং নৈতিক দিক হইতে ধ্বংসাত্মক ছিল। ধনসঞ্চয়ের জন্য তাহাদের আগ্রহ ছিল না, কারণ তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের সঞ্চিত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত। পেলসের্ট বলিয়াছেন, তাহাদের 'মহল (বাসগৃহ) নীতিবিগর্হিতভাবে সজ্জিত করা হইত এবং দম্ভের প্রতীক রূপে গণ্য হইত'। তাহারা প্রায় সকলেই মদ্যপায়ী এবং দুশ্চরিত্র ছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল সংখ্যার দিক হইতে ক্ষুদ্র এবং আর্থিক দিক হইতে মিতব্যয়ী। সীমিত আয় এবং সামাজিক ঐতিহ্য এই শ্রেণীকে অমিতব্যয়িতা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করিত। বিত্তশালী বণিকেরাও প্রায়ই সাধারণভাবে জীবন-যাপন করিত। কিন্তু পশ্চিম ভারতের বণিকেরা প্রায়ই বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে লব্ধ প্রচুর আয় বিলাসদ্রব্যে ব্যয় করিত।

সামাজিক অবস্থা

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রবল ছিল; ভক্তি আন্দোলনের ফলে ইহার কঠোরতা অতি সামান্য পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। শিখগুরুগণ এই প্রথার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু শিখ সম্প্রদায় ইহা ত্যাগ করে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে গুরু গোবিন্দ সিংহ যে সকল সংস্কার প্রবর্তন করেন তাহার ফলে শিখ সম্প্রদায় মোটামুটিভাবে জাতিভেদের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিল। হিন্দু সমাজে নারীরা বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ এবং 'সতী' প্রথার ফলে বহু দুঃখ ভোগ করিত। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন অঞ্চলে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল।

মুসলমান সমাজে জাতিভেদ না থাকিলেও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্য স্থাপিত হয় নাই। বংশ এবং ঐশ্বর্য—এই দুইটি ছিল মুসলমানের সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি। বিদেশ হইতে আগত মুসলমানেরা বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করিত। সরকারী চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহারা অগ্রাধিকার পাইত। যে সকল হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত তাহারা এবং তাহাদের বংশধরেরা, বিদেশ

হইতে আগত মুসলমানদের এবং তাহাদের বংশধরদের সমান মর্যাদা পাইত না। মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ এবং বিধবা বিবাহ সুপ্রচলিত ছিল।

ইয়োরোপীয় পর্যটকগণ

সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে বহু পযটক বিভিন্ন পথে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়াছিলেন। কাহারও উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য, কেহ কেহ আসিয়াছিলেন চাকুরির সন্ধানে, কয়েকজনের উদ্দেশ্য ছিল অজানা দেশে অজানা মানুষের মধ্যে প্রচলিত অদ্ভুত রীতি-নীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান। তাঁহারা এদেশে যাহা দেখিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণ সেই যুগের ইতিহাস রচনার একটি অত্যাবশ্যক উপাদান।

আকবরের রাজত্বকালের শেষ দিকে আসিয়াছিলেন র‍্যাল্‌ফ ফিচ (Ralph Fitch) নামক একজন ইংরাজ। ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের একখানি চিঠি লইয়া উইলিয়ম হকিন্‌স (William Hawkins) জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। তাঁহার লিখিত বিবরণীতে মনসবদারী প্রথার বর্ণনা আছে। ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম জেম্‌সের দূত স্যার টমাস্ রো (Sir Thomas Roe) আজমীরে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণীতে (*Journal*) বাদশাহী দরবারে প্রচলিত ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এবং দুর্নীতির বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা আছে। ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে ব্রুটন (Bruton) এবং কার্টরাইট (Cartwright) নামক দুইজন ইংরাজ বণিক বাংলায় এবং উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন। ব্রুটন বাংলার মানুষের নানারকম শিল্পে দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন।

মানৃরিক (Maurique) নামক সিবাস্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত এক সন্ন্যাসী (Sebastian Friar) এবং পেলসের্ট নামক এক ওলন্দাজ (Dutch) বণিক জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিবরণী ঐতিহাসিকের পক্ষে মূল্যবান।

পিয়েত্রো দেলা ভ্যালে (Pietro della Valle) নামক এক ইটালীয় পর্যটক ১৬২৩ খ্রীস্টাব্দে সুরাটে আসিয়াছিলেন। গুজরাটে ধর্ম সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা এবং সতী প্রথার ক্রমাবলুপ্তি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। গেমেলি কারেরি নামে আর একজন ইটালীয় পর্যটক ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে আওরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মানুচি (Manucci) নামক আর একজন ইটালীয় পর্যটকের নাম অধিকতর সুপরিচিত। *Storia do Mogor* নামক তাঁহার রচিত বৃহৎ গ্রন্থে অর্ধ শতাব্দীর (১৬৫৩-১৭০৮ খ্রীস্টাব্দ) বিবরণ পাওয়া যায়।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সম্বন্ধে তিন জন ফরাসী পর্যটকের লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। বের্নিয়ে (Bernier) ছিলেন চিকিৎসক। তাভার্নিয়ে (Tavernier)

ছিলেন রত্নব্যবসায়ী। থ্যভ্যনো (Thevenot) অপরিচিত দেশ এবং অপরিচিত ভাষা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে উৎসাহী ছিলেন।

পিটার মাণ্ডি (Peter Mundy) ইয়োরোপে এবং ভারত সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দীর্ঘকাল (১৬০৮-৬৭ খ্রীস্টাব্দ) ভ্রমণ করেন।

৩. শিল্প ও সাহিত্য

স্থাপত্য শিল্প : বাবর ও হুমায়ুন

আওরঙ্গজেব ছাড়া ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সকল মুঘল শাসকই শিল্পের—বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পের—উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাবর আগ্রা, সিক্রি, বিয়ানা, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র এবং কিউলে সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। নির্মাণ কার্যে ভারতীয় প্রস্তর শিল্পীদের সাহায্য নেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার আত্মজীবনীতে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের বিরূপ সমালোচনা আছে। কথিত আছে যে তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল হইতে স্থাপত্যশিল্পী আনিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সময়ে নির্মিত সৌধগুলিতে পূর্ব-ইয়োরোপীয় (Byzantine) শিল্পের প্রভাব দেখা যায় না। হুমায়ুনের নির্মিত সৌধগুলির মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। তাহার মধ্যে একটিতে পারসিক ধাঁচের অলঙ্করণ (decoration) আছে।

স্থাপত্য শিল্প : আকবর

আকবরের রাজত্বকালেই প্রকৃত পক্ষে মুঘল শিল্পের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছিল। সাসারামে শের শাহের অপূর্ব সমাধিসৌধে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এই ঐতিহ্য আকবরের নিকট প্রেরণা পাইয়াছিল। তাঁহার সময়ে পারসিক শিল্পভাবনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দু এবং জৈন মন্দিরগুলির অলঙ্করণ রীতি আকবর কর্তৃক নির্মিত আগ্রা, লাহোর এবং ফতেপুর সিক্রির কোন কোন সৌধে ব্যবহৃত হইয়াছিল। হুমায়ুনের সমাধিসৌধে পারসিক প্রভাব সুস্পষ্ট ; কিন্তু সেখানেও ভূমিসংলগ্ন অংশটি ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্মিত এবং বহির্ভাগে ভারতীয় রীতি অনুযায়ী শ্বেতবর্ণ প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্পষ্টতঃই ধর্ম সম্বন্ধে আকবরের উদারতা তাঁহার সৌধাবলীতে প্রতিফলিত হইয়াছে। "আকবরের রাজত্বকালের স্থাপত্যকীর্তিতে হিন্দু এবং মুসলমান রীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। প্রস্তরের মাধ্যমে তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতি ও বিশ্বাস প্রকাশিত হইয়াছে।" আবুল ফজল বলিয়াছেন, "সম্রাট অপূর্ব সৌধাবলীর পরিকল্পনা করেন, তারপর নিজের হৃদয়ের ও মনের সেই ভাবকে প্রস্তর ও কর্দমের ভূষণে ('garment of stone and clay') রূপায়িত করেন।" 'অপূর্ব সৌধাবলী' ছাড়া

আকবর বহু দুর্গ, স্তম্ভ, বাসগৃহ, সরাই, বিদ্যালয় ইত্যাদি নির্মাণ করেন এবং দীঘি ও কূপ খনন করেন।

নবনির্মিত শহর ফতেপুর সিক্রি কয়েক বৎসর (১৫৬৮-১৫৮৪) আকবরের রাজধানী ছিল। এই মনোরম নগরী 'এক মহান ব্যক্তির মনের প্রতিবিম্ব।' এখানে নির্মিত 'অপূর্ব সৌধাবলী' প্রকৃতই দৃষ্টি আকর্ষণকারী। যোধাবাঈর প্রাসাদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, জামি মসজিদ এবং পঞ্চ মহল স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দক্ষতার বিস্ময়কর নিদর্শন। সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণকারী কীর্তি বুলন্দ দরওয়াজা। গুজরাট বিজয় স্মরণীয় করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে এই অপূর্ব প্রবেশদ্বার নির্মিত হইয়াছিল।

হুমায়ুনের পত্নী হাজী বেগম পারস্য দেশে নির্বাসিতের জীবনযাপনকালে তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন। এই বেগমের পরিকল্পনা অনুসারে হুমায়ুনের সমাধিসৌধ নির্মিত হইয়াছিল। সৌধটি একটি উদ্যান-পরিবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত; পরবর্তী কালেও এই নমুনা অনুসরণ করা হইয়াছিল। সৌধটিতে পারসিক প্রভাবের চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট।

আকবর আগ্রায় যে প্রাসাদ-দুর্গ নির্মাণ করেন তাহা উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং একটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রবেশদ্বার দ্বারা শোভিত। ইহার গঠনে রাজপুতদের দুর্গ নির্মাণ রীতির প্রভাব আছে। এলাহাবাদে ৪০টি স্তম্ভের প্রাসাদ ভারতীয় হিন্দু রীতি অনুসারে নির্মিত। সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি ভবনের পরিকল্পনা তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু ভবনটি নির্মিত হইয়াছিল জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে। ইহার গঠনরীতি আমাদিগকে প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

স্থাপত্য শিল্প : জা

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্মিত দুইটি সৌধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য: সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিভবন এবং আগ্রায় নূর জাহান কর্তৃক নির্মিত তাঁহার পিতা ইতিমদউদ্দৌলার সমাধিভবন। দ্বিতীয় সৌধটির বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হইল শ্বেতবর্ণ পাথরের পরিবর্তে (white marable) রক্তবর্ণ বেলে পাথরের (red sand stone) ব্যবহার প্রবর্তন। জাহাঙ্গীর নিজে স্থাপত্য শিল্প হইতে চিত্রকলা সম্বন্ধে বেশী আগ্রহী ছিলেন। বৃহদাকার সৌধের নির্মাণ কার্যে সৌন্দর্য প্রতিফলিত করিতে যে বিপুল প্রচেষ্টার প্রয়োজন তাহা তাঁহার মন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

স্থাপত্য শিল্প : শাহ জাহান

ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরী বলিয়াছেন, শাহ জাহানের রাজত্বকালে 'মনোহর বস্তুগুলি পূর্ণতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল।' আকবর এবং

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্মিত সৌধগুলি সাধারণতঃ শাহ জাহানের আমলে নির্মিত সৌধগুলি হইতে আকারে এবং দৃঢ়তায় শ্রেষ্ঠতর ; কিন্তু শাহ জাহানের স্থাপত্যকীর্তি সৌষ্ঠব এবং ব্যয়বহুল অলঙ্করণের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রক্তবর্ণ বেলে পাথরের পরিবর্তে শ্বেতবর্ণ মার্বেল ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্বে যে হিন্দু রীতি আংশিকভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা বহুলাংশে পরিত্যক্ত হইল। শাহ জাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয়-পারসিক (Indo-Persion) স্থাপত্য শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে শাহ জাহান কয়েকটি অপূর্ব সৌধ শ্বেতবর্ণ পাথরে নির্মাণ করিয়াছিলেন : দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস, মোতি মসজিদ, জামি মসজিদ। দুর্গের বাহিরে—যমুনার তীরে—নির্মিত হইয়াছিল তাজমহল। শাহ জাহানের উদ্দেশ্য ছিল পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতি রক্ষা করা। এই অতুলনীয় সমাধিভবনে নারীজনোচিত সৌকুমার্যের সহিত নিপুণতম গঠনকৌশলের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক স্মিথ ইহাকে ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয় প্রতিভার যৌথ সাফল্য রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু ইহার নকৃসা তৈরীর কাজে বা গঠনে ইতালীয় অথবা ফরাসী স্থপতিদের কোন অংশ ছিল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। সাধারণতঃ বলা হয় যে তাজমহলের নকৃসা প্রস্তুত করেন ওস্তাদ ঈশা নামক শিল্পী। নির্মাণকার্যে প্রায় ২২ বৎসর (১৬৩২-৫৩ খ্রীস্টাব্দ) সময় লাগিয়াছিল।

দিল্লীতে শাহ জাহান একটি নূতন নগরী নির্মাণ করেন। তাহার নাম শাহ-জাহানবাদ। এখানে একটি মনোরম প্রাসাদ, এবং দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি অপূর্ব সৌধ নির্মিত হইয়াছিল। ময়ূর সিংহাসন ছিল একটি অপূর্ব শিল্পকার্য।

স্থাপত্য শিল্প : আওরঙ্গজেব

আওরঙ্গজেব এমন কোন সৌধ নির্মাণ করেন নাই যাহা শিল্পের ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য। তাঁহার ধর্মানুরক্তি মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। সম্ভবতঃ শাহ জাহানের অপরিমিত নির্মাণ কার্যের বিরুদ্ধে এটি এক রকমের প্রতিবাদ। ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে শিল্পের চরম উন্নতির পরে চরম অবসাদের যুগ শুরু হইয়াছে।

সমগ্র মুঘল যুগে মূর্তিগঠন শিল্পের (Sculpture) সামগ্রিক পরিবর্জন বিস্ময়কর।

মুঘল চিত্রকলা

আকবর শুধু স্থাপত্য শিল্পের নয়, চিত্রকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি হিন্দু শিল্পীদিগকে চিত্রকলার পারসিক কৌশল শিক্ষা করিতে এবং পারসিক রীতির

অনুকরণ করিতে প্রেরণা দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতীয়-পারসিক চিত্রকলার (Indo-Persian painting) গোড়াপত্তন হইয়াছিল। চিত্রশিল্পীরা মানুষের ছবি এবং নাটকীয় ঘটনার পূর্ণ দৃশ্য আঁকিত।

আকবরের ১৭ জন প্রধান চিত্রশিল্পীর মধ্যে ১৩ জন ছিলেন হিন্দু। হিন্দু চিত্রশিল্পীদের সম্বন্ধে আবুল ফজল বলিয়াছেন, তাহাদের অঙ্কিত চিত্রগুলি বস্তু সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অতিক্রম করিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদের সহিত তুলনীয় চিত্র খুব কমই আছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বস্তওন, লাল, কেসু, মুকুন্দ, হরবন্‌স এবং দাসোয়ানাথ। বিদেশী চিত্রশিল্পীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আব্দুস সামাদ, ফররুখ বেগ এবং জামসেদ। তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রগুলি ফতেপুর সিক্রির অপূর্ব সৌধাবলীর শোভাবর্ধন করিয়াছিল।

স্থাপত্য শিল্প অপেক্ষা চিত্র শিল্প সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর বেশী আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি কৃতী চিত্রশিল্পীদিগকে উৎসাহ দিতেন। তিনি শিল্প কলার শুধু সমঝদার নহেন, যোগ্য বিচারক ছিলেন। ক্ষুদ্র চিত্র (miniature) তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁহার আমলের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন আবুল হাসান, মহম্মদ নাদির, মহম্মদ মুরাদ, ওস্তাদ মনসুর, বিসন দাস, মনোহর এবং গোবর্ধন। মুঘল শিল্পরীতি তখন আত্মনির্ভর এবং পরিপক্ক হইয়া উঠিতেছিল; পারসিক প্রভাব ক্ষীণ হইয়া ভারতীয় ভাব ও রীতি আত্মপ্রকাশ করিতেছিল।

চিত্র শিল্প সম্বন্ধে শাহ জাহান পিতার মত আগ্রহী ছিলেন না। স্থাপত্য শিল্পের উপর তাঁহার মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। তিনি চিত্রশিল্পীদের সংখ্যা ও বেতন হ্রাস করেন। তাঁহার রাজত্বকালে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে রঙের বিচিত্র সংমিশ্রণ অপেক্ষা নয়নাভিরাম অলঙ্করণের প্রাচুর্য অধিক আকর্ষণীয়। কোন কোন চিত্র সৌন্দর্যের জীবন্ত প্রতিফলন।

ধর্মীয় কারণে আওরঙ্গজেব চিত্রশিল্পের কঠোর বিরোধী ছিলেন। সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি ভবনে যে সকল চিত্র অঙ্কিত ছিল তিনি সেগুলির উপরে চূণ লেপিয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিজাপুরে তিনি বহু চিত্র নষ্ট করিয়াছিলেন।

চিত্রিত হস্তলিপি (Calligraphy) চিত্রশিল্পের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। চিত্রিত হস্তাক্ষর ফার্সী ভাষায় রচিত বহু হস্তলিখিত গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

ফার্সী সাহিত্য

কেবল শিল্প নয়, সাহিত্যও মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। দেশে সুস্থির রাজনৈতিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল।

আকবরের রাজত্বকালে ফার্সী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন তাঁহার বন্ধু এবং প্রশংসাকারী আবুল ফজল। তাঁহার রচিত 'আকবর-নামা' (*Akbar-nama*)

গ্রন্থে আকবরের রাজত্বকালের রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। অপর গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী'তে (*Ain-i-Akbari*) আছে শাসনকার্য ও পরিসংখ্যানের বিস্তৃত বিবরণী। এই দুইটি গ্রন্থ হইতে আকবরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। আবুল ফজলকে সাধারণতঃ আকবরের স্তাবক বলা হয়; তাঁহার রচনাশৈলী জটিল এবং দুর্বোধ্য। কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে তথ্য বিকৃত করেন নাই, এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা বিশেষ মূল্যবান।

আকবরের আমলের অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বদায়ূনী এবং নিজামউদ্দীন আহম্মদ। বদায়ূনীর 'মুন্তাখাব-উল-তারিখ' (*Muntakhab-ul-Tawarikh*) গোঁড়া সুন্নী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে লিখিত এবং উদার ধর্মনীতির পৃষ্ঠপোষক আকবরের প্রতি বিরোধীভাবাপন্ন। নিজামউদ্দীনের 'তবকৎ-ই-আকবরী' (*Tabaqat-i-Akbari*) ঘটনাবলীর সাধারণ বিবৃতি মাত্র।

আকবরের দরবারে কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আবুল ফজলের ভাই ফৈজী। আমীর খসরুর পরে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ফৈজী অপেক্ষা বড় কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। আকবরের আমলের অন্যান্য কবিদের মধ্যে ছিলেন ঘিজলি, মহম্মদ হোসেন নাজিরী এবং সৈয়দ জামালউদ্দীন উরফি। সাহিত্যক্ষেত্রে আর একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন আব্দুর রহিম খান খানান। তিনি আরবী, ফার্সী, তুর্কী, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন।

আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মহাভারত', 'রামায়ণ', 'অথর্ববেদ' এবং 'লীলাবতী' নামক জ্যোতিষ বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ করা হয়। কয়েকটি গ্রীক এবং আরবী গ্রন্থেরও ফার্সী অনুবাদ করা হইয়াছিল।

আকবরের ন্যায় জাহাঙ্গীরও ফার্সী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাবরের মত তিনি আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' (*Tuzuk-i-Jahangiri*) রচনা করেন। ইহাতে তাঁহার সাহিত্যরসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার উৎসাহে 'ফরহাং-ই-জাহাঙ্গীরী' (*Farhang-i-Jahangiri*) নামক একটি মূল্যবান অভিধানের রচনাকার্য সমাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার আমলে রচিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের নাম 'মাসির-ই-জাহাঙ্গীরী' (*Masir-i-Jahangiri*)।

স্থাপত্য শিল্পের প্রতি শাহ জাহানের প্রধান আকর্ষণ ছিল, কিন্তু দুই জন সুপরিচিত ঐতিহাসিক তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। একজন 'পাদশাহ্-নামা'র (*Padshah-nama*) লেখক আব্দুল হামিদ লাহোরী, আর একজন 'শাহ জাহান-নামা'র (*Shah Jahan-nama*) লেখক ইনায়েৎ খাঁ। দারা সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণদের সহায়তায় 'অথর্ববেদ' এবং কয়েকটি 'উপনিষদে'র ফার্সী সারানুবাদ রচনা করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে আওরঙ্গজেবের আকর্ষণ ইসলাম ধর্মের তত্ত্ব এবং মুসলমান

আইনে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' (*Fatawa-i-Alamgiri*) নামক মুসলমান আইনের প্রসিদ্ধ সংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার রাজত্বকালের ইতিহাস রচনার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার অসন্তোষ হইতে আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যে খাফি খাঁ গোপনে 'মুন্তাখাব-উল-লুবাব' (*Muntakhab-ul-lubab*) নাম প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—মির্জা মহম্মদ কাজিমের 'আলমগীর-নামা' (*Alamgir-nama*), মহম্মদ সাকির 'মাসির-ই-আলমগীরী' (*Masir-i-Alamgiri*), সুজন রায় ক্ষত্রীর 'খুসালত-উত-তারিখ' (*Khusalat-ut-Tarikh*), ভীমসেনের 'নুস্‌কা-ই-দিলখুসা' (*Nushka-i-Dilkhusa*) এবং ঈশ্বর দাসের 'ফুতুহাৎ-ই-আলমগীরী' (*Futuhat-i-Alamgiri*)।

হিন্দী সাহিত্য

উত্তর ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দীর গুরুত্ব সূচিত হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীতে—মালিক মহম্মদ জ্যায়সী কর্তৃক 'পদ্মাবৎ' নামক দার্শনিক কাব্য ('philosophic epic') রচনার (১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ) ফলে। চিতোরের রাণী পদ্মিনীর কাল্পনিক কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু।

আকবরের রাজত্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দী কবি তুলসীদাস, কিন্তু তিনি সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন নাই। তিনি হিন্দী ভাষার প্রাচ্য রীতিতে (যে রীতি উত্তর প্রদেশের পূর্ব ভাগে প্রচলিত) 'রামচরিতমানস' কাব্য রচনা করেন। ভক্তি-রসাপ্লুত এই কাব্য অদ্যাপি হিন্দী ভাষী সমাজে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাঁহার সমসাময়িক অন্ধ কবি সুরদাস হিন্দী ভাষার পশ্চিমা রীতিতে (যে রীতি উত্তর প্রদেশের পশ্চিম ভাগে প্রচলিত) ভক্তিমূলক কবিতা রচনা করেন। তিনি ছিলেন আগ্রার মানুষ, এবং বাদশাহী দরবারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তুলসীদাসের উপাস্য রাম, সুরদাসের উপাস্য কৃষ্ণ। আকবরের সভাসদগণের মধ্যে বীরবল কবি ছিলেন এবং আব্দুর রহিম খান খানান শ্রুতিমধুর 'দোহা' রচনা করিতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে তুলসীদাসের মত কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু জয়পুরের বিহারীলালের মত কয়েকজন জনপ্রিয় কবি ছিলেন। তিনি শাহ জাহানের আমলের মানুষ। হিন্দীর উন্নতির মূলে ছিল স্থানীয় শাসকদের আনুকূল্য, বাদশাহী দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা নয়।

মূল পুস্তকের মুখবন্ধ

এই বইএ ভারতের আধুনিক কালের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এ আলোচনায় সামরিক ও কূটনৈতিক ঘটনাবলী, ভিন্ন ভিন্ন শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আলোচনার চেয়ে ঘটনাপরম্পরা, জনমানসের প্রতিক্রিয়া ও সামাজিক রীতিনীতি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকার উপরই গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিদেশী বণিক্ সংস্থা কি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই বিরাট দেশকে জয় করতে পেরেছিল তা স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি, ভারতবাসীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনে তার প্র াব এবং তার প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। সর্বশেষে দে ানো হয়েছে যে কিভাবে দেশে জাতীয় চেতনা দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিল, কিভাবে বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে মুক্তিসংগ্রাম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং কি ভাবে পরিণামে দেশে স্বাধীনতার অভ্যুদয় ঘটেছিল। বিশ্বের ঘটনাবলীর পটভূমিকায় এই আলোচনা নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ডঃ বিপনচন্দ্র এই গ্রন্থটি রচনার ভার গ্রহণ করার জন্য সম্পাদকমণ্ডলী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সম্পাদকমণ্ডলী এই গ্রন্থটি যত্নপূর্বক সমীক্ষা করেছেন। সুতরাং এই ইতিহাস গ্রন্থটির যাথার্থ্য বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণে তাঁদের কোন বাধা নেই।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

প্রায় দুইশত বর্ষ ধরে সমকালীন বিশ্বের ঈর্ষার বিষয় ছিল সুবিশাল মুঘল সাম্রাজ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হতে হতে পরিশেষে তা পতনোন্মুখ হয়ে উঠল। মুঘল সম্রাটদের শক্তি ও গৌরব হ্রাস পেতে থাকল, তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হতে হতে তার পরিমাণ দাঁড়াল দিল্লীকে কেন্দ্র করে মাত্র কয়েক বর্গমাইল। অবশেষে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দিল্লীই ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হয়ে যাওয়ার ফলে একদা মহিমান্বিত মুঘল সম্রাট হয়ে পড়লেন একটি বিদেশী শক্তির অনুগ্রহ-ভাজন বৃত্তিজীবী। এই বিশাল সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবক্ষয়ের ধারা অনুধাবন খুবই শিক্ষাপ্রদ। ভারতে মধ্যযুগে সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক গড়নের দোষ ত্রুটি ও দুর্বলতাই ছিল পরিণামে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক এই দেশের শাসন কর্তৃত্ব অধিকারের কারণ, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ঘটনা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

আওরঙ্গজেবের দীর্ঘস্থায়ী ও দৃঢ় শাসনকালেই মুঘল সাম্রাজ্যের ঐক্য ও স্থায়িত্বের ভিত্তি কেঁপে উঠেছিল। তাঁর শাসন পদ্ধতিতে ক্ষতিকর দিকগুলিও বেশ প্রকট ছিল; এতৎ সত্ত্বেও ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকালেও মুঘল শাসনব্যবস্থা ও সামরিক শক্তি যথেষ্ট দৃঢ় ছিল। তখনও পর্যন্ত মুঘল রাজবংশকে দেশে সম্ভ্রমের সঙ্গেই দেখা হত।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র সিংহাসনের দাবি নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন পঞ্চ-ষষ্ঠি বৎসর বয়স্ক বাহাদুর শাহ্। তিনি বিদ্বান, আত্মমর্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন ও দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার নীতি মেনে চলতেন তার প্রমাণ এই যে সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রবর্তিত পক্ষপাতমূলক কিছু শাসননীতি ও আইনকানুন তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। হিন্দু রাজা ও হিন্দু প্রধানদের প্রতি ব্যবহারে তাঁর সহনশীলতা ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যেত। তাঁর রাজত্বকালে কোন হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ঘটনা ঘটেনি।

রাজত্বকালের প্রথম দিকে বাহাদুর শাহ্ রাজপুতানার অম্বর ও মাড়োয়ার (যোধপুর) রাজ্য দুটির উপর অধিকতর কর্তৃত্বলাভের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অম্বররাজ জয়সিংহকে অপসারিত করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয় সিংহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার চেষ্টা করেন। মাড়োয়ার রাজ অজিত সিংহকে মুঘল শক্তির নিকট নতিস্বীকাব করাতেও তিনি সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে অম্বর ও যোধপুর শহর দুটি তিনি সৈন্যবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই অবরোধের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামও চলেছিল। হয়ত এই প্রতিরোধ বাহাদুর শাহের জ্ঞান-চক্ষু খুলে দিতে সাহায্য করেছিল, কারণ এর পরই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে এই দুটি রাজ্যের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশ্য এর সর্তগুলিও যে খুব উদার ছিল তা নয়। রাজা জয়সিংহ ও অজিত সিংহকে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে রাজত্ব করার অধিকারও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁরা উচ্চমানের মনসব (পদমর্যাদা) ও গুজরাট ও মালোয়ার মত বিশিষ্ট প্রদেশের সুবাদার পদের যে দাবি উপস্থিত করেছিলেন, তা তাঁদের দেওয়া হয়নি। বাহাদুর শাহ্ মারাঠা সর্দারদের সম্বন্ধে যে আপোষমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যেও বেশ আন্তরিকতার অভাব ছিল।

বাহাদুর শাহ্ মারাঠা সর্দারদের দাক্ষিণাত্যের 'সরদেশমুখী'ত্ব মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের 'চৌথ্' মঞ্জুর করেননি। কাজেই মারাঠা সর্দারদের তিনি ভালভাবে সন্তুষ্ট করতে পারেননি। শাহুকে তিনি ন্যায়সঙ্গত মারাঠা-নৃপতিরূপে স্বীকৃতি দেননি। এর ফলে মারাঠা রাজ্যের অধিকার নিয়ে শাহু ও তারাবাঈ-এর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে গিয়েছিল। বাহাদুর শাহের অস্বীকৃতির কারণে শাহু ও মারাঠা সর্দারেরা অশান্ত হয়ে উঠেন এবং এর পরিণামে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলও অশান্তিগ্রস্থ হয়। কখনও মারাঠা সর্দারগণ নিজেদের মধ্যে লড়াই করে যাচ্ছিলেন, কখনও বা মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছিলেন, কাজেই ঐ অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হয়ে উঠেছিল।

গুরু গোবিন্দ সিংকে উচ্চমর্যাদা (মনসব) দিয়ে এবং তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে বাহাদুর শাহ্ বিদ্রোহী শিখদের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু গুরু গোবিন্দ সিং-এর মৃত্যুর পরেই শিখেরা যখন আবার বান্দা বাহাদুরের নেতৃত্বে পাঞ্জাব অঞ্চলে বিদ্রোহের

ধ্বজা উত্তোলন করেছিল তখন সম্রাট্ তা' দমনের উদ্দেশ্যে স্বয়ং একটি অভিযানের নেতৃত্ব নিয়ে শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রায় সমগ্র ভূ-ভাগ বিদ্রোহীদের উপদ্রবমুক্ত করে অধিকার করেন। এই অঞ্চলটি প্রায় দিল্লীর কোলঘেঁষা। শুধু তাই নয়, আম্বালার উত্তর-পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত গুরু গোবিন্দ সিং নির্মিত লোগড় দুর্গসহ শিখদের অন্যান্য দৃঢ় কয়েকটি ঘাঁটিও তিনি জয় করতে সমর্থ হন। এতৎসত্ত্বেও তিনি শিখ বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। 1712 খ্রীষ্টাব্দে শিখেরা লোগড় দুর্গ পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল।

বাহাদুর শাহ্ বুন্দেলা নায়ক ছতরসালের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। ছতরসাল তাঁর অনুগত মিত্র রাজা রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। জাঠ-প্রধান চূড়ামনের সঙ্গেও বাহাদুর শাহের অনুরূপ মিত্রতা স্থাপিত হয়েছিল। বান্দা বাহাদুরের বিরুদ্ধে অভিযানে চূড়ামন বাহাদুর শাহকে সাহায্য করে-ছিলেন।

বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে শাসনব্যবস্থার অবনতি ঘটেছিল। যথেচ্ছ জায়গীর দান ও অনুগতদের পদোন্নতির কারণে রাজকোষের অবস্থা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। 1707 খ্রীষ্টাব্দে রাজকোষের মজুত তের কোটি টাকা বাহাদুর শাহের রাজত্বকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল।

বাহাদুর শাহ্ তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। সময় পেলে হয়ত তিনি সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, 1712 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল গৃহযুদ্ধ, যা সাম্রাজ্যকে গ্রাস করে ফেলেছিল।

এই সময়ে মুঘল রাজনীতি মঞ্চে সিংহাসনের দাবি নিয়ে একটি নূতন ব্যাপার দেখা দিয়েছিল। এ পর্যন্ত যে কোন সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসনের জন্য লড়াই বাধত মৃত সম্রাটের পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে। রাজদরবারে প্রতি-পত্তিশালী আমীরওমরাহেরা এক বা অন্য দাবিদারের পক্ষে যোগ দিতেন, তাঁরা নিজেরা সিংহাসন দখল করতে চাইতেন না। নিজেদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার সোপান হিসেবে কোন বিশেষ দাবিদারের পক্ষ অবলম্বন করাই ছিল এঁদের রীতি। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হল তাতে সম্রাটের অযোগ্য এক পুত্র জাহান্দার শাহ্

বিজয়ী হলেন। এঁর সাফল্যের মূলে ছিলেন জুল্‌ফিক্‌র খান নামে সর্বাধিক প্রভাবশালী এক ওম্‌রাহের সাহায্য।

জাহান্দার শাহ্‌ ছিলেন দুর্বলচিত্ত ও কুক্রিয়াসক্ত। ইনি বিলাস-ব্যসনেই মত্ত থাকা পছন্দ করতেন। সুরুচি এবং আত্মসম্মানবোধ এঁর ছিল না। এঁর আদব কায়দাও আপত্তিজনক ছিল।

জাহান্দার শাহের রাজত্বকালে রাজ্যশাসনভার কার্যতঃ ছিল জুল্‌ফিক্‌র খানের হাতে, ইনি নামেই ছিলেন বাদশাহের উজীর। জুল্‌ফিক্‌র অবশ্য বেশ কর্মদক্ষ ও উদ্যমশীল ব্যক্তি ছিলেন। জুল্‌ফিক্‌রের বিশ্বাস ছিল এই যে, সাম্রাজ্যের স্বার্থে রাজপুত রাজা ও মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন বিশেষ প্রয়োজনীয়। তিনি মনে করতেন যে শুধু রাজপুত ও মারাঠা-প্রধান নয়, সাধারণভাবে সব হিন্দু-প্রধানদের সঙ্গে আপোষ ও বোঝাপড়ার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে এবং এটাই হবে যুগপৎ তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ও সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের উপায়। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে জুল্‌ফিক্‌র শাসনব্যবস্থায় অতিক্রুত আওরঙ্গজেবের শাসননীতির বিপরীত নীতি অবলম্বন করলেন। ঘৃণিত 'জিজিয়া' কর আদায় ব্যবস্থা তিনি তুলে দিলেন। অম্বরপতি জয়সিংহকে মির্জা রাজা সোয়াই খেতাব দিয়ে মালোয়ার গভর্নর (সুবাদার) নিযুক্ত করা হল। মাড়োয়ার-পতি অজিত সিংহকে 'মহারাজা' খেতাবে ভূষিত করে গুজরাটের গভর্নর পদ দেওয়া হল। ইতিপূর্বে দাক্ষিণাত্যে জুল্‌ফিক্‌রের সহকারী প্রতিনিধি দাউদ খান্‌ পান্নি 1711 খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারাজ শাহুর সঙ্গে একটা গোপনীয় চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই চুক্তির সর্ত এই ছিল যে মারাঠা নৃপতি দাক্ষিণাত্যে 'সরদেশমুখী' ও চৌথের অধিকারী হবেন, তবে এগুলির আদায়ের ভার থাকবে মুঘল দরবারের কর্মচারীদের উপর। এঁরা 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' সংগ্রহ করে সেটা মারাঠা নৃপতির হাতে তুলে দেবেন। ক্ষমতা হাতে পেয়ে জুল্‌ফিক্‌র এই চুক্তিটিকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃতি দিলেন। জুল্‌ফিক্‌র জাঠ-নেতা চুড়ামন ও ছত্রসাল বুন্দেলার সঙ্গেও আপোষ-মীমাংসার দ্বারা মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বান্দা ও শিখদের উপর পূর্বাচরিত দমন-নীতিই অবশ্য বজায় রাখা হয়েছিল।

নিত্য নূতন জায়গীর অথবা সরকারী পদ সৃষ্টির বাড়াবাড়ি সংযত করে জুল্‌ফিক্‌র খান্‌ সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি চেষ্টা করেছিলেন যেন প্রতিটি মনসবদার তাঁদের অধীনে যত সংখ্যক সৈন্য থাকার কথা ঠিক তত সংখ্যক সৈন্য পোষণের দায়িত্ব পালন করেন।

'ইজারা'র মত একটি কুপ্রথাকে জুল্‌ফিক্‌র অবশ্য প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তোডরমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থানুযায়ী এ যাবৎ প্রজার কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের খাজনা সংগ্রহের যে রীতি এ যাবৎ প্রচলিত ছিল, জুলফিক্‌রের আমলে তা পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁর আমলে মধ্যস্বত্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। বৃহৎ চাষী অথবা অন্য কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের পরিবর্তে রাজস্ব স্বরূপ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণের চুক্তি সুরু করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে যার সঙ্গে চুক্তি করা হল তাকে কৃষকদের কাছ থেকে তার ইচ্ছামত যে কোন পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের উপর অবিচার ও শোষণের পথ খুলে গিয়েছিল।

ঈর্ষা-পরায়ণ বহু ওম্‌রাহ জুল্‌ফিক্‌র খানের বিরুদ্ধে আসরে নেমেছিলেন। জুল্‌ফিক্‌রের পক্ষে এটাও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হয়েছিল এই যে স্বয়ং সম্রাটও তাঁর উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করেননি, সব সময়ে তিনি সহযোগিতার সুযোগও দেননি। সম্রাটের অনুগ্রহ-ভাজন বিবেক-বর্জিত বহু অনুচর জুল্‌ফিক্‌রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত, যাকে বলে 'কান ভাঙানি'। এরা সম্রাটকে বলত যে তাঁর উজীর জুল্‌ফিক্‌র এতই প্রভাবশালী ও উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠছে যে স্বয়ং সম্রাটকে সে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই একদিন সিংহাসনে বসতে পারে। কাপুরুষ সম্রাট তাঁর শক্তিধর উজীরকে প্রকাশ্যে বরখাস্ত করার সাহস না পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র সুরু করেন। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার একটা সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা বজায় রাখার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল।

জাহান্দার শাহের কলঙ্কময় স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালের অবসান ঘটেছিল 1713 খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। আগ্রার যুদ্ধে জাহান্দারকে পরাজিত করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফর্‌রুখসিয়র সিংহাসন অধিকার করলেন।

ফর্‌রুখসিয়রের জয়লাভের পেছনে দুই 'সৈয়দ' ভ্রাতার বিশেষ হাত ছিল। এঁদের নাম ছিল—আবদুল্লাহ্‌ খান ও হুসেন আলী খান্‌ বারাহা। ফর্‌রুখসিয়র আবদুল্লাহ্‌ খানকে 'উজীর' পদ দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা হুসেন আলীকে দেওয়া হল, 'মীর বখ্‌শী' পদ। এই দুই

ভাই-ই অচিরকালের মধ্যে হয়ে উঠলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা। ফরূরুখ-সিয়রের রাজ্যশাসন ক্ষমতা মোটেই ছিল না। তিনি ছিলেন কাপুরুষ, নিষ্ঠুর, অনির্ভরযোগ্য ও সন্দিগ্ধ চরিত্র। এর উপরে তাঁর আর এক দোষ এই ছিল যে তিনি নিকৃষ্ট প্রকৃতির মোসাহেবদের দ্বারা সর্বদাই প্রভাবিত হতেন।

এই সব দুর্বলতা সত্ত্বেও ফরূরুখসিয়র সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর সব কর্তৃত্ব-ভার ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অপর দিকে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিশ্বাস ছিল এই যে সম্রাট্ যদি নামে মাত্র সম্রাট্ থেকে তাঁদের উপর রাজ্যের যথার্থ কর্তৃত্ব ছেড়ে দেন তবে সাম্রাজ্যের অবক্ষয় রোধ করা যাবে, শাসনব্যবস্থা ভাল চলবে, সর্বোপরি এতে তাঁদের দুভায়েরও স্বার্থ রক্ষিত হবে। দুপক্ষের এই দুই বিপরীত মনোভাবের ফলে একদিকে সম্রাট্ অন্যদিকে তাঁর উজীর ও মীর বখ্সীর সঙ্গে কর্তৃত্বের অধিকার নিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সূচনা হল। বছরের পর বছর ধরে সম্রাট্ দুই সৈয়দ ভ্রাতাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন কিন্তু তা' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। অবশেষে 1719 খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ফরূরুখসিয়রকে সিংহাসনচ্যুত করে হত্যা করেন। ফরূরুখসিয়রের মৃত্যুর পর তাঁরা পরপর দুই রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসালেন। ক্ষয়-রোগে অল্পদিনের মধ্যে এই দুজনেরই মৃত্যু হয়েছিল। তখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মাত্র আঠার বৎসরের এক বালক মহম্মদ শাহ্‌কে সিংহাসনে বসালেন। ফরূরুখসিয়রের পরবর্তী তিন জন 'সম্রাট্' ছিলেন সৈয়দ ভ্রাতাদের হাতের ক্রীড়নক। এঁদের কিছু মাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল না। নিজেদের ইচ্ছামত লোকজনের সঙ্গে দেখা করা বা কোথাও যাওয়ার স্বাধীনতাও এঁদের ছিল না। 1713 থেকে 1720 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ই ছিলেন রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকর্তা। 1720 খ্রীষ্টাব্দে এঁদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

সৈয়দ ভ্রাতৃগণ রাজ্যশাসন ব্যাপারে পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতি মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষ সুশৃঙ্খলভাবে শাসন করতে হলে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই প্রধান পুরুষদের শাসন ব্যাপারে সমান কর্তৃত্ব দিতে হবে। ফরূরুখসিয়র ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সিংহাসন অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব কালে সৈয়দ ভ্রাতৃগণ রাজপুত-জাঠ ও মারাঠা নায়কদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে তাঁদের ফরূরুখসিয়রের পক্ষ

অবলম্বন করাতে সমর্থ হন। ফরুখসিয়রের সিংহাসন আরোহণের অনতি-কাল পরেই তাঁরা 'জিজিয়া' কর রহিত করে দিয়েছিলেন। বহুস্থানের পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে 'তীর্থ-কর' আদায়ের ব্যবস্থাও রহিত করা হয়েছিল। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মাড়োয়ারের অজিত সিংহ, অম্বরের জয় সিংহ এবং অন্যান্য রাজপুত রাজাদের সাম্রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত করে তাঁদের নিজেদের পক্ষাবলম্বী করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। জাঠ-সর্দার চূড়ামনের সঙ্গেও একটা মিত্রতার চুক্তি করা হয়েছিল। তাঁদের শাসনকালের শেষদিকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মারাঠারাজ শাহুর সঙ্গেও একটা চুক্তি করে তাঁকেও মিত্রতা পাশে আবদ্ধ করেন। এর সর্ত ছিল এই যে শিবাজী অর্জিত 'স্বরাজ্যের' এবং দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশ থেকে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' সংগ্রহের অধিকার শাহুর থাকবে। এর বিনিময়ে শাহু প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি দাক্ষিণাত্যে মুঘল দরবারের স্বার্থে ১৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন রাখবেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করে শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এতৎ সত্ত্বেও তাঁদের ব্যর্থতার মূলে ছিল রাজদরবারের ওমরাহ্‌দের মধ্যে অহরহ পারস্পরিক ঈর্ষা, ষড়যন্ত্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শাসক-সম্প্রদায়ের এই কলহের বিষ শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরেই সঞ্চারিত হয়ে তাকে পঙ্গু ও অচল করে দিয়েছিল। জমিদার ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী জমির জন্য খাজনা দিতে অস্বীকার করে যাচ্ছিল, অন্যদিকে অসাধু রাজকর্মচারীগণ রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করছিল, জমি ইজারা দেওয়ার কু-ব্যবস্থার ফলে কেন্দ্রীয় তহবিলে অর্থাগমও কমে যাচ্ছিল। এর ফলে রাজকোষের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে রাজকর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর লোকদের নিয়মমত বেতন দান করা যাচ্ছিল না। বেতন না পাওয়া সৈন্যেরা নিয়মকানুন আর মানছিল না, এমন কি তারা বিদ্রোহ করতেও উদ্যত হয়েছিল।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সকল শ্রেণীর ওমরাহ্‌দের সঙ্গে বন্ধুতাসূচক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য খুবই চেষ্টা করেছিলেন। এতৎ সত্ত্বেও একদল প্রভাবশালী ওমরাহ্ নিজাম-উল্-মুলুক এবং তাঁর পিতার সম্পর্কিত ভ্রাতা মহম্মদ আমিন খানের নেতৃত্বে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি এই ওমরাহ্‌দের বিশেষ ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। ফরুখসিয়রের সিংহাসন থেকে অপসারণ

ও তাঁর প্রাণ-নাশের ঘটনা এই সব ওমরাহ্‌দের মনে ভীতিরও সঞ্চার করেছিল। এদের মনে এই চিন্তা জেগে উঠেছিল যে স্বয়ং সম্রাটের যদি প্রাণ-নাশ করা হয়, তবে তাঁদের নিজেদের জীবনের আর নিরাপত্তা কোথায়?

সম্রাটের প্রাণনাশ ঘটায় জনসাধারণের মনে সৈয়দ ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে একটা তীব্র ঘৃণার ভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। তারা এঁদের বিশ্বাস-ঘাতক ও নেমক্‌হারাম বলে গণ্য করে নিয়েছিল। কারণ এরা সম্রাটের নুন খেয়ে তার সঙ্গে বেইমানি করেছিল। আওরঙ্গজেবের আমলের বহু ওমরাহ্‌ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হিন্দুদের প্রতি উদারনীতি প্রয়োগ এবং মারাঠা ও রাজপুত প্রধানদের সঙ্গে বোঝাপড়া সুনজরে দেখেননি। এই ওমরাহ্‌গণ ঘোষণা করলেন যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজ্যশাসন নীতি মুঘল স্বার্থ ও ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী। এইভাবে এঁরা সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের একাংশের মধ্যে ধর্মান্ধতার মনোভাব উস্কে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বিরোধী ওমরাহ্‌গণ স্বয়ং সম্রাট্‌ মহম্মদ শাহের সমর্থন লাভ করতে পেরেছিলেন কারণ তিনিও সৈয়দ ভ্রতৃদ্বয়ের রাহু-গ্রাস থেকে নিজের মুক্তি খুঁজছিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধীগণ 1720 খ্রীষ্টাব্দে দুইজনের মধ্যে ছোট হুসেন আলি খানকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে সমর্থ হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল্লা খান্‌ বিরোধীগণের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে আগ্রার নিকট পরাজয় বরণ করেন। ভারতের ইতিহাসে রাজা বানানোর কর্তারূপে কীর্তিত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মুঘল সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্বের অতঃপর অবসান ঘটেছিল।

মহম্মদ শাহের প্রায় ত্রিশবর্ষ ব্যাপী (1719-48) দীর্ঘ শাসনকালটি মুঘল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার শেষ সুযোগ এনে দিয়েছিল। 1707-1720 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজসিংহাসনের অধিকারী পুনঃপুনঃ পরিবর্তিত হয়েছিল, মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল ছিল তার ব্যতিক্রম। মহম্মদ শাহ্‌ যখন সিংহাসনে আসীন হলেন তখনও দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে মুঘল সম্রাট্‌ বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, জনসাধারণের মধ্যে তখনও মুঘল সাম্রাজ্যের মর্যাদাবোধ জাগ্রত ছিল। তখনও মুঘল সৈন্য বাহিনী বিশেষতঃ তার গোলন্দাজ সেনাবাহিনীর শক্তি বেশ প্রবল ছিল। উত্তর ভারতে মুঘল শাসনব্যবস্থার অবনতি হয়েছিল ঠিকই, তবে তখনও তা' একেবারে ভেঙ্গে পড়েনি। মারাঠা সর্দারদের যা কিছু পরাক্রম তা তখনও দাক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ

ছিল, রাজপুত রাজন্যবৃন্দ তখনও মুঘল রাজবংশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য বিসর্জন দেননি। একজন দৃঢ়চেতা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সম্রাট্, সাম্রাজ্যের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সজাগ একদল পারিষদের সাহায্যে এই সময় সাম্রাজ্যকে অবশ্যই অবলুপ্তি থেকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু মহম্মদ শাহ্ এই পরিস্থিতির উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি দুর্বলচেতা ও খামখেয়ালী ছিলেন। নির্ঝঞ্ঝাট স্ফূর্তি ও বিলাসময় জীবনযাপনের দিকেই ছিল তাঁর অধিক আকর্ষণ। তিনি রাজকাজেও অবহেলা করতেন। নিজাম উল্ মুল্কের মত দক্ষ উজীরদের পরিপূর্ণভাবে সমর্থন না করে তিনি কতকগুলি দুর্নীতিপরায়ণ অপদার্থ মোসাহেবের পরামর্শে নিজের দক্ষ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিতেন। এমন কি তাঁর অনুগ্রহভাজন মোসাহেবরা অন্যায়-ভাবে যে সব উৎকোচ অর্জন করত, তারও তিনি ভাগ নিতেন।

সম্রাটের অস্থিরচিত্ততা ও সন্দিগ্ধ প্রকৃতি এবং রাজদরবারে নিত্য নূতন কলহ কচ্‌কচিতে বিরক্ত হয়ে রাজদরবারে সর্বাধিক প্রভাবশালী নিজাম উল্ মুল্ক তাঁর স্বীয় উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। 1722 খ্রীষ্টাব্দে উজীর পদ প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকেই শাসনব্যবস্থা সংস্কারের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। সম্রাটের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে সম্রাট্ ও সাম্রাজ্যের পরিণতি নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাবেন না, যা ঘটার তা ঘটে যাক্, এবার তিনি নিজের ভাগ্য গড়ে তোলায় মন দেবেন। 1724 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উজীরের পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে চলে যান এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই প্রস্থানকে ঐতিহাসিকেরা সাম্রাজ্য থেকে রাজানুগত্য এবং ন্যায়ধর্মের প্রস্থানের প্রতীকরূপে বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসের সূচনা হয়েছিল।

রাজদরবারের অন্যান্য যে সব ক্ষমতাশালী ও উচ্চাভিলাষী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা ওমরাহ্ ছিলেন এখন তাঁরাও নিজেদের জন্য এক একটি আধা স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। দেশের নানাস্থানে তখন বেশ কয়েকজন বংশানুক্রমিক 'নবাব' গজিয়ে উঠল, মুঘল সম্রাটের প্রতি এদের আনুগত্য ছিল নামে মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলা, আউধ (অযোধ্যা), হায়দ্রাবাদ ও পাঞ্জাবের নাম করা যেতে পারে। দেশের প্রায় সর্বত্র ছোট-

খাটো জমিদার, রাজা ও নবাবেরা বিদ্রোহী হয়ে নিজেদের এখন স্বাধীন বলে দাবি তুলতে লাগলেন। এই সময়ে মারাঠা সর্দারেরা দাক্ষিণাত্যের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রেখে উত্তরাপথের দিকে অগ্রসর হয়ে মালোয়া, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ড দখল করে নিয়েছিলেন। ঠিক এই সময়, 1738-.9 খ্রীষ্টাব্দে নাদির শা' উত্তর ভারতের উপত্যকা অঞ্চল আক্রমণ করতেই মুঘল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

নাদির শাহ্ শৈশবে ভেড়া চরাতেন। বড় হয়ে তিনি পারস্য দেশকে পতন ও খণ্ড খণ্ড হওয়ার অবস্থা থেকে উদ্ধার করে দেশের অধীশ্বর হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একদা শক্তিশালী ও বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী পারস্য দেশ ছিল পতনোন্মুখ সাফাভি বংশের শাসনাধীন। এই বংশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনার সঙ্গে অন্তর্বিপ্লবের বহ্নি দেশে প্রকট হয়ে উঠেছিল। দেশের পূর্ব প্রান্তে আবদালি উপজাতিয়েরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে হিরাট দখল করেছিল, আবার ঘালজাই উপজাতিয়েরা কান্দাহার অধিকার করেছিল। দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলেও অনুরূপ বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু ধর্মান্ধ ব্যক্তি কর্তৃক সুন্নী সম্প্রদায়ের কিছু লোকের নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় শিরবান অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এখানে "সুন্নী মোল্লাদের হত্যা করা হয়। মসজিদ অপবিত্র করে সেখানে ঘোড়ার আস্তাবল করা হয়, পবিত্র গ্রন্থসমূহও নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল।" 1721 খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহারের ঘালজাই-প্রধান মামুদ পারস্য আক্রমণ করে এর রাজধানী ইস্পাহান অধিকার করে নেন। রুশ অধীশ্বর মহান্ পিটরের (পিটর দি গ্রেট্) প্রবল ইচ্ছা ছিল দক্ষিণদেশ অর্থাৎ পারস্য অভিযান। 1722 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পিটর পারস্য আক্রমণ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই এই দেশকে একটি সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই চুক্তির ফলে পারস্যদেশের কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী কয়েকটি প্রদেশ রুশ অধিকারভুক্ত হয়, এই অঞ্চলের মধ্যে বাকু শহরটিও ছিল। তুরস্ক ইউরোপের অনেকখানি অংশ ইতিমধ্যে হারিয়েছিল, সেই দেশও এখন পারস্যের কিছু অংশ দখল করে এই ক্ষতিপূরণের আশা পোষণ করতে লেগেছিল। 1723 খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে তুরস্ক পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। অতিক্রান্ত জর্জিয়া অঞ্চল ভেদ করে তারা পারস্যের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে এগিয়ে চলেছিল। 1724 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তুরস্ক ও

রুশের মধ্যে একটি সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি অনুসারে পারস্যের সমগ্র উত্তরাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সবটুকু রুশ ও তুরস্ক নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। 1726 খ্রীষ্টাব্দে এই পরিস্থিতিতে পারস্য নৃপতির একজন দক্ষ সমর্থক ও তাঁর একজন অগ্রগণ্য সেনাধ্যক্ষ রূপে নাদির শাহের আবির্ভাব ঘটেছিল। 1729 খ্রীষ্টাব্দে নাদির শা আবদালিদের বিতাড়িত করে হীরাট পুনর্দখল করলেন। এর পর তিনি ঘালজাইদের শুধু ইস্পাহান থেকে নয়, সমগ্র মধ্য এবং দক্ষিণ পারস্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন। দীর্ঘস্থায়ী এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর তিনি তুরস্ককেও সমগ্র বিজিত ভূখণ্ড প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য করেন। 1735 খ্রীষ্টাব্দে তিনি রুশের সঙ্গে একটা চুক্তি করে তাদের জবরদখল করা সমস্ত ভূভাগ পারস্যের অধিকারে ফিরিয়ে এনেছিলেন। পরবৎসর সাফাভী বংশীয় শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নাদির সিংহাসনে বসে নিজেকে পারস্যের 'শাহ' রূপে ঘোষণা করলেন। পরবৎসরগুলিতে তিনি কান্দাহার প্রদেশ জয় করে তা আবার পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

ভারতবর্ষ চিরকালই তার বিপুল ধনসম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই অকল্পনীয় ধনসম্পদের জন্য ভারত নাদির শাহের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল। পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত ও যুদ্ধরত থাকার ফলে পারস্য দেশ প্রায় দেউলিয়া অবস্থায় পৌঁছেছিল। বেতনভুক্ সেনাবাহিনী পোষার জন্য প্রচুর অর্থের একান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতবর্ষ লুণ্ঠন এই ঘাটতি পূরণের একটা উপায়-স্বরূপ ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের তৎকালীন দুর্বলতা থেকে নাদির বেশ বুঝে গিয়েছিলেন যে ভারত লুণ্ঠনের এটা একটা বেশ উপযুক্ত সময়। 1738 খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বিনা প্রতিরোধে নাদির ভারতে প্রবেশ করেন। বহুশত বৎসর ধরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। নাদির শাহের বাহিনী লাহোর পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত বিপদের গুরুত্ব কেউই বুঝতে পারেননি। এখন দিল্লী রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হতে লাগল। কিন্তু আসন্ন শত্রু-আক্রমণের মুখেও কলহপ্রিয় রাজ-প্রধানেরা একমত হতে পারলেন না। কিভাবে শত্রু-আক্রমণ প্রতিহত করা হবে এবং কে সেনাপতি হবেন এই নিয়ে মতদ্বৈততা দেখা দিল। অনৈক্য, নেতৃত্ব করার মত ব্যক্তির অভাব, পারস্পরিক ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের পরিণাম অনিবার্য পরাজয়। 1739 খ্রীষ্টাব্দের তেরই ফেব্রুয়ারী

কর্ণালে মুঘল ও নাদির শাহের সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আক্রমণকারী নাদির শাহের পরাক্রমে মুঘল বাহিনী পরাজিত হল। সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌কে বন্দী করে নাদির শা এবার দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলেন। নাদিরশাহের কয়েকজন সৈন্যকে দিল্লীতে হত্যা করা হয়েছিল, এ'র প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নাদির শাহের আদেশক্রমে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীর নাগরিকদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। লোভী নাদির শা রাজকোষ এবং রাজ পরিবারের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেই ক্ষান্ত থাকেননি। দিল্লীর ওমরাহ্‌দের কাছ থেকে তিনি প্রচুর 'নজরানা' আদায় করেন। দিল্লীর ধনী নাগরিকদের ধনসম্পদও লুণ্ঠিত হয়েছিল। নাদির শা কর্তৃক লুণ্ঠিত ধনসম্পদের মোট অর্থমূল্য দাঁড়িয়েছিল 70 কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থ বলে বলীয়ান হয়ে তিনি নাকি তিন বৎসর তাঁর নিজ রাজত্বের প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় বন্ধ রেখেছিলেন। সুবিখ্যাত 'কোহিনুর' হীরক খণ্ড, এবং সম্রাট শাহ-জাহানের মণিমাণিক্য খচিত ময়ূর সিংহাসনও তিনি লুণ্ঠন করে স্বদেশে নিয়ে যান। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্তী সমগ্র ভূভাগ নাদির শার অধিকারে থাকবে মহম্মদ শাহ্‌কে বাধ্য হয়ে এমনি একটি চুক্তি করতে হয়েছিল।

নাদির শাহের আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করেছিল। এতে শুধু সাম্রাজ্যের মর্যাদাহানিই ঘটেনি। সাম্রাজ্যের গোপন দুর্বলতা বা আঘাত স্থানগুলি কোথায় এই ঘটনা থেকেই তা বোঝা গিয়েছিল। মারাঠা সর্দার ও বিদেশাগত বনিক্ সম্প্রদায়ের চোখও এই ঘটনায় খুলে গিয়েছিল। নাদির শাহের আক্রমণের ফলে কিছুকালের জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। এই আক্রমণের ফলে রাজকীয় অর্থব্যবস্থাই শুধু ধ্বংস হয়নি, সমগ্র দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়েছিল। এই সময় হৃত-বিত্ত ভূস্বামীগণ তাঁদের অবস্থা ফেরানোর আশায় প্রজাদের :করভার অতিরিক্তরূপে বৃদ্ধি করে তাদের উপর নিপীড়ন সুরু করেছিল। কিভাবে অপরকে বঞ্চিত করে লাভজনক জায়গীর বা উচ্চপদ পাওয়া যায় তার জন্য এরা আবার বেপরোয়াভাবে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। কাবুল এবং সিন্ধুনদীর পশ্চিমে অবস্থিত ভূভাগ মুঘল সম্রাটের হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বহিঃশত্রুর

আক্রমণের আশঙ্কাও বেড়ে গিয়েছিল। প্রতিরক্ষার একটা বিরাট প্রাচীর যেন অন্তর্হিত হয়েছিল।

এটা একটু বিস্ময়জনক যে নাদির শাহের বিদায়ের পর সাম্রাজ্য তার হৃতশক্তি কিছুটা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল, যদিও এই পুনরুজ্জীবন খুব সঙ্কীর্ণ এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিছু পরে আবার এই সীমানাও দ্রুত সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল। সুতরাং হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার হয়েছে বলে আত্ম-সন্তুষ্টির মনোভাবের মধ্যে ফাঁকি থেকে গিয়েছিল। রাষ্ট্রের শক্তি বাইরে থেকে যতটা বেড়েছিল মনে হত, আসলে তা বাড়েনি। **1748** খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর ক্ষমতা-লিপ্সু বিবেক-বর্জিত রাজ্যপ্রধানদের মধ্যে তিক্ত বাদ-বিসংবাদ ও সঙ্ঘর্ষের উদ্ভব হয়েছিল। এর উপরে আর এক উপদ্রব দেখা দিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারত অঞ্চল হাতছাড়া হওয়াতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধ করার উপায় আর ছিল না। নাদির শাহের সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে দক্ষতম সেনাপতি আমেদ শা আবদালি নাদির শার মৃত্যুর পর আফ্‌গানিস্তানে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এই আমেদ শা আবদালি সুযোগ বুঝে এই সময় বারবার সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হেনে দেশকে ধ্বংস করে দিতে থাকেন। **1748** থেকে **1767** পর্যন্ত আবদালি বারে বারে উত্তর ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এঁর অভিযানের এলাকা ছিল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে দিল্লী মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত। **1761** খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আমেদ শা আবদালি মারাঠাদের পরাস্ত করেন। মারাঠাদের উচ্চাভিলাষ মুঘল সাম্রাজ্য অধিকার তথা সমগ্র দেশে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন। আবদালি তাদের উচ্চাভিলাষের মূলে একটা বড় রকমের আঘাত হানতে সমর্থ হয়েছিলেন। আবদালি অবশ্য ভারতে আফগান রাজত্ব স্থাপন করতে পারেননি। তিনি বা তাঁর উত্তরাধিকারীগণ শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব পর্যন্ত হাতে রাখতে পারেননি। অল্পদিনের মধ্যেই শিখেরা যুদ্ধে জয়লাভ করে তাঁদের হাত থেকে পাঞ্জাব ছিনিয়ে নিয়েছিল।

নাদির শা ও আবদালির আক্রমণ এবং মুঘল প্রধানদের আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে **1761** খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্য কার্যতঃ একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের মর্যাদাভ্রষ্ট হয়েছিল। মুঘল শক্তি একান্তভাবে দিল্লীতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এমন কি এই রাজধানী দিল্লীতেও

নিত্যনূতন অশান্তি ও দাঙ্গাহাঙ্গামা চলেছিল। ভারত সাম্রাজ্যের অধিকার-কেন্দ্রিক সংঘর্ষে মহান্ মুঘল সম্রাটদের বংশধরেরা আর সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতেন না। তবে সাম্রাজ্যের দাবিদাররূপে সংগ্রামরত কোন কোন ব্যক্তি বা শক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল মনে করে তাঁদের নামের আশ্রয় নিত। দিল্লীর সিংহাসনে মুঘল বংশীয়েরা দীর্ঘকাল ধরে অবশ্যই আসীন ছিলেন, তবে যে সিংহাসন তাঁরা অধিকার করে থাকতেন সে সিংহাসন ছিল নাম মাত্র সিংহাসন। কোন মর্যাদা বা ক্ষমতা তার ছিল না।

দ্বিতীয় শাহ্ আলম 1769 খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম কয়বৎসর তিনি রাজধানী থেকে বহু দূর দূর স্থানে ঘুরে বেড়াতেন কারণ তিনি উজীরকে ভীষণ ভয় করতেন, এটাই ছিল তাঁর রাজধানী থেকে দূরে থাকার কারণ। তাঁর কিছু কর্মদক্ষতা ছিল, সাহসেরও অভাব ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যের অবস্থা এখন এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল, যে তাকে আর সুপ্রতিষ্ঠিত করার আশা ছিল না। 1764 খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার নবাব মীর্ কাসীম ও আউধের (অযোধ্যা) নবাব সুজা-উদ্দৌল্লার ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রথমোক্তদের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। বক্সারে ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহ্ আলম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৃত্তি (পেনশন) ভোগী রূপে কিছুদিন এলাহাবাদে বাস করেছিলেন। 1772 খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদের ব্রিটিশ আশ্রয় ত্যাগ করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তাঁকে স্বীয় নিরাপত্তার জন্য মারাঠাদের কৃপার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। ইংরাজেরা 1803 খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী অধিকার করে নিয়েছিল। ব্রিটিশের নাম-মাত্র রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষরূপে 1803 থেকে 1857 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল রাজবংশ অবশ্য টিকে ছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দে মুঘল রাজবংশের মহিমা সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল। 1759 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে মুঘল রাজবংশের সামরিক শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। এই সামরিক শক্তি নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও যে মুঘল রাজবংশ 'সম্রাট্' রূপে টিকে ছিল তার কারণ ভারতবর্ষের জনমানসে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক সংহতির প্রতীক রূপে মুঘল সম্রাটদের আসন বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

মহান্ মুঘল সম্রাটদের হাতে গড়া মুঘল সাম্রাজ্যের মত সাম্রাজ্য যখন ক্ষীয়মান হতে হতে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয় তখন তার পেছনে নানাবিধ ঘটনা ও শক্তি সক্রিয় ছিল। আওরঙ্গজেবের জবরদস্ত রাজ্যশাসন পদ্ধতি থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমিক পতনের সূচনা হয়। আওরঙ্গজেব উত্তরাধিকার সূত্রে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য হাতে পেয়েছিলেন। এতে তৃপ্ত না থেকে তিনি চাইলেন তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা সুদূর দাক্ষিণাত্যের শেষ ভৌগোলিক প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হ'ক। এর জন্য প্রচুর জনশক্তি ও সরঞ্জামের নিয়োগ অপরিহার্য ছিল। বাস্তবতার বিচারে তখনকার দিনের যোগাযোগ ব্যবস্থা, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সুদূরতম প্রান্ত সহ সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। সমগ্র দেশকে একটি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বেঁধে দেশের সংহতি বিধানের যে লক্ষ্য আওরঙ্গজেবের ছিল রাষ্ট্রনীতি হিসাবে তার সারবত্তা যাই হোক্ না কেন, কার্যতঃ তার রূপায়ণ ছিল অসম্ভব।

আওরঙ্গজেবের ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল তাঁর নিজস্ব কূটনীতি। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছিল মারাঠাদের দাবি, আওরঙ্গজেব এটি পুরোপুরি মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি যে শিবাজী ও অন্যান্য মারাঠা সর্দারেরা যে শক্তিতে বলীয়ান সেই শক্তিকে দাবিয়ে রাখা যায় না। অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আকবর রাজপুত সর্দার ও রাজাদের সঙ্গে মিত্রতামূলক সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। এমনিভাবে মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে পারলে তা আওরঙ্গজেবের পক্ষে শুভ হত। আওরঙ্গজেব চুক্তির পথে না গিয়ে মারাঠাদের প্রতি দমন-নীতির আশ্রয় নিলেন। মারাঠাদের বিরুদ্ধে বহু বৎসর ধরে তাঁর অতি কষ্টকর রক্তক্ষয়ী অভিযান চলেছিল। এতে কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি, তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। এই অভিযানে রাজকোষের অর্থ জলের মত ব্যয়িত হয়েছিল। এই অভিযানের ফলে দাক্ষিণাত্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থাও হয়েছিল অতি শোচনীয়। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে উত্তর ভারতে ছিল তার অনুপস্থিতি। কিন্তু তবুও তিনি মারাঠাদের দমন করতে পারেননি। এই কারণে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার প্রচুর অবনতি হয়েছিল।

মারাঠা দমনে তাঁর ব্যর্থতা সাম্রাজ্যের ও তার সামরিক শক্তির মর্যাদাহানিও ঘটিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অবহেলার ফলে ঐ সব অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা স্থানীয় রাজকর্মচারীগণ কেন্দ্রীয় শাসন অথবা নির্দেশ উপেক্ষা করে নিজেদের স্বাধীনতারস্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিল। পরে, অষ্টাদশ শতকে উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তির প্রাদুর্ভাবের কারণে কেন্দ্রীয় শাসন আরও দুর্বল হয়ে উঠেছিল।

রাজপুতানার কয়েকজন রাজার সঙ্গে আওরঙ্গজেবের বিরোধের পরিণাম গুরুতর হয়েছিল। রাজপুত রাজাদের সঙ্গে আপোষের অর্থ ছিল তাদের সামরিক সহায়তা লাভ। এই সামরিক সহায়তা অতীতে মুঘল বাহিনীর শক্তির প্রধান উৎস ছিল। রাজ্যলাভের গোড়ার দিকে স্বয়ং আওরঙ্গজেব রাজপুত রাজাদের সঙ্গে মিত্রতার নীতি মেনে নিয়েছিলেন। মাড়োয়ার-এর যশোবন্ত সিংহ ও অম্বরের জয়সিংহকে তিনি সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদগুলিতে উন্নীত করেছিলেন। পরে কিন্তু তিনি এই নীতি বিসর্জন দিয়ে রাজপুত রাজাদের পদমর্যাদা হ্রাস করে রাজপুতানায় নিজের একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা শুরু করেছিলেন। এই অদূরদর্শী নীতির ফলে তিনি রাজপুত রাজাদের আনুগত্যও হারিয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয়ও ঘটেছিল। সাম্রাজ্য থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতাও দেখা দিয়েছিল। আওরঙ্গজেবের অদূরদর্শিতার ফলে হিন্দু ও মুসলমান উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও একটা বিভেদের প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

আওরঙ্গজেবের রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল দিল্লীতেই তার শক্তি পরীক্ষার জন্যই যেন শতনামী, জাঠ ও শিখ বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এই বিদ্রোহে যোগদানকারী মানুষের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না, তবুও তার পেছনে যে জনসমর্থনের অভাব ছিল না তার প্রমাণ ছিল এই বিদ্রোহে কৃষকদের যোগদান। এরাই ছিল এই বিদ্রোহের মূল উৎস। কৃষকদের প্রতি মুঘল সাম্রাজ্যের রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের নির্যাতনই ছিল এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। এই বিদ্রোহ থেকে এটা পরিস্ফুট হয়েছিল যে জমিদার, ওমরাহ্ এবং রাজদরবারের সামন্ততান্ত্রিক দমননীতিই দেশের কৃষক সমাজের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে।

আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা ও হিন্দু রাজাদের প্রতি তাঁর বিসদৃশ ব্যবহার

মুঘল সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার পক্ষে প্রভূত অনিষ্টসাধন করেছিল। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য কার্যতঃ ছিল একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের সুদৃঢ়তার মূলে বেশ কতকগুলি নীতি ছিল। এই রাষ্ট্রনীতি ছিল কারো ধর্মবিশ্বাসে কোন রকম আঘাত দেওয়া চলবে না, চিরাভ্যস্ত সামাজিক প্রথাগুলি অব্যাহত থাকবে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির পরিমণ্ডল বজায় রাখা হবে আর সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদগুলি কারো একচেটিয়া অধিকারভুক্ত থাকবে না, এগুলি যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির পেতে কোন বাধা থাকবে না। এই উদার রাষ্ট্রনীতি মুঘল-রাজপুত সংহতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল। জিজিয়া কর প্রবর্তন, উত্তর ভারতে কয়েকটি মন্দির ধ্বংস এবং হিন্দু প্রজাদের প্রতি কিছু বিধিনিষেধ প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে আওরঙ্গজেব এ যাবৎ অনুসৃত উপরোক্ত উদার রাষ্ট্রনীতি পাল্টে দিতে প্রয়াসী হন। এইভাবে তিনি হিন্দু সমাজের আস্থা হারিয়ে তৎকালীন সমাজে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সঞ্চার করেন। এতদ্দ্বারা হিন্দু-মুসলমান উচ্চশ্রেণীর মধ্যে একটি বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের ধর্মসম্বন্ধীয় এই দৃষ্টিভঙ্গি মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি-ক্ষয়ের একমাত্র কারণ এটা মনে করা অবশ্য সঙ্গত নয়। এই অন্ধনীতি আওরঙ্গজেবের রাজ্যকালের শেষদিকেই প্রকট হয়েছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এই ধর্মান্ধতার নীতি অবিলম্বে পরিত্যাগ করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই জিজিয়া কর আদায় প্রথা পরিত্যক্ত হয়েছিল। রাজপুত ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু-প্রধানদের সঙ্গে মৈত্রী ও সখ্যতার নীতি পুনরায় অনুসৃত হয়েছিল। পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের রাজত্বকালে অজিত সিংহ রাঠোর ও জয়সিংহ সাওয়াই-এর মত রাজপুত প্রধানেরা মুঘল সাম্রাজ্যের উচ্চপদাধিকারী হতে পেরেছিলেন। রাজা শাহু ও অন্যান্য মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে যে সব চুক্তি ইত্যাদি করা হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক স্বার্থ, এই ব্যাপারে ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজপুত, জাঠ, মারাঠা ও শিখ রণনায়কগণ যে হিন্দুত্বের স্বার্থে মুঘলদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, এর কোন প্রমাণ তাঁরা রেখে যেতে পারেননি। ধর্মীয় সংহতি স্থাপনের চেয়ে এঁদের মনোযোগ নিজেদের ক্ষমতা লাভ ও লুণ্ঠনের দিকেই বেশী ছিল। যুদ্ধ ও

লুণ্ঠনের ব্যাপারে সাধারণতঃ এঁদের নৃশংসতার শিকারের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই স্থান হত। অর্থাৎ হিন্দু হিসাবে কারো হিন্দু আক্রমণকারীদের হাত থেকে অব্যাহতির ঘটনা ঘটত না। বাস্তবিক ক্ষেত্রে অন্য স্বার্থ-নিরপেক্ষ নিছক হিন্দু বা মুসলমান সমাজের অস্তিত্বই সেকালে ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাত স্তরের মানুষ নিয়ে ছিল একটি শাসকশ্রেণী। আর একটি শ্রেণী ছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একটি বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের। এই শ্রেণী ছিল কৃষিজীবী, কারিগর ও শ্রমিক প্রভৃতির সমবায়ে গঠিত। রাজনৈতিক স্বার্থেই অনেক সময় হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতদের কোন কোন সময়ে ধর্মের জিগির জাগাতে দেখা যেত। তবে প্রায়ই দেখা যেত যে, হিন্দু ও মুসলমান প্রধানেরা পরস্পরের সাহায্যে নিজের স্বধর্মাবলম্বীদের উপর নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে, তাদের জমিজায়গা আত্মসাৎ করতে বা তাঁদের অর্থ লুণ্ঠন করতে সঙ্কোচ বোধ করছেন না। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের উপর নির্মম শোষণ ও নির্যাতনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাত ও ভূস্বামীগণের তৎপরতা দেখা যেত। অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা শোষণ ও নির্যাতনের সুবিধা পেলে স্বধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষকে অব্যাহতি দিতেন না। আগ্রা, আউধ্ (অযোধ্যা) ও বাংলার হিন্দু ও মুসলমান কৃষক প্রজাদের যে গুরুপরিমাণ রাজস্ব দিতে হত, মহারাষ্ট্র বা রাজপুতানার হিন্দু প্রজাদের করভার তার তুলনায় কম ছিল না। এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে এইকালে হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত শ্রেণীদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক ও সংস্কৃতিগত একটা হৃদ্য-সম্পর্কের বন্ধনও বিরাজিত ছিল।

আওরঙ্গজেব বহু সমস্যার সমাধান করার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে যে সব বিধ্বংসী যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয় সেগুলি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে দিয়েছিল। উত্তরাধিকার লাভের কোন নির্দিষ্ট বিধান না থাকায় মুঘলবংশীয় সম্রাটদের প্রত্যেকের মৃত্যুর পর রাজপুত্রদের পরস্পরের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে একটা গৃহযুদ্ধ নিয়মিতরূপে সংঘটিত হয়ে যাচ্ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘল ইতিহাসে সিংহাসনের দাবি নিয়ে এই ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের পরিণতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সর্বনাশী রূপ ধারণ করত। এই গৃহযুদ্ধের পরিণাম হত

বিপুল লোকক্ষয় ও সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি। সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য, শত শত রণদক্ষ সেনাপতি এবং বহু কর্মদক্ষ ও বিচক্ষণ রাজকর্মচারী এই গৃহযুদ্ধের সময়ে প্রাণ হারাতেন। এই গৃহযুদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোটিতেও ফাটল ধরিয়ে দিত। সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ অভিজাত শ্রেণীতেও ফাটল ধরত, এঁরা যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যেতেন। অনেক সময় শাসন কেন্দ্রে এই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার সুযোগে আঞ্চলিক রাজা বা সম্রাটের প্রতিনিধিগণ নিজেদের স্বাধীনতার মাত্রা বৃদ্ধি করতে অথবা নিজের পদটি বংশানুক্রমিক করে নিতে চেষ্টা করতেন।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের দুর্বলতার কারণগুলিও পরবর্তীকালে সিংহাসনের দাবি নিয়ে যে সব যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল তজ্জনিত ক্ষতিগুলি সবই পূরণ হয়ে যেত যদি দিল্লীর সিংহাসনে দক্ষ দূরদর্শী ও উদ্যমশীল কোন সম্রাট্ বসতে পারতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, বাহাদুর শাহের স্বল্পকালীন রাজত্বের পর বহুদিন ধরে যে সব সম্রাট্ মুঘল সিংহাসন অধিকার করে ছিলেন তাঁরা সবাই ছিল অপদার্থ, দুর্বল-চিত্ত ও বিলাস-প্রিয়। স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য রাজার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অপরিসীম গুরুত্ব আছে। তবে, শুধু রাজার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বই নয় এবিষয়ে আরও কিছুর প্রয়োজন আছে। আওরঙ্গজেব অবশ্যই দুর্বল ছিলেন না, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাও যথেষ্ট ছিল। তাঁর কর্মদক্ষতাও যথেষ্ট ছিল। রাজা মহারাজাদের মধ্যে যে সব সাধারণ উচ্ছৃঙ্খলতা দোষ থাকে আওরঙ্গজেব সেই সব দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি অনাড়ম্বর ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। পিতৃপুরুষের গড়ে তোলা বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি আওরঙ্গজেবের সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল বটে, তবে তার কারণ তাঁর চরিত্রহীনতা বা অপদার্থতা ছিল না। আওরঙ্গজেবের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা ছিল না, কিন্তু তাঁর অনুসৃত নীতিগুলি যে বেশ দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি শুধু সম্রাটদের ব্যক্তিত্বের উপরই নির্ভরশীল ছিল না। রাজদরবার যাদের নিয়ে গঠিত সেই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষদের চরিত্র ও তাদের বিন্যাসের উপরও সাম্রাজ্যের শক্তিসৌধ গুরুপরিমাণে নির্ভরশীল

ছিল। সম্রাটের ক্রটিবিচ্যুতিগুলি অনুগত, কর্মঠ ও কর্মতৎপর রাজদরবার-ভুক্ত কিছু সম্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারা শুধরে যাওয়ার পথ খোলা থাকত। কিন্তু হায়, এই সম্রান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের চরিত্রও দূষিত হয়ে পড়েছিল। এঁদের অনেকেই নিজেদের সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়বহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এঁরা হয়ে উঠেছিলেন আরাম-প্রিয় ও অতিরিক্ত বিলাসী। এমনি কি যুদ্ধে যাওয়ার সময়েও তাঁরা বিলাস-সামগ্রী দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন, অনেক সময় পরিবার ও তাঁদের সঙ্গে থাকত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁদের শিক্ষার মান খুব নীচু ছিল। যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারেও এঁদের অনীহা দেখা যেত। আগেকার দিনে নিম্নশ্রেণীর বহু মানুষ নিজেদের যোগ্যতা দেখিয়ে উচ্চ পদ লাভ করে সম্রান্ত শ্রেণীর রাজকর্মচারী বা সভাসদ্ হয়ে যেতেন। এইভাবে সম্রান্ত শ্রেণীতে কিছু নূতন রক্তের সঞ্চার হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর মানুষেরা লোভনীয় রাজপদগুলি নিজেদের জন্য সংরক্ষিত করে নিয়ে এগুলি একচেটিয়াভাবে ভোগদখল করতেন, যোগ্যতা দেখিয়ে নীচু স্তরের মানুষদের পক্ষে এগুলি অধিকারের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। একটা কথার উল্লেখ করা আবশ্যক যে রাজদরবারের সম্রান্ত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে সকলেই যে দুর্বল ও অপদার্থ হয়ে উঠেছিলেন এমন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সংখ্যার দিক থেকে বেশ কিছু দক্ষ ও উদ্যমশীল রাজকর্মচারী ও নিপুণ সেনাধ্যক্ষ তাঁদের নিজ গুণে বিশিষ্টতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এঁদের কারো দ্বারা সাম্রাজ্যের কোন উপকার সাধিত হয়নি। কারণ এঁরা রাষ্ট্র ও সমাজের স্বার্থে নিজেদের প্রতিভা ও কর্মোদ্যম নিযুক্ত করেননি। এঁরা যা কিছু করেছেন সব নিজের নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য। এই স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে এঁরা নিজেদের মধ্যেও বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে যে, অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে কর্মদক্ষতা ও নৈতিক শক্তির অভাব দেখা দিয়েছিল, এই ধারণাটি অবশ্য যথার্থ নয়। বস্তুতঃ সম্রান্ত শ্রেণীর ব্যর্থতার মূলে ছিল তাঁদের স্বার্থপরতা এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অভাব। এর ফলে শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। পারস্পরিক দোষানুসন্ধান ও কলহের পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছিল। নিজেদের ক্ষমতা, মান, সম্মান ও আয়বৃদ্ধির জন্য এই সম্রান্ত শ্রেণী নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট একটা

করে 'দল' বা 'গোষ্ঠী' গড়ে তোলেন। এঁরা সর্বদা পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন কি সম্রাটের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতেন। ক্ষমতা অধিকারের জন্য এঁরা বলপ্রয়োগ, জালিয়াতি ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। পারস্পরিক হানাহানির ফলে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ও সংহতি শিথিল হয়ে তা খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সংহতির অভাবে শাসনব্যবস্থা তার প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে বিদেশী আক্রমণের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল। এই বিষয়ে সবচেয়ে দোষী সাব্যস্ত করা যায় সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ সেইসব সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষদের যাঁরা ছিলেন সক্রিয় ও কর্মদক্ষ। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এঁরাই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ নিজস্ব সম্পত্তিরূপে গড়ে নিয়ে সাম্রাজ্যের সংহতির সর্বনাশ করে দিয়েছিলেন। মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে এই হঠাৎ গজিয়ে উঠা নবাব বা রাজাদের অবস্থাও অবনতির দিকে ঝুঁকেছিল। এই অবনতি এঁদের ব্যক্তিজীবনের দোষ-ত্রুটিগুলির জন্যই ঘটেনি। এর কারণ ছিল রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, সামাজিক কর্তব্যবোধের অভাব এবং আশু কিছু প্রাপ্তির লোভে বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন। তবে একথা বলা ভুল হবে যে, শুধু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীই একমাত্র এই দোষযুক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক মঞ্চে বহু সাহসী ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিই খ্যাতি ও ক্ষমতা অর্জনে সফলকাম হয়েছিলেন। এই খ্যাতিমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান শক্তির অধিকারী মারাঠা, রাজপুত, জাঠ, শিখ ও বুন্দেলা সর্দার ও রাজন্যবৃন্দও ছিলেন। মুঘল প্রধানদের বিবেক-বুদ্ধিহীনতা, আত্মকলহ, সামাজিক কর্তব্যবোধের অভাব প্রভৃতি দোষগুলি মুঘল দরবারের বাইরে এঁদের কাজেকর্মেও অনুসৃত হয়েছিল।

অভিজাত শ্রেণীর মানুষদের ক্রমবর্ধমান স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্র প্রবণতার একটা প্রধান কারণ দাঁড়িয়েছিল জায়গীরের সংখ্যাল্পতা, এবং চালু জায়গীরগুলির আয় হ্রাস। ঠিক এই সময়ে নূতন নূতন অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মান তথা ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছিল। যে কয়েকটি জায়গীর রাজদরবারের হাতে ছিল সেগুলি দখল করার জন্য অভিজাতদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। অনেক বেশী দাবিদারের তুলনায় জায়গীর ও লোভনীয় পদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। কোনো একটা ব্যবস্থা করা ঐ সময়ে অসম্ভব ছিল যে ব্যবস্থা দ্বারা সকলেরই

ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যেতে পারে। জায়গীরের সংখ্যাল্পতার পরিণামও ছিল সুদূরপ্রসারী। জায়গীরদারেরা তাঁদের জায়গীর থেকে যথাসম্ভব লাভ উঠিয়ে নিতেন, এতে কৃষকদের উপর শোষণের মাত্রা বেড়ে যেত। অভিজাত শ্রেণীর জায়গীরদারেরা তাঁদের জায়গীর ভোগের অধিকার বংশানুক্রমিক করে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য এঁরা জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত 'খালিসা' বা রাজার নিজস্ব 'খাস' জমিও দখল করে নিতেন, এতে কেন্দ্রীয় তহবিলের ক্ষতি হত। জায়গীর ভোগের সর্ত ছিল এই যে, প্রত্যেক জায়গীরদারকে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য-বাহিনী রাখতে হবে। জায়গীরদারেরা নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্যবাহিনী না রেখে ব্যয়সঙ্কোচ করতেন এবং ফলে যুদ্ধকালে সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীতে সংখ্যার ঘাটতি থেকে যেত।

অবশ্য মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মৌলিক কারণ ছিল এই যে এটা আর প্রজাপুঞ্জের নিম্নতম প্রয়োজনগুলিও মেটাতে সক্ষম হচ্ছিল না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় কৃষক সমাজের অবস্থা ক্রমাগতভাবে হীন হতে হীনতর হয়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ ভারতীয় কৃষক সমাজের অবস্থা কখনই তেমন ভাল ছিল না। তবুও তুলনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল 'হৃত সর্বস্ব, কুশ্রী, দুর্ভাগ্যজনক ও অনিশ্চিত'। আকবরের কাল থেকে জমির উপর করের বোঝা বেড়েই চলেছিল। এর উপর, ক্রমাগত ভূস্বামী বা জায়গীরদারের পরিবর্তনও প্রচুর অনর্থের কারণ হয়ে উঠত। কেউ একজন জায়গীরের অধিকার লাভ করে অল্প সময়ের মধ্যে যতটা বেশী উপার্জন করে নেওয়া যায় ততটা উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কৃষকদের উপর এঁদের দাবির বহর ছিল মাত্রাতিরিক্ত, এটা নির্যাতন করে আদায় করা হত। কৃষকদের দেয়-অদেয় বিষয়ে সরকারী আইনকে জায়গীরদারেরা অনেক সময় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নীলামে সর্বোচ্চ ডাকে একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জমির খাজনা আদায়ের অধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা (ইজারা) চালু হয়েছিল। এই ইজারাদারদের কৃষকের কাছ থেকে যতটা সম্ভব রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। জায়গীরভুক্ত ও খালিশা জমির সম্বন্ধেও ছিল এই নিয়ম। এই কুপ্রথা থেকে রাজস্ব আদায়কারী একটি নূতন তালুকদার শ্রেণীর উদ্ভব

হয়েছিল। এদের কৃষক শোষণের মাত্রা প্রায়ই সহ্যাতিরিক্ত হয়ে উঠত।

এইসব কারণগুলির জন্য কৃষিব্যবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাক তার দিন দিন অবনতি ঘটছিল। কৃষিব্যবস্থার উন্নতির অভাবে কৃষকদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে পেতে এক সময় তা' খুবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এমনও দেখা যেত যে খাজনার হাত থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য কৃষকেরা জায়গাজমি ফেলে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ বিদ্রোহের আকারও লাভ করেছিল (সৎনামী, জাঠ ও শিখদের ক্ষেত্রে)। এই বিদ্রোহগুলি সাম্রাজ্যের শক্তি ও সংহতির মূলে আঘাত হেনেছিল। বহু সর্বস্বান্ত কৃষক ভ্রাম্যমান ডাকাত দলভুক্ত হয়ে ভাগ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিল। অনেক সময় এই ডাকাতদের নেতৃত্ব দিত স্বয়ং জমিদার। এই ব্যাপারটি মুঘল শাসনব্যবস্থা তথা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মূলে কুঠারাঘাত করেছিল।

বস্তুতঃ কৃষিকার্য থেকে আয় সাম্রাজ্য পরিচালন, নিত্যনূতন যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয় ও শাসকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বিলাসের চাহিদা মেটানোর পক্ষে আর পর্যাপ্ত ছিল না। সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে ও তার হৃতশক্তি ফিরিয়ে আনতে, জনগণের জীবনযাত্রা সচ্ছল করতে নূতন আয়ের পন্থা আবিষ্কার তখন একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। আর এই অতিরিক্ত আয়ের একমাত্র উপায় ছিল—শিল্প ও বাণিজ্য। কিন্তু আয়ের এই দুটি উৎসই হয়ে পড়েছিল সবচেয়ে অকেজো। একটা বিশাল সাম্রাজ্যের গড়ন স্বভাবক্রমেই শিল্প ও বাণিজ্যিক অগ্রগতির বিশেষ অনুকূল হয়ে থাকে। এক সময় ভারতে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বেশ ভালভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমসাময়িক বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় শিল্পবস্তুর গুণগত মান ও উৎপাদন তৎকালে বেশ উন্নত অবস্থায় স্থিত ছিল। ইউরোপে এই সময়ে শিল্পোৎ-পাদন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সুরু হয়েছিল। ভারতে অবশ্য সমসাময়িককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করা হয়নি। অন্যদিকে—ভারতে বাণিজ্যব্যবস্থা উন্নততর হওয়ার পক্ষে একটা মস্ত বাধা ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল স্বয়ম্ভর মাত্র। অর্থাগম এবং রাজকোষের স্বার্থে জমির উপরই ছিল সবার

দৃষ্টি। বহির্বাণিজ্য ও নৌবাণিজ্যের দিকটি ছিল উপেক্ষিত। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন সম্ভবতঃ যে কোন দক্ষ নৃপতি বা কোন রাজপ্রধানের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। তৎকালে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি সাধিত হয়নি। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় কোন বিপ্লব বা চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হয়নি। তুলনামূলকভাবে ইউরোপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ঘটেছিল, জনমানসে বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনারও জন্ম হয়েছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক্ থেকে সমৃদ্ধ ইউরোপের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাই ভারতকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণটি ছিল সামাজিক তথা রাজনৈতিক। এই সময়ে জনমানসে একটা জাতীয়তাবোধের অভাব সুপ্রকটভাবে বিরাজমান ছিল। একটা আধুনিক জাতি যে বিশিষ্ট উপাদানগুলির সমবায়ে গড়ে উঠে তৎকালীন ভারতবাসীর মধ্যে তার অভাব ছিল। ভারতের তৎকালীন অধিবাসীগণ সকলেই নিজেদের ভারতবাসীরূপে চিন্তা করতে অনভ্যস্ত ছিল। শত শত বৎসর ধরে ভারতবাসীর মনে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা সংহতিবোধ ছিল না। ভারতবাসী মাত্রেরই স্বার্থ এক এই চেতনাও তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। ফলতঃ জাতির স্বার্থে বেঁচে থাকা বা জাতির স্বার্থে মৃত্যুবরণ এই আদর্শবাদের অস্তিত্ব তৎকালে অজাগ্রত ছিল। তৎকালে জনসাধারণের আনুগত্য ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায়, বর্ণ বা ধর্মের গণ্ডিতেই নিবদ্ধ থেকে গিয়েছিল।

বস্তুতঃ তৎকালে দেশের কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী সমগ্র দেশের বা সাম্রাজ্যের সুস্থিতি নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনা-চিন্তার ধার ধারেনি। খুব জবরদস্ত শাসক অবশ্য কোন কোন সময়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে জনসাধারণকে একতাবদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হতেন। দেশের কৃষক-সমাজ শুধুমাত্র তাদের গ্রামের বা বিশেষ জাতের স্বার্থ চিন্তাই করত। সাম্রাজ্যের রাজনীতি বা সুস্থিতি বিষয়ে এদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। সাম্রাজ্যের ভালোমন্দ নিয়ে এদের কোন আগ্রহ বা অনাগ্রহের অস্তিত্বই ছিল না। তারা এটাই মনে করত যে, সাম্রাজ্যের ভালোমন্দের সঙ্গে তাদের ভালো থাকা বা মন্দ থাকার কোন সম্পর্ক নেই। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঠেকানোর কিছুমাত্র দায়িত্বও তাদের আছে এটা তারা ভাবতে একেবারেই অভ্যস্ত

ছিল না। কেন্দ্রে কোন সম্রাটের দুর্বলতা জেনে ফেলা মাত্র জমিদারেরা বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করত। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে একটা দৃঢ় শাসনব্যবস্থা এদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল না কারণ এই ব্যবস্থায় তাদের প্রভুত্বলিপ্সা ও স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার আশঙ্কা থেকে যেত।

আগের যুগের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে রাজপরিবারের প্রতি আনুগত্য বেশ গভীর ছিল। তবে এই আনুগত্য স্বার্থহীন ছিল না। এই আনুগত্যের বিনিময়ে তাঁরা ভোগ করতেন উচ্চ রাজপদ এবং এই সংক্রান্ত বহু সুযোগসুবিধা। মুঘল রাজবংশের অধঃপতন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতমণ্ডলীর অনেকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উচ্চাশাকে রাষ্ট্রের বা সম্রাটের আনুগত্যের উর্ধে স্থান দিয়ে নিজেরা রাজ্যের অংশবিশেষ দখল করে তার স্বাধীন অধীশ্বর হয়ে বসেছিলেন। তাঁদের এই ব্যবহারে সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে, এর জন্য তাঁরা মোটেই চিন্তিত হননি। মারাঠা, জাঠ, রাজপুত প্রভৃতি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল আঞ্চলিক স্বাধীনতা এবং সম্প্রদায়গত বা ব্যক্তিগত ক্ষমতা-অর্জন। ভারতীয় জাতির স্বার্থে অথবা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্রোহ ঘোষিত হয়নি। এই চিন্তায় তারা কখনও উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি। প্রকৃত অবস্থা বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় তখনকার দিনে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ; জাতিবর্ণ ভেদের গঠন ইত্যাদি এমন একটা অবস্থায় ছিল, যে অবস্থা ভারতীয় সমাজের সংহতি অথবা ভারতীয়দের একটি জাতি হিসাবে আবির্ভাবের অনুকূলতা সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

পূর্বালোচিত কারণগুলির জন্য মুঘল শাসনব্যবস্থা ও সামরিক শক্তি ভেঙ্গে পড়েছিল। অন্যথায় মুঘল সাম্রাজ্য আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। সুশাসন ব্যবস্থা বজায় রাখার দিকে শাসকদের মোটেই লক্ষ্য ছিল না। সাম্রাজ্যের নানাস্থানে আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছিল। দুর্বিনীত কোন কোন ভূস্বামী প্রকাশ্যেই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে অমান্য করতে লেগেছিল। অবস্থা এতদূর খারাপ হয়েছিল যে যুদ্ধযাত্রার পথে রাজকীয় শিবির ও সৈন্যবাহিনী বিরুদ্ধপক্ষীয়গণ কর্তৃক আক্রমণ ও লুণ্ঠনের কাণ্ডও ঘটত। দুর্নীতি, উৎকোচ-গ্রহণ, শৃঙ্খলাহীনতা, অকর্মণ্যতা, অবাধ্যতা, আনুগত্য-

হীনতা রাজকর্মচারীদের সর্বস্তরেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারে যখন তখন দেউলিয়া অবস্থা দেখা দিত। রাজকোষে ধনাগমের পথগুলি ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল আর রাজভাণ্ডারের পূর্বসঞ্চিত অর্থরাশিও নিঃশেষিত হয়েছিল। বহু প্রদেশ থেকে রাজস্ব আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যের নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে গণ্য খালিশা জমির পরিমাণও কমে এসেছিল কারণ সম্রাটেরা বন্ধুভাবাপন্ন অভিজাত শ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তিকে হাতে রাখার জন্য এইসব জমি তাঁদের 'জায়গীর' স্বরূপ বিলি করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্রোহী জমিদারেরা রাজস্ব না দেওয়াটাই নিয়মে পরিণত করেছিল। কৃষক সম্প্রদায়কে উৎপীড়ন করে আয় বাড়ানোর যে চেষ্টা চলেছিল তারও বহু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি ও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিয়েছিল, সৈন্য-বাহিনীর যুদ্ধ করার মনোবলও ভেঙ্গে এসেছিল। অর্থাভাবে একটা বিরাট সৈন্যবাহিনী বজায় রাখা সম্ভবও ছিল না। সৈন্যবাহিনীর সৈনিক ও সেনানায়কেরা মাসের পর মাস বেতন থেকে বঞ্চিত থাকত। নিছক অর্থের প্রয়োজনেই এরা যোদ্ধার খাতায় নাম লিখিয়েছিল, দেশ রক্ষার জন্য নয়, তাই এরা বেতন না পেলে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ত এবং সময় সময় বিদ্রোহেরও চেষ্টা করত। মুঘল সেনাধক্ষ্য ও অভিজাতদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যবাহিনী প্রতিপালন করার যে প্রথা ছিল সেটাও ঠিকভাবে অনুসৃত হত না। যাঁদের উপর সৈন্য পোষণের দায়িত্ব ছিল তাঁরা নিজেদের অর্থসঙ্কটের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য নিজেদের বাহিনীতে মজুত রাখতে পারতেন না, কাজেই যুদ্ধকালে সৈন্যের ঘাটতি থেকে যেত। শত্রুর আক্রমণ ছাড়াও অভিজাত শ্রেণী ও রাজবংশীয়দের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধের সময় বহু দক্ষ রণ-নায়ক এবং সাহসী ও অভিজ্ঞ যোদ্ধার প্রাণনাশ হত। সাম্রাজ্যের দৃঢ়তম ভিত্তি এবং মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব তার এই সৈন্যবাহিনী এতদূর দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তার পক্ষে বিদ্রোহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাত বা কোন রাজার অভিযানও প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ থেকেও দেশরক্ষার সামর্থ্য মুঘল সৈন্যবাহিনীর লুপ্ত হয়েছিল।

উপর্যুপরি কয়েকটি বৈদেশিক আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের উপর চরম

আঘাত হেনেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই ভারতে নাদির শা ও আমেদ শা আবদালির আক্রমণ ডেকে এনেছিল। এই আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের অর্থসম্পদ নিঃশেষিত হয়েছিল। অশান্তির কারণে উত্তর ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নাদির শা ও আমেদ শা আবদালির আক্রমণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি প্রায় সামগ্রিকরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থার মধ্যেই সত্ত অভ্যুত্থিত ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে মুঘল সামরিক শক্তির সঙ্ঘর্ষ ঘটেছিল। সমস্যা-দীর্ণ মুঘল সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের শেষ আশাটুকুও তাই ব্রিটিশ শক্তির মুখোমুখি হওয়ার ফলে নিভে গিয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরের অবস্থা বিচার করলে দেখা যাবে যে, ভারতের আর কোন শক্তি মুঘল সম্রাটদের উত্তরাধিকার দাবি করতে এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি। এই শক্তিগুলির মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস করে ফেলার সামর্থ্যই শুধু ছিল। এদের কারো এমন সামর্থ্য ছিল না যার দ্বারা একটা সাম্রাজ্য রক্ষা করা যায় বা নূতন একটা সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যায়। পশ্চিম দেশ থেকে নবাগত শত্রুদের রুখতে পারে এমন একটা নূতন সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে তৎকালীন ভারতীয় নেতারা যে ব্যর্থ হয়েছিলেন তার কারণ তৎকালীন ভারতীয় প্রধানেরা সকলেই মুঘলদের মত একই নির্জীব সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধি ছিলেন। বিরাট মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণস্বরূপ দোষ-ত্রুটিগুলি তৎকালীন সকল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমপরিমাণেই সক্রিয় ছিল।

অপরদিকে, যে ইউরোপীয়গণ ভারতের দ্বার প্রান্তে এসে হানা দিয়েছিল তারা এমন এক সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, যে সমাজ ছিল উন্নততর আর্থিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সদ্ব্যবহারে পূর্ণমাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছিল। মুঘল সামাজ্য পতনের পরিণাম নিঃসন্দেহে দেশের দুর্ভাগ্য সূচনা করেছিল। একটি বৈদেশিক শক্তি মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছিল। এই শক্তি স্বীয় স্বার্থেই এদেশে প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ধ্বংসসাধন করে তৎপরিবর্তে একটি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু এই অমঙ্গল থেকে কিছু কিছু শুভকর বিষয়েরও আবির্ভাব ঘটেছিল। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার অচলায়তনে পরিবর্তনের একটা নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল। এই হাওয়াবেদল ঘটেছিল ঔপনিবেশিক সভ্যতার পরিবেশে।

স্বাভাবিক কারণে এই হাওয়াবদল অবশ্য জাতির জীবনে চরম দুর্দশা ও অধঃপতন ঘটিয়েও দিয়েছিল। দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৈন্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এতৎসত্ত্বেও এই পরিবর্তনের স্রোতাবর্তেই আধুনিক ভারতের জীবনধর্মী চলিষ্ণুতার সূচনা হয়েছিল একথাও স্বীকার করতে হবে।

অনুশীলনী

1. মুঘল সাম্রাজ্য কিভাবে দিল্লী ও তার চারপাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল? সম্রাট্ ও রাজকর্মচারীগণ সাম্রাজ্যের অবনতি রোধ করতে কি কি উপায় অবলম্বন করেছিলেন?
2. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে আওরঙ্গজেবের দায়িত্ব কতটুকু তা বিচার-বিশ্লেষণ কর।
3. অভিজাত শ্রেণী মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কতদূর দায়ী ছিল?
4. মুঘল সাম্রাজ্যের সুস্থিতি কৃষি ও শিল্পের অবনতি দ্বারা কিভাবে ব্যাহত হয়েছিল?
5. নিম্নলিখিত বিষয়ে ছোট ছোট মন্তব্য লিখ:

   (a) বাহাদুর শাহ্ (b) জুলফিকর খান (c) সৈয়দ ভ্রাতৃগণ (d) নাদির শা ও তাঁর ভারত অভিযান (e) জায়গীর প্রথার সংকট।

দ্বিতীয় আধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজ্যসমূহ ও সমাজ

মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর মুঘল শাসনব্যবস্থার অনুকরণে কয়েকটি স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। এগুলি ছিল বাংলা, আউধ (অযোধ্যা), হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও মারাঠা রাজ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই শক্তিগুলি ভারতে ব্রিটিশের সার্বভৌম শক্তিবিস্তার রোধের চেষ্টা চালিয়েছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে কোন কোনটি তদানীন্তন মুঘল সুবাদারদের কেন্দ্রীয় শাসন উপেক্ষা করে স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে সৃষ্ট হয়েছিল। অপরগুলি ছিল মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে উদ্ভূত।

এই রাজ্যগুলির শাসকেরা নিজ নিজ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা এবং কার্যকরী শাসন ও আর্থিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ছোটখাট স্থানীয় রাজকর্মচারী, ছোটখাট জমিদার বা গোষ্ঠীপতির দল তৎকালে রাজার শাসন উপেক্ষা করে এমন কি তাঁর সঙ্গে বিবাদের ঝুঁকি নিয়ে কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের বেশীরভাগ আত্মসাৎ করত। এরা অনেক সময় একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে নিজেদের প্রভুত্ব ও স্থাপন করে ফেলত। মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে ওঠা স্বাধীন রাজ্যগুলির শাসকেরা কম বেশী এই ভুঁইফোড়, উচ্চাভিলাষী ক্ষুদে নবাবদের সংযত রেখেছিলেন, অন্ততঃ এরা বেশী প্রশ্রয় পায়নি। এই স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক। শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল রাজনীতি বা অর্থনীতি ভিত্তিক। সামরিক বা অসামরিক যে কোন রাজকার্যে নিয়োগের কালে প্রার্থী কোন ধর্মাবলম্বী সে দিকে লক্ষ্য রাখা হত না। প্রার্থীর যোগ্যতাই শুধু বিচার করা হত। কোন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকালে বিদ্রোহী কখনও স্বধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত কি অনুচিত সেই বিচারে প্রবৃত্ত হত না।

দুর্ভাগ্যক্রমে, উপরোক্ত কোন রাজ্যই স্ব-সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করতে সক্ষম হয়নি। জমিদার ও জায়গীরদারদের সংখ্যা দিন দিন

বেড়েই চলেছিল। কৃষকদের অবস্থা দিন দিন হীন হচ্ছিল আর জায়গীর-দারের শোষণের মাত্রাও বাড়ছিল। এই রাজ্যগুলিতে অন্তর্বাণিজ্যব্যবস্থার ভাঙ্গন রোধ করার ব্যবস্থা হয়েছিল এমন কি বহির্বাণিজ্য বিস্তারেরও চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু এই রাজ্যগুলিতে শিল্পবাণিজ্যের কাঠামোর উন্নতি বা আধুনিকীকরণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটক

নিজাম-উল-মুলুক্ আসফ জা 1724 খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আওরঙ্গজেব পরবর্তী যুগের তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট অভিজাত বা ওম্‌রাহ্। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের অপসারণের ব্যাপারে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে দাক্ষিণাত্যের রাজ-প্রতিনিধি (ভাইসরয়) নিযুক্ত করা হয়েছিল। 1720 থেকে 1722 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদী সকল প্রতিযোগিগণকে পর্যুদস্ত করে দাক্ষিণাত্যে তাঁর প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি একটি সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থারও প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। 1722 থেকে 1724 পর্যন্ত তিনি মুঘল দরবারের উজীর (মন্ত্রী) পদেরও দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এই উজীরপদ তাঁর বিরক্তি জন্মিয়ে দিয়েছিল, কারণ সম্রাট মহম্মদ শাহ্ শাসন সংস্কার বিষয়ে তাঁর সব চেষ্টাতেই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন। বিরক্ত হয়ে তিনি উজীরপদ ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে গিয়ে নিজের প্রভুত্ব নিরাপদ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্য ভূখণ্ডে তিনি হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং দৃঢ়ভাবে রাজ্য শাসন করেন। প্রকাশ্যে তিনি কখনও তাঁর রাজ্যকে স্বাধীনরূপে ঘোষণা করেননি, কিন্তু কার্যতঃ তিনি স্বাধীন নৃপতি হিসেবেই রাজত্ব চালাতেন। দিল্লীর নির্দেশের অপেক্ষা না করেই বা সম্রাটকে না জানিয়েই তিনি যুদ্ধ বা সন্ধি স্থাপন, জায়গীর বা উচ্চপদে নিয়োগ, খেতাব দান ইত্যাদি কাজগুলি স্ব-ইচ্ছায় সম্পন্ন করতেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁর নীতি ছিল উদার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে তাঁর 'দেওয়ান' ছিলেন পুরাণচাঁদ নামে একজন হিন্দু। দাক্ষিণাত্যের একটি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে তিনি বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। দুর্বিনীত বহু বড় বড় জমিদারকে তিনি তাঁর অনুগত থাকতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর রাজ্যে শক্তিশালী মারাঠাদের আক্রমণ তিনি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার

প্রয়াসও তিনি চালিয়েছিলেন। কন্তু 1748 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর হায়দ্রাবাদ রাজ্যে সেই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রকট হয়ে পড়েছিল যা দিল্লীতে ঘটেছিল।

কর্ণাটক ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা অঙ্গরাজ্য। মুঘল শাসনাধীন দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতির জন্য এটা ছিল প্রত্যক্ষভাবে নিজামের শাসনভুক্ত। কার্যতঃ যেভাবে নিজাম দিল্লীর শৃঙ্খল ছিন্ন করেছিলেন ঠিক সেইভাবে কর্ণাটকের নবাব দাক্ষিণাত্যে দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি নিজামের অধীনতাপাশ ছিন্ন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর এই পদ বংশানুক্রমিকভাবে ভোগদখলের ব্যবস্থাও করে নিয়েছিলেন। এইভাবে নবাব সাদুল্লাখান তাঁর উচ্চতর পদে আসীন নিজামের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র দোস্ত আলীকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে, 1740 খ্রীষ্টাব্দের পর নবাবী গদির অধিকার নিয়ে দাবিদারদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কর্ণাটকের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল আর এই রাজনৈতিক অস্থিরতার দুর্যোগে ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলি ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের সুযোগ লাভ করেছিল।

বাংলা

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে মুর্শিদকুলি খান্ ও আলিবর্দী খান নামে দুইজন অসাধারণ কর্মতৎপর ব্যক্তি কার্যতঃ বাংলা সুবাকে স্বাধীন করে ফেলেছিলেন। 1700 খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সুবার দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই মুর্শিদকুলি খান্ বাংলাদেশের কার্যতঃ শাসনকর্তা-রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এর বহু পরে, 1717 খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার সুবাদার বা গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিয়মিতভাবে সম্রাটকে 'নজরানা' পাঠাতেন যদিও তিনি দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল থেকে বেশ আগে থেকেই নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। বাংলা প্রদেশকে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আক্রমণ থেকে মুক্ত করে তিনি সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আমলে জমিদার শ্রেণীর বিদ্রোহ থেকে বাংলা প্রদেশ প্রায় মুক্ত ছিল। তাঁর সময়ে জমিদার-বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল তিনটি। এই তিনটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহের

প্রথমটির নায়ক ছিলেন—সীতারাম রায়, উদয়নারায়ণ এবং গোলাম মহম্মদ। এর পরের দুটির নায়ক ছিলেন যথাক্রমে সুজাত্ খান্ ও নাজাত্ খান্। এঁদের পর্যুদস্ত করে মুর্শিদকুলি খান্ এঁদের জমিদারির অধিকার তাঁর প্রিয়পাত্র রামজীবনের হাতে অর্পণ করেন। 1727 খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হয়। 1739 পর্যন্ত তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। এই বৎসরই সুজাউদ্দীন-এর পুত্র সরফরাজ খান্কে পদচ্যুত করে আলিবর্দী খান তাঁকে হত্যা করেন এবং নিজেকে বাংলার নবাব হিসেবে ঘোষণা করেন।

এই তিনজন নবাবের শাসনকালে বাংলার শাসনব্যবস্থা সুস্থিত থাকায় দেশে বহুকাল ধরে শান্তি বিরাজমান ছিল। ফলে দেশের শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খান শাসনব্যয় হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাজস্ব নির্ধারণের জন্য নূতনভাবে তিনি জমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন, এটা ছিল বিশেষ এলাকায় চাষের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিরাজস্ব আদায় বা ইজারাদারি প্রথার প্রবর্তন। এই জমি বন্দোবস্তের সময় প্রচুর জমি জায়গীরদারদের কবল থেকে উদ্ধার করে সেগুলিকে তিনি 'খলিশা' বা সরকারি খাস জমিরূপে পরিণত করেন। 'খালিশা' জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে রাজকোষের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষকদের দুঃসময়ে তিনি তাদের কৃষিঋণ (তাক্কাভি) দেওয়ার ব্যবস্থা করায় কৃষকেরা দুঃসময় কাটিয়ে ঠিক সময়মত খাজনা পরিশোধ করার সুযোগ পেত। এইভাবে তিনি বাংলা সরকারের রাজকোষের আমদানি বৃদ্ধি করিয়েছিলেন। তবে তাঁর ইজারাদারি প্রথা কৃষকদের পক্ষে বেশ দুঃসহও হয়ে পড়ত। ন্যায্য রাজস্ব আদায় হবে, বে-আইনী কোন 'শেস' আদায় চলবে না এটা মুর্শিদকুলি খাঁর নীতি ছিল। তবে জমিদার ও কৃষকদের কাছ থেকে ধার্য খাজনা আদায়ের জন্য তিনি বেশ নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতেন। মুর্শিদকুলি খাঁর ভূমি সংক্রান্ত নীতির পরিণামে পুরাতন আমলের জমিদারগণের অনেকেই বিতাড়িত হয়েছিলেন। 'জমি হিসেবে খাজনা' দিতে ইচ্ছুক ভুঁইফোঁড় ইজারাদার শ্রেণী তাঁর সময় থেকে পুরনো জমিদারদের স্থান অধিকার করেছিল।

মুর্শিদকুলি খান্ ও তাঁর উত্তরাধিকারী সরকারী চাকুরির ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কেই সমান সুযোগ-সুবিধা দিতেন। দুই

সম্প্রদায়েরই উপযুক্ত ব্যক্তিরা রাজ্যের সামরিক ও অসামরিক পদে নিযুক্ত হতেন। এই সময়ে বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। জমির ইজারাদার নিয়োগের সময় মুর্শিদকুলি খান্ স্থানীয় জমিদার ও মহাজন (কুসিদজীবী) শ্রেণীর লোকই পছন্দ করতেন। এদের মধ্যে হিন্দুদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। এইভাবে মুর্শিদকুলি বাংলায় একটি নূতন অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।

বাংলার তিনজন নবাবই বুঝেছিলেন যে দেশের ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রসার রাজা ও প্রজা এই উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থেই প্রয়োজন। এই কারণে তাঁরা দেশী-বিদেশী সব শ্রেণীর ব্যবসায়ীকেই ব্যবসায় করতে উৎসাহ দিতেন। নদীপথে ও রাজপথে চোর ডাকাতের উপদ্রব রোধ করার জন্য তাঁরা পথের দুপাশে কিছুদূর অন্তর অন্তর 'থানা' বা 'চৌকি' স্থাপন করিয়েছিলেন। রাজকর্মচারীগণের গোপন ব্যবসায়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হত। শুল্ক আদায়কালে যেন কোন দুর্নীতি প্রশ্রয় না পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হত। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নবাবরা বিদেশী বাণিজ্য সংস্থা-গুলির কাজকর্মের দিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখতেন, যেন বিদেশী বণিক ও তাদের কর্মচারীগণ তাদের প্রতি প্রদত্ত ব্যবসায়ের সুযোগগুলির কোনরকম অসদ্ব্যবহার না করতে পারে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণকে নবাবেরা দেশের প্রচলিত আইনকানুন মেনে চলতে বাধ্য করতেন। অন্যান্য বণিকদের দেয় শুল্ক এদের কাছ থেকেও আদায় করা হত। আলিবর্দী খান্ ইংরাজ ও ফরাসী বণিকদের কলকাতা ও চন্দননগরের বাণিজ্যকুঠীতে দুর্গ বানানোর অনুমতি দেননি। বাংলার নবাবেরা অবশ্য একটি ব্যাপারে তাঁদের অদূরদর্শিতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের দাবি আদায়ের জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের যে মনোভাব গ্রহণ করেছিল তা' ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। 1707 খ্রীষ্টাব্দের পর, নবাবেরা তা কঠোর হস্তে দমনের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। কোম্পানীর ভীতি প্রদর্শনের মোকাবিলা করার মত ক্ষমতা নবাবদের যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তাঁরা এটা বিশ্বাসই করতে পারেননি যে একটা সামান্য ব্যবসায়ী কোম্পানী তাঁদের কোন ক্ষতিসাধনে সক্ষম হবে। ইংরাজ কোম্পানী যে শুধু একটা বাণিজ্য সংস্থা নয়, তারা যে তদানীন্তন-কালের একটি প্রবল জবরদস্ত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিভূ এটা

বাংলার নবাবেরা তখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই অজ্ঞতা এবং বহির্জগতের সঙ্গে সর্ববিধ সম্পর্কহীনতার জন্য বাংলাদেশকে খুব কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। বাইরের জগতের কোন খোঁজখবর এঁদের জানা থাকলে এঁরা বুঝতে পারতেন যে প্রতীচ্যদেশের এই ব্যবসায়ী কোম্পানী-গুলি আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় কিভাবে শোষণ-লুণ্ঠনের দ্বারা ঐসব অঞ্চলে কি ধরনের বিভীষিকার সৃষ্টি করে চলেছে।

বাংলার নবাবেরা একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারেও শৈথিল্য দেখিয়েছিলেন। এই ভুলের জন্য তাঁদের যথেষ্ট ভুগতে হয়েছিল। এই শৈথিল্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মুর্শিদকুলি খানের সৈন্যবাহিনী ছিল 2000 অশ্বারোহী ও 4000 পদাতিক সৈন্য নিয়ে গঠিত। আলিবর্দী খান্‌কে মারাঠাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বিব্রত থাকতে হয়েছিল। শেষকালে, বাধ্য হয়ে ওড়িশার একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁকে মারাঠাদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। 1756-57 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আলিবর্দীর উত্তরাধিকারী নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, তখন নবাবের সৈন্যবাহিনীর স্বল্পতাই হয়ে উঠেছিল তাদের বিজয়লাভের বেশ বড় একটা কারণ। বাংলার নবাবগণ রাজ-কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কাজী ও মুফ্‌তি শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণও উৎকোচ গ্রহণে অভ্যস্ত হয়েছিল। নবাবী শাসনের আইনকানুন ও নীতিগুলিকে ফাঁকি দিতে বিদেশী বাণিজ্য সংস্থাগুলি রাজকর্মচারীদের এই দুর্বলতার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করত।

আউধ্ (অযোধ্যা)

স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন আউধ্ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাদাত খান্‌বুরহান্ উল্ মুলুক্। ইনি 1722 খ্রীষ্টাব্দে আউধের গভর্নর (সুবাদার) পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি অতিশয় সাহসী, উদ্যমী, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে যখন সুবাদার নিযুক্ত করা হয় তখন আউধের সর্বত্র জমিদারগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এরা ভূমিরাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেছিল। তার উপর নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গঠন ও দুর্গ নির্মাণ করে এরা দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে অমান্য করার মত ঔদ্ধত্যও দেখানো

হিন্দু-

শুরু করেছিল। কয়েক বৎসর ধরে সাদাৎ খান্‌কে এদের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত লড়াই চালাতে হয়েছিল। সাদাৎ খান্‌ বড় বড় জমিদারদের বে-আইনি কাজকর্ম দমন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জমিদারদের এইভাবে জব্দ করে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বৃদ্ধি করাতে পেরেছিলেন। পরাজিত জমিদারদের সকলকেই অবশ্য উৎখাত করা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পরাজিত জমিদারদের হাতে এই শর্তে জমিদারি ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল যে ভবিষ্যতে তাদের দিল্লীর অনুগত হয়ে থাকতে হবে এবং সরকারের পাওনা নিয়মিতভাবে মিটিয়ে দিতে হবে। জমিদারগণ কিন্তু তাদের অবাধ্যতা বজায় রেখেছিল। যখনই নবাবের শাসন কিছুটা শিথিল হত অথবা যখনই তিনি অন্যক্ষেত্রে কর্মব্যস্ত থাকতেন ঠিক তখনই সুযোগমত এরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে নবাবী শাসনকে আঘাত হানত। সাদাৎ খানের এক উত্তরাধিকারী সফ্‌দার জঙ্গ্‌ এদের সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন "আউধের জমিদার বা প্রধানগণ চোখের নিমেষে একটা উপদ্রব সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল। এরা দাক্ষিণাত্যের মারাঠাদের চেয়েও অধিক বিপজ্জনক।"

সাদাৎ খান্‌ 1723 খ্রীষ্টাব্দে নূতনভাবে ভূমি-বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, যথাযথ ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করে তিনি দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। বড় বড় জমিদারদের উৎপীড়ন থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে তাঁর ভূমিবন্দোবস্ত নীতি বেশ কার্যকরী হয়েছিল।

বাংলার নবাবদের মতই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কাউকে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন না। তাঁর সেনাধ্যক্ষ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু। বিদ্রোহী জমিদারদের সায়েস্তা করার সময়ও তিনি কোন ধর্মান্ধতা দেখাতেন না, অর্থাৎ অপরাধী মুসলমান ধর্মাবলম্বী হলেও সে রেহাই পেত না। তাঁর সৈন্যবাহিনী ছিল সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত, এরা বেতনও ভাল পেত। সাদাৎ খানের শাসনব্যবস্থাও ছিল বেশ দক্ষ। 1739 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে কার্যতঃ তিনি একরকম স্বাধীন নৃপতিতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা যাতে পুরুষানুক্রমে অযোধ্যা প্রদেশের নবাব থাকতে পারেন সে ব্যবস্থাও পাকা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সফ্‌দার জঙ্গ্‌ নবাব হন। একই সঙ্গে তিনি 1748 খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাটের

উজীরের পদও লাভ করেন। এই সূত্রে এলাহাবাদ প্রদেশের শাসনকর্তৃত্বও তিনি লাভ করেন।

1754 খ্রীষ্টাব্দে সফ্‌দর জঙ্গের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সুশাসনে আউধ্‌ ও এলাহাবাদ প্রদেশের প্রজাবৃন্দ দীর্ঘকাল ধরে বেশ শান্তিতেই বাস করতে পেরেছিল। তিনিও দুর্দান্ত জমিদারদের বশে আনতে পেরেছিলেন। মারাঠা নায়কগণের সঙ্গে তিনি একটা সমঝোতা গড়ে তুলেছিলেন যার ফলে তাঁর রাজত্বে মারাঠাদের হানাদারি বন্ধ হয়েছিল। রোহিলা ও বাঙ্গাশ্‌ পাঠানদের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালিয়েছিলেন। 1750-51 খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গাশ্‌ নবাবদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি মারাঠা ও জাঠ্‌দের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। এর প্রতিদানে তিনি প্রত্যহ মারাঠা ও জাঠ্‌দের যথাক্রমে 25,000 ও 15,000 টাকা দৈনিক ভাতা দিতেন। পরবর্তীকালে তিনি পেশোয়ার সঙ্গে এমন একটা চুক্তি করেন যার সর্ত ছিল এই যে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আমেদ শা আবদালির আক্রমণ রুখতে পেশোয়া সাহায্য করবেন এবং ভারতের পাঠান শক্তি এবং রাজপুত রাজাদের বিদ্রোহকালেও তাঁকে সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে সাহায্য করতে হবে। সর্ত আরও ছিল যে এই সহায়তার জন্য পেশোয়া পাবেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, তাঁকে পাঞ্জাব ও সিন্ধু সহ উত্তর ভারতের কয়েকটি জেলার চৌথ্‌ আদায়ের অধিকারও দেওয়া হবে, এ ছাড়াও তিনি আগ্রা ও আজমীরের গভর্নর বা সুবাদার পদ লাভ করবেন। তবে এই চুক্তি কার্যকরী হয়নি কারণ পেশোয়া শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে সফ্‌দার জঙ্গের বিরোধী গোষ্ঠীর দলে চলে গিয়েছিলেন। এই বিরোধী গোষ্ঠীও তাঁকে আউধ্‌ ও এলাহাবাদের সুবাদার পদে নিয়োগের প্রলোভন দেখিয়েছিল।

সফ্‌দার জঙ্গ্‌ তাঁর রাজ্যে বিচার বিভাগে ন্যায় বিচার লাভের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। চাকুরিদানের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যোগ্য প্রার্থীকেই চাকুরির সুযোগ দিতেন। তাঁর রাজত্বের সর্বোচ্চ পদটির অধিকারী ছিলেন একজন হিন্দু। এঁর নাম ছিল মহারাজা নবাব রায়।

নবাবদের দীর্ঘস্থায়ী শাসনকালে শান্তি ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতার পরিবেশে সমৃদ্ধ আউধ্‌ নবাব দরবারের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল এটাকে লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে।

লক্ষ্ণৌ বরাবরই ছিল আউধ্ অঞ্চলের একটা বিশিষ্ট জনপদ। 1775 খ্রীষ্টাব্দের পর এটাই ছিল আউধ্ নবাবদের রাজধানী। অতঃপর কলা ও সাহিত্যচর্চায় লক্ষ্ণৌ দিল্লীর সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। হস্তশিল্প-কলা কেন্দ্র হিসেবেও এর সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

সফ্দার জঙ্গের ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রের মান বেশ উন্নত ছিল। আজীবন তিনি একটি মাত্র স্ত্রীতেই আসক্ত ছিলেন। বস্তুতঃ হায়দ্রাবাদ, বাংলা ও আউধ্ এই তিনটি স্বাধীন রাজ্যের প্রবর্তকগণ নিজাম-উল্-মুলুক, মুর্শিদকুলি ও আলিবর্দি খান্ এবং সাদাৎ খান্ ও সফ্দার জঙ্ এঁরা সকলেই ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে উচ্চনৈতিক চরিত্রের অধিকারী। এঁরা প্রায় সকলেই সরল ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণ-ভাবে এই কথাই প্রচারিত হয়ে থাকে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সকল বিশিষ্ট অভিজাত ব্যক্তিই ছিলেন বিলাসব্যসনাসক্ত ও অমিতব্যয়ী। উপরোক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে যে সকল অভিজাত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার অভিযোগটি সর্বাংশে সত্য নয়। জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহারে অথবা রাজনৈতিক লেনদেনের কালে অবশ্য এঁদের ষড়যন্ত্র, জালিয়াতি ও বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ গ্রহণে কোন কুণ্ঠা দেখা যেত না।

মহীশূর

হায়দ্রাবাদের পরেই দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল সেটি ছিল মহীশূর। এটি গড়ে উঠেছিল হায়দার আলির নায়কতায়। মহীশূর রাজ্যটি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবসানকাল থেকে এ পর্যন্ত তার স্বাধীনতা কোনরকমে বজায় রেখেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় নানজারাজ (সর্বাধিকারী) ও দেবরাজ (দুলওয়াই) নামে দুজন মন্ত্রী রাজা চিক্কা কৃষ্ণ-রাজকে পুত্তলিকার মত ক্ষমতাচ্যুত করে মহীশূরের শাসনকর্তৃত্ব অধিকার করে বসেছিলেন। হায়দর আলি 1721 খ্রীষ্টাব্দে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মহীশূর সৈন্যবাহিনীর একজন নীচুদরের সেনানায়ক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল। লেখাপড়া না জানলেও তাঁর বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন উদ্যমী, সাহসী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। একজন দক্ষ সেনানায়ক এবং চতুর কূটনীতিজ্ঞও তিনি ছিলেন।

মহীশূরে বিংশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহকালে হায়দর আলি তাঁর উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। যেসব সুযোগ তাঁর সামনে এসেছিল সেগুলির সদ্ব্যবহার করে মহীশূরের সৈন্যবাহিনীতে তিনি উচ্চস্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্যদেশের রণ-নীতি কৌশলগুলি আয়ত্ত করে তিনি নিজের সৈন্যবাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। ফরাসী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে 1755 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডিণ্ডিগুলে একটি আধুনিক অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। 1761 খ্রীষ্টাব্দে নান্‌জারাজকে পরাজিত করে তিনি মহীশূর রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করেন। বিদ্রোহী পলিগার (জমিদার)-দের সায়েস্তা করে তিনি বিদ্‌নুর, সুণ্ডা, সেরা, কানাড়া ও মালাবার অঞ্চল জয় করেন। তিনি যখন মহীশূরের শাসনকর্তৃত্ব হাতে পান তখন মহীশূর ছিল একটি কলহ-দীর্ণ দুর্বল রাজ্য। অল্পকালের মধ্যেই হায়দর আলি মহীশূরকে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। হায়দর আলি পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর প্রধান 'দেওয়ান' ও অন্যান্য বহু উচ্চ-রাজকর্মচারী ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মারাঠাসর্দার, নিজাম ও ইংরাজদের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রামরত থাকতে হয়েছিল। 1769 খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনঃ পুনঃ ব্রিটিশদের যুদ্ধে হারাতে হারাতে মাদ্রাজ পর্যন্ত তাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন। 1782 খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র টিপু তাঁর উত্তরাধিকার লাভ করেন।

1799 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের হাতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত টিপু ছিলেন মহীশূরের শাসনকর্তা। ইনি ছিলেন বেশ জটিল চরিত্রের মানুষ। নূতন নূতন বিষয় প্রবর্তনের ঝোঁক তাঁর ছিল। কালের সঙ্গে সমতালে চলার জন্য তিনি নূতন ধরনের পঞ্জিকা, নূতন ধরনের মুদ্রা-ব্যবস্থা এবং নূতন ধরনের ওজনের মান প্রবর্তনের আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারে বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থের সংগ্রহ ছিল, এর মধ্যে ছিল ধর্ম, ইতিহাস, রণ-নীতি, চিকিৎসা ও গণিতের গ্রন্থ। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা ছিল। শ্রীরঙ্গপত্তনে তিনি 'স্বাধীনতা বৃক্ষ' নাম দিয়ে একটি গাছের চারা বসিয়েছিলেন। একটি 'জ্যাকোবিন ক্লাবের'ও তিনি সদস্য হয়েছিলেন। তৎকালে ভারতের সর্বত্র সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব প্রায়ই দেখা যেত। টিপুর সৈন্যবাহিনী শেষ সময় পর্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে লড়াই করে

তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। এই ঘটনা থেকে টিপুর সংগঠন কুশলতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। টিপু জায়গীরদান প্রথা লোপ করার চেষ্টা করেন, এর ফলে রাজকোষের আয় বেড়েছিল। পলিগার (জমিদার)-দের পুরুষানুক্রমিকভাবে সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার বিলোপের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। তাঁর ভূমিরাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বেশ চড়া ছিল—তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য রাজ্যের মতই তার রাজত্বে উৎপাদনের $\frac{1}{3}$ অংশ রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল। তবে তিনি অন্যায়ভাবে কোন বাড়তি কর (সেস) আদায় রোধ করেছিলেন। রাজস্ব মকুব বিষয়ে তিনি উদারতারও পরিচয় দিতেন।

তাঁর পদাতিক বাহিনীকে ইউরোপীয় ধরনে 'মাস্কেট' বন্দুক ও বেয়নেট্ দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছিল। অবশ্য এইগুলি মহীশূর রাজ্যেই নির্মিত হত। 1796 খ্রীষ্টাব্দের পরে টিপু একটা আধুনিক ধরনের নৌবহর গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দুটি জাহাজঘাটা (ডক্-ইয়ার্ড) নির্মাণ করান, নৌবাহিনীর জাহাজের দুটি আদর্শ বা মডেল টিপু নিজেই তৈরী করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে টিপু শুদ্ধ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি বিলাসীও ছিলেন না। সৈন্য পরিচালনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। তিনি দুঃসাহসীও ছিলেন। তবে তাঁর দোষ ছিল এই যে তিনি ভেবেচিন্তে কাজ করতেন না। কিছুটা অস্থিরচিত্ততাও তাঁর ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর যে কোন ভারতীয় শাসকদের চেয়ে আগে এবং পরিপূর্ণ-ভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ শক্তি শুধু দাক্ষিণাত্যে নয় সমগ্র ভারতের যে কোন শক্তির পক্ষেও ভীতি ও বিপদের কারণ। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির শত্রুরূপে অবিচল দৃঢ়তা সহকারে তিনি তাদের বিরুদ্ধে অবিচলভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এর ফলে ইংরাজের তাঁকে ভারতে তাদের ভয়ঙ্করতম শত্রুরূপে গণ্য করতে আরম্ভ করেছিল।

তখনকার দিনের সাধারণ অর্থনৈতিক পশ্চাদপরতার পরিপ্রেক্ষিতে মহীশূর রাজ্যের সমৃদ্ধি বিশেষ উন্নত ছিল না। তত্রাচ, হায়দর আলি ও টিপুর শাসনকালে অনতি অতীতকালের এবং দেশের অন্য স্থানের তুলনায় মহীশূর রাজ্যের বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। 1799 খ্রীষ্টাব্দে টিপুকে পরাজিত ও নিহত করে ইংরাজেরা যখন মহীশূর রাজ্য দখল করেছিল তখন তারা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল যে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত মাদ্রাজের কৃষক-

সমাজের থেকে মহীশূরের কৃষকসমাজ অনেক বেশী পরিমাণ সমৃদ্ধির অধিকারী। 1793 থেকে 1798 পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন সার জন শোর। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন যে, "টিপুর রাজ্যমধ্যে প্রজাবৃন্দের স্বার্থ সুরক্ষিত, কাজ করতে তারা উৎসাহিত হয়, কারণ শ্রমের ফল তারা ভোগ করতে পায়।" আধুনিক ধারায় শিল্প-বাণিজ্য প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম সম্ভবতঃ টিপুই উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতের শাসককুলের মধ্যে একমাত্র তিনিই এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে সামরিক শক্তি শুধু কোন একটা রাজ্যের আর্থিক সুস্থিতির উপরই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বিদেশী শিল্প-বিশেষজ্ঞ আমদানি করে তাদের সাহায্যে তিনি আধুনিক শিল্পোদ্যোগ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। রাজ্যের অনেকগুলি শিল্পসংস্থাকে সরকারী অর্থসাহায্যও দেওয়া হত। বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্স, তুরস্ক, ইরাণ ও পেগুতে রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছিলেন। চীনের সঙ্গেও তাঁর রাজ্যের ব্যবসায় সংযোগ ছিল। এমন কি ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলির আদর্শে ব্যবসায়ের জন্য তিনি একটি যৌথ সংস্থা বা কোম্পানী গঠনেরও চেষ্টা করেছিলেন।

কোন কোন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টিপুকে ধর্মোন্মাদরূপে চিত্রিত করেছেন। বাস্তব ঘটনাগুলি থেকে এটা সত্য বলে প্রমাণিত করা যায় না। স্বধর্মে তাঁর নিষ্ঠা অবশ্যই ছিল, কিন্তু কার্যতঃ তিনি পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। অন্য ধর্মের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব উদারই ছিল। 1791 খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনী কর্তৃক শৃঙ্গেরী মঠ লুণ্ঠিত হওয়ার পর টিপু সারদাদেবীর মূর্তি নির্মাণের জন্য অর্থদান করেছিলেন। তিনি এই মন্দিরসহ অপর কয়েকটি মন্দিরে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য দিতেন। শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের দূরত্ব টিপুর প্রাসাদ থেকে ছিল ১০০ গজ মাত্র।

কেরল

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেরল রাজ্য ছিল অনেকগুলি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী ও রাজাদের অধীন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি রাজ্য ছিল—জামোরিণের অধীন কালিকট, চিরাক্কল, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর। 1729 খ্রীষ্টাব্দে রাজা মার্তণ্ডবর্মার অধীনে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। মার্তণ্ডবর্মা অষ্টাদশ শতকের একজন বিশিষ্ট রাজনীতি বিশারদ

নৃপতি ছিলেন। অসাধারণ দূরদৃষ্টি, দৃঢ়সঙ্কল্প, শৌর্য ও সাহস তাঁর ছিল। সামন্ত রাজাদের পরাস্ত করে তিনি কুইলন ও এলায়াডাম অধিকার করেন। ডাচ্‌দের পরাস্ত করে তিনি কেরলে তাদের শক্তি নির্মূল করে দিয়েছিলেন। ইউরোপীয় সৈন্যের সাহায্যে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সংগঠিত করেছিলেন। আধুনিক সমরাস্ত্র দ্বারা তাদের শক্তিশালী করা হয়েছিল। একটি আধুনিক ধরনের সমরাস্ত্রের ভাণ্ডারও তিনি গড়ে তুলেছিলেন। মার্তণ্ডবর্মা তাঁর নবগঠিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে উত্তরাভিমুখে অভিযান চালিয়ে ত্রিবাঙ্কুরের রাজ্যসীমা কন্যাকুমারী থেকে কোচিন পর্যন্ত বিস্তৃত করে নিয়েছিলেন। রাজ্যমধ্যে সেচব্যবস্থার উন্নয়ন, পথনির্মাণ, যাতায়াতের সুবিধার জন্য খাল খনন প্রভৃতি কাজ তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারেও তিনি উৎসাহদাতা ছিলেন।

1763 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কেরলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর ও কালিকট এই তিনটি বৃহৎ রাজ্যের একটি না একটির মধ্যে সম্মিলিত হয়ে গিয়েছিল। হায়দর আলি 1766 খ্রীষ্টাব্দে কেরল আক্রমণ করে কোচিন পর্যন্ত উত্তর কেরল ভূভাগ দখল করে নিয়েছিলেন। এর মধ্যে কালিকটের জামোরিণ অধিকৃত এলাকাও ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মালয়ালম সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। এর মূলে ছিল কেরলের সাহিত্যানুরাগী রাজা-মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রম্‌ সংস্কৃতচর্চার একটি বিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। মার্তণ্ডবর্মার উত্তরাধিকারী রামবর্মা স্বয়ং ছিলেন সুপণ্ডিত, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, নিপুণ অভিনেতা এবং একজন বিশেষ বিদগ্ধ পুরুষ। তিনি বেশ ভালভাবে ইংরাজী কথোপকথনেও অভ্যস্ত ছিলেন। ইউরোপ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। লণ্ডন, কলিকাতা ও মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি তিনি নিয়মিতভাবে পাঠ করতেন।

দিল্লী সংলগ্ন অঞ্চল—রাজপুত রাজ্যসমূহ

মুঘল শক্তির দুর্বলতার সুযোগে প্রধান প্রধান রাজপুত রাজ্যগুলি বাস্তবসম্মতভাবে নিজেদের স্বাধীনতার চেষ্টাই শুধু চালিয়ে যায়নি, নিজের

নিজের এলাকার বাইরে সাম্রাজ্যের অন্যত্রও নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টাও তারা করেছিল। মুঘল সম্রাট ফর্‌রুখ্‌সিয়র ও মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে অম্বর ও মাড়োয়ারের দুই রাজা আগ্রা, গুজরাট ও মালোয়ার মত প্রধান প্রধান প্রদেশের সুবাদার বা গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রাজপুতানার রাজ্যগুলির মধ্যে সংহতির অভাব ছিল। বড় বড় রাজ্যগুলি সংলগ্ন ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি গ্রাস করে ফেলত। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির রাজাদের মধ্যে অ-রাজপুত রাজাও থাকত। বড় ধরনের রাজপুত রাজ্যগুলিতে গৃহযুদ্ধ ও কলহবিবাদ লেগেই থাকত। এই সব রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সেই একই ধরনের দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত দেখা যেত যেমনটি ছিল মুঘল দরবারের মধ্যে। মুঘল দরবারে পুত্র কর্তৃক পিতৃহত্যার ঘটনা ঘটত। ঠিক একইভাবে মাড়োয়ার নৃপতি অজিত সিংহ তাঁর পুত্রের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বাধিক বিশিষ্ট রাজপুত নৃপতি ছিলেন অম্বররাজ সওয়াই জয়সিংহ। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কূটনীতিজ্ঞ, আইন-প্রণেতা ও সংস্কারক। এ গুণগুলি ছাপিয়ে তাঁর বিজ্ঞানমুখী চরিত্রটিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কারণ তিনি এমন একটা সময়ে বিজ্ঞান-মনস্কতা দেখিয়েছিলেন যে সময়ে সাধারণ ভারতবাসী বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিল। জাঠ অধিকৃত ভূখণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে তিনি জয়পুর শহরের পত্তন করেন। জয়পুর শহর তাঁর প্রযত্নে শিল্পকলা ও বিজ্ঞান চর্চার একটি সুবিখ্যাত পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। রীতিমত নক্সা ফেঁদে প্রযুক্তিবিজ্ঞানসম্মতভাবে জয়পুর শহর নির্মিত হয়েছিল। এর প্রশস্ত রাজপথগুলি আড়াআড়িভাবে যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে সমকোণের সৃষ্টি হয়েছে।

সবকিছু গুণ ছাপিয়ে জয়সিংহ ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ্‌। দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, বারাণসী ও মথুরায় তিনি মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন। এর যন্ত্রপাতিগুলি ছিল সূক্ষ্ম ও আধুনিক যুগোচিত। এই যন্ত্রগুলির মধ্যে কিছু কিছু ছিল তাঁর নিজেরই আবিষ্কৃত। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণাগুলি পরীক্ষার পর সঠিক বলেই প্রমাণিত হত। জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গণনার জন্য তিনি কতকগুলি 'সারণী' (টেবল্‌স) তৈরী করেছিলেন, এগুলি 'জিজ্‌ মহম্মদশাহী' নামে পরিচিত ছিল।

প্রণীত জ্যামিতি গ্রন্থ (এলিমেণ্টস্ অফ জিওমেট্রি) তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত করিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর চেষ্টায় পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত ত্রিকোণমিতি, নেপিয়ায়ের সংবধমান (Logarithm)-এর গঠন ও প্রয়োগ-পদ্ধতি ইত্যাদি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

জয়সিংহ একজন সমাজসংস্কারকও ছিলেন। রাজপুত সমাজে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করার বাধ্যতামূলক রেওয়াজ ছিল। এই অর্থব্যয়ের ভয়ে অনেক সময় দরিদ্র পরিবারে জন্মকালেই শিশুকন্যাকে হত্যা করা হত। জয়সিংহ আইন প্রণয়ন করে এই কুপ্রথা রোধের চেষ্টা করেছিলেন। 1699 থেকে 1743 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিশিষ্ট নৃপতি প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর ধরে জয়পুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জাঠ্গণ

কৃষিজীবী এই সম্প্রদায়ের বাস ছিল দিল্লী, আগ্রা ও মথুরা অঞ্চলে। মুঘল শাসনকর্তাদের অত্যাচারে মথুরা অঞ্চলের জাঠ্গণ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল। এরা জাঠ জমিদারগণের নেতৃত্বে 1669 খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। 1688 খ্রীষ্টাব্দেও তারা আর একবার বিদ্রোহ করেছিল। এই দুটি বিদ্রোহই কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছিল কিন্তু এই অঞ্চলের অবস্থা অশান্তই থেকে গিয়েছিল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর জাঠেরা দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বেও বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল। নির্যাতিত কৃষকদের বিক্ষোভরূপে যে অশান্তির সূত্রপাত সেটা জাঠ্-জমিদারদের নেতৃত্বে একটা লুণ্ঠন পর্বের আকার ধারণ করেছিল। এই জাঠ্ বিদ্রোহীগণ ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান বা জমিদার-প্রজা নির্বিশেষে সকলেরই ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। দিল্লীর দরবারে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারেও জাঠেরা অংশ নিত এবং নিজেদের স্বার্থে যখন যাকে সুবিধা তাকেই সমর্থন করত। ভরতপুরের জাঠ্ রাজ্য চূড়ামন ও বদনসিং কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাঠ্-শক্তি সুরযমলের রাজত্বকালে তাঁরই চেষ্টায় গৌরবের চরমসীমায় পৌঁছেছিল। ইনি 1756 থেকে 1763 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি একজন অতিদক্ষ প্রশাসক, অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ও নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। পূর্বে গঙ্গা ও দক্ষিণে চম্বল নদী, পশ্চিমে আগ্রা ও উত্তরে দিল্লী প্রদেশের অন্তর্বর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর রাজ্যের

মধ্যে আগ্রা, মথুরা, মীরাট ও আলিগড় জেলাগুলিও ছিল। একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক তাঁর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছেন :

"তিনি সাধারণ চাষীর পোষাক পরতেন, নিজের মাতৃভাষা ব্রজভাষায় কথা বলতেন, কিন্তু জাঠ্ জাতির মধ্যে তিনি গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। বুদ্ধি বিবেচনায়, রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় সমগ্র হিন্দুস্তানের মধ্যে একমাত্র আসফ ঝা বাহাদুর তাঁর সমতুল্য ছিলেন।"

1763 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর জাঠ্ রাজ্যের পতন শুরু হয়। রাজ্যটি খণ্ড-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ছোটখাট জমিদারদের অধীনে চলে গিয়েছিল। লুঠতরাজই এদের পেশা হয়ে উঠেছিল।

বঙ্গাস পাঠান ও রোহিলাগণ

মহম্মদ খান বঙ্গাস নামে এক আফগান ভাগ্যান্বেষী বর্তমান আলিগড় ও কানপুরের মধ্যবর্তী ফারুখাবাদ অঞ্চলে ফরুকখ্‌সিয়র ও মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে নিজস্ব একটি রাজ্য স্থাপন করেন। নাদির শা'র আক্রমণের পরে, মুঘল সাম্রাজ্যে শাসনব্যবস্থার শৈথিল্যের যুগে এমনিভাবে আলি মহম্মদ খানও একটি পৃথক রাজ্য গড়ে নিয়েছিলেন। হিমালয়ের সানুদেশে দক্ষিণে গঙ্গা ও উত্তরে কুমায়ুনের পর্বতমালার অন্তর্বর্তী এই ভূভাগ রোহিল-খণ্ড নামে পরিচিত। প্রথমে রোহিলখণ্ডের রাজধানী ছিল বেরিলীর আওলান নামক স্থানে, পরে রাজধানী রামপুরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। রোহিলারা আউধ্, দিল্লী ও জাঠ্‌দের বিরুদ্ধে অবিরতই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত।

শিখগণ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে গুরু নানক প্রবর্তিত শিখ ধর্ম পাঞ্জাবের জাঠ্ ও অন্যান্য তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। গুরু হরগোবিন্দ সিং-এর সময়ে (1606-1645) একটি সংগ্রামী মনোবৃত্তি সম্পন্ন যোদ্ধুগোষ্ঠীতে শিখদের রূপান্তর শুরু হয়েছিল। তবে শিখদের একটি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিরূপে অভ্যুত্থান সম্ভবপর হয়েছিল দশম বা শেষ শিখগুরু গুরু গোবিন্দ সিং-এর নেতৃত্বে। 1699 খ্রীষ্টাব্দ থেকে গুরু গোবিন্দ

সিং আওরঙ্গজেব ও পাঞ্জাব অঞ্চলের পার্বত্য রাজাদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর গুরু গোবিন্দ সিং সম্রাট বাহাদুর শাহের দলে যোগদান করেন। তাঁকে 5000 পদাতিক ও 5000 সওয়ার (অশ্বারোহী) বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে দরবারের অভিজাত ব্যক্তিরূপে গণ্য করা হয়েছিল। বাহাদুর শা'র সঙ্গে দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় একজন পাঠান অনুচর বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করেছিল।

গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর 'গুরু' পদের বিলোপ সাধিত হয়। অতঃপর শিখদের নেতৃপদের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁরই বিশ্বস্ত শিষ্য বান্দা সিং; ইনি বান্দা বাহাদুর নামেই সমধিক পরিচিত। বান্দা পাঞ্জাবের শিখ কৃষক সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করে মুঘল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আট বছর ধরে সাহসিকতার সঙ্গে অসম সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। 1715 খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুঘলের হাতে বন্দী হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বান্দার মৃত্যুতে শিখদের রাজত্ব স্থাপনের উচ্চাশা ব্যাহত হয়েছিল। তাদের সামরিক শক্তিও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

নাদির শাহ্ ও আহম্মদ শা আবদালির অভিযানের ফলে পাঞ্জাবে মুঘল শাসনব্যবস্থার যে অবনতি ঘটেছিল তার সুযোগ পেয়ে শিখেরা আর একবার মাথা তুলেছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণের পরবর্তী অস্থির পরিস্থিতির সুযোগে লুণ্ঠন চালিয়ে তারা নিজেদের সম্পদ ও সামরিক শক্তি দুই-ই বাড়িয়ে নিতে পেরেছিল। পাঞ্জাব থেকে আবদালির প্রত্যাবর্তনের পর শাসনব্যবস্থায় যে শূন্যতা দেখা দিয়েছিল শিখেরা তার সুযোগ নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিল। 1765 থেকে 1800 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শিখেরা সমগ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে নিয়েছিল। শিখেরা নিজেদের অধিকৃত রাজ্য বারটি অংশ বা মিশালে বিভক্ত করে নিয়েছিল। একটি অংশ অপরটির সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ থাকত। এই মিশালগুলি সকলের সমানাধিকারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি মিশালের যতজন প্রজা বা মানুষ আছে কোন কর্মপন্থা গ্রহণের আগে তাদের মত প্রকাশের অধিকার ছিল। সর্দার বা রাজকর্মচারী নিযুক্তির ব্যাপারেও ছিল এই একই নিয়ম। কিন্তু ক্রমশঃ মিশালের এই গণতান্ত্রিক চরিত্র ম্লান হয়ে উঠেছিল। শক্তিশালী সর্দারদের নির্দেশেই এইগুলি পরিচালিত হত। 'খালসা'দের মধ্যে ঐক্য

ও সৌভ্রাত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে অপসৃত হয়েছিল এর কারণ সর্দারেরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হতেন এবং নিজেকে অন্য-নিরপেক্ষ স্বাধীন শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন।

রণজিৎ সিংহের অধীন পাঞ্জাব

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুকেরচাকিয়া নামক মিসাল-এর প্রধান বা সর্দার রণজিৎ সিং-এর অভ্যুদয় হয়। রণজিৎ সিংহ নেতৃসুলভ গুণাবলী সঙ্গে নিয়েই যেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি শক্তিমান সাহসী যোদ্ধা, দক্ষ প্রশাসক এবং কুশলী কূটনীতিবিশারদ ছিলেন। 1799 খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাহোর অধিকার করেন। 1802 খ্রীষ্টাব্দে তিনি অমৃতসরও দখল করেন। শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরবর্তী সমস্ত শিখ সর্দারদের নিজের শাসনাধীনে এনে তিনি পাঞ্জাবে নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুকাল পর তিনি কাশ্মীর, পেশোয়ার ও মুলতান জয় করে তা' নিজের রাজ্যভুক্ত করেন। পুরানো আমলের শিখ সর্দারেরা তাঁর রাজত্বকালে বড় বড় জমিদার বা জায়গীরদারে পরিণত হয়েছিল। মুঘল আমলের রাজস্ব-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন তিনি করেননি। মোট উৎপন্ন শস্যের পঞ্চাশ শতাংশের উপর রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হত।

ইউরোপীয় শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষণপ্রাপ্ত ইউরোপীয় ধাঁচের একটি সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী রণজিৎ সিংহের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। তাঁর নবগঠিত সৈন্যবাহিনীতে শিখ ছাড়াও গুর্খা, বিহারী, ওড়িয়া, পাঠান, ডোগ্‌রা ও পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্য সংগৃহীত হয়েছিল। কামান নির্মাণের জন্য লাহোরে তিনি আধুনিক ধরনের একটি ঢালাই কারখানা স্থাপন করেছিলেন। এটি মুসলমান গোলন্দাজদের দ্বারা পরিচালিত হত। জানা গিয়েছে যে এশিয়া মহাদেশে তৎকালে তাঁর সৈন্য-বাহিনীর স্থান ছিল দ্বিতীয়। প্রথম স্থানের অধিকারী ছিল ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

রাজকর্মচারী অথবা মন্ত্রী নির্বাচনে রণজিৎ সিংহের বিশেষ পটুতা ছিল। সম্ভবত্ রাজসভায় বহু অসাধারণ ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে রাজনৈ পরধর্মসহিষ্ণু ও উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান শিখ শিখগুরু ন কিন্তু তাঁর ধর্মদৃষ্টি এতই উদার ছিল যে রাজদরবারে কোন মুসলমান

ফকির বা ধর্মগুরু উপস্থিত হলে তিনি সিংহাসন থেকে উঠে তাঁর দীর্ঘ শুভ্র দাড়ি দিয়ে আগন্তুকের পায়ের ধুলো মুছে দিয়ে তাঁকে সম্মান জানাতেন। তাঁর বিশিষ্ট মন্ত্রী ও সেনানায়কদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু অথবা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও বিশিষ্ট অমাত্য ছিলেন—ফকির আজিজউদ্দীন, তাঁর অর্থমন্ত্রীর নাম ছিল—দেওয়ান দীননাথ। বস্তুতঃ রণজিৎ সিংহ শাসিত পাঞ্জাবকে একটি শিখরাষ্ট্র বলা সঙ্গত হবে না কারণ পাঞ্জাবে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা শুধুমাত্র শিখ জাতির স্বার্থেই প্রযুক্ত হত না। শিখ জমিদারেরা হিন্দু বা মুসলমান প্রজাকে যেমন পীড়ন বা শোষণ করত, শিখ প্রজার ভাগ্যেও সেই শোষণ-পীড়ন জুটত। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে শাসনব্যবস্থার যে কাঠামো প্রচলিত ছিল, পাঞ্জাবে তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ইংরাজেরা 1809 খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহকে শতদ্রু নদীর সীমানা লঙ্ঘন না করতে নির্দেশ দিয়েছিল। শতদ্রুর পূর্বতীর ব্যাপী ছোট ছোট শিখরাজ্য গুলির রাজারা ইংরাজদের আশ্রয় নিয়েছিল। রণজিৎ ইংরাজের এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেননি, তার কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরাজেরা তাঁর চেয়ে বহুগুণ অধিক শক্তিশালী। বাস্তববাদী রাজনৈতিক দৃষ্টি এবং নিজের বাহুবলে তিনি সাময়িকভাবে ইংরাজ কর্তৃক তাঁর রাজ্য-গ্রাস ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এই বিদেশী আগ্রাসনের সম্ভাবনা তিনি দূর করে যেতে পারেননি ; তাঁর উত্তরাধিকারীগণকে এই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর, ক্ষমতা দখলের আত্মকলহে দুর্বল পাঞ্জাব রাজ্য ইংরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তাদের শাসনাধিকারভুক্ত হয়েছিল।

মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় ও পতন

ধ্বংসোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় শত্রু দাঁড়িয়েছিল মারাঠা রাজ্য। মুঘলশক্তির দুর্বলতার সুযোগে স্ব-স্ব স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে এই রাজ্যটিই হয়ে উঠেছিল সর্বাধিক শক্তিশালী। মুঘল সাম্রাজ্যের হীনাবস্থায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতের শূন্যস্থান পূর্ণ করার মত শক্তি একমাত্র মারাঠারাই অর্জন করতে পেরেছিল। এই নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারও অভাব এদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু মারাঠা সর্দারদের মধ্যে একতার অভাব ছিল। সর্বভারতব্যাপী

সাম্রাজ্য গড়ে তোলার মত একটা দৃষ্টিভঙ্গী বা কর্মসূচী এদের ছিল না। এই কারণে তারা মুঘল সম্রাটদের স্থান পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে এরা মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে এটির ধ্বংসসাধন করতে সমর্থ হয়েছিল।

শিবাজীর পুত্র সাহু 1689 খ্রীষ্টাব্দ থেকে আওরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব অবশ্য সাহু ও তাঁর মাতার প্রতি যথেষ্ট মর্যাদা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁদের ধর্মীয় অথবা সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার সবকিছু' ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল যে এর ফলে সাহুর সঙ্গে তাঁর একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া সম্ভব হবে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর 1707 খ্রীষ্টাব্দে সাহু মুক্তি পান। অনতিকাল পরেই তাঁর সঙ্গে তাঁর খুল্লতাত পত্নী তারাবাঈ-এর একটা গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সাহুর ঘাঁটি ছিল সাতারা আর তারাবাঈ-এর ঘাঁটি ছিল কোলাপুর। তারাবাঈ তাঁর স্বামী রাজারামের মৃত্যুর পর 1700 খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শিবাজীর নাম নিয়ে তাঁর পক্ষে মুঘলের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রত্যেক মারাঠা সর্দারের অধীনে একটি করে বড় সৈন্যবাহিনী থাকত, এই সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য শুধু সর্দারের প্রতিই কেন্দ্রীভূত থাকত। এখন নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর বলে বলীয়ান সর্দারেরা কেউ সাহু কেউ বা তারাবাঈ-এর দলে যোগ দিয়েছিল, আর এঁরা দুজনই মারাঠা রাজ্যের উত্তরাধিকার দাবি করছিলেন। সর্দারদের মধ্যে অনেকে দাক্ষিণাত্যে মুঘল-রাজপ্রতিনিধির সঙ্গেও এদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। সাহু ও তাঁর কোলাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিবাদের ফলে রাজা সাহুর 'পেশোয়া' বালাজী বিশ্বনাথের নেতৃত্বে একটা নূতন ধরনের মারাঠা শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। মারাঠা ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের এখানেই সূত্রপাত। এই অধ্যায় মারাঠা ইতিহাসে পেশোয়া নেতৃত্বের অধ্যায় আর এই অধ্যায়ই মারাঠা সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের ইতিহাস।

বালাজী বিশ্বনাথের জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণ পরিবারে। রাজস্ব আদায়কারী সামান্য কর্মচারীরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ধীরে ধীরে তিনি মারাঠা রাজ্যের একজন পদস্থ কর্মচারী হয়ে উঠেন। শত্রু দমনের ব্যাপারে রাজা সাহুকে তিনি খুবই সাহায্য করেছিলেন। সাহুর প্রতি তাঁর বিশেষ আনুগত্যও ছিল। কূটনীতি প্রয়োগে বালাজী বিশ্বনাথের বিশেষ

দক্ষতা ছিল। বহু মারাঠা সর্দার তাঁর চেষ্টায় শাহুর পক্ষে যোগ দিয়েছিল। 1713 খ্রীষ্টাব্দে শাহু তাঁকে পেশোয়া পদে নিয়োগ করেন। মারাঠি ভাষায় 'পেশোয়া' শব্দের অর্থ মুখ্ প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী। বালাজী বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে মারাঠা সর্দারদের উপর ও মহারাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্র রাজা শাহুর তথা নিজের অধিকার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে কোলাপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে রাজা শাহু প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। ঐ অঞ্চলে রাজারামের বংশধরগণেরই প্রভুত্ব ছিল। পেশোয়া শাসন-ব্যবস্থার সবটুকু কর্তৃত্বই নিজের কুক্ষিগত করে ফেলেছিলেন, তাঁর সহযোগী অন্যান্য মন্ত্রী ও সর্দারদের তাঁর ক্ষমতার প্রভাবে নিষ্প্রভ হয়ে থাকতে হত। বস্তুতঃ বালাজী বিশ্বনাথ ও তাঁর পুত্র প্রথম বাজীরাও এর আমলে মারাঠা সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র-প্রধান বলতে পেশোয়া পদকেই বোঝাত।

মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রভাব ও শক্তিবৃদ্ধির প্রয়াসে বালাজী বিশ্বনাথ মুঘল রাজকর্মচারীদের অন্তর্দ্বন্দ্বের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতেন। মুঘল সম্রাট্ জুল্‌ফিক্‌র খানের কাছ থেকে দাক্ষিণাত্যে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' কর সংগ্রহের সুবিধাটি তিনি সুকৌশলে আদায় করে নেন। শেষে, তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গেও একটি চুক্তি করেন। এই চুক্তির ফলে শিবাজীর রাজত্বের প্রথমদিকে দাক্ষিণাত্যের যেসব অঞ্চল তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল সেগুলি পুনরায় রাজা শাহুকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশে শাহুকে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায়ের অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। এর প্রতিদানে শাহু নামে মাত্র মুঘল সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ ও লুণ্ঠন দমনের প্রয়োজনে 15,000 অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সাম্রাজ্যের সহায়তা করতে সম্মত হন। সম্রাটকে বার্ষিক 10 লক্ষ মুদ্রা নজরাণা দিতেও তিনি প্রতিশ্রুত হন। 1719 খ্রীষ্টাব্দে একটি মারাঠা সেনাবাহিনী নিয়ে বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দ হুসেনআলি খানের সঙ্গে দিল্লী যান এবং ফরুখ্‌সিয়রকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে সৈয়দ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের সহায়তা করেন। দিল্লী এসে বালাজী বিশ্বনাথ ও অন্যান্য মারাঠা সর্দারেরা নিজেদের চোখে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা বা ছিদ্রগুলি দেখে গিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের এই পতনোন্মুখ অবস্থা দেখে উত্তর ভারতে নিজেদের অধিকার বিস্তারের উচ্চাশা তাঁদের মনে জেগে উঠেছিল।

'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' কর আদায় যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয় তার জন্য

বালাজী বিশ্বনাথ এক-একজন মারাঠা সর্দারের জন্য এক-একটি এলাকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সর্দারেরা এর মোটা অংশ নিজেরাই ভোগ করতে পেতেন। কোন কোন সর্দার কোন কোন এলাকার 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায় করবে এটা পেশোয়া স্বয়ং নির্ধারণ করে দিতেন। অনুগ্রহ বিতরণের ক্ষমতা হাতে থাকার জন্য পেশোয়ার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রভাব বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর দলে ভিড়ে যাওয়ার জন্য সর্দারদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। অবশ্য পরিণামে এই ব্যবস্থা মারাঠা সাম্রাজ্যের একটি প্রধান দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'ওয়াতন' ও 'সরঞ্জাম' (জায়গীর) প্রথা মারাঠা সর্দারদের মধ্যে শক্তি ও স্ব-নির্ভরতা এনে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় প্রভুত্বকে এরা সুনজরে দেখত না। অতিরিক্ত চৌথ ও 'সরদেশাই' প্রথার সুবিধা পেয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের দূর দূর প্রান্তে থেকে এই সর্দারেরা ধীরে ধীরে কমবেশি স্বাধীন রাজা হয়ে উঠতে থেকেছিল। এই কারণে, দেখা গিয়েছিল যে মূল মারাঠা রাজ্যের বাইরে মারাঠা জাতি যে সব অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিল তার পেছনে মারাঠা নৃপতি বা পেশোয়ার কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর কোন প্রত্যক্ষ কৃতিত্ব ছিল না। এই বিজিত অঞ্চল-গুলি জয়ের কৃতিত্ব বিশেষ বিশেষ মারাঠা সর্দারদেরই প্রাপ্য হয়েছিল। নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর সাহায্যেই তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের অধিকার বিস্তার করে নিয়েছিলেন। এই সব যুদ্ধাভিযান কালে মারাঠা সর্দারদের একের অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও দেখা যেত। মারাঠা রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি মারাঠা সর্দারদের এই আত্ম-কলহ সংযত করার চেষ্টা করলেও বিশেষ কোন ফল হত না। অনেক সময় এই হস্তক্ষেপের কারণে তারা শত্রু-পক্ষীয়দের দলেও ভিড়ে যেত, তা এই শত্রু নিজাম, মুঘল বা ইংরাজ কোম্পানী যেই হ'ক না কেন। বালাজী বিশ্বনাথ 1720 খ্রীষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন। তাঁর স্থানে 'পেশোয়া' পদে নিযুক্ত হন তাঁর বিংশবর্ষ বয়স্ক পুত্র প্রথম বাজীরাও। বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাজীরাও ছিলেন সাহসী ও দক্ষ সেনানায়ক। চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও উচ্চাভিলাষীও তিনি ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, শিবাজীর পরেই তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ গেরিলা-যুদ্ধ বিশারদ। বাজীরাও-এর নেতৃত্বে মারাঠাগণ মুঘল সাম্রাজ্য বার বার আক্রমণ করে মুঘলদের তাদের বিস্তীর্ণ এলাকায় চৌথ আদায়ের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে বা আক্রমণের আশঙ্কায়

পরবর্তী কালে মুঘলেরা এই এলাকাগুলি একেবারেই তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। 1740 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাজীরাও-এর মৃত্যুর পূর্বেই মারাঠাগণ মালোয়া, গুজরাট এবং বুন্দেলখণ্ডের কতক অংশ মারাঠা সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত করে নিয়েছিল। এই কালের মধ্যে মারাঠাদের মধ্যে গায়কোয়াড়, হোলকার, সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলে পরিবার প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

সমগ্র জীবন ধরে বাজীরাও দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদের নিজামের প্রভাব সীমাবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। পেশোয়ার প্রভাব খর্ব করার জন্য নিজাম সদাসর্বদাই কোলাপুরের রাজা, বিভিন্ন মারাঠা সর্দার ও মুঘলদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালিয়ে গিয়েছিলেন। পেশোয়া ও নিজাম—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দুইবার যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হন। দুইবারই নিজামের পরাজয় হয়েছিল। এর ফলে নিজাম দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলিতে মারাঠাদের 'চৌথ ও 'সরদেশমুখী' আদায়ের অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। 1733 খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও জাঞ্জিরার সিডিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ অভিযান চালিয়ে অবশেষে তাদের মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি পর্তুগীজদের বিরুদ্ধেও আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু করেন। এই অভিযানের ফলে সালসেত ও বেসিন—এই দুটি স্থান অধিকৃত হয়। তবে পর্তুগীজেরা পশ্চিম উপকূলে তাদের পূর্ব-অধিকৃত স্থানসমূহের অধিকার বজায় রাখতে পেরেছিল।

বাজীরাও 1740 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মারা যান। মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যে তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের কাঠামোতে একটা পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিলেন। মারাঠা রাজ্যকে উত্তর ভারত পর্যন্ত প্রসারিত করে তিনি সাম্রাজ্যের রূপদান করেন। তবে তিনি এই সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় করে যেতে পারেননি। নূতন নূতন রাজ্য অবশ্যই বিজিত হয়েছিল কিন্তু ঐ স্থানগুলিতে সুশাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। বিজয়ী সর্দারদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আদায়, সুশাসনব্যবস্থা নয়।

বাজীরাও-এর অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র বালাজী বাজীরাও (যিনি নানাসাহেব নামেই অধিক পরিচিত) 1740 থেকে 1761 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পেশোয়া পদে আসীন ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মতই দক্ষ ছিলেন তবে তাঁর কর্মোদ্যম তত বেশী ছিল না। রাজা শাহু 1749 খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব অতঃপর পেশোয়াদের হাতেই

ন্যস্ত :হয়েছিল। 'পেশোয়া' পদটি আগে থেকেই পুরুষানুক্রমিক .হয়ে ·এবং কার্যতঃ পেশোয়াই হয়ে উঠেছিলেন সাম্রাজ্যের আসল শাসনকর্তা। নানাসাহেব রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করে, যেন কতকটা তাঁর অধিকার প্রদর্শনের জন্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পুনেতে (পুনা) স্থানান্তরিত করেন, শাহুর মৃত্যুর আগে পুনে থেকেই তিনি পেশোয়ার দপ্তর পরিচালন করতেন।

বালাজী বাজীরাও তাঁর পিতার পদাঙ্কানুসরণ করে সাম্রাজ্যের সীমা চারদিকেই প্রসারিত করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় মারাঠা শক্তির গৌরব গগণ-স্পর্শী হয়ে উঠেছিল। সারা ভারত মারাঠা বাহিনীর অভিযান-ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। এই সময় মালোয়া, গুজরাট এবং বুন্দেলখণ্ডে মারাঠা প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলা প্রদেশে পুনঃপুনঃ অভিযান চালানো হয়েছিল। পরিশেষে বাংলার নবাব ওড়িশার অধিকার তাদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দাক্ষিণাঞ্চলে মহীশূর রাজ্য সহ আরও কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা মারাঠাদের প্রভুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাদের 'নজরাণা' দিতে বাধ্য হন। 1760 খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে উদগীরে পরাস্ত হয়ে 62 লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়যুক্ত একটি বিরাট অঞ্চল তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। উত্তরাঞ্চলে, অল্পদিনের মধ্যেই মারাঠা শক্তিই মুঘল সাম্রাজ্যের ত্রাণকর্তারূপে গণ্য হয়েছিল। গঙ্গা নদীর তীর ও রাজপুতানার মধ্যবর্তী ভূভাগ দিয়ে অভিযান চালিয়ে 1752 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মারাঠারা দিল্লী পৌঁছে গিয়েছিল। দিল্লীর সমীপস্থ হয়ে মারাঠা অভিযানকারীগণ ইমাদ-উল্-মুলুককে মুঘল সাম্রাজ্যের 'উজীর' পদে নিযুক্তি পেতে সাহায্য করেছিল। এই নবনিযুক্ত উজীর মারাঠাদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। অর্থাৎ মারাঠাদের ইচ্ছা বা আদেশ মতই তাঁকে চলতে হত। দিল্লী থেকে অতঃপর মারাঠারা পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং আমেদ শা আবদালির প্রতিনিধিকে পরাস্ত করে তারা পাঞ্জাব দখল করে নিয়েছিল। এই ঘটনায় তদানীন্তন আফগানিস্তানের অধীশ্বর দুর্ধর্ষ আমেদ শা আবদালি ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে মারাঠাদের পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে আর একবার ভারত অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

উত্তর-ভারত অধিকারের জন্য একটা প্রচণ্ড যুদ্ধের এটাই ছিল উদ্যোগ-পর্ব। আমেদ শা আবদালি রোহিলখণ্ডের নাজিব-উদ্-দৌলা ও অযোধ্যার

সুজা-উদ্-দৌলার সঙ্গে একটা মিত্রতার চুক্তি করেছিলেন। এই দুইজনই ইতিমধ্যে মারাঠা সর্দারদের কাছে পরাজিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পেশোয়া স্বদেশ থেকে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী উত্তর-ভারতে পাঠিয়েছিলেন। এই বাহিনীর নামমাত্র সেনাধ্যক্ষ ছিলেন পেশোয়ার এক বালক পুত্র, তবে এর প্রকৃত অধিনায়কতার দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন তাঁর এক সম্পর্কিত ভ্রাতা সদাশিব রাও ভাউ-এর উপর। পেশোয়া প্রেরিত এই সৈন্যবাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর ধাঁচে গঠিত একটি পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী। এই গোলন্দাজ বাহিনীর নায়ক ছিলেন ইব্রাহিম খান্ গর্দী। যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠায় মারাঠারা উত্তর-ভারতে সাহায্যকারী মিত্রশক্তির সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। মারাঠা শক্তির উচ্চাভিলাষ ও অতীত আচরণের জন্য উত্তর-ভারতের রাজন্যবৃন্দ সকলেই মারাঠাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। রাজপুতানার রাজ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মারাঠারা পুনঃপুনঃ হস্তপেক্ষ করেছিল, শুধু তাই নয় প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও নজরানাও তারা আদায় করেছিল। অযোধ্যার অংশ বিশেষের অধিকার ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে অযোধ্যা বা আউধের রাজার সঙ্গেও তাদের সদ্ভাব ছিল না। পাঞ্জাবে শিখ সর্দারদের সঙ্গেও মারাঠারা ভাল ব্যবহার করেনি। জাঠ-প্রধানদের কাছ থেকেও মারাঠাগণ প্রচুর জরিমানা আদায় করেছিল, সুতরাং জাঠরাও তাদের প্রতি প্রসন্ন ছিল না। এই কারণে সম্পূর্ণ নিজেদের শক্তি সহায় করে মারাঠাদের আমেদ শা আবদালির সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এক্ষেত্রে মারাঠাদের একমাত্র সহায় ছিলেন মুঘল উজীর ইমাদ-উল-মুলুক, তবে তাঁর সামর্থ্যও ছিল খুব অল্প। মারাঠাদের আর একটি দুর্বলতার উৎস ছিল মারাঠা সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে অবিরত কলহ-বিবাদ। যাই হোক্, পানিপথ নামক স্থানে মারাঠা বাহিনীর সঙ্গে আমেদ শা আবদালি বাহিনীর যুদ্ধ সুরু হয় 1761 খ্রীষ্টাব্দের পনেরই জানুয়ারী। এই যুদ্ধে মারাঠারা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়েছিল। পেশোয়ার পুত্র, বিশ্বাস রাও, সদাশিব রাও ভাউ-এর মত সেনানায়কদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়েছিল। এই যুদ্ধে মৃত মারাঠা সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় 28,000। আফগান অশ্বারোহীরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। পানিপথ অঞ্চলের

জাঠ, আহীর ও গুজর শ্রেণীর লোকেরাও পলায়নপর মারাঠা সৈনিকদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়েছিল।

সংগ্রামরত মারাঠা বাহিনীর সাহায্যের জন্য পেশোয়া স্বয়ং তাঁর রাজধানী থেকে উত্তর-ভারতের পথে অভিযান সুরু করেছিলেন। মধ্যপথে শোচনীয় এই পরাজয়ের দুঃসংবাদে তিনি স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর বেশ অসুস্থ ছিল। তাঁর ভগ্নশরীর এই ঘটনায় আরও ভেঙ্গে পড়েছিল। 1761 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

পানিপথের পরাজয় মারাঠাদের আরও শোচনীয় পরিণাম বহন করে এনেছিল। সুদক্ষ একটি সৈন্যবাহিনীই শুধু তারা হারায়নি, এই পরাজয় তাদের রাজনৈতিক মর্যাদাও বেশ খর্ব করে দিয়েছিল। মারাঠার এই পরাজয়ে সবচেয়ে বড় রকমের লাভ জুটেছিল ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাগ্যে। মারাঠা শক্তির দুর্দশার সুযোগে এরা বাংলা ও দক্ষিণ-ভারতে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির সুবিধা পেয়ে গিয়েছিল। বিজেতা আফগানেরা অবশ্য কোন সুবিধাই লাভ করতে পারেনি। পাঞ্জাব প্রদেশ অতঃপর তারা স্ব-অধিকার ভুক্ত রাখতে পারেনি। বস্তুতঃ পানিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধে কে ভবিষ্যতে ভারত শাসন করবে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। মীমাংসা অবশ্যই একটা হয়েছিল। তবে সেটা ছিল নঞর্থক অর্থাৎ ভারত-শাসনের অধিকার কার থাকবে না এই জিজ্ঞাসার। ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের বাধাগুলি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের দ্বারা অপসারিত হয়েছিল।

1761 খ্রীষ্টাব্দে সপ্তদশবর্ষীয় মাধবরাও পেশোয়া পদ লাভ করেন। তিনি রণদক্ষ ছিলেন, রাজনীতিজ্ঞানও তাঁর বেশ ছিল। এগার বৎসরের মধ্যে তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের হৃত-গৌরব ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। তিনি নিজামকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও মহীশূরের হায়দর আলিকে রাজস্ব প্রদান করতে বাধ্য করেন। রোহিলাদের, রাজপুত রাজাদের ও জাঠ সর্দারদের দমন করে তিনি উত্তর-ভারতে আর একবার মারাঠা জাতির প্রভুত্ব স্থাপন করেন। 1771 খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা শক্তির সহায়তায় সম্রাট্ শাহ আলম দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হন। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মারাঠার আশ্রিত একজন বৃত্তিভোগী সম্রাট্ হয়ে পড়েছিলেন। লোকচক্ষে এটাই তখন প্রতীয়মান হয়েছিল যে উত্তর ভারতে মারাঠারা তাদের হৃত-গৌরব উদ্ধার করতে পেরেছে। 1772 খ্রীষ্টাব্দে ক্ষয়রোগে মাধবরাও-এর মৃত্যু

মারাঠা জাতির উপর একটা প্রচণ্ড আঘাতের আকারে নেমে এসেছিল। অতঃপর মারাঠা সাম্রাজ্যে বেশ একটা বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়েছিল। পেশোয়ার রাজধানী পুনেতে ক্ষমতা দখল নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘর্ষ ছিল এই অশান্তির প্রধান কারণ। পেশোয়া পদের দুই দাবিদারের মধ্যে একজন ছিলেন বালাজী বাজীরাও-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ রাও আর অন্যজন ছিলেন মাধব-রাও এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও। 1773 খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণ রাও নিহত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর শিশুপুত্র সোয়াই মাধব রাও। নারায়ণ রাও-এর মৃত্যুকালে ইনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। পেশোয়ার গদী না পেয়ে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ রঘুনাথ রাও ইংরাজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদেরই সাহায্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার চেষ্টা করেন। এর পরিণামেই প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

পেশোয়ার ক্ষমতাও এই সময়ে বেশ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল। নানা ফাড়্‌নবীসের নেতৃত্বে সোয়াই মাধবরাও-এর সমর্থকদের সঙ্গে রঘুনাথ রাও-এর পক্ষাবলম্বীদের বিরোধ ও ষড়যন্ত্র রাজধানী পুনের পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলেছিল। ইতিমধ্যে উত্তর-ভারতে বড় বড় মারাঠা সর্দারেরা নিজেদের জন্য অর্ধ-স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এঁরা স্বদেশের রাজনীতিতে যোগদান করতে পারছিলেন না। এই প্রায়-স্বাধীন রাজা বা সর্দারদের মধ্যে বরোদার গায়কোয়াড়, নাগপুরের ভোঁসলে, ইন্দোরের হোলকার ও গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন মুঘল শাসনব্যবস্থার আদর্শে এঁরা নিজ নিজ রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ও নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। পেশোয়ার প্রতি তাঁদের আনুগত্য ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পেতে শুধু নামমাত্র অবশিষ্ট ছিল। সঙ্কটকালে পেশোয়ার শক্তিবৃদ্ধি করার পরিবর্তে তাঁরা কেউ কেউ বিরোধী পক্ষেও যোগ দিয়েছিলেন। অনেকে আবার মারাঠা সাম্রাজ্যের বিরোধী শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয়েছিলেন।

উত্তর-ভারতের মারাঠা শাসকদের মধ্যে বিশেষরূপে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন মহাদজী সিন্ধিয়া। ফরাসী সেনানীদের সাহায্যে তিনি একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। 1784 খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ্ আলমের উপরও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'পেশোয়া' পদটি সম্রাটের সহকারী মর্যাদাযুক্ত হবে (নায়েব-ই-মুনাইব) এই ব্যবস্থা তিনি সম্রাটকে

দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন তবে তার সঙ্গে সর্ত এই ছিল যে স্বয়ং মহাদজী সিন্ধিয়াই পেশোয়ার প্রতিনিধিরূপে কাজ করে যাবেন। এই ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নানা ফাড়্‌নবীশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজের শক্তিক্ষয় করেছিলেন। ইন্দোরেব হোলকারের সঙ্গে তাঁর প্রবল বৈরিতা ছিল। 1800 খ্রীষ্টাব্দে নানা ফাড়্‌নবীশ-এর মৃত্যু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা জাতিকে উন্নতির শিখরে উত্তীর্ণ করার ব্যাপারে শেষ দুই রণকুশল ও রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন মহাদজী সিন্ধিয়া ও নানা ফাড়্‌নবীশ।

1795 খ্রীষ্টাব্দে সওয়াই মাধবরাও-এব মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া পদ লাভ করেন। ইনি রঘুনাথ রাও-এর পুত্র। এঁর কোন যোগ্যতা ছিল না। এই সময় ভারতের আধিপত্যের পথে কণ্টকস্বরূপ মারাঠা শক্তিকে উৎখাত করার জন্য ইংরাজেরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। পরস্পরের সঙ্গে বিবাদমান মারাঠা-প্রধানদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জোরদার করার জন্য ইংরাজেরা নানা কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সফল হয়েছিল। তার পর, পর পর দুইটি পৃথক পৃথক যুদ্ধে ইংরাজেরা তাদের সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিতে সমর্থ হয়েছিল। এই যুদ্ধ দুটি দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ (1803-1805) ও তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ (1816-1817) নামে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই যুদ্ধগুলির অবসানে কয়েকটি মারাঠা রাজ্য অধীন রাজ্য বা মিত্র-রাজ্যরূপে ইংরাজের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তবে পেশোয়া পরিবার বা বংশকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

মারাঠা জাতির স্বপ্ন ছিল মুঘল সাম্রাজ্য গ্রাস করে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। তাদের এই স্বপ্ন শূন্যে বিলীয়মান হয়েছিল। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, যে পচনশীল সমাজব্যবস্থা মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে এনেছিল, মারাঠা সাম্রাজ্য ও অনুরূপ সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্লীন দোষ-ত্রুটিগুলি মারাঠা সমাজব্যবস্থার মূলেও আঘাত হেনেছিল। মারাঠা প্রধানগণ শেষ মুঘল যুগের অভিজাত শ্রেণীর আদর্শেই সংগঠিত হয়েছিল। মারাঠা শাসনব্যবস্থার সরঞ্জামি প্রথা ছিল মুঘল জায়গীরদারি প্রথারই আর এক রূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত মুঘল শক্তি প্রবল শত্রুরূপে অবস্থিত ছিল ততদিন একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে পারস্পরিক সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজনের

পরিপ্রেক্ষিতেই মারাঠাগণ একতার বন্ধনে বদ্ধ ছিল। তবে এই ঐক্য বা সংহতি কোন দিনই যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কোন একটা সুযোগ এলেই মারাঠা সর্দারেরা নিজেদের স্বাধীনতার চেষ্টা চালাত। এমন কি ধ্বংসোন্মুখ মুঘল দরবারের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যে শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যেত, মারাঠা প্রধানদের মধ্যে তারও অভাব দেখা যেত। মারাঠা সর্দারদের পক্ষ থেকে একটা ভাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন প্রবণতা দেখা যায়নি। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতিতেও এদের আগ্রহের অভাব ছিল। দেশে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারেও এদের মনোযোগ প্রায় ছিলই না।

এদের রাজস্ব বা শাসনব্যবস্থা মুঘলদের মতই ত্রুটিযুক্ত ছিল। মুঘলদের মতই মারাঠা শাসকদের নীতি ছিল কর-ভার বৃদ্ধি করে অসহায় প্রজাদের অর্থ-শোষণ। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে এরা উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ করস্বরূপ আদায় করত। মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে যে সুস্থিত শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে প্রজারা বাস করত মহারাষ্ট্র ভূমির বাইরে মারাঠা শাসনাধীন অঞ্চলে সেই সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার বেশ অভাব ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যে ভারতীয় জনগণের মধ্যে যে পরিমাণ রাজানুগত্যের ভাব দেখা যেত তার চেয়ে বেশী আনুগত্য মারাঠা সাম্রাজ্যের ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। এর জন্যে দায়ী ছিল মারাঠা শাসকদের মধ্যে জনসংযোগের অভাব। সমগ্র মারাঠা সাম্রাজ্যে শুধু বলপ্রয়োগের নীতিই ছিল রাজনীতি। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখীন হয়ে তাদের হটিয়ে দেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল মারাঠা শাসকদের পক্ষ থেকে এই সাম্রাজ্যকে একটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা। মারাঠা শাসকগণ এই আধুনিকীকরণের পদক্ষেপে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

জনসাধারণের সামাজিক ও বৈষয়িক অবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের স্ব-বিনষ্টির থেকে আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে যে পরিমাণ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার আবশ্যকতা ছিল, তা' সাধিত হয়নি।

ক্রমবর্ধমান সরকারী করভার, সরকারী কর্মচারীদের পীড়ন, অভিজাত সম্প্রদায়ের লোভ ও লালসা, জমিদারের উৎপাত—এই সব ব্যাপারগুলি

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুঃসহ করে তুলেছিল। শুধু তাই নয়, আরও কিছু উপদ্রবও ছিল। দুই দলে কোথাও হয়ত যুদ্ধ বেধেছে,—এই অবস্থায় কোন একটি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বিজয়ী অথবা পলায়নপর সৈন্যদের হামলা জনসাধারণকে সহ্য করতে হত। এই সময় বহু ভাগ্যান্বেষী আগন্তুকও দেশের মধ্যে ঢুকে পড়ে হত্যা ও লুণ্ঠন চালাত।

তখনকার দিনের ভারত ভূমিতে পরস্পর-বিরোধী অবস্থা অথবা ঘটনার সহাবস্থান দেখা যেত। সুপ্রচুর সমৃদ্ধি ও বিলাসব্যসনের পাশাপাশি দেখা যেত অপরিসীম দারিদ্র্যের ছবি। আরাম ও বিলাস বৈভবের মধ্যে ডুবে থাকা ধনী ও প্রভাবশালী অভিজাত শ্রেণী যেমন ছিল তেমনি সমাজে বাস করত অনগ্রসর, নিপীড়িত দরিদ্র কৃষককুল। এরা অতি নিম্নমানের জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত থাকতে বাধ্য হত। যত কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও অবিচারও এদেরই সহ্য করতে হত। তবে এটা বলা প্রয়োজন যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রিটিশ শাসনের একশ বছরের পরেও ভারতবর্ষের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের চেয়ে এই কালের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নত ও শান্তিপূর্ণ ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত এবং মামুলী ধরনের ছিল। উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশলগুলি অজ্ঞাত ছিল, সেই আবহমান কালের পুরানো পদ্ধতিতেই চাষবাস চলত। কৃষকেরা শুধুমাত্র আপ্রাণ কায়িক শ্রমে উন্নত কৃষিব্যবস্থার অসুবিধাগুলি পূরণ করার চেষ্টা করত। বস্তুতঃ ভারতীয় কৃষকদের ফসল উৎপাদনের সামর্থ্য ছিল রীতিমত বিস্ময়জনক। একটা সুবিধা ছিল এই যে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ তখন যথেষ্ট ছিল। দুঃখের বিষয় উৎপন্ন ফসল ভালভাবে ভোগ করা ফসল উৎপাদনকারী কৃষকের ভাগ্যে ঘটত না। উৎপন্ন ফসলের সিংহ-ভাগ ভোগ করত তারাই যারা চাষ করত না। চাষী তার উৎপন্ন ফসলের অতি অল্প অংশই তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পেত। সরকার, জায়গীরদার, খাজনা আদায়কারী বড় চাষী এরা সবাই মিলে উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশই চাষী কৃষকের কাছ থেকে শোষণ করে নিত। কি মুঘল রাষ্ট্রে অথবা তাদের স্থলাভিষিক্ত মারাঠা বা শিখ রাজ্যে সর্বত্রই এই শোষণের নীতি অনুরূপ ও অব্যাহত ছিল।

ভারতের গ্রামগুলি বহুলাংশে ছিল স্বনির্ভর, বাইরে থেকে জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রামেই পাওয়া যেত। এক গ্রাম থেকে অন্যত্র যাওয়ার মত পথ-ঘাটের অভাবও ছিল। এতৎসত্ত্বেও মুঘল আমলে দেশের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য বেশ প্রসার লাভ করেছিল। শুধু আন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নয় বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার এশিয়ার অন্যান্য দেশে ও ইউরোপে প্রেরিত হত এবং ঐসব দেশের উৎপন্ন সামগ্রী ভারতে আমদানি হত। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতে আমদানি হত মুক্তা, কাঁচা রেশম, পশম, খেজুর ও অন্যান্য শুষ্ক ফল এবং গোলাপ জল। কফি, সোনা, ওষধিদ্রব্য, মধু প্রভৃতি আসত আরব দেশ থেকে। চা, চিনি, চীনা-মাটির বাসন ও রেশম চীন থেকে আমদানি হত। তিব্বত থেকে আসত সোনা, মৃগনাভি ও পশমী বস্ত্র। সিঙ্গাপুর থেকে টিন আমদানি হত আর ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি পাঠাত মসলা, গন্ধদ্রব্য, আরক ও চিনি। আফ্রিকা থেকে আসত গজদন্ত ও ঔষধি দ্রব্য। পশমী বস্ত্র, তামা, লোহা, সীসা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ এবং কাগজ আসত ইউরোপ মহাদেশ থেকে। ভারত থেকে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল তুলা থেকে তৈরী বিবিধ প্রকার বস্ত্র। পৃথিবীর সর্বত্র গুণগত মানের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট ভারতীয় বস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ও সমাদর ছিল। ভারত থেকে যে সব বস্তু বিদেশে রপ্তানি হত তার মধ্যে ছিল কাঁচা রেশম, রেশমী বস্ত্র, লৌহজাত নিত্যব্যবহার্য বস্তু, নীল, সোরা, আফিম, চাল, গম, চিনি, লঙ্কা প্রভৃতি মশলা, মণি-মাণিক্য এবং ঔষধি দ্রব্য।

কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য ও কৃষিজাত পণ্যে ভারতবর্ষ মোটামুটি স্বয়ম্ভর থাকার জন্য বিদেশী দ্রব্য বহুল পরিমাণে এদেশে আমদানির প্রয়োজন বিশেষ হত না। শুধু তাই নয়, ভারতের কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পদ্রব্যের বহির্ভারতে বিশেষ চাহিদা ও সমাদরও ছিল। ফলে, ভারত থেকে রপ্তানির পরিমাণ আমদানির চেয়ে বেশীই থেকে যেত। আমদানিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুস্থিতি সাধিত হত। কার্যতঃ বহির্বিশ্বে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে ভারত একটি রত্ন-খনি। অঢেল মণি-মাণিক্যের আকর।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবিরত যুদ্ধবিগ্রহের কারণে ভারতের নানাস্থানে শান্তি-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এতে দেশে অন্তর্বাণিজ্যের বেশ ক্ষতি

হয়েছিল। বহির্বাণিজ্যেরও এতে বেশ ক্ষতি হয়েছিল, কারণ বহির্বাণিজ্য-পথের কোন কোনটি দেশের আভ্যন্তরীন অশান্তির জন্য আর নিরাপদ ছিল না।

দুই শাসকের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অনেক সময় ব্যবসায়-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি আক্রান্ত ও লুন্ঠিত হ'ত। বিদেশী আক্রমণকারীগণ কর্তৃক ব্যবসা-সমৃদ্ধ স্থান লুণ্ঠন প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপারে পবিণত হয়েছিল। বহু বাণিজ্য-পথে সুসজ্জিত দলবদ্ধ দস্যুদের উৎপাত দেখা যেত। নিয়মিতভাবে এরা বণিকদের আক্রমণ করত ও তাদের মালপত্র লুণ্ঠন করে নিত। দিল্লী ওআগ্রার মত দুটি রাজকীয় শহর অভিমুখের রাজপথও নিরুপদ্রব ছিল না, সেই পথেও দস্যুর ভয় ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পথে আর একটি বাধাও দেখা দিয়েছিল। দেশের মধ্যে ইতস্ততঃ স্থানীয় কোন শক্তিশালী প্রধানের নেতৃত্বে আঞ্চলিক ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠছিল। এই তথাকথিত ছোট বড় স্বাধীন রাজারা নিজেদের আয় বৃদ্ধির জন্য নিজের নিজের রাজ্য-সীমান্তে শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি বসিয়েছিল। এই সব এলাকা দিয়ে মাল চলাচল কালে বণিকশ্রেণীর কাছ থেকে মোটা অর্থ শুল্ক হিসেবে আদায় করা হত। এই সব ছোটখাট অসুবিধাগুলি মিলিয়ে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বর্ণনাতীত ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। বিলাসদ্রব্যগুলির কাটতি ছিল অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নানা দুর্যোগে অভিজাত সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধিও হ্রাস পেয়েছিল এই কারণে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা কমে যাওয়াতে এই জাতীয় শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছিল।

যে সব রাজনৈতিক কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা দেখা দিয়েছিল সেই সব কারণগুলি নগরাঞ্চলের শিল্পোৎপাদনও ব্যাহত করেছিল। শিল্পোৎপাদন কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত বহু সমৃদ্ধ সহর আগন্তুক আক্রমণকারীগণের দ্বারা লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। নাদির শা দিল্লী লুণ্ঠন করেছিলেন। আহমদ শা আবদালি লাহোর, দিল্লী, ও মথুরা লুণ্ঠন করেছিলেন। আগ্রা জাঠদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের এবং গুজরাটের সুরাট সহ কয়েকটি সহর মারাঠা সর্দারদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল। কারিগর শ্রেণীর মানুষেরা সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী ও রাজদরবারের উপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল হয়ে থাকে। রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে সামন্ত শ্রেণী ও রাজদরবার পুনঃপুনঃ বিপন্ন হয়ে পড়াতে কারিগর শ্রেণীর মেহনতী মানুষেরাও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। দেশের নানাস্থানে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের মন্দাও তাদের দুরবস্থার

কারণ হয়ে উঠেছিল। দেশের যে সকল অংশ নিরুপদ্রব ছিল সেই সব অংশে অবশ্য কিছু বিশেষ ধরনের শিল্পোদ্যোগের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, কারণ এই সব অঞ্চল থেকে ইউরোপীয় বণিক সংস্থাগুলি ইউরোপীয় দেশসমূহের সঙ্গে রীতিমত ব্যবসায়িক লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছিল।

বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারত অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিবিধ শিল্প উৎপাদনকারী দেশরূপে পরিচিত ছিল। শিল্প-কুশলী হিসাবে তখনও পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্র ভারতীয় কারিগরদের খ্যাতি বর্তমান ছিল। এই সময়েও ভারতে প্রচুর পরিমাণে সুতী ও রেশম বস্ত্র, চিনি, পাট, রঞ্জন-দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, বাসন, সোরা ও তেল জাতীয় ধাতব ও খনিজ বস্তু উৎপন্ন হত। বস্ত্রশিল্পের সুবিখ্যাত কেন্দ্র ছিল বাংলার ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ, বিহারের পাটনা, গুজরাটের সুরাট, আমেদাবাদ ও বরোচ, মধ্যপ্রদেশের চান্দেরি, মহারাষ্ট্রের বুরহানপুর, উত্তর-প্রদেশের জৌনপুর, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রা, পাঞ্জাবের মুলতান ও লাহোর, অন্ধ্রের মসুলিপত্তন, আওরঙ্গাবাদ, চিকাকোল ও বিশাখাপত্তন, মহীশূরের বাঙ্গালোর এবং মাদ্রাজের কোয়েম্বাটুর ও মাদুরাই। কাশ্মীর ছিল পশমী বস্ত্র প্রস্তুতকারকদের কেন্দ্র। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও বাংলায় জাহাজ-নির্মাণ শিল্প বেশ জেঁকে উঠেছিল। জাহাজনির্মাণ বিদ্যায় ভারতীয়দের বিশেষ নৈপুণ্যের সম্বন্ধে একজন ইংরাজ পর্যবেক্ষক এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন "ভারতীয়েরা জাহাজনির্মাণ বিষয়ে এতদূর সুশিক্ষিত যে ইংরাজদের কাছ থেকে তারা এবিষয়ে যতটুকু কৌশল শিখতে পেরেছে সম্ভবতঃ তার চেয়ে অনেক বেশী কৌশল তারা ইংরাজদের শিখিয়েছে।" ইউরোপীয় বণিক সংস্থাগুলি ভারতীয়দের প্রস্তুত বহু জাহাজ কিনে সেগুলি নিজেদের কাজে ব্যবহার করত।

বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা কালে ভারত ছিল বিশ্বের অন্যতম বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্র। ভারতের এই গুরুত্ব অনুধাবন করে রুশ সম্রাট পিটর দি গ্রেট্ (মহামতি পিটর) বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে "মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতে বাণিজ্যবিস্তারের অর্থই হল সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য। যে ইউরোপীয় জাতি এটি হস্তগত করতে সক্ষম হবে সে জাতি ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে উঠবে।"

শিক্ষা

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে শিক্ষা একটি বিশেষ অবহেলিত বিষয় ছিল না। কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থা সামূহিক বিচারে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। চিরাচরিত ধারায় শিক্ষা দেওয়া হত, প্রতীচ্যের বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে এই শিক্ষার সম্পর্কমাত্র ছিল না। সাহিত্য. আইন, ধর্ম, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, এই সব ছিল অধীতব্য বিষয়। পদার্থবিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান,- প্রযুক্তিবিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদি তৎকালীন ভারতে সাধারণ পাঠ্য বহির্ভূত বিষয় ছিল। সমাজের বাস্তব অবস্থাও তার যুক্তিসঙ্গত সমাধানের বিষয়ে কোন চিন্তাভাবনা তদানীন্তন শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ছিল। কোনরূপ মৌলিক চিন্তাভাবনাকে শিক্ষাজগতে নিরুৎসাহিত করা হত। আবহমান কাল ধরে অনুসৃত সেই প্রাচীনকাললব্ধ শিক্ষা বা জ্ঞানই তদানীন্তন কালে শিক্ষা সম্বন্ধে শেষ কথা রয়ে গিয়েছিল।

দেশের নানা স্থানে উচ্চশিক্ষাদান কেন্দ্রগুলি ছড়ানো ছিল। সাধারণতঃ রাজা, নবাব ও ধনী জমিদারদের অর্থসাহায্যে এগুলি পরিচালিত হত। হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা ছিল সংস্কৃতকেন্দ্রিক। শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। ফার্সী ভাষা সেকালে ছিল সরকারী কাজকর্মের মাধ্যম, এই কারণে শুধু মুসলমানেরই নয় হিন্দুরাও ফার্সী শিখতে উৎসাহিত হত। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদেই ফার্সী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জনপ্রিয় ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ছিল। হিন্দুদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শহর ও গ্রামের শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। মসজিদের সঙ্গে যুক্ত মৌলভীদের দ্বারা চালিত মক্তবগুলি থেকে মুসলমান ছেলেরা শিক্ষা পেত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেরা অক্ষর চিনে লিখতে শিখত এবং অঙ্কও শিখত। হিন্দুদের মধ্যে এই শিক্ষা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও বৈশ্য শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তথাকথিত নিম্নবর্ণের ছেলেদেরও এই শিক্ষা গ্রহণ করতে দেখা যেত। এটা লক্ষ্য করার মত বিষয় যে পরবর্তী ব্রিটিশ শাসনকালে শিক্ষিতের হার সেই আমলের শিক্ষিতের হারের তুলনায় অধিক হয়ে উঠতে পারেনি। তৎকালীন শিক্ষার মান আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় যথেষ্ট মনে না হলেও তখনকার দিনের সীমায়িত প্রয়োজনের তুলনায় তা পর্যাপ্তই ছিল। তখনকার দিনের শিক্ষাজগতের

একটা সন্তোষজনক দিক ছিল এই যে শিক্ষক মহাশয়েরা সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত শ্রেণীরূপে বিবেচিত হতেন। তখনকার দিনের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি এই ছিল যে মেয়েদের শিক্ষালাভে উৎসাহ দান করা হত না। উচ্চবর্ণের মেয়েদের মধ্যে অবশ্য কোন কোন সময়ে শিক্ষালাভের প্রবণতা দেখা যেত।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অতীতভিত্তিক ও প্রগতিবিমুখ ছিল। দেশের সর্বত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অবশ্য এক প্রকারই ছিল না। ভারতবর্ষের সব হিন্দু ও সব মুসলমান যে দু'টি সুস্পষ্ট সমাজে বিভক্ত ছিল এমন কথা বলা যেতে পারে না। ভারতবর্ষের মধ্যে ধর্মের বিভিন্নতা অবশ্যই ছিল কিন্তু নিছক ধর্ম বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মিল ছিল না, একথা ঠিক নয়। ধর্মের সঙ্গে আঞ্চলিক, ভাষা, সম্প্রদায় ও বর্ণভেদও জনজীবনে সক্রিয় ছিল। দেশে সমগ্র জনতার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ছিল উচ্চতর শ্রেণী বা অভিজাত সম্প্রদায়, এদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি অনভিজাত শ্রেণীর থেকে বহু বিষয়ে ভিন্ন ধরনের ছিল।

হিন্দুদের সামাজিক জীবনে বর্ণ বা জাত ছিল সবচেয়ে বড় ব্যাপার। হিন্দুদের ছিল চার বর্ণ, এই চার বর্ণের মধ্যে আবার অনেক রকমের 'জাত' (জাতি) ছিল। এদের আচার আচরণ, প্রকৃতি প্রভৃতি ছিল এক এক অঞ্চলে এক এক রকম। এই জাতের বন্ধন ছিল অপরিবর্তনীয়। সামাজিক জীবনে এক একটি জাতের মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়রূপে নির্দিষ্ট ছিল। উচ্চতর বর্ণগুলির শীর্ষে ছিল ব্রাহ্মণের স্থান, সবকিছু সামাজিক মর্যাদা ও সুবিধা এদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জাতের বন্ধন ছিল খুবই দৃঢ়। এক জাতের সঙ্গে অন্যজাতের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্নবর্ণের ছোঁয়া খাদ্য স্পর্শ করত না। বহু ক্ষেত্রে এই 'জাত' থেকেই মানুষের পেশা নির্দিষ্ট হয়ে যেত, তবে এর ব্যতিক্রমও দেখা যেত। এক এক 'জাত'-এর জন্য এক একটি বিশেষ জীবনযাত্রা প্রণালী নির্দিষ্ট ছিল। সমাজপতি অথবা কোন একটি বিশেষ জাতের পঞ্চায়েত সেই বিশেষ জাতের পক্ষে পালনীয় বিধি-নিষেধগুলি ঠিক ঠিক অনুসৃত হচ্ছে কিনা তার উপর লক্ষ্য রাখত। জাতের পক্ষে নিষিদ্ধ কোন কাজ করার জন্য দোষীকে জরিমানা

দিতে হত বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। এই আজ্ঞা না মানলে অভিযুক্তকে জাতিচ্যুত করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে জাতীয় সংহতি-হীনতার একটি মূল কারণ ছিল জাতিভেদ প্রথা। একই গ্রামে বা অঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দুদের মধ্যে এই জাতিভেদের প্রাচীর সমাজকে বহুধা বিভক্ত করে রেখেছিল। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেও একটি ঐক্য বা সংহতি গড়ে উঠতে দেয়নি। তবে যে কোন জাতিভুক্ত যে কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে বড় চাকুরী বা উচ্চপদ লাভ করে, উচ্চতর সামাজিক স্তরে আরোহণ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়ে উঠত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহারাষ্ট্রের হোলকার পরিবারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কথনও কথনও অবশ্য দেখা যেত একটা গোটা 'জাত' স্বচেষ্টায় উচ্চতর শ্রেণীতে উঠে পড়তে পেরেছে। তবে এটা খুব অল্প ক্ষেত্রেই সম্ভব হত।

ইসলাম ধর্মে মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের কোন স্থান নেই। তত্রাচ, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি বেশ ক্রিয়াশীল ছিল। বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায় ভেদবুদ্ধির সঙ্গে সামাজিক বা আর্থিক অবস্থার তারতম্য বিচার মুসলমানদের মধ্যেও বর্তমান ছিল। ধর্মমত নিয়ে সিয়া ও সুন্নী অভিজাতদের মধ্যে অনেক সময় ঝগড়া বাধত। মুসলমান অভিজাত ও উচ্চপদস্থগণের মধ্যে ইরাণী, তুরাণী, আফগানী বা হিন্দুস্তানী বংশ-গৌরব নিয়ে বিচ্ছিন্নতা বোধ ছিল। এরা স্ব স্ব উঁচু-ঘরের গৌরবে অপরকে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত ছিল। বহু হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েও উচ্চজাত বংশের অভিমান মনে মনে পোষণ করত, এবং নীচবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সামাজিকভাবে এড়িয়ে চলত। অবশ্য হিন্দু থাকা কালে নীচবর্ণের প্রতি ঘৃণার তীব্রতা মুসলমান ধর্ম অবলম্বনের পর পরিমাণে অনেকটা কম থাকত। মুসলমান সমাজেই ছিল দুটি শ্রেণী। 'শরীফ' শ্রেণী বলে গণ্য হত অভিজাত সম্প্রদায়, মৌলভী ও মোল্লা এবং সেনাধ্যক্ষ বা উচ্চ রাজকর্মচারীগণ। এই শরীফ শ্রেণী আজলাফ, বা নীচু জাতের মুসলমান বলে অন্যদের অবজ্ঞা করত। 'আজলাফ'দের প্রতি শরীফদের এই অবজ্ঞা বা ঘৃণা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিম্নবর্ণের প্রতি ব্যবহারের সমতুল্যই ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে পরিবার প্রথা সাধারণতঃ পিতৃ-কেন্দ্রিক ছিল। একটি পরিবারের সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই হতেন পরিবারের কর্তা।

উত্তরাধিকার পুরুষ সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। অবশ্য, কেরলে মাতৃ-তান্ত্রিক পরিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। কেরলের বাইরে, স্ত্রীজাতিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে পুরুষ শাসিত বা পুরুষ নির্ভর হয়ে থাকতে হত। স্ত্রীজাতি শুধু জননী বা স্ত্রীর ভূমিকাই নেবে, সমাজ এটাই চাইত। অবশ্য জননী বা স্ত্রীর ভূমিকায় নারী জাতির প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হত। এমন কি যুদ্ধ বা অরাজকতার সময়েও নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান দেখানো হত। উপদ্রবকারীদের হাতে নারী-লাঞ্ছনা বা অপমানের ঘটনা খুবই বিরল ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবে জে. এ. ডুবোইস (Abbe J. A. Dubois) নামে একজন পর্যটক এ সম্বন্ধে লিখেছেন "একজন হিন্দুনারী একাকিনী যে কোন স্থানে চলাফেরা করতে পারেন, তা সে স্থান যতই জনবহুল হক না কেন। এইসব জায়গায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে এমন লোকেরা যে মেয়েদের দিকে খারাপ চোখে তাকাবে বা হাসি মস্করা করবে এমন ভয় মেয়েদের করতে হয় না, কারণ মেয়েদের অসম্মান করার সাহস তাদের থাকে না।...যে বাড়ীতে কোন মহিলা একা বাস করে সেটি যেন একটি পবিত্র সংরক্ষিত এলাকা রূপে বিবেচিত হয়। অতি নির্লজ্জ লম্পটও এই গৃহে ঢোকার কথা তার চিন্তাতেও আনতে পারে না।" সেকালে নারীদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব-চেতনা খুব অল্পই পরিলক্ষিত হত। তবে এর ব্যতিক্রম দেখা যেত না এমন নয়। অহল্যাবাঈ 1766 থেকে 1796 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে ইন্দোর রাজ্য পরিচালন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান নারী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন। উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের গৃহের বাইরে গিয়ে কোন কাজ করার পক্ষে সামাজিক বাধা থাকলেও কৃষক-রমণীরা ক্ষেতের কাজ করত। পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য তথাকথিত দরিদ্রশ্রেণীর মেয়েরা বাড়ীর বাইরে নানারকম কাজকর্মে যোগ দিত। পর্দা বা অবরোধ প্রথা সাধারণতঃ উত্তর ভারতের উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ ভারতে এর প্রচলন ছিল না।

ছেলেমেয়েদের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল। পরিবারের কর্তাব্যক্তিগণ ছেলেমেয়েদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে দিতেন। পুরুষদের একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, তবে বেশ সচ্ছল পরিবারের পুরুষেরাই একাধিক বিবাহ করত। সাধারণভাবে এক-স্ত্রী বিবাহ প্রথাই তৎকালীন

ভারতে প্রচলিত ছিল। অপর দিকে, মেয়েদের জীবদ্দশায় একবার বিবাহই সমাজ-সম্মত ছিল। দেশের সর্বত্র বাল্য-বিবাহই প্রচলিত ছিল! অনেক সময় তিন বা চার বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বিবাহ হতে দেখা যেত।

উচ্চশ্রেণীর সমাজে বিবাহ দূষিত পণপ্রথা ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে প্রচুর অর্থব্যয় সাপেক্ষ ছিল। পণ-প্রথার মত দূষিত প্রথার প্রকোপ বিশেষভাবে বাংলা ও রাজপুতানায় ব্যাপকভাবে দেখা যেত। মহারাষ্ট্রে পেশোয়াগণের বিশেষ চেষ্টায় এই কুপ্রথার তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল।

জাতিভেদ প্রথা ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে আর দু'টি দুষ্কৃত ছিল—সতীদাহ প্রথা ও বৈধব্য। সতীদাহ প্রথার অর্থ ছিল মৃত স্বামীর চিতায় বিধবা স্ত্রীর জীবন্ত অবস্থায় সহমরণ। রাজপুতানা, বাংলা এবং উত্তর ভারতের আরও কিছু কিছু অংশে এই কুপ্রথা বর্তমান ছিল। দক্ষিণ ভারতে এর বিশেষ চলন ছিল না। এমন কি রাজপুতানা ও বাংলায় সতীদাহ প্রথা রাজা, বড় জমিদার ও উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চবর্ণের বা উচ্চসামাজিক মর্যাদাযুক্ত শ্রেণীর বিধবাদের মধ্যে পুনর্বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল না, তবে কোন কোন অঞ্চলে জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ সমাজ-সম্মত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মহারাষ্ট্রের অব্রাহ্মণদের মধ্যে, জাঠ এবং উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য জাতিদের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ বেশ প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ হিন্দু বিধবার জীবন খুবই বেদনাদায়ক হত। তাদের খাদ্য, পোশাক, চলাফেরা সবই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। সাধারণভাবে সমাজ চাইত যে একজন বিধবা মহিলা পার্থিব সুখ ভোগ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে তার স্বামীর পরিবার অথবা তার ভ্রাতার পরিবারের নিঃস্বার্থ সেবায় জীবন অতিবাহিত করবে। স্বামীর পরিবার বা নিজ ভ্রাতার পরিবার এই দুই জায়গার যেখানেই সে আশ্রয় নিক না কেন, আজীবন তাদের মন জুগিয়ে তাদের সেবা করে যেতে হবে। সহানুভূতি-প্রবণ বহু ভারতীয় ব্যক্তি বিধবাদের প্রতি সমাজের এই কঠোরতা বা নির্মমতায় ব্যথা বোধ করতেন। অম্বরের রাজা সওয়াই জয়সিংহ ও মারাঠা সেনাপতি পরশুরাম ভাও সমাজে বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনধারা নিষ্প্রাণ হয়ে উঠেছিল। কারণ পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলির বাঁধাধরা ধারাতেই এটি প্রবাহিত ছিল। এই

সাংস্কৃতিক জীবন ছিল একেবারে অতীতনির্ভর ও গতানুগতিক। এই সংস্কৃতিধারার পেছনে সাধারণভাবে রাজদরবার, শাসককুল, অভিজাত শ্রেণী বা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য ছিল। বিত্তশালী ব্যক্তিদের আর্থিক দুর্গতির কারণে সাংস্কৃতিক উদ্যমগুলির বিকাশ উপেক্ষিত হয়েছিল। রাজা, রাজ-পরিবারের লোকজন ও অভিজাত শ্রেণীর উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য নির্ভর শিল্পকলাগুলির অবনতি বেশ তাড়াতাড়িই দেখা দিয়েছিল। মুঘল স্থাপত্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে এই অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের কারণে মুঘল-শৈলীর বহু চিত্রশিল্পী দিল্লী থেকে প্রাদেশিক রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতার ভরসায় অর্ধস্বাধীন বা স্বাধীন রাজ্যগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল। একদা মুঘল দরবারের আশ্রিত এই শিল্পীগণ হায়দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর এবং পাটনায় থেকে নিজেদের শিল্পচর্চায় ভালভাবেই মনোনিবেশ করেছিল। এই সময় মুঘল-শৈলী থেকে স্বতন্ত্র নূতন ধাঁচের চিত্রকলার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা বিশিষ্টতাও লাভ করতে পেরেছিল। কাংড়া ও রাজপুত শৈলীর চিত্রকলায় সজীবতা ও সুরুচির বিকাশ লক্ষিত হয়েছিল। স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ-এ নির্মিত ইমামবরায় নির্মাণকৌশল পরিলক্ষিত হলেও সেখানে মার্জিত শিল্প-সুষমার অবক্ষয়ের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অপর দিকে, জয়পুর শহর এবং এর সৌধাবলী থেকে এটা পরিস্ফুট হয়েছিল যে, ভারতের স্থাপত্যশিল্প তার প্রাণময়তা তখনও হারিয়ে ফেলেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সঙ্গীতকলা অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পেরেছিল। সঙ্গীতকলার ক্ষেত্রে সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল।

প্রায় সকল ভারতীয় ভাষাতেই এই সময়ে কাব্য-রচনার ধারা জীবনের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। যেসব কবিতা রচিত হ'ত সেগুলিতে প্রাণের স্পর্শ থাকত না। সেগুলি গতানুগতিক, বাক্-বহুল, প্রাণ-হীন ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। তখনকার দিনে জনমানসে যে হতাশা ও সন্দিগ্ধতার উদ্ভব হয়েছিল নৈরাশ্যব্যঞ্জক এই রচনাগুলিতে সেই ভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছিল। এই রচনাগুলির বিষয়বস্তু থেকেই ধরা পড়ত যে যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের কাব্য সৃষ্টি হয়েছে সেইসব রাজা-উজীর-

অভিজাত শ্রেণীর আধ্যাত্মিক জীবন কতদূর নিম্নগামী হয়েছিল। এদের রুচি নিম্নগামী না হলে এই ধরনের সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহিত্যের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল উর্দু ভাষার প্রসার এবং উর্দু-কাব্যসাহিত্যের ক্রমোন্নতি। উর্দু ভাষা ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের উচ্চশ্রেণীর মানুষদের পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় ভাষাসমূহের কাব্য-সৃষ্টিতে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল, উর্দু কবিতা সমসাময়িক কালের সেই ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। এতৎসত্ত্বেও এই সময়ে উর্দু সাহিত্যে মীর, সৌদা, নাজির প্রভৃতি শক্তিমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন কবি মীর্জা গালিব।

উর্দু সাহিত্যের মতই এই সময়ে মালয়ালম সাহিত্যে একটা নবযুগের উন্মেষ হয়েছিল। মার্তণ্ডবর্মা, রামবর্মা প্রভৃতি ত্রিবাঙ্কুর নৃপতিদের পৃষ্ঠ-পোষকতার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। নিত্যব্যবহৃত মানুষের কথ্য-ভাষায় জনপ্রিয় কবিতা রচনা করে এই কালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন কেরলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে পরিগণিত কুঞ্চন নাম্বিয়ার। এই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই কেরলের কথাকলি সাহিত্য, অভিনয় ও নৃত্য সমধিকরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই শতাব্দীতেই প্রাচীর চিত্রযুক্ত ও স্থাপত্য-কীর্তি হিসেবে অতি বিশিষ্ট পদ্মনাভম্ প্রসাদটি নির্মিত হয়েছিল।

তামিল সাহিত্যের 'সিত্তার' কাব্যধারার অন্যতম স্মরণীয় পথিকৃৎ ছিলেন তায়াউমানাবর (1706—44)। অন্যান্য 'সিত্তার' ধারার কবিদের মতই ইনি স্বরচিত কব্যে জাতিভেদ প্রথা এবং জনসাধারণের দেব-মন্দিরের দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আসামে আহোম রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় অসমীয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুজরাটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি দয়ারামের আবির্ভাব হয়েছিল। এই সময়েই পাঞ্জাবীতে 'হীর-রঞ্ঝা' নামে বিখ্যাত রোমান্টিক মহাকাব্য রচিত হয়েছিল, রচয়িতার নাম ওয়ারিশ শা। এই শতাব্দীতে সিন্ধি ভাষার সাহিত্যেরও প্রভূত উন্নতি দেখা দিয়েছিল। 'রিসালো' নামীয় বিখ্যাত কাব্য-সংগ্রহের কবিতাগুলি এই সময়ে শা আব্দুল লতিফ রচনা করেছিলেন। এই শতাব্দীর অন্যান্য প্রখ্যাত শিল্পী কবিদের মধ্যে সচল ও সামির নাম করা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। একটি দীর্ঘ শতাব্দী জুড়ে ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিম জগতের তুলনায় বহু পিছনে পড়েছিল। বিগত দুইশত বৎসর ধরে পশ্চিম ইউরোপে বিজ্ঞান ও আর্থিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন ও কর্ম-চাঞ্চল্যের ফলস্বরূপ বহু নূতন বিষয় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়েছিল। পশ্চিমদেশীয় মানুষের বিজ্ঞান-মনস্কতার কারণে তাদের দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারাগুলিও আমূল পরিবর্তিত হয়ে উঠেছিল। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ছাপ তাদের সামাজিক জীবন ও প্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রভাবিত করেছিল। প্রাচীন ভারতে গণিত ও বিজ্ঞানের চর্চায় ভারতীয় পণ্ডিতদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক সূত্র আবিষ্কার ও সংযোজন ভারতেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তী অনেকগুলি শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান-চর্চা ভারতে অবহেলিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় মানস গতানুগতিকতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছিল। অভিজাত শ্রেণী থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলেই অতিমাত্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাধনা ও সাফল্যের বিষয়ে ভারতবাসী সম্পূর্ণ অনবহিতই রয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে যাঁরা রাজ্য পরিচালনা করতেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁদের কোনই ঔৎসুক্য বা আগ্রহ ছিল না। পাশ্চাত্যদেশীয় মারণাস্ত্র সংগ্রহ ও পাশ্চাত্যদেশীয় সমর-কৌশল আয়ত্ত করা ছাড়া পাশ্চাত্ত্যের আর কিছু সম্বন্ধে তাঁদের গভীর ঔদাসীন্য লক্ষিত হ'ত। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এই অনগ্রসরতা ও ঔদাসীন্য বহুল পরিমাণে ভারতের ইংরাজের অধীনতা পাশে বদ্ধ হওয়ার অন্যতম হেতু এটা বলা যেতে পারে। কারণ ইংরাজ ছিল তদানীন্তন কালের সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর দেশের মানুষ। এদের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই চালানো ভারতের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

প্রতিপত্তি এবং অর্থের জন্য পারস্পরিক সংঘর্ষ, আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি, সামাজিকভাবে পশ্চাৎপরতা এবং সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা ভারতের একশ্রেণীর মানুষের নৈতিকতার উপর সুদূরপ্রসারী অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষভাবে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অবক্ষয় কার্যকর হয়েছিল। এদের ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবন দূষিত হয়ে পড়েছিল। আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার জন্য এঁরা দায়বদ্ধ ছিলেন,

কিন্তু আত্ম-স্বার্থ-সিদ্ধির লোভে এঁরা নির্দ্বিধায় উপরোক্ত কর্তব্য বা মনোভাব যথাসময়ে বিসর্জন দিতেন। অভিজাত শ্রেণীর বহু ব্যক্তিই পাপাচারী ও অতিরিক্ত বিলাসী হয়ে উঠেছিলেন। রাজকার্যের কোন দায়িত্বশীল পদে থেকে এঁদের অনেকেই উৎকোচ গ্রহণ করতেন। এটা বেশ আশ্চর্যজনক যে, এই পরিবেশে সাধারণ মানুষের নৈতিক জীবনের মান লক্ষণীয়রূপে হ্রাস পায়নি। সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে তাদেব উচ্চ-নীতিবোধ ও সচ্চরিত্রতাই প্রতিফলিত হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ 1821 খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একজন সুপরিচিত ও উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারী জন ম্যালকমের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রবিপ্লব ও অত্যাচারী শাসনের মধ্যে বাস করেও এ দেশের অধিকাংশ মানুষ যে পরিমাণ উচ্চনৈতিকতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণাবলী বজায় রাখতে পেরেছে তা বিস্ময়কর। অনুরূপ পবিবেশে এত সৎ মানুষ অন্য কোথাও পাওয়া যাবে আমি তা ভাবতে পারি না।"

এই রাজকর্মচারী ভারতে চৌর্যবৃত্তি, মাতলামি ও গুণ্ডামির মত অতি সাধারণ ধরনের পাপাচারের অনুপস্থিতির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। ক্র্যাণফোর্ড নামে আর একজন ইউরোপীয় লেখকও এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"তাদের (ভারতীয়দের) নীতিবোধ অপরের উপকার ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। এদের নীতি হল আতিথেয়তা ও দান। এই নীতি শুধু কেতাবী শিক্ষার মধ্যেই আবদ্ধ নয়, বাস্তব জীবনেও এটি সদা অনুসৃত অভ্যাস। আমার এই বিশ্বাস যে আতিথেয়তা ও অপরকে সাহায্যদানে হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোন সমাজ জগতের মধ্যে আর কোথাও দুর্লভ।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির ভাব একটা বেশ সুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। তখনকার দিনে রাজা ও সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মানুষেরা অবিরত পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ অথবা কলহে অবশ্যই লিপ্ত থাকত। যুদ্ধ ও কলহে দুই পক্ষেরই সাহায্যকারী মিত্র থাকত। যুদ্ধ বা কলহের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ বা মিত্র নির্বাচনে কে কোন ধর্মাবলম্বী সেই বিচার আদৌ করা হত না অর্থাৎ সব হিন্দু মিলে কোন মুসলমানধর্মী রাজাকে আক্রমণ করবে এবং এঁর সাহায্যকারীগণ সবাই যে শুধু মুসলমান ধর্মাবলম্বী হবে এমন ব্যাপার কখনই দেখা যেত না। এক কথায় বলা যেতে পারে,

যুদ্ধবিগ্রহগুলি ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ। যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মের নাম কখনই টেনে আনা হত না। কার্যতঃ তৎকালে দেশে সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান বা তিক্ততা এবং পরধর্মদ্বেষিতার মনোভাব অতি অল্পই ছিল। উচ্চ-নীচ সকলশ্রেণীর মানুষ অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখত এবং অপরের ধর্মাচারণে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিত, এমন কি একটা ধর্ম-সমন্বয়ের মনোভাবও গড়ে উঠেছিল। "হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্কের মত"। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভ্রাতৃভাব বিশেষভাবে গ্রাম ও সহরের সাধারণ মানুষের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হত কে কোন ধর্মাবলম্বী এই ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত থেকে সাধারণ ভারতবাসী পরস্পরের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করত।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যতীত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও হিন্দু ও মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা লক্ষিত হত। হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ রীতিনীতি মিলিয়ে যে একটি মিলিত সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়েছিল তার পরিপুষ্টি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অব্যাহত ছিল। অনেক সময় দেখা যেত, হিন্দু-লেখক ফার্সীতে সাহিত্য রচনা করছেন আর মুসলিম লেখকের রচনার মাধ্যম হিন্দী, বাংলা অথবা অন্য কোন ভারতীয় ভাষা। এই রচনা-গুলির বিষয়বস্তু প্রায়ই থাকত হিন্দু-সমাজজীবন অথবা হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক—রাধাকৃষ্ণ, রাম সীতা অথবা নল-দময়ন্তী প্রসঙ্গ। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে এটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দু ও মুসলিম উভয়শ্রেণীর প্রিয় মিলনক্ষেত্র।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে আস্থা ও আদান-প্রদানের মনোভাব বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল। এর মূলে ছিল হিন্দুধর্মের মধ্যে ভক্তি ও মুসলিমদের মধ্যে সুফী ভাবধারার প্রসার। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অপরের ধর্মে শ্রদ্ধা এবং আদান-প্রদান প্রবণতা অব্যাহত ত ছিলই, এমন কি এটা বেশ দৃঢ়মূল হয়েছিল। বহু হিন্দু মুসলিম-সাধকদের ভক্ত হয়ে উঠেছিল। বহু মুসলমান হিন্দু-সাধক ও হিন্দুর উপাস্য দেব-দেবীর প্রতি অনুরূপ ভক্তিভাব পোষণ করত। মুসলমান রাজা অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ হিন্দুদের হোলি, দেওয়ালি ও দুর্গা পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলিতে আনন্দের সঙ্গে যোগদান যেমন করত তেমনি-ভাবে হিন্দুরাও মহরমের শোভাযাত্রায় অংশ নিত। এখানে বিশেষভাবে

উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের এক মহান্ পুরুষ রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম ও দর্শন দ্বারা সমান-ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এটা স্মরণ রাখা দরকার, যে তৎকালীন ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন একই ধরনের ছিল না, তার দুটি স্তর ছিল। তবে এই বিভিন্নতার মূলে কোন ধর্মের স্থান ছিল না। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিমদের জীবনধারা ছিল একই ধরনের আবার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিম শ্রেণীর জীবনধারা ছিল অন্য ধরনের। সর্বশ্রেণীর হিন্দু সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের থেকে অন্য এক জীবনধারা অনুসরণ করেছে এমনটি ঘটত না। অর্থাৎ জীবনধারার ভিন্নতা ছিল শ্রেণীনির্ভর, ধর্মনির্ভর নয়। এমনিভাবে দুই প্রবহমান সংস্কৃতির মধ্যে যে তফাৎ দেখা যেত সেটার কারণও ছিল আঞ্চলিক রূপ-ভেদ, ধর্মীয় নয়। এক একটি প্রদেশ বা অঞ্চলে একই ধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চরিত্র ফুটে উঠতে দেখা যেত। এক অঞ্চলের সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একই ধরনের হয়ে উঠত। একটি বিশেষ ধর্মের প্রভাবযুক্ত এমন কোন বিশেষ ধরনের সংস্কৃতি ছিল না যা ভারতের সর্বত্রই প্রতিফলিত দেখা যেত। আবার এই সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার আর একটি কারণ ছিল নগর বা গ্রাম। নগরবাসী বা গ্রামবাসী দুইপ্রকার ভিন্ন জীবনধারার পথিক ছিল। মোট কথা ধর্মীয় ভেদ-বুদ্ধি ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

অনুশীলনী

1. হায়দ্রাবাদ, আউধ ও বাংলার শাসকদের শাসন-নীতি বিশ্লেষণ কর।
2. টিপু সুলতানের চরিত্র ও তাঁর কার্যাবলী বিচার করে তাঁর বিষয়ে আলোচনা কর।
3. অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে শিখজাতির অভ্যুদয় বর্ণনা কর। পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের শাসন-নীতি কিরূপ ছিল তাহা আলোচনা কর।
4. প্রথম তিন পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান কিরূপে সম্ভব হয় লিখ। এই সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বিশ্লেষণ কর।
5. অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা এই বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা কতদূর প্রভাবিত হয়েছিল তাহা লিখ।
6. অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল? এই বিষয়ে উচ্চ-শ্রেণী বা জাতির সহিত নিম্নশ্রেণী বা জাতির জনসাধারণের কতকগুলি পার্থক্যের উল্লেখ কর।

7, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাগুলি বিশ্লেষণ কর। এই বিকাশধারায় অভিজাতমণ্ডলী, শাসকশ্রেণী বা নৃপতিগণের প্রভাব কতদূর ছিল তাহা বর্ণনা কর।

8. অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। এই শতাব্দীতে রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব কতদূর কার্যকর ছিল তা বর্ণনা কর।

9. নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ—

(a) অম্বরের রাজা জয়সিংহ (b) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (c) হায়দর আলি (d) অষ্টাদশ শতাব্দীর কেরল (e) ভরতপুরের জাঠ রাজ্য (f) অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা (g) অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে বিজ্ঞান (h) অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে কৃষকের অবস্থা।

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সূচনা

গ্রীক্ জাতির সময় থেকে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এটি ঘটেছিল বেশ প্রাচীন কালে। মধ্যযুগে ভারতের সঙ্গে একদিকে ইউরোপের, অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে একাধিক পথে বাণিজ্য চলত। ইউরোপের জন্য বাণিজ্যিক লেনদেন পথের একটি ছিল জলপথে—পারস্য উপসাগর দিয়ে। পরে বাণিজ্যিক সম্ভার স্থলপথ ধরে ইরাকের মধ্য দিয়ে তুরস্কে পৌছাত। এখান থেকে আবার ছিল জলপথ—ভেনিস অথবা জেনোয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় পথটি ছিল লোহিত সাগর দিয়ে, তারপর আবার স্থলপথ ধরে ঈজিপ্টের আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত। এখান থেকে আবার জলপথ দিয়ে ভেনিস ও জেনোয়া পর্যন্ত। তৃতীয় একটি স্থলপথ ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গিরি-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়া ও রুশ দেশ ভেদ করে বাল্টিক সাগরের উপকূল পর্যন্ত। এই পথটি অবশ্য কমই ব্যবহৃত হত। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রধানতঃ আরব দেশীয় বণিক্ ও নাবিকদের সাহায্যে চলত। অপরদিকে ভূমধ্যসাগরীয় ও ইউরোপীয় ভূখণ্ডে মূলতঃ ইতালী দেশীয়েরা এই কাজ চালাত। এশিয়া দেশের মালপত্র ইউরোপে পৌছানর পথে বহু রাজ্য পার হতে হ'ত। এগুলি পরিবহনের দায়িত্বভার একদল মানুষের হাতেই বারবার থাকা সম্ভব হত। দলের মধ্যেও পালাবদল করতে হত। প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে মালপত্র পরিবহনের শুল্ক ও অন্যান্য কর দিতে হত এবং প্রত্যেক বণিক্ই মাল থেকে ভাল রকম লাভ উঠিয়ে নিত। এছাড়াও মাল পরিবহনের পথে বহু বাধা ছিল—চোর ডাকাত বা জলদস্যুর উপদ্রব এবং জল-ঝড়ের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এই সব বাধা সত্ত্বেও এই বহির্বাণিজ্য প্রচুর লাভজনক ছিল। ইউরোপের বাজারগুলিতে প্রাচ্যদেশীয় মশলাপাতির প্রচুর চাহিদা ছিল, দাম বেশী হওয়ার জন্য এই ব্যবসায়ে লাভের অঙ্ক বেশ ভারী হয়ে উঠত। শীতকালে—ইউরোপে

গৃহপালিত জীবজন্তুদের খাওয়ার জন্য ঘাসের অভাব দেখা দিত। ইউরোপীয় জনসাধারণকে নুন ও ঝাল দিয়ে মাংস খেতে হত। প্রচুর মশলা সংযোগ মাংস সুস্বাদু করার একমাত্র উপায় ছিল। এই খাদ্য সুস্বাদু করার জন্যই ইউরোপে মশলার কদর বেড়ে উঠেছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় আহার্যবস্তুতে মশলার প্রচলন ভারতের মতই ব্যাপক ছিল।

1453 খ্রীষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার তুর্কী জাতির এক শাখা অটোমেন তুর্কীরা এশিয়া মাইনর অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে কন্‌স্‌টান্টিনোপল অধিকার করে নিয়েছিল। ফলে এই সময় থেকে এশিয়া হয়ে পশ্চিমদেশগামী বাণিজ্যপথটি তুর্কীদেরই নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল। তদুপরি, ভেনিস ও জেনোয়ার বণিক্‌রা ইউরোপ ও এশিয়ার অন্তর্বাণিজ্য একচেটিয়া করে নিয়েছিল। ইউরোপের নবঅভ্যুদয় প্রাপ্ত স্পেন ও পর্তুগালের বণিক্‌দের তারা তাদের বাণিজ্যপথে একচেটিয়া ব্যবসায়ের কোন ভাগ দিতে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। পশ্চিম ইউরোপের স্প্যানীশ ও পর্তুগীজদের মত ব্যবসায়ী জাতির ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। কারণ এটা ছিল খুবই লাভজনক। মশলা আমদানি করা আর সেই ব্যবসা থেকে ধনার্জনের সম্ভাবনা ছিল খুবই উৎসাহজনক। ভারতের অতুলনীয় সমৃদ্ধির কথা তাদের বেশ ভালভাবেই জানা ছিল। ইউরোপের সর্বত্র তখন সোনা দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে গেলে সোনার বিনিময়েই তা করা সম্ভব ছিল। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি এবং বণিক্ সম্প্রদায় ভারতে এবং মশলা দ্বীপ ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার জন্য একটা নূতন এবং নিরাপদ জলপথ আবিষ্কার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এই অঞ্চল তখন তাদের কাছে 'ইস্ট ইণ্ডিজ্' রূপে পরিচিত ছিল। তারা ভিনীসীয় ও আরব বণিক্‌দের একচেটিয়া কারবারের পথে কাঁটা দিয়ে এবং তুর্কীদের পথের বাধা এড়িয়ে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য সংস্থাপন করতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এই জাতিগুলি ইতিমধ্যেই অর্জন করে নিয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই এদের জাহাজ-নির্মাণ-কৌশল উন্নত ধরনের হয়ে উঠেছিল, সমুদ্রাভিযানের বিদ্যাও এরা বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপব্যাপী নব-

জাগরণের (রেনেসাঁ) অভ্যুদয়ে জনসাধারণের মনেও নূতন কিছু গড়া বা দুঃসাহসিক অভিযানের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল।

এ বিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিল স্পেন ও পর্তুগাল। এই দুইটি রাজ্যের নাবিকগণ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ভৌগোলিক দিক থেকে নব নব আবিষ্কারের একটি যুগের সূচনা করেছিল। 1494 খ্রীষ্টাব্দে স্পেনদেশীয় কলম্বাস ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তার পরিবর্তে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। 1498 খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল নিবাসী ভাস্কো ডা গামা ইউরোপ থেকে ভারতে আসার উপযোগী একটি জলপথ আবিষ্কার করেন। আফ্রিকা মহাদেশ বেষ্টন করে উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) হয়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের কালিকটে এসে পৌঁছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে জাহাজে যে সব বাণিজ্য-দ্রব্য এনেছিলেন সেগুলি বিক্রি করে দেখা গিয়েছিল যে তাঁর পথখরচের ষাটগুণ দামে সেগুলি বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর লাভের অঙ্কটা বেশ ভারিই হয়েছিল। ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার ও তৎসহ সমুদ্রপথের অন্যান্য জ্ঞানলাভের ঘটনাগুলি বিশ্ব ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা এনে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে এডাম স্মিথ এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে মানবজাতির ইতিহাসে দুটি বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল আমেরিকা ও উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়েছিল। ইউরোপের কাছে নবাবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপ ও এশিয়ার সম্পর্কের মধ্যেও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। নূতন মহাদেশ মূল্যবান ধাতুসম্ভারের দিক থেকে অশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এর স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্পদের প্রবাহে ইউরোপের ব্যবসায়-বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। ইউরোপীয় জাতিগুলি এই সময়ে শিল্প-বাণিজ্য ও বিজ্ঞান জগতে যে অগ্রগতি লাভ করেছিল তার পশ্চাতে ছিল অজস্র অর্থের রসদ। আর এই রসদের অধিকাংশই আমেরিকা থেকে আহৃত স্বর্ণ রৌপ্য ভাণ্ডারের মাধ্যমে এসেছিল। ইউরোপের শিল্পদ্রব্য উৎপন্নকারী বণিকদের অফুরন্ত বিক্রয়কেন্দ্রও হয়ে উঠেছিল আমেরিকা মহাদেশ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় জাতিগুলি আফ্রিকা মহাদেশেও

অনুপ্রবেশ করেছিল। এদের ধনভাণ্ডার স্ফীত হয়ে উঠা বা ধনী হওয়ার একটা প্রধান উপায় হয়ে উঠেছিল তাদের আফ্রিকা অভিযান। প্রথম দিকে বিদেশীরা স্বর্ণ ও হস্তিদন্ত সংগ্রহের লোভে আফ্রিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে দাস-ব্যবসায়কে কেন্দ্র করেও আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগাল ও স্পেনের এই ব্যবসায়-বাণিজ্য একচেটিয়া ছিল। ক্রমশঃ এই ব্যবসায়ে ডাচ্, ফরাসী ও ইংরাজেরাও ঢুকে পড়েছিল। বছরের পর বছর জুড়ে বিশেষতঃ 1650 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে আফ্রিকার মানুষকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ এবং দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকায় দাস রূপে বিক্রয় করা হ'ত। দাস বহনের জাহাজগুলি ইউরোপের শিল্পজাত-সামগ্রী বোঝাই হয়ে ইউরোপ থেকে আফ্রিকা পৌছাত। আফ্রিকার উপকূলে পৌছে এই শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়ে আফ্রিকার নিগ্রোদের ক্রয় করা হত। তারপর নিগ্রো বোঝাই জাহাজগুলি আতলান্টিক সাগর পার হয়ে আমেরিকার উপকূলে পৌছাত। এখানে উপনিবেশজাত কৃষিপণ্য অথবা খনিজদ্রব্যের বিনিময়ে দাসদের ঔপনিবেশিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হত। দাস বিক্রয়লব্ধ কৃষি-পণ্য ও খনিজপদার্থ বোঝাই জাহাজ ইউরোপে ফিরে আসার পর এই দ্রব্যগুলি ইউরোপের বাজারে বিক্রি হত। এই ত্রিমুখী ব্যবসায়-সূত্রে অর্জিত বিপুল অর্থই হয়ে উঠেছিল বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি।

পশ্চিম গোলার্ধের চিনি, তুলা ও তামাকের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে দাসদের চাহিদা খুব বেশী ছিল। দাসদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করা হত, এদের অতিরিক্ত পরিমাণে খাটানোও হত। এইসব কারণে দাসদের মৃত্যুহারও ছিল বেশী। ইউরোপের জনসংখ্যা সীমিত থাকায় নবীন মহাদেশের ভূমি ও খনিগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য সস্তা বেতনের শ্রমিকের জোগান দেওয়া ইউরোপ থেকে সম্ভব ছিল না। আফ্রিকার কত সংখ্যক মানুষ দাসরূপে বিক্রীত হয়েছিল তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে ঐতিহাসিকদের মতে 15 থেকে 50 লক্ষ মানুষ এই দাস ব্যবসায়ের শিকার হয়েছিল।

আফ্রিকার দেশগুলি থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ দাসরূপে অন্যত্র চালান হয়ে যাওয়ার ফলে আফ্রিকার দেশগুলি প্রায় পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল, এখানকার

সমাজব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়েছিল। এই ক্ষতির অন্যদিক ছিল পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিশেষ সমৃদ্ধি। এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল দাস-ব্যবসায় তথা দাসদের কায়িক শ্রমে আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে উৎপন্ন ফসল ও অন্যান্য পণ্যবস্তু। দাস-ব্যবসায় এককভাবেই লাভজনক ছিল। তার উপর দাসদের শ্রমজাত ফসল ও পণ্যসামগ্রীও প্রচুর অর্থ লাভে সহায়তা করত। এই দ্বিবিধ আয়ের একটা মোটা অংশ মূলধন রূপে শিল্পোদ্যোগে লগ্নী হওয়ার ফলে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে একটা শিল্প-বিপ্লব সম্ভবপর হয়েছিল। কিছু পরবর্তীকালে ঠিক এমনিভাবে ভারতের সম্পদ শোষণের ফলেও ইউরোপের শিল্পক্ষেত্রে সমৃদ্ধির বান ডেকেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে দাস-ব্যবসায় অবশ্য নিষিদ্ধ হয়েছিল, তবে এই সময়ে দাস-ব্যবসায় আর আগের মত অর্থকরী ছিল না। যতদিন এটা লাভজনক বিবেচিত হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত এই প্রথার সমর্থন ও প্রশংসা প্রকাশ্যেই করা হত। শাসক-নৃপতি, মন্ত্রীমণ্ডলী, পার্লামেণ্টের সদস্য, খ্রীষ্টীয় ধর্মগুরু সম্প্রদায়, জননায়ক, বণিক্ ও শিল্পপতিগণ সকলেই দাস-ব্যবসায়ের সমর্থক ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইংল্যাণ্ডে রাণী এলিজাবেথ, তৃতীয় জর্জ, এডমণ্ড বার্ক, নেলসন, গ্ল্যাডস্টোন, ডিস্‌রেলী, কার্লাইল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দাস-ব্যবসায়ের সমর্থক ত ছিলেনই এমন কি এটা যে মোটেই দূষণীয় নয় এটাও বিরুদ্ধবাদীদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিক্ ও যুদ্ধ ব্যবসায়ী সৈনিকগণ সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রথমে এশিয়ার দেশগুলিতে কোন রকমে ঢুকে পড়া এবং পরে এই দেশগুলিতে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করার কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিল। এই অনুপ্রবেশ-কৌশল কার্যকরী হওয়ার ফলে ইতালীর শহরগুলি এবং বণিক্-কুল ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল কারণ এই অঞ্চল থেকে ব্যবসায় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রগুলি ধীরে পশ্চিমমুখে আতলান্টিক মহাসমুদ্রের উপকূল ভাগে অপসৃত হচ্ছিল।

প্রায় এক শতাব্দী ধরে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে অতি লাভজনক ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ পর্তুগাল একাই দখল করে বসেছিল। ভারতের মধ্যে কোচিন, গোয়া, দিউ ও দমনে পর্তুগাল তার ব্যবসায় কেন্দ্র বা ঘাঁটি স্থাপন করে নিয়েছিল। প্রথম থেকেই পর্তুগীজগণ ব্যবসায়ের সঙ্গে বলপ্রয়োগ

নীতিও অবলম্বন করেছিল। এই বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের সহায় ছিল তাদের সুসজ্জিত রণতরী। রণতরীর সহায়তায় জলপথে তাদের প্রভুত্ব স্থাপন সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ত। মুষ্টিমেয় পর্তুগীজ সৈন্য ও নাবিকেরা সমুদ্রবক্ষে রণতরীতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে ভারত বা এশিয়ার বহুগুণ বেশী শক্তিশালী স্থলসৈন্যের আক্রমণ রুখতে পারত। এ ছাড়াও তারা এটা বেশ বুঝে নিয়েছিল যে ভারতের শাসনকর্তা বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে পারস্পরিক যে প্রতিযোগিতা বা শত্রুতা বিরাজমান এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারলে তাদের ভবিষ্যতে ভাল হবে। মালাবার উপকূলে নিজেদের ব্যবসায়ের ঘাঁটি ও দুর্গ বানানোর জন্য তারা কালিকট ও কোচিনের রাজাদের মধ্যে বিবাদে হস্তক্ষেপ করেছিল। মালাবার উপকূলে ঘাঁটি গেড়ে তারা আরবদেশীয় জাহাজগুলি আক্রমণ ও ধ্বংস করে দিত। বহু শত আরব নাবিক ও বণিক্দের তারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। মুঘল সম্রাট্দের জাহাজ আক্রমণের ভয় দেখিয়ে তারা মুঘল সম্রাট্দের কাছ থেকেও ব্যবসায় সংক্রান্ত বেশ কিছু সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল।

1510 খ্রীষ্টাব্দে গোয়া দখল করে আলফান্সো দ্য আলবুকুয়ের্ক গোয়ায় পর্তুগীজ রাজার প্রতিনিধি বা 'ভাইসরয়' পদ প্রাপ্ত হন। এরই শাসনকালে এশিয়ার চারিদিকে জলপথে পর্তুগীজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পারস্য উপসাগরস্থিত হরমুজ থেকে মালয়দ্বীপের মালাক্কা এবং ইন্দোনেশিয়ার মশলা দ্বীপসমূহ পর্যন্ত তাদের এই আধিপত্য-সীমা বিস্তৃত ছিল। ভারত সমুদ্রের উপকূলভাগ দখল করে নিজেদের বাণিজ্যবিস্তার ও নূতন নূতন রাজ্য গ্রাসের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে আগত বাণিজ্যসংস্থাগুলিকে হঠিয়ে দিয়ে ভারতের বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠাও তাদের আর একটি অভীষ্ট ছিল। জল ও স্থলে দস্যুবৃত্তি চালাতে পর্তুগীজগণ এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস মিল এ সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন "পর্তুগীজেরা প্রধানতঃ ব্যবসায় করার জন্য বিদেশে যেত কিন্তু ঐ সময়ের ডাচ্ ও ইংরাজদের মতই সুযোগ পাওয়া মাত্রই লুণ্ঠন করত।" ধর্ম বিষয়ে পর্তুগীজরা ছিল অতি উৎসাহী, তাদের চরিত্রে পরধর্মসহিষ্ণুতার লেশমাত্র ছিল না। তারা বলপ্রয়োগ করে

অন্যদের ধর্মান্তরিত করত। "হয় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কর নতুবা মৃত্যুবরণ কর"—আততায়ী রূপে আক্রান্তের প্রতি তাদের এই ছিল নীতি। ভারতবর্ষের মাটিতে এযাবৎ পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতিই বলবৎ ছিল। সুতরাং পর্তুগীজদের এই বলপ্রয়োগের দ্বারা ধর্মান্তরিতকরণ ব্যাপারটি ভারতের জনসাধারণ সুনজরে দেখেনি। পর্তুগীজেরা অন্যের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘনে খুবই অভ্যস্থ ছিল। এই বর্বরতা সত্ত্বেও পর্তুগীজেরা ভারতে তাদের অধিকৃত স্থানগুলি শতাব্দীকালেরও অধিক সময় ধরে নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিল। তাদের এই প্রভুত্ব বজায় থাকার কারণ এই ছিল যে জলপথে এরা ছিল দুর্ধর্ষ, তদুপরি এদের সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসকদের :মধ্যে বেশ শৃঙ্খলাবোধ ছিল। ভারতে পর্তুগীজ শক্তি প্রতিষ্ঠার মূলে আরও একটা কারণ ছিল যে এদের মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তির সম্মুখীন হতে হয়নি, কারণ এই সময় পর্তুগীজ-উপক্রত দক্ষিণ ভারতে মুঘল শক্তির কোন প্রভাবই ছিল না। 1631 খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় পর্তুগীজদের সঙ্গে মুঘল শক্তির সংঘাত বেধেছিল এবং তার ফলে তাদের হুগলীস্থ ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। আরব সমুদ্রে ইতিমধ্যে ইংরাজদের দাপটে এরা দুর্বল হয়ে এসেছিল। গুজরাট্ অঞ্চলে পর্তুগীজ প্রভাব প্রায় বিলীন হয়েছিল।

যাই হোক, পর্তুগীজেরা দীর্ঘকাল ধরে প্রাচ্যদেশে তাদের একচেটিয়া ব্যবসায় ও বিজিত ভূখণ্ডের আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি। পর্তুগালের লোকসংখ্যা ছিল দশ লক্ষেরও কম, এদেশের রাজশক্তি ছিল স্বৈরাচারী। পর্তুগীজ বণিক্‌দের সুযোগ-সুবিধা ও মানসম্মান রাজদরবারে পর্তুগালের অভিজাত ভূস্বামী সমাজের তুলনায় কমই ছিল। জাহাজ নির্মাণ ও জলপথে ব্যবসায় অব্যাহত রাখার জন্য যে প্রেরণা বা সংগঠনের প্রয়োজন সেটা পর্তুগীজদের স্বদেশে আর তেমন জোরদার ছিল না। ধর্ম বিষয়ে পর্তুগীজ জাতির অসহিষ্ণুতাও অব্যাহত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পর্তুগীজ ও স্পেনীয় জাতি ইংরাজ ও ডাচ্‌দের চেয়ে অনেক বেশী উন্নতিমুখী ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমে ইংল্যাণ্ড ও হলাণ্ড এবং কিছু পরে ফ্রান্স তাদের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও নৌ-বলের সাহায্যে বিশ্ববাণিজ্যে স্পেনীয় ও পর্তুগীজ একাধিপত্য ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই

সংঘর্ষের ফলে স্পেন ও পর্তুগাল পশ্চাদাপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। 1580 খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল স্পেনের অধীনস্থ হয়। 1588 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা 'আর্মাডা' নামে খ্যাত স্পেনীয় নৌবহরকে জলযুদ্ধে পরাজিত করে জলপথে স্পেনের আধিপত্য চিরতরে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। এই ঘটনায় ইংরাজ ও ডাচ্ বণিক্‌দের উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতে পৌছাবার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়াতে তাদের পক্ষে প্রাচ্যদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতায় যোগদান সম্ভবপর হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতার পরিণামে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ্‌দের এবং ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মালয়ে ব্রিটিশের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দীর্ঘকাল ধরে ডাচ্ বণিকেরা সমগ্র উত্তর ইউরোপ জুড়ে প্রাচ্য-দেশ-জাত পণ্যের ব্যবসায় চালাত। এই পণ্যদ্রব্যগুলি তারা পর্তুগাল দেশ থেকে ক্রয় করত। এই ব্যবসায় সূত্রে ডাচেরা উন্নত ধরনের জাহাজ নির্মাণ কৌশল, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জাহাজ পরিচালন, সুষ্ঠু ব্যবসায় পদ্ধতি ও সংগঠন কুশলতা আয়ত্ত করে নিয়েছিল। তাদের স্বদেশ নেদারল্যাণ্ডসের (বা হল্যাণ্ড) উপর স্পেনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং স্পেনের সঙ্গে পর্তুগালের সংযুক্তির কারণে ডাচেরা ব্যবসায়ের জন্য মশলা সংগ্রহের বিকল্প একটি কেন্দ্র অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছিল। 1595 খ্রীষ্টাব্দে চারটি ডাচ্ জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল। 1602 খ্রীষ্টাব্দে ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সংগঠিত হয়। ডাচ্‌দের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা পার্লামেণ্ট এদের একটা আজ্ঞা বা অনুমতিপত্র (চার্টার) দিয়েছিল। এই চার্টার বা অনুমতিপত্রে ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ডাচ্ জাতির তরফে যুদ্ধ বা সন্ধি, দেশ জয় ও দুর্গ নির্মাণের অধিকার মঞ্জুর করা হয়েছিল। ডাচ্‌দের প্রধান আকর্ষণের ক্ষেত্র ছিল ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা ও অন্যান্য মশলা সমৃদ্ধ দ্বীপগুলি, ভারতবর্ষ নয়। অনতিকালের মধ্যে তারা মালয় প্রণালী ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে দিয়েছিল। 1623 খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানগুলি অধিকারের জন্য ইংরাজের অভিযানকেও তারা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। এই সময়ে সকলেই ভেবেছিল যে এশিয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্যের সবচেয়ে লাভজনক অংশটুকু একমাত্র ডাচেদের দখলেই থেকে গিয়েছে। ডাচেরা ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করে নিয়ে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে অবশ্য সরে যায়নি। পশ্চিম ভারতে

গুজরাটের সুরাট, বরোচ্, ক্যাম্বে, আমেদাবাদ, কেরলের কোচিন, মাদ্রাজের নাগপটম, অন্ধ্রের মুসলীপত্তন, বাংলার চুঁচুঁড়া, বিহারের পাটনা এবং উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় তাদের ব্যবসায়ঘাঁটি বা কুঠি ছিল। 1658 খ্রীষ্টাব্দে ডাচেরা পর্তুগীজদের পরাজিত করে সিংহল (শ্রীলঙ্কা) জয় করে নিয়েছিল। ডাচেরা ভারতবর্ষ থেকে নীল, কাঁচা রেশম, তুলাজাত বস্ত্র, সোরা ও আফিম রপ্তানি করত। পর্তুগীজদের মতই এরা ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করত এবং তাদের নির্মমভাবে শোষণ করত।

এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি ইংরাজ বণিক্‌দেরও লোলুপ দৃষ্টি ছিল। পর্তুগীজদের সাফল্য, বাণিজ্য জাহাজ বোঝাই মশলা, সুতীবস্ত্র, রেশম, সোনা, মুক্তা, ঔষধ, চীনামাটির বাসন, আবলুস কাঠ এবং এর বিক্রয়লব্ধ প্রচুর অর্থ ইংরাজ বণিক্‌দের লালসা উদ্দীপ্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এরা এই লাভজনক বাণিজ্য-ব্যবসায়ের সুযোগ লাভের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধৈর্যধারণ করতে হয়েছিল কারণ এই সময় পর্যন্ত জলপথে স্পেনীয় ও পর্তুগীজ নৌ-বাহিনীর শক্তির সম্মুখীন হওয়ার সামর্থ্য তাদের ছিল না। পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল ধরে ইংরাজেরা ভারতে পৌছোনোর একটা বিকল্প জলপথ আবিষ্কারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। ইতিমধ্যে জলপথে ইংরাজেরা কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে এনেছিল। 1579 খ্রীষ্টাব্দে ড্রেক পৃথিবী পরিক্রমায় বেড়িয়েছিলেন। 1588 খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয় 'আর্মার্ডা' রণতরী বাহিনীর পরাজয়ের পর প্রাচ্যদেশের জলপথ ইংরাজদের নিকট উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

1599 খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইংরাজদের একটি সমিতি বা কোম্পানী গঠিত হয়। ভাগ্যান্বেষীরূপে পরিচিত একটি বণিক্ গোষ্ঠী এই কোম্পানীর প্রবর্তক। রাণী এলিজাবেথ 1600 খ্রীষ্টাব্দের 31 ডিসেম্বর এদের একটি রাজকীয় সনদ (চার্টার) অর্পণ করেন। এই সনদে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' কোম্পানী' নামে পরিচিত এই কোম্পানীকে রাণী এলিজাবেথ প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার দিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই এই কোম্পানীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের রাজসিংহাসন তথা গভর্নমেন্টের সম্পর্ক ছিল। স্বয়ং রাণী এলিজাবেথ (1558-1603) এই কোম্পানীর একজন অংশীদার ছিলেন।

ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-তরী সর্বপ্রথম 1601 খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার মশলাপ্রসূ দ্বীপগুলিতে পৌছেছিল। 1608 খ্রীষ্টাব্দে এরা ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত সুরাটে একটি 'ফ্যাক্টরী' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাণিজ্যিক ঘাঁটিগুলিকে তখন 'ফ্যাক্টরী' বলা হত। রাজকীয় অনুমতিলাভের উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন হকিন্স (Captain Hawkins) নামে এক ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দরবারে পাঠানো হয়েছিল। প্রথম দিকে ক্যাপ্টেন হকিন্সকে বেশ সৌজন্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখানো হয়েছিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পক্ষ থেকে তাকে চারশ সৈন্যের নায়কত্ব (মনসব) ও একটা জায়গীর উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে পর্তুগীজদের ষড়যন্ত্রে এঁকে অবশ্য আগ্রার দরবার থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে ইংরাজ বণিকেরা বুঝে নিয়েছিল যে ভারত সম্রাটের দরবার থেকে কোন সুবিধা বা অনুগ্রহ আদায় করতে হলে মুঘল দরবারে পর্তুগীজদের প্রভাব খর্ব করা প্রয়োজন। 1612 খ্রীষ্টাব্দে সুরাটের নিকটবর্তী সোয়ালী নামক স্থানে ইংরাজেরা একটি পর্তুগীজ নৌ-বহরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। 1614 খ্রীষ্টাব্দে আর একবার তারা পর্তুগীজদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। পর্তুগীজ-ইংরাজ সংঘর্ষে ইংরাজদের বিজয়ে মুঘলেরা বুঝে গিয়েছিল যে ইংরাজদের সাহায্য নিয়ে জলপথে পর্তুগীজদের আধিপত্য খর্ব করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। তার উপর, ইংরাজদের ব্যবসার সুবিধা দিলে ভারতীয় বণিকেরা একাধিক ইউরোপীয় খরিদ্দার পাবে, এতে তারা চড়া দামে পণ্য বিক্রয়েরও সুযোগ পাবে। এই ধরনের চিন্তা-ভাবনার পর মুঘল দরবার থেকে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে একটা রাজকীয় সনদ বা 'ফর্মান' মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই ফর্মান অনুযায়ী ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি 'ফ্যাক্টরী' বা বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপনের অধিকার পেয়েছিল।

কিন্তু ইংরাজেরা শুধু এই অধিকার পেয়েই সন্তুষ্ট থাকেনি। 1615 খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজদূতরূপে সার টমাস রো (Sir Thomas Roe) মুঘল দরবারে হাজির হন। জলপথে ভারতীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরাজেরা ভারতীয় বণিক্ ও ভারতীয় জাহাজগুলির লোহিত সাগর ও মক্কা যাবার পথে ইতিমধ্যে নানাবিধ উপদ্রব চালিয়ে যাচ্ছিল, এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুঘল সরকারকে বিব্রত করা। একদিকে চাপ সৃষ্টি অন্যদিকে

ইংলণ্ডের রাজদূতের প্রার্থীরূপে ভারত আগমন এটা ছিল ইংরাজের একটা কৌশল। এই কৌশলে রো সম্রাটের কাছ থেকে একটা ফর্মান বা আজ্ঞাপত্র আদায় করতে সক্ষম হন। এই ফর্মানে মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বত্র ইংরাজদের 'ফ্যাক্টরী' স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণে রো-র এই সাফল্যে পর্তুগীজেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। 1620 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ও পর্তুগীজদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর নৌযুদ্ধে পর্তুগীজরা পরাজিত হয়। 1630 খ্রীষ্টাব্দে এই ইংরাজ-পর্তুগীজ বৈরিতার অবসান হয়। 1632 খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজেরা বোম্বাই দ্বীপটি বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে উপঢৌকন দিয়েছিল। ইনি এক পর্তুগীজ রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত, পর্তুগীজগণ গোয়া, দমন, দিউ ব্যতীত ভারতের অন্য সব স্থানের অধিকারচ্যুত হয়েছিল। পর্তুগীজদের এই ক্ষতি থেকে ডাচ্, ইংরাজ ও মারাঠাগণ বেশ লাভবান হয়েছিল। মারাঠারা 1739 খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ অধিকৃত সালসেত্ ও বেসেইন অধিকার করেছিল।

ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে মশলা ব্যবসায়ের অধিকার নিয়ে ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে ডাচ্ কোম্পানীর ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ডাচেরা ইংরাজদের এই অঞ্চলে মশলার ব্যবসায় থেকে প্রায় বিতাড়িত করে ফেলেছিল। এখানে বিশেষ সুবিধা নেই দেখে অগত্যা ইংরাজেরা ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের দিকে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ দিয়েছিল। ভারতে অবস্থাটাও ছিল তাদের পক্ষে অনুকূল। 1654 খ্রীষ্টাব্দ থেকে ডাচ্দের সঙ্গে ইংরাজদের কিছুদিন পরপরই যুদ্ধ বাধছিল। একটা আপোষের ফলে 1667 খ্রীষ্টাব্দে এই বিরোধের সমাপ্তি ঘটেছিল। ইংরাজেরা ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে তাদের সব দাবি ছেড়ে দিয়েছিল, অপরপক্ষে ডাচেরা ভারতবর্ষে ইংরাজদের দখল করা স্থানগুলির উপর সর্বপ্রকার দাবি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। তবে ইংরাজেরা ভারতের বাণিজ্যিক ক্ষেত্র থেকে ডাচদের উৎসন্ন করার চেষ্টা ক্রমাগত চালিয়ে গিয়েছিল, ফলে 1795 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তারা ভারতে ডাচ্দের অধিকৃত শেষ ভূমিখণ্ডটিও কেড়ে নিয়ে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যবিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধি (1600-1774)

ভারতে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হয়েছিল অতি সামান্যভাবে। 1687 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুরাট ছিল এদের ব্যবসায়িক ঘাঁটি। এ পর্যন্ত ইংরাজেরা ছিল মুঘল শাসকদের কাছে কৃপাপ্রার্থী উমেদার মাত্র। 1623 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুরাট, বরোচ্, আমেদাবাদ, আগ্রা এবং মুসলিপত্তনে তাদের কুঠি বা ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়েছিল। শুরু থেকেই ইংরাজ ব্যবসায়ী কোম্পানীর লক্ষ্য ছিল শুধু ব্যবসায় নয়, সেই সঙ্গে ব্যবসায় কেন্দ্রগুলি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই ভূভাগে যুদ্ধ বা কূটনীতি প্রয়োগের দ্বারা প্রভুত্ব স্থাপন। বস্তুতঃ 1619 খ্রীষ্টাব্দে রো ইংরাজ বণিক্‌দের যে পরামর্শ দিয়েছিলেন ভবিষ্যতে ভারতের সম্পর্কে ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গির সেটিই নির্দেশনামা হয়ে উঠেছিল। তিনি লিখেছিলেন, "আমি বেশ দৃঢ়তা সহকারে এই উপদেশ আপনাদের দিয়ে যাচ্ছি যে, এক হাতে তরবারি আর এক হাতে লাঠি এ দেশের মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে প্রয়োজন হবে।" তিনি আরও বলেছিলেন "ভীতি প্রদর্শন দ্বারা আমরা আমাদের অভিযান শুরু করেছিলাম। এই ভয় দেখিয়েই আমরা টিকে থাকতে পারব।"

1625 খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাদের ফ্যাক্টরীতে একটি দুর্গ নির্মাণ করে এটি সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি তখনও হীন হয়ে যায়নি। স্থানীয় মুঘল শাসকেরা এই ব্যাপার জানা মাত্র সুরাট ফ্যাক্টরীর কর্তৃস্থানীয় ইংরাজদের হাতে হাতকড়া দিয়ে কারারুদ্ধ করেছিল। ইংরাজ কোম্পানীর শত্রুস্থানীয় কোন বিদেশী কোম্পানী একবার একটি মুঘল জাহাজের উপর দস্যুতার উদ্দেশ্যে হানা দিয়েছিল। বিদেশী কোম্পানীগুলিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্থানীয় মুঘল কর্তৃপক্ষ সুরাটে ইংরাজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ (প্রেসিডেন্ট) এবং তার পরিষদদের ধরে তাদের কারারুদ্ধ করেছিল। 18,000 পাউণ্ড ক্ষতিপূরণস্বরূপ আদায় করার পর এদের ছাড়া হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে ইংরাজদের অবস্থা একটু ভালই দাঁড়িয়েছিল, কারণ এখানে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের প্রভাব শিথিল হয়ে এসেছিল—এটাই ছিল তাদের পক্ষে সুবিধাজনক। 1565 খ্রীষ্টাব্দে বিরাট বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। কতকগুলি ছোট ছোট দুর্বল রাজ্য তার

জায়গায় এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিছু লোভ দেখিয়ে অথবা বলপ্রয়োগের দ্বারা এদের জব্দ করা অথবা এদের থেকে কাজ আদায় করা সহজ ছিল। দক্ষিণাঞ্চলে মুসলিপত্তনে 1611 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা ত'দের প্রথম 'ফ্যাক্টরী' খুলেছিল। স্থানীয় এক রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজের ইজারা পেয়ে সেখানে তারা 1639 খ্রীষ্টাব্দে এই ফ্যাক্টরী স্থানান্তরিত করেছিল। এই স্থানীয় রাজা তাদের মাদ্রাজ শাসন ও দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মাদ্রাজ বন্দরের শুল্ক থেকে যে আয় হবে তার অর্ধাংশ তাঁকে দেওয়া হবে এই সর্তে তিনি কোম্পানীকে টাকশাল খুলে মুদ্রা তৈরীর অনুমতিও দিয়েছিলেন। মাদ্রাজে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি ছোট দুর্গ নির্মাণ করে তার নাম দিয়েছিল 'ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ'।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরাজ কোম্পানী নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আরম্ভ করেছিল। সার্বভৌমত্বের দাবি বজায় রাখতে তারা সংগ্রামের প্রস্তুতিও নিয়েছিল। এটা আশ্চর্যের কথা যে, একদল লাভ-খোর বিদেশী বণিকের সঙ্কল্প ছিল যে এদেশ তারা জয় করবে আর এর জন্য যে যুদ্ধ চলবে তার খরচও যোগাবে সেই দেশেরই বিজিত মানুষ। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক-মণ্ডলী (কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্) 1683 খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের কোম্পানীর কর্তাদের এই নির্দেশ দিয়েছিল—"আমরা চাইছি যে আপনারা মাদ্রাজের দুর্গ ও শহরকে এমনভাবে ধীরে ধীরে শক্তিশালী করে তুলবেন যেন কোন ভারতীয় রাজা বা ডাচেরা এটা আক্রমণ করতে ভয় পায়।···কিন্তু আমাদের ইচ্ছা এই যে, আপনারা এমন ভদ্রতার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবেন যেন দুর্গ বা শহর রক্ষার এবং মেরামতি কাজের খরচা ঐ দেশের মানুষের কাছ থেকেই আদায় করা যায়।"

পর্তুগালের কাছ থেকে 1668 খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বোম্বাই-এর অধিকার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে এখনে একটি দুর্গ বানিয়ে তা' সুরক্ষিত করে নিয়েছিল। এই দুর্গটি ছিল বেশ বড় এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাযুক্ত। সুরাট অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান মারাঠা শক্তির চাপে ঐ অঞ্চলে ইংরাজদের ব্যবসা বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল। এই কারণে এবং বোম্বাই-এ বড় একটি সুরক্ষিত দুর্গ হাতে পাওয়াতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাটের পরিবর্তে বোম্বাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

পূর্বভারতে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1633 খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে ওড়িশাতে তাদের প্রথম ফ্যাক্টরীগুলি খুলেছিল। 1651 খ্রীষ্টাব্দে এরা হুগলীতে ব্যবসা করার অনুমতি পেয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই এরা বাংলা ও বিহার প্রদেশের পাটনা, বালেশ্বর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও ফ্যাক্টরী খুলেছিল। এরা এখন বাংলা মুলুকেও একটা স্বাধীন উপনিবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। ব্যবসায়ে অনায়াস সাফল্য, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ দুটি স্বাধীন ও সুরক্ষিত উপনিবেশ স্থাপন, এদিকে মারাঠা দমনে আওরঙ্গজেবের বিব্রত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজেরা আর অনুগ্রহ প্রার্থীর ভূমিকায় থাকা পছন্দ করেনি। তারা এই সময় থেকে ভারতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল। তারা ভেবেছিল যে এমন শক্তি তারা অর্জন করবে যে-শক্তিবলে ভীত হয়ে মুঘল শক্তি তাদের অবাধ ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার দেবে। এই অধিকারের জোরে তারা ভারতবাসীকে চড়া দামে জিনিস কিনতে ও সস্তাদামে কাঁচামাল বেচতে বাধ্য করবে। তারা আরও এমন রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করতে চেয়েছিল যার বলে তারা প্রতিযোগী ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিকে ব্যবসাক্ষেত্র থেকে হঠিয়ে দিতে পারবে। ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের আরোপিত বাধা-নিষেধগুলি উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার স্বপ্নও তারা দেখেছিল। এরা আরও ভেবেছিল যে রাজনৈতিক শক্তি হাতে এলে তারা ভারতীয়দের প্রজায় পরিণত করে তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করবে এবং তাদের কাছ থেকে পাওয়া টাকার জোরেই যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা তাদের দেশটি সম্পূর্ণভাবে দখল করে নেবে। এই সব পরিকল্পনাগুলি বিশদভাবে ব্যক্ত ও আলোচিত হত। বোম্বাই-এর গভর্নর জেরাল্ড আউঙ্গিয়ার (Gerald Aungier) লণ্ডনে কোম্পানীর পরিচালকদের কাছে এইভাবে একটি পত্র লিখেছিলেন, "সেই সময় এসেছে যখন আপনাদের সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য আপনাদের তরবারির সাহায্যে চালাতে হবে।" 1687 খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের পরিচালকেরা মাদ্রাজের গভর্নরকে লিখেছিলেন, "এমনভাবে একটি নীতি নির্ধারণ করে চলতে হবে যেন একটা মোটা রকমের রাজস্ব সংগ্রহ করে তদ্দ্বারা সামরিক ও অসামরিক ব্যবস্থাগুলি বেশ জোরদার করা যায়। সামরিক ও অসামরিক ব্যবস্থাগুলি এমনভাবে সুদৃঢ় করতে হবে যেন সেটা ভারতে সুবিস্তীর্ণ, দৃঢ় ও চিরস্থায়ী

ব্রিটিশ প্রভুত্বের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।" এই পরিচালকদেরই তরফ থেকে 1689 খ্রীষ্টাব্দে বলা হয়েছিল :

"ব্যবসায়ের মুনাফা সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ যতটুকু, রাজস্ব সংগ্রহলব্ধ আয় সম্বন্ধেও আমাদের ঠিক ততটুকু আগ্রহ। বিশ রকমের এমন দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব যার দ্বারা আমাদের ব্যবসা মার খেতে পারে। কাজেই রাজস্ব আমাদের ভালভাবেই প্রয়োজন, এর আয় থেকেই আমাদের সামরিক বাহিনী পুষতে হবে। এটাই আমাদের ভারতে একটা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবে।"

1686 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের হুগলী আক্রমণ ও মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে মুঘলদের সঙ্গে ইংরাজের দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে কিন্তু ইংরাজেরা অবস্থাটা বুঝতে ভুল করেছিল; মুঘলদের শক্তি সম্বন্ধে তাদের ধারণায় গলদ ছিল। তখনও পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের রাজত্বে মুঘলের সামরিক শক্তি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য ফৌজীশক্তির তুলনায় বহু অধিক শক্তিশালীই ছিল। ইংরাজদের পক্ষে এই যুদ্ধের ফল খুবই শোচনীয় হয়েছিল। বাংলার ফ্যাক্টরীগুলি থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংরাজদের গঙ্গার মোহানায় অবস্থিত একটা অস্বাস্থ্যকর দ্বীপে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সুরাট, মসুলিপত্তন এবং ভিজাগাপটমের (বিশাখাপত্তন) ইংরাজদের ফ্যাক্টরীগুলি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাদের বোম্বাই-এর দুর্গও অবরোধ করা হয়েছিল। ইংরাজেরা যখন বুঝেছিল যে তখনও তারা মুঘল সামরিক শক্তির সম্মুখীন হওয়ার উপযুক্ত হয়নি, তখন তারা তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছিল। অনুগত উমেদারের ভূমিকায় নেমে সম্রাটের কাছে তারা প্রার্থনা জানিয়েছিল যে তারা যে সব অন্যায় কাজ করেছে সেগুলি যেন ক্ষমা করা হয়। তারা তাদের এই মনোভাব প্রকাশ করেছিল যে তারা অতঃপর ভারতীয় শাসকদের আশ্রিত রূপেই ব্যবসায় করতে ইচ্ছুক। বস্তুতঃ তারা প্রকৃত শিক্ষাই লাভ করেছিল। মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার লাভের জন্য আর একবার তারা তোষামোদ ও অনুনয় বিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

মুঘল সম্রাট্ সদ্য অতীতে ইংরাজকৃত দুষ্কর্মগুলি তাদের হঠকারিতা বা নির্বুদ্ধিতা প্রসূত বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তাই ইংরাজেরা যখন অনুতাপ প্রকাশ করে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিল তৎক্ষণাৎ তা মঞ্জুর করা হয়েছিল,

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রার্থিত সুবিধাগুলিও তাদের দেওয়া হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, ইংরাজদের গূঢ় অভিসন্ধি জানার কোন উপায় মুঘলদের ছিল না। মুঘল শাসকেরা বুঝতে পারেননি—দেখতে বেশ সরল ও নিরীহ বিদেশী বণিকেরা একদিন এদেশের সমূহ বিপদের কারণ হয়ে উঠবে। তাঁরা ভেবেছিলেন যে বিদেশী বণিকদের এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা দিলে রাজকোষের আয় বাড়বে, এবং এদের সঙ্গে কারবার চালিয়ে দেশীয় বণিক্ ও কারিগরি কাজে নিযুক্ত শিল্পী সম্প্রদায়ও লাভবান হবে। মুঘলদের পক্ষে ইংরাজদের প্রশ্রয় দেওয়ার আরও একটা কারণ ছিল। তারা চিন্তা করে দেখেছিল যে স্থলযুদ্ধে ইংরাজ দুর্বল হলেও নৌশক্তিতে তারা অধিকতর শক্তিশালী। এরা ইচ্ছা করলে ইরাণ, পশ্চিম এশিয়া, উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা এবং পূর্ব-এশিয়ার সঙ্গে জলপথে ভারতের যে বাণিজ্যিক লেনদেন আছে তার যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। এইসব চিন্তার পর, সম্রাট্ আওরঙ্গজেব 150,000 টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ নিয়ে ইংরাজদের আগের মত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার অনুমতি দান করেছিলেন। 1691 খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক 3,000 টাকার বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেয় বাণিজ্যশুল্ক মকুব করা হয়। 1698 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদারি পেয়েছিল। এখানে তারা তাদের ফ্যাক্টরীর চারিপাশে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল। এই দুর্গের নাম দেওয়া হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম। এই স্থানটি অল্পদিনের মধ্যেই একটি শহরে পরিণত হয়ে 'ক্যালকাটা' বা কলিকাতা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। 1717 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী সম্রাট্ ফরুরুখসিয়রের কাছে থেকে একটা 'ফর্মান' আদায় করেছিল। এই ফর্মানে 1691 খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত অধিকারগুলির স্থায়ীকরণই শুধু আদিষ্ট হয়নি এই সঙ্গে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে কোম্পানীকে এই ধরনেরই সুবিধা ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার প্রকৃত শাসক ছিলেন যথাক্রমে মুর্শিদকুলি খান ও আলিবর্দী খান নামে দুইজন শক্তিশালী নবাব। এঁরা ইংরাজ বণিক্‌দের প্রতি কড়া নজর রাখতেন। যে সুবিধাগুলি এদের ব্যবসায়সূত্রে ভোগ করার কথা তার কোন অপব্যবহার যাতে এরা না করতে পারে সেদিকে এঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কোম্পানীকে এঁরা কলিকাতা দুর্গের শক্তিবৃদ্ধি করতে দেননি, স্বাধীনভাবে কলিকাতায় রাজত্ব করার অধিকারও

এদের দেওয়া হয়নি। কলিকাতায় কোম্পানীকে নবাবের অধীন জমিদার হিসেবেই পরিগণিত করা হত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ অবশ্যই খর্ব হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা অভূতপূর্ব ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। 1708 খ্রীষ্টাব্দে এরা £ 500,000 মূল্যের পণ্য স্বদেশ থেকে আমদানি (Import) করেছিল। 1740 খ্রীষ্টাব্দে এটা বেড়ে টাকার অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল £ 1,795,000। আমদানির এই অঙ্কবৃদ্ধি দুটি প্রবল বাধা সত্ত্বেও ঘটেছিল, নতুবা এটা আরও অনেক স্ফীত হ'ত। ইংল্যাণ্ডের সরকার স্বদেশে ভারতীয় সূতি ও রেশমেব ব্যবহার স্বদেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতি আশঙ্কায় নিষিদ্ধ কবে দিয়েছিল। ভারতে রৌপ্য আমদানিও নিষিদ্ধ ছিল। ইংরাজ কোম্পানী একদিকে এদেশে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ ও অধিকার লাভের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল অন্যদিকে তাদের নিজেদের দেশে ভারতকে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিতে তাদের ঘোর অনিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতীয় শিল্পোৎপাদনকারীদের ইংল্যাণ্ডের বাজার দখল করার সম্ভাবনায় তারা ভীত হয়েছিল।

মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা ব্রিটিশের এই তিনটি উপনিবেশ তথা বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি সমৃদ্ধিশালী নগরীরূপে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। বিপুল সংখ্যক ভারতীয় বণিক্ ও টাকা লেনদেনকারী মহাজন শ্রেণীর মানুষ এই শহরগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসেছিল। এই তিনটি শহরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দুটি কারণ ছিল। একটি কারণ ছিল এই যে এই শহর তিনটিতে নূতন নূতন ব্যবসায় পরিচালনার প্রচুর সুযোগ বর্তমান ছিল। দ্বিতীয় কারণ, এই তিনটি শহরের বাইরে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ দশার জন্য সমগ্র দেশে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও নিরাপত্তার অভাব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাদ্রাজের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল 300,000, কলিকাতার জনসংখ্যা 200,000 আর বোম্বাই-এর 70,000। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই তিনটি শহরেই সুরক্ষিত ইংরাজ উপনিবেশ বর্তমান ছিল আর এই তিনটি শহরের সঙ্গেই ছিল সমুদ্রপথের যোগাযোগ, এবং এই জলপথে ইংরাজের সামরিক সামর্থ্য ছিল ভারতীয়দের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। যে কোন ভারতীয় আক্রমণের ক্ষেত্রে এই শহরগুলি থেকে জলপথে পলায়নের সুবিধা ইংরাজের করায়ত্ত ছিল। দেশে রাজনৈতিক

অস্থিরতা দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে নিজেদের বেশ কিছু সুবিধা অর্জনের জন্য ইংরাজদের পক্ষে এই শহরগুলি খুবই নিরাপদ ও সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারত জয়ের উদ্দেশ্যে এই শহরগুলি অতি সম্ভাবনাপূর্ণ নিরাপদ বিজয়যাত্রার ঘাঁটি রূপে বিবেচিত হয়েছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ সংগঠন ব্যবস্থা

1600 খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে সনদ (চার্টার) দেওয়া হয়েছিল তাতে তাদেব 15 বৎসর পর্যন্ত উত্তমাশা অন্তরীপের পূর্বভাগে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার নির্দিষ্ট ছিল। এই 'চার্টার' বা সনদ অনুযায়ী একটি কর্মপরিষদের বা সমিতির (কমিটি) উপর এর পরিচালনভার ন্যস্ত ছিল। এই কমিটি একজন গভর্নর, একজন ডেপুটি গভর্নর ও চব্বিশজন কার্যনির্বাহক সদস্য দ্বারা গঠিত ছিল। যেসব বণিক্‌দের নিয়ে কোম্পানী গঠিত হয়েছিল বা যারা এদের অংশীদার ছিল তাদের উপরই এই কর্মপরিষদ বা কমিটির সদস্য নির্বাচনের দায়িত্ব থাকত। এই কর্মপরিষদকে পরবর্তীকালে বলা হত 'কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস', এবং এর প্রতিটি সদস্যকে বলা হত 'ডিরেক্টর'।

অচিরকালের মধ্যেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংল্যাণ্ডের মধ্যে একটি শক্তিশালী বণিক-সংস্থা রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। 1601 থেকে 1612 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এদের বার্ষিক লাভ দাঁড়িয়েছিল মূলধনের শতকরা কুড়ি ভাগ। এই লাভের উৎস শুধু ব্যবসায়ই ছিল না এর সঙ্গে জলদস্যুতা সূত্রে লুণ্ঠনের আয়ও ধরা হয়েছিল। অবশ্য তৎকালে লুণ্ঠন ও ব্যবসায়ের সীমারেখা খুবই ক্ষীণ ছিল। £ 200,000 পাউণ্ড মাত্র মূলধন থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1612 খ্রীষ্টাব্দে £ 1,000,000 লাভ উঠিয়েছিল। সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে এদের লাভের অঙ্ক বেশ ভালভাবেই স্ফীত হয়ে উঠেছিল।

তবে এই কোম্পানী ছিল মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং এদের কারবারও একচেটিয়া ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদস্য নয় এমন কাউকে পূর্বদেশে ব্যবসায় করতে দেওয়া হ'ত না। এদের লাভের অঙ্কে আর কারো ভাগ বসাবার অধিকার ছিল না। এই জন্য প্রথম থেকেই ইংল্যাণ্ডের শিল্পদ্রব্য উৎপাদক এবং একচেটিয়া কারবারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত বণিক্‌গণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত সংস্থাগুলিকে এককভাবে এই

রাজকীয় অনুগ্রহ ভোগ থেকে বঞ্চিত করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত বড় বড় বণিক্ সংস্থাগুলির একচ্ছত্র আধিপত্য রোধ করা বিরোধীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ ইংল্যাণ্ডের রাজা এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উৎকোচের বশীভূত হয়ে এদের পক্ষাবলম্বন ও সমর্থন করত। 1609 থেকে 1676 পর্যন্ত কোম্পানী রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে £ 170,000 পাউণ্ড ঋণ দিয়েছিল। এর বিনিময়ে দ্বিতীয় চার্লস একটা পর একটা চার্টার বা সনদ মঞ্জুর করে এদের আগের সুযোগ-সুবিধাগুলি বজায় রেখে দুর্গ নির্মাণ, সৈন্যসংগ্রহ ও সৈন্যবাহিনী গঠন, পূর্বদেশে প্রয়োজন মত স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধ বা সন্ধি স্থাপনের অধিকার দিয়েছিলেন। এমন কি কোম্পানীর কর্মচারীদের ইংরাজ উপনিবেশগুলিতে ইংরাজ ও দেশীয় বাসিন্দাদের বিচার সংক্রান্ত কার্য পরিচালনের অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সামরিক ও প্রশাসনিক উভয়বিধ শক্তি প্রয়োগের অধিকার অর্জন করে নিয়েছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার সত্ত্বেও বহু ইংরাজ বণিক্ এশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লিপ্ত ছিল। এরা নিজেদের স্বাধীন ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিত, আর কোম্পানীর তরফে এদের বলা হত অনধিকার হস্তক্ষেপকারী (ইণ্টারলোপার)। এই উটকো হস্তক্ষেপকারীরা পরিশেষে কোম্পানীকে তাদেরও অংশীদাররূপে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। একটা বিপ্লবের পরিণামস্বরূপ 1688 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা দ্বিতীয় জেমস সিংহাসনচ্যুত হন। যুগ্মভাবে রাজসিংহাসন অধিকারের জন্য আহুত হন তৃতীয় উইলিয়ম ও তৎপত্নী মেরী। এই পরিবর্তনের ফলে ইংল্যাণ্ডের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকার পেয়েছিল সেদেশের পার্লামেণ্ট বা সংসদ, রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব আর বজায় থাকেনি। যে 'স্বাধীন ব্যবসায়ী'-দের কথা বলা হয়েছে তারা এই পরিবর্তিত অবস্থায় জনসাধারণ ও পার্লা-মেণ্টের কাছে নিজেদের বৈধ ব্যবসায়ীরূপে ঘোষণা করার দাবি জানাতে লাগল। এদের প্রয়াস ঠেকাতে কোম্পানীর তরফে রাজা, মন্ত্রী ও পার্লামেণ্ট সদস্যদের ঘুষ দেওয়া চলেছিল। মাত্র এক বছরে ঘুষের খাতে তারা £ 80,000 পাউণ্ড ব্যয় করেছিল, এর মধ্যে রাজাকে দেওয়া হয়েছিল £ 10,000 পাউণ্ড। পরিশেষে কোম্পানী 1693 খ্রীষ্টাব্দে একটি নূতন সনদ বা 'চার্টার'-এর অধিকারী হয়েছিল।

কিন্তু কোম্পানীর সুসময় শেষ হয়ে এসেছিল। 1694 খ্রীষ্টাব্দে 'হাউস অফ কমন্স' বা ইংল্যাণ্ডের লোকসভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে যদি পার্লামেন্টে আইন করে তার ব্যবসায়ের অধিকার নিষিদ্ধ না করা হয়ে থাকে, তবে ইংল্যাণ্ডের যে কোন প্রজার প্রাচ্যদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাবার অধিকার থাকবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধী বণিকেরা আরও একটি যৌথ সংস্থার পত্তন করেছিল, এটি নূতন কোম্পানী নামে পরিচিত হয়েছিল। এই নূতন কোম্পানী গভর্নমেণ্টকে £ 2,000,000 পাউণ্ড ঋণ দিয়েছিল অথচ পুরাতন কোম্পানী দিতে পেরেছিল মাত্র £ 700,000 পাউণ্ড। এর ফলে, পার্লামেণ্ট পুরাতন কোম্পানীর পরিবর্তে নতুন কোম্পানীকে ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার দিয়েছিল। পুরানো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এত সহজে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিদের হাতে এই লাভের ব্যবসা ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল না। নতুন কোম্পানীর কর্তৃত্বের অধিকার পাওয়ার উদ্দেশ্যে এরা নতুন কোম্পানীর প্রচুর 'শেয়ার' কিনতে সুরু করেছিল। এদিকে ভারতে অবস্থিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ নতুন কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারতে ব্যবসা করতে বাধা দিয়ে চলেছিল। পরস্পর বিবদমান দুটি কোম্পানীই এখন ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। অবশেষে, 1702 খ্রীষ্টাব্দে দুই কোম্পানী একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি মিলিত সংস্থার পত্তন করেছিল। এই নূতন কোম্পানী "ইস্ট ইণ্ডিজে ব্যবসায় রত ইংলণ্ডীয় বণিক্‌দের সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত কোম্পানী" রূপে 1708 খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ভারতে কোম্পানীর কুঠীসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শক্তিবৃদ্ধি এবং ভারতে তাদের রাজত্ব লাভের ঘটনায় ধীরে ধীরে ভারতে অবস্থিত কোম্পানীগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। কোম্পানীর ফ্যাক্টরী বলতে বোঝাত একটি সুরক্ষিত এলাকা। এই এলাকার মধ্যে থাকত পণ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার, আপিস ঘর, কর্মচারীদের বাসগৃহ ইত্যাদি। এটা জানা দরকার যে, এই ফ্যাক্টরীগুলিতে কোন পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হত না যদিও ফ্যাক্টরী বলতে এটাই বুঝিয়ে থাকে।

কোম্পানীর কর্মচারীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; যথা 'রাইটার',

'ফ্যাক্টর' এবং বণিক্। এরা ছাত্রাবাসে ছাত্রেরা যেভাবে একসঙ্গে বাস করে সেইভাবেই একসঙ্গে বাস ও আহার করত। এদের সব খরচা কোম্পানীই বহন করত। একজন 'রাইটার' বা কেরাণীর বেতন ছিল বার্ষিক 10 পাউণ্ড (প্রায় 100 টাকা), একজন ফ্যাক্টর বা ফ্যাক্টরীর পরিচালক পেত বার্ষিক 20 থেকে 40 পাউণ্ড (200 থেকে 400 টাকা), একজন মার্চেণ্ট বা বণিক্ পেত বার্ষিক 40 পাউণ্ড (400 টাকা) বা কিছু বেশী। দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতনের পরিমাণ খুব অল্পই ছিল। এদের প্রকৃত আয়ের উৎস ছিল অন্যত্র, আর তার জন্য এরা চাকুরী নিয়ে এদেশে আসার জন্য উৎসুক হত। কোম্পানী তার কর্মচারীদের এদেশের মধ্যে ব্যবসা করার অনুমতি দিত। তবে বিদেশের সঙ্গে এদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দেওয়া হত না। ভারত ও ইউরোপের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার ছিল একমাত্র কোম্পানীর।

এই ফ্যাক্টরী এবং এর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনের দায়িত্ব ছিল সপারিষদ গভর্নর-এর উপর (Governor in Council)। গভর্নর ও কয়েক-জন সদস্য নিয়ে যে পরিষদ সেই পরিষদের সভাপতি হতেন গভর্নর। তবে তাঁর নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকত না। কাউন্সিল বা পরিষদে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে সেই বিষয়ে 'ভোট' নেওয়া হত, যে পক্ষের ভোট বেশী, সেই পক্ষের সিদ্ধান্তই কার্যকর হত। অভিজ্ঞ বণিক্‌দের মধ্য থেকে এই পরিষদের সদস্য বাছাই হত।

দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে রাজ্যজয় ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা আওরঙ্গজেব প্রতিহত করে দিয়েছিলেন। 1740 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের আপাত পতনে ইংরাজেরা পুনরায় ভারতে তাদের রাজ্য ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ থেকেই মুঘলদের কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা ধরা পড়েছিল। তবে এই সময়ে পশ্চিম ভারতে কোন বিদেশী শক্তির অভ্যুদয় মারাঠাদের প্রতাপে অসম্ভব ছিল। এদিকে পূর্ব ভারতেও আলিবর্দি খানের প্রবল প্রতাপে কোম্পানীর রাজ্য-স্থাপনের স্বপ্ন সুদূরপরাহত ছিল। দক্ষিণ-ভারতে অবস্থাটা অন্যরূপ ছিল

অন্য রকম। এই অঞ্চলের পরিস্থিতি আস্তে আস্তে বিদেশী শক্তির মাথা তোলার পক্ষে অনুকূল হয়ে এসেছিল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা এই অঞ্চল থেকে লুপ্ত হয়েছিল। 1748 খ্রীষ্টাব্দে নিজাম-উল-মুলুক আসফ্‌ঝার মৃত্যুর পর নিজামের প্রবল প্রতাপ আর এই অঞ্চলে অনুভূত হত না। এর উপর ছিল মারাঠাদের উৎপাত। মারাঠা সর্দারেরা প্রায়ই নিজাম রাজ্যসহ অন্যান্য দক্ষিণী রাজগুলি আক্রমণ করে 'চৌথ' আদায় করত। মারাঠাদের এই উপর্যুপরি হানা দেওয়ার ফলে এইসব অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা বা শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কর্ণাটক রাজ্যেও গৃহ-বিবাদ দেখা দিয়েছিল।

এই অবস্থা বিদেশী শক্তিগুলির কাছে দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যগুলিতে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন ও শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ এনে দিয়েছিল। তবে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার আসরে একা ইংরাজেরাই অবতীর্ণ হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজেরা তাদের ডাচ্‌ ও পর্তুগীজ প্রতিদ্বন্দ্বিদের হটিয়ে দিলেও এখন ফরাসীরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। 1744 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 1763 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে রাজ্যজয়, সম্পদ আহরণ ও বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

1664 খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হয়। 1720 খ্রীষ্টাব্দে পুনর্গঠিত হওয়ার পর এটি দ্রুত উন্নতি লাভ ক'রে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমকক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলিকাতার নিকটবর্তী চন্দননগরে এবং পূর্ব-উপকূলের পণ্ডিচেরীতে এদের সুদৃঢ় ঘাঁটি ছিল। পণ্ডিচেরীর ঘাঁটিতে সুরক্ষিত দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। এই দুটি ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অনেক বন্দর শহরে ফরাসীদের বাণিজ্যকুঠী বা কেন্দ্র ছিল। ভারত মহাসাগরস্থিত মরিশাস্‌ ও রিইউনিয়ন দ্বীপের উপরও ফরাসীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ফরাসী গভর্নমেণ্টের উপর ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। ফরাসী সরকারের রাজকোষ থেকে এরা অনুদান, ভরতুকি, ঋণ ইত্যাদি বিবিধ রকমের সাহায্য পেত। এই কারণে, এই কোম্পানীর উপর ফরাসী দেশের সরকারের কর্তৃত্বের বেশ প্রভাব ছিল। 1723 খ্রীষ্টাব্দের পর ফরাসী গভর্নমেণ্ট কর্তৃক এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বা পরিচালকমণ্ডলী

নিযুক্ত করা হত। এই কোম্পানীর বড় বড় অংশীদার বা 'শেয়ার'ক্রেতাদের মধ্যে ফরাসী অভিজাতগণ ও মহাজন শ্রেণীর আধিক্য ছিল। কোম্পানীর স্থায়ী ব্যবসায়িক সাফল্যের চেয়ে আশু মোটারকম লভ্যাংশ প্রাপ্তির দিকে এদের দৃষ্টি বেশী ছিল। সরকার থেকে প্রাপ্ত ঋণ, ভরতুকির জোরে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী যতদিন তাদের লভ্যাংশ মিটিয়ে গিয়েছিল ততদিন এরা কোম্পানী ঠিকভাবে চলছে কিনা বা তাদের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা কতটুকু সাফল্য লাভ করেছে সে বিষয়ে মোটেই আগ্রহান্বিত ছিল না। কোম্পানীর উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ একদিক থেকে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থহানিই ঘটিয়েছিল। তদানীন্তন কালের ফরাসী রাষ্ট্র ছিল স্বৈরাচারী সামন্ততন্ত্রী শাসনব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণ এই শাসন অপছন্দ করত। দুর্নীতি, অকর্মণ্যতা ও স্থায়িত্বের অভাবে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দূষিত ছিল। ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে, বর্তমানের প্রয়োজন উপেক্ষা করে পুরানো কালের রীতিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হত। এই অবস্থা আদৌ সময়োপযোগী ছিল না। এই ধরনের একটি সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষতি নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল।

1742 খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ ভূখণ্ডে ফ্রান্স-ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিল। আমেরিকার উপনিবেশগুলির অধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। আর একটি কারণ ছিল ভারতে ব্যবসায় ক্ষেত্রের প্রতিযোগিতা। ভারতে ইঙ্গ ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সময়ে বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল কারণ দুই পক্ষই বুঝতে পেরেছিল যে মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার মুখে রাজ্যগ্রাস অথবা বাণিজ্যপ্রসারের সুযোগ আগের থেকে অনেক বেশী হয়ে উঠেছে এবং দুই পক্ষের মধ্যে যে জয়ী হবে তার প্রাপ্তির পরিমাণ হবে আগের থেকে বহুগুণ মূল্যবান। ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ চলেছিল দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠায় এই সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটেছিল। দুটি কোম্পানীর মধ্যে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থশক্তি অধিকতর ছিল, কারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এরাই ছিল শ্রেষ্ঠতর। এদের নৌ-বলও ছিল ফরাসীদের চেয়ে বেশী। ফরাসীদের আগেই এরা ভারতে ভূমিদখল সুরু করেছিল। এই বিজিত স্থানগুলি সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। কাজেই বাস্তবের দিক থেকে ব্রিটিশের অবস্থা ছিল ফরাসীদের থেকে অনেক উন্নত।

ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের লড়াই অল্পকালের মধ্যেই ভারতেও সংক্রামিত হয়েছিল এবং এর পরিণামে ভারতে ইংরাজ ও ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। 1745 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ নৌ-বাহিনী ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ফরাসী যুদ্ধজাহাজের উপর হানা দিয়ে তা অধিকার করে নিয়েছিল। তারপর এরা পণ্ডিচেরী আক্রমণ করেছিল। এই সময় পণ্ডিচেরীতে ফরাসী গভর্নর জেনারেল ছিলেন —ড্যুপ্লে (Dupleix)। ইনি প্রতিভাবান, কল্পনা-কুশল ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কুশলী নেতৃত্বে ফরাসীরা এর পাল্টা আঘাতে 1746 খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ অধিকার করে নিয়েছিল। এর ফলে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ একটা তাৎপর্য-পূর্ণ নূতন পথে অগ্রসর হয়েছিল। মাদ্রাজ অঞ্চল ছিল কর্ণাটকের অন্তর্ভুক্ত। ইংরাজেরা এখন ফরাসীদের হাত থেকে নিজেদের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য কর্ণাটকের নবাবের শরণাপন্ন হয়েছিল। কর্ণাটকের নবাব এই বিবাদে হস্তক্ষেপ করতে রাজী হয়েছিলেন। কারণ তিনি এটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে তখনও পর্যন্ত তিনিই এই সমগ্র অঞ্চলের প্রকৃত মালিক, ইংরাজ বা ফরাসী তাঁর প্রজা মাত্র। তাঁর রাজ্যে দুই বিদেশী বণিক্ কোম্পানীর যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। ফরাসীদের বিতাড়নই ছিল তাঁর অভীষ্ট। আদিয়ার নদীর তীরে সেণ্ট্ থোম্ নামক স্থানে নবাবের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ হয়। নবাব বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল 10,000। ফরাসী বাহিনীতে ছিল মোট 930 জন সৈন্য, এদের মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র 230 জন, বাকী 700 জন ছিল দেশীয় সৈনিক। ফরাসী বাহিনী অবশ্য পাশ্চাত্য-সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। অল্পসংখ্যক ফরাসী বাহিনী নবাবের বিপুল সংখ্যাযুক্ত সৈন্যবাহিনীকে বেশ ভালভাবেই পরাজিত করে দিয়েছিল। এই যুদ্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে পশ্চিমদেশীয়দের দ্বারা সংগঠিত সৈন্য-বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর চেয়ে বহুগুণ বেশী। পাশ্চাত্য সৈন্য-বাহিনীর এই উৎকর্ষের কারণ ছিল তাদের আধুনিক সমরোপকরণ এবং সংগঠন। পাশ্চাত্যদেশীয় মাসকেট্ ও বেয়নেটের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার শক্তি দেশীয় সৈনিকদের সড়্কির ছিল না। পাশ্চাত্যদেশীয় গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে দেশীয় যোদ্ধাদের অশ্বারোহী বাহিনীর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা যে নিতান্ত ক্ষীণ হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকার কথা নয়। কাজেই অধিকতর

শৃঙ্খলাবদ্ধ মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্যদেশীয় বাহিনীর কাছে বিরাট সংখ্যাধিক্য যুক্ত হয়েও বিশৃঙ্খল দেশীয় সৈন্যবাহিনীর পরাজয় এক্ষেত্রে ঠেকানো যায়নি।

1748 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হয়েছিল। সন্ধি-চুক্তির একটি সর্তানুযায়ী ভারতের মাদ্রাজ ইংরাজদের হাতে প্রত্যর্পিত হয়েছিল। ইংরাজ ও ফরাসী জাতির মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটলেও ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভূখণ্ডের অধিকার নিয়ে এদেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব অব্যাহত থেকে গিয়েছিল। আপোষ নিষ্পত্তির পথে এর সমাধান হত না। এইসব যুদ্ধ থেকে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে ভারতীয় রাজ্যশাসন ব্যবস্থা কতটা অন্তঃসার শূন্য এবং এর সামরিক শক্তিও কত দুর্বল। ভারতের এই অবস্থা ইংরাজ ও ফরাসী দুটি বণিক্ সংস্থাকেই ভারতে রাজ্য বিস্তারের দিকে প্রলুব্ধ করেছিল।

কর্ণাটকে নবাবের সঙ্গে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে ডুপ্লে অতঃপর কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। ভারতীয় নৃপতিদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সুশৃঙ্খল ও সুসজ্জিত বাহিনীর সুযোগ গ্রহণের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। পরস্পর বিবাদমান কোন একটি নৃপতিব পক্ষ নিয়ে তাঁকে জিতিয়ে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে পারিশ্রমিকস্বরূপ অর্থ, ব্যবসায়িক সুবিধা অথবা ভূমিখণ্ড আদায় করাই হয়ে উঠেছিল ডুপ্লের রাজনীতি। স্থানীয় শাসকদের অর্থ ও সামরিক শক্তির সাহায্যে ফবাসী কোম্পানীকে শক্তিশালী করে ইংরাজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়নের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছিল। ভারতীয় রাজা, নবাব বা সর্দারেরা যদি এমন কোন সিদ্ধান্ত নিতেন যে আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদে আমরা বিদেশী কোন শক্তিকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না, তবে ডুপ্লের এই কৌশলটি ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। তার কারণ ভারতের তৎকালীন রাজা, নবাব বা শাসকেরা স্বদেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হননি। সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত উচ্চাশা সিদ্ধি ও কিছু প্রাপ্তির নীতিই তাঁদের নিয়ন্ত্রিত করত। নিজেদের স্বসমাজভুক্ত কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে জব্দ করার জন্য বিদেশী শক্তির সাহায্য ভিক্ষা করতে দেশীয় শাসকেরা মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করতেন না।

1748 খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল সেটি হয়ে উঠেছিল ডুপ্লের কূটনীতিক প্রতিভা প্রয়োগের একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। কর্ণাটকে চান্দাসাহেব নবাব আনোয়ারুদ্দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত,

হয়েছিলেন। এদিকে হায়দ্রাবাদে নিজাম-উল্-মুলুক আসফ ঝার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির জঙ্গের সঙ্গে তাঁর পৌত্র মুজাফফ্‌র জঙ্গের বিরোধ গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ডুপ্লে চান্দাসাহেব ও মুজাফফ্‌র জঙ্গের সঙ্গে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সুশিক্ষিত বাহিনী নিয়ে এঁদের দুজনের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। এই তিনটি শক্তির সঙ্গে 1749 খ্রীষ্টাব্দে অম্বুরের যুদ্ধে কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারউদ্দীন পরাজিত ও নিহত হন। আনোয়ারউদ্দীনের পুত্র মুহম্মদআলি ত্রিচিনাপল্লীতে আশ্রয় নেন। কর্ণাটকের অবশিষ্ট অঞ্চলের অধীশ্বর হয়ে কৃতজ্ঞ চান্দাসাহেব পণ্ডিচেরীর চারপাশে আশীটি গ্রাম ফরাসীদের উপঢৌকন দিয়েছিলেন।

ফরাসীদের কৌশল হায়দ্রাবাদেও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। নাসির জঙ্গ নিহত হওয়ার পর মুজাফ্‌ফর জঙ্গ দাক্ষিণাত্যের নিজাম বা রাজ-প্রতিনিধির পদে আসীন হন। নবীন নিজাম পণ্ডিতচেরীর নিকটবর্তী কিছু ভূখণ্ড এবং প্রসিদ্ধ নগরী মুসলিপত্তনের অধিকার দিয়ে ফরাসী কোম্পানীকে পুরস্কৃত করেন। এছাড়া তিনি কোম্পানীকে নগদ 500,000 ও কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীকে 500,000 টাকা উপঢৌকন দেন। ডুপ্লে নিজে পুরস্কার পেয়েছিলেন নগদ 2000,000 এবং বাৎসরিক 100,000 টাকা আয়ের একটি জায়গীর। এছাড়াও কৃষ্ণানদী থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব উপকূলে মুঘল অধিকারভুক্ত ভূখণ্ডের অবৈতনিক 'গভর্নর' পদ দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছিল। নিজের দক্ষতম কর্মচারী বুসিকে ডুপ্লে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে হায়দ্রাবাদে একটি ফরাসী সৈন্যবাহিনী সহ মোতায়েন রেখে দিয়েছিলেন। বাহ্যতঃ এই ব্যবস্থাটা নিজামকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা হলেও এর আসল উদ্দেশ্য ছিল নিজামের দরবারে ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। বিজয়ী মুজাফফ্‌র জঙ্গ হায়দ্রাবাদ যাওয়ার পথে এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। বুসি নিজাম-উল্-মুলুকের তৃতীয় পুত্র সালাবৎ জঙ্গকে তাড়াতাড়ি নিজামের শূন্য আসনে বসিয়ে দেন। এর বিনিময়ে নবীন নিজাম অন্ধ্রপ্রদেশের 'উত্তর সরকার' নামে পরিচিত অঞ্চলটির অধিকার ফরাসীদের দান করেন। উত্তর সরকার নামে পরিচিত ভূভাগ মুস্তাফানগর, এলোর, রাজমহেন্দ্রী ও চিকোকোল এই চারিটি জেলা নিয়ে গঠিত ছিল।

এই সময় দক্ষিণ ভারতে ফরাসী কোম্পানীর শক্তি তুঙ্গে পৌঁছেছিল। ডুপ্লে তাঁর কল্পনারও অতীত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ফরাসীরা ভারতীয়

নৃপতিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে কিছু স্বার্থসিদ্ধি মাত্র করতে চেয়েছিল। আসলে দেখা গেল যে ভারতীয় শক্তিগুলি তাদের আজ্ঞাধীন মক্কেলে পরিণত হয়েছে।

ইংরাজেরা প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী কোম্পানীর এই সাফল্যের শুধু নীরব দর্শক হয়ে থাকেনি। ফরাসী প্রভাব খর্ব করে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য তারা অপর দুই পক্ষ নাসির জঙ্‌ ও মুহম্মদ আলির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল। 1750 খ্রীষ্টাব্দে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তারা মুহম্মদ আলির পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অপর পক্ষের সঙ্গে ফরাসীদের মিত্রতার পরিণামস্বরূপ কর্ণাটকের মুহম্মদ আলি ত্রিচিনাপল্লীর দুর্গে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ইংরাজ কোম্পানীর এক তরুণ কেরানীর মাথায় এই মতলব এসেছিল যে কর্ণাটক-এর রাজধানী আর্কট আক্রমণ করা হলে ত্রিচিনাপল্লীর উপর ফরাসীদের চাপ কমে যাবে কারণ তখন আর্কট রক্ষার জন্য ফরাসী বাহিনী সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হবে। তরুণ কেরানী ক্লাইভের এই প্রস্তাবটি কোম্পানী অনুমোদন করায়, ক্লাইভ মাত্র দুইশত ইংরাজ ও তিনশত জন দেশীয় সৈন্য নিয়ে আর্কট আক্রমণ করে জয়লাভ করেন। ক্লাইভের প্রত্যাশানুযায়ী চান্দাসাহেব ও ফরাসী বাহিনী ত্রিচিনাপল্লীর অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এর পর ফরাসীদের ক্রমাগত পরাজয় ঘটতে থাকে। কিছুদিন পরেই চান্দাসাহেব বন্দী হয়ে নিহত হন। অতঃপর ফরাসীদের ভাগ্যস্রোতে ভাঁটা পড়তে থাকে। ফরাসী সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্যবাহিনী ইংরাজদের অমিতবিক্রমের প্রতিযোগিতায় পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল।

ফরাসীদের এই ভাগ্য বিপর্যয় রোধের জন্য দুপ্লে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে তিনি এই ব্যাপারে বিশেষ সহযোগিতা লাভ করতে পারেননি। এর উপর ছিল কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী, স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সেনাধ্যক্ষদের পরস্পরের মধ্যে অবিরত কলহ-বিবাদ। কখনও কখনও এরা স্বয়ং দুপ্লের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করত। ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে ফরাসী গভর্নমেণ্টের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল, এদিকে তাদের মনে তাদের আমেরিকার উপনিবেশগুলি হারাবার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল। এইসব কারণে তারা নিজেরাই ইংরাজদের সঙ্গে একটা শান্তি চুক্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। 1754 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা ফরাসীদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়েছিল এই সর্তে যে

ডুপ্লেকে ভারতবর্ষ থেকে ফ্রান্সে ফেরত পাঠাতে হবে। ফরাসী গভর্নমেন্ট ইংরাজদের এই দাবি মেনে নিয়ে ডুপ্লেকে ভারত ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছিল। এই ঘটনা ভারতে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্বের উপর বিরাট আঘাত হেনেছিল।

দুই বিদেশী কোম্পানীর মধ্যে এই সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। 1756 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের পুনরায় যুদ্ধ বেধেছিল। এই যুদ্ধের সূচনা-কালেই ইংরাজেরা বাংলায় তাদের শক্তি বেশ দৃঢ় করে নিয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এই ব্যাপারের পর ভারতে ফরাসী-শক্তির অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। বাংলার সম্পদ ইংরাজদের সমৃদ্ধি এতদূর বাড়িয়ে দিয়েছিল যে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ অন্য কারো পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংরাজদের ভারত থেকে উৎখাত করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এখন একবার ফরাসী গভর্নমেন্ট কাউন্ট দ্য লালির নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী পাঠিয়েছিল। এই চেষ্টা ফলবতী হয়নি। ভারতীয় সমুদ্র এলাকা থেকে ফরাসী নৌ-বাহিনীকে ইংরাজেরা বিতাড়িত করে দিয়েছিল। কর্ণাটকের রণক্ষেত্রেও ফরাসী বাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল। এর পর ফরাসীদের হঠিয়ে ইংরাজ নিজামের রক্ষাকর্তার ভূমিকাটি গ্রহণ করেছিল। ফরাসীদের পাওয়া মুসলিপত্তন ও অন্ধ্রের উত্তর সরকারের অধিকারও ইংরাজেরা হস্তগত করে নিয়েছিল। 1760 খ্রীষ্টাব্দের বাইশে জানুয়ারী ইংরাজ সেনাপতি জেনারেল আয়ারকূট বান্দিওয়াসের যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি লালিকে এক ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত করেন। এক বছরেরই মধ্যে ফরাসীরা তাদের ভারতে অধিকৃত স্থানগুলি হারিয়েছিল।

প্যারিসে এক সন্ধির ফলে 1763 খ্রীষ্টাব্দে এই ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল। ভারতে ফরাসী কোম্পানী তাদের কুঠী বা ফ্যাক্টরীগুলি ফেরৎ পেয়েছিল তবে এই কুঠীগুলিতে তাদের দুর্গ নির্মাণ বা তাদের সৈন্য মোতায়েনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এগুলিকে নিছক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়েছিল। এখন থেকে ফরাসীদের ইংরাজদের রক্ষণাধীন হয়েই বাস করতে হয়েছিল। তাদের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন এইভাবেই শূন্যে মিলিয়েছিল। ইংরাজেরা ভারতের সমুদ্রপথেও তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের হটিয়ে দিয়ে ইংরাজেরা এখন নিশ্চিন্ত মনে ভারতজয়ের সাধনায় মনোযোগ নিবদ্ধ

করেছিল। ফরাসী ও তার ভারতীয় মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে ইংরাজেরা কয়েকটি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান শিক্ষা অর্জন করেছিল। এর প্রথমটি ছিল এই যে—ভারতীয় রাজা, নবাব, সর্দার শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিবাদ আছে সেটা ইংরাজের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার পক্ষে খুবই সহায়ক, কারণ এই দেশীয় শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের একান্ত অভাব। দ্বিতীয় শিক্ষা ছিল এই যে, ইউরোপীয় বা দেশীয় পদাতিক বাহিনী যদি পাশ্চাত্য সামরিক রীতিতে অভ্যস্ত ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয় এবং যদি কিছু গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তা পায় তবে সেকালের যুদ্ধরীতিতে অভ্যস্ত বিরাট সংখ্যক ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে হারিয়ে দেওয়া মোটেই অসাধ্য নয়। তৃতীয় শিক্ষাটি ছিল তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। দেখা গিয়েছিল যে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত ও সমরাস্ত্র সজ্জিত যে কোন ভারতীয় সৈনিক অনুরূপভাবে শিক্ষিত ও সজ্জিত যে কোন ইউরোপীয় সৈনিকের মতই যুদ্ধনৈপুণ্য প্রদর্শনে সক্ষম। তারা এটা বুঝতে পেরেছিল যে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেও দেশ-প্রেম বা সাজাত্যবোধের অভাব আছে। পয়সা খরচ করে তাদের কাজে লাগানো যায় কারণ যারা বেশী পয়সা দেবে তাদের হয়েই লড়াই করতে তাদের আপত্তি নেই। ইংরাজেরা অতঃপর ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে একটা শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠনে মনোযোগ দিয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যদের সেপাই (Sepoy) বলা হত। এদের পরিচালনভার ছিল বিভিন্ন স্তরের ইংরাজ অফিসারদের উপর। মূলতঃ এই সৈন্যবাহিনীর জোরে উপরন্তু ভারতে ব্যবসায়জনিত আয়, এবং কিছু বিজিত ভূখণ্ডের আধিপত্যের সহায়তায় ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযান সুরু হয়েছিল—অবশ্য এই অভিযান ছিল বহু যুদ্ধ-কণ্টকিত।

অনুশীলনী

1. খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যবিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা কর।
2. 1600 থেকে 1744 পর্যন্ত ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে বাণিজ্য ও প্রভুত্ব বিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা কর।

3. কি কি কারণে দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের উদ্ভব হয়েছিল? কিভাবে এই সংঘর্ষ ভারতীয় নৃপতিদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল?

4. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ:

(a) ভারতে পর্তুগীজ (b) মশলার ব্যবসায় (c) ভারতে ডাচ্ (d) আওরঙ্গজেব ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (e) ভারতে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংগঠন (f) ডুপ্লে (g) ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রিটিশের ভারত জয়

I. সাম্রাজ্য বিস্তার 1756-1818

ব্রিটিশের বাংলা অধিকার

1757 খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের সময় থেকেই ভারতে ব্রিটিশ অধিপত্যের স্বত্রপাত হয়েছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করেছিল। এর আগে দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের সঙ্গে ব্রিটিশের যে যুদ্ধ হয়েছিল সেটি পলাশীর যুদ্ধের একটা প্রস্তুতি মাত্র ছিল। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে ইংরাজেরা বাংলার যুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিল।

বাংলা প্রদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল, কারণ এর মাটি বেশ উর্বর তথা শস্য-প্রসূ। এখানকার শিল্পোদ্যোগ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যবস্থাও বেশ ভাল রকম উন্নত ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তার কর্মচারীগণ এই প্রদেশে বেশ ভালভাবেই ব্যবসা চালাচ্ছিল। মুঘল সম্রাট্ প্রদত্ত এক রাজকীয় সনদের (ফর্মান) কল্যাণে এরা বেশ কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করেও আসছিল। এই ফর্মানের সর্ত মত এরা বিনা শুল্কে বাংলা প্রদেশ থেকে বাণিজ্যসম্ভার রপ্তানী করতে পারত, আবার আমদানিও করতে পারত। মাল চলাচলের জন্য এদের হাতে দস্তক্ বা ছাড়পত্র দেওয়ার অধিকারও ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজের কর্মচারীদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা করারও অধিকার দিয়েছিল। তবে এটি সম্রাটের ফর্মানে অনুমোদিত না থাকায় এদের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মতই নির্ধারিত কর বা ট্যাক্স দিতে হত। সম্রাটের প্রদত্ত এই 'ফর্মান'-এর ব্যবহার নিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে বাংলার নবাবদের নিরন্তর বিরোধ লাগত। একপক্ষে, এটি ছিল বাংলার রাজকোষের পক্ষে হানিকর। দ্বিতীয়তঃ দেখা যেত যে কোম্পানীর 'দস্তক' বা ছাড়পত্র দেওয়ার অধিকার কোম্পানীর কর্মচারীদের নিজস্ব ব্যবসায় ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে; এটা ছিল নিঃসন্দেহে অপব্যবহার, ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার একটা কৌশল। 1717 খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত

ফর্মানের যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে মুর্শিদকুলি খান্ থেকে নবাব আলিবর্দি খানের সময় পর্যন্ত কোম্পানীর সঙ্গে বিবাদ চলেছিল। এঁরা কোম্পানীকে রাজকোষে মোটা টাকা করস্বরূপ দিতে বাধ্য রেখেছিলেন, 'দস্তক'-এর বে-আইনি ব্যবহারও এঁরা কড়া হাতে দমন করেছিলেন। কোম্পানী এই বিষয়ে নবাবদের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থেকেছিল কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীগণ সুবিধা পেলেই নবাবী নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করত এবং কর ফাঁকি দিত।

কোম্পানীর সঙ্গে বাংলার নবাবের মনোমালিন্য 1756 খ্রীষ্টাব্দে একটা চরমসীমায় এসে পৌছেছিল। এই সময় আলিবর্দি খানের দৌহিত্র তরুণ যুবক সিরাজউদ্দৌলা তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে বাংলার নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইনি খামখেয়ালী প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে মুর্শিদকুলি খানের আমলে কোম্পানী যে সব সর্তে ব্যবসা করত এখনও তাদের সেই সর্তগুলি মেনে চলতে হবে। ইংরাজেরা নবাবের এই আদেশ মানতে অস্বীকার করেছিল। সদ্য সদ্য দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের পরাজিত করে কোম্পানী তখন নিজেদের বেশ শক্তিমান বোধ করছিল। এরা এতদিনে বেশ বুঝতে পেরেছিল যে ভারতের দেশীয় রাজা-নবাবদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি কতটা অন্তঃসার শূন্য। সুতরাং নিজেদের মালপত্র আনা নেওয়ার ব্যাপারে নবাবকে ট্যাক্স বা কর দিতে তারা অস্বীকৃত হয়েছিল। উপরন্তু তারা এই নিয়ম করে দিয়েছিল যে কলিকাতার মধ্যে কোন ভারতীয় মাল আনতে হলে কোম্পানীকে শুল্ক দিতে হবে, কারণ কলকাতা তাদের অধিকারভুক্ত, নবাবের নয়। স্বাভাবিক কারণেই তরুণ নবাব এইসব ঘটনায় ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত বোধ করেছিলেন। তাঁর মনে এই সন্দেহও জেগেছিল যে কোম্পানী তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং এরা বাংলার মসনদে বসার জন্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

কলকাতার অদূরবর্তী চন্দননগরে ছিল একটি ফরাসী ঘাঁটি। ফরাসীদের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ আসন্ন মনে করে ইংরাজেরা কলকাতায় একটি দুর্গ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেছিল। নবাবের বিনানুমতিতে এই দুর্গনির্মাণ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নবাবের সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানীর বিরোধ তীব্রতম অবস্থায় পৌছেছিল। সিরাজ ইংরাজদের এই কাজটিকে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বের প্রতি উপেক্ষার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই বিশ্বাসে কোন ভুলও

ছিল না। একদল বণিক্ তাঁর নিজের রাজ্যমধ্যে দুর্গ বানাবে এবং অন্য একদলের সঙ্গে তাঁরই রাজ্যমধ্যে যুদ্ধ চালাবে এটা আত্মমর্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন কোন স্বাধীন নৃপতির পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। এর উপর সিরাজের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে তিনি যদি তাঁর রাজ্যের মধ্যে ফরাসী ও ইংরাজদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে দেন তবে পরিণামে তাঁর অবস্থাও কর্ণাটকের নবাবদের মত হবে। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে সিরাজ চেয়েছিলেন যে ইউরোপীয় বণিকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে হয় করুক, তাঁর রাজ্যমধ্যে তাদের কোন প্রকার প্রভুত্ব করতে দেওয়া চলবে না। তিনি ইংরাজ ও ফরাসী উভয় পক্ষকেই কলকাতা ও চন্দননগরের দুর্গ ভেঙ্গে ফেলতে ও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ না করতে আদেশ জারী করেছিলেন। ফরাসী কোম্পানী নবাবের আদেশ মেনে নিয়েছিল কিন্তু ইংরাজ কোম্পানী নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করেছিল। কারণ কর্ণাটকের যুদ্ধে জয়লাভ তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অহমিকার মূলে ইন্ধন যুগিয়ে দিয়েছিল, তাদের আত্মবিশ্বাসও প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইংরাজ-কোম্পানী নবাবের নিষেধ অবজ্ঞা করে নিজেদের খুসীমত নিজেদের সর্তেই বাংলা প্রদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইতিপূর্বেই তাদের উপর ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। ব্রিটেনের ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীর কর্তৃত্ব ও ব্যবসার অধিকার সম্বন্ধে যে সব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল সেগুলি অবশ্য তারা বিনা প্রতিবাদেই মেনে নিয়েছিল। যে সরকারী সনদ বা চার্টারের বলে কোম্পানী পূর্বদেশে বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 1693 খ্রীষ্টাব্দে সেটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এরা ইংল্যাণ্ডেশ্বর, পার্লামেণ্ট ও দেশের রাজনৈতিক নেতাদের প্রচুর ঘুষ খাইয়েছিল (মাত্র এক বছরে এই ঘুষের পরিমাণ ছিল £ 80,000)। এতৎসত্ত্বেও ইংরাজ কোম্পানী বাংলার নবাবের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বাংলা প্রদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দাবি করতে ছাড়েনি। এটা ছিল নবাবের সার্বভৌমত্বের উপর একটা সরাসরি আঘাত। ইংরাজদের কূটকৌশলের সুদূরপ্রসারী পরিণাম কি হতে পারে সেটুকু বোঝার মত রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব নবাব সিরাজউদ্দৌলার ছিল না। তিনি স্থির করলেন যে এদেশের মাটিতে থেকে তাদের যদৃচ্ছা ব্যবহার দমন করতেই হবে।

অতিক্রুত এবং অপর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে বিপুল উদ্যমে সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদের কাশিমবাজার কুঠী দখল করে কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। 1756 খ্রীষ্টাব্দের 20 জুন তিনি ইংরাজদের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করেন। ইংরাজদের জলপথে পালিয়ে যেতে দিয়ে তিনি কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র তাঁর অনায়াস বিজয়ের উৎসব ভোগে ব্যস্ত হয়েছিলেন। এটা হয়েছিল তাঁর পক্ষে একটা বিষম ভুল। ব্রিটিশ শত্রুর শক্তি কতদূর এই বিচার তিনি ঠিকমত করতে পারেননি।

কলকাতা থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংরাজেরা বঙ্গোপসাগরের সমীপবর্তী ফলতায় আশ্রয় নিয়েছিল। এখানে তাদের নৌবাহিনী বেশ শক্তিশালী ছিল। এখানে তারা মাদ্রাজ থেকে প্রেরিত সাহায্যের জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। আর এই পরিস্থিতিতেই তারা নবাব দরবারের কয়েকজন বিশ্বাস-ঘাতপ্রবণ বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি ষড়যন্ত্র জাল বিস্তারের উদ্যোগ নিয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন নবাবের মীর-বখ্সী অর্থাৎ ধনাধ্যক্ষ মীরজাফর, কলকাতায় নবাবের কর্মাধ্যক্ষ মানিকচাঁদ, এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আমিচাঁদ, মহাজন-শ্রেষ্ঠ জগৎশেঠ এবং নবাবেব এক উচ্চপদস্থ সেনাধ্যক্ষ খাদিম খান্। অল্পকালের মধ্যেই মাদ্রাজ থেকে এডমিরাল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইভের নেতৃত্বে একটি করে শক্তিশালী স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী কলকাতা থেকে বিতাড়িত ইংরাজ কোম্পানীর সাহায্যার্থে পৌছে গিয়েছিল। 1757 খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ নবাবকে পরাজিত করে কলকাতা পুনর্দখল করেন। এবার কোম্পানীর সবকিছু দাবিদাওয়া মেনে নিতে নবাবকে বাধ্য করা হয়েছিল।

ইংরাজেরা এতেও কিন্তু সন্তুষ্ট হয়নি। এদের আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। তারা বাংলার নবাবরূপে এমন একজনকে দেখতে চেয়েছিল, যে সিরাজউদ্দৌলার মত শক্ত হবে না, যে তাদের ইচ্ছামত চলবে। বাংলার তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে অপসারিত করে মীরজাফরকে বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত করার জন্য নবাবের শত্রুরা যে ষড়যন্ত্র ফেঁদেছিল ইংরাজেরা সেই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে কতকগুলো অন্যায্য দাবি নবাবের কাছে পেশ করেছিল। এখন নবাব এবং ইংরাজ দুপক্ষেরই মনে হয়েছিল যে জয়লাভের জন্য অপরপক্ষের উচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন এবং একটা যুদ্ধই এই সমস্যার অবসান ঘটাতে পারে। 1757 খ্রীষ্টাব্দের 23 জুন, মুর্শিদাবাদ থেকে কুড়ি

মাইল দূরে অবস্থিত পলাশীতে দুই পক্ষের লড়াই সুরু হয়েছিল। যুগান্তর সৃষ্টিকারী এই পলাশীর যুদ্ধ কিন্তু খুব গুরুতর ধরনের কিছু ছিল না। এটা ছিল নামমাত্র যুদ্ধ। সবশুদ্ধ উনত্রিশ ইংরাজ সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, নবাব পক্ষে ক্ষতির সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভের অধীন নবাবী ফৌজের অধিকাংশ সৈন্য যুদ্ধেই নামেনি। শুধু মীরমদন ও মোহনলালের নায়কতায় মুষ্টিমেয় নবাবী সৈন্য সাহসিকতার সঙ্গে বেশ ভালভাবেই লড়েছিল। পরাজিত নবাব সিরাজউদ্দৌলা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে বন্দী হয়ে মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

/ পলাশীর যুদ্ধ বাঙালী কবি নবীনচন্দ্র সেনের ভাষায় ভারতের ভাগ্যে অন্ধকারময়ী চিররাত্রির সূচনা করেছিল (নিভিল গৃহের দীপ, নিভিল তখন, ভারতের শেষ আশা হইল স্বপন)। ইংরাজেরা অতঃপর মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে লুঠের ভাগ ভালভাবে আদায় করার ব্যাপারে মনোনিবেশ করেছিল। নূতন নবাব মীরজাফর বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্যের একছত্র অধিকার মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন। কলকাতার সংলগ্ন চব্বিশটি পরগণার জমিদারীও তারা উপঢৌকন পেয়েছিল। এককালে কলকাতা সিরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। কোম্পানী ও কলকাতার ব্যবসায়ীদের তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ মীরজাফরের কাছ থেকে 17,700,000 টাকা আদায় করা হয়েছিল। এ ছাড়াও ঘুষ অথবা উপহার হিসেবে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তাঁকে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয়েছিল। একা ক্লাইভ নিয়েছিলেন কুড়ি লক্ষেরও কিছু বেশী টাকা। ক্লাইভ পরে নিজেই হিসেব করে দেখেছিলেন যে কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণ 'পুতুল' নবাবের কাছ থেকে 30 মিলিয়ন (তিনশ লক্ষ) টাকা নিয়েছে। এর উপরে এই ধরনের একটা রফাও হয়েছিল যে ব্রিটিশ বণিক্ ও কোম্পানীর কর্মচারীগণকে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য কোন কর দিতে হবে না।

পলাশী-যুদ্ধের ব্যাপারটি বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধের ফলাফল বাংলায় এবং পরে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের পথ সুগম করে দিয়েছিল। এতে ব্রিটিশের মর্যাদাও স্ফীত হয়েছিল। এই একটা চালেই তারা ভারত সাম্রাজ্যের এক অতি শক্তিশালী দাবিদাররূপে নিজেদের

প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। সমৃদ্ধ বাংলা প্রদেশের রাজস্বের টাকায় তারা একটা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে নিয়েছিল। বাংলা প্রদেশের কর্তৃত্বলাভ ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতারও মীমাংসা করে দিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের হাতে অপরিমিত অর্থ এনে দিয়েছিল। এই অপরিমিত অর্থসম্পদ বাংলার অসহায় মানুষদের শোষণ করে আহৃত হয়েছিল।

এ সম্বন্ধে দুই ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডোয়ার্ড টমসন ও জি. টি. গ্যারাটের মন্তব্য এই যে :—

"একটা বিপ্লবের পরিকল্পনা ও সংঘটন যে একটা সর্বাধিক লাভজনক কৌশল এটা বেশ পরীক্ষিত সত্য। কোর্টেজ ও পিজারোর যুগে স্পেন দেশের মানুষেরা সোনার খোঁজে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। তারপরেই এই উন্মাদনা ইংরাজদের পেয়ে বসেছিল। বিশেষ করে বাংলার মানুষের শেষ রক্তবিন্দু শুষে না নেওয়া পর্যন্ত ইংরাজেরা তাদের শোষণ অব্যাহত রেখেছিল।"

ইংরাজদের সহায়তা নিয়েই মীরজাফর নবাবের গদি পেয়েছিলেন। এই মীরজাফরও শেষ পর্যন্ত তাঁর অতীত আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ইংরাজদের সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়ে তাঁর লাভের পাল্লা মোটেই ভারী হয়নি, খেসারৎ তাঁকে বেশ ভাল রকমই দিতে হয়েছে। কোম্পানীর ঘুষ অথবা নজরানার দাবি মেটাতে মেটাতে তাঁর রাজকোষ শূন্য হয়ে এসেছিল। স্বয়ং ক্লাইভেরই দাবির বহর ছিল বেশ বড়। কর্ণেল ম্যালেসনের ভাষায় 'যতটা পারা যায় ততটাই আদায় করে নেওয়া'টাই কোম্পানীর কর্মচারীদের লক্ষ্য ছিল। মীরজাফর তাদের কাছে ছিল যেন একটা সোনা ভর্তি থলে। এই বস্তায় বা থলেতে যখন খুসী তখনই হাত ঢুকিয়ে কিছুটা সোনা তুলে নেওয়াই ছিল তাদের অভ্যাস। সরকারীভাবে কোম্পানীর ডিরেক্টর বা পরিচালকমণ্ডলীর এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে বাংলা প্রদেশ হাতে পেয়ে তারা একটা কামধেনু লাভ করেছে. বাংলা যেন অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার, যত সম্পদই টেনে নাও, এর ভাণ্ডার কখনও ফুরোবে না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে লণ্ডন থেকে কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা কোম্পানীকে এই নির্দেশ পাঠিয়েছিল যে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে কোম্পানীর খরচের সমস্ত অর্থ বাংলা প্রেসিডেন্সীকেই বহন করতে হবে। এর উপর বাংলার রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়েই কোম্পানীর রপ্তানিযোগ্য

সমস্ত মালই কেনা হবে। এই নির্দেশের পরিণামে কোম্পানীর দায়িত্ব দাঁড়িয়েছিল শুধু ব্যবসায়-বাণিজ্যের নয়। বাংলার নবাবকে মোচড় দিয়ে এই প্রদেশের সম্পদ অন্যত্র চালান দেওয়ার দায়িত্বও তাদের উপর এসে পড়েছিল।

মীরজাফর অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন যে কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের দাবিগুলি পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়া তাঁর সাধ্যের অতীত। এদিকে কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণ সবসময়ে মীরজাফরকে জানিয়ে দিতে ভুলত না যে তিনি তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতঃপর 1760 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কোম্পানীর চাপে তিনি নবাবপদ ত্যাগ করে ঐ পদ তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মীরকাশিম কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী স্বত্ব দান করেন। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের তিনি দামী দামী উপঢৌকনও দিয়েছিলেন। এই উপঢৌকনের অর্থমূল্য ছিল উনত্রিশ লক্ষ টাকা।

মীরকাশিম ইংরাজদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেননি, উপরন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাদের সম্মান ও স্বার্থসিদ্ধির পথে এক প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কর্মদক্ষ; যোগ্য এবং দৃঢ়প্রকৃতির শাসক ছিলেন। বিদেশী কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে তাঁকে নবাবপদ লাভে কোম্পানী যে সহায়তা দিয়েছে তার বিনিময়ে তিনি কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণকে যথেষ্ট অর্থ পুরস্কার দিয়েছেন। তাঁকে এখন নির্বিবাদে বাংলা শাসন করতে দেওয়া উচিত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর স্বাধীনতা অব্যাহত রাখতে হলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাঁর রাজকোষের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও একটি যুদ্ধকুশল সেনা-বাহিনী। অতঃপর তিনি দেশে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তাঁর রাজস্ব বিভাগের দুর্নীতি নিবারণ করে রাজকোষে অধিক অর্থাগমের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ইউরোপীয় ধাঁচের একটা আধুনিক ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গঠনের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। ইংরাজেরা নবাবের এই কাজগুলি সুনজরে দেখেনি। 1717 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীকে যে ফর্মান মঞ্জুর করা হয়েছিল মীরকাশিম কোম্পানীর কর্মচারীগণ কর্তৃক তার অপব্যবহার রোধ করারও চেষ্টা করেছিলেন আর এটাই ছিল কোম্পানীর তাঁর উপর

বিশেষ বিরাগের কারণ। কোম্পানীর কর্মচারীগণ চেয়েছিল যে তাদের ব্যবসায়-সামগ্রী ইউরোপে রপ্তানীর উদ্দেশ্যেই হ'ক অথবা দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের জন্য নির্দিষ্ট হ'ক সেগুলি সবই করভার মুক্ত (Duty free) থাকবে। এই ব্যবস্থায় দেশীয় বণিকেরা প্রতিযোগিতায় বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হ'ত, কারণ ইংরাজেরা কর থেকে অব্যাহতি পেত, আর তাদের কর বা Duty দিতে হত। এর উপর আর একটা দুর্নীতির খেলা চলত। কোম্পানীর কর্মচারীগণ নিজেদের অনুগত দেশীয় বণিকদের কাছে বেআইনিভাবে তাদের 'দস্তক' বা বিনা-শুল্কে মালপত্র চলাচলের 'ছাড়পত্র' বিক্রি করত। অসাধু উপায়ে প্রাপ্ত এই ছাড়পত্রের জোরে দেশীয় বণিকদের অনেকে দেশের মধ্যে মাল চলাচলের ক্ষেত্রে দেয় শুল্ক ফাঁকি দিত। এদের সঙ্গে অসম-প্রতিযোগিতায় সৎস্বভাবের ব্যবসায়ী বণিকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হত। আবার নবাবের রাজকোষের অর্থ আমদানিও কম হত। এর উপর আরও অনেক ব্যাপার ঘটত যেগুলি বেশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠত। নবলব্ধ ক্ষমতায় মত্ত কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণ তাদের সামনে ধনার্জনের প্রভূত সম্ভাবনা দেখে নবাবের কর্মচারী ও বাংলার গরীব মানুষদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের বোঝা চাপাতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। দেশীয় কর্মচারী ও জমিদারদের কাছ থেকে জোর করে কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীরা ঘুষ অথবা নজরাণা আদায় করত। ভারতীয় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতকারী ভারতীয় কারিগর, চাষী ও বণিক্দের তারা ভয় দেখিয়ে সস্তায় তাদের জিনিস বেচতে বাধ্য করত। আবার ভয় দেখিয়ে চড়া দামে নিজেদের ব্যবসায় দ্রব্যাদি এদের কিনতে বাধ্য করা হত। যারা কোম্পানীর কর্মচারীদের নিজেদের জিনিস সস্তায় বেচতে ও তাদের জিনিস চড়াদামে কিনতে অস্বীকার করত তাদের প্রায়ই চাবুক মেরে সায়েস্তা করা হত। কোন কোন সময় তাদের কোম্পানীর জেলে আবদ্ধও করে রাখা হ'ত।

আধুনিক কালের এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ার (Percival Spear) আলোচ্য কালটিকে 'নির্লজ্জ ও প্রকাশ্য লুণ্ঠনের যুগ' রূপে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুতঃ বাংলার সমৃদ্ধির যে খ্যাতি এতকাল ধরে বর্তমান ছিল এই সময় থেকে ধীরে ধীরে তা মলিন হতে সুরু করেছিল।

মীরকাশিম এটা বেশ বুঝে নিয়েছিলেন যে, কোম্পানীর এই ধরনের কাজকর্ম যদি দমন না করা হয় তবে তিনি কখনও বাংলা প্রদেশকে শক্তিশালী

ও সমৃদ্ধ করতে পারবেন না, আর নিজেকেও তিনি কোনদিন কোম্পানীর কবল হতে মুক্ত করতে পারবেন না। অতঃপর নবাব মীরকাশিম এক চাল চাললেন—দেশে অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে শুল্ক নেওয়ার প্রথা ছিল, তা তিনি তুলে দিলেন। ইংরাজেরা বিশেষভাবে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার যে সুবিধা গায়ের জোরে ভোগ করে আসছিল সেটি দেশীয় ব্যবসায়ীদেরও ভোগ করতে দেওয়া হল। কিন্তু বিদেশী বণিক্ কোম্পানী দেশীয় বণিক্‌দের সঙ্গে এই সুবিধা একত্রে ভোগ করার আইন বরদাস্ত করতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না—তারাই শুধু বিশেষ সুবিধা ভোগ করে যাবে এই ছিল তাদের বাসনা। তারা এখন দাবি করতে লাগল যে দেশীয় বণিক্‌দের অন্তর্বাণিজ্য শুল্ক মকুব করা চলবে না। ফলে আবার একটা যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল। আসলে ঘটনাটা দাঁড়িয়েছিল এই যে বাংলার তখন দুই মালিক—কোম্পানী ও নবাব। সকলেরই জানা কথা যে একদেশেই দু'জন রাজার রাজত্ব চলতে পারে না। একদিকে মীরকাশিম নিজেকে একজন স্বাধীন নৃপতি রূপে ভাবছিলেন এবং অন্যদিকে ইংরাজেরা তাঁকে তাদের আজ্ঞাবহ পুতুল রূপে মাত্র রাজত্ব করতে দিতে চাইছিলেন কারণ তারাই তাঁকে ঐ পদে তুলেছিল।

1763 খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম অনেকবার ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। অবশেষে তিনি অযোধ্যায় গিয়ে সেখানকার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অযোধ্যায় বসে তিনি সুজাউদ্দৌলা ও পলাতক মুঘল সম্রাট্ শাহ্ আলমের সঙ্গে একটা আঁতাত গড়ে তোলেন। এই তিন সঙ্গীর সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে 1764 খ্রীষ্টাব্দের 22 অক্টোবর বক্সারে কোম্পানীর যে যুদ্ধ হয় তাতে এঁরা পরাজিত হন। ভারতের ইতিহাসে বক্সারের এই যুদ্ধটি সর্বাধিক যুগান্তকারী ও তাৎপর্যময় কারণ এই যুদ্ধে ভারতের দুটি প্রধানের মিলিত শক্তির চেয়ে ইংরাজের বাহুবলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের পরিণামে ব্রিটিশেরা বাংলা, বিহার ও ওড়িশার একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ করেছিল। আউধ রাজ্যটিও তাদের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছিল।

1765 খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ বাংলার গভর্নর রূপে ফিরে এসেছিলেন। বাংলায় ফিরে তিনি দেখলেন যে এই সুযোগে বাংলার রাষ্ট্রশাসনভার ধীরে ধীরে নবাবের হাত থেকে কোম্পানীই গ্রহণ করে নিতে পারে। 1763 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী পুনরায় মীরজাফরকে নবাবের গদিতে বসিয়েছিল, যথারীতি

কোম্পানী এবং এদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ এইজন্য তাঁর কাছ থেকে প্রচুর টাকাও আদায় করে নিয়েছিল। মীরজাফরের মৃত্যুর পর কোম্পানী তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নিজামউদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসিয়েছিল। ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ 1765 খ্রীষ্টাব্দের 20 ফেব্রুয়ারী নিজামউদ্দৌলাকে একটা নূতন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। এই চুক্তির সর্ত ছিল এই যে নবাবের সৈন্যবাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ ভেঙ্গে দিতে হবে, নবাবের সৈন্যবাহিনী অবশ্য একটা থাকবে, তবে তা নামমাত্র। আর একটা সর্ত ছিল যে বাংলার শাসনভার থাকবে একজন ডেপুটি বা উপ-সুবাদারের হাতে। এই উপ-সুবাদার মনোনয়নের অধিকার অবশ্যই কোম্পানীর হাতে থাকবে এবং এঁকে কোম্পানীর অমতে বরখাস্ত করা চলবে না। এইভাবে কোম্পানী বাংলা প্রদেশের শাসনব্যবস্থা (নিজামত) নিজেদের কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। নূতন নবাবের কাছ থেকে কোম্পানীর 'বেঙ্গল কাউন্সিল'-এর সদস্যগণ আর একবার প্রায় 15 লক্ষ টাকা হস্তগত করে নিয়েছিল।

তখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় শাহ্ আলম মুঘল সাম্রাজ্যের নামমাত্র সম্রাট্ ছিলেন। কোম্পানী এঁর কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার 'দেওয়ানি' অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার আদায় করে নিয়েছিল। এতদিন কোম্পানী বাংলা অঞ্চলে যেসব অধিকার ভোগ করত সেগুলি আইনসঙ্গত ছিল না। সম্রাটের কাছ থেকে 'দেওয়ানি' লাভ করে তাদের কর্তৃত্ব একটা আইনসঙ্গত রূপ পেয়েছিল। এইভাবে ভারতের মধ্যে সমৃদ্ধতম প্রদেশের রাজস্বের উপর কোম্পানীর অধিকার বর্তে গিয়েছিল। পুরস্কারস্বরূপ কোম্পানী সম্রাট্ শাহ্ আলমকে 2·6 মিলিয়ন (26 লক্ষ) টাকা উপঢৌকন দিয়েছিল। এছাড়া তিনি যাতে কোরা ও এলাহাবাদ জেলা দুটির রাজস্ব নিজে নির্বিবাদে ভোগ করতে পারেন সেই ব্যবস্থাও কোম্পানী করে দিয়েছিল। প্রায় ছয় বৎসর সম্রাট্‌কে এলাহাবাদ দুর্গে কোম্পানীর রক্ষণাধীন থাকতে হয়েছিল। এটা ছিল বন্দীদশার নামান্তর মাত্র।

আওধ (অযোধ্যা)-এর নবাব সুজাউদ্দৌলাকে কোম্পানী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য করেছিল। এছাড়াও সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে কোম্পানীর আর একটি চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তির সর্ত ছিল যে নবাবের বিরুদ্ধে কোন শত্রুর আক্রমণের ক্ষেত্রে কোম্পানী নবাবের রক্ষার্থে এগিয়ে আসবে, তবে এক্ষেত্রে কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর ব্যয়

নবাবকেই বহন করতে হবে। এক কথায়, নবাব কার্যতঃ কোম্পানীর আশ্রিত শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। নবাব প্রথমদিকে অবশ্য এই চুক্তির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কোম্পানী একটা বণিক্ সংস্থা মাত্র এবং এদের ক্ষমতা অস্থায়ী। তাঁর মনে এই ধারণা ছিল যে আফ্‌গান ও মারাঠারাই তাঁর আসল শত্রু। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য আউধ এবং দেশের অবশিষ্ট অংশকে বেশ গুরু খেসারৎ দিতে হয়েছিল। এই চুক্তিটি ছিল ব্রিটিশ কূটনীতির বেশ ভাল রকম চাল। ব্রিটিশেরা চেয়েছিল যে আউধ পশ্চিমাঞ্চলে মারাঠাদিকে বাধা দিয়ে আটকাবে আর এদিকে ইতিমধ্যে তারা পূর্বাঞ্চলে বাংলা প্রদেশে তাদের শক্তি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নেবে।

বাংলায় দ্বৈত শাসন

অন্ততঃ 1765 খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার প্রকৃত প্রভুত্ব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এসে গিয়েছিল। বাংলা প্রদেশের প্রতিরক্ষার ভার এবং সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অধিকার এদের করতলগত হয়েছিল। প্রদেশের আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাক্রমণের অশান্তি দমনের জন্য নবাবকে কোম্পানীর উপর একান্ত নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। 'দেওয়ান' হিসেবে একদিকে কোম্পানী সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহের ভার নিয়েছিল। অন্যদিকে ডেপুটি-সুবাদার নিয়োগের অধিকার তাদের থাকায় কার্যতঃ নিজামতের অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা পরিচালনাও তাদের হস্তগত হয়েছিল। নিজামতের অধীন বিভাগগুলি থেকেই দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য সান্ত্রী-সেপাই (পুলিশ) রাখা হত এবং বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হত। সরকারী শাসনের দুই অঙ্গ যে একই ছিল এবং এটা যে একান্তভাবে কোম্পানীর দ্বারাই পরিচালিত হ'ত তা কার্যকালে বেশ ধরা পড়ত। তার কারণ এই যে, কোম্পানীর তরফে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত ডেপুটি-দেওয়ানকেই নবাবের তরফে ডেপুটি-সুবাদার নিযুক্ত করা হত। এটাই ইতিহাসে যুগ্ম শাসন বা দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশের পক্ষে খুবই সুবিধা-জনক। এতে সকল ক্ষমতাই তারা বিনা দায়িত্বে ভোগের অধিকারী হয়েছিল। কোম্পানী সোজাসুজিভাবে সবকিছু আর্থিক আধিপত্য ভোগ করত এবং এই অর্থের জোরে সৈন্যবাহিনীও পুষত। কিন্তু তারা শাসন-

ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি কোন যোগ রাখত না। নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের উপর শাসনব্যবস্থা চালাবার দায়িত্ব ছিল কিন্তু এই কাজ চালাবার জন্য যে অধিকার বা ক্ষমতা দরকার তার প্রয়োগের সুবিধা তাদের ছিল না। শাসন-ব্যবস্থার গলদের জন্য নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের দায়ী করা হত আর শাসন-জনিত সুবিধাগুলি কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা ভোগ করত। এর ফল বাংলার জনসাধারণের কাছে বিষময় হয়ে উঠেছিল। কোম্পানী অথবা নবাব উভয় পক্ষই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকত। নবাবের পক্ষ থেকে এই ঔদাসীন্যের একটা কারণও অবশ্য ছিল। কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণ দেশীয় জনসাধারণের উপর যে শোষণ ও নিপীড়ন চালাত তার থেকে তাদের রক্ষা করার কোন সাধ্য নবাব বা তাঁর কর্মচারীদের ছিল না। নবাবের কর্মচারীদের আর একটা ধান্ধা ছিল—সরকারী ক্ষমতার জোরে যতটুকু উপরি পাওনা হতে পারে তার প্রতি আকর্ষণ।

কোম্পানীর নিজস্ব কর্মচারীদের কাজে সমগ্র বাংলাদেশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র। মানুষের উপর উৎকট নির্যাতনও তারা চালাত। এ সম্বন্ধে ক্লাইভের নিজস্ব মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"'আমি শুধু এইটুকুই বলছি যে পৃথিবীর আর কোন দেশে এত অরাজকতা, বিভ্রান্তি ঘুষ, দুর্নীতি এবং উৎপীড়ন-শোষণের ঘটনা কেউ শোনেনি বা দেখেনি যতটুকুর লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল একমাত্র বঙ্গদেশ। এত বিপুল সম্পদ এত অবৈধ উপায়ে এত উন্মত্ত লালসার প্রেরণায় আর কোন দেশ থেকে লুণ্ঠিত হয়নি। বাংলা-বিহার ও ওড়িশার থেকে পাওনা তিরিশ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব মীরজাফরের নবাবপদ পুনঃপ্রাপ্তির পর সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর কর্মচারীদের হেফাজতে এসে গিয়েছিল। কোম্পানীর সামরিক ও অসামরিক উভয় বিভাগীয় কর্মচারীগণ প্রতিটি বিশিষ্ট দেশীয় ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু না কিছু অর্থ জুলুম করে আদায় করে নিত। স্বয়ং নবাব থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট জমিদার কারো এদের উৎপীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় ছিল না।" স্বয়ং ক্লাইভের লেখনীতেই কোম্পানীর কর্মচারীগণের আচরণ কি ছিল তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অন্যদিকে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষও পিছিয়ে ছিল না, বাংলা প্রদেশের সম্পদ নিঃশেষ করে শুষে নেওয়ার আগ্রহ তাদেরও খুব বেড়ে গিয়েছিল। ভারতীয় পণ্যবস্তু ক্রয়ের জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে বরাদ্দ টাকা পাঠানো তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন বাংলা প্রদেশে

প্রাপ্ত রাজস্ব থেকেই রপ্তানিযোগ্য সামগ্রী কিনে তা ইউরোপে বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। কোম্পানীর হিসেবে এটা ছিল তাদের লগ্নীকৃত অর্থের ন্যায্য লভ্যাংশ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল এই যে খোদ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও এই লুন্ঠিত সম্পদের ভাগ পেতে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। 1767 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কোম্পানীর উপর বাৎসরিক £ 400,000 পাউণ্ড কর ধার্য করে দিয়েছিল।

1766 থেকে 1768 এই তিন বৎসরের মধ্যেই £ 5.7 মিলিয়ন পাউণ্ড পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ থেকে শোষিত হয়েছিল। দ্বৈতশাসনের নৈরাজ্য এবং সম্পদ শোষণের ফলে এই হতভাগ্য প্রদেশ দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। 1770 খ্রীষ্টাব্দে বাংলা প্রদেশে এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। মানুষের ইতিহাসে এমন ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষের কথা আর শোনা যায়নিও বলা চলতে পারে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এর কবলে পড়ে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছিল। এটা ছিল বাংলার জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। অনাবৃষ্টির কারণে শস্যহানিতে এই দুর্ভিক্ষের সূচনা হলেও কোম্পানীর শাসননীতিই এই দুর্ভিক্ষকে সর্বগ্রাসী ও ব্যাপক করে তোলার জন্য দায়ী ছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংস (1772-1785) ও কর্ণওয়ালিসের (1786-1793) অধীনে যুদ্ধ

1772 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ একটি বিশেষ ক্ষমতাপন্ন শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত এর পরিচালকবৃন্দ ভারতের অবশিষ্ট অংশে নতুনভাবে প্রভুত্ব বিস্তারের প্রস্তুতি হিসেবে বাঙলায় তাদের ক্ষমতা বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করায় মনোনিবেশ করেছিল। কোম্পানী ইতিপূর্বেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অভ্যাস আয়ত্ত করেছিল, নতুন নতুন রাজ্যজয় এবং অর্থলালসাও তারা সংযত রাখতে পারেনি। কাজেই বাঙলায় তাদের শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তাদের অনেকগুলি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

1766 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিল। এই চুক্তির সর্ত ছিল যে কোম্পানী মহীশুরের হায়দর আলির

বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজামকে সাহায্য করবে এবং এর বিনিময়ে নিজামকে তাঁর রাজ্যভুক্ত 'উত্তর সরকার' নামে পরিচিত অংশটুকু কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হবে। কোম্পানী ভেবেছিল যে অতি সহজেই হায়দার আলিকে পরাজিত করা যাবে। কিন্তু হায়দার আলির শক্তি কোম্পানীর তুলনায় খুব কম ছিল না। ইংরাজদের যুদ্ধে বিতাড়িত করে হায়দার আলি 1769 খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে হানা দিয়েছিলেন। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মাদ্রাজে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ (কাউন্সিল) হায়দার আলির সর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। সন্ধির সর্তানুসারে দুই পক্ষকেই বিজিত এলাকার পুনরাধিকার দেওয়া হয়। তৃতীয় কোন পক্ষ দুই পক্ষের যে কোন পক্ষকে আক্রমণ করলে দুই পক্ষ একজোটে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে লড়বে এই প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। ইংরাজ কোম্পানী অবশ্য এই সর্ত লঙ্ঘন করতে কোন দ্বিধা করেনি। 1771 খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা আক্রমণে বিব্রত হায়দার আলির সাহায্যার্থে ইংরাজ কোম্পানী এগিয়ে আসেনি, এটা তাদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। এই ঘটনার পর হায়দার আলি ইংরাজদের উপর তাঁর বিশ্বাস অটুট রাখতে পারেননি। অতঃপর ইংরাজদের তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখতেন।

1775 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে বিবাদ বেধে উঠেছিল। ঠিক এই সময়ে মারাঠাদের মধ্যে প্রবল অন্তর্বিরোধও দেখা দিয়েছিল। দুই পক্ষের এক পক্ষ ছিল শিশু পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও-এর সমর্থক আর দ্বিতীয় পক্ষ ছিল রঘুনাথ রাও-এর সমর্থক। প্রথম পক্ষীয় দলের নেতা ছিলেন —নানা ফাড্‌নীশ। বোম্বাইস্থিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই গৃহবিবাদের সুযোগে রঘুনাথ রাওকে সমর্থন করে কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে চেয়েছিল। মাদ্রাজ ও বাংলায় তাদের স্বদেশীয় কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীগণ যেভাবে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাচ্ছিল সেই দৃষ্টান্ত তাদেরও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে প্রেরণা দিয়েছিল। এর পরিণামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে 1775 থেকে 1782 পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বৎসরকাল মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল।

প্রথমদিকে তালগাঁও নামক স্থানে মারাঠারা ইংরাজদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। এই পরাজয়ের পর ইংরাজেরা তাদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধিচুক্তি ওয়াদগাঁও চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তি অনুসারে ইংরাজেরা লড়াই-এ যেসব জায়গা জয় করেছিল তা' মারাঠাদের ফিরিয়ে

দিতে হয়েছিল। পেশোয়া পদের অপর দাবিদার রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ ত্যাগ করতেও তারা বাধ্য হয়েছিল।

এই সময়টা ভারতে ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে একটা দুঃসময়রূপে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত মারাঠা সর্দার পেশোয়া ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী নানা-ফাড়্‌নীশের নেতৃত্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের শাসকগণ দীর্ঘকাল ধরে তাদের মধ্যে ব্রিটিশের অনুপ্রবেশে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক এই সময়েই যুগপৎ হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মহীশূরের হায়দার আলি ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেন। এইভাবে ইংরাজদের মারাঠা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর—এই তিন শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এদিকে পৃথিবীর অপর প্রান্তে আমেরিকার বিদ্রোহী ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধেও তাদের সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠেছিল এবং সেখানেও তাদের জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। পুরাতন শত্রুর বিপদ উপস্থিত দেখে ভারতে ফরাসী শক্তি এই সুযোগে ইংরাজদের উপর যে আঘাত হানার প্রস্তুতি নিয়েছিল, সেটাও তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির এই দুর্দিনে ভাগ্যক্রমে তারা একজন বুদ্ধিমান, উদ্যোগী ও অভিজ্ঞ গভর্নর-জেনারেলের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। এই গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস দৃঢ়সঙ্কল্প ও প্রবল উদ্যম সহকারে ইংরাজের বিলীয়মান শক্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। গডার্ড নামে এক সেনাপতির নেতৃত্বে ব্রিটিশের একটি সৈন্যবাহিনী তাদের রণকৌশল দেখাতে দেখাতে মধ্যভারতের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। পথে অনেক-গুলি যুদ্ধে জয়লাভ করে ব্রিটিশ বাহিনী আরও অগ্রসর হয়ে পরিশেষে 1780 খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদ অধিকার করে নিয়েছিল। বিজয়গর্বী ইংরাজ কিন্তু বুঝে গিয়েছিল যে মারাঠা তাদের সবচেয়ে পরাক্রান্ত শত্রু। এদের বাহুবল ছাড়া অন্যান্য সুবিধাগুলিও অপ্রতুল নয়। মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে বিক্রমের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে ব্রিটিশ শক্তি বেশ ভয় পেয়েছিল। মারাঠাদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধে কোন পক্ষ বিজয়ী তা নির্ধারণ অবশ্য সম্ভব হয়নি। অবশেষে, মহাদ্‌জীর মধ্যবর্তিতায় 1782 খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-মারাঠা সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। 'সালবাই' চুক্তি নামে খ্যাত এই সন্ধিসূত্রে এটাই স্থির হয়েছিল যে যার দখলে যা আছে তা বজায় থাকবে। এই সন্ধির ফলে

ভারতে ব্রিটিশ শক্তি, অবশিষ্ট ভারতীয় শক্তিপুঞ্জের মিলিত প্রতিরোধ থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ নামে খ্যাত এই যুদ্ধের ফলাফলে কে বিজয়ী এটা নির্ধারিত না হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশের লাভ হয়েছিল এই যে তদানীন্তন ভারতের এক প্রবলতম ও দুর্ধর্ষ মারাঠা শক্তির সঙ্গে কুড়ি বৎসর যাবৎ আর তাদের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়নি। এই সময়টির মধ্যে ইংরাজ বাংলায় তার শাসন সংহত করে নিয়েছিল, আর অন্যদিকে মারাঠা সর্দারেরা নিজেদের শক্তি সংহত না করে পারস্পরিক তিক্ত বিবাদে মত্ত হয়ে এই সময়ের অপচয় করেছিল। সালবাই চুক্তি অনুযায়ী ইংরাজেরা মহীশূর রাজ্যের উপর হামলা চালাবার সুযোগ পেয়েছিল। হায়দার আলির কাছ থেকে বিজিত অঞ্চল পুনরুদ্ধারে মারাঠারা ইংরাজদের সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধও ছিল।

1780 খ্রীষ্টাব্দে হায়দার আলির সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বাধে। ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে এর আগে হায়দার আলি একের পর এক যুদ্ধে ইংরাজদের পরাজিত করেছিলেন, বহু ইংরাজ সৈন্য আত্মসমর্পণ করতেও বাধ্য হয়েছিল। এই যুদ্ধটিতেও দেখা গিয়েছিল যে হায়দার আলির সেই পুরাতন রণকুশলতা অব্যাহতই রয়েছে। এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র কর্ণাটক অঞ্চল হায়দার আলির করতলগত হয়েছিল। কিন্তু পরে আর একবার ব্রিটিশের বাহুবল ও কূটনীতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস নিজামকে ঘুষ দিয়ে তাকে ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তিগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন এবং এই-জন্য তাঁকে গুণ্টুর জেলার অধিকারও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। 1781-82 খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের ওয়ারেন হেস্টিংস এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। মারাঠা শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে কোম্পানীর যে বিরাট বাহিনী নিযুক্ত ছিল তাদের এখন মহীশূরের বিরুদ্ধে অভিযানে কাজে লাগানো হয়েছিল। 1781 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আয়ার কূটের (Eyre Coote)-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পোর্টোনোভো নামক স্থানে হায়দার আলির পরাজয় ঘটেছিল। 1782 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হায়দার আলির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু সুলতান ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত হয়ে উঠায় অবশেষে 1784 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। এর সর্তানুযায়ী পরস্পরকে বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পিত হয়েছিল।

উপরের ঘটনাগুলি আলোচনা করলে বেশ বোঝা যায় যে মারাঠা বা হায়দার আলির তুলনায় ব্রিটিশের বাহুবল মোটেই অধিক ছিল না, এদের তুলনায় ব্রিটিশের শক্তি বহুলাংশে হীনতর ছিল কিন্তু তত্রাপি তারা ভারতের মৃত্তিকায় নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে এবং পরবর্তীকালের যুদ্ধবিগ্রহে দক্ষতা দেখিয়ে এখন ব্রিটিশ শক্তি ভারতের তিনটি প্রধান শক্তির অন্যতম রূপে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল।

ব্রিটিশের দিক থেকে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলাফল অপেক্ষাকৃত লাভজনক হয়েছিল। 1784 খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিতে টিপু এবং ব্রিটিশের বিরোধের হেতুগুলির কোন ফয়সালা হয়নি। সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র সাধিত করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ টিপুর প্রতি অতিমাত্রায় বিদ্বিষ্ট হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে টিপুকে তারা তাদের প্রবলতম শত্রু বলে ধরে নিয়েছিল। তাদের মতে টিপুই ছিলেন সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ একাধিপত্যের পথে প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এদিকে টিপু ইংরাজদের মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর স্বাধীনতার পথে এরা ছিল তাঁর প্রবল শত্রু। ভারতভূমি থেকে এদের বিতাড়ন টিপুর পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল।

ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আর একবার 1789 খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। টিপুর পরাজয়ের পর 1792 খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধের অবসান হয়। অমিতবিক্রম ও সাহসের সঙ্গে টিপু ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছিলেন। কিন্তু কূটনীতির খেলায় তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তদানীন্তন কালের ইংরাজ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁর চতুর কূটনীতি প্রয়োগ করে নিজাম সহ মারাঠাদের এবং ত্রিবাঙ্কুরও কুর্গের শাসকদের স্বপক্ষে টেনে নিয়ে টিপুকে নিঃসঙ্গ করে ফেলেছিলেন। এই যুদ্ধ থেকে আর একবার বোঝা গিয়েছিল তখনকার দিনের ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতি বা শাসকেরা কতদূর অদূরদর্শী ছিলেন। কিছু সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির লোভে এঁরা একজন ভারতীয় নরপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিদেশী শক্তিকে সাহায্য জুগিয়েছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তন চুক্তি অনুযায়ী টিপুকে তাঁর রাজ্যের অর্ধাংশ ইংরাজদের ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এছাড়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ তাঁকে ইংরাজদের 330 লক্ষ টাকা দিতে হয়েছিল। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ ভারতে টিপুর একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়ে সেখানে ব্রিটিশের আধিপত্য দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির অধীনে সাম্রাজ্য বিস্তার (1798-1805)

1798 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল রূপে ভারতে এসেছিলেন। এই সময়ে পৃথিবীর নানা অংশে ফরাসীদের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামে ব্রিটিশ জাতি বিব্রত হয়ে পড়েছিল। ওয়েলেসলির কার্যকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের আর একটি উল্লেখযোগ্য যুগের সূচনা হয়।

ইংরাজদের নীতি ছিল তারা এ পর্যন্ত যে সব রাজ্য লাভ করেছে সেগুলি যাতে বজায় থাকে সেদিকে সতর্ক থাকা। তারা রাজ্যজয়ের চেষ্টা তখনই করত যখন তারা দেখত এই ব্যাপারে ঝুঁকি অল্প, এবং এটা ভারতীয় প্রধান শক্তিগুলিকে না ঘাঁটিয়েও করা সম্ভব। ওয়েলেস্‌লি এই রক্ষণশীল নীতি বর্জন করে এই সঙ্কল্প নিয়েছিলেন যে যতগুলি সম্ভব ততগুলি রাজ্যকে ব্রিটিশের করায়ত্ত করে নিতে হবে। 1797 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ভারতের মহীশূর ও মারাঠা এই দুই বৃহৎ শক্তির গৌরব অস্তমিত হয়েছিল। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পর মহীশূর বা কর্ণাটক রাজ্য তার অতীত গৌরবের কঙ্কাল মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মারাঠা-নায়কেরা পরস্পরের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থেকে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। কাজেই ব্রিটিশের পক্ষে তার সাম্রাজ্য বিস্তারের একটা শুভক্ষণ এসে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে যে কোন রাজ্য আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই সঙ্গে ছিল পররাজ্য গ্রাসের পরিণামে প্রচুর মুনাফা লাভের সম্ভাবনা। ভারতে ইংরাজের প্রভুত্ব বিস্তার ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সমাজেরও একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছিল। এতদিন পর্যন্ত এরা ভারতে ইংরাজদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া পছন্দ করত না কারণ এদের বিশ্বাস এই ছিল যে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যবসার ক্ষতি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এরা উপলব্ধি করেছিল যে সমগ্র ভারতে ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপিত হলেই ব্রিটেনের শিল্পদ্রব্যের জন্য একটা ভাল বাজারের সৃষ্টি হবে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষও ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল, তবে ব্যবসায়ের ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ বিনা অর্থহানিতেই তারা এটা করতে চেয়েছিল। ব্রিটিশেরা ফরাসীদের তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর মোটেই বরদাস্ত করতে পারছিল না কাজেই যে সব ভারতীয় রাজা বা নবাব ফরাসীদের প্রশ্রয় দিচ্ছিল তাদের দমন করাও ব্রিটিশের পক্ষে বেশ আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে কাবুলের নৃপতি জামান শাহের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কোম্পানী এই

সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় বেশ সন্ত্রস্থ বোধ করেছিল। এই জামান শাহ্ উত্তর ভারতের কোন কোন দেশীয় নৃপতির সাহায্য পেতে পারে এমন আশঙ্কাও বর্তমান ছিল। এদিকে টিপু সুলতান জামান শাহ্‌কে তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরাজকে ভারতভূমি থেকে বিতাড়নের আহ্বানও জানিয়ে রেখেছিলেন।

রাজনৈতিক দিক থেকে ওয়েলেস্‌লির নীতি ছিল ত্রিমুখী। অধীনতামূলক মিত্রতা, সরাসরি যুদ্ধ ও কোন সময়ে বিজিত রাজ্যগুলি দখল—এই ছিল তাঁর তিনটি নীতি বা কার্যক্রম। কিছু ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন রেখে কোন একটি বিশেষ রাজ্যকে প্রতিবেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, এই নীতি ইংরাজেরা আগেই অবলম্বন করেছিল। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা শাসককেই বহন করতে হত। ওয়েলেস্‌লি এই পুরাতন ব্যবস্থাকে এমন-ভাবে ঢেলে সাজালেন যাতে এই ধরনের রাজ্যগুলি কোম্পানীর সর্বময় প্রভুত্বের আওতায় এসে পড়তে বাধ্য হয়। ওয়েলেস্‌লির এই 'অধীনতা-মূলক মিত্রতা'র নীতির ফলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে স্থায়ীভাবে ইংরাজ সৈন্যবাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং এই সৈন্যবাহিনীর খরচ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কাছে কোম্পানীই আদায় করবে এটাই ঠিক হয়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে এই ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েনের ব্যবস্থাটা ছিল মিত্র রাজ্যটিকে প্রতিবেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষা কিন্তু আসলে এটা ছিল রাজ্যটির তরফে কোম্পানীর প্রভুত্ব মেনে নিয়ে সৈন্যের খরচের নামে কোম্পানীকে রাজস্ব বা কর দান। অনেক সময় ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা-চুক্তি কবলিত শাসক বা রাজাকে বাৎসরিক খাজনার বদলে তার রাজ্যাংশ কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হত। এই অধীনতামূলক মিত্রতা ব্যবস্থায় প্রায়ই কতকগুলি সর্তও জড়িত থাকত। এগুলি ছিল যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের দরবারে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে 'রেসিডেণ্ট'রূপে রাখতে হবে; ব্রিটিশের বিনা অনুমতিতে কোন ইউরোপীয় (অ-ইংরাজ) কর্মচারী নিয়োগ করা চলবে না; গভর্নর জেনারেলের বিনা অনুমতিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা শাসক প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে কোন বিষয়ে কোন কথাবার্তা চালাতে পারবে না। এই সর্তগুলি পূরণের বিনিময়ে ইংরাজ কোম্পানী মিত্র রাজ্যটিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিত। কোম্পানীর তরফ থেকে মিত্র রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বলা হ'ত যে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা কোন হস্তক্ষেপ করবে না, রাজা

তাঁর ইচ্ছামতই দেশ শাসন করবেন। অবশ্য এই প্রতিশ্রুতি প্রায়ই রক্ষিত হত না।

প্রকৃতপক্ষে, ওয়েলেস্‌লির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' ব্যবস্থা ছিল একটা ফাঁদ। কোন রাজা বা রাজ্যের পক্ষে নিজের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়া ছিল এই ফাঁদে পড়ার অর্থ। কোন রাজ্যের পক্ষে ইংরাজের সঙ্গে এই অধীনতা-মূলক মিত্রতা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পরিণাম ছিল—আত্মরক্ষার অধিকারহীনতা এবং অন্য রাজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা বা রক্ষার অধিকারচ্যুতি। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে কোন পরামর্শ বা আলোচনা করে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি অথবা রাজ্যের উন্নতির জন্য কোন বিদেশী নিয়োগ এসবও ছিল নিষিদ্ধ। এক কথায় অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি পাশবদ্ধ ভারতীয় শাসক তার রাজ্যের বাইরে কারও সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখা এমন কি আলাপ আলোচনারও অধিকার হারাতেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণব্যাপারে ও তাঁর স্বাধীনতাতেও হাত পড়েছিল। ব্রিটিশ 'রেসিডেণ্ট' রাজ্যের দৈনন্দিন শাসন-ব্যবস্থাতেও হস্তক্ষেপ করত এবং রাজাকে তার কথামত চলতে হত। এই ব্যবস্থায় রাজ্যটির আভ্যন্তরীণ অবস্থা বেশ হীন হয়ে উঠত। ব্রিটিশ সৈন্য রক্ষার জন্য কোম্পানীকে সাধ্যাতিরিক্ত রকমের টাকা দিতে হ'ত। এই টাকার অঙ্ক একতরফাভাবে কোম্পানীই নির্দিষ্ট করে দিত এবং এটা ক্রমাগত স্ফীত করা হত। রাজ্যের আর্থিক অবস্থা এতে দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠত, আর জনসাধারণ দারিদ্র্যের পেষণে পিষ্ট হয়ে উঠত। অধীনতামূলক মিত্রতা পাশে আবদ্ধ 'আশ্রিত' রাজ্যগুলির নিজস্ব সৈন্যবাহিনীগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। পুরুষানুক্রমে সৈনিক বৃত্তিধারী লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও সেনা-নায়কেরা জীবিকাচ্যুত হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে দারিদ্র্য ও নৈতিক পতনের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। এদের অনেকে ভ্রাম্যমান পিণ্ডারি দস্যুদের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। এরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই যুগ ধরে সমগ্র উত্তর ভারতে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'মিত্রতামূলক সন্ধি'গ্রস্থ শাসকেরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রজাদের সুখদুঃখের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাতে শুরু করেছিল। রাজ্যের সুরক্ষার জন্যই রাজারা প্রজাদের সুখে শান্তিতে রাখার চেষ্টা করে থাকেন। এর অন্যথা হলে রাজা বা শাসকদের ভয় থাকে যে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে অধিকারচ্যুত করবে, সুতরাং তাঁরা প্রজাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন। ইংরাজের 'আশ্রিত' রাজাদের অন্ততঃ প্রজা

বিদ্রোহের আতঙ্ক ছিল না, কারণ তাঁরা জানতেন সেক্ষেত্রে রাজ্যে মোতায়েন ব্রিটিশ সৈন্যরাই তাদের রক্ষা করবে। এই অবস্থায় আশ্রিত রাজারা প্রজা নির্যাতনও চালিয়ে যেতেন। জনপ্রিয় শাসক হওয়ার প্রয়োজন তাদের পক্ষে আর ছিল না কারণ তাঁরা জানতেন—বহিঃশত্রু ও গৃহশত্রু এই দ্বিবিধ আক্রমণের ক্ষেত্রে প্রবল প্রতাপশালী ইংরাজ কোম্পানী তাদের সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ব্রিটিশের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভারতীয় শাসকদের টাকায় তারা এখন একটা বিরাট সৈন্য-বাহিনী পোষণ করতে পেরেছিল। সৈন্যবাহিনী পোষার জন্য যে মোটা অঙ্কের টাকা প্রয়োজন সেটা তাদের খরচ করতে হয়নি। নিজেদের অধিকৃত এলাকার বহুদূরস্থিত অঞ্চলে অবস্থিত এলাকায় তারা নিজেদের আশ্রিত রাজার হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, কারণ আশে-পাশের প্রতিটি আশ্রিত রাজ্যই ছিল এক একটি ব্রিটিশ শক্তির ঘাঁটি। আশ্রিত রাজ্যের সুরক্ষা এবং বহির্বিভাগীয় সম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্বও তারা পেয়েছিল। এইসব রাজ্যগুলির প্রত্যেকটিতে সুসজ্জিত নিজস্ব সৈন্য-বাহিনী থাকায় যে কোন সময়ে 'আশ্রিত' রাজাকে তাড়িয়ে দিয়ে তার রাজ্য দখল করা খুব সহজ হয়ে উঠেছিল, কারণ সংশ্লিষ্ট এই রাজার আত্মরক্ষার জন্য নিজস্ব সৈন্যবাহিনী থাকত না। বাইরের কোন রাজ্যের সঙ্গেও তার যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকায় অসহায়ভাবে তাকে ব্রিটিশের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হত। যে কোন রাজ্যের রাজা বা শাসককে 'অনুপযুক্ত' ঘোষণা করে তার রাজ্যকে সোজাসুজি দখল করারও বেশ সুযোগ ছিল। ব্রিটিশের পক্ষে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি কত লাভজনক হয়ে উঠেছিল সেটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন "খাইয়ে দাইয়ে একটা ষাঁড়কে বেশ হৃষ্টপুষ্ট করে তোলা হয় এই উদ্দেশ্যে যে একদিন পরমানন্দে প্রচুর মাংস ভোজন করা যাবে। ব্রিটিশেরা এইভাবে 'আশ্রিত' রাজাদের উন্নতি করিয়ে দিত, যাতে ভবিষ্যতে তাকে বেশ ভালভাবে গলাধঃকরণ করা যায়।"

1798 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লী সর্বপ্রথম হায়দ্রাবাদের নিজামকে এই অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ করেন। এই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী নিজামকে তার নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিতে হয়েছিল। এই বাহিনী

ফরাসী যুদ্ধবিশারদদের শিক্ষায় সুগঠিত হয়েছিল। নিজস্ব বাহিনীর পরিবর্তে নিজাম পেয়েছিলেন তাঁর রাজ্যরক্ষার জন্য কোম্পানীর ছয় ব্যাটালিয়ন ব্রিটিশ সৈন্য। এর জন্য তাঁকে বাৎসরিক £ 241,710 পাউণ্ড ব্যয় হিসেবে কোম্পানীকে দিতে হত। নিজামকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে এই ব্রিটিশ বাহিনী মারাঠা আক্রমণের হাত থেকে তাঁর রাজ্যকে রক্ষা করবে। 1800 খ্রীষ্টাব্দে একটা নূতন চুক্তি করে নিজাম রাজ্যে ব্রিটিশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছিল। বাড়তি খরচ আর দাবি করা হয়নি, তবে তার পরিবর্তে নিজাম রাজ্যের কিছু অংশ কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল, অর্থাৎ নিজাম রাজ্যের একাংশ প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

অযোধ্যার নবাবকে 1801 খ্রীষ্টাব্দে এই অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি অঙ্গীকার করে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। চুক্তিবদ্ধ নবাব ইংরাজদের তাঁর রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই অংশের মধ্যে ছিল রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ। এর পরিবর্তে নবাবকে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য একটি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী তাঁর রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছিল। এইভাবে নবাব তাঁর স্বাধীনতা হারিয়েছিলেন। অবশিষ্ট 'আউধ' রাজ্যেও তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তাঁর স্বরাজ্য পরিচালনও তিনি স্বইচ্ছায় করতে পারতেন না। তাঁকে সব ব্যাপারেই ইংরাজের 'পরামর্শ' নিয়ে চলতে হত, আসলে পরামর্শের চেয়ে এগুলি ছিল হুকুমনামা। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাঁর যে আরক্ষা বাহিনী ছিল সেটিও ইংরাজ-কর্তা ব্যক্তিদের নির্দেশমত পুনর্গঠিত করতে বলা হয়েছিল। নবাবের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী প্রায় ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। তাঁর রাজ্যের যে কোন স্থানে সৈন্য মোতায়েন করার অধিকারও ইংরাজেরা হস্তগত করেছিল।

মহীশূর, কর্ণাটক, তাঞ্জোর ও সুরাট সম্বন্ধে ওয়েলেস্‌লীর ব্যবহার কঠোরতর হয়েছিল। এর মধ্যে মহীশূর রাজ্য-প্রধান টিপু কখনই এই অধীনতামূলক মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হতে চাননি। 1792 খ্রীষ্টাব্দে টিপু তাঁর রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ ইংরাজদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এই ব্যবস্থা সহজে মেনে নিতে চাননি। ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর একটা সংগ্রাম করতেই হবে এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী করার দিকে মন দিয়েছিলেন। বিপ্লবী ফরাসী সরকারের সঙ্গে

একটা মৈত্রী স্থাপনের জন্য তিনি আলাপ-আলোচনা সুরু করেছিলেন। একটা ব্রিটিশ বিরোধী সামরিক জোট গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি আফগানিস্থান, আরব এবং তুরস্ক দেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলও পাঠিয়েছিলেন।

এদিকে লর্ড ওয়েলেস্‌লিও টিপুকে পদাবনত করতে কম বদ্ধপরিকর হননি, বিশেষতঃ ফরাসীদের ভারতেব রাজনৈতিক মঞ্চে পুনরাগমনের বিরুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। 1799 খ্রীষ্টাব্দে একটা স্বল্পস্থায়ী কিন্তু তীব্র সংগ্রামে টিপুকে ইংরাজেরা পরাস্ত করেছিল। টিপুর প্রত্যাশিত ফরাসী সাহায্য প্রাপ্তির আগেই এই সংগ্রাম সুরু হয়েছিল। পরাজিত হয়েও টিপু অবমাননাজনক সর্তে ইংরাজের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি গর্বভরে বলেছিলেন "ইংরাজের দেওয়া বৃত্তিভোগী রাজা, নবাবদের দলভুক্ত হয়ে বিধর্মীদের অনুগ্রহে ঘৃণিত জীবনযাপনের চেয়ে প্রকৃত সৈনিকের মত আমার পক্ষে মৃত্যুবরণই শ্রেয়ঃ।" নিজের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে ইংরাজদের আক্রমণ রুখতে গিয়ে 1799 খ্রীষ্টাব্দের 4 মে টিপু সশস্ত্র সংগ্রামকালে বীরোচিত মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে লড়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যৎকালে ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন নামে পরিচিত আর্থার ওয়েলেস্‌লি শ্রীরঙ্গপত্তন রাজধানী দখলের ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন—"চার তারিখ রাত্রিতে যা ঘটেছিল, এব চেয়ে অধিক অত্যাচারের ঘটনা আর ঘটতে পারে না। শহরে এমন একটি বাড়ী ছিল না, যেটি লুণ্ঠিত হয়নি। আমি জেনেছিলাম যে সৈন্যবাহিনীর বাজারের বহু মূল্যবান রত্ন, সোনার বাঁট প্রভৃতি দ্রব্য কোম্পানীর ইংরাজ সৈন্য, দেশীয় সেপাই ও তাদের সঙ্গীগণ বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছিল।…নগরের লোকজন এখন তাদের ফেলে যাওয়া ঘর-বাড়ীতে ফিরে আসছে এবং নিজের নিজের জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করছে। তবে এদের প্রত্যেকেরই সম্পদ বলতে যা কিছু সবই চলে গিয়েছে।"

টিপুর রাজত্বের প্রায় অর্ধভাগ ইংরাজ এবং তার আশ্রিত মিত্র নিজাম ভাগ করে নিয়েছিল। খণ্ডিত মহীশূর রাজ্য মহীশূরের প্রাচীন রাজবংশীয়দের হাতে দেওয়া হয়েছিল। এদের পূর্বপুরুষদের হাত থেকেই হায়দার আলি মহীশূর রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। মহীশূরের নূতন রাজাকে ইংরাজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি অবশ্যই মেনে নিতে হয়েছিল তবে এই

চুক্তির সর্ত আরও কঠোর করা হয়েছিল। এই চুক্তির সর্ত ছিল যে গভর্নর জেনারেল প্রয়োজনবোধে রাজ্যের শাসনব্যবস্থারও দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে মহীশূর রাজ্য তার স্বাধীনতা হারিয়ে পুরোপুরি কোম্পানীর অধীনস্থ হয়ে পড়েছিল। চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম দাঁড়িয়েছিল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে ফরাসীদের বাধাদানের চেষ্টার স্থায়ী বিলুপ্তি।

1801 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি কর্ণাটকের পুতুল নবাবকে একটা নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেছিলেন। এই চুক্তি অনুসারে বেশ মোটা রকমের বৃত্তি বা পেনশন নবাবকে দিয়ে কর্ণাটক রাজ্য কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত করা হয়েছিল। 1947 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষে 'মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি' নামে যে প্রদেশ ছিল আলোচ্য সময়েই তার সৃষ্টি হয়। মালাবার সহ মহীশূরের কাছ থেকে বিজিত অঞ্চলের সঙ্গে কর্ণাটক রাজ্যকে সংযুক্ত করে মাদ্রাজ প্রদেশ গঠিত হয়েছিল। এইভাবে কোম্পানী তাঞ্জোর এবং সুরাটও এদের শাসকদের বৃত্তিভোগীতে পরিণত করে নিজেদের দখলে এনে ফেলেছিল। অতঃপর ভারতে ব্রিটিশের শাসন বহির্ভূত শক্তিগুলির মধ্যে মারাঠারাই মুখ্য স্থানের অধিকারী হয়েছিল। এইবার ওয়েলেস্‌লির মনোযোগ তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। মারাঠা রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি এবার এমনভাবে হস্তক্ষেপ আরম্ভ করলেন যে মারাঠাদের ইংরাজদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকেনি।

এই সময়ে মারাঠারা একটা যৌথ সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিল। পাঁচজন প্রধান বা সর্দার এই সাম্রাজ্যের অংশীদার ছিলেন। এঁরা ছিলেন পুনের পেশোয়া, বরোদার গায়কোয়াড়, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার ও নাগপুরের ভোঁসলে। পেশোয়া ছিলেন এই পাঁচজনের নেতৃ-স্থানীয়। মারাঠা জাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মারাঠা-দের মধ্যে বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ নায়কগণের মধ্যে আর বিশেষ কেউ জীবিত ছিলেন না। মহাদজী সিন্ধিয়া, তুকোজী হোলকার, অহল্যাবাঈ হোলকার, পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও এমন কি যিনি মারাঠাদের যৌথ সাম্রাজ্যকে তিরিশ বছর ধরে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন সেই নানা ফাড়্‌নীশ সহ সকলেই 1800 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে এই সময়ে মারাঠা নায়কেরা আগ্রাসী বিদেশী শত্রু যে ক্রুত

তাদের দিকে এগিয়ে আসছে এই নিশ্চিত বিপদের প্রতি উদাসীন থেকে এক তীব্র ঘরোয়া বিবাদে উন্মত্ত হয়েছিলেন। একদিকে যশোবন্ত রাও হোলকার ও অন্যদিকে দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল।

ওয়েলেস্‌লি বারংবার পেশোয়া ও সিন্ধিয়াকে তাঁর নিজস্ব ধরনের মিত্রতা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ নানা-ফাড়্‌নীশ এই ফাঁদে পড়তে অস্বীকার করেন। কিন্তু 1802 খ্রীষ্টাব্দের 25 অক্টোবর দেওয়ালী উৎসবের দিন হোলকার, পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার মিলিত বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর কাপুরুষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরাজের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছিলেন। 1802 খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভাগ্যজনক শেষ দিনে পেশোয়া বেসিন নামক স্থানে ইংরাজের অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। 1802 খ্রীষ্টাব্দের 24 ডিসেম্বর ওয়েলেস্‌লি লিখে-ছিলেন যে "ঘটনাস্রোত যে পথ ধরেছে তাতে মনে হচ্ছে মারাঠা সাম্রাজ্যে কোনরকম যুদ্ধবিগ্রহ না করেই ব্রিটিশ স্বার্থ দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার শুভক্ষণ আসন্ন।"

মারাঠা রাজ্যে ব্রিটিশের এই বিজয়লাভ খুব অনায়াসসাধ্য হলেও ওয়েলেস্‌লি একটি বিষয়ে সঠিক অবহিত হতে পারেননি। আত্ম-গর্বী মারাঠা প্রধানেরা বিনা দ্বন্দ্বে তাঁদের বহুদিনের সাধনালব্ধ স্বাধীনতা সহজে বিকিয়ে দেবেন না, এটা তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু এই বিপদের দিনেও তারা একত্রে মিলিত হয়ে তাঁদের সকলের শত্রু ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারেননি। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে যখন ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত সেই সময়ে হোলকার দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখেছিলেন, আর গায়কোয়াড় প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজদের সহযোগিতা করেছিলেন। যখন হোলকার বিপদ-গ্রস্থ হলেন, তখন ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া তাদের পুরাতন ক্ষতে প্রলেপ দিতে ব্যস্ত থাকলেন। একে ত নিজেদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তার উপর ইংরাজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে মারাঠা প্রধানেরা হিসেবেও ভুল করতেন। ইংরাজ শত্রু যে কত প্রবল সেটা গ্রাহ্য না করে যথোচিত প্রস্তুতি না নিয়েই তাঁরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন।

দক্ষিণাপথে আর্থার ওয়েলেস্‌লির নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী 1803 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আসাই (Assaye) নামক স্থানে ও নভেম্বর মাসে

আরগাঁও-এ সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। উত্তর ভারতে লর্ড লেকের নেতৃত্বাধীন ইংরাজ বাহিনী 1803 খ্রীষ্টাব্দের পয়লা নভেম্বর লাসোয়ারী নামক স্থানে সিন্ধিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে আলিগড়, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে নিয়েছিল। অন্ধ মুঘল সম্রাট্ আর একবার ব্রিটিশের বৃত্তিভোগী হয়েছিলেন। ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া উভয়েই ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। দুই পক্ষকেই অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির আওতাভুক্ত হতে হয়েছিল। এঁরা দুজনেই নিজ নিজ রাজ্যাংশ ইংরাজদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের দরবারে ইংরাজ রেসি-ডেণ্টের অবস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন। ইংরাজের বিনা অনুমতিতে কোন ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ করবেন না, এই প্রতিশ্রুতিও তাঁদের দিতে হয়েছিল। এখন ওড়িশার উপকূল ভাগ এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ ভূভাগ সম্পূর্ণভাবে ইংরাজ অধিকারভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। বিক্ষুব্ধ পেশোয়া ইংরাজের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন।

ওয়েলেস্‌লি এবার হোলকারকে সায়েস্তা করার চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। তবে যশোবন্ত রাও হোলকার সহজে নতিস্বীকার করার পাত্র ছিলেন না। একস্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ না করা ছিল মারাঠাদের অন্যতম রণকৌশল। জাঠদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চলমান যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ চালিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর বিজয়লাভ হোলকার অসম্ভব করে তুলেছিলেন। হোলকারের সহযোগী ভরতপুরের রাজা ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণোদ্যত ইংরাজ সেনাপতি লেকের আক্রমণ ঠেকিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন। এই সময়ে হোলকার পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘকালের বৈরিতা উপেক্ষা করে সিন্ধিয়া তাঁকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই অবস্থায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারেরা এবিষয়ে সজাগ হয়ে উঠলেন যে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করার খরচ যোগাতে কোম্পানীর লাভের মাত্রায় টান ধরছে। কোম্পানীর ঋণের মাত্রা 1797 খ্রীষ্টাব্দে ছিল £ 17 মিলিয়ন, 1806 খ্রীষ্টাব্দে এটা বর্ধিত হয়ে £ 31 Million-এ দাঁড়িয়েছিল। নেপোলিয়ন আর একবার মাথা তুলে সমগ্র ইউরোপের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি স্বদেশ ইংল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থাও বিপন্ন করে তুলেছিল। ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকেরা এই সময়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বিপুল অর্থব্যয়সাপেক্ষ সাম্রাজ্য

বিস্তার চেষ্টা এখন বন্ধ করা দরকার, যথেষ্ট টাকা ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়েছে। যা কিছু নূতন রাজ্য পাওয়া গিয়েছে সেগুলি ভোগ করা এবং সেখানে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করাটাই এখন প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সাম্রাজ্য বিস্তারকামী ওয়েলেস্লিকে স্বদেশে ফিরতে হয়েছিল। 1806 খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কোম্পানী রাজঘাটে একটা চুক্তি মারফৎ হোলকারের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিল। তাঁর রাজ্যের বেশীরভাগ অংশ তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তার চেষ্টার শেষ পর্যায়েই ওয়েলেস্লির কার্যকালের অবসান হয়েছিল। কাজেই এই সময়ের মধ্যেই ইংরাজেরা ভারতের সর্বপ্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কোম্পানীর বিচার বিভাগীয় তরুণ এক কর্মচারী হেনরি রোবারক্ল (Henry Roberclaw) 1805 খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন "ভারতে বাসকারী যে কোন ইংরাজ মদগর্বী ও জেদী। সে মনে মনে সর্বদাই জানে যে সে একটা বিজিত জাতির প্রভু তাই সে তার অধীনস্থ সকল ব্যক্তিকেই অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে।"

লর্ড হেস্টিংসের অধীনে সাম্রাজ্য বিস্তার

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ মারাঠা প্রধানদের শক্তি ও প্রভাব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল কিন্তু তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে পারেনি। স্বাধীনতার বিলোপ তাঁদের হৃদয়কে বেদনা-বিহ্বল করে তুলেছিল। 1817 খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা তাঁদের হৃত স্বাধীনতা ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার জন্য একটা শেষ মরণপণ সংগ্রামের চেষ্টা করেছিল। ইংরাজ রেসিডেন্টের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেও মারাঠা প্রধানদের মিলিত করে ইংরাজের বিরুদ্ধে এই শেষ সংগ্রামের উদ্যোগে নেতৃত্ব করতে এগিয়েছিলেন স্বয়ং পেশোয়া। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আর একবার মারাঠারা এক সম্মিলিত ও সুচিন্তিত কর্মধারা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। 1817 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পেশোয়া পুনের ইংরাজ রেসিডেন্টের বাস ভবন ও কার্যালয়ে হানা দেন। নাগপুরের আপ্পা সাহেব নাগপুর রেসিডেন্সী আক্রমণ করেন। এই রেসিডেন্সীগুলি ছিল ব্রিটিশ শক্তির প্রতীক। এদিকে মাধব রাও হোলকারও ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন।

গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস উল্লেখযোগ্য তেজস্বিতার সঙ্গে মারাঠাদের

এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছিলেন। সিন্ধিয়াকে তিনি ব্রিটিশ প্রভুত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেন। পেশোয়া, ভোঁসলে ও হোলকারের সৈন্যবাহিনীকে তিনি পরাজিত করেন। পেশোয়াকে গদিচ্যুত করে তিনি তাঁকে একটা ভাতা মঞ্জুর করে কানপুরের নিকট বিঠুরে নির্বাসিত করেন। তাঁর রাজ্য গ্রাস করে বর্ধিতায়তন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়েছিল। হোলকার ও ভোঁসলেকে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সব মারাঠা প্রধানেরাই নিজ নিজ রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চল ইংরাজের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। অবশ্য মারাঠাদের অহমিকা তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে পেশোয়ার রাজ্যভুক্ত একটা ক্ষুদ্র এলাকা নিয়ে সাতারা নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করা হয়। এটা ছত্রপতি শিবাজীর এক বংশধরকে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর সাতারার অধিপতি ব্রিটিশের অধীনে এই রাজ্য শাসনের অধিকার পান। এর পর থেকে ভারতের অন্যান্য স্থানের রাজা নবাবদের মত মারাঠা প্রধানদের অস্তিত্ব ব্রিটিশের কৃপার উপরই নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল।

কয়েক যুগ ধরে রাজপুতানার রাজ্যগুলি সিন্ধিয়া ও হোলকারের অধিকারভুক্ত ছিল। মারাঠাদের পতনের পর রাজপুতানার রাজারা তাদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের কোনই চেষ্টা করেনি। মারাঠাদের পরিবর্তে তারা এখন ব্রিটিশের বশ্যতা মেনে নিয়েছিল।

এইভাবে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র ভারতীয় উপ-মহাদেশ 1818 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ব্রিটিশের অধিকারে এসে গিয়েছিল। এই সাম্রাজ্যের একাংশ ছিল ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। বাকী অংশ বহুসংখ্যক ভারতীয় রাজা ও নবাবদের দ্বারা শাসিত হলেও ব্রিটিশের সর্বময় প্রভুত্বের অধীনে পরিচালিত হত। এই দেশীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব সৈন্যবাহিনী বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। রাজ্যের বাইরে অন্য রাজ্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতাও দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকদের ছিল না। রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য মোতায়েন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর জন্য খুব মোটা টাকা দেশীয় রাজাদের খরচ করতে হ'ত। আভ্যন্তরীণ কাজকর্মের ব্যাপারে এঁদের স্বাধীনতা দেওয়া হত, কিন্তু তা ছিল নামমাত্র। একজন ইংরাজ প্রতিনিধির (রেসিডেন্ট্) ইচ্ছা বা হুকুম সর্বব্যাপারে দেশীয় রাজাদের মেনে চলতে হত। ব্রিটিশের স্বার্থহানিকর এমন কোন ব্যাপার রাজ্যমধ্যে ঘটবার বিন্দুমাত্র

সম্ভাবনা দেশীয় রাজ্যে ছিল না। ভারত জয় প্রায় শেষ করে ব্রিটিশ শক্তি এবার ভারতের প্রাকৃতিক সীমানা পাঞ্জাবের দিকে তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল।

II. ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের সংহতিসাধন (1818-1857)

1818 থেকে 1857 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ কর্তৃক সমগ্র ভারতে প্রভুত্ব বিস্তারের কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল। সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশও জয় করা হয়েছিল। আউধ, মধ্য ভারত এবং বহুসংখ্যক ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গ্রাসও সম্পূর্ণ হয়েছিল।

সিন্ধু বিজয়

ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশে ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমবর্ধমান হওয়ার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইংরাজেরা সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করে এই প্রদেশ জয় করে নিয়েছিল। তাদের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে আফগানিস্থান বা ইরাণ দেশের মধ্য দিয়ে রুশেরা ভারত আক্রমণ করতে আসবে। কাজেই রুশ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ইংরাজেরা ঐ দুই দেশে অর্থাৎ, আফগানিস্থান ও ইবাণে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। তাদের হিসাবমত এই দুই দেশে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির উপায় ছিল—সিন্ধু প্রদেশ অধিকার, কারণ সিন্ধু প্রদেশ অধিকারভুক্ত হলে সিন্ধুর নদীর অধিকাব হাতে আসবে এবং এতে কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হবে একথাও তারা ভেবে রেখেছিল।

1832 খ্রীষ্টাব্দের এক চুক্তি অনুসারে ইংরাজেরা সিন্ধু দেশের নদী ও স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল। সিন্ধু প্রদেশের 'আমীর' আখ্যাধারী শাসকেরা 1839 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের চাপে পড়ে একটা অধীনতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে আমীরদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার আশ্বাস দিয়েও ইংরাজেরা 1843 খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস নেপিয়ারের নেতৃত্বে একটি সামরিক বাহিনীর সাহায্যে অতি অল্প আয়াসেই সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিয়ে এসেছিল। এ সম্বন্ধে অভিযানকারী স্যার চার্লস নেপিয়ার তাঁর দিনলিপিতে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন "সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করাটা মোটেই ন্যায়সঙ্গত না হলেও আমাদের তা করতে হবে। কাজটা মানবতার দিক থেকে খুবই নৃশংস

ব্যাপার হলেও এর থেকে আমাদের বহু প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। স্বার্থসিদ্ধির দিক থেকে সিন্ধু প্রদেশ জয় আমাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন।" সিন্ধু প্রদেশ জয় করার জন্য নেপিয়ার সাত লক্ষ টাকা পারিতোষিক লাভ করেছিলেন।

পাঞ্জাব জয়

1839 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মহারাজা রণজিৎ সিং'এর মৃত্যুর পর পাঞ্জাব প্রদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। এর ফলে ঘন ঘন শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। এই সুযোগে দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর নেতারাও মাথা তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীই প্রদেশের শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিল। এই সৈন্যবাহিনী সাহসিকতাও স্বদেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাপরায়ণতার বেশ অভাব ছিল। এই পরিস্থিতি ইংরাজের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, তাদের লোলুপ দৃষ্টি শতদ্রু তীরবর্তী পঞ্চনদের দেশের উপর পড়েছিল। যদিও 1809 খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত একটা চুক্তি অনুসারে পাঞ্জাবের সঙ্গে তারা একটা চিরস্থায়ী মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ ছিল। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ভারতে ইংরাজদের কর্তা ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে পাঞ্জাব অভিযান সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা সুরু করে দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশের যুদ্ধায়োজন এবং পাঞ্জাবের চরিত্রহীন কিছু কিছু সর্দারের সঙ্গে তাদের সলা-পরামর্শের কথা পাঞ্জাবের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত সৈন্যবাহিনীর ধৈর্য-চ্যুতি ঘটিয়ে দিয়েছিল। 1844 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মেজর ব্রড্‌ফুট (Major Broadfoot)-কে লুধিয়ানায় ব্রিটিশের প্রতিনিধি বা 'এজেন্ট' পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইনি শিখ-বিদ্বেষী রূপে পরিচিত ছিলেন। ব্রড্‌ফুট পুনঃপুনঃ শিখদের সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ করে তাদের ধৈর্যচ্যুতিঘটাবার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দুর্নীতিপরায়ণ সর্দার ও রাজকর্মচারীগণ বুঝতে পেরেছিল আজ হ'ক বা কাল হ'ক একদিন না একদিন শাসনকর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত সৈন্যবাহিনীর কোপে পড়ে তাদের শক্তি, পদ এবং সম্পদ সবই চলে যাবে। এরা ভেবেছিল যে এই সৈন্যবাহিনীকে কোন প্রকারে উত্তেজিত করে ইংরাজের সঙ্গে তাদের লড়াই বাধিয়ে দিতে পারলে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে আর সেটাই তাদের স্বার্থ-সিদ্ধি করবে। 1845-এর শরৎকালে খবর পাওয়া গেল যে শতদ্রু নদী পারাপারের কাজে সেতুরূপে ব্যবহৃতব্য কতক-

গুলি নৌকো বোম্বাই থেকে ফিরোজপুরে এসে পৌছেছে। পাঞ্জাব সীমান্তে বাড়তি সৈন্যদলের জন্ম ছাউনি প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং এই অতিরিক্ত সৈন্য-বাহিনীর পাঞ্জাব সীমান্ত অভিমুখে প্রেরণের কাজ স্থুরু হয়ে গিয়েছে ' ব্রিটিশ শক্তি পাঞ্জাব অধিকার করতে কৃতসঙ্কল্প এটা বুঝতে পারার পর পাঞ্জাবের শাসনকর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত সৈন্যবাহিনীও কতকগুলি প্রতিরোধ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। লর্ড গাফ্ (Lord Gough) ও লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge) যথাক্রমে ব্রিটিশ ভারতের প্রধান সেনাপতি ও গভর্নর জেনারেল ফিরোজপুরের দিকে এগিয়ে আসছেন—ডিসেম্বর মাসে এই খবর পেয়ে পাঞ্জাবী বাহিনীও প্রত্যাঘাতের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল। 1845 খ্রীষ্টাব্দের 13 ডিসেম্বর ইঙ্গ-শিখ বা ইঙ্গ-পাঞ্জাব যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। বিদেশী শত্রুর আক্রমণের বিপদ রুখতে হিন্দু, মুসলমাম ও শিখ খুব দ্রুতই একতাবদ্ধ হয়েছিল। পাঞ্জাব বাহিনী অতি বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিল। কিন্তু কয়েকজন পাঞ্জাবী নেতা ইতিমধ্যেই বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী রাজা লালসিং এবং প্রধান সেনাপতি মিশার তেজসিং আগে থেকেই গোপনে শত্রুপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। এর ফলে পাঞ্জাব বাহিনীকে পরাজয় স্বীকার করে 1846 খ্রীষ্টাব্দের 8 মার্চ অবমাননাকর লাহোর চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। ইংরাজেরা জলন্ধরের ডোয়াব অঞ্চল নিজেরা গ্রাস করে নগদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কাশ্মীর ও জম্মু অঞ্চল রাজা গুলাব সিং ডোগরাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। পাঞ্জাব বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে তাদের শুধু 20,000 পদাতিক 12,000 অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে লাহোরে একটি শক্তিশালী ইংরাজ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। পাঞ্জাবের স্বাধীনতা এইভাবে খর্ব করেও ভারতে অবস্থিত সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শাসকদের ক্ষুধা তৃপ্ত হয়নি। তারা পাঞ্জাবকে আর অধীন মিত্র রাজ্য হিসেবে রাখতে চায়নি, তারা বাংলা ও অন্যান্য রাজ্যের মত পাঞ্জাবের উপর সরাসরি প্রভুত্ব করতে চেয়েছিল। 1848 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ পাঞ্জাব পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করার একটা অজুহাত পেয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে স্বাধীনতাকামী পাঞ্জাবীরা বিক্ষিপ্ত-ভাবে কোন কোন স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই বিদ্রোহগুলির মধ্যে দুটি ছিল উল্লেখযোগ্য। এর একটির নায়ক ছিলেন মুলতানের মুলরাজ,

অপরটির নায়ক ছিলেন লাহোরেব সন্নিহিত স্থানের ছত্তর সিং আতারি-ওয়ালা। ইংরাজদের সঙ্গে সংগ্রামে এবারও পাঞ্জাবীদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেছিল। এই সুযোগে লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাব সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছিলেন। এইভাবে ভারতের শেষ স্বাধীন বাজ্য পাঞ্জাব ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

ডালহৌসী এবং রাজ্যগ্রাস নীতি (1848-1856)

লর্ড ডালহৌসী 1848 খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল রূপে ভারতে আসেন। প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্কল্প এই ছিল যে ব্রিটিশেব প্রত্যক্ষ অধিকাব বা শাসন যতটা বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যাপ্ত কবা সম্ভব তা তিনি করে যাবেন। তিনি আগে থেকেই ঘোষণা করে বসেছিলেন যে "ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা হরণ সুনিশ্চিত, তবে সেটা কিছু সময়সাপেক্ষ মাত্র।" ডালহৌসীর এই নীতির পেছনে ছিল তাঁর একটি নিজস্ব ধারণা। তাঁর ধারণাটি ছিল এই যে দেশীয় শাসকদের রাজ্যের শাসনব্যবস্থা প্রজা-পীড়ন ও দুর্নীতি পুষ্ট। এই তুলনায় ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থা বহু পরিমাণে উন্নত। তবে এই রাজ্য-বিস্তার নীতির মূল প্রেরণা ছিল ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি। অন্যান্য সাম্রাজ্যবিস্তারকামী ইংরাজদের মতই ডালহৌসীর এই বিশ্বাস ছিল যে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ পণ্যের কম কাটতির কারণ ঐ রাজ্য-সমূহে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার অভাব। তাছাড়া ডালহৌসী ও তাঁর সমমর্মীরা এই সময়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন যে তাঁদের 'ভারতীয় মিত্র'গণ ইতিমধ্যেই তাঁদের ভারত বিজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছিল। যে উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে মিত্রতা করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়েছে। এবার এই আশ্রিত মিত্রদের বাতিল করার দিন এসেছে।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজটি লর্ড ডালহৌসী ভালভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর 'স্বত্ববিলোপ নীতি'র উদ্ভাবনকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাজে লাগিয়েছিলেন। এই নীতি অনুসারে কোন 'আশ্রিত' রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেওয়া হত। চিরাচরিত প্রথানুসারে অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি 'দত্তক' পুত্রের পাওয়ার কথা। ডালহৌসীর আইনে এটা মান্য হয়নি। জীবিত অবস্থায় আশ্রিত'অপুত্রক' রাজা যদি কোন 'দত্তক' পুত্র নিয়ে থাকেন

এবং এটি যদি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আগে থেকেই অনুমোদিত হয়ে থাকে শুধু সে ক্ষেত্রেই রাজ্যটি আশ্রিত রাজ্য হিসেবে টিকে থাকবে—স্বত্ববিলোপ নীতি এইভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল। স্বত্ব বিলোপ নীতির ফলে 1848 খ্রীষ্টাব্দে সাতারা এবং 1854 খ্রীষ্টাব্দে ঝাঁসি ও নাগপুর রাজ্যগুলিকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল।

ডালহৌসী বহু ভূতপূর্ব রাজা বা শাসকের সনদ বা উপাধি বরবাদ করে দিয়েছিলেন, ব্রিটিশের কাছ থেকে এদের প্রাপ্য নির্ধারিত বৃত্তিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কর্ণাটক ও সুরাটের নবাব এবং তাঞ্জোরের রাজার উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ভূতপূর্ব পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে বিঠুরের রাজা করা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র নানা-সাহেবকে আর রাজা রূপে গ্রাহ্য করা হয়নি। প্রাপ্য বৃত্তি ইত্যাদি থেকেও নানাসাহেবকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

আউধ রাজ্যটিকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করার জন্য লর্ড ডালহৌসী বড়ই উৎসুক হয়েছিলেন। কিন্তু এ পথে অনেক বাধা দেখা দিয়েছিল। বক্সার-যুদ্ধের আমল থেকে অর্থাৎ বহু বৎসর যাবৎ 'আউধ' ছিল ব্রিটিশের আশ্রিত মিত্র রাজ্য। এই দীর্ঘকাল ধরে আউধের রাজারা ব্রিটিশের প্রতি একান্ত আনুগত্য দেখিয়ে এসেছিলেন। আউধের সদ্য মৃত এক নবাবের বহু পুত্র ছিল। কাজেই এক্ষেত্রে প্রচলিত স্বত্ব-বিলোপের নীতি প্রয়োগ করা ডালহৌসীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। 'আউধ' গ্রাসের জন্য অন্য কিছু অজুহাতের সন্ধানরত ডালহৌসীর মনে আউধ রাজ্যের প্রজাগণের দুঃখদুর্দশা মোচনের মত একটি সাধু পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল। ডালহৌসির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হল যে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ ঠিকমত রাজ্য-শাসনে অক্ষম। রাজ্যের উন্নতির জন্য যে সংস্কারের উদ্যোগ প্রয়োজন তাতে তিনি বাধা দিচ্ছেন। অতঃপর 1856 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'আউধ' রাজ্য গ্রাস করে নেওয়া হয়েছিল।

এটা অবশ্য সত্য কথা যে আউধ রাজ্যের শাসনব্যবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। তখনকার দিনে অন্যান্য শাসকদের মতই অযোধ্যার নবাবেরা ছিলেন খুবই স্বার্থপর এবং ভোগবিলাসী। রাজ্যের শাসনব্যবস্থা অথবা জনসাধারণের দুঃখকষ্টের দিকে এঁরা মোটেই দৃষ্টি দেননি, এ বিষয়ে তাঁদের

কোন মাথাব্যথাও ছিল না। কিন্তু এই শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য ব্রিটিশেরাও কম দায়ী ছিল না। 1801 খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পিছনে থেকে তারা রাজ্যশাসনব্যবস্থা পরিচালন করত, রাজ্যের সর্বময় প্রভুও তারাই ছিল। ডালহৌসীর হৃদয় আউধেব প্রজাদের দুঃখে কাতর হয়ে ওঠার একটা গূঢ় কারণ ছিল এই যে, তাঁর মনে হয়েছিল এই রাজ্যটি ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পসম্ভারের খুব ভাল বাজার হতে পাবে. এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য রাজ্যটির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। ব্রিটেনের বস্ত্র শিল্পে কাঁচা তুলার অভাব দূর করার জন্য 1853 খ্রীষ্টাব্দে ডালহৌসী নিজামের হাত থেকে বেরার প্রদেশ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ এই প্রদেশে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হত।

ব্রিটিশ কর্তৃক কোন দেশীয় রাজ্য অধিকারের অবশ্য বিশেষ কোন তাৎপর্য ছিল না, কারণ দেশীয় রাজ্যগুলিকে কোন রকমেই ভারতীয় রাজ্য বলা চলত না। পুরোপুরি ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হওয়ার আগে থেকেই এর সবকিছুই ব্রিটিশের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ব্রিটিশ ভারতের জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের অবস্থার কোন তফাৎ ছিল না। দেশীয় রাজ্য-গুলিকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশের দিক থেকে একটা শাসন সৌকর্য মাত্র। জনগণের উপর এই পরিবর্তনের কোন প্রভাব পড়েনি। তাদের অবস্থা ঠিক আগের মতই থেকে গিয়েছিল।

অনুশীলনী

1. নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধের কি কারণ ছিল?
2. পলাশীর যুদ্ধ কি ধরনের যুদ্ধ ছিল? এর পরিণাম কি হয়েছিল?
3. মীরকাশিম ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধের কারণগুলি আলোচনা কর।
4. মহীশূরের সঙ্গে ব্রিটিশের যুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর।
5. ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি কি কি কারণে ও কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অবলম্বিত হয়েছিল? সাম্রাজ্য বিস্তারনীতির সাফল্যের জন্য কি কি কৌশল অবলম্বিত হয়েছিল?

6. কিভাবে ব্রিটিশ শক্তি মারাঠারাজ্য জোটকে পরাস্ত কবেছিল?
7. ডালহৌসির রাজ্যজয় ও রাজ্যগ্রাস নীতি বিশ্লেষণ কর।
8. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ:

   (a) মীরজাফর (b) ক্লাইভ (c) বাংলায় দ্বৈতশাসন (d) সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্ভুক্তি

   (e) আউধের অন্তর্ভুক্তি।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরকারী সংগঠন ও আর্থিক নীতি (1757-1857)

ভারতে একটা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেশের সুষ্ঠু প্রশাসন ও সুরক্ষার উপযোগী একটি শাসনপদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। 1757 থেকে 1857 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—এই শতবর্ষের মধ্যে কোম্পানীর শাসনপদ্ধতি পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তবে এইসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য একই ছিল, তার আর পরিবর্তন হয়নি। এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল—খোদ কোম্পানীর লাভের হার বৃদ্ধি, ভারত জয় ও অধিকার সূত্রে স্বদেশ ব্রিটেনের সমৃদ্ধিসাধন, সর্বোপরি ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা। কোম্পানীর দৃষ্টি অন্যদিকেও যে ছিল না এমন নয়, তবে উপরোক্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলিই মুখ্য ছিল। অন্য যেসব চিন্তা-ভাবনা করা হত সেগুলি আগেরগুলির তুলনায় গৌণই ছিল। ভারত গভর্নমেণ্ট বা ভারত সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো উপরোক্ত লক্ষ্যগুলি ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যেই সংগঠিত হয়েছিল। ভারতের শাসনব্যবস্থায় আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। এর একমাত্র কারণ এই ছিল যে, দেশে আইনশৃঙ্খলার অভাব থাকলে কোম্পানীর ব্যবসার ক্ষতি হবে এবং নির্বিবাদে ভারতের সম্পদ শোষণের পথে বাধার সৃষ্টি হবে।

সরকারী গঠনতন্ত্র

1765 খ্রীষ্টাব্দে বাংলার অধিকার লাভ করার পর প্রচলিত শাসনব্যবস্থার কোন পরিবর্তনের ইচ্ছা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছিল না। তারা চেয়েছিল তারা তাদের লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবে এবং প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে সেই অর্থ স্বদেশে পাঠিয়ে দেবে। 1765-1772 খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ নবাব ও কোম্পানীর দ্বৈতশাসন কালে ভারতীয় কর্মচারীদের কর্মচ্যুত করা হয়নি, তবে এদের আর নবাবের অধীন থাকতে হয়নি। ব্রিটিশ গভর্নরের সর্বময় কর্তৃত্বে উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারীদের আজ্ঞা অনুসারে

এদের কাজ করতে হত। ভারতীয় কর্মচারীদের উপর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হত, কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের জন্য যে ক্ষমতা অর্থাৎ 'চাপরাস' থাকা দরকার তা' তাদের দেওয়া হয়নি। আর একদিকে ইংরাজ কর্মচারীদের হাতে ছিল প্রচুর ক্ষমতা কিন্তু তাদের উপর কোন দায়িত্বই ন্যস্ত করা হয়নি। দেশীয় ও ইংরাজ উভয় শ্রেণীর কর্মচারীগণই ছিল দুর্নীতিপরায়ণ এবং অর্থগৃধ্নু। 1772 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর উদ্যোগে এই দ্বৈতশাসনের অবসান হয়। এর পর কোম্পানী নিজস্ব কর্মচারীদের সহায়তায় স্বয়ং দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করেছিল। নিছক ব্যবসায়ী একটি কোম্পানীর পক্ষে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার অনিষ্টজনক পরিণাম অতিশীঘ্রই প্রকটিত হয়ে উঠেছিল।

তৎকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল। এর সংগঠন ছিল প্রাচ্যদেশের সঙ্গে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই কোম্পানী যাঁরা পরিচালনা করতেন তাঁরা ছিলেন ভারত থেকে বহুদূরে অবস্থিত গ্রেট্-ব্রিটেন বা ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী (বর্তমান হিসেবে ইউনাইটেড্ কিংডম বা U. K.)। তথাপি এই কোম্পানীর হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা এসে পড়েছিল। পরস্পরবিরোধী এই অবস্থা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে একটা সমস্যার বিষয় হয়ে উঠেছিল। সমস্যাগুলি ছিল—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার অর্জিত ধন ও ভূমিসম্পদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সরকার বা গভর্নমেণ্টের সম্পর্ক কি ধরনের হবে? ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে সুদূর ভারতে নিযুক্ত বিরাট সংখ্যক কর্মচারী ও সৈন্য-বাহিনীর নিয়ন্ত্রণই কিভাবে সম্ভব হবে? যদি ভারতের কোনস্থানে কোম্পানীর একটি পরিচালন কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করা হয় তবে সেখান থেকে ভারতের সুদূর প্রান্তে যথা বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ অবস্থিত স্থানগুলির কাজকর্ম কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে?

উপরোক্ত প্রশ্ন বা সমস্যাবলীর প্রথমটির গুরুত্বই ছিল সর্বাধিক ও দ্রুত সমাধানযোগ্য। এই সমস্যাটির গুরুত্বের কারণ এই ছিল যে এক্ষেত্রে দুটি ভিন্নমুখী স্বার্থ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর একদিকে ছিল ইংল্যাণ্ডের উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আর একদিকে ছিল অর্থলোলুপ ইংরাজ বণিককুল—যারা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেছিল। সমৃদ্ধ বাংলার বিপুল সম্পদ কোম্পানীর মুঠোর মধ্যে এসে পড়ায় কোম্পানী মালিকেরা 1767 খ্রীষ্টাব্দে অংশীদারদের লভ্যাংশের হার

শতকরা দশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিল। 1771 খ্রীষ্টাব্দে এটা শতকরা সাড়ে বারো (12½%) করার প্রস্তাব হয়েছিল। কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীগণ তাদের পদমর্যাদার অপব্যবহার করে বে-আইনি ব্যবসা এবং ভারতীয় জমিদারদের কাছ থেকে বলপূর্বক ঘুষ বা 'নজরাণা' আদায় করে খুব তাড়াতাড়ি প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে পড়েছিল। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে ক্লাইভ যখন ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর সম্পত্তির বার্ষিক আয় দাঁড়িয়েছিল £ 40,000 পাউণ্ড।

কোম্পানীর অংশীদারদের উচ্চ লভ্যাংশ প্রাপ্তি এবং ভারত থেকে প্রত্যাগত কোম্পানীর কর্মচারীদের বিপুল বৈভব—ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনে একটা আলোড়ন এনেছিল। কোম্পানীর অংশীদার বা কর্মচারীরও নয় স্বাভাবিক কারণে ইংল্যাণ্ডে এই ধরনের লোকের সংখ্যাধিক্য ছিল। স্বাভাবিক কারণে সমাজের এই ধরনের জনসাধারণের মনে বিপুল ঈর্ষার সঞ্চার হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল সীমিতসংখ্যক বণিকের একটি গোষ্ঠী মাত্র, বহু বণিক্ এই সংস্থার অংশীদার হতে পারেনি। ইংল্যাণ্ডে এই সময়ে শিল্পোদ্যোগের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছিল। একদল মানুষ অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার পেতে সচেষ্ট ছিল। এইসব বিভিন্ন পেশার বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের একক-ভাবে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা ও সমৃদ্ধি ভোগ করতে দিতে চাইছিল না। তারা নিজেরাও এই সমৃদ্ধির অংশ ভোগ করতে ব্যগ্র হয়ে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার নষ্ট করার জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছিল। এদের প্রথম পদক্ষেপ হয়েছিল বাংলা প্রদেশে কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার দোষ উদ্ঘাটন। ভারত থেকে প্রত্যাগত কোম্পানীর কর্মচারীগণই হয়ে উঠেছিল এদের বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্য। এইসব ভারত-প্রত্যাগত কোম্পানী-কর্মচারীদের ব্যঙ্গ করে 'নবাব' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সংবাদ-পত্রে এবং রঙ্গমঞ্চে এই নবাবদের কীর্তিকাহিনী ফাঁস করা হত। ব্রিটেনের অভিজাত সম্প্রদায় সামাজিকভাবে এদের পরিহার করে চলত। বলা হত এরা ভারতীয়দের উপর জুলুম চালিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। এই শ্রেণীর আক্রমণের দুই বিশিষ্ট শিকার হয়েছিলেন ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস। এই নবাবদের প্রতি সামাজিক ঘৃণার উদ্রেক করার মূল উদ্দেশ্য

ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লোকচক্ষে হেয় করে পরিশেষে তার বিলোপ-সাধন।

বাংলা অধিকারের কিছু কিছু সুবিধা লাভের জন্য ব্রিটিশ সরকারের বহু মন্ত্রী ও পার্লামেণ্ট্ সদস্যও উৎসুক হয়েছিলেন। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য এঁরা কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে অর্থদানের জন্য চাপ সৃষ্টি করতেন। বলা হত ভারত থেকে রাজস্বরূপে অর্জিত অর্থে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের আর্থিক সুরাহা হবে এবং স্বদেশীয় প্রজাদের করভার হ্রাস পাবে। 1767 খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রতি বৎসর ইংল্যাণ্ডের রাজকোষে £ 400,000 পাউণ্ড কর জমা দিতে হবে। ইংল্যাণ্ডের বহু রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্ ও অভিজ্ঞ রাজনীতি বিশারদ্ ব্যক্তি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণের কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন কারণ এঁদের মনে এই আশঙ্কার উদয় হয়েছিল যে শক্তিশালী কোম্পানী ও কোম্পানীর ধনাঢ্য কর্মচারীবৃন্দ সমগ্র ব্রিটিশ জাতির নৈতিক চরিত্র অর্থবলে কলুষিত করে ফেলবে। রাজনীতি ক্ষেত্রের পরিবেশও এর ফলে দূষিত হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক বা 'পার্লামেণ্টারি' রাজনীতি সবিশেষ কলুষিত হয়ে উঠেছিল। পার্লামেণ্টের লোকসভা বা 'হাউস অফ্ কমন্স'-এর সদস্যদের মধ্যে কোম্পানী বা কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত অর্থবান কর্ম-চারীদের বহু দালাল ছিল। প্রচুর পয়সা খরচ করে এদের নির্বাচিত করা হত, অথবা প্রচুর টাকা খরচ করে এদের সাহায্য ক্রয় করা হত। 'হাউস অফ্ কমন্স'-এর সদস্যরূপে এরা নিজেদের বিবেক বাঁধা রেখে পার্লামেণ্টে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থরক্ষায় নিরত হত। ভারত লুণ্ঠন করে পাওয়া অর্থের জোরে কোম্পানী ও তার কর্মচারীবৃন্দই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা দখল করে নিতে পারে, ইংল্যাণ্ডের বহু বিবেকবান রাজনৈতিক নেতার মনে এই আশঙ্কার উদয় হয়েছিল। তাঁরা ভেবে নিয়েছিলেন যে কোম্পানী এবং তার ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য যদি অচিরেই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না করা হয় তবে এমন সময় আসতে পারে যখন ভারতের অধিপতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই টাকার জোরে স্বদেশ ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা দখল করে নেবে। এই কোম্পানীই হয়ে উঠবে ব্রিটেনের সরকার। এই অবস্থা ব্রিটিশ জাতির স্বাধীনতার পক্ষেও ক্ষতিকর হয়ে উঠবে।

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রসারের একটা আন্দোলন চলছিল। শিল্পোৎপাদনকারী ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এই নয়া অর্থ-নীতিবিদ্‌গণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সর্বসম্মত অর্থনীতি বিজ্ঞানের প্রবর্তক এডাম স্মিথ (Adam Smith) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়েল্‌থ অফ নেশন্‌স্‌' (Wealth of Nations) গ্রন্থে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে-ছিলেন "একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারী এই কোম্পানীগুলি একাধিক দিক থেকে ক্ষতিকর। যে দেশে এই ধরনের একচেটিয়া অধিকারপ্রাপ্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য সংস্থা আছে কম বেশি সেই দেশগুলির স্বার্থহানি ঘটতে বাধ্য। আর যে হতভাগ্য দেশগুলি এইরূপ কোম্পানীর দ্বারা শাসিত সেই দেশগুলির ধ্বংসও অবধারিত।"

এমন একটা সময় এসেছিল যখন ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্বন্ধের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এর একটা উপলক্ষ্য ছিল—কোম্পানী কর্তৃক ব্রিটিশ সরকারের নিকট £ 1,000,000 ঋণ প্রার্থনা। সেই সময় ইংল্যাণ্ডে কোম্পানীর বহু শক্তিশালী শত্রু অবশ্যই ছিল, তথাপি কোম্পানী একেবারে নির্বান্ধবও হয়ে পড়েনি; পার্লামেণ্টে কোম্পানীর সমর্থকের সংখ্যা মোটেই নগণ্য ছিল না, সর্বোপরি স্বয়ং রাজা তৃতীয় জর্জ ছিলেন কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক। এটাই স্বাভাবিক যে কোম্পানী এক্ষেত্রে জেতার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। অবশেষে কোম্পানী এবং ব্রিটেনের প্রভাবশালী কোম্পানী-বিরোধী শক্তি—এই উভয় পক্ষের স্বার্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে দু'পক্ষের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা হয়েছিল। মীমাংসার সর্ত ছিল এই যে কোম্পানী কিভাবে ভারত শাসন করবে তার মূলনীতি নির্ধারণের ভার থাকবে ব্রিটিশ সরকারের উপর। এটা গ্রাহ্য হয়েছিল, কারণ এই নীতির ফলে ব্রিটিশ জাতির অভিজাত সমাজের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বিরোধী পক্ষকে এইভাবে তুষ্ট করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাচ্যদেশে ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছিল। কোম্পানীর ভারতে কর্মচারী নিয়োগের অধিকারটি অবশ্য বজায় রাখা হয়েছিল। ভারত শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণের দায়িত্বও কোম্পানীর পরিচালকদের হাতেই ন্যস্ত হয়েছিল।

কোম্পানীর ভারত শাসন সম্পর্কে পার্লামেন্টের প্রথম আইন (অ্যাক্ট)

Regulating Act, 1773 নামে খ্যাত, কারণ 1773 খ্রীষ্টাব্দেই এই নিয়ন্ত্রক আইনটি বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এই আইনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক-মণ্ডলী বা বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্-এর গঠনব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এই য়্যাক্টে কোম্পানীর কাজকর্ম ব্রিটিশ সরকারের তদারকির অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছিল। এখন থেকে কোম্পানীর পরিচালকদের ভারতের সামরিক ও অসামরিক তথা রাজস্বসংক্রান্ত সব কাগজপত্র ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রক (Ministry)-এর কাছে পেশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ আরও ছিল এই যে, বাংলা প্রদেশের শাসনভার একজন গভর্নর জেনারেল (বড়লাট)-এর উপর ন্যস্ত হবে, তাঁর একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে (কাউন্সিল)। স-পারিষদ গভর্নর জেনারেল বাংলার শাসনব্যবস্থা পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী দ্বয়ের বিশেষতঃ যুদ্ধ ও শান্তিসংক্রান্ত কাজকর্মও দেখাশুনা করবেন। এই য়্যাক্ট (Act) বা আইনে কলকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই আদালতের উপর ইউরোপীয় বাসিন্দা, তাদের কর্মচারী এবং কলকাতার অধিবাসীদের বিচার বিভাগীয় প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ন্ত্রক আইন বা Regulating Act বাস্তবে অবশ্য কার্যকর হয়নি। এই আইনে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কোম্পানীর উপর দৃঢ় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। আইনের কোন কোন ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভূমিকা কি হবে তা' বেশ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়নি। এই আইন চালু হওয়ার পর দেখা গিয়েছিল যে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সদস্যদের (Members of the Council) খেয়ালখুসির উপর তাঁকে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। কাউন্সিলের তিনজন সদস্য একমত হলে যে কোন বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের মতামত বা সিদ্ধান্ত বানচাল করে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকত। এই আইন চালু হওয়ার পর ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হয়ে এসেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর কাউন্সিল বা পরিষদের তিনজন সদস্য অবিরত কলহবিবাদে উন্মত্ত থাকতেন, ফলে শাসনব্যবস্থায় একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হত। কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে অপর দুটি প্রেসিডেন্সির উপরও গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব ঠিকমত বজায় থাকছে না। সবচেয়ে বড় সমস্যা এটাই দাঁড়িয়েছিল যে কোম্পানী এবং কোম্পানী-বিরোধী ক্রমবর্ধমান প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরোধের

সূত্রগুলির সমাধান করতে এই আইনটি ব্যর্থ হয়েছিল। ভারতে কোম্পানী শাসনব্যবস্থা এই আইন চালু হওয়ার পরও অত্যাচার, দুর্নীতি ও আর্থিক দুর্গতি মুক্ত হতে পারেনি। কোম্পানীবিরোধী গোষ্ঠী এইসব অনাচার অত্যাচারমূলক তথ্যগুলি উদ্ঘাটন করে ব্রিটিশ জনমতকে কোম্পানীর বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অবশ্য কোন শৈথিল্য দেখায়নি।

রেগুলেটিং য়্যাক্টের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি শুধরে নিয়ে এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এবিষয়ে নিজস্ব নীতিগুলি প্রয়োগ করে 1784 খ্রীষ্টাব্দে আর একটি য়্যাক্ট বা আইন চালু হয়েছিল—এটি পিটের ভারতশাসন আইন নামে পরিচিত (Pitt's India Act 1784)। এই আইনে শুধু ভারতশাসন ব্যাপারে নয়, কোম্পানীর সবকিছু ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতশাসন-সংক্রান্ত কার্যনির্বাহের জন্য ছজন প্রতিনিধি (কমিশনার) নিয়ে একটি বোর্ড বা পরিষদ গঠিত হয়েছিল, এই পরিষদের দুজন সদস্য খোদ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মন্ত্রীদের মধ্য থেকে নেওয়া হবে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এই পরিষদ 'বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল' নামে চিহ্নিত হয়েছিল। এই 'বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল'কে ভারত গভর্নমেণ্ট এবং কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর (কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস) কার্য পরিচালনার নির্দেশ দেওয়ার অধিকার অর্পিত হয়েছিল। এই নির্দেশগুলি যথাযথ-ভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্বও 'বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল'কে দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ন্ত্রক পরিষদ্ বা বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলকে কোন গুরুতর ব্যাপারে সোজাসুজি ভারত সরকারকে নির্দেশ বা হুকুম পাঠাবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল তবে এই নির্দেশ বা হুকুমটি পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নিয়ে গঠিত একটা গুপ্ত সমিতি মারফৎ পাঠানোর নিয়ম করা হয়েছিল। এই নূতন য়্যাক্ট বা আইনে ভারত সরকার বা গভর্নমেণ্ট পূর্ণভাবে গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর পরিষদের তিনজন সদস্যের হাতে এসে পড়েছিল। গভর্নর-জেনারেলের পারিষদ সংখ্যা তিন রাখা হয়েছিল যাতে অন্ততঃ একজন সদস্যের সমর্থন পেলেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তমত কাজ করতে বাধা না পান। এই আইনে শাসনব্যবস্থা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজস্ব প্রভৃতি ব্যাপারে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি দুটিকে সুস্পষ্টভাবে গভর্নর-জেনারেলের আজ্ঞাবহ করে রাখা হয়েছিল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় ভারতে ব্রিটিশ-বিজয় ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-

ব্যবস্থায় ব্রিটেনের জাতীয় সরকারের নীতির কর্তৃত্ব এসে পড়াতে ভারতবর্ষ ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের স্বার্থপূরণের ক্ষেত্র হয়ে পড়েছিল। চীন ও ভারতে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারটুকু ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীর হাত থেকে কেড়ে নেয়নি, সুতরাং তাদের এ ব্যাপারে আর কোন আপত্তি ছিল না। তাছাড়া কোম্পানীর মাধ্যমেই শাসনব্যবস্থা চলতে দেওয়া হয়েছিল, শাসন-নীতি যাই হোক না কেন।

মোটামুটিভাবে পিটের ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট নির্ধারিত কাঠামো অনুসারেই 1857 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তবে মাঝে মাঝে এরই মধ্যে কিছু কিছু আইনের ধারা এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, যার ফলে কোম্পানীর প্রাপ্য সুবিধা ও ক্ষমতার পরিমাণ খর্ব হয়েছিল। 1786 খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেলকে সাম্রাজ্যের সুরক্ষা, শান্তি ও স্বার্থরক্ষার সর্বময় প্রভুত্বের অধিকারী করা হয়েছিল। এইসব প্রয়োজনে তিনি তাঁর কাউন্সিল বা পরিষদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারেন এমনি বিধান প্রবর্তিত হয়েছিল।

1813 খ্রীষ্টাব্দে যে "চার্টার য়্যাক্ট" বিধিবদ্ধ হয় তার ফলে ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকাব কেড়ে নেওয়া হয়। অতঃপর যে কোন ব্রিটিশ প্রজাকেই ভারতে ব্যবসা করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তবে চাযের ব্যবসা এবং চীনের সঙ্গে ব্যবসায় কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার কোম্পানীর হাতেই রাখা হয়েছিল। ভারত সরকার ও রাজস্বের ব্যাপারেও কোম্পানীর অধিকার বজায় রাখা হয়েছিল। ভারতে কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারেও কোম্পানীর কর্তৃত্ব অব্যাহত ছিল। 1833 খ্রীষ্টাব্দে আর একটি 'চার্টার য়্যাক্ট' বা আইন প্রবর্তিত হয়। এই নূতন আইনে চায়ের ব্যবসায় ও চীনের সঙ্গে ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার থেকে কোম্পানীকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই আইনে কোম্পানীর নিজস্ব ঋণ ভারত গভর্নমেণ্ট বা ভারত সরকারের স্কন্ধে চাপান হয়েছিল এমন কি লগ্নী মূলধনের উপর কোম্পানীর অংশীদারদের $10\frac{1}{2}\%$ শতাংশ লভ্যাংশ (Dividend) দেওয়ার দায়িত্বও ভারত সরকারের উপর এসে পড়েছিল। ভারত গভর্নমেণ্ট চালানোর দায়িত্ব কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হলেও ব্রিটেনে স্থিত নিয়ন্ত্রক বোর্ডের (Board of control) কড়া নজরের আওতাতেই তা পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল।

ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ উপরোক্ত আইনগুলির কারণে কোম্পানী ও তৎকর্তৃক পরিচালিত ভারতীয় শাসনব্যবস্থার উপর পুরোপুরি-ভাবে ব্রিটিশ সরকারের প্রভুত্ব কায়েম হয়েছিল। এই সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃ-পক্ষের মনে হয়েছিল 6,000 হাজার মাইল দূরে থেকে ভারতের দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থা পরিচালন এমন কি এর খবরদারি সম্ভব নয়। এই কারণে ভারতের গভর্নর-জেনারেলের হাতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে সর্ববিধ ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরিষদ (কাউন্সিল)-এর মতামত অগ্রাহ্য করে নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করার অধিকার পাওয়াতে প্রকৃতপক্ষে গভর্নর-জেনারেলই হয়ে উঠেছিলেন ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক। তাঁকে অবশ্যই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নির্দেশও অবেক্ষণা-ধীন হয়ে কাজ করতে হত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যাদের প্রয়োজনে এই শাসনব্যবস্থা সেই ভারতীয়দের এই শাসনব্যবস্থা পরিচালনার কোন দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ভারতশাসন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব ছিল ত্রিস্তরযুক্ত। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী (বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস), ব্রিটিশ সরকারের নির্বাচিত নিয়ন্ত্রক পরিষদ (বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল) এবং স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল। এই তিন স্তরের কোনটিতেই কোন ভারতীয়ের নামগন্ধও ছিল না। শাসনব্যবস্থার সঙ্গে কোন ভারতীয়ের কোন রকমের একটা ক্ষীণ সম্পর্কও ছিল সুদূরপরাহত।

নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ব্রিটিশ জাতি ভারতের জন্য একটা নূতন ধরনের শাসনব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিল। এই শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অঙ্গগুলি সম্বন্ধে আলোচনার আগে মনে রাখতে হবে কোন্ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই শাসনব্যবস্থা প্রণীত হয়েছিল। এটা জানা কথা যে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই যে কোন দেশের শাসনপ্রণালী উদ্ভাবিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যতদূর সম্ভব ভারতের অর্থ শুষে নিয়ে ব্রিটিশের স্বার্থে তা কাজে লাগানোই ছিল ব্রিটিশের মূল লক্ষ্য। এই ব্রিটিশ স্বার্থ বলতে শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ ভাবা হ'ত তা নয়। ব্রিটেনের সকল প্রকার শিল্পোৎপাদক শ্রেণীর স্বার্থের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হ'ত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে ল্যাঙ্কাসায়ার শিল্পোৎপাদক সংস্থা পর্যন্ত সকলকেই ভারতশোষণলব্ধ সুবিধা ভোগের অধিকারী রাখা হয়েছিল। ইংরাজের ভারত জয় এবং ভারতে প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখার সামরিক ও অন্যান্য সকল প্রকার

ব্যয় ভারতকেই বহন করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশ অনুসৃত অর্থনীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখা এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন।

ভারতে অনুসৃত ব্রিটিশ অর্থনীতি (1757-1857)

বাণিজ্যনীতি : 1600 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 1757 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে একটা বাণিজ্য সংস্থা বা বণিক্ গোষ্ঠী রূপে বর্তমান ছিল। এরা কিছু মালপত্র বা সোনা-রূপা জাতীয় মূল্যবান ধাতু স্বদেশ থেকে এনে তার বিনিময়ে এদেশ থেকে বস্ত্র, মশলা প্রভৃতি সংগ্রহ করে সেগুলি সাগর পারের দেশগুলিতে বিক্রি করত। ভারতীয় দ্রব্যাদি অন্যদেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করাই ছিল এদের লাভের প্রধান উৎস। স্বাভাবিক কারণে এরা তাই নিজের দেশে বা অন্যদেশে ভারতীয় মাল বিক্রির নূতন নূতন বাজার বা বিক্রয়কেন্দ্র খুঁজে বেড়াত। এই বাজার ক্রমাগতভাবে বিস্তৃত হওয়ার ফলে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতীয় শিল্পোৎপাদনের হারও এই কারণে বেড়ে গিয়েছিল। ভারতীয় শিল্পোৎপাদনের উন্নতি ঘটায় ভারতীয় শাসকগণ কোম্পানীর ব্যবসাতে কোনপ্রকার বাধা দিতে চাননি। এমনকি অনেক দেশীয় রাজা তাঁর রাজ্যের মধ্যে কোম্পানীকে নিজস্ব কুঠি স্থাপন করতে সাহায্য ও উৎসাহ দিতেন।

সুরু থেকেই ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রোৎপাদনকারী ব্যবসায়ীরা ভারতের বস্ত্রশিল্পকে ভাল চোখে দেখত না, কারণ ভারতের বস্ত্রশিল্প সেদেশে প্রচুর সমাদৃত ছিল। স্বদেশজাত কাপড়চোপড়ের চেয়ে ইংল্যাণ্ডবাসী ভারত-জাত বস্ত্র বেশী পছন্দ করত ও কিনত। কাজেই ইংল্যাণ্ডের বস্ত্র উৎপাদনকারীগণের ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রতি ঈর্ষার বেশ একটা কারণ ছিল। ইংল্যাণ্ডের লোকদের পোশাক-পরিচ্ছদের ধরনও বদলে গিয়েছিল। আগে লোকে স্বদেশজাত মোটা পশমের পরিচ্ছদে অভ্যস্ত ছিল, ভারতের সঙ্গে ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর দেখা গেল, কর্কশ পশমী বস্ত্রের বদলে লোকে হাল্কা তুলোর কাপড়চোপড়ই পরতে চাইছে। তুলো থেকে প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহারই এখন প্রথা বা 'ফ্যাসান' হয়ে উঠেছিল। 'রবিনসন ক্রুসো' নামীয় গ্রন্থের প্রসিদ্ধ লেখক ডেফো (Defoe) দুঃখ করে লিখেছিলেন যে ইংল্যাণ্ডে ঘরে ঘরে, বসবার ঘর ও শোবার ঘরে সর্বত্র ভারতীয় বস্ত্র ঢুকে পড়েছে। পর্দা, গদি বা কুশন চেয়ার এমন কি বিছানা সবই হয়ে উঠেছিল ভারত-জাত

ক্যালিকো কিম্বা অন্য কোন ধরনের বস্ত্র। ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রোৎপাদকগণ এই অবস্থায় সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিতে লাগল যেন ভারত থেকে বস্ত্র আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয়, অন্ততঃ যেন এই আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। 1720 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে আইন জারী করে ছাপা অথবা রঙীন কাপড়ের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছিল। 1760 খ্রীষ্টাব্দে একটা আমদানি করা রঙীন রুমাল ব্যবহার করার জন্য এক ভদ্রমহিলাকে £ 200 পাউণ্ড অর্থদণ্ড দিতে হয়েছিল। আমদানিকৃত সাধারণ বস্ত্রের জন্য অতিরিক্ত শুল্কও ধায করা হয়েছিল। একমাত্র হলাণ্ড ছাড়া প্রায় প্রতিটি ইউরোপীয় দেশে ভারত থেকে বস্ত্র আমদানি হয় নিষিদ্ধ হয়েছিল, নয়ত উচ্চহারে আমদানি শুল্ক ধার্য করে ভারতীয় বস্ত্র আমদানির হার যৎপরোনাস্তি সঙ্কুচিত করার চেষ্টা হয়েছিল।

এইসব বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ভারত-জাত রেশম ও তুলাজাত বস্ত্র ইউরোপের বাজারে তার চাহিদা বজায় রেখেছিল। এই অবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলেছিল। এর পর অবশ্য ইংল্যাণ্ডেই নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে নিজস্ব বস্ত্রশিল্প প্রভূত উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছিল।

1757 খ্রীষ্টাব্দে পলাশীব যুদ্ধের পর গুণগতভাবে ভারতের সঙ্গে কোম্পানীব বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছিল। ভারতে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনায় কোম্পানী এখন তার রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছিল। ভারতীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে স্বদেশে তা রপ্তানি করার সুযোগও বর্ধিত হয়েছিল, কারণ ভারতীয় দ্রব্য কেনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেটা বাংলা প্রদেশের রাজস্ব হতেই সংগৃহীত হয়ে যেত। কোম্পানী দেশের শাসনভার হাতে পেয়ে বাংলার তাঁতীদের ভয় দেখিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত নির্দিষ্ট দরে তাদের বস্ত্র বিক্রয় করতে বাধ্য করত। উচিত মূল্য না পাওয়ার জন্য তাঁতীরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই লোকসান স্বীকার করতে বাধ্য হত। এমন কি তাদের কাজের স্বাধীনতাটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বহু তাঁতীকে কোম্পানী নিজেদের ব্যবসায়ের জন্য কাপড় বুনে দিতে বাধ্য করত, কাজের উপযুক্ত মজুরিও তাদের দেওয়া হত না। কোন ভারতীয় বণিকের কাছে কাপড় বিক্রি বা তাদের জন্য কাপড় বোনাও নিষিদ্ধ করা হত। এইভাবে কোম্পানী তার দেশী ও বিদেশী দুই ধরনেরই প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের ব্যবসাক্ষেত্র থেকে হটিয়ে দিয়েছিল। বাঙ্গালী শিল্পজীবীদের

অধিক পারিশ্রমিক পাওয়া বা বেশী দামে তাদের জিনিস বিক্রি করার সব সুযোগই কোম্পানীর চেষ্টায় লুপ্ত হয়েছিল। কোম্পানীর কর্মচারীগণ কাঁচাতুলা বিক্রয়ের ব্যবসা একচেটিয়াভাবে নিজেদের দখলে রেখে দিয়েছিল। বাঙ্গালী তাঁতীরা এদের কাছ থেকে অত্যধিক দামে তুলো কিনতে বাধ্য হত। বাঙ্গালী তাঁতী বেশী দামে তুলো কিনে সেই তুলোয় বোনা বস্ত্র অতি অল্প মূল্যে কোম্পানীকে বিক্রি করতে বাধ্য হত। কেনা ও বেচা দুই তরফেই তার লোকসান হত। ভারতীয় বস্ত্র ইংল্যাণ্ডে আমদানি কালে খুব উঁচুহারে শুল্ক (Duty) দিতে হত। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্বদেশে সদ্য গড়ে উঠা যন্ত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল কারণ তখনও পর্যন্ত এই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য দাম ও গুণগত উৎকর্ষে ভারতীয় বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে অক্ষম ছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পবস্তুকে ইংল্যাণ্ডের বাজার থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে 1813 খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে ভারতীয় কুটির শিল্পের প্রতি চরম আঘাত এসেছিল। এই সময়ে ভারতীয় শিল্প শুধু বিদেশের বাজার থেকেই বিতাড়িত হয়নি, দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বদেশের বাজারের দরজাও তার কাছে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লব সেদেশের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রকৃতিটিও পাল্টে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কয়েকযুগব্যাপী কালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছিল। এই কাল সীমার মধ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি, কারখানা প্রতিষ্ঠা ও লগ্নীকৃত যথেষ্ট পুঁজির প্রসাদে ব্রিটিশ শিল্পোদ্যোগের অতিদ্রুত বিস্তৃতি ও উন্নতি ঘটেছিল। এই উন্নতির অনেকগুলি কারণও ছিল।

পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলি জুড়ে সাগর পারে অবস্থিত দূরদেশগুলির সঙ্গে ব্রিটিশের বাণিজ্য-ব্যবসায় বহু বিস্তৃতি লাভ করেছিল। যুদ্ধ এবং উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা ব্রিটিশ জাতি দূরবর্তী বহু দেশে একচেটিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার দখল করে নিয়েছিল। রপ্তানিযোগ্য শিল্পোৎপাদক ব্রিটিশ সংস্থা-গুলি নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও সুষ্ঠু সংগঠনের সাহায্যে দ্রুত তাদের উৎপাদন-হার বর্ধিত করতে সক্ষম হয়েছিল, আর সমতালে এই পণ্যসামগ্রী বিদেশের

বাজারে রপ্তানি সুরু করেছিল। আফ্রিকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, ল্যাটিন আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, চীন ও সর্বোপরি ভারতে এই শিল্প-সামগ্রী কাটতির অপরিসীম সুযোগ ছিল। ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লবের ফলে ব্রিটিশ বস্ত্র-শিল্পেরই সবচেয়ে অগ্রগতি লাভ হয়েছিল। আর বিদেশে এই বস্ত্রশিল্পেরই চাহিদা সবচেয়ে অধিক হয়েছিল। ব্রিটেনের বাণিজ্যনীতির ঔপনিবেশিক চরিত্রই সেদেশের শিল্প-বিপ্লব সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছিল। আবার এই শিল্প-বিপ্লবের ফলেই ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক বাণিজ্যনীতি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশ ও অনুন্নত দেশগুলি থেকে ব্রিটিশ-ব্যবসায়ীগণ কৃষি ও খনিজ কাঁচামাল স্বদেশে রপ্তানি করে স্বদেশের শিল্পোৎপাদকদের কাছে তা বিক্রয় করে দিত।

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, ব্রিটেনে মূলধনের বাহুল্যও দেখা দিয়েছিল, নূতন নূতন যন্ত্র ও কারখানাগুলি এই মূলধন লগ্নীর উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। ব্রিটেনের এই অর্থনৈতিক সচ্ছলতা শুধু সামন্তশ্রেণীর ভোগেই লাগেনি, শুধু এদের হাতেই অর্থ জমা হলে তা বিলাসব্যসনে ব্যয়িত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেত। সৌভাগ্যক্রমে তা হয়নি, বণিক্ ও শিল্পোদ্যোগীদের হাতেও প্রচুর মূলধন জমা হয়েছিল। এই শ্রেণী সর্বদাই ব্যবসায় ও শিল্পে মূলধন খাটানোর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। আফ্রিকা, এশিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আহৃত সম্পদের সঙ্গে এসে মিশেছিল পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তার কর্মচারীদের দ্বারা ভারতে শোষণ-লব্ধ অপরিসীম অর্থসম্পদ। এইসব অর্থই ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিস্তারে প্রভূত সহায়তা দিয়েছিল।

তৃতীয়তঃ ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, এই বর্ধিত জনসংখ্যা কারখানাগুলিকে কম মজুরিতে শ্রমিক জোগান দিতে পেরেছিল। 1740 খ্রীষ্টাব্দের পর ব্রিটেনের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে 1780 খ্রীষ্টাব্দের পর এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ দাঁড়িয়েছিল।

চতুর্থতঃ ব্রিটেনের গভর্নমেণ্ট বা সরকারের উপর শিল্পোৎপাদক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রভূত প্রভাব ছিল। কাজেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই শ্রেণীর স্বার্থে বিদেশে বাণিজ্যের বাজার বা উপনিবেশ গড়ে তুলতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে দ্বিধা করত না।

পঞ্চমতঃ ব্রিটিশ দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নততর প্রযুক্তি-কৌশল উদ্ভাবনায় তৎপরতা দেখাত। হারগ্রীভস্, ওয়াট্, ক্রম্পটন, কার্টরিট্ প্রভৃতির আবিষ্কারগুলিকে ব্রিটেনের উন্নতিশীল শিল্পসংস্থাগুলি এখন বেশ ভালভাবে কাজে লাগিয়েছিল। এই আবিষ্কারগুলি সবই যে নূতন ছিল এমন নয়, তবে এগুলি এতদিন কোন কাজে লাগেনি। এই আবিষ্কারসমূহ এবং বাষ্পীয় শক্তির প্রয়োগ এখন ব্রিটেনের কলকারখানাগুলির বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। তবে এই আবিষ্কারগুলির জন্যই যে ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এমন নয়। শিল্পোৎপাদকেরা তাদের শিল্পদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা যোগান দেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল, বিনিয়োগযোগ্য মূলধনও তাদের যথেষ্ট ছিল, এই অবস্থায় তারা অভ্যস্ত প্রযুক্তি-কৌশল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন আবিষ্কারগুলিও কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিল। বস্তুতঃ মানবসমাজের অগ্রগতির জন্য প্রযুক্তি-কৌশলের পরিবর্তন নবীন শিল্পোদ্যোগের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। এই অর্থে শিল্প-বিপ্লবের যুগ কোন সময়ে ক্ষান্ত হয়েছে বা তার অবসান হয়েছে একথা বলা যায় না। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সমকালীন শিল্প ও প্রযুক্তি-কৌশল ক্রমাগতই ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে।

এই শিল্প-বিপ্লব ব্রিটেনের সমাজজীবনে একটা মৌলিক পরিবর্তনও এনে দিয়েছিল। শিল্প-বিপ্লব জনিত আর্থিক উন্নতিই আজকের দিনে ব্রিটেন সহ ইউরোপ, সোভিয়েত রাষ্ট্র, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের মানুষের কাছে উন্নততর জীবনযাত্রার ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছে। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নতরূপে পরিচিত দেশের অধিবাসিগণের জীবনযাত্রার মান অন্যান্য অনগ্রসর দেশের অধিবাসিদের তুলনায় খুব বেশী উন্নত ছিল না। এই শেষোক্ত দেশগুলিতে শিল্প-বিপ্লব কার্যকর হয়নি, এজন্যই উন্নত ও অনগ্রসর দেশগুলির অধিবাসিদের আর্থিক অবস্থার মধ্যে বর্তমানে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের অবস্থা পর্যালোচনা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের সমাজ নগরমুখী হয়ে উঠেছিল। অধিক-সংখ্যক মানুষই কলকারখানা সংশ্লিষ্ট সদ্য-গড়ে-উঠা শহরগুলির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। 1750 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনে দুটি মাত্র শহরে, কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ হাজার

মানুষের বাস ছিল। 1851 খ্রীষ্টাব্দে তুইটির জায়গায় ব্রিটেনে উনত্রিশটি শহর গড়ে উঠেছিল।

শিল্প-বিপ্লব তুটি সম্পূর্ণ নুতন শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল। একটি শিল্পপতি ধনিকশ্রেণী—এদের হাতে ছিল কলকারখানা। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত। দৈনিক মজুরির বিনিময়ে এরা নিজেদের শ্রম বিক্রয় করে জীবিকানির্বাহ করত।

শিল্পপতি ধনিকশ্রেণী অতি দ্রুত অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছিল এবং খেটেখাওয়া শ্রমিকশ্রেণীকে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে অশেষ তুঃখকষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গ্রাম্য-পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে এদের চিরাভ্যস্ত জীবনধারা ব্যাহতই হয়নি, তাতে সম্পূর্ণ ছেদ পড়ে গিয়েছিল। বিশুদ্ধ জল-হাওয়ার পরিবেশ থেকে ধূমাচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন শহরে বাস করতে তারা বাধ্য হঁয়েছিল।

তাদের বাসস্থানগুলি ছিল ব্যবহারের অনুপযুক্ত ও স্বাস্থ্যহানিকর। অধিকাংশ শ্রমিককে আলোবাতাসহীন অন্ধকার বস্তিতে বাস করতে হত। ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের রচনায় এই শ্রমিক বস্তিগুলির পরিচয় বেশ ভাল-ভাবেই দেওয়া হয়েছে। শিল্প-কারখানা অথবা খনিগুলিতে শ্রমিকদের কাজের সময় ছিল খুব দীর্ঘ। চোদ্দ থেকে ষোল ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত থাকতে হত। বেতন ছিল খুবই কম। নারী ও শিশু-শ্রমিকদেরও খুব কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হত। অনেক সময় কল-কারখানা বা খনিগুলিতে চার-পাঁচ বছরের শিশুকেও শ্রমিক হিসেবে খাটানো হত। সাধারণভাবে বলতে পারা যায় যে, তখনকার দিনে শ্রমিকের নিত্য-সঙ্গী ছিল কঠোর শারীরিক শ্রম, দারিদ্র্য, রোগ এবং অপুষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অবশ্য এদের মজুরি কিছু বেড়েছিল, তবে তার আগে নয়।

ব্রিটেনে একটি শক্তিশালী শিল্পোৎপাদক শ্রেণীর আবির্ভাব ভারতের শাসনব্যবস্থা ও তৎসম্পর্কিত নীতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পপতিকুল বেশ রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এদের লাভ যা কিছু হত তা' শিল্পোৎপাদন থেকে। ভারত থেকে শিল্পদ্রব্যাদির আমদানি কমে যাওয়া বা বন্ধ হওয়া এদের

অভিপ্রেত ছিল। এরা চেয়েছিল যে ভারত তাদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের বাজার হয়ে উঠুক। ভারত থেকে কিছু আমদানি যদি করতেই হয় তবে তা যেন হয় ভারতের কাঁচামাল যথা তুলা, তুলাজাত বস্ত্র মোটেই নয়। 1769 খ্রীষ্টাব্দে এই শিল্পপতিগণ পার্লামেণ্টের একটি আইনের বলে কোম্পানীকে বাৎসরিক £ 350,000 পাউণ্ড মূল্যেরও কিছু বেশী ব্রিটেনে প্রস্তুত শিল্প-সম্ভার ভারতে রপ্তানি করতে বাধ্য করেছিল। এই বিপুল শিল্পসম্ভার ভারতে বিক্রি করতে গিয়ে লোকসানের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কোম্পানীকে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল। 1793 খ্রীষ্টাব্দে এই শিল্পপতিগণ তাদের দ্বারা উৎপন্ন 3,000 টন শিল্পসামগ্রী প্রতি বৎসর কোম্পানীর জাহাজে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বাহিত হওয়ার অধিকারও কোম্পানীর কাছ থেকে আদায় করেছিল। 1794 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ £ 156 পাউণ্ড মূল্যের সূতীবস্ত্র পূর্বদেশে বিশেষভাবে ভারতে রপ্তানি হত। কয়েকবছর পর 1813 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই অঙ্ক প্রায় সাতশতগুণ অর্থাৎ £ 110,000 পাউণ্ড পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কিন্তু সূতীবস্ত্র রপ্তানির এই উচ্চহারও ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র উৎপাদকদের উদ্দাম লালসা তৃপ্ত করতে পারেনি।

আরও আরও মাল কিভাবে ভারতে রপ্তানি করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য তারা অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছিল। 1901 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'The Economic History of India' (ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস) গ্রন্থে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দেখিয়েছেন যে 1812 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত একটি বিশেষ কমিটির (Select Committee) প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এমন কোন কৌশল উদ্ভাবন যার দ্বারা ভারতের বাজার থেকে ভারতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদি হটিয়ে দিয়ে সেখানে ব্রিটেন-জাত শিল্পদ্রব্যের বাজার প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পোৎপাদক শ্রেণীকে উৎসন্ন করে ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদকদের সুবিধা করে দেওয়াই ছিল এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য।

ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদক শ্রেণী বুঝেছিল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের অভীষ্ট সাধনের পথে এক বিরাট বাধা রূপে দণ্ডায়মান হয়ে রয়েছে। এদের হাতে রয়েছে পূর্বদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার, এছাড়াও ভারতের রাজস্ব ও রপ্তানি বাণিজ্যের সূত্রে এরা ভারতবর্ষকে শোষণ করে স্ফীতি লাভ করছে। 1793 থেকে 1813 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই শিল্পপতি গোষ্ঠী

কোম্পানী এবং তাদের বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালিয়ে অবশেষে 1813 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকারের বিলোপ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল।

এই ঘটনার পর ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। কৃষিপ্রধান ভারতকে শিল্প-সমৃদ্ধ ইংল্যাণ্ডের অর্থ-নৈতিক উপনিবেশে পরিণত করা হয়েছিল।

এখন থেকে ভারত গভর্নমেণ্ট অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করে চলেছিল, এর অর্থ হল ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের ভারতে অবাধ অনুপ্রবেশ। ব্রিটেনের যন্ত্রজাত শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে অসম ও তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে মানুষের হাতের তৈরী ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় হস্তশিল্পের অন্তিম দশা ঘনিয়ে এসেছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ব্রিটেন থেকে শিল্পবস্তু বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে আমদানি করা হত। ভারত গভর্নমেণ্ট এই সময়ে ভারতে নূতন নূতন অঞ্চল অধিকার করে নিচ্ছিল, আবার পূর্বঘোষিত আশ্রিত রাজ্যগুলিও (যথা অযোধ্যা প্রদেশ) প্রত্যক্ষভাবে স্ব-শাসনে এনে ফেলেছিল। ব্রিটেন-জাত শিল্পদ্রব্যাদির একটা বিস্তৃত বাজার গড়ে তোলা এইসব আগ্রাসনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বহু ইংরাজ রাজকর্মচারী, রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ী ভারতে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল এই যে, করভার কিছু হ্রাস পাওয়ার ফলে ভারতের কৃষকসমাজের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ও এই উদ্বৃত্ত অর্থের সাহায্যে তারা ব্রিটেনে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য ক্রয় করতে পারবে। ভারতবাসীকে আধুনিক বা 'সভ্য' করার দিকেও এদের দৃষ্টি ছিল, কারণ আলোকপ্রাপ্ত ভারতবাসীর পক্ষে স্বদেশজাত দ্রব্যের থেকে বিদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারের সম্ভাবনা বেশী ছিল।

হাতে তৈরী ভারতীয় শিল্পবস্তুর পক্ষে ব্রিটেনের যন্ত্রজাত শিল্পবস্তুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ব্রিটেনের যন্ত্রজাত শিল্পদ্রব্যের দাম ছিল ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের তুলনায় বেশ সস্তা। ব্রিটিশ শিল্প-দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষও ছিল। তার কারণ ছিল এই যে ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে বাষ্পশক্তির সাহায্যে তাদের কল-কারখানায় কাজে লাগিয়েছিল, এইজন্য উৎপাদনের পরিমাণও বেশী হত।

ভারতবাসীর স্বার্থসংরক্ষণে ইচ্ছুক যে কোন সরকারের পক্ষে উচিত কর্তব্য ছিল দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার জন্য উচ্চ শুল্কের প্রাচীর দিয়ে বিদেশজাত দ্রব্যের ভারতে আমদানি হ্রাস। একই সঙ্গে পশ্চিমদেশে প্রচলিত প্রযুক্তি-বিদ্যার সাহায্যে ভারতীয় শিল্পের আধুনিকীকরণ বা উন্নতিসাধনের চেষ্টাও করা যেতে পারত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বদেশের শিল্পকে বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে ব্রিটেন এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিল। এই সময়ে স্ব স্ব দেশের শিল্পোদ্যোগের স্বার্থে ফ্রান্স, জার্মানী ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও এই পন্থার আশ্রয় নিয়েছিল। বেশ কিছুকাল পর নিজ নিজ দেশের শিল্পোদ্যোগকে রক্ষা করার জন্য জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নকেও এই নীতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তৎকালে ভারতের বিদেশী শাসকেরা কিন্তু ভারতীয় শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচানোর কোন চেষ্টাই করেনি, ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্যের ভারতে অবাধ প্রবেশের সুযোগ এরা অব্যাহতই রেখে দিয়েছিল। বিদেশী দ্রব্যের আমদানি অল্পদিনের মধ্যেই খুব বেড়ে গিয়েছিল। 1813 খ্রীষ্টাব্দে £ 110,000 পাউণ্ড মূল্যের ব্রিটিশ সুতীবস্ত্র ভারতে আমদানি হয়েছিল। 1856 খ্রীষ্টাব্দে এই অঙ্ক £ 6,3.0,000 পাউণ্ডে এসে পৌঁছেছিল।

বিদেশী দ্রব্যের ভারত-প্রবেশের দ্বার অবারিত করে দেওয়া হলেও ব্রিটেনে ভারতীয় হস্তশিল্পের প্রবেশ অবারিত হয়নি। ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ব্রিটেনে রপ্তানি করতে গেলে তার জন্য অতিরিক্ত শুল্ক (duty) দিতে হত। ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্য উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের তুলনায় উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ জাতি ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের প্রতি সুবিচার করতে কুণ্ঠা দেখিয়েছিল। কয়েকশ্রেণীর ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপর আমদানি শুল্কের হার এত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ভারত থেকে শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি কারবার প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 1824 খ্রীষ্টাব্দে ভারত-জাত 'ক্যালিকো' বস্ত্রের উপর ব্রিটেনে শতকরা $67\frac{1}{2}$ ভাগ অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল, ভারতীয় মসলিন বস্ত্রের উপর শুল্ক ধার্য ছিল শতকরা $37\frac{1}{2}$ ভাগ। ভারতীয় চিনির উপর ব্রিটেনের শুল্কের হার ছিল এই চিনির দামের তিনগুণ অনেকসময় এমন কি চারগুণও বেশী (400%)। ব্রিটেনে যন্ত্রের সাহায্যে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও সাধ্যাতিরিক্ত শুল্ক বৃদ্ধির কারণে ভারত থেকে শিল্পদ্রব্যের রপ্তানির

হার দ্রুত মন্দীভূত হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এইচ্. এইচ্. উইলসন (H. H. Wilson) ব্রিটিশের এই অসাধু ব্যবসায়-নীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—

"সাক্ষ্য দেওয়ার সময় জানা গিয়েছিল যে এই সময়ে ভারতীয় সূতী ও রেশমজাত বস্ত্র ব্রিটিশজাত এই শ্রেণীর বস্ত্রর চেয়ে শতকরা পঞ্চাশ অথবা ষাট ভাগ কম মূল্যে যথেষ্ট লাভ হাতে রেখেও বিক্রয় করা সম্ভব ছিল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর বস্তুকে আরও সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শুল্কের হার আরও শতকরা সত্তর বা আশীভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছিল, এমন কি আমদানিও অনেক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কবা হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পের ব্রিটেনে প্রবেশের পথ এইসব কঠোর আইন অথবা অতি উচ্চ শুল্কের হার দ্বারা যদি না রুদ্ধ করা হত তবে ম্যাঞ্চেস্টার ও পেইসলের (Paisley) কল-কারখানাগুলি প্রথম অবস্থাতেই বন্ধ হয়ে যেত। বাষ্পশক্তির সাহায্য নিয়েও তাদের আর চালু করা সম্ভব হত না। ভারতীয় শিল্পোৎ-পাদকদের সর্বনাশ সাধন করেই ব্রিটিশের এই কলকারখানাগুলির সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন দেশ হত, তবে ভারতে ব্রিটিশ-জাত দ্রব্যের উপর চড়া শুল্ক নির্ধারণ করে সে তার স্বদেশীয় শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচাতে পারত। তার নিজস্ব শিল্পোদ্যোগ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেত। বিদেশী শাসনের কবলে পিষ্ট পরাধীন ভারতবর্ষকে তার এই আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়নি। বিনা শুল্কে ভারতে আমদানি ব্রিটেন-জাত শিল্পদ্রব্য কিনতে ভারতবাসী বাধ্য হয়েছিল। বিদেশী শিল্পোদ্যোগীগণ রাজ-নৈতিক প্রভুত্বের জোরে তাদের ভারতীয় প্রতিযোগিগণকে শুধু দাবিয়েই রাখেনি তাদের সম্পূর্ণরূপে গলা টিপে হত্যা করেছিল। একই ধরনের সুবিধার অধিকার যদি থাকত তবে ব্রিটিশ শিল্প কখনই ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারত না।"

শিল্পদ্রব্য রপ্তানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর ভারতকে তুলা ও রেশমের মত কাঁচামাল রপ্তানি করতে বাধ্য করা হয়েছিল, ব্রিটেনের কল-কারখানাগুলি চালু রাখার জন্য এগুলির রপ্তানির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শুধু তুলা ও রেশমই নয় চা, নীল ও খাদ্যশস্যও প্রচুর রপ্তানি করতে হ'ত কারণ ব্রিটেনে এই দ্রব্যগুলির অভাব ছিল। 1856 খ্রীষ্টাব্দে £ 4,300,000

পাউণ্ড মূল্যের কাঁচাতুলা ব্রিটেনে রপ্তানি হয়েছিল, সেক্ষেত্রে রপ্তানি সুতী-বস্ত্রের মূল্য পরিমাণ ছিল মাত্র £ 810,000 পাউণ্ড। এই বৎসরই যথাক্রমে খাদ্যশস্য, নীল ও কাঁচারেশম রপ্তানির পরিমাণের মূল্য ছিল £ 2,900,000, £ 1,730,000 ও £ 770,000 পাউণ্ড। ভারতের ব্রিটিশ সরকার ভারত থেকে চীনে আফিম রপ্তানি বৃদ্ধি করতেও উৎসাহিত ছিল যদিও চীনারা আফিমের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে সজাগ হয়ে দেশে আফিম আমদানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। আফিম রপ্তানিতে কোম্পানী পরিচালিত ভারত গভর্ন-মেণ্টের এই আগ্রহের কারণ ছিল এই যে, এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্রিটিশ বণিক্‌দের প্রচুর মুনাফা ও এদের দেওয়া কর থেকে কোম্পানীর তহবিলের প্রচুর অর্থাগম। এই সূত্রে একটি কথার উল্লেখ বেশ প্রয়োজন। ভারত থেকে চীনদেশে আফিম রপ্তানিতে ভারত সরকারের উৎসাহ ও সমর্থন থাকলেও স্বদেশ ব্রিটেনে আফিম রপ্তানি তারা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কারণ তাদের দেশবাসির আফিম ব্যবহারের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল। 1813 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যনীতি এমনিভাবে ব্রিটিশ শিল্প ও শিল্পপতিদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়েছিল। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসিকে জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের জন্য ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী রাখা আর এখান থেকে ব্রিটিশ পণ্যের জন্য কাঁচামাল আহরণ।

ভারতের সম্পদ শোষণ ঃ ভারতের ইংরাজ শাসকেরা ভারতের অর্থ ও উৎপন্ন সম্পদের একটি বৃহৎ অংশ স্বদেশে চালান করে দিত, এর বিনিময়ে কোনরকম আর্থিক বা অন্যবিধ প্রতিদান ভারতবাসির প্রাপ্য হত না। এই আর্থিক শোষণ ছিল ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর আগে ভারতের শাসকদের মধ্যে যাঁরা শাসনকার্যে মোটেই দক্ষ ছিলেন না, তাঁদের সময়েও প্রজাদের কাছ থেকে শোষিত অর্থ বা রাজস্বের সবটুকু অংশই দেশের মধ্যেই ব্যয়িত হত, অর্থসম্পদ দেশের বাইরে চলে যেত না। এই অর্থ সাধারণতঃ সেচ-প্রণালী, গমনাগমনের জন্য বড় রাস্তা, বড় বড় মন্দির, মসজিদ প্রভৃতির নির্মাণ, রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ অথবা তাদের নিজস্ব বিলাসব্যসন ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত হত। রাজাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যেভাবেই টাকা খরচ হোক না কেন এই টাকা শেষ পর্যন্ত দেশের শিল্প-বাণিজ্যের কাজেই লেগে যেত, দেশের মানুষের রুজি-রোজগারেরও সুবিধা হত। এর

কারণ এই ছিল যে, ইতিপূর্বে বিদেশ থেকে আক্রমণকারীরূপে ভারতে এসে যারা ভারত জয় করে নিয়েছিল তারা বেশিদিন বিদেশী থাকেনি, ভারতকেই তারা স্বদেশ করে নিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুঘলদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশেরা ভারতে চিরকালই বিদেশী হিসেবেই রয়ে গিয়েছিল। ভারতে কোম্পানীর কর্মচারী অথবা সাধারণ ব্যবসায়ীরূপে যারাই কর্মরত থাকত তাদের সকলেই একদিন না একদিন স্বদেশে ফিরে যাবার সঙ্কল্প নিয়েই থাকত। ভারত গভর্নমেণ্ট বা সরকারের পরিচালক ছিল একদল বিদেশী বণিক্ ও ইংল্যাণ্ডের স্বদেশের গভর্নমেণ্ট। এর ফলে, ভারতের ইংরাজ শাসক বা ব্যবসায়ীদের ভারতে অর্জিত আয় বা সম্পদের একটা বৃহৎ অংশ ইংল্যাণ্ডেই ব্যয়িত হত।

বাংলার অর্থনৈতিক শোষণের সূচনা হয় 1757 খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় থেকে কোম্পানীর কর্মচারীগণের প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পালা সুরু হয়। ভারতীয় নবাব, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে জোরজুলুম করে এইসব টাকাকড়ি বা ধনসম্পদ আহৃত হত। 1758 থেকে 1765 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত থেকে ব্রিটেনে প্রেরিত এই ধরনের সম্পদের পরিমাণ ছিল ষাট লক্ষ পাউণ্ড (£ 6 Million)। 1765 খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাবের দ্বারা সংগৃহীত রাজস্বের চেয়ে এই টাকার অঙ্কটি ছিল চতুর্গুণ। কোম্পানী বাণিজ্যসূত্রে যে টাকা এই সময়ে 'লাভ' হিসেবে অর্জন করেছিল সেটা উপরোক্ত ষাট লক্ষ পাউণ্ডের হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। অবশ্য কোম্পানীর তথাকথিত 'ন্যায্য' লাভের মধ্যেও অনেকখানি বে-আইনি কারবার ছিল। 1765 খ্রীষ্টাব্দে বাংলার 'দেওয়ানি' পেয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার রাজস্বের অধিকারী হয়েছিল। এখন থেকে একটি সংস্থা রূপে কোম্পানীও ভারতের ধনসম্পদ স্বদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা সংগঠিত করে নিয়েছিল। এখন থেকে কোম্পানী বাংলায় সংগৃহীত রাজস্বের সাহায্যে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে তা স্বদেশে রপ্তানি করতে সুরু করেছিল। বাংলা থেকে সংগৃহীত রাজস্বের অর্থে ভারতীয় মাল কিনে ব্রিটেনে রপ্তানির এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছিল—লগ্নী (Investment)। এই 'লগ্নী' ছাপ মেরে বাংলা থেকে সংগৃহীত রাজস্ব ব্রিটেনের ভোগে লাগানো হত। 1765 থেকে 1770 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানী চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড অর্থমূল্যের 'মাল' স্বদেশে চালান দিয়েছিল। এটা ছিল বাংলার রাজস্বের মোট শতকরা তেত্রিশ ভাগ।

কিন্তু শোষণের পথ শুধু একটাই ছিল না, আরও বহু উপায়ে ভারতীয় সম্পদ ব্রিটেনে চালান করা হত। কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের বেতন ও অন্যবিধ আয় এবং ইংরাজ ব্যবসায়ীদের আয়ের প্রায় সবটুকু অংশই শেষ পর্যন্ত সাগর পার হয়ে ব্রিটেনে গিয়ে পৌঁছাত।

প্রতি বৎসর কি বিপুল সম্পদ ভারত থেকে ব্রিটেনে পাচার হয়ে যেত অঙ্কের দিক থেকে তার পরিমাণ সঠিক নির্ণয় করা হয়নি। এবিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন অঙ্কের হিসাব দিয়েছেন। তবে 1757 থেকে 1857 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত থেকে ব্রিটেনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ চালান হয়েছিল এটা প্রায় সব ব্রিটিশ রাজকর্মচারীই স্বীকার করে গিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লর্ড এলেনবরার (Lord Ellenborough) অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের উচ্চতর পরিষদ লর্ড-সভার সদস্য এবং এই সভার একটি বিশেষ কমিটির (Select committee) সভাপতি। পরবর্তীকালে ইনি কিছুকাল ভারতের বড়লাট বা গভর্নর-জেনারেল পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1840 খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজে স্বীকার করেছিলেন যে ভারত প্রতি বৎসর কুড়ি থেকে ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড ব্রিটেনে পাঠিয়ে থাকে। এর বিনিময়ে ভারতকে সামান্য সামরিক সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয় না। মাদ্রাজের রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি জন সুলিভ্যান (John Sullivan) তাঁর কার্যকালে মন্তব্য প্রকাশ করে লিখেছিলেন "আমাদের শাসনব্যবস্থা অনেকটা স্পঞ্জের মত। গঙ্গাতীরবর্তী দেশ থেকে এই স্পঞ্জধর্মী শাসন যা কিছু সম্পদ তা সব শুষে নেয়। এই স্পঞ্জ থেকে সবকিছু সারবস্তু টেমস্ তীরবর্তী দেশে নিঙড়ে নেওয়া হয়।"

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা বেশ মন্দ ছিল। পরিবহনের মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ী, উট অথবা ভারবাহী অশ্ব। ব্রিটিশ শাসকেরা অল্পদিনের মধ্যে এটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ পণ্যের কাট্‌তি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিতে এবং ভারতের নানাস্থান থেকে ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ব্যবস্থা সুষ্ঠু করতে হলে ভারতে কম খরচে অনায়াস পরিবহন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রিটিশ শাসকেরা এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নদীপথে বাষ্পচালিত জলযান বা স্টীমার

চালু করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দেশের স্থলপথগুলির উন্নতিসাধনেও তৎপর হয়েছিলেন। 1839 খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে দিল্লীগামী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ সংস্কারের কাজ আরম্ভ করে 1850 খ্রীষ্টাব্দে তা সম্পন্ন করা হয়েছিল। ভারতের বড বড় শহব, বন্দর এবং কেনা-বেচার হাট বা কেন্দ্রগুলির মধ্যে পথসংযোগ সৃষ্টি করার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছিল। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতির সূচনা হয়েছিল রেল ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর।

জর্জ স্টিফেনসন উদ্ভাবিত প্রথম রেলইঞ্জিনের সাহায্যে ইংলণ্ডে রেলগাড়ী চলার ব্যবস্থা 1814 খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল। 1830 থেকে 1840 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে রেলওয়ে ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ও উন্নতি ঘটেছিল। এরপর আশু ভারতে রেললাইন স্থাপন ও রেলগাড়ী চলাচল ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ভারতে রেলব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এই আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দূরস্থিত অঞ্চলগুলিতে তাদের উৎপন্ন শিল্পবস্তুগুলির কাটৃতি অসম্ভব বেড়ে যাবে। ব্রিটেনের কলকারখানা-গুলি চালু রাখতে যে বিরাট পরিমাণ কাঁচামাল দরকার রেলব্যবস্থার সাহায্যে সেগুলি সংগ্রহ করারও সুবিধা হবে। কারখানার বুভুক্ষু শ্রমিকদের খাওয়ার উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতেও এই রেলব্যবস্থা সহায়ক হবে। ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও ভাল লভ্যাংশের বিনিময়ে টাকা লগ্নীতে ইচ্ছুক ধনিকশ্রেণীর মানুষেরা চাইছিল যে ভারতে বেল কোম্পানী চালু হলে তারা এতে বাড্তি অর্থসম্পদ লগ্নী করে প্রচুর মুনাফা লুটে নেবে আর এই রেল কোম্পানীর পেছনে অর্থলগ্নী করার ঝুঁকিও কম, এটা বেশ নিরাপদ লগ্নীই বলতে পারা যায়। ব্রিটিশ ইস্পাত ব্যবসায়ীরাও ভেবেছিল যে ভারতে রেলব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে তারাই হবে ভারতীয় রেলের রেল-লাইন, ইঞ্জিন, মালগাড়ি, নানাধরনের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ প্রভৃতির বিক্রেতা, তাদের ব্যবসা এতে ফুলে ফেঁপে উঠবে। বিভিন্ন মহল থেকে ভারতে রেল-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিগুলি বিচার করে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারত সরকারও রেলব্যবস্থা প্রবর্তনের সুবিধা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিল। ভারত সরকার ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা ছাড়াও নিজেদের স্বার্থেও ভারতে রেলব্যবস্থা প্রবর্তন বাঞ্ছনীয় মনে করেছিল। ভারতবর্ষের মত একটি বিশাল দেশ সুষ্ঠুভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে শাসনের

ব্যাপারে রেলের প্রয়োজন ছাড়াও আর একটি কথা তাদের মনে এসেছিল। সেটি হচ্ছে এই যে, দেশের কোন সুদূর প্রান্তে প্রজারা যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে অথবা কোন বহিঃশত্রু আক্রমণ করতে আসে তবে সেক্ষেত্রে রেল-ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে দ্রুত সৈন্য সংগ্রহ করে অকুস্থলে তাদের সহজেই পৌঁছে দেওয়া যাবে। 1831 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব মাদ্রাজ থেকে উত্থাপিত হয়েছিল। তবে প্রস্তাব এসেছিল যে ঘোড়ায় এই রেলপথে গাড়ী টানবে। 1834 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডের বাষ্পচালিত রেলগাড়ীর মত গাড়ী ভারতে প্রবর্তনের প্রস্তাব উঠেছিল। ইংল্যাণ্ডের রেলপথ-পরিচালক, অর্থলগ্নী করতে ইচ্ছুক ধনিক্-শ্রেণী, কাপড়-কলের মালিক এবং ভারতের সঙ্গে ব্যবসায় রত বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি ভারতে রেলপথ প্রবর্তনের জন্য ভারত সরকারের উপর একটা রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছিল। শেষে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে ভারতে রেললাইন বসবে আর রেলগাড়ী প্রবর্তিত হবে এবং বেসরকারী সংস্থা দ্বারা এগুলি পরিচালিত হবে। এই সংস্থাগুলি ভারতে রেল প্রবর্তনে যে মূলধন নিয়োগ করবে তার উপর কমঁ করে পাঁচ শতাংশ বার্ষিক হিসাবে তাদের দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য থাকতে হবে। বোম্বাই শহর থেকে থানা পর্যন্ত রেলপথে রেলগাড়ী চলা 1853 খ্রীষ্টাব্দে এই-ভাবে সুরু হয়েছিল।

লর্ড ডালহৌসি 1849 খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল রূপে ভারতে এসে-ছিলেন। ইনি ভারতে দ্রুত রেললাইন গড়ে তোলার একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন। 1853 খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি প্রতিবেদনে (নোট) ভারতে দ্রুত রেলব্যবস্থা প্রবর্তনের একটি কর্মসূচী ছকে দেন, এই প্রতিবেদনটি স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর এই কর্মসূচীতে চারটি বড় ধরনের রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এগুলির সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী আরও অনেক শাখা রেলপথেরও উল্লেখ ছিল। মোটকথা লর্ড ডালহৌসির এই পরিকল্পনায় ভারতের বড় বড় শহর ও বন্দরগুলিকে রেলপথে সংযুক্ত রাখার ব্যবস্থার সঙ্গে এটাও দেখা হয়েছিল যে ভারতের সুদূর প্রান্তগুলিও যেন এই রেলপথ সংযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

1869 খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত রেল কোম্পানীগুলির উদ্যোগে ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছিল 4,000 মাইল। এই কোম্পানীগুলির লাভের

অঙ্ক সুনিশ্চিত রাখা ছিল (Guaranteed), সেইজন্য রেলপথ নির্মাণের খরচ বেশী পড়েছিল, কাজের গতিও খুব সন্তোষজনক হয়নি। এই কারণে ভারত গভর্নমেণ্টকে সরকারী খরচে রেলপথ নির্মাণের কাজ হাতে নিতে হয়েছিল। কিন্তু ভারতে রেলসম্প্রসারণের গতি ভারত গভর্নমেণ্টের কর্মকর্তা অথবা ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণকে সন্তুষ্ট করতে পাবেনি। 1830 খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার নিজস্ব রেলসম্প্রসারণ উদ্যোগ হাতে রেখে বেসরকারী কোম্পানীগুলিকেও রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালনের অনুমতি দিয়েছিল। 1905 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য 28,000 মাইলে পরিণত হয়েছিল। ভারতে রেলওয়ে সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথম কথা এই যে রেলওয়ে সম্প্রসারণে যে 350 কোটির মত টাকা এ যাবৎ ব্যয়িত হয়েছিল তার উৎস ছিল প্রায় সবটাই ইংরাজদের লগ্নীকৃত মূলধন, ভারত থেকে অতি অল্প টাকাই লগ্নী করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতেব রেলব্যবস্থা খুবই অলাভজনক ছিল। লগ্নীকারকদের দেয় সুদের টাকা মিটিয়ে দেবার সামর্থ্যও ভারতীয় রেল অর্জন করতে পারেনি। তৃতীয় প্রসঙ্গ এই যে ভারতের রেলব্যবস্থার পরিকল্পনা, রেলপথ নির্মাণ বা পরিচালন ব্যবস্থায় ভারতের তথা ভারতবাসীর রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকটি উপেক্ষিত হয়েছিল। অপরদিকে রেলব্যবস্থার পরিকল্পনা, সংগঠন ও পরিচালন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিকেই সবচেয়ে বেশী মনোযোগ দেখা গিয়েছিল। রেলপথ নির্মাণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে যেসব জায়গায় ব্রিটেনে রপ্তানিযোগ্য কাঁচামালের প্রাচুর্য ছিল সেই জায়গাগুলি বেছে নিয়ে সেই স্থানগুলির নিকটতম বন্দর পর্যন্ত রেললাইন পাতা হত। ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপযোগী কাঁচামালের উৎসস্থানগুলি অথবা এইসব শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রগুলি রেল পাতার সময় উপেক্ষিত হয়েছিল। মাল পরিবহনের জন্য মাশুল ধার্যের ব্যাপারেও যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব করা হত। আমদানি ও রপ্তানির কারবার ইংরাজদের একচেটিয়া হয়ে উঠেছিল, এইজন্য মালপত্র আমদানি-রপ্তানির মাশুল ছিল বেশ সস্তা, সেই তুলনায় দেশের মধ্যে মাল চলাচলের জন্য মাশুলের হার ছিল বেশ চড়া। ব্রহ্মদেশ এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নিছক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে প্রচুর খরচ করে রেললাইন পাতা হয়েছিল।

ইংরাজেরা বেশ দক্ষ এবং আধুনিক ডাক-ব্যবস্থারও প্রচলন করেছিল। 1853 খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে আগ্রা পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন প্রবর্তিত হয়। লর্ড ডালহৌসি ডাকটিকিট ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেছিলেন। আগে কোন চিঠি ডাকে দেবার আগেই নগদ পয়সা গুণে দিতে হত। তিনি ডাক-মাশুলের হারও কমিয়ে দিয়েছিলেন। দেশের যে কোন স্থান থেকে যে কোন স্থানে আধ আনা (পুরানো আমলের দু' পয়সা) দিয়ে চিঠি পাঠানো যাবে এই নিয়মও তিনি প্রচলন করেন। তাঁর এই নিয়ম প্রবর্তনের আগে দূরত্ব অনুযায়ী ডাকমাশুলের তারতম্য হত। পুরাতন নিয়মে অনেক সময় দূর পথে চিঠি পাঠাতে হলে একজন দক্ষ ভারতীয় শ্রমিকের চারদিনের মজুরির সম-পরিমাণ পয়সা খরচ করতে হত।

ভূমি-রাজস্ব নীতি

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায় ও লাভ, শাসনব্যবস্থা পরিচালনা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য যুদ্ধ—এইসব বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় হত তার সবটাই ভারতের কৃষক সমাজ বা রায়তদেরই যোগাতে হত। বস্তুতঃ কৃষকদের উপর গুরুভার খাজনা ধার্য না করে ব্রিটিশের পক্ষে ভারতের মত একটা বিশাল দেশ জয় করা খুবই কঠিন হত।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে কৃষিজাত শস্যের একটা অংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে রাজকোষে জমা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। এটা আদায়ের জন্য নানা ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজকর্মচারীরা এটা সোজাসুজি চাষীদের কাছ থেকে আদায় করত। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন মধ্যবর্তীর মাধ্যমে এটা আদায় হত। এই মধ্যবর্তী জমিদার বা জোতদার চাষীর কাছ থেকে খাজনা আদায় করে তা রাজকোষে জমা দিত। মধ্যবর্তী প্রথায় রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তীগণ রাজস্বের একটা অংশ তাদের 'কমিশন' বা পারিশ্রমিকরূপে ভোগ করত। এই মধ্যবর্তী শ্রেণী মুখ্যতঃ ছিল রাজস্ব সংগ্রহকারী মাত্র, তবে তাদের নিজস্ব জমিজমাও অনেক সময় থাকত, এর রাজস্ব তারা নিজেরাই ভোগ করত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে 1765 খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও ওড়িশার 'দেওয়ানি' অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভ করেছিল। এই অধিকার পেয়ে, প্রথমদিকে কোম্পানী পূর্ব প্রথা মতই

রাজস্ব সংগ্রহ করেছিল। তবে এই রাজস্বের পরিমাণ বেশ বেড়ে গিয়েছিল। 1722 খ্রীষ্টাব্দে ও 1764 খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 14,290,000 ও ৪,180,000 টাকা। 1771-এ এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল 23,400,000 টাকা। 1773 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী সোজাসুজি প্রজার কাছ থেকেই রাজস্ব সংগ্রহ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। ওয়ারেণ হেস্টিংস রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার নীলামে তুলে সবচেয়ে বেশী টাকার অঙ্ক দিতে রাজী এমন ব্যক্তিকে রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দিতেন। কিন্তু ওয়ারেণ হেস্টিংসের এই নীতি কোম্পানীর পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয়নি। জমিদার ও ফাটকা-বাজ শ্রেণীর মানুষেরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় নামার ফলে নীলামে ডাকের অঙ্ক বেশ স্ফীত হয়ে উঠলেও কার্যক্ষেত্রে যে রাজস্ব সংগৃহীত হ'ত তা কোম্পানীর আশা পূর্ণ করতে পারত না। রাজস্বের টাকার পরিমাণও ঠিক থাকত না, এক এক বছর এক এক রকম টাকা উঠত। এই সময় কোম্পানীর টাকার প্রয়োজন ছিল বেশী, একটা নির্দিষ্ট টাকার রাজস্বের খুবই দরকার ছিল। নীলামে রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার ডেকে নেওয়া প্রথার একটা অসুবিধা এই ছিল যে পরের বছর এই অধিকার কার হবে তা জানা যেত না, পরের বছর খাজনার হারও জানা যেত না, কারণ নীলাম ডাকের টাকার অঙ্কের হিসেবে খাজনার হার প্রতিবছর নূতন করে নির্ধারিত হত। এর ফলে নীলাম ডাক জেতা রাজস্ব সংগ্রাহক বা জমিদার অথবা রায়ত এরা কেউই চাষের উন্নতির দিকে মন দিত না। ফলে কৃষি উৎপাদনও আশানুরূপ হতে পারত না।

এই অবস্থার মধ্যে ভূমি-রাজস্বের হার স্থায়ীভাবে বেঁধে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজন হয়েছিল। দীর্ঘস্থায়ী তর্ক, বিতর্ক ও আলোচনার পর 1793 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাংলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এর দুটি বিশেষত্ব ছিল। এই প্রথার ফলে জমিদার ও রাজস্ব সংগ্রাহকেরা ভূস্বামীতে পরিণত হয়েছিল। এর আগে এই শ্রেণী কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে মাত্র খাজনা আদায়ের অধিকারী ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় এরা নিজের নিজের এলাকার মধ্যে অবস্থিত ভূমিখণ্ডের মালিকে পরিণত হয়েছিল। পুরুষানুক্রমে এরা এই জমিদারী ভোগের অধিকার পেয়েছিল। ইচ্ছা করলে এই অধিকার অন্যকে হস্তান্তরও করা যেতে পারত। জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ এই নূতন ব্যবস্থায় সুরক্ষিত থাকলেও চাষী বা

রায়তেরা জমির উপর তাদের স্বত্ব ও অন্য সব সুযোগসুবিধা হারিয়েছিল। গোচারণ ভূমি, বনজঙ্গল, সেচের খাল, মাছের ভেড়ি, বাস্তুজমি প্রভৃতির উপরও রায়তদের স্বত্ব লোপ পেয়েছিল। খাজনা-বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকে তাদের রেহাই পাবার কোন পথও রাখা হয়নি। এক কথায় বলা চলে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় কৃষক সমাজকে জমিদারশ্রেণীর দয়ার উপর একান্ত-ভাবে নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। কোম্পানীর দাবিমত অতিউচ্চহারে নির্ধারিত রাজস্ব নির্দিষ্ট সময়ে লাভের স্বার্থেই জমিদারদের সুযোগসুবিধা-গুলি বর্ধিত করা হয়েছিল। জমিদারদের সংগৃহীত রাজস্বের এগার ভাগের দশ ভাগ (10/11th) গভর্নমেণ্টকে দিতে হ'ত। এগার ভাগের একভাগ মাত্র জমিদারের ভোগে লাগত। কোম্পানীকে জমিদারদের দেয় অর্থের পরিমাণ বা অঙ্কটি নির্দিষ্ট করা থাকত। নিজ নিজ এলাকায় চাষবাসের উন্নতিসাধন করে, চাষের এলাকা বাড়িয়ে বা অন্য কোন উপায়ে বেশী রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারলে জমিদারদের পক্ষে সেই অতিরিক্ত আয় ভোগ করার সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানীকে নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত আর কিছু তাদের দিতে হত না। এর একটা উল্টো দিকও ছিল। শস্যহানি বা দুর্ভিক্ষ হলেও জমিদারকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোম্পানীর প্রাপ্য খাজনা উশুল করে দিতে হ'ত। নির্দিষ্ট দিনে খাজনা না দিলে জমিদারের অধিকার কেড়ে নিয়ে তা' নতুন জমিদারকে বিলি করাই ছিল কোম্পানীর নিয়ম।

একটা এলাকার বা জমিদারির জন্য কোম্পানীকে জমিদারের কত টাকা রাজস্ব দিতে হবে সেটা কোম্পানীই নিজের খেয়ালখুশী মতই নির্ধারণ করত। এবিষয়ে জমিদারদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করা হত না। কোম্পানীর কর্ম-চারীগণ যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণ রাজস্ব ধার্য করার চেষ্টা করত। কাজেই রাজস্ব খুব উঁচুহারেই ধার্য হয়ে থাকত। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনা করেছিলেন জন শোর (John Shore), ইনি কর্ণওয়ালিশের পর নিজেও গভর্নর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর হিসেব ছিল এই যে, বাংলার উৎপাদন হার যদি একশত হয়, তবে গভর্নমেণ্টের প্রাপ্য হবে পঁয়তাল্লিশ ভাগ, জমিদার এবং এই শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীরা পাবে শতকরা পনের ভাগ আর চাষীর ভাগে পড়বে শতকরা চল্লিশ ভাগ মাত্র।

পরবর্তীকালে সরকারী-বেসরকারী উভয় শ্রেণীর পর্যবেক্ষকেরা এবিষয়ে

প্রায় একমত প্রকাশ করেন যে 1793 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাংলা বা বিহারের জমিদারদের জমির উপর মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ অতি অল্পক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, ঢালাও মালিকানা প্রায়ই ছিল না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতের ব্রিটিশ সরকার জমিদারদের এই মালিকানা কেন মেনে নিয়েছিল? ভারতের ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতাই এর অন্যতম কারণ ছিল। ইংল্যাণ্ডের কৃষিব্যবস্থায় জমিদার বা ল্যাণ্ড-লর্ডই মুখ্য পাত্র। ভারতের ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণ সুতরাং ধরেই নিয়েছিল যে ভারতীয় জমিদার বা ইংরাজ ল্যাণ্ড-লর্ড একই শ্রেণীভুক্ত, জমিদার এবং ইংরাজ ল্যাণ্ড-লর্ড শব্দটি সমার্থক। তবে এটা লক্ষণীয় যে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণ ভারতীয় জমিদার ও ইংল্যাণ্ডের ল্যাণ্ড-লর্ডের তফাৎটা ধরতে পেরেছিল। ইংল্যাণ্ডের 'ল্যাণ্ড-লর্ড' শুধু তার প্রজাদের কাছেই 'ল্যাণ্ড-লর্ড' ছিল না, ব্রিটিশ সরকারের চোখেও সে ল্যাণ্ড-লর্ড। সেখানে তার একটি স্বাধীন সত্তা বিরাজমান থাকে। বাংলায় জমিদার প্রজাদের কাছেই জমির মালিক, কোম্পানীর কাছে সে কিন্তু অধীন গোলাম। আসলে সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল একজন প্রজামাত্র। ব্রিটিশ ল্যাণ্ড-লর্ডকে তার আয়ের অতি সামান্য অংশই ভূমি-রাজস্ব হিসেবে রাজকোষে দিতে হত, সেক্ষেত্রে ভারতীয় জমিদার তার আয়ের এগার ভাগের দশ ভাগ কোম্পানীকে দিতে বাধ্য ছিল। যদিও তাকেই বলা হত তার এলাকার ভূ-স্বামী। একজন ভারতীয় জমিদার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব না দিলে তার জমিদারি কেড়ে নিয়ে অন্যকে তার জমিদারি বিক্রি করে দেওয়ার অধিকার কোম্পানীর ছিল। কাজেই ব্রিটিশ ল্যাণ্ড-লর্ডের অবস্থা আর কোম্পানী সৃষ্ট জমিদারদের অবস্থার মধ্যে আসলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল।

নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধার কথা চিন্তা করেই কোম্পানী জমিদারদের জমির মালিকরূপে স্বীকার করে নিয়েছিল কোন কোন ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করে থাকেন। তিনটি কারণ কোম্পানীকে জমিদারদের জমির মালিক হিসেবে স্বীকৃতিদানের প্রেরণা দিয়েছিল। প্রথমটি ছিল কূট-নীতি,—কোম্পানী চেয়েছিল দেশ শাসনে তাদের আজ্ঞাবহ ও বিশ্বস্ত একটি শ্রেণী। ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণ এটা বুঝেছিল যে তারা এদেশের মানুষ নয়, তারা বিদেশী, ভারত শাসনকে দৃঢ় ও সুচিরস্থায়ী করতে হলে কিছু সংখ্যক দেশীয় মানুষের সমর্থন তাদের বিশেষ

প্রয়োজন। জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হলে তাদের সমর্থক সংখ্যাব পুষ্টি হবে; জমিদারশ্রেণী কোম্পানী-শাসন এবং ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে একটা যোগ-সূত্রের কাজ করবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে বাংলায় অনেকগুলি গণ-বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল এটা মনে রাখলে সহজেই বোঝা যাবে কেন কোম্পানী তাদেব শাসনের সমর্থক একটি শক্তিশালী শ্রেণী গঠন করতে চেয়েছিল। ব্রিটিশের কৃপায় এই ধনশালী ও বিশেষ সুবিধাভোগী জমিদাব-শ্রেণীব উদ্ভব হয়েছিল, কাজেই নিজেদের স্বার্থেই এই জমিদারশ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ় সমর্থক হতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদেব পক্ষে জমিদার-শ্রেণীর সমর্থনের এই প্রত্যাশা মোটেই ব্যর্থ হয়নি। ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিরোধ ব্যাপাবে পরবর্তীকালে জমিদাবগণ গোষ্ঠীগতভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিল। জমিদারশ্রেণীর প্রতি ব্রিটিশ দাক্ষিণ্যের দ্বিতীয় কারণটিই ছিল সমধিক গুরুত্বপূর্ণ, এটি ছিল আর্থিক নিরাপত্তা। ভূমি-বাজস্বের আযের উপর কোম্পানীকে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হত। কিন্তু 1793 খ্রীষ্টাব্দের আগে কোম্পানীকে রাজস্ব সংগ্রহ নিয়ে বেশ বেগ পেতে হত। প্রায় কোন বৎসরই আশানুরূপ রাজস্ব আদায় হত না। আয়ের এই হেবফের কোম্পানীকে বিব্রত করে তুলত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোম্পানীর এই অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি দূর কবে দিয়েছিল, একটা নির্দিষ্ট রাজস্বের অঙ্ক লাভের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা হয়েছিল। জমিদারেরা ইতি-মধ্যেই বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের এই সম্পত্তিই সরকারের দৃষ্টিতে তাদেব 'জামিন' বা সিকিউরিটির কাজ করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় কোম্পানী সুকৌশলে মাথাপিছু ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ বেশ উঁচুহারে ধার্য করে রেখেছিল, এত উঁচু হারে রাজস্ব কখনও ধার্য হয়নি। একদিকে সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব বৃদ্ধি আর একদিকে ছিল জমিদারদের মাধ্যমে এটা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, কোম্পানীব পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের এই ছিল সুবিধা। লক্ষ লক্ষ কৃষকের প্রতিজনের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের চেয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন জমিদারের মারফৎ খাজনা আদায় সরকারের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হয়েছিল, এতে খাজনা আদায়ের জন্য কোম্পানীর ব্যয়ও খুব কমে গিয়েছিল। তৃতীয়তঃ এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। জমিদারের আয় যতই বাড়ুক না কেন, সরকারকে তার দেয় রাজস্বের পরিমাণ আর বাড়বে না

এই জন্য জমিদারশ্রেণী তাদের নিজ নিজ এলাকায় কৃষিব্যবস্থার উন্নতি এবং চাষের উপযোগী নূতন শস্যক্ষেত্র সৃষ্টিতে তৎপর হবে, এবং এই চেষ্টার ফলে সামগ্রিকভাবে দেশে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। জমিদারির চিরস্থায়ী প্রথা ক্রমে ক্রমে ওড়িশা, উত্তর মাদ্রাজ এবং বারাণসী জেলায়ও প্রবর্তিত হয়েছিল।

মধ্যভারতের কোন কোন স্থানে এবং আউধ বা অযোধ্যায় কোম্পানী যে জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করেছিল তাতে জমিদারদের জমির উপর মালিকানার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তবে বাংলামুলুকের মত জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ স্থায়ী করা হয়নি, সময়ে সময়ে জমিদারদের দেয় রাজস্বের হার বৃদ্ধির অধিকার কোম্পানী নিজেদের হাতেই রেখেছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে কোম্পানী অপর একটি জমিদারশ্রেণীরও সৃষ্টি করেছিল। বিদেশী ইংরাজ শাসকদের বিশ্বস্ত সেবার পুরস্কারস্বরূপ কিছু কিছু 'রাজভক্ত' ব্যক্তিকে বেশকিছু জমির মালিকানা দিয়ে তাদেরও জমিদার শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়ার নীতিও কোম্পানী অবলম্বন করেছিল।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর ভূমি-বন্দোবস্তের ব্যাপারে ভারত সরকারের পক্ষে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণের ধারণা জন্মেছিল যে এইসব অঞ্চলে জমিদার হওয়ার মত এমন ব্যক্তির অভাব—যার সঙ্গে রাজস্ব-সংগ্রহ বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া তাদের মনে হয়েছিল বাংলা বা অন্যান্য অঞ্চলের ধাঁচে জমিদারি প্রথার প্রবর্তন এই অঞ্চলের অবস্থায় মানিয়ে নেওয়া যাবে না। রীড্ (Reed) এবং মনরো (Munro) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির এই কর্তা-ব্যক্তিদের পরিচালনাধীন রাজকর্মচারীগণ উচ্চতন কর্তৃপক্ষকে এই পরামর্শ দিয়েছিল যে প্রকৃত চাষীর কাছ থেকে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব সরাসরি কোম্পানীরই গ্রহণ করা উচিত। এরা আরও বলেছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় কোম্পানীর লোকসানই হয়ে থাকে, জমিদারদের লাভের বখরা দিতে হয়। কৃষির ফলন অধিক হলে অতিরিক্ত আয়টুকু জমিদারেরাই ভোগ করে, কোম্পানী কিছুই পায় না। তার উপর, এই ব্যবস্থায় চাষীকে জমিদারের কৃপানির্ভর করে রাখা হয়, ইচ্ছা করলেই জমিদারেরা তাদের উপর নির্যাতন চালাতে পারে। প্রজাদের কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের এই

ব্যবস্থাকে 'রায়তওয়ারী' নাম দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে এই রায়তওয়ারী প্রথা প্রবর্তন করে প্রজার একটি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের উপর অধিকার নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে মেনে নেওয়া উচিত। মাদ্রাজের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোম্পানীর কর্তাদের এটাও জানিয়ে দিয়েছিল যে অতীতে এই ব্যবস্থাতেই খাজনা সংগ্রহের রীতি ছিল। তাদের মতে "এই নিয়মই ভারতে চিরকাল ধরে অনুসৃত হয়েছে।" এই সুপারিশ অনুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন অংশে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল। তবে এটিকে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি, অর্থাৎ খাজনার পরিমাণ এক রাখা হয়নি। কুড়ি বা ত্রিশ বছর পর পর এই বন্দোবস্তের নবীকরণ হত এবং এই সুযোগে খাজনার হার বাড়িয়ে দেওয়া হত।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে 'চাষীই জমির মালিক' এই নীতি অবশ্য কার্যকর হয়নি। চাষীরা খুব তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল যে অনেকগুলি জমিদারের বদলে এখন দেখা দিয়েছে এক বিরাট জমিদার—সেই জমিদার হচ্ছে স্বয়ং সরকার। সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে জমির খাজনা ঠিক 'খাজনা' নয়, এটা 'ভাড়া'। জমির উপর চাষীর অধিকার এই নীতি দ্বারা যে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছিল বা এটা যে একটা ভাঁওতা মাত্র তার তিনটি প্রমাণ উপস্থিত করা যেতে পারে: (1) অধিকাংশ এলাকায় খাজনার হার এত অধিক ধার্য ছিল যে ফসল খুব ভাল হলেও খাজনা মিটিয়ে চাষীর পক্ষে দিন চালান কঠিন হয়ে পড়ত। রায়তওয়ারী প্রথা প্রবর্তনের প্রথম দিকে উৎপন্ন ফসলের শতকরা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন ভাগ খাজনা হিসেবে ধার্য ছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও এর থেকে খাজনার হার কিছু কম ছিল না। (2) রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে গভর্নমেন্টের যখন খুসী তখন খাজনা বৃদ্ধির অধিকার রাখা হয়েছিল, (3) বন্যা বা খরার কারণে শস্যহানি ঘটলেও প্রজাদের খাজনার রেহাই দেওয়া হত না।

মহলওয়ারী বন্দোবস্ত

জমিদারি বন্দোবস্তের একটু কাটছাঁট করে এই মহলওয়ারী বন্দোবস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মধ্য ভারতের কিছু অংশ এবং পাঞ্জাব প্রদেশে চালু করা হয়েছিল। কতকগুলি গ্রাম বা এষ্টেট নিয়ে একটি মহল ধরা হত। এই মহলগুলির উপর একাধিক জমিদারের দাবি মেনে হওয়া হত।

একাধিক জমিদার, বা একাধিক সচ্ছল পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের উপর খাজনা ধার্য হত। পাঞ্জাবে এই ব্যবস্থা একটু পাল্টিয়ে গ্রাম্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। মহলওয়ারী বন্দোবস্ত প্রথায় খাজনার হার সময়ে সময়ে সংশোধন করে তা বাড়ানো হত।

চিরস্থায়ী জমিদারি বা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত এই দুটিই ভারতের চিরাচরিত ভূমি-ব্যবস্থার প্রায় বিপরীত ব্যবস্থা হয়ে দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ নীতি নূতন ধরনের এই ব্যক্তিগত মালিকানা এমনভাবে প্রবর্তন করেছিল যার ফলে কৃষির উন্নতি সত্ত্বেও কৃষকদের উপকৃত হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমগ্র দেশে জমিকে একটি বিক্রয় বা বন্ধকযোগ্য সম্পদে পরিণত করা হয়েছিল। জমির অধিকারও যখন তখন হারাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সরকারের রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করার জন্যই ছিল এই ব্যবস্থা। যে দরিদ্র কৃষকের জমি ছাড়া আর কোন সম্পদ নেই সে নির্ধারিত খাজনা কোনরকমে পরিশোধ করতে অপারগ হলে সরকারী প্রাপ্য খাজনার অঙ্ক মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেত। এই সরকারী খাজনা যাতে মারা না যায় তারই জন্য কৃষকের জমির উপর স্বত্ব কেড়ে নিয়ে সেটিকে বিক্রয় বা হস্তান্তরযোগ্য বস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল। নূতন নিয়মে একজন কৃষক তার জমি বিক্রি করে অথবা বন্ধক রেখে তার খাজনা মিটিয়ে দেবার অধিকার পেয়েছিল। যদি সে স্বেচ্ছায় এইভাবে খাজনা পরিশোধ না করত তবে গভর্নমেণ্ট তার জমি নীলামে চড়িয়ে অপরকে জমি বিক্রী করে নিজের পাওনাগণ্ডা উশুল করে নিতে পারত। জমির ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি-দানের নীতি প্রবর্তনের আরও একটি কারণ ছিল। কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস এই ছিল যে ব্যক্তিগত মালিকানা নীতি বহাল থাকলে জমির মালিক জমিদার বা প্রজা যেই হোক না সে ঐ জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করবে।

জমিকে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তুতে পরিণত করে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এদেশের চিরাভ্যস্ত ভূমি-ব্যবস্থায় একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। এই নূতন ভূমি-ব্যবস্থার ফলে ভারতের গ্রামগুলির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ এই নূতন ভূমিব্যবস্থা ভারতের গ্রামীণ সমাজের অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

অনুশীলনী

1. 1765 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 1838 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পর্কের বিবর্তন বিষয়ে আলোচনা কর। কি কি মুখ্য সূত্রগুলির প্রভাবে এই বিবর্তন কার্যকর হয়েছিল তা আলোচনা কর।
2. 1757 থেকে 1857 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অবলম্বিত ব্রিটিশ বাণিজ্যনীতির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ কর।
3. ব্রিটিশের ভূমি-রাজস্ব নীতি কিভাবে ভারতে প্রচলিত নীতির পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল তাহা দেখাও।
4. নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য (Notes) লিখ :

   (a) 1773 খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা (b) শিল্প বিপ্লব।
   (c) বাংলা হইতে সম্পদ শোষণ (d) ভারতে রেলওয়ের প্রবর্তন ও বিস্তার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক নীতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে 1785 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে গিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্রিটিশ অর্থনীতির পরিপূরক অর্থনীতি কোম্পানী শাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছিল। এখন আমরা কোম্পানী কর্তৃক পরবর্তীকালে বিজিত অঞ্চলগুলির শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব।

কোম্পানী প্রথম দিকে তার অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার ভারতীয় কর্মচারীদের উপরই ন্যস্ত করে রাখত, নিজেরা শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করে এর উপর মোটামুটি দৃষ্টি রাখত। এই পুরাতন শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশের লক্ষ্যপূরণ ঠিক মত হচ্ছে না এটা বুঝতে তাদের বেশী সময় লাগেনি। অতঃপর কোম্পানী শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতে নিয়েছিল। ওয়ারেণ হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিশের আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। এই নূতন শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ ধাঁচে গড়ে তোলা হয়েছিল। ব্রিটিশের কর্তৃত্ব নূতন নূতন এলাকায় প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন প্রয়োজন ও সমস্যার উদ্ভব হত। নবার্জিত অভিজ্ঞতা ও তজ্জনিত পরিকল্পনার সাহায্যে শাসনব্যবস্থা সময়োপযোগী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি সুষ্ঠু রূপ পেয়েছিল। তবে সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই শাসনব্যবস্থা সংগঠিত হয়েছিল, একথা মনে রাখতে হবে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল— সিভিল সার্ভিস, সামরিক বাহিনী ও পুলিশ। এর কারণ ছিল দুটি। প্রথম কারণটি এই যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব বিধান। ভারতে আইন ও শৃঙ্খলার অভাব হলে ভারতের প্রতিটি প্রান্তে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও ব্রিটিশ পণ্যোৎপাদকশ্রেণীর মালের কাটতির ঘাটতি বা লোকসান অনিবার্যভাবে ঘটার সম্ভাবনা ছিল। তার উপর ইংরাজ শাসকেরা ছিল বিদেশী, ভারতবাসী তাদের প্রীতির চোখে দেখবে এটা তারা আশা করতে পারত না। ভারত শাসন-

কার্যে বা ভারতের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভারতীয় জনগণের সহ-যোগিতা ও সমর্থন ছিল তাদের আশাতীত। এই কারণে জন-সমর্থনের চেয়েও বেশী শক্তিশালী ও কার্যকর উপায় তাদের অবলম্বন করতে হয়েছিল। ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন তাঁর ভ্রাতা লর্ড ওয়েলেস্লির অধীনে কিছুকাল ভারতে কাজ করতে এসেছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি লিখেছিলেন "ভারতের শাসনতান্ত্রিক গঠন, শাসনের প্রয়োগ পদ্ধতি ও প্রণালী এসবই ইউরোপে অবলম্বিত শাসন-পদ্ধতির থেকে একেবারে ভিন্ন। ভারত গভর্নমেণ্টের অবস্থিতি ও সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস হল—তরবারি।" ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন বোঝাতে চেয়েছেন যে শুধুমাত্র তরবারির জোরে ব্রিটিশ শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একমাত্র তরবারির জোরেই ভারত-শাসনকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

সিভিল সার্ভিস

'সিভিল সার্ভিস' নামে প্রশাসনিক শ্রেণীর এক ধরনের পদ লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে গোড়া থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে একশ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করে ব্যবসা চালাত তাদের বেতন ছিল খুব অল্প কিন্তু এরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা চালানোরও অধিকারী ছিল। পরবর্তীকালে কোম্পানীর রাজত্ব লাভের পর, এই কর্মচারীগণের উপরই প্রশাসনিক দায়িত্বও ন্যস্ত হয়েছিল। অতঃপর এরা খুবই দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। এরা দেশের তাঁতী, কারিগর শ্রেণী, বণিক্ ও জমিদারদের উপর অত্যাচার চালাত। রাজা নবাব শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাছে এরা ঘুষ নিত, অনেক সময় এই ঘুষকে 'উপহার' বলে চালান হত। এছাড়া এরা বে-আইনি ব্যবসায়ও চালিয়ে যেত। উপরোক্ত উপায়ে অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে এরা ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেত। ক্লাইভ ও ওয়ারেণ হেস্টিংস এদের মধ্যে দুর্নীতির দমনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁরা এবিষয়ে সাফল্য লাভ করতে পারেননি।

1786 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গভর্নর-জেনারেল রূপে আসার পর কর্ণওয়ালিস শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিলেন সেই সঙ্গে তিনি এটাও বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে পর্যাপ্ত বেতন না পাওয়া গেলে কর্মচারীদের পক্ষে সৎভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়, উৎকোচ অথবা উপহার গ্রহণ

নিষিদ্ধ করে তিনি একটি কড়া আইন জারী করেছিলেন এবং সেইসঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতনের হারও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই বেতনের হার ছিল নিম্নরূপ : একটি জেলার কালেক্টারের বেতন ধার্য হয়েছিল মাসিক 1500 টাকা। তাছাড়া জেলা থেকে আহৃত রাজস্বের শতকরা একাংশ ছিল কালেক্টারের উপরি আয় বা কমিশন। বস্তুতঃ কোম্পানী সিভিল সার্ভিসের বেতনের হার তৎকালে বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল। কর্ণ-ওয়ালিস এই নিয়মও বেঁধে দিয়েছিলেন যে চাকুরীর দৈর্ঘ্য হিসেব করেই সিভিল সার্ভিসে পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকবে। বাইরের কোন প্রভাব পদোন্ন-তির ব্যাপারে পড়তে না দেওয়া ছিল এই নিয়মের উদ্দেশ্য। ধরাধরির জোরে বা মুরুব্বির জোরে পদোন্নতি রোধের জন্যই এই নিয়ম চালু হয়েছিল।

1800 খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি দেখলেন যে সিভিল সার্ভেন্টদের কর্মক্ষেত্র বেশ বিস্তৃত। সিভিল সার্ভিসে ভর্তি হয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে যেসব ছেলেরা আসে বয়সে তারা অপরিণত। আঠারো বা তার কাছাকাছি বয়সের এই তরুণদের চাকুরীতে যোগদানের আগে কোন শিক্ষণ-ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত ছিল না। এরা প্রায় সকলেই ভারতীয় ভাষার সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যেত। এইসব কারণে লর্ড ওয়েলেস্‌লি কলকাতায় 'ফোর্ট উই-লিয়ম কলেজ' নামে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সিভিল সার্ভিসে সদ্যভর্তি তরুণ-যুবকদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। 1806 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর পরিচালকেরা ওয়েলেস্‌লির এই প্রচেষ্টার প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করায় এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে ইংল্যাণ্ডের হেইলবেরিতে (Hailebury) তাঁরা 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ' নামে একটি কলেজ খুলে এখানে শিক্ষানবীশদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। 1853 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদের হাতেই 'সিভিল সার্ভিস' চাকুরি নিয়োগের ভার ছিল। 'বোর্ড অফ্ কন্ট্রোল' অর্থাৎ কোম্পানীর নিয়ামক সংস্থার সদস্যদের খুশী রাখার জন্য তাঁদের মনোনীত কিছু প্রার্থীকেও চাকুরী দেওয়া হত। কোম্পানীর পরিচালকদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধাগুলি পার্লামেন্টের চাপে একে একে হস্তচ্যুত হয়ে পড়েছিল কিন্তু তারা 'সিভিল সার্ভিস' পদে তাদের নিজস্ব প্রার্থীদের নিয়োগের অধিকারটি সহজে ছাড়তে চায়নি। কিন্তু 1853 খ্রীষ্টাব্দে 'চার্টার অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হওয়ার পর কোম্পানী সিভিল সার্ভিসে নিজস্ব মনোনীত প্রার্থীদের চাকুরীতে নিয়োগ করার অধিকার হারিয়েছিল[৮]

তখন থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পর সিভিল সার্ভিসে চাকুরী পাওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

কর্ণওয়ালিসের আমল থেকে সিভিল সার্ভিস চাকুরীতে কোন ভারতীয়ের প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বা রুদ্ধ রাখা হয়েছিল। 1793 খ্রীষ্টাব্দে সরকারিভাবে এই নিয়ম করা হয়েছিল যেসব চাকুরীতে বাৎসরিক বেতন £ 500 পাউণ্ডের বেশী সেইসব চাকুরীতে শুধু ইংরাজদেরই অধিকার থাকবে। এই নিয়ম শুধু সিভিল সার্ভিসে নয়, সরকারী সব চাকুরীর ক্ষেত্রে যথা সামরিক বিভাগ (Army), আরক্ষা (Police), বিচার ও পূর্ত বিভাগেও সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল।

কর্ণওয়ালিসের পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল জন শোর এ সম্বন্ধে মন্তব্য করে লিখেছিলেন, "ইংরাজের মূলনীতি এই ছিল যে ভারতীয় জাতিকে এমনভাবে পদানত করে রাখতে হবে যাতে আমাদের সুযোগ-সুবিধাসমূহ ও স্বার্থ যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। অতি নিম্নস্তরের একজন ইংরাজ সানন্দে যা গ্রহণের জন্য ইচ্ছুক থাকবে সেই মর্যাদা; সম্মান বা চাকুরী যাতে কোন ভারতবাসী না পায় সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল।"

কিন্তু ব্রিটিশের এই নীতি অবলম্বনের কারণ কি? অবশ্যই এর একাধিক কারণ ছিল। একটি কারণ এই যে কোম্পানীর ধারণা ছিল যে ইংরাজী ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস ও ইংরাজ জাতির প্রতিষ্ঠানের ধাঁচে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করতে হলে এটা শুধু ইংরাজ কর্মচারীদের দ্বারাই এদেশে বদ্ধমূল করে দেওয়া যাবে। দ্বিতীয় কারণ হল এই যে, ইংরাজেরা ভারতীয়-দের কর্মদক্ষতা এবং সাধুতা বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি চার্লস গ্রাণ্টের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ভারতবাসীদের নিন্দা করে তিনি বলেছিলেন, "এরা শোচনীয়ভাবে নীচ ও অধঃপতিত একটি জাতি, এদের নীতিবোধ যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা অতি অল্প। পাপাচারের ফলে এরা অপরিসীম দুর্দশা-গ্রস্থ।" আবার স্বয়ং কর্ণওয়ালিশের বিশ্বাস ছিল যে হিন্দুস্থানের প্রতিটি অধিবাসীই দুর্নীতিপরায়ণ। এখানে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে উপরোক্ত মন্তব্যগুলি তৎকালে কিছু কিছু ভারতীয় কর্মচারী বা জমিদার সম্বন্ধে অবশ্যই প্রযোজ্য ছিল। তবে এই নীতিবোধহীন ও অসাধু মানুষের সংখ্যা মুষ্টিমেয় জমিদার ও কোম্পানীর ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

ছিল। তবে এই নিন্দাসূচক বিশেষণগুলি সমানভাবেই এমন কি অনেক বেশী মাত্রায় কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যেতে পারত। কর্ণওয়ালিশ ইংরাজ কর্মচারীদের বেশী বেতন দিতে চেয়েছিলেন এই কারণে যে এরা হয়ত বেশী বেতন পেলে প্রলোভন জয় করবে, আনুগত্যের সঙ্গে রাজকার্য পালন করবে। ইংরাজ কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতা রোধ করতে কর্ণওয়ালিশ তাদের বেতন বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। ভারতীয় কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি দ্বারা তাদের অর্থের প্রলোভন জয় করে সাধুতার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ তিনি অবশ্য দেননি।

বস্তুতঃ উচ্চতর বেতনযুক্ত পদগুলি থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করে রাখার নীতিটি ছিল সুপরিকল্পিত। ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তা বজায় রাখার জন্যই ছিল এইসব পদ। এই পদগুলি ভারতীয়দের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। একজন ইংরাজ 'সিভিল সার্ভেন্ট' তার স্বভাবজাত সংস্কারবশে ব্রিটিশ স্বার্থকে যে সহানুভূতির সঙ্গে অনুভব করে কর্মরত থাকবে, একজন ভারতীয়ের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কাজেই এইসব পদে ভারতীয়দেব নিয়োগ রুদ্ধ ছিল। এইসব পদে ভারতীয় নিয়োগ না করার আরও একটা কারণ ছিল। ব্রিটেনের প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠী ভারতে 'সিভিল সার্ভিস' বা এই জাতীয় মোটা বেতনের চাকুরীগুলি তাদের সন্তানদের মধ্যেই সীমায়িত রাখার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকত। এমন কি এই অধিকার পাওয়ার জন্য তারা নিজেদের মধ্যেও ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত থাকত। ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল ও ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ এই দুই পক্ষেরই মধ্যে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব একটা স্থায়ী বিষয় ছিল। নিজেদেরই লোভ আছে, কোন দল এই নিয়োগের ভাগ পাবে এই নিয়ে যখন বিরোধ, সেক্ষেত্রে ইংরাজদের পক্ষে এই লাভজনক পদে ভারতীয়দের নিয়োগের কথা ভাবাই অসম্ভব ছিল। তবে ছোটখাট পদগুলিতে প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ করার নীতি গৃহীত হয়েছিল। তার কারণ এই স্বল্প বেতনের পদগুলির জন্য প্রচুর প্রার্থী পাওয়া যেত, এতে সরকার কম বেতনে প্রচুর কাজও করিয়ে নিতে পারত। এত কম বেতনে কাজ করার মত ইংরাজ কর্মচারীও সুলভ ছিল না।

ধীরে ধীরে 'ভারতীয় সিভিল সার্ভিস' সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটা সুদক্ষ এবং ক্ষমতাপন্ন শ্রেণীরূপে সংগঠিত হতে পেরেছিল। সিভিল সার্ভিসভুক্ত

কর্মচারীদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, এমন কি শাসন-নীতি নির্ধারণের সুযোগও এদের দেওয়া হত। এই সিভিল সার্ভিস পদাধিকারী-গণের কাজকর্মের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা, সততা এবং কঠোর পরিশ্রমের একটা ঐতিহ্য সৃষ্ট হয়েছিল। তবে 'আই-সি-এস্'-দের উপরোক্ত সদগুণাবলী ব্রিটিশ স্বার্থেই নিয়োজিত হ'ত, তার দ্বারা ভারত বা ভারতবাসীর কোন উপকার সাধিত হত না। ক্রমশঃ এরা একটা অহঙ্কারী, জনসম্পর্করহিত ও কঠোর মনোভাবসম্পন্ন শ্রেণীরূপে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। এরা অত্যন্ত রক্ষণশীল ও সঙ্কীর্ণমনারূপেও বিশিষ্ট হযে উঠেছিল। এদের মনে এই ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে তারা যেন ভারত-শাসনের পবিত্র অধিকার নিয়ে দেশ শাসন করতে এসেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পালন-পোষণকারীরূপে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসকে 'ইস্পাতের কাঠামো'রূপে প্রায়ই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কালক্রমে এই শ্রেণী ভারতের জাতীয় জীবনেব সর্বক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি কবেছিল। এইসব কারণে, ভারতেব ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী শক্তির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যই হয়ে উঠেছিল এই আই-সি-এস শ্রেণী।

সৈন্যবাহিনী

ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিল সামরিক বাহিনী। এদেব কাজ ছিল তিনটি। এদের সাহায্যে ভাবতীয় বাজাদেব পরাজিত করে তাদের রাজ্য দখল করা হত। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ রোধ কবার জন্যও এদের প্রয়োজন ছিল। এদেব তৃতীয় কাজ ছিল ভারতের মধ্যে কোথাও বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন করে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা। বিদ্রোহের ঘটনা অবশ্য হামেশাই দেখা যেত।

কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই বর্তমানে বিহার ও উত্তর-প্রদেশ নামে পরিচিত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হত। 1857 খ্রীষ্টাব্দে 311,400 সংখ্যক সৈন্যের মধ্যে 265,900 জনই ছিল ভারতীয়। এদের মধ্যে উচ্চ-পদস্থ 'অফিসার', সকলেই ছিল নির্ভেজাল ব্রিটিশ, অন্ততঃ কর্ণওয়ালিশের আমল থেকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে কোন ভারতীয়ের স্থান হয়নি। 1856 খ্রীষ্টাব্দে মাসিক 300 টাকার অধিক বেতন পেয়ে থাকে ভারতীয় সৈন্য বিভাগে এমন কর্মচারীর সংখ্যা ছিল মাত্র তিনজন। ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে উচ্চতম পদ ছিল সুবাদার। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর পালন-পোষণ

ব্যয়সাধ্য বলেই অনেকগুলি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী রাখতে হয়েছিল। শুধু খরচ কমাবার জন্যই এই ব্যবস্থা ছিল না, এর অন্য কারণও ছিল। ভারত জয় করার মত লোকবল ব্রিটেনের ছিল না, কাজেই ভারতীয়দেরই নিজেদের সৈন্যদলভুক্ত রাখা ছাড়া ব্রিটিশের হাতে আর কোন উপায় ছিল না। তবে এর প্রতিষেধক হিসেবে সৈন্য বিভাগের উচ্চপদগুলি সবই ইংরাজ অফিসার দ্বারা পূর্ণ করা হত। ভারতীয় সৈন্যদের বশীভূত রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হত। এছাড়া এমন কয়েকটি বাহিনী রাখা হ'ত যেগুলি শুধু ব্রিটিশ সৈন্য দিয়েই গঠিত। এতদসত্ত্বেও আজকার দিনে একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিদেশী অধিকাংশ ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় ও শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল। দুটি কারণে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। তখনকার দিনে আধুনিক কালের জাতীয়তাবোধ মোটেই জাগ্রত হয়নি। বিহার বা অযোধ্যা অঞ্চলজাত কোন সৈন্যের মনে কখনও এ চিন্তা জাগত না বা জাগা সম্ভবও ছিল না, যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষে লড়াই করে এবং তাদের হারিয়ে দিয়ে সে দেশদ্রোহিতা করছে। কাজটি যে ভারতের স্বার্থবিরোধী একথা তার মনে উঠত না। এছাড়া ভারতীয় সৈনিক শ্রেণীর মধ্যে চিরাচরিত একটা সংস্কার ছিল যে, যে তাকে বেতন দেবে তার হয়েই তাকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে লড়াই করতে হবে, এটাই তার সৈনিক-ধর্ম। এক কথায় বলতে গেলে ভারতীয় সৈন্য ছিল পয়সার ভক্ত, আর মাইনে দেওয়া বিষয়ে কোম্পানীর সুনাম ছিল, তারা সৈন্যদের নিয়মিত বেতন দিতে কার্পণ্য করত না। সমসাময়িককালে ভারতীয় নৃপতি বা সর্দারেরা সৈন্যদের নিয়মমত মাইনে দেওয়ার অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছিল।

আরক্ষা (Police)

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তৃতীয় স্তম্ভ ছিল তার আরক্ষা বিভাগ বা Police। এটাও কিন্তু অনেক কিছুর মতই কর্ণওয়ালিশের সৃষ্টি। আগে আরক্ষার দায়িত্ব ছিল জমিদারদের হাতে। জমিদারদের হাত থেকে এই দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কর্ণওয়ালিশ একটি নিয়মিত আরক্ষা বাহিনী (Police Force) গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগঠনের ভার হাতে নিয়ে তিনি ভারতে প্রচলিত 'থানা' প্রথা কিছুটা আধুনিকীকরণের পর পুনঃপ্রবর্তিত করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে খাস ব্রিটেনেও এই পুলিশ-ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত ভালভাবে গড়ে ওঠেনি। কর্ণ-

ওয়ালিশ কতকগুলি 'থানা' বা আরক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করে প্রত্যেকটি থানার দায়িত্ব একজন ভারতীয়ের হাতে ন্যস্ত করেন। প্রতিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে 'দারোগা' বলা হত। পরবর্তীকালে সমগ্র জেলাব আরক্ষা কার্যের দায়িত্ব সহ 'সুপারিনটেন্‌ডেন্ট অফ্ পুলিশ' নামে কতকগুলি পদ সৃষ্ট হয়। তবে আরক্ষা বিভাগের সব গুরুত্বপূর্ণ উচ্চবেতনযুক্ত পদগুলি থেকে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ রাখা হয়েছিল। প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের মত উচ্চপদে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। গ্রামের আরক্ষা কার্যের ভার আগের মতই গ্রাম্য-চৌকিদারের উপর ন্যস্ত ছিল, এদের বেতন গ্রামবাসীদেরই দিতে হত। নবসৃষ্ট আরক্ষা-বিভাগ ধীরে ধীরে ডাকাতির মত গুরুতর অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছিল। এই বিভাগের সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ—ঠগ্‌দের দমন। এই ঠগ্ বা ঠগীরা বাজ-পথের যাত্রী পথিকদেব সর্বস্ব অপহবণ করে তাদের হত্যা করে পলায়ন করত। বিশেষভাবে মধ্যভাবতেই এদেব আধিপত্য ছিল। বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে বড বকমের কোন প্রকাব ষড়যন্ত্রের সংগঠন দমনেও ভাবতীয় পুলিশ বাহিনীর বিশেষ তৎপরতা ছিল। জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভবকালে ভারতীয় পুলিশ বাহিনীই তা দমনের দায়িত্ব নিয়েছিল। জনসাধারণের প্রতি ভাবতীয় পুলিশের সহানুভূতির অভাব দেখা যেত। 18 3 খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টেব একটি কমিটি কোন ক্ষেত্রে পুলিশেব আচবণ সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিল "পুলিশ রাখার উদ্দেশ্য গ্রামবাসীদেব ডাকাতদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, (এক্ষেত্রে) নিরীহ গ্রামবাসীদেব উপব পুলিশ যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, তা তুলনায ডাকাতদেব অত্যাচারের থেকে কিছু কম হয়নি।" এই প্রসঙ্গে 1832 খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> "বর্তমানে একটি নিয়ম খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই আইনটি হ'ল যে চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটলে পুলিশ বিনা আহ্বানে সেখানে যাবে না। যার বাড়িতে চুরি-ডাকাতি হয়েছে সে চাইলে তবেই পুলিশ এবিষয়ে নাক গলাবে। এর সরল অর্থ হচ্ছে এই যে গ্রামবাসীদের কাছে নেকড়ে ডাকাতের চেয়ে মেষ-রক্ষক পুলিশ আরও ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হচ্ছে।"

বিচার-ব্যবস্থা

কতকগুলি দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত প্রবর্তন দ্বারা ব্রিটিশ-রাজ ভারতে এক নূতন ধরনের বিচার-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই ব্যবস্থার স্থচনা ওয়ারেণ হেস্টিংসের সময়ে হলেও 1793 খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ এটি সুসংগঠিত করেছিলেন। প্রতিটি জেলায় একটি করে দেওয়ানি আদালত (Civil Court) প্রতিষ্ঠিত হয়, এর কর্তা থাকতেন জেলা জজ। এই জেলা জজ হতেন সিভিল সার্ভিসের লোক অর্থাৎ আই-সি-এস্। কর্ণওয়ালিশ এইভাবে বিচার বিভাগীয় 'জজ' ও 'কালেক্টর'-এর পদ দু'টি পৃথক করে দেন। 'আপিল' বা উত্তর-বিচারের জন্য চারটি প্রাদেশিক আদালত ছিল এবং তারও পরের ধাপ ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। জেলা আদালতের অধীনে ছিল রেজিস্ট্রারের আদালত, এই রেজিস্ট্রার পদগুলিও ছিল ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত। তার নীচে কয়েকটি আদালত থাকত, এগুলিতে, বিচারভার অবশ্য ভারতীয়দের উপর ন্যস্ত থাকত। এই পদাধিকারীদের মুন্সেফ ও আমীন বলা হত। অপরাধ-সংক্রান্ত বা ফৌজদারী মামলার জন্য কর্ণওয়ালিশ বেঙ্গল বা বাংলা প্রেসিডেন্সিকে চার ভাগে ভাগ করে, সেখানে একটি করে বিভাগীয় আদালত (সার্কিট কোর্ট) স্থাপন করেন। এই কোর্টগুলি ছিল এক একজন সিভিল সার্ভিসভুক্ত তথা ইউরোপীয় বিচারপতির অধীন। এই আদালত-গুলির অধীন আরও অনেক ছোটখাট আদালত ছিল। এইগুলিতে বিচার-ভার ছিল ভারতীয় বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর। এরা ছোটখাট মামলার বিচার করতেন। কোর্ট অফ্ সার্কিট বা বিভাগীয় বিচারালয়ের মামলার উত্তর-বিচারের (আপীল) দায়িত্ব ছিল সদর নিজামত আদালতের উপর। ফৌজদারি আদালতে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট অপরাধ-সংক্রান্ত আইন কিছুটা সংশোধিত করে নিয়ে তদনুসারে বিচার হত। অপরাধীর শাস্তি বিষয়ে এই নিয়মগুলি অবশ্য কিছু সহৃদয়তার সঙ্গে প্রয়োগ করা হত। মুসলিম অপরাধ-সংক্রান্ত আইনে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদেরও বিধান আছে। অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি বিধানগুলি অবশ্য সংশোধিতরূপে প্রয়োগ করা হত। দেওয়ানি আদালতগুলিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। 1833 খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক পূর্বসৃষ্ট চারটি প্রাদেশিক 'আপীল' ও 'সার্কিট' আদালত তুলে দিয়ে প্রথমে এই বিচারভার বিভাগীয় কমিশনদের উপর ন্যস্ত করেন। কিছু পরে জেলার

অমীমাংসিত মামলার উত্তর-বিচারের (আপীল) ভার জেলার জজ ও জেলার কালেক্টরদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বেন্টিঙ্ক বিচার-সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতীয়দের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাব্ জজ, মুখ্য সদর আমীন প্রভৃতি চাকুরীতে ভারতীয়দের চাকুরীর সুযোগও তিনি করে দিয়েছিলেন। 1865 খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত তুলে দিলে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ হাইকোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকার নিজস্ব প্রণালীতে দেশে নূতন ধরনের এক আইনব্যবস্থা প্রচলন করেছিল। কিছু আইন রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে বিধিবদ্ধ হয়েছিল আবার দেশে প্রচলিত কিছু আইনও সময়োপযোগীরূপে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছিল। এর পূর্বে বিচার-ব্যবস্থা ভারতের চিরাচরিত প্রথানুযায়ীই বলবৎ ছিল। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র, ইসলামী শরিয়ৎ অথবা রাজকীয় নির্দেশ —এইগুলির সমন্বয়ে গঠিত আইনই ছিল প্রথাসিদ্ধ। সাধারণভাবে এই প্রথা-সিদ্ধ আইনগুলি যথাসম্ভব বজায় রেখে ভারতের ব্রিটিশ রাজ ধীরে ধীরে একটি নূতন ধরনের আইনের কাঠামো দাঁড় করিয়েছিল। কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ সূচক নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল আবার প্রচলিত কিছু আইন যুগোপ-যোগী সংস্কার করে নূতনভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। 1833 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ চার্টার য়্যাক্টের কল্যাণে গভর্নর-জেনারেলের ভারতের উপর আইন প্রণয়নের অধিকার ন্যস্ত হয়েছিল। গভর্নর-জেনারেল দেশের আইন প্রণয়নের কর্তা, এর অর্থ এই দাঁড়িয়েছিল যে ভারতবাসীকে অতঃপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মনুষ্যকৃত আইনের দ্বারা শাসিত হতে হবে তা সেটা ভালই হ'ক বা মন্দই হ'ক। এর আগে আইনের অর্থ ছিল শাস্ত্র নির্দেশ। এই শাস্ত্রের পেছনে ঈশ্বরিক সমর্থন আছে তা অবশ্য পালনীয়, এই ছিল ভারতবাসীর বিশ্বাস। এখন অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে তারা মনুষ্য-রচিত আইন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

1833 খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার লর্ড মেকলের নেতৃত্বে একটি আইন-কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনকে ভারতে ব্যবহার্য আইনসমূহ সংহিতা (Code) আকারে লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল। ল' কমিশনের চেষ্টার ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন (Penal Code) প্রণীত হয়। এছাড়াও এই ল' কমিশন পশ্চিমী ধাঁচের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারপদ্ধতি প্রভৃতি

আইনগ্রন্থ বা কোড্ তৈরী করেছিলেন। অতঃপর সমগ্র দেশের জন্য একই ধরনের আইন প্রচলনের ব্যবস্থা হয়। দেশব্যাপী আদালতগুলিতে এই বিধিবদ্ধ আইন ও বিচারপ্রণালী অনুযায়ী বিচার-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। এক কথায় বলা যায় যে বিচার-ব্যবস্থা সূত্রে ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড রূপ পেয়েছিল।

আইনের শাসন

আইন মেনে চলার ধারণাটি ব্রিটিশ রাজই ভারতে প্রবর্তন করেছিল। এর অর্থ ছিল এই যে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা অন্ততঃ নীতির দিক দিয়ে আইন অনুযায়ীই পরিচালিত হবে। এই আইনগুলিতে প্রজাদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। যারা শাসনের ভারপ্রাপ্ত তাদের খেয়ালখুসী মত চলার পথ খোলা রাখা হয়নি। অর্থাৎ প্রজার অধিকার বা কর্তব্য কি সেটা আইনেই পূর্বনির্দিষ্ট হয়েছিল, কোন শাসকের সেটা পরিবর্তনের অধিকার ছিল না। 'আইনের শাসন' নীতিগত-ভাবে খাতা-পত্রে চালু থাকলেও বাস্তবের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র ও পুলিশ যথেচ্ছ ক্ষমতা ভোগ করত এবং প্রজার অধিকার ও তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করত। ব্রিটিশ রাজের 'আইনের শাসন-নীতি' অনুসারে কোন রাজকর্মচারী তার কর্তব্য পালন না করলে অথবা তার ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করলে তাকে আদালতে অভিযুক্ত করা যেতে পারত। 'আইনের শাসননীতি' বহুলাংশে কোন একজন মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচস্বরূপ ছিল। এটা অবশ্য সত্য কথা যে আগের দিনে যাঁরা ভারতের শাসনকর্তা ছিলেন তাঁরা পূর্বাচরিত নীতি ও প্রথাগুলি মেনে নিয়েই শাসনকার্য পরিচালন করতেন। কিন্তু শাসনকার্যের প্রয়োজনে এঁরা যেকোন ধরনের কাজ করতে পারতেন, তাঁদের কোন আইন মেনে চলতে হত না। তাঁদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন কাজের জন্য তাঁদের কারো কাছে দায়ী থাকতে হ'ত না। এঁদের কাজকর্ম ন্যায় কি অন্যায় এটা বিচার করার মত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ভারতীয় রাজা-নবাব শ্রেণীর লোকেরা ক্ষমতার আসনে বসে যা খুসী তাই-ই করতে পারতেন। ব্রিটিশ রাজত্বে অবশ্য শাসনব্যবস্থা আইনমাফিকই চলেছিল। তবে আইনের ব্যাখ্যা আদালতের দ্বারাই নির্ধারিত হ'ত। এইগুলিতে অনেক সময় ফাঁক থেকে যেত, কারণ যারা শাসিত তাদের মতামত নিয়ে এইগুলি প্রণীত হয়নি। এইগুলি ছিল বিদেশী শাসকদের দ্বারা

প্রণীত আইন। প্রশাসক শ্রেণী (সিভিল সার্ভেন্টস্) ও পুলিশ বিভাগের হাতে ব্রিটিশের আইন প্রচুর ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিল। তবে বিদেশী শাসনের আওতায় তাদের প্রণীত আইন সর্বতোভাবে গণ-সম্মত হওয়া সম্ভব ছিল না।

আইনের নিরপেক্ষতা

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতের বিচার বা আইন-ব্যবস্থা 'আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান' এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ছোট বড় সবাইকে এক আইন মানতে হবে, আইন ভঙ্গ করলে সে রাজা-প্রজা যাই হোক না কেন তাকে সাজা পেতে হবে। অপরাধী কোন শ্রেণীভুক্ত, কি তার ধর্ম, সে কোন জাতিভুক্ত এর নিরিখে বিচার চলবে না, বিচার হবে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী—এই ছিল ব্রিটিশ প্রচলিত আইনের দৃষ্টিভঙ্গি। আগেকার দিনে বিচার-ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট পক্ষের জাতিবিচার মানা হত, উচ্চবংশ-নীচবংশজাত ভেদাভেদও গণ্য ছিল। একই অপরাধে অভিযুক্ত ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে শাস্তির তারতম্য ঘটত। ব্রাহ্মণের শাস্তি ছিল কম, অব্রাহ্মণের বেশী। আবার জমিদার বা অভিজাতশ্রেণীর মানুষকে যে অপরাধে লঘুদণ্ড দেওয়া হ'ত, সাধারণ একজন মানুষকে সেই অপরাধের জন্য গুরুতর দণ্ড ভোগ করতে হত। এমন কি বহুক্ষেত্রে ধনী বা প্রভাবশালী উচ্চ জাতিভুক্তদের অপরাধী হিসেবে অভিযুক্তই করা হত না। ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইনে দীনতম ব্যক্তিকেও আদালতে বিচার প্রাপ্তির সুযোগ অর্পিত হয়েছিল।

উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সুবিচার প্রাপ্তি ব্যবস্থার মত একটি অতি উচ্চ আদর্শ-পূর্ণ এই ব্রিটিশ নীতির মধ্যে কিন্তু একটি বিশেষ ত্রুটি বা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় বা ইউরোপীয় বংশজাত ব্যক্তিদের জন্য পৃথক কোর্ট বা বিচারালয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এদের জন্য পৃথক আইনও ছিল। ফৌজদারি বা অপরাধমূলক কোন মামলায় শুধুমাত্র ইউরোপীয় বিচারকদের উপরই এদের বিচারের ভার ন্যস্ত হ'ত, কোন দেশীয় বিচারকের উপর এদের বিচারের অধিকার দেওয়া হয়নি। বহু ইংরাজ রাজকর্মচারী, সামরিক কর্মচারী, বাগিচা মালিক ও বণিক্ ভারতীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত। অনেক সময় এদের আচরণে রূঢ়তা ও পাশবিকতা দেখা যেত। এদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে, বাঁকাপথে এদের বাঁচাবার চেষ্টা করা হ'ত। এর ফলে ইউরোপীয় বিচারপতিদের বিচারে এরা বেকসুর খালাস পেয়ে যেত। সাজা যদি বা হত তবে তা অপরাধের

তুলনায় খুব লঘুই হত। এর ফলে, প্রায়ই দেখা যেত যে ইউরোপীয় বনাম ভারতীয় বিরোধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুবিচার ঘটত না।

আইনের বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে আর এক ধরনের বিচার-বৈষম্যের উদ্ভব দেখা দিয়েছিল। সুবিচার লাভ একটা বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। আদালতে বিচারপ্রার্থীকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা 'কোর্ট ফি' দিতে হত। নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য মোটা পারিশ্রমিকে এক বা একাধিক আইনজীবী নিযুক্ত করতে হত, সাক্ষীদের যাওয়া-আসা, খাওয়ার খরচ ইত্যাদিও বিচারপ্রার্থী বা অভিযোগকারীকে যোগাতে হত। বিচারালয়গুলি ছিল গ্রাম-গঞ্জ থেকে বহুদূর সহরে অবস্থিত। আদালতে মামলাগুলির নিষ্পত্তি হতে বহুদিন সময়ও লাগত। আইনের মধ্যে বহু মারপ্যাঁচ থাকত, যেগুলি নিরক্ষর ও নির্বোধ সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যেত যে ধনী ব্যক্তিরা টাকাপয়সার সাহায্যে আইন এবং আদালত দুই-ই হাত করে নিয়ে মামলায় জয়লাভ করত। এই কারণে কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে তার নামে আদালতে নালিস করার ভয় দেখালে তাকে দিয়ে যেকোন অভীষ্ট কাজ করিয়ে নেওয়া যেত। কারণ সে বুঝত যে তার নামে কেউ নালিশ করলে তাকে বাঁচবার জন্য পর পর ধাপে ধাপে ছোট আদালত থেকে বড় আদালত বা হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে হবে। আত্মরক্ষার জন্য উকীল ব্যারিস্টারের খরচ সে কি করে জোটাবে? আর সে নিজের কাজ ছেড়ে মামলা করার মত অত সময়ই বা কি করে দিতে পারবে। মামলা লড়ে কপর্দকশূন্য হয়ে যাওয়ার চেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি ভীতি প্রদর্শনকারীর কাছে আত্মসমর্পণই শ্রেয়ঃ মনে করত। পুলিশ ও প্রশাসন বিভাগে ব্যাপক দুর্নীতি থাকার জন্য দরিদ্র ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে ন্যায়বিচার লাভ চরম দুরূহ ছিল। সরকারী কর্মচারীগণ প্রায়শঃই ধনী ব্যক্তিদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করত। জমিদারগণ প্রজাদের উপর অত্যাচার করত এবং তারা সরকারী শাসনের ভয় করত না কারণ সরকারী প্রশাসনযন্ত্র তাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই থাকত। ব্রিটিশ-শাসন প্রবর্তনের পূর্বে দেশে যে বিচার-ব্যবস্থা ছিল তা ছিল খুবই সরল। খুব তাড়াতাড়ি এবং অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে লোকে সুবিচার পেত। ব্রিটিশ আমলের নবগঠিত বিচার-ব্যবস্থা—আইনের চোখে সবাই সমান এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবারই সুবিচার পাওয়ার অধিকার আছে এই মহান নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিক

শক্তি অথবা মুনি-ঋষিদের নির্দেশে এই আইনগুলি প্রণীত হয়নি। যুক্তিনির্ভর এই আইনগুলি ছিল উদার-মানবতা বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ প্রবর্তিত এই আইন অথবা বিচার-ব্যবস্থা বাস্তবে বেশ ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়েছিল। কারণ সুবিচারের আশায় আইন-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ প্রচুর অর্থব্যয় ও সময় সাপেক্ষ হয়ে উঠেছিল।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতি

ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশজাতির শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখার উদ্দেশ্যে সুশৃঙ্খল ও সুরক্ষিত একটি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল—এই আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। 1813 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবাসীর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করাই ছিল ভারতে অনুসৃত ব্রিটিশ নীতি। কিন্তু 1813 খ্রীষ্টাব্দের পর ব্রিটিশ শাসককুল ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে নব নব ভাবধারা ও নব নব শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিল্প-বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত শিল্পপতি ধনিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। ধনতন্ত্রবাদের এই বিকাশ ব্রিটিশ সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। উদীয়মান এই শিল্পপতি গোষ্ঠী ভারতবর্ষকে তাদের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করতে চেষ্টিত হয়েছিল। শুধুমাত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখলেই ভারতে তাদের কারখানায় প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যগুলি কাটতি হবে না, এটা তারা বুঝেছিল। ভারতবাসীর সামাজিক জীবনের রূপান্তর তথা আধুনিকীকরণ না হলে ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্য তারা ব্যবহার করবে না এটা নিশ্চিত ছিল। আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ভারতবাসীর কাছেই তাদের মালের চাহিদা হবে, ভারতবাসী প্রাচীন জীবনধারায় অভ্যস্ত থাকলে তাদের প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের বাজার গড়ে উঠবে না, এই ছিল শিল্পপতিদের বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক টমসন ও গ্যারেট মন্তব্য করেছেন "আগেকার দিনের চড়াও হয়ে রাহাজানির ধারা-ধরনই শুধু বদলে ছিল। এই রাহাজানির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল ভারতে আধুনিক শিল্প বিস্তার ও ধনতন্ত্র।"

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেন তথা ইউরোপে নব নব চিন্তাধারার উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই নবজাগরণের প্রভাব ভারতের প্রতি

ব্রিটিশের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। সমগ্র ইউ-রোপ জুড়ে মানুষের মতিগতি, আচার-আচরণ ও নৈতিকতার মান তখন বদলে যাচ্ছিল। 1789 খ্রীষ্টাব্দের স্মরণীয় ফরাসী বিপ্লব সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীন-তার বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে মানুষের মনে গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কালের জাতীয়তাবোধও জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। চিন্তা জগতে নূতন নূতন চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছিল। এই নব ভাবধারার প্রবক্তা ছিলেন বেকন, লক্, ভল্টেয়ার, রুশো, কাণ্ট, এডাম স্মিথ এবং বেন্থাম। সাহিত্যের জগতে নূতন বাণীর সন্ধান এনেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বাইরণ, শেলী ও চার্লস ডিকেন্স প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই চিন্তা-জড়তা পাশ-ছেদন বা বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবের প্রসাদেই আবির্ভূত হয়েছিল। এই নব ভাবধারার তরঙ্গ স্বাভাবিক কারণেই ভারত-বর্ষেও এসে পৌঁছেছিল। ভারতের ব্রিটিশ শাসককুলকেও এটা স্পর্শ করেছিল। বিবেকরহিত শাসনদণ্ড সঞ্চালনের অনৈতিকতা তারাও কিছু কিছু উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

ইউরোপের নব জাগ্রত চিন্তাধারা তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত ছিল। এই নূতন ভাববাদের প্রথম ধারা ছিল যুক্তিনির্ভরতা। অর্থাৎ মানুষ যুক্তি মেনে চলবে এবং সে হবে বিজ্ঞান-মনস্ক। দুই, মানবিকতা, অর্থাৎ মানুষকে তার সকল কাজে অপর মানুষের সহমর্মী হতে হবে, এক কথায় তাকে মানবিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তিন, যেকোন মানুষ বা জাতি উন্নতি করতে সক্ষম এই বিশ্বাস মনে পোষণ করতে হবে। যুক্তিনির্ভরতা ও বিজ্ঞান-মনস্কতার ব্যাখ্যা এই যে মানুষের বুদ্ধি দিয়ে বাস্তব জীবনে যেটা রূপায়িত করা যায় সেইটাই ধ্রুব-সত্য। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপুল শিল্পদ্রব্যোৎপাদন ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছিল যে মানুষের বুদ্ধি বা যুক্তিনির্ভরতা কতদূর শক্তিশালী হতে পারে। নব ভাববাদের মানবিকতা-বোধের ভিত্তি ছিল যে প্রতিটি মানুষ স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং তার একটি অভীষ্ট আছে। নব ভাববাদের শিক্ষা ছিল প্রতিটি মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে। একজন মানুষের অস্তিত্ব শুধু অপর এক মানুষের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত থাকবে তার নিজের সুখ-দুঃখ বলে কিছু থাকবে না—নব চিন্তাধারায় ব্যক্তিমানুষের এই স্বার্থবোধ নিন্দিত হয়েছিল।

এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, উদারতা সমাজতন্ত্র প্রভৃতি মত-

বাদের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। নবভাববাদের উন্নতি সম্পর্কিত মতবাদের বক্তব্য এই ছিল যে, যে কোন সমাজ কালের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত হবে। কোন কিছু চিরকাল একইভাবে থাকেনি এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। এই চিন্তাধারার প্রবক্তারা আরও বিশ্বাস করতেন যে যুক্তি ও নৈতিকতার সাহায্যে প্রকৃতি ও সমাজকে নূতন করে গড়ে তোলার মত সামর্থ্য মানুষের আছে।

ইউরোপের এই নবীন চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারার একটা সংঘাত বেধেছিল। ভারত-শাসনের নীতি যাঁরা নির্ধারণ করতেন এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারত-শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে নব্যপন্থী ও প্রাচীনপন্থী দুদলেরই লোক ছিলেন। প্রাচীনপন্থী বা রক্ষণশীল দল ভারতের শাসননীতি যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। পূর্ববর্তীকালে এই রক্ষণশীল মনোভাবের প্রতিভূ ছিলেন ওয়ারেণ হেস্টিংস ও প্রসিদ্ধ লেখক এবং পার্লামেণ্ট সদস্য এড্‌মণ্ড বার্ক। পরবর্তী সময় এই রক্ষণশীল মনোভাবের ধারক ও বাহক ছিলেন ভারত-শাসক গোষ্ঠীর মনরো, ম্যালকম, এল্‌ফিনস্টোন্ ও মেটকাফ্। রক্ষণশীল দল অবশ্য এটা স্বীকার করতেন যে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতা পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন হলেও ভারতের সভ্যতা ইউরোপের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। এঁদের অনেকে ভারতের দর্শন এবং সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। পাশ্চাত্যদেশীয় কিছু চিন্তা ও প্রথা ভারতে প্রচলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে এঁরা ধীরে ধীরে ও সতর্কতার সঙ্গে এগুলি কার্যকর করার কথা ভেবে রেখেছিলেন। ভারতের সামাজিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করে তাড়াহুড়ো কোন কর্মধারা অনুসরণ করার এঁরা বিরোধী ছিলেন। তাড়াতাড়ি ও ব্যাপকভাবে কোন সমাজ-সংস্কারের কাজ প্রবর্তন করতে গেলে দেশে একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনার আশঙ্কা এঁদের মনে জেগেছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান কাল পর্যন্ত ভারতে এমন কি খাস ইংল্যাণ্ডে রক্ষণশীল ধ্যানধারণার প্রভাবই বেশী ছিল। বস্তুতঃ ভারত-শাসনে নিযুক্ত অধিকাংশ ইংরাজ-কর্মচারী রক্ষণশীল মনোভাবের মানুষ ছিলেন। ব্রিটেনে যাঁদের উপর ভারতে ব্রিটিশ নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল তাঁদের মধ্যে কিন্তু এই রক্ষণশীলতা সমর্থকদের সংখ্যা যথেষ্ট কমে এসেছিল। এর একটা কারণ ছিল এই যে, কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে এই রক্ষণশীলতার নীতি ভারতে ব্রিটেনের বাণিজ্য-বিস্তার ও প্রভুত্ব বজায় রাখার পক্ষেও অনুকূল নয়।

1800 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রক্ষণশীল নীতির সমর্থকদের অন্য একদল রাজনৈতিক পুরুষদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রবক্তারা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণের পরিবর্তে ঘৃণার মনোভাব পোষণ করতেন। ভারতে প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথাগুলি এদের কাছে ছিল বর্বরতার নিদর্শন। ভারতীয় সংস্কার ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে এঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত ও পচনশীল বলে মনে করতেন। ভারতীয় চিন্তাধারা এঁদের কাছে ছিল অবৈজ্ঞানিক ও সঙ্কীর্ণ-চিত্ততার নিদর্শন। ব্রিটেনের সরকারী কর্মচারী, লেখক ও রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে অনেকেই এই মতের সমর্থক ছিলেন। ভারতের উপর ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব যে ন্যায়সঙ্গত এটা লোকসমক্ষে তুলে ধরাই ছিল এই মত প্রচারের উদ্দেশ্য। ভারত এক অসভ্য দেশ ও ভারতীয়েরা কুক্রিয়াসক্ত, এদের নিজেদের উন্নতি করার কোন সাধ্য নেই অতএব ব্রিটিশ এদের উপর চিরকাল প্রভুত্ব করে যাবে—এঁরা এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই দলের অস্তিত্ব সত্বেও প্রগতিশীল এক শ্রেণীর মানুষ এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে দেখা দিয়েছিলেন যাঁরা ব্রিটেনের এই সাম্রাজ্যবাদী ও সঙ্কীর্ণ মনোভাবের বিরোধিতা করতেন। এঁরা পশ্চিম জগতের নবজাগ্রত প্রগতিশীল মানবতাবোধ ও যুক্তিবাদের সাহায্যে ভারতের পরিস্থিতি বিচার করে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। যুক্তিবাদের আলোকে এঁরা বুঝেছিলেন যে ভারতের অবস্থা যতই অবনত থাকুক না কেন সে চিরকাল অবনত থাকতে পারে না কারণ যেকোন সমাজ যুক্তিনির্ভরতা ও বিজ্ঞান-মনস্কতার সহায়তায় উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার সামর্থ্য অর্জনে সক্ষম। মানবতা-বোধ নীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ এই শ্রেণীর মানুষেরা আন্তরিকভাবে ভারতীয় জনগণের অবস্থার উন্নতি হোক এই ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করতেন। উন্নতিশীলতার নীতিতে বিশ্বাসী ইংল্যাণ্ডের এই শ্রেণীর মানুষের মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে ভারতবাসী একদিন না একদিন উন্নত অবস্থার মুখ দেখবে। এই র‍্যাডিকাল বা প্রগতিবাদী গোষ্ঠী ছিলেন ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনের উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর মানুষ। এঁরা ভারতকে বিজ্ঞান-মনস্ক, মানবতাবাদী ও উন্নতিশীল বিশ্বের অংশীদাররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তদানীন্তন ভারতের প্রচলিত সামাজিক অবিচারসমূহ যথা জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ, অবাঞ্ছিত শিশু হত্যা, নারীজাতি বিশেষতঃ বিধবাদের হীন অবস্থা প্রভৃতি

এই প্রগতিশীল গোষ্ঠীর চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। ভারতের সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল কুসংস্কারসমূহ এবং যুক্তিবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী এঁদের বিজ্ঞান-চেতন মনকে বিচলিত করে তুলেছিল। এঁদের বিশ্বাস ছিল এই যে পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের প্রচারে ভারতের অজ্ঞানতা দূর হবে। এক কথায় ভারতের উন্নতির জন্য প্রয়োজন ভারতের দ্রুত এবং সর্বাঙ্গীণ আধুনিকীকরণ। এই প্রগতিপন্থী চিন্তাবিদ্‌দের সামনে ব্রিটিশের ভারত-শাসন নীতিকে পরিবর্তিত বা প্রভাবিত করার একটা সুযোগ এসে পড়েছিল। তখনকার ইংল্যাণ্ডের প্রগতিশীল চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জেমস্ মিল্ 1817 খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর দপ্তরে (Office of the Court of Directors) একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন। এটি ছিল প্রধান পরীক্ষকের (Chief Examiner) পদ। তাঁরই দলভুক্ত আর একজন উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক 1829 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদ লাভ করেছিলেন। 1820 খ্রীষ্টাব্দ বা তার পরে এই দলভুক্ত অনেকেই রাজকর্মচারীরূপে ভারতে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। 1830 খ্রীষ্টাব্দের পর ইংল্যাণ্ডে যে 'হুইগ' গোষ্ঠী শাসনক্ষমতা লাভ করেছিল তাদের নীতিই ছিল প্রগতিবাদ ও সংস্কার।

তবে এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, পূর্বোক্ত সৎ ও জনহিতৈষী মনোভাবসম্পন্ন ইংরাজদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে এঁদের যে শক্তি ছিল, ব্রিটিশের ভারত-শাসন নীতির পরিবর্তন সাধনের সামর্থ্য তার ছিল না, এঁরা শুধু প্রস্তাব করতে বা প্রতিবাদ জানাতে পারতেন। ভারতের ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদী ও শোষণধর্মী চরিত্র এঁরা বদলে দিতে সমর্থ হননি। ব্যবসায়িক স্বার্থ ও মুনাফা শিকার ব্যবস্থার কোন ক্ষতিসাধন করবে না, এমন কোন নূতন প্রস্তাব বিবেচনা করতে শাসকগোষ্ঠীর অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু যখনই এমন কোন প্রস্তাব আসত যদ্দারা তাদের লাভের অঙ্ক কম পড়ার আশঙ্কা আছে, সেই প্রস্তাব তারা তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিত। ভারতবর্ষের ধনসম্পদ লুণ্ঠনের সহায়তা করবে এমন কোন আধুনিকীকরণে তাদের আপত্তি থাকত না, বরং আগ্রহই প্রকাশ পেত। ইংরাজ রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই চাইত যে ভারতকে এমনভাবে আধুনিক অবস্থার উপযোগী করে তোলা হ'ক যদ্দারা তারা ব্রিটেনে উৎপন্ন পণ্যসম্ভার ব্যবহারে আকৃষ্ট হবে

এবং বিদেশীর দাসত্ব বিনা বাধায় মেনে চলবে। ঘটনাচক্রে অবশ্য দেখা গিয়েছিল যে প্রগতিপন্থীরূপে পরিচিত অনেকেই ব্রিটিশের ভারতনীতির আলোচনা কালে তাঁদের ঘোষিত মতবাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। ভারতে জনগণ-সম্মত শাসন প্রবর্তনের পরিবর্তে এঁরা ভারতে ব্রিটিশের জবরদস্ত শাসনপ্রণালীরই সমর্থন করতেন। পিতা যেমন দুর্বল শিশুকে পালন-পোষণ করে, এঁরা ব্রিটিশের ভারত-শাসনকে সেই চোখে দেখতে ও দেখাতে চাইতেন। এই জবরদস্ত শাসনের ঘৃণিত দিক্‌টি এঁরা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতেন। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল এই পিতৃতন্ত্রের পৃষ্ঠ-পোষক ও সমর্থক ছিল। এরা চাইত পিতা যেমন শিশুকে সংসারের কাজ-কর্ম করতে দেয় না, ব্রিটিশ জাতিও তেমনিভাবে ভারত-শাসন চালিয়ে যাবে, ভারতবাসী কখনও নিজ দেশের শাসনব্যবস্থার অংশীদার হবে না। তথা-কথিত প্রগতিবাদীরাও বহুক্ষেত্রে এই রক্ষণশীলদের সঙ্গে সুরে সুর মেলাতেন এটাই ছিল আশ্চর্যের বিষয়। ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের সামনে সমস্যা ছিল এই যে, ভারতের সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণ বাস্তবে রূপায়িত হলে এর ফলে এমন কতকগুলি শক্তি বা মানসিকতার অভ্যুদয় ঘটবে, যেগুলি ব্রিটিশ স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্যকর হবে এবং পরিণামে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান সাধন করবে। এদিকে ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনেই কিছু আধুনিকীকরণ অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই দোটানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে শাসকগোষ্ঠী একটা মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছিল। তারা আংশিক-ভাবে ভারতের আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা সাধন করে বাকী ক্ষেত্রগুলিতে আধুনিকীকরণের পথ রুদ্ধ অথবা নিষিদ্ধ করেও রেখে দিয়েছিল।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক উইলবার ফোর্স, চার্লস গ্রাণ্ট প্রভৃতি ইংরাজদের বেশ উৎসাহ ছিল। গ্রাণ্ট ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি। এঁরা সকলেই ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এঁরা ভারতের প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে হীনচক্ষে দেখতেন, তবে কারণটা ছিল ভারতের ধর্মীয় মত। এঁদের দৃঢ়বিশ্বাস এই ছিল যে খ্রীষ্টধর্মই বিশ্বের একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্ম, বাকী ধর্মগুলি অসার। ভারতীয় ধর্মগুলির সমর্থকরা জড়োপাসক, নাস্তিক এমন কি অর্ধ-বর্বর। এঁরা ভারতকে পশ্চিমী ধরনে

গড়ে তোলার কর্মসূচির সমর্থক ছিলেন কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে এই উপায়ে ভারতবাসীকে খ্রীষ্টধর্মের ছত্রছায়ায় এনে ফেলা যাবে। এঁদের আরও বিশ্বাস ছিল যে পশ্চিমী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় লাভের পর ভারতের মানুষ নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য হারাবে, এবং অতঃপর এরা সানন্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এঁরা ভারতে আধুনিক ধরনের স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে প্রগতিপন্থীদের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা একযোগে ভারতে পাশ্চাত্য ভাবধাবা প্রচারের কাজে নামলেও খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা প্রগতিপন্থীদের বেশ সন্দেহের চোখে দেখত। তার কারণ প্রগতিপন্থীদের যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মশাস্ত্রগুলিই শুধু অশ্রদ্ধেয় ছিল না, খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রের প্রতিও তাদের অনাস্থা প্রকাশিত হত। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক এইচ্. এইচ্. উড্ওয়েল লিখেছেন "পাশ্চাত্যধারায় শিক্ষিত ভাবতবাসীর মনে তাদের দেবদেবীগণ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে তাদের নিজেদেব ধর্মবিশ্বাস অবশ্যই শিথিল হয়েছিল তবে সেই সঙ্গে তাদের মনে বাইবেলের এবং এতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ জেগে উঠেছিল।" খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক মিশনারী সম্প্রদায়ও ভারতে ব্রিটিশের রক্ষণাবেক্ষণমূলক শাসননীতির সমর্থক ছিল। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের স্থায়িত্ব ও আইনশৃঙ্খলার সুস্থিতি তাদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পক্ষে সহায়ক হবে। এই মিশনারীগণ ব্রিটিশ ব্যবসায়ী এবং পণ্যদ্রব্য উৎপাদকদের কাছ থেকেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য সাহায্য চাইত। এদের বক্তব্য ছিল যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ভারতীয়গণ ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যগুলির বেশ ভাল খরিদ্দার হয়ে উঠবে।

সংস্কারপন্থী বা প্রগতিপন্থী ইংরাজগণ রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর মত চিন্তাসম্পন্ন অন্যান্য ভারতীয় ব্যক্তিদের প্রভূত সমর্থন লাভ করেছিলেন। এই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে দেশ ও দেশের সমাজ যৎপরোনাস্তি হীনাবস্থায় পতিত হয়ে আছে। এঁরা জাতিভেদ এবং অনুরূপ সামাজিক কুপ্রথাগুলিকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। এঁদের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে বিজ্ঞান-চেতনা ও মানবিকভাবোধের উপরই ভারতের মুক্তির সম্ভাবনা নিহিত আছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এঁদের চিন্তাধারা ও কাজকর্মের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

গভর্নমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া (ভারত সরকার) খুব ধীরে ধীরে এবং সতর্কতার সঙ্গে ভারতের আধুনিকীকরণের কাজে অগ্রসর হয়েছিল, একেবারে আমূল পরিবর্তন তাদের অভীষ্ট ছিল না। এর অন্যতম কারণ, ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অধিকাংশই ছিলেন রক্ষণশীল স্বভাবের মানুষ। এই কর্মচারীদের মনে এই আশঙ্কাও জেগেছিল যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক প্রথার নড়চড় হতে পারে সরকারের পক্ষে এমন নীতি বা কাজ ভারতবাসীকে বিক্ষুব্ধ করবে এবং বিদ্রোহ ডেকে আনবে। এঁদের মধ্যে প্রগতিবাদী কর্মচারীগণও রক্ষণশীলদের মতই সাবধানী পদক্ষেপের পক্ষপাতী হয়ে পড়তেন কারণ রক্ষণশীলদের মতই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা ও আবহমানতা এঁদেরও অভীষ্ট ছিল। ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে অন্য উচ্চচিন্তা বিসর্জন দিতে এঁদের মনে কোন কুণ্ঠা জেগে উঠত না। কার্যক্ষেত্রে 1858 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সরকারী পক্ষ থেকে সংস্কারমূলক আধুনিকীকরণের কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই সময় থেকে বুঝে গিয়েছিল যে ভারতবাসীগণ শিক্ষার্থী হিসেবে বেশ এগিয়ে গিয়েছে, এরা নিজেরা নিজেদের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে নিজেদের সমাজসংস্কারে মন দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এরা এখন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে বর্তমান সভ্যতাসম্মত শাসনব্যবস্থারও দাবি তুলছে।

মানবতাবাদী সংস্কার

সরকারীভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করেনি, কাজেই দেশ যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে গিয়েছিল। তবে এবিষয়ে তাদের এক বিরাট পদক্ষেপ তথা কৃতিত্ব হল—সতীদাহ নিরোধ। 1829 খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এই প্রথা নিষিদ্ধই শুধু করেননি, সতীদাহে প্ররোচনা দান বা সহায়তা করাও গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে ঘোষণা করেছিলেন। মৃত স্বামীর চিতায় তার জীবিত স্ত্রীকে দাহ করে ফেলাই ছিল সতীদাহ প্রথা। এর আগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই কুপ্রথা দূর করতে কোন উৎসাহ দেখায়নি। তাদের এই আশঙ্কা ছিল যে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে গেলে তারা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরাগভাজন হবে। রামমোহন এবং তাঁর মত সুশিক্ষিত কিছু নেতা ও খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অক্লান্ত আন্দোলনের চাপে সরকারী পক্ষ এই ঘৃণিত প্রথার অবসান করে একটা মানবিক দৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোগ নিয়েছিল। অতীতে আকবর ও আওরঙ্গজেব এবং

জয়পুরের জয়সিংহের মত অনেক ভারতীয় নৃপতি এই সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা সফলকাম হতে পারেননি। শুধুমাত্র বাংলাদেশে 1815 থেকে 1818 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আটশত সতীদাহের ঘটনা ঘটেছিল। সতীদাহ প্রথার সমর্থক রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও কঠোর হস্তে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে দিয়ে বেন্টিঙ্ক সৎসাহস ও হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, এজন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসার্হ।

ভারতের আর একটি সামাজিক কলঙ্ক ছিল জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতীয় শিশুহত্যা। এই কুপ্রথা রাজপুত জাতির কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কোন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। এইসব অঞ্চলে বিবাহযোগ্য পুরুষের সংখ্যা কম ছিল, বহু যুবক দেশে অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে অংশ নিতে গিয়ে প্রাণ হারাত, তাছাড়া উষর বা অনুর্বর এইসব অঞ্চলে নিদারুণ খাদ্যসমস্যাও ছিল। এইসব অঞ্চলে পণপ্রথা প্রচলিত থাকায় দরিদ্র ব্যক্তিদের কন্যার বিয়ে দিতে সর্বস্বান্ত হতে হত। মেয়ের বিয়ে দেওয়া অসম্ভব, এই কারণে স্ত্রী-শিশুকে জন্মমাত্র মেরে ফেলার কু-রীতি প্রচলিত হয়ে উঠেছিল। 1795 ও 1802 খ্রীষ্টাব্দে শিশুহত্যা নিষিদ্ধ করে নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হলেও সেটি নিয়মমত কার্যকর হয়নি। কেবলমাত্র বেন্টিঙ্ক ও হার্ডিঞ্জের কার্যকালেই এই নিয়ন্ত্রক আইন যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। গোণ্ড আদিবাসী সমাজের মধ্যে প্রচলিত নরবলি প্রথাও হার্ডিঞ্জ দমন করেছিলেন। 1856 খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া (ভারত সরকার) হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ বৈধকরণের জন্য একটি আইন প্রবর্তন করেছিল। হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহের সপক্ষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কারকেরা যে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালিয়েছিলেন তার প্রেরণাতেই ভারত সরকারকে এই আইন বিধিবদ্ধ করতে হয়েছিল। তবে এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রথা সমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

সরকারী উদ্যোগে এই সমাজসংস্কার ভারতীয় সমাজকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি, মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিই শুধু এতদ্বারা উপকৃত বা প্রভাবিত হয়েছিল। ভারতের বিশাল জনমণ্ডলী পূর্বতন ধ্যান-ধারণা বা সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বসেছিল।

আধুনিক শিক্ষার বিস্তার

সংস্কার প্রচেষ্টার দ্বারা জনসাধারণের অন্তর স্পর্শ করতে ব্যর্থ হলেও

আধুনিক শিক্ষা প্রচারের দ্বারা ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতীয় জনসাধারণের বিচারবুদ্ধির ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন বা বিপ্লব আনতে সমর্থ হয়েছিল। তবে এই আধুনিক শিক্ষা প্রচারের কৃতিত্বের সবটুকু অংশ ব্রিটিশ শাসকদের প্রাপ্য নয়। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক এবং সুশিক্ষিত কিছুসংখ্যক ভারতবাসীও এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত-শাসনের অধিকার পেয়েছিল বটে, তবে এরা মূলতঃ ছিল মুনাফালোলুপ বণিক্‌সংস্থা মাত্র। শাসনকর্তৃত্ব লাভ করার প্রথম ষাট বৎসরের মধ্যে এরা ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে কোন আগ্রহ দেখায়নি। তবে দু-একটি ছোটখাট ব্যাপারে এরা কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছিল। 1781 খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেস্টিংস কলকাতায় মুসলমানী আইন এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি 'মাদ্রাসা' স্থাপন করেছিলেন। 1791 খ্রীষ্টাব্দে জোনাথান ডানক্যান্ বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছিলেন, এখানে হিন্দু দর্শন ও আইন পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। জোনাথান ডানক্যান্ তখন বারাণসীতে কোম্পানীর প্রতিনিধি (Resident) পদে নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতার মাদ্রাসা ও বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ খোলার মূল্য উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর আদালতগুলিতে ইংরাজ বিচারকদের সাহায্য করার জন্য কিছু ভারতীয় পণ্ডিত বা মৌলভীর সৃষ্টি।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক, এদের সমর্থক এবং কিছুসংখ্যক উদার মতাবলম্বী দেশীয় ভদ্রলোক কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষা-বিস্তার নীতি গ্রহণের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে আসছিলেন। এই বিদ্যোৎসাহী ও মহানুভব ব্যক্তিদের মধ্যে ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় শ্রেণীর মানুষই ছিলেন। এঁরা মনে করেছিলেন যে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্গতি একমাত্র আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারাই দূর করা সম্ভব হবে। খ্রীস্টান মিশনারীদের এক্ষেত্রে বিশ্বাস ছিল যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেলে ভারতীয়গণ তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে, তখন তাদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা খুব সহজসাধ্য হবে। এ বিষয়ে সামান্য ধরনের একটা কর্মসূচী 1813 খ্রীষ্টাব্দের 'চার্টার য়্যাক্টে' সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। এতে শিক্ষিত ভারতবাসীদের উৎসাহদান এবং ভারতবাসীদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচারের নীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই 'য়্যাক্টে' ইস্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে শিক্ষাখাতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দুঃখের বিষয় 1823 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সামান্য অঙ্কের টাকাও কোম্পানী খরচ করেনি।

শিক্ষাখাতে একলক্ষ টাকা বরাদ্দ হওয়ার পর এই টাকাটা কিভাবে খরচ করা হবে তাই নিয়ে দেশে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। একদলের মত এই ছিল যে, এই টাকাটা আধুনিক ধরনের পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে ব্যয় করা উচিত। অপর দলের যুক্তি ছিল যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যে শিক্ষা-লাভ শুধু চাকুরী পেতেই সাহায্য করে, সুতরাং চিরাচরিত ভারতীয় প্রথায় শিক্ষাবিস্তারই বাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যেই আবার বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা হবে তাই নিয়ে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক কেউ কেউ চেয়েছিলেন শিক্ষার মাধ্যম হবে ভারতীয় কোন ভাষা বা 'ভার্ণাকুলার'। তৎকালে ভারতীয় ভাষাগুলিকে 'ভার্ণাকুলার' বলা হত, এর অর্থ দেশীয় লোকের ভাষা। বিপক্ষবাদী দল চেয়েছিল যে ইংরাজী ভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। দুর্ভাগ্যক্রমে, এ বিষয়ে বেশ একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। বহু ব্যক্তিই ইংরাজী ভাষা বা সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষালাভের সঙ্গে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের মধ্যে যে পার্থক্য আছে এটা ধরতে পারেনি। আবার দ্বিতীয় পক্ষভুক্ত ব্যক্তিগণ ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ আর মূলতঃ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার তফাৎ কি সেটা বুঝতে পারেনি।

1835 খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছিল। এই সময় ভারত সরকার স্থির করেন যে শিক্ষাখাতে যত কম খরচই করা হ'ক না কেন, সেটা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা হবে এবং এই শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরাজী ভাষা। লর্ড মেকলের শিক্ষা বিষয়ক বিলগত প্রস্তাব (এটিকে মিনিট বলা হয়)-টিতে এই যুক্তি দেখান হয়েছিল যে, ভারতীয় ভাষাগুলির অবস্থা এত হীন যে এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান অসম্ভব। লর্ড মেকলে ছিলেন তৎকালে গভর্নর-জেনারেলের একজন পারিষদ্। ইনি আইন বিভাগের কর্তা ছিলেন (ল' মেম্বর)। মেকলের ব্যক্তিগত মত ছিল যে প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অতি নিকৃষ্ট। মেকলের এই অভিমত থেকে বোঝা যায় যে তাঁর এই মন্তব্য পক্ষ-পাতদুষ্ট। এই মন্তব্য থেকে এটাও পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে অতীতকালে

বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ কত উন্নত ছিল মেকলের তা জানা ছিল না। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে মেকলের ঐ মন্তব্য একেবারে অসার তা বলা যেতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশ ভৌতবিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তদানীন্তনকালে যে উন্নত অবস্থায় আসীন হয়েছিল ভারতবর্ষ সেই অবস্থার ধারে কাছেও যেতে পারত না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একদা ভারতবর্ষ একটা উন্নত অবস্থায় অবশ্যই পৌছেছিল কিন্তু তার সেই উন্নতি অব্যাহত থাকেনি। একদা কিছুটা উন্নতিলাভ করে তার উন্নতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এমন কি অতীতের এই জ্ঞান-সম্পদের ব্যবহারও বাস্তবজীবন থেকে মুছে গিয়েছিল। ঠিক এই কারণেই রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে তদানীন্তনকালের প্রগতিশীল ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, পাশ্চাত্য জগতের জনকল্যাণ ও গণতন্ত্র-মূলক চিন্তাধারা ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করার মূল উপায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষা-লাভ। তাঁরা এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, চিরাচরিত পদ্ধতির শিক্ষা থেকে কুসংস্কার, ভীতি ও আপ্ত বাক্যের প্রতি আস্থা জন্ম নিয়ে থাকে। এক কথায় এঁদের মত ছিল এই যে, দেশের মুক্তি বা মঙ্গল সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব ও চেষ্টার মধ্যেই নিহিত আছে। পিছনের দিকে তাকিয়ে আগের যুগের পরিবেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা মঙ্গল-প্রসূ হতে পারে না। বস্তুতঃ উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর যে কোন বিশিষ্ট ভারতীয় ভদ্রলোকেরই মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। আধুনিককালের পরিধির মধ্যেও দেখা গিয়েছে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাভিলাষী ভারতীয় সমাজ নিজেদের পক্ষ থেকেই সরকারী কর্তৃপক্ষ যাতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচারে অধিকতর উদ্যোগী হয় তার জন্য আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে সরকারী প্রচেষ্টার মূলে ভারতীয় জননেতাদের এই ভূমিকা অনেকটুকু কাজ করেছে।

1835 খ্রীষ্টাব্দে মেকলের শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশের পর ভারত সরকার শিক্ষা-প্রচার সম্বন্ধে খুব দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, তবে বিশেষভাবে বাঙ্‌লা প্রেসিডেন্সিতেই এই উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। সরকারীভাবে স্কুল ও কলেজে ইংরাজী ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। সরকারী উদ্যোগে অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যা-লয়ের পরিবর্তে কতকগুলি ইংরাজী স্কুল ও কলেজ খোলা হয়েছিল। জন-সাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার বিষয়টি উপেক্ষা করে মুষ্টিমেয়

লোকের স্বার্থে শুধুমাত্র কয়েকটি স্কুল-কলেজ খোলার এই শিক্ষানীতি পরবর্তী-কালে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিল। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে আধুনিক ধাবায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তৎকালেব পক্ষে মোটেই নিন্দনীয় হয়নি। অন্য সবদিকের কথা ছেড়ে দিলেও শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তুলতে হলেও উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য অবশ্যই ছিল। তবে, উচ্চবিদ্যালয়গুলি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধাবণের উপকারার্থে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হওয়াও সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য কর্তব্য ছিল। এই কর্তব্য পালিত হযনি। সরকারী পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ না নেওয়ার কারণ এই ছিল যে, শিক্ষাখাতে যে সামান্য অর্থ ব্যযের জন্য ধার্য কবা হত তাতে কয়েকটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ই চালানো যেতে পাবত, এই বিবাট দেশে বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালানোর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করতে সরকারী কর্তৃপক্ষের কুণ্ঠা ছিল। শিক্ষাখাতে সরকারী অর্থের অপ্রতুলতার কারণে সরকারী কর্তৃপক্ষের নীতি ছিল নিম্নাভিমুখী। এই নীতির ব্যাখ্যা করে বলা হত যে, যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার মত অর্থ সরকারের হাতে আছে তাই খরচ করা হবে। সরকারী সাহায্যে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদেরই কাজ হবে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার এবং তাদের মধ্যে আধুনিক ভাবধারা প্রচার। উচ্চতর শ্রেণী থেকে নিম্নশ্রেণীগুলির মধ্যে শিক্ষা ও আধুনিক ভাবধারার স্রোত প্রবাহিত হবে—এই হল 'নিম্নাভিমুখী শিক্ষার' ব্যাখ্যা। সরকারীভাবে 1854 খ্রীষ্টাব্দে উপরোক্ত নীতি নথিগতভাবে পরিত্যক্ত হলেও ব্রিটিশ শাসনের অন্তকাল পর্যন্ত এটাই ছিল সরকারী নীতি অর্থাৎ উচ্চ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সরকারী প্রত্যাশা মত সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর শিক্ষিতগণ নিম্নতর শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হয়নি। উচ্চতর শ্রেণীর মানুষেরা অবশ্যই আধুনিক ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তবে সবসময় এই উচ্চশ্রেণীর মানুষদের কর্মধারা সরকারের মনস্কামনা পূরণ করতে পারেনি। স্কুল-কলেজের শিক্ষা বা পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে আধুনিকতা প্রচারের ক্ষমতা বা সাধ্য ভারতের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ছিল না, তাই গণতান্ত্রিক চেতনা, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, অর্থ-নৈতিক সাম্য, ন্যায়বিচারবোধ প্রভৃতি বিষয়ে শহর বা গ্রামাঞ্চলের মানুষের

চেতনা জাগ্রত করার জন্য এঁরা রাজনৈতিক সংগঠন, সংবাদপত্র, পুস্তিকা-প্রচার, বক্তৃতা প্রভৃতি মাধ্যমগুলিকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

1854 খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে ভারত-সচিব ভারত গভর্নমেণ্টের কাছে শিক্ষা-বিষয়ক যে নির্দেশনামা (এডুকেশন ডেস্‌প্যাচ্‌) পাঠিয়েছিলেন সেটি ভারতে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে একটি প্রয়োজনীয় ও বিশিষ্ট পদক্ষেপ রূপে গণ্য হয়েছে। এই নির্দেশনামায় ভারত সবকারকে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। ভারতের উচ্চ-শ্রেণীর মানুষেরাই ভারতের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলবে এই দোহাই দিয়ে ভারত সরকার এতদিন যে দায় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল অন্ততঃ কাগজপত্রে সে সাফাই গেয়ে যাওয়ার নীতিতে ছেদ এসে পড়েছিল। বাস্তব-ক্ষেত্রে, এযাবৎ ভারত সরকার শিক্ষাপ্রচারে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি, অতি অল্প অর্থই তারা এই উদ্দেশ্যে খরচ করেছিল। ভারত-সচিবের শিক্ষা-সংক্রান্ত নির্দেশনামা গৃহীত হওয়ার পর প্রতিটি প্রদেশে একটি করে পৃথক শিক্ষা বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া 1857 খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এক একটি করে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আও-তায় আনা হয়েছিল, অর্থাৎ দেশের তাবৎ স্কুল-কলেজগুলির পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ, পরীক্ষা ইত্যাদি গ্রহণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর ন্যস্ত হয়ে-ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1858 খ্রীষ্টাব্দে যে দু'জন সর্বপ্রথম "গ্রাজুয়েট্"রূপে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হন—প্রখ্যাত বাঙালী ঐতি-হাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম।

প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরে ইংল্যাণ্ডের রাণী বা রাজার শাসন-কালে ভারত সরকার ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা এমন কি যে কোন প্রকার শিক্ষাপ্রচার বা বিস্তারে কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখায়নি, অথচ এ বিষয়ে তারা বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী বলে দাবি করত। এ বিষয়ে তারা যে সামান্য চেষ্টা চালিয়েছিল সেটাও ছিল স্বার্থ-গন্ধী, এবং তা শিক্ষাবিস্তাররূপ মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতও ছিল না। আধুনিক শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার নেতা ছিলেন কিছু প্রগতিশীল ভারতীয় ভদ্রলোক, বিদেশী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকবৃন্দ, কিছু মানবিকতাবোধ সম্পন্ন ইংরাজ রাজ-কর্মচারী এবং কিছু সংখ্যক সহৃদয় বেসরকারি ইংরাজ ভদ্রলোক। ভারতে শিক্ষা প্রচার-

ক্ষেত্রে এঁদের প্রচেষ্টাই ছিল মুখ্য। এঁদের উদ্দেশ্যও মহৎ ছিল। অপরদিকে ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে কিছুটা আগ্রহের মূলে ছিল কম অর্থ ব্যয়ে সরকারী শাসনব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ বণিক্ সংস্থার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী সংগ্রহ। কিছু ভারতীয়কে শিক্ষিত করে তুলে ক্রমবর্ধমান কর্মচারীর চাহিদা পূরণই ছিল সরকারী নীতির আসল লক্ষ্য। ইংরাজ কর্মচারী রাখতে হলে প্রচুর মাইনে দিতে ত হতই, তাছাড়া এদেশে এত ইংরজ কর্মচারী পাওয়াও ছিল কঠিন। ইংলণ্ডের পক্ষে এত বিপুল সংখ্যক লোককে ভারতে পাঠানও সম্ভব ছিল না, কারণ তাদের জনসংখ্যাও বেশী ছিল না। স্কুল-কলেজে আধুনিক ধরনের পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল সস্তাদরের কেরাণী তৈরীর প্রয়োজন মেটাতে আর শিক্ষার মাধ্যম রাখা হয়েছিল ইংরাজী, কারণ সেটাই ছিল শাসক প্রভুদের এবং সরকারী কাজকর্মের ভাষা। সরকারী শিক্ষাবিস্তার নীতির আর একটা উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের অধিকতর চাহিদা সৃষ্টি। ভারত সরকারের এই বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষিত ভারতবাসী নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে ব্রিটিশ পণ্যের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখাবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে ইংরাজের ভারতের উপর প্রভুত্ব স্থায়িত্বলাভ করবে এবং ইংরাজী শিক্ষায় অভ্যস্ত ভারতবাসীর মনে ইংরাজ-প্রীতি স্বাভাবিকভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে। তার কারণ স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হত ;তা' ছিল ভারতবিজয়ী ইংরাজ, এবং ভারতে ইংরাজ শাসনের জয়গানে মুখর। দৃষ্টান্ত হিসাবে এ সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে "আমাদের উচিত প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা ভারতে এমন এক শ্রেণীর মানুষ তৈরী করা যারা আমাদের কথাগুলি আমাদের শাসনাধীন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেবে। শুধু গায়ের চামড়ায় কৃষ্ণবর্ণ এবং জন্মসূত্রে ভারতীয় এই শ্রেণীর মানুষগুলিকে রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে পুরোপুরি ইংরাজরূপে গড়ে তুলতে হবে"।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে ব্রিটিশের একটা গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। এটা ছিল ভারতে তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের চিরস্থায়িত্ব বিধান।

ভারতের পুরাতনপন্থী শিক্ষাধারার স্রোত সরকারী আনুকুল্যের অভাবে শুকিয়ে এসেছিল। 1844 খ্রীষ্টাব্দে একটি সরকারী ঘোষণায় সরকারী চাকুরীতে ইংরাজী জ্ঞান আবশ্যিক করে দেওয়ায় প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থার

সমাধি রচিত হয়েছিল। এই ঘোষণার পর দেশে ইংরাজী মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রাচীনপন্থী বিদ্যালয়ে পড়বার উৎসাহ আর কারো অবশিষ্ট থাকেনি।

ভারতে ব্রিটিশ শিক্ষানীতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল জনসাধারণমুখী শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য। এর পরিণাম এই দাঁড়িয়েছিল যে 1821 থেকে 1921 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একশ বছর সময়সীমার মধ্যে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের সংখ্যার বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। 1911 খ্রীষ্টাব্দে দেশের শতকরা 94 জন মানুষ (94%) নিরক্ষর ছিল। 1921 খ্রীষ্টাব্দে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল শতকরা 92 ভাগ (92%)। ভারতীয় কোন একটি ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম স্থির করার জন্যই জনসাধারণের মধ্যে নিরক্ষরতা-রোধ সম্ভবপর হতে পারেনি। ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার জন্যই শিক্ষিতসমাজের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অসাম্যের ভাব সৃষ্ট হয়েছিল। তদুপরি উচ্চশিক্ষালাভ ব্যয়সাধ্য রাখার জন্য, সাধারণ মানুষের পক্ষে এই শিক্ষা অর্জন অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এর ফলে উচ্চশিক্ষালাভ নগরবাসী এবং ধনিকশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেই সীমিত থেকে গিয়েছিল।

তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ছিল স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে চরম ঔদাসীন্য। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হত না। তবে এর একটা কারণ ছিল এই যে, ভারতের রক্ষণশীল সমাজ স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল না, স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তার ব্যবস্থা দ্বারা শাসককুল এই রক্ষণশীল সমাজের বিরূপতা অর্জন করতে চায়নি। স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারে সরকারী ঔদাসীন্যের আর একটি কারণ ছিল এই যে এর দ্বারা তাদের কোন স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না, বিদেশী শাসকের শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল তাদের শাসনব্যবস্থা চালু রাখার মত কিছু কেরাণী-কর্মচারীর সৃষ্টি। তখনকার দিনে মেয়ে কেরাণীর প্রয়োজন মোটেই দেখা দেয়নি। এই ঔদাসীন্যের ফলে 1921 খ্রীষ্টাব্দে দেখা গিয়েছিল যে ভারতীয় নারীসমাজের শতকরা মাত্র দুইজন শিক্ষিত, বাকী আটানব্বই জন অক্ষরপরিচয় জ্ঞানহীনা। 1919 খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর উচ্চবিদ্যালয়গুলির সর্বোচ্চ চারটি শ্রেণীতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র 490 জন। কোম্পানী শাসনকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষাও উপেক্ষিত হয়েছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা-

দানের নিমিত্ত মাত্র তিনটি 'মেডিকেল কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই-গুলির অবস্থিতি ছিল কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। পূর্ত-বিদ্যায় উচ্চ-শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি মাত্র মহাবিদ্যালয় ছিল রুড়কিতে। এখানেও মাত্র ইউরোপীয় এবং ইউরোপীয়-এশিয় সংমিশ্রণজাত ইউরেশিয়ান ছাত্রদেবই প্রবেশলাভেব অধিকার ছিল।

ব্রিটিশ শাসনকালে শিক্ষাব্যবস্থার মূল গলদ ছিল অর্থসঙ্কট। ভারত গভর্নমেণ্ট্ কখনও এ বিষয়ে যথেষ্ট ব্যয় করার ইচ্ছা দেখায়নি। একটা সামান্য অঙ্কেব টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয়েব জন্য বরাদ্দ কবা হত। 1886 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষাখাতে মাত্র এক কোটি টাকা ব্যয়িত হযেছিল, অথচ এই সময়ের মধ্যে রাজস্বখাতে আয়ের পরিমাণ ছিল 47 কোটি টাকা।

তবে একথা আমাদের অবশ্যই মনে বাখতে হবে যে সবকাবী শিক্ষা-নীতির বহুবিধ ত্রুটি ছিল। আধুনিক শিক্ষার বিস্তৃতি ব্যাপক হয়নি, মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তিই এই আধুনিক শিক্ষাব সুযোগ লাভ কবেছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার এই সীমিত প্রসার ভারতের মধ্যে নব নব চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করে দিয়েছিল। এই নব ভাবধারা ভারতের আধুনিকীকরণের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

অনুশীলনী

1. শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য, সিভিল সার্ভিস, সামরিক বাহিনী, পুলিশ এবং বিচার বিভাগ—এই-গুলির প্রসঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কালে শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য কি ছিল তাহা আলোচনা কর।
2. ব্রিটিশের ভারতশাসননীতিকে যে আধুনিক চিন্তাধারা প্রভাবিত করিয়াছিল তার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ? এই প্রভাবের গতিপ্রকৃতি আলোচনা কর।
3. যে ঘটনাবলী আধুনিক শিক্ষাবিস্তার নীতি প্রবর্তনের কারণস্বরূপ তাহাদের উল্লেখসহ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষানীতির বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা কর।
4. নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ—

   (a) ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (b) আইনের শাসন (c) আইনের সমদৃষ্টি (d) আংশিক আধুনিকীকরণের নীতি (e) সতীদাহ প্রথা নিরোধ (f) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষার ভূমিকা (g) স্ত্রী-শিক্ষা (h) প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা।

সপ্তম অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ

পাশ্চাত্য দেশের প্রচলিত আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভের পর ভারতে এক নূতন চেতনার উন্মেষ দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্য জাতির ভারত বিজয় থেকে ভারতীয় সমাজের দুর্বলতা ও অবক্ষয়ের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ভারতের চিন্তাশীল মনীষীগণ এই সময় তাঁদের নিজস্ব সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলি কি তা বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি থেকে পরিত্রাণের উপায়ও খুঁজেছিলেন। এই সময়ে এমন বহু ব্যক্তি দেশে ছিলেন, যাঁরা পাশ্চাত্যভাবধারা বা জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। এঁরা ভারতীয় চিন্তাধারা ও ভারতীয় সমাজ ও ধর্মব্যবস্থাকে অনুসরণ করে চলাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেছিলেন। এঁদের পাশাপাশি আর একদল মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক ভাবধারার সহায়তা নিয়েই সমাজের পুনর্জীবন লাভ সম্ভব। এই শেষোক্ত দল আধুনিক বিজ্ঞান, এবং পাশ্চাত্য চিন্তার যুক্তিবাদ ও উদার মানবিকতা বোধের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এছাড়া এই সময়ে নূতন নূতন সামাজিক-স্বার্থ বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এঁরা ছিলেন ধনশালী, শ্রমজীবী ও সদ্য-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এঁরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের দাবি তুলেছিলেন।

এই নবজাগরণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, এঁকে যে আধুনিক ভারতের সর্বপ্রথম নেতা বলা হয়ে থাকে সেটা মিথ্যা নয়। দেশ ও দেশবাসির প্রতি রামমোহনের গভীর মমত্ববোধ ছিল। দেশ ও দেশের মানুষের সামাজিক, ধর্মীয়, বুদ্ধিগত ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি সারা-জীবন কঠোর প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিলেন। জাতিভেদ প্রথা ও কুসংস্কার জর্জরিত তদানীন্তন সমাজের দুর্নীতি ও কূপমণ্ডূকতা তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছিল। তৎকালে দেশের মানুষ যে ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে চলত

তা নানাবিধ কুসংস্কার পরিপূর্ণ ছিল। অশিক্ষিত ও দুর্নীতিপরায়ণ পুরোহিত শ্রেণীর কিছু লোক এই সুযোগে অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রতারিত করত। উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তিরা ছিল স্বার্থমগ্ন। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজের স্বার্থ এদের কাছে উপেক্ষণীয় ছিল। ভারতীয় দর্শনের প্রতি রামমোহন রায়ের অনুরাগ গভীর ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি মনে মনে এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে—পাশ্চাত্য চিন্তা ও সংস্কৃতিই ভারতীয় সমাজের পুনরুজ্জীবন সাধন করতে পারবে, ভারতীয় দর্শনের সাহায্যে এটা সম্ভব হবে না। বিশেষভাবে তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর দেশের মানুষ যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হবে, প্রতিটি মানুষের মনুষ্যত্বের মর্যাদা স্বীকার করবে এবং সামাজিকভাবে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে একই দৃষ্টিতে দেখবে। দেশে আধুনিক জগতের ধনতন্ত্রবাদ তথা শিল্পোন্নতি বিস্তারও তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

রামমোহন ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সমন্বয়ের প্রতীক। তিনি পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন ও হিব্রুসহ বারটিরও অধিক ভাষা তাঁর জানা ছিল। তরুণ বয়সে তিনি বারাণসীতে পণ্ডিতদেব কাছে সংস্কৃতসাহিত্য ও হিন্দুদর্শন পাঠ করেছিলেন। পরে পাটনায় তিনি কোরাণ এবং ফার্সী ও আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। জৈনধর্ম সহ ভারতে প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় ও ধর্মীয় আন্দোলন সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। পরবর্তীকালে তিনি খুব মনোযোগ সহকারে পাশ্চাত্য দর্শন ও সংস্কৃতিমূলক বিষয়গুলি অধ্যয়ন করেন। মূল বাইবেল গ্রন্থের মর্মগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি হিব্রু ও গ্রীক্ ভাষাও অধ্যয়ন করেছিলেন। 1809 খ্রীষ্টাব্দে ফার্সী ভাষায় তিনি একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ (তুহ্ফাৎ উল্ মুয়াহ্হিদীন্) রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বহুদেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করে একমাত্র ঈশ্বরই যে উপাস্য এটাই প্রতিপন্ন করেছিলেন।

1814 খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস আরম্ভ করেন। অল্প-দিনের মধ্যেই একদল তরুণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল। এদের সাহায্যে তিনি 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেন। এর পর থেকে তিনি তৎকালীন দেশের হিন্দু-সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষভাবে

তিনি মূর্তিপূজা, জাতিভেদ প্রথা এবং অর্থহীন কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন। ধর্মীয় কুপ্রথাগুলির প্রবর্তন ও প্রচারের জন্য পুরোহিত শ্রেণীকে দায়ী স্থির করে তিনি তাদের নিন্দা করতেন। তাঁর মত ছিল এই যে সব প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্রেই একেশ্বরবাদ বা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা বিহিত হয়েছে। তাঁর এই মতের সমর্থনের জন্য রামমোহন বেদ এবং উপনিষদের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেছিলেন। একেশ্বরবাদ সমর্থন করে তিনি কতগুলি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন।

প্রাচীন শাস্ত্রের ভিত্তিতে রামমোহন তাঁর দার্শনিক মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপরই নির্ভরতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য যে কোন মতবাদের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বেদান্ত দর্শন অবশ্যই যুক্তিবাদ সম্মত। ধর্মশাস্ত্র বা গ্রন্থ, অথবা চিরাচরিত কোন প্রথা যদি যুক্তিনির্ভর না হয় তবে সেই নির্দেশ বা আচার লঙ্ঘন করতে কারো কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর—এমন কোন ধর্মীয় নির্দেশ ও প্রথা যুক্তিতর্কের নিরিখেই লঙ্ঘনীয়। রামমোহন রায়ের এই যুক্তিবাদ শুধু হিন্দু-ধর্ম বা দর্শনের প্রতিই প্রযুক্ত হয়নি। রামমোহন রায় যখন যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করে হিন্দুধর্মের দোষ-ত্রুটিগুলি বিচার করে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক বন্ধুদের মধ্যে এই আশার সঞ্চার হয়েছিল যে তিনি শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টানধর্ম অবলম্বন করবেন। রামমোহন যুক্তির আলোকে খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, খ্রীষ্টধর্মের মতে কিছু অন্ধবিশ্বাসও তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। 1820 খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'প্রিসেপ্টস্ অফ জীশাস' বা খ্রীষ্টের উপদেশ (Precepts of Jesus) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট বা নববিধান গ্রন্থের নৈতিক ও দার্শনিক মতবাদগুলিতে যেসব অলৌকিক বা অবাস্তব তথ্য বা তত্ত্ব আছে সেগুলির সমালোচনা করে তিনি এ সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। যীশু-খ্রীষ্টের উচ্চনৈতিকতাপূর্ণ বাণীগুলি হিন্দুধর্মের মধ্যেও গ্রহণযোগ্য একথা লিখতেও তিনি দ্বিধা করেননি। যাই হোক্, নিউ টেস্টামেণ্টের অভ্রান্ততা মেনে না নেওয়ার জন্য তাঁকে খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল।

রামমোহন রায়ের মতামতের সার কথা এই ছিল যে অতীত ভারতের সবকিছুই অন্ধভাবে অনুসরণ করা চলবে না, আবার ভারতের সবকিছু ফেলে

দিয়ে মর্কটসুলভ পরাণুকরণ বৃত্তির প্রেরণায় পশ্চিমের সবকিছু অনুকরণও অনুচিত হবে। তাঁব দৃঢ় অভিমত বা পরামর্শ এই ছিল যে নবীন ভারত তার বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়খণ্ডে যা কিছু ভাল তা সবই গ্রহণ কবে যা কিছু মন্দ তা বর্জন কবে চলবে। দেখা যাচ্ছে যে, তিনি অবশ্যই চেয়েছিলেন যে ভারতবাসী প্রতীচ্যেব কাছ থেকে অবশ্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান আহবণ কববে। তবে এই শিক্ষা হবে বুদ্ধি-নির্ভর এবং সৃজনধর্মী। এই শিক্ষার সাহায্যে অবশ্যই ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাব পুনরুজ্জীবন সাধিত হবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই ভাবতীয সংস্কৃতির উপর পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যেন চেপে না বসে এটা দেখতে হবে। রামমোহন হিন্দুধর্ম সংস্কাবের পক্ষপাতী ছিলেন, হিন্দুধর্মেব পরিবর্তে ভাবতে খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠাব তিনি বিবোধীও ছিলেন। হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ খ্রীষ্টধর্ম প্রচাবক বা মিশনাবী সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় অপপ্রচাবেব বিরুদ্ধে বামমোহন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। হিন্দু-ধর্মকে সমর্থনেব সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধেও সবিশেষ অনুরাগ পোষণ কবতেন। তাঁব বিশ্বাস এই ছিল যে সকল ধর্মের একই বাণী, একই লক্ষ্য। যে কোন ধর্মাবলম্বী হ'ক না কেন নানা বৈষম্য সত্ত্বেও তাবা মূলতঃ অভিন্ন।

ধর্মচিন্তায এই দুঃসাহসী মনোভাবেব জন্য বামমোহনকে অশেষ দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ কবতে হযেছিল। মূর্তিপূজা বিবোধ এবং খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামেব প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশেব জন্য রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ কর্তৃক তিনি ধিক্কৃত হয়েছিলেন। এরা তাঁকে সামাজিকভাবে বর্জন কবেছিল এবং এই ব্যাপাবে তাঁব জননীও তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে নাস্তিক প্রতিপন্ন কবে 'জাতিচ্যুত' কবা হয়েছিল। 1829 খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ব্রহ্ম-সভা' নামে একটি নূতন ধর্মীয় সমাজ প্রবর্তন করেন, পরবর্তীকালে এটি 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়েছিল। এই ব্রহ্ম-সভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্ম সংস্কার ও একেশ্বরবাদ প্রচার। এই নূতন ব্রহ্ম-সভা অনুসৃত ধর্মমতকে বেদ ও উপনিষদ প্রচারিত মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। অন্য ধর্মগুলির মতামতও এই ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র ছিল সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের উন্মেষ, মূর্তিপূজার বিরোধিতা এবং সতীদাহ প্রথার মত সামাজিক কুপ্রথাগুলির অনিষ্টকরতা উদ্ঘাটন।

রামমোহন একজন উচ্চস্তরের চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি একজন কাজের মানুষও ছিলেন। জাতিগঠনমূলক এমন কোন প্রচেষ্টা ছিল না

যা তাঁর মনোযোগ বা কর্মশক্তিকে আকৃষ্ট করেনি। ভিতর থেকে হিন্দুধর্ম সংস্কারের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতীয় সমাজ-সংস্কার রূপ কাজেরও ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর আজীবন সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সতীদাহরূপ অমানুষিক সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর সুদীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন। 1818 খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীর সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ব্রতী হন। তাঁর এই আন্দোলন ছিল দ্বি-মুখী, একদিকে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রগুলি মন্থন করে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রগুলিতে সতীদাহ প্রথার সমর্থনের অভাব বরং এর বিরুদ্ধ নির্দেশই আছে। আর একদিকে তিনি বিচার-বুদ্ধি, মানবিকতাবোধ ও সহৃদয়তা প্রণোদিত হয়ে জনসাধারণকে সতীদাহ প্রথা রোধে অগ্রসর হতে আবেদন জানিয়েছিলেন। রামমোহন কলকাতাব শ্মশানঘাটগুলিতে গিয়ে মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণেচ্ছু বিধবা ও তার আত্মীয়স্বজনদের এই আত্মহত্যা বন্ধ রাখার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতেন। তিনি এবিষয়ে তাঁর সমমতাবলম্বী ব্যক্তিদের নিয়ে ছোট ছোট দলও গড়ে ছিলেন। এঁরা কোথাও সতীদাহ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে বিধবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার আত্মীয়স্বজনের চাপে সহমরণের উদ্যোগে বাধা দিতেন। গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্কের চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রোধেব জন্য ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল সতীদাহ নিষিদ্ধ করে একটি আইন বিধিবদ্ধকরণ। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধিগণ পার্লামেণ্টে এই মর্মে একটি আবেদন করেন যেন বেন্টিঙ্কের এই প্রস্তাব পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত না হয়। এই সময়ে বেন্টিঙ্কের প্রস্তাব যাতে গৃহীত হয়, এই মর্মে রামমোহনের নেতৃত্বে বহু উদার মনোভাবাপন্ন ভারতীয়ের স্বাক্ষরযুক্ত একটা পাল্টা আবেদনপত্রও পার্লামেণ্টে প্রেরিত হয়েছিল।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও রামমোহন আপ্রাণ চেষ্টিত থাকতেন। নারীজাতিকে পদানত করে রাখার তিনি বিরোধী ছিলেন। তৎকালে সমাজে এমন একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী-জাতি বুদ্ধি-বৃত্তির দিক থেকে হীন, নীতিগতভাবেও এদের স্থান নীচে। রামমোহন এই ধারণার প্রতিবাদী ছিলেন। পুরুষের বহুবিবাহ তিনি পছন্দ করতেন না। পতিহীনা নারীর প্রতি সমাজ তৎকালে সচরাচর যে অবিচার ও উপেক্ষা

দেখাত রামমোহন তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। নারীজাতির দুরবস্থার প্রতিকারস্বরূপ তিনি নারীদের সম্পত্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করেছিলেন।

আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্বাগ্রে আন্দোলন সুরু করেন রামমোহন তাঁদের অন্যতম। কারণ, দেশে আধুনিক চিন্তা বা ভাবধারার অভ্যুদয় ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন এটাই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। 1817 খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার ইতিহাসে বিখ্যাত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। 1800 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে ইনি ঘড়ি ব্যবসা করতে এদেশে এসে সারাজীবন ভারতে আধুনিক শিক্ষাবিস্তার ব্রতে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। রামমোহন হিন্দুকলেজ বা অনুরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রবর্তনে ডেভিড্ হেয়ারকে নানাভাবে সাহায্য করেন। এছাড়া তিনি নিজ ব্যয়ে কলকাতা শহরে 1817 খ্রীষ্টাব্দে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে যন্ত্রবিদ্যা ও ভল্‌টেয়ারের দর্শন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। 1825 খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেদান্ত শিক্ষাদানের জন্যও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে এখানে পাশ্চাত্যদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

বাংলা ভাষাকে উচ্চচিন্তার মাধ্যম রূপে গড়ে তুলতে রামমোহন সমধিক আগ্রহী ছিলেন। তিনি একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষায় অনুবাদ, পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িকপত্র প্রকাশ দ্বারা তিনি বাংলা ভাষায় আধুনিক কালোপযোগী অথচ প্রাঞ্জল একটি গদ্যরীতির সৃষ্টি করে-ছিলেন।

রামমোহন ভারতবর্ষে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের অন্যতম প্রতিভূ হয়ে উঠেছিলেন। নবজাগ্রত স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা তাঁর সর্বচিন্তা ও কর্মো-দ্যমের উৎস ছিল। তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ সাধন এবং বেদান্ত-সম্মত একেশ্বরবাদ প্রচার দ্বারা তিনি শতধা বিভক্ত ভারতীয় সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করার ভিত্তি স্থাপন করে যাচ্ছেন। বিশেষভাবে তিনি জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মত এই ছিল যে, জাতিভেদ প্রথাই আমাদের মধ্যে একতার অভাব সৃষ্টি করেছে। জাতিভেদ প্রথার দুটি অনর্থকর দিক তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে একদিকে এই কুপ্রথা পরস্পরের মধ্যে বিভেদ

আনে অন্যদিকে এই প্রথা দেশাত্ম-বোধ সঞ্চারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাঁর মতে ধর্ম-সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্যও ছিল দেশের রাজনৈতিক উন্নতি।

রামমোহন ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও একজন অগ্রদূতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি বাংলা, হিন্দী, ফার্সী ও ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, সাহিত্য-বিষয়ক ও রাজনৈতিক জ্ঞান প্রচার দ্বারা তাদের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবহিত রাখাই এই সংবাদপত্রগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল। এই সংবাদপত্রগুলির আরও একটি লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি শাসকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রতিকার বিধান।

রাজনৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করে তাদের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারেও রামমোহন অগ্রণী ছিলেন। কৃষকদের দুরবস্থার জন্য দায়ী বাঙালী জমিদারবর্গের অনাচার-অত্যাচারের ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে রামমোহন তীব্র প্রতিবাদ জানাতেন। তিনি এই দাবি উত্থাপন করে-ছিলেন যে প্রকৃত চাষী সম্প্রদায়ের দেয় সর্বোচ্চ খাজনার পরিমাণ চিরকালের মত একই রাখতে হবে, যখন তখন খেয়ালখুসী মত খাজনা বাড়ানো চলবে না। 1793 খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এটাই ছিল সুবিধা, এই সুবিধা চাষীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রামমোহন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমির উপর খাজনা চাপানোর ক্ষেত্রেও রামমোহন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতেন। কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়িক অধিকার বজায় রাখা ও ভারতীয় পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর ব্যাপারে চড়া হারে শুল্ক ধার্য নীতিরও তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর উত্থাপিত অন্য দাবিদাওয়াগুলির মধ্যে ছিল সরকারী উচ্চপদগুলির ভারতীয়করণ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, জুরী প্রথা দ্বারা বিচার প্রবর্তন এবং বিচারক্ষেত্রে ভারতীয় ও ইউরোপীয় নির্বিশেষে একই আইনের প্রয়োগ।

আন্তর্জাতিকতাবাদে রামমোহনের গভীর আস্থা ছিল। পৃথিবীর সর্ব-দেশের মানুষের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা প্রসার তাঁর অভীষ্ট ছিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "তাঁর কালে সমগ্র বিশ্বে একমাত্র রামমোহনই আধুনিককালের বিশেষত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে মানবসভ্যতার আদর্শ এটা নয় যে স্বাধীনতা নিয়ে একজন অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। চিন্তায় ও কর্মে একজন অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বোধে

আবদ্ধ থেকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে এটাই মানব সভ্যতার আদর্শ। কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা কোন দেশবিশেষের জাতির ক্ষেত্রেও এই আদর্শ অনুসরণীয়।"

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে রামমোহন বিশেষ আগ্রহ পোষণ করতেন। প্রতিটি দেশে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়বাদের তিনি সমর্থক ছিলেন। অবিচার, অত্যাচার ও দমন-পীড়ন যে কোন ধরনে কোথাও আত্ম-প্রকাশ করলেই তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। 1821 খ্রীষ্টাব্দে নেপ্‌লসের বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার সংবাদে বিচলিত হয়ে তিনি সমস্ত সামাজিক যোগা-যোগ বন্ধ রেখেছিলেন। আবার 1823 খ্রীষ্টাব্দে স্পেন অধিকৃত আমেরিকায় গণবিদ্রোহের সাফল্যের সংবাদে তিনি খুবই উল্লসিত হয়েছিলেন। এমন কি, এই ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্য তিনি একটি ভোজসভারও আয়োজন করেছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডের ভূস্বামী সম্প্রদায় অন্যত্র বসবাস করে প্রজাদের উপর নির্মম শোষণ চালাত এবং অত্যাচার করত। রামমোহন এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে ব্রিটিশ পার্লা-মেণ্ট যদি সংস্কারমূলক আইনপ্রণয়ন দ্বারা এই অপব্যবস্থা রোধ না করে তবে তিনি নিজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে কোন স্থানে গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করবেন।

রামমোহন রায়ের সাহস ছিল সিংহসদৃশ। ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং ক্লেশ বরণ করে নিয়ে তিনি সামাজিক অবিচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামরত ছিলেন। সমাজ সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবনে রামমোহনকে তাঁর নিজের আত্মীয়স্বজন, ধনী জমিদার, শক্তিশালী খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকবৃন্দ, উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারী এবং বিদেশী সরকারের বহু প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়ে-ছিল। এতৎসত্ত্বেও তিনি কখনও ভীত হয়ে তাঁর বিবেকসম্মত পন্থা পরিত্যাগ করেননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় আকাশে রামমোহন রায় উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররূপে ভাস্বর ছিলেন কিন্তু তিনি একক বা নিঃসঙ্গ ছিলেন না। শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইংরাজ ঘড়ি ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক আলেক-জাণ্ডার ডাফ্ তাঁকে সহায়তা দিয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর একজন বিশিষ্ট সহযোগী ছিলেন। তাঁর অন্যান্য অনুগামীদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখ-

যোগ্য। তাঁরাচাঁদ ছিলেন ব্রহ্ম-সভার প্রথম সম্পাদক। 1820 খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে 1830-এর দশকে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রগতিশীল সংস্কারপন্থী মনোভাবের উন্মেষ দেখা দিয়েছিল। আধুনিকতার বিচারে এদের চিন্তাধারা রামমোহনের চিন্তাধারার থেকেও প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিল। এদের কার্যাবলী নব্যবঙ্গের (Young Bengal) আন্দোলন রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই নব্যবঙ্গ আন্দোলনের নেতা বা প্রেরণাদাতা ছিলেন একজন তরুণ ইঙ্গ-ভারতীয় হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো। 1809 খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। 1826 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 1831 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ডিরোজিয়ো অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তৎকালে আধুনিকতম প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার পরিপোষক ছিলেন। ফরাসী বিপ্লব ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস। শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁর বিশেষ যোগ্যতা ছিল। নিজে বয়সে তরুণ হয়েও তিনি একদল প্রতিভাবান তরুণ ছাত্রের বিশেষ অনুরাগ ও আনুগত্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

ডিরোজিয়ো তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে যুক্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির অধিকারী হতে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে বিনা বিচারে কোন কিছু গ্রহণ না করার শিক্ষা দিতেন। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এবং সামাজিক জীবনে সাম্যভাব ও সত্যপরায়ণতার দিকে তিনি তাঁর শিষ্যদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতেন। ডিরোজিয়ো স্বয়ং এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর প্রত্যেকের মনেই গভীর স্বদেশপ্রেম জাগ্রত ছিল। সম্ভবতঃ ডিরোজিয়োই আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী কবি। 1827 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় লিখিত তার একটি কবিতার মর্ম তাঁর দেশপ্রেমিকতার নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত করা হল—"হে আমার স্বদেশ, তোমার অতীত গৌরবের দিনে তোমার ললাটে জ্যোতির্বলয় শোভা পেত, তখন তুমি দেবীরূপে পূজিতা হতে। তোমার আজ সেই গৌরব কোথায়, আজ সে ভক্তিও ত বিলীন হয়েছে। ঈগল পাখীর মত ডানা মেলে তুমি একদা উর্ধাকাশে বিচরণ করতে। আজ তোমার সেই মুক্ত-পক্ষ শৃঙ্খলিত, তুমি আজ ধূলিশয্যায় শুয়ে আছ। তোমার বন্দনাগান রচনা করতে আজ কবির ক্ষমতা নেই, সেই গৌরব মাল্য তোমার গলায় আজ দুলিয়ে দেওয়া যাবে না, আজ শুধু তোমার দুঃখের কাহিনী মাত্রই কবির সম্বল।" এবার তাঁর একজন ছাত্র

কাশীপ্রসাদ ঘোষের লিখিত একটি ইংরাজী কবিতার মর্মানুবাদ দেওয়া হল—"আমার স্বদেশ, তোমাকে চিরতরে বিদায় জানাচ্ছি, তুমি ছিলে দেবভূমি, তোমার নামের কি উত্তুঙ্গ মহিমাই না ছিল। কি অতুলনীয় শোভা ও সৌন্দর্য ছিল তোমার। কত বড় বড় কবি একদিন তোমার বন্দনা করে গিয়েছেন।" (1830) "একদিন তুমি সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে ঈগল পাখীর মত ডানায় ভর করে জ্ঞান ও স্বাধীনতার স্বর্গলোকে পৌছে যাবে। তোমার সেই বিজয়লাভের দিনে বেঁচে থাকব না, আমি এমনই হতভাগ্য।" (18১1)

1831 খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিয়োকে হিন্দু কলেজ থেকে প্রগতিশীল চিন্তা প্রচারের অপরাধে কর্মচ্যুত করা হয়। এর অল্পদিনের মধ্যেই মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ডিরোজিয়ো শিষ্যগণ পুরাতন ও পচনশীল প্রথা, ক্রিয়াকর্ম ও সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এরা নারী-জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। এঁরা কিন্তু এবিষয়ে কোন আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেননি কারণ তাঁদের প্রগতিশীল ধ্যানধারণাগুলি গ্রহণ করার মত সামাজিক পরিবেশ তখনও গড়ে ওঠেনি। এঁরা দেশের কৃষক-সমাজের অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাননি। দুঃখের বিষয় এই তরুণ দলের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সমর্থক কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী তদানীন্তনকালে গড়ে ওঠেনি। এই তরুণ দলের আর একটা ত্রুটি ছিল এই যে এঁরা দেশের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখেননি। বাস্তবে এই তরুণদের প্রগতিশীল চিন্তার প্রেরণাস্থল ছিল ছাপানো পুস্তক। কাজেই ভারতীয় সমাজের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা এঁদের সাধ্যের মধ্যে থাকেনি। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে এই ডিরোজিয়ান বা 'নব্যবঙ্গ' খ্যাত যুবকবৃন্দ রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংবাদপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে:সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সচেতন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্টের কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ বা চার্টারের সংশোধন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্রিটিশের উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি মানবিকতাপূর্ণ ব্যবহার, জুরীদ্বারা বিচার, জমিদারদের অত্যাচার থেকে রায়তদের রক্ষা, উচ্চ সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ ইত্যাদি জনস্বার্থ-মূলক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে এঁরা জনমত জাগ্রত করার দায়িত্ব নিয়ে-ছিলেন। • জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সুবিখ্যাত নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায় ডিরোজিয়ানদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন : "এঁরাই বাঙলায় আধুনিক সভ্যতার প্রবর্তন করেছিলেন। এঁরাই আমাদের জাতির পিতা, এঁদের গুণাবলী আমাদের কাছে স্মরণীয়। এদের দুর্বলতা বা দোষত্রুটিগুলি সম্বন্ধে মুখর হয়ে ওঠা উচিত হবে না।" এই সময় ব্রাহ্ম সমাজেরও অস্তিত্ব ছিল, তবে কবি রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই এর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারা ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুলি দেবেন্দ্রনাথের আয়ত্তাধীন হয়েছিল। 1839 খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামমোহন প্রবর্তিত ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে রামমোহন রায় ও ডিরোজিয়োর বিশিষ্ট অনুগামী ও শিষ্যদের অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির মত বহু মনীষী এই সভার সভ্য হন। তত্ত্ববোধিনী সভা ও এর মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে নিয়মিত ধারাবাহিক আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। বাঙালী শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট করার কাজেও তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা প্রচুর সাহায্য করেছিল। 1843 খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রহিতকরণ, স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তার, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি, মদ্যপান নিবারণ প্রভৃতি আন্দোলনকেও পরিপুষ্ট করেছিল।

ভারতভূমিতে এই সময়ে আবির্ভূত আর এক বিরাট পুরুষ ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ মনীষী ও সমাজসংস্কারক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজসংস্কারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। 1820 খ্রীষ্টাব্দে এক দরিদ্র পরিবারে এঁর জন্ম হয়েছিল। কঠোর সংগ্রাম করে তিনি শিক্ষালাভ করেন। 1851 খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারাগুলি গ্রহণ বিষয়ে তাঁর কোন গোঁড়ামি ছিল না। এক কথায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় শিক্ষা-সংস্কৃতির তিনি ছিলেন প্রতীক। তিনি বহুগুণ সম্পন্ন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তবে অতি উন্নত চরিত্রবত্তা ও তীক্ষ্ণ মেধা তাঁর অন্যসব গুণাবলীকে ম্লান করে রেখেছিল। তাঁর ছিল দুর্জয় সাহস ও নির্ভীক মানসিকতা। যা তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করতেন তাই তিনি ব্যক্তিগত জীবনে আশ্রয় করে থাকতেন, তাঁর বিশ্বাস ও কর্মে, চিন্তায়

এবং আচরণে কোন তফাৎ ছিল না। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। তাঁর ব্যবহারও ছিল কপটতা বর্জিত। মহান মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর দীন-দরিদ্র, দুর্ভাগা ও নির্যাতিত মানুষদের প্রতি মনে অপার করুণা পোষণ করতেন।

এখনও পর্যন্ত বাঙ্‌লা দেশে তাঁর মহান চরিত্র, নৈতিক মূল্যবোধ ও অপার করুণা সম্বন্ধে অজস্র কাহিনী প্রচলিত আছে। অকারণ সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে তিনি সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। দরিদ্রদের প্রতি তাঁর দয়ার পরিমাণ ছিল সীমাহীন, এ সম্বন্ধে অজস্র কাহিনী বর্তমান। তাঁর গায়ে গরম পোশাক উঠতেই পেত না। দামী গরম পোশাক পরে রাস্তায় বেরিয়ে শীতজর্জর প্রথম যে ভিখারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হত তার হাতে সেই পোশাকটি তুলে দিয়ে তিনি তার শীত নিবারণের ব্যবস্থা করে নিজে নিশ্চিন্ত বোধ করতেন। আধুনিক ভারতের অভ্যুদয়ে বিদ্যাসাগরের দান বহুমুখী। সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য নতুন এক পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করেন। তিনি বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন তা' এখনও প্রচলিত রয়েছে। নিজের রচনাবলীর মাধ্যমে তিনি আধুনিক বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তনে পথিকৃতের কাজ করেন। সংস্কৃত কলেজে একমাত্র ব্রাহ্মণশ্রেণীর ছাত্রদেরই পাঠের অধিকার ছিল। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষা একটি মাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এইভাবে আবদ্ধ রাখার বিরোধী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের দ্বার অব্রাহ্মণ-শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যও উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাস্তব জগৎ থেকে নিজেকে বিযুক্ত রেখে সংস্কৃত চর্চার যে ক্ষতিকর প্রথা প্রচলিত ছিল তা দূর করার জন্য তিনি সংস্কৃত কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজেও একটি মহাবিদ্যালয় বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে এটি তাঁরই নামানুসারে 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে পরিচিত।

নিপীড়িত ভারতীয় নারীসমাজের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কৃতজ্ঞ দেশবাসী বিশেষভাবে এই কারণেই আজও তাঁকে মনে রেখেছে। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তর-সাধক। বিদ্যাসাগর বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রচলনের জন্য সুদীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন স্বভাবে মানবদরদী। হিন্দু বিধবাদের দুঃখ কষ্ট তাই তাঁর হৃদয়কে বিচলিত করেছিল।

এদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি বহু সময় ও অর্থ ব্যয় করেছিলেন। বলতে গেলে এই কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজের বৈষয়িক সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। এই জ্ঞানের সহায়তায় তিনি দৃঢ়ভাবে 1855 খ্রীষ্টাব্দে বিধবাদের পুনর্বিবাহের বৈধতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর এই প্রস্তাব ঘোষণার পর বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। এই আন্দোলন এখনও স্তিমিত হয়নি। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে 1855 খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি স্থান থেকে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য বহু দরখাস্ত গভর্নমেণ্টের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে বিধবা-বিবাহকে বিধিবদ্ধ করে একটি আইন গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের দেশে উচ্চজাতির মধ্যে সর্বপ্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায় 1856 খ্রীষ্টাব্দের 7 ডিসেম্বর দিনটিতে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক তথাকথিত নিম্ন-জাতিগুলির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা অবশ্য তৎকালেও প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উদ্ধৃত হল—

"এই দিনটির কথা আমি কখনও ভুলব না। বিদ্যাসাগর একটি বিরাট শোভাযাত্রার পুরোভাগে তাঁর বন্ধু বিধবা বিবাহের উদ্দিষ্ট পাত্রটিকে নিয়ে যখন নির্দিষ্ট স্থানটিতে পৌঁছালেন তখন সেই স্থানটি দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এত বেশী ভীড় হয়েছিল যে কোথাও তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। তখনকার দিনে কলকাতায় রাস্তার ধারে বড় বড় পয়ঃপ্রণালী বা নর্দমা ছিল। ধাক্কাধাক্কিতে ভিড়ের মধ্যে অনেক লোক ঐ নর্দমাগুলিতে পড়ে গিয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর হাটে, বাজারে, পথে-ঘাটে, ছাত্রদের ছাত্রাবাসে, আপিসে, বাবুদের বৈঠকখানায় এমন কি দূর গ্রাম-গঞ্জের সর্বত্রই এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। এমন কি মেয়েরাও নিজেদের মধ্যে এ বিবাহের ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় মেতেছিল।"

বিধবা বিবাহ প্রবর্তন বা সমর্থন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সময়ে সময়ে তাঁর জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ত। বিদ্যাসাগর এই শত্রুতায় অবিচলিত থেকে তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টায় এবং অর্থ

সাহায্যে 1855 থেকে 1866 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পঁচিশটি বিধবার পুনর্বিবাহ ইত হয়েছিল।

1850 খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর শিশু-বিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। সারা-জীবন ধরে তিনি বহু-বিবাহ প্রথারও বিরোধিতা চালিয়েছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর সমধিক আগ্রহ ছিল। বিদ্যালয় পরিদর্শকরূপ সরকারী পদে থেকে তিনি পঁয়ত্রিশটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর মধ্যে কিছু কিছু বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার তিনি স্বয়ং বহন করতেন। বেথুন স্কুলের সেক্রেটারী বা সম্পাদকরূপে তিনি এদেশে নারীজাতির মধ্যে উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রবর্তকের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

1840 খ্রীষ্টাব্দ থেকে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে আন্দোলন সুরু হয়েছিল তার প্রথম ফলস্বরূপ 1849 খ্রীষ্টাব্দে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা যে চিরকালই অপ্রচলিত ছিল তা' নয়। তবে সাধারণতঃ সাধারণ মানুষের মনে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে অনীহাই ছিল। অনেক মানুষের মনে এই রকম একটা কুসংস্কারও ছিল যে, নারী শিক্ষিতা হলেই তার ভাগ্যে বৈধব্য জুটবে। 1821 খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে তাঁদের এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল। বেথুন স্কুলের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্রী সংগ্রহ করতে কর্তৃপক্ষকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার পথে মেয়েদের টিটকারী সহ্য করতে হত। তাদের পরিবারবর্গকেও 'একঘরে' করার ভয় দেখান হত। অনেকে আবার বিশ্বাস করত যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েরা স্বামীদের মোটেই শ্রদ্ধা করবে না, শিক্ষিতা স্ত্রীগণ স্বামীদের প্রতি ক্রীতদাসের মত ব্যবহার প্রদর্শন করবে।

বাঙলা প্রদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা পশ্চিম ভারতের বহু পূর্বেই প্রবাহিত হতে সুরু করেছিল। 1818 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ পশ্চিম ভারত অঞ্চল প্রকৃত অর্থে ব্রিটিশ শাসনের আওতায় এসেছিল। 1849 খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে 'প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রবর্তকেরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন এবং জাতিভেদ প্রথার বিলোপ এঁদের লক্ষ্য ছিল। এই প্রার্থনা সমাজের অধি-বেশনকালে এর সদস্যগণ তথাকথিত নীচজাতির হাতের রান্না খাবার খেতেন। 1848 খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন শিক্ষিত যুবকের চেষ্টায় ছাত্রদের জন্য একটি সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল (Students'

Library and Scientific Society)। এর দুটি শাখা ছিল, একটি গুজরাটি ভাষীদের অপরটি মারাঠি ভাষীদের জন্য। এর দেশীয় নাম ছিল 'জ্ঞান প্রকাশ মণ্ডলী'। উপরোক্ত সমিতি বিজ্ঞান বিষয়ে এবং সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সর্বসাধারণের উপযোগী বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করত। এই সমিতির আর একটি উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন। 1851 খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিবা ফুলে এবং তাঁর স্ত্রী পুনেতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই পর পর আরও কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ভাউদাজী ও শঙ্কর শেঠের নাম উল্লেখযোগ্য। ফুলে মহারাষ্ট্রে বিধবার পুনর্বিবাহ ব্যাপারেও অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। 1850 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে বিষ্ণুশাস্ত্রী পণ্ডিত মহারাষ্ট্রে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রথা প্রচলিত করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে আর একজন বিশিষ্ট সংস্কারকের নাম কারসনদাস (কৃষ্ণদাস) মূলজী। ইনি 1852 খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহকে সমাজ-সম্মত করার উদ্দেশ্যে গুজরাটিতে 'সত্যপ্রকাশ' নামে একটি সাময়িক পত্র প্রবর্তন করেন।

মহারাষ্ট্রে প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে গোপাল হরি দেশমুখ ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। লোক-হিতৈষণার জন্য ইনি দেশবাসী কর্তৃক 'লোকহিতবাদী' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। যুক্তিবাদী চিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুগ-সম্মত মানবতাবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের পুনর্বিন্যাস এঁর ঈপ্সিত ছিল। জ্যোতিবা ফুলে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর 'মালি' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই কারণে মহারাষ্ট্রে অব্রাহ্মণ ও অচ্ছুত শ্রেণীর সামাজিক দুর্গতির বেদনা তিনি বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। উচ্চবর্ণের মানুষদের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর প্রভুত্ব স্পৃহা ও দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

বোম্বাই প্রদেশের আর একজন নেতৃস্থানীয় সমাজসংস্কারক ছিলেন—দাদাভাই নৌরোজী। জরথুস্ত্র (Zoroastrian) ধর্মসংস্কারের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়, ইনি ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। জরথুস্ত্র ধর্মাবলম্বীদের (পার্শীদের) মধ্যে নারীজাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিবাহ ও উত্তরাধিকার বিষয়ে একই ধরনের আইন প্রচলনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে পার্শী

আইন প্রণয়ন সমিতি স্থাপিত হয় দাদাভাই নৌরোজী তারও একজন উদ্যোক্তা ছিলেন।

অনুশীলনী

1. উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে রাজা রামমোহনের যে ভূমিকা ছিল তাহা বিশেষভাবে আলোচনা কর।
2. কিভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নবভারত গঠনের সহায়তা করেন তাহা আলোচনা কর।
3. সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ (a) হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো (b) নব্যবঙ্গ (c) পশ্চিম ভারতে ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টা।

অষ্টম অধ্যায়

1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

1857 খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও মধ্যভারতে একটা প্রচণ্ড ধরনের গণ-বিদ্রোহ ঘটেছিল। এই মহাবিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে প্রায় ভাসিয়ে দিতে বসেছিল। কোম্পানীর ভারতীয় সেনাবাহিনীর (এই ভারতীয় সৈনিকদের সাধারণত সিপাহী বা সেপাই বলা হত) মধ্যে এর প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দিলেও অতি অল্পদিনের মধ্যে এটা শুধু সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে জনগণের মধ্যেও এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় বৎসরখানেক ধরে লক্ষ লক্ষ চাষী, মজুর এবং সিপাহীরা সাহসের সঙ্গে ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। এই বিদ্রোহীদের সাহস এবং স্বার্থত্যাগ ভারতীয় জনগণের ইতিহাসে একটি গৌরবজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল।

1857 খ্রীষ্টাব্দের এই বিদ্রোহকে শুধু সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এটা নিছক সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের কারণেই আত্মপ্রকাশ করেনি। এই বিদ্রোহের উৎস ছিল কোম্পানীশাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিতৃষ্ণা। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে একের পর এক ভারতীয় ভূখণ্ড জয় করে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে আসছিল। এর ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের মনে যে অসন্তোষ দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত হয়ে আসছিল তা' কালক্রমে একটা বিরাট আকার ধারণ করে-ছিল। এই দীর্ঘসঞ্চিত অথচ নিরুদ্ধ বিক্ষোভ একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে আর সংযত থাকতে পারেনি। এই নিরুদ্ধ ক্ষোভের বিস্ফোরণ জনসমর্থিত বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

সম্ভবতঃ ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতের অর্থনৈতিক শোষণ ও তজ্জনিত ভারতে প্রচলিত অর্থনৈতিক সংস্থিতির বিনষ্টি ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের মুখ্য কারণ হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ শোষণ এবং তৎকর্তৃক ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের মূলে কুঠারাঘাতের ফলে শুধু বিরাট সংখ্যক চাষী-

মজুর কারিগর শ্রেণীর মানুষই যে শুধু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তা নয়, এই ক্ষতি ভারতের বহু সম্ভ্রান্ত রাজা জমিদারদেরও স্পর্শ করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের সূচনাপর্বে ভারতীয় অর্থনীতির ভয়াবহ বিপর্যয়ের বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ব্রিটিশের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব নীতি এবং আইন ও প্রশাসনের কঠোরতাও জনসাধারণকে অনেকটা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। বিশেষভাবে বহু কৃষক ব্যবসায়ী এবং মহাজনদের জুলুমে এবং আইনের ফাঁকে তাদেব হাতে নিজেদের জমি তুলে দিয়েও তাদের ঋণভার থেকে রেহাই পেত না। প্রশাসনের নীচুস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি বর্তমান থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্গতি অসহ্য হয়ে উঠেছিল। পুলিশ, ছোটখাট রাজকর্মচারী ও নিম্নতম আদালতগুলি ছিল দুর্নীতির লীলাক্ষেত্র। 1859 খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উইলিয়ম এড্‌-ওয়ার্ডস নামে একজন ইংরাজ রাজকর্মচারী লিখেছিলেন "পুলিশ জনসাধারণের কাছে রীতিমত 'বিভীষিকাজনক বস্তু', আমাদেব গভর্নমেণ্টের উপর জনসাধারণের বিরাগের একটা মুখ্য কারণ হল তাদের উপব পুলিশের অত্যাচার ও শোষণ।" কৃষক-প্রজা এবং জমিদারদের ভয় দেখিয়ে অথবা তাদের কার্যোদ্ধারে সাহায্য করার অজুহাতে তাদের অর্থ শোষণ করে বড়লোক হবার সুযোগ নেওয়া ছোটখাট রাজকর্মচারীদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিচাব বিভাগীয় ব্যবস্থা এতই জটিল ছিল যে সেই অবস্থায় ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে গরীবদের উপর উৎপীড়ন চালানো খুব সহজ ছিল। আইনের মারপ্যাচের ফাঁকে ধনী অত্যাচারকারী অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারত। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাব মধ্যে জনসাধারণ মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার আশায় জনসাধারণ এই মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল।

ভারতীয় সমাজের উচ্চ এবং মধ্যস্তরের মানুষেরা সরকারী শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত মোটা বেতনের উচ্চতর পদগুলি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আর্থিক দিক থেকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। বিশেষভাবে উত্তর-ভারতে এই শ্রেণীর মানুষেরা ব্রিটিশ আমলে চাকুরীর সুবিধা মোটেই পায়নি। ইংরাজ শাসনের আগে এই শ্রেণীই এই উচ্চবেতনেব সরকারী পদগুলি ভোগ করত। ভারতীয় শাসিত রাজ্যগুলি একে একে ব্রিটিশের অধিকারে এসে পড়ায়, এইসব রাজ্যে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় উচ্চপদে যে ভারতীয় ব্যক্তিগণ অধিষ্ঠিত ছিল

তারা জীবিকা-চ্যুত হয়ে পড়েছিল, তাদের ভদ্রভাবে জীবনধারণের উপায় থাকেনি। সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মে নিযুক্ত থেকে যারা জীবিকা অর্জন করত, ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পর তারাও বৃত্তি-চ্যুত হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় রাজা-মহারাজা বা নবাব-বাদশাগণ সাহিত্য ও সুকুমার কলা চর্চার পৃষ্ঠ-পোষকতা করতেন। ধর্মপ্রচারক এবং সাধু-ফকির শ্রেণীর মানুষদেরও এঁরা পালনপোষণ করতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসাদে একে একে এঁরা যখন নিজের নিজের রাজ্য হারালেন তখন তাঁরা যাদের পালনপোষণ করতেন তারা সবাই আকস্মিকভাবে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল। ধর্মপ্রচারক, পণ্ডিত বা মৌলভী সম্প্রদায় বেশ বুঝে নিয়েছিলেন যে বৈদেশিক শাসনে তাঁদের ভবিষ্যৎ অতি অনিশ্চিত। এই অবস্থায় এঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রচারের কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ শাসন ভারতে যে কখনই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি তার একটি মূল কারণ ছিল এই শাসনের বিদেশী ভাব বা গন্ধ। ব্রিটিশ জাতির মানুষেরা এদেশে চিরকাল বিদেশীই থেকে গিয়েছিল। সামাজিক জীবনে এরা ভারতীয়দের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চায়নি, এরা ভারতীয়দের মনোভাব কোনোদিন বোঝার চেষ্টা করেনি, নিজেদের মনোভাবও এরা খোলাখুলিভাবে ভারতীয়দের জানাতে চায়নি। সামাজিকভাবে ইংরাজেরা কোনদিন ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করেনি, সাধারণ মানুষের কথা দূরে থাক উচ্চস্তরের অতি সম্ভ্রান্ত ভারতীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশাও এরা করতে চায়নি। শুধু তাই-ই নয়া এরা নিজেদের ভারতীয়দের থেকে শ্রেষ্ঠতর জাত বলে ভাবত। ভারতীয়দের প্রতি এদের ব্যবহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং ঘৃণা-সূচক ছিল। পরবর্তীকালে এ সম্বন্ধে সৈয়দ আমেদ খান্ মন্তব্য করেছিলেন যে অতিসম্ভ্রান্ত কোন ভারতীয় ভদ্রলোকও কোন ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে মনে মনে ভীত বোধ করতেন। সবচেয়ে বড় কথা ছিল এই যে ব্রিটিশ জাতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন ও শোষণ। এরা এদেশে বসবাস করার উদ্দেশ্যে আসেনি। এদের ভারতে আসার উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র ধনার্জন। অর্জিত ধনসম্পত্তিসহ স্বদেশে ফিরে যাওয়াই ছিল এদের অভীষ্ট। নূতন শাসকশ্রেণী যে তাদের আপনার জন নয়, মনেপ্রাণে এরা যে বিদেশী, ভারতবাসী এটা বেশ ভালভাবেই বুঝে গিয়েছিল। ব্রিটিশ জাতীয়েরা যে তাদের উপকার করতে আসেনি, এটা ভারতবাসী উপলব্ধি

করতে পেরেছিল তাই শাসনব্যবস্থার প্রতিটি পরিবর্তন বা পদক্ষেপকেই তারা সন্দেহের চোখে দেখত। ব্রিটিশের ভারতে আসার সময় থেকেই ভারতবাসীর মনে একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে উঠেছিল, তবে এই মনোভাব খুব চাপা অবস্থায় ছিল। মহাবিদ্রোহেব আগের অনেকগুলি ঘটনাতেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। দিল্লীবাসী মুন্সী মোহনলাল মহাবিদ্রোহ সময়ে ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিলেন। ইনিও পরবর্তীকালে মহাবিদ্রোহের সময়কার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনকালে যারা বেশকিছু গুছিয়ে নিয়েছিল এমন লোকেরাও মহাবিদ্রোহের দিনগুলিতে ব্রিটিশদেব পবাজয় বা লাঞ্ছনাব সংবাদে গোপনে গোপনে উল্লসিত হয়ে উঠত। আর একজন ব্রিটিশ ভক্ত মঈনুদ্দীন হাসান খান্ এই সময়ের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে তৎকালে জনসাধারণ ইংরাজদের বিদেশী অনধিকার প্রবেশকারীরূপেই গণ্য করত।

ধীরে ধীরে ভারতীয় জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠার সমকালেই আরও এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল যাব ফলে মানুষের মনে ব্রিটিশ বাহুবলের অজেয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ জেগে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও গড়ে উঠেছিল যে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বেব অবসানের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এর আগে ভারতীয়দের মনে অবশ্য ধারণা ছিল যে মহাশক্তিধর ব্রিটিশের পরাক্রমের কাছে দাঁড়ানোর সাধ্য জগতে কারো নেই। ব্রিটিশেরা অজেয় নয়, অনেক ক্ষেত্রেই সেটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম আফগান যুদ্ধ (1838-42), পাঞ্জাব যুদ্ধ (1845-49) এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (854-56)-গুলিতে ব্রিটিশ শক্তি রীতিমত পর্যুদস্ত হয়েছিল। 1855-৫ খ্রীষ্টাব্দে বিহার ও বাঙলার সাঁওতাল আদিবাসীগণ শুধুমাত্র কুঠার ও তীর-ধনুকের সাহায্যে তাদের এলাকা থেকে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছিল। একটা সঙ্কীর্ণ এলাকায় সীমিত শক্তি নিয়েও জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে যে ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখীন হতে পারে সাঁওতাল বিদ্রোহ সেটা দেখিয়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্রিটিশ এই যুদ্ধগুলিতে বিজয়লাভ করেছিল, সাঁওতাল বিদ্রোহও তারা দমন করেছিল। তবে এইসব যুদ্ধের ব্যাপারে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্গতি থেকে ভারতবাসী এই শিক্ষা নিতে পেরেছিল যে শুধুমাত্র এশীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ব্রিটিশশক্তিকে পরাজিত করা অসম্ভব নয়। তবে ব্রিটিশশক্তিকে এইভাবে

কম গুরুত্ব দেওয়াটা রাজনৈতিক হিসেবের দিক থেকে খুবই ভুল হয়েছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দে এই রাজনৈতিক ভুলের জন্য বিদ্রোহীদের গুরুতর বিপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 1857-এর বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য অস্বীকার করা সম্ভব বা উচিত নয়। শুধুমাত্র শাসককুলকে অপসারিত করার ইচ্ছাতেই জনসাধারণ কখনও বিপ্লবে যোগ দেয় না। এই ইচ্ছার বাইরে শাসক সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করার মত উপযুক্ত শক্তি তাদের হাতে আছে এইরূপ একটা আত্মবিশ্বাসেরও প্রয়োজন থাকে।

লর্ড ডালহৌসী 1856 খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা (আউধ) রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করে এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ভারতবর্ষ বিশেষতঃ অযোধ্যার মানুষ এই ঘটনায় বিশেষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বিশেষভাবে অযোধ্যা অঞ্চলে এবং কোম্পানীর ভারতীয় সেপাইদের মধ্যে এই ঘটনায় বিদ্রোহের মনোভাব জেগে উঠেছিল। ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে অযোধ্যা রাজ্যের মানুষই বেশী ছিল, স্বাভাবিক কারণেই এরা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। এই সিপাহীদের সাহায্যেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করতে পেরেছিল, কারণ এই সিপাহীদের মধ্যে জাতীয়-চেতনা বা ভারত-বোধ তখনও জাগ্রত হয়নি। কিন্তু তাদের মধ্যে আঞ্চলিক চেতনাবোধ অবশ্যই ছিল, যে অঞ্চলে যার জন্ম সেই অঞ্চল বা প্রদেশের প্রতি তাদের একটা মমত্ববোধ অবশ্যই ছিল। এটাকে আঞ্চলিক দেশ-প্রেম নামে অভিহিত করা যেতে পারে। তাদের নিজেদের মুলুক বিদেশীর দ্বারা অধিকৃত হয়েছে এটা তাদের মনোমত হয়নি। ডালহৌসী কর্তৃক অযোধ্যা প্রদেশ অধিকারের পর ওই প্রদেশের ভূমিরাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছিল। অযোধ্যা প্রদেশে তাদের পরিবারবর্গের কাছ থেকে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করা হচ্ছিল, এতে তাদের আয়ের একটা অংশ খরচ হয়ে যাচ্ছিল—অযোধ্যা প্রদেশের সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের এটাও একটা কারণ হয়ে উঠেছিল।

অযোধ্যা প্রদেশকে ব্রিটিশ শাসনভুক্ত করার ব্যাপারে ডালহৌসীর একটা অজুহাত ছিল যে জনসাধারণকে নবাব ও তালুকদারদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করার জন্যই অযোধ্যা দখল করা হয়েছে। কার্যতঃ এর বিপরীত ব্যাপারই ঘটেছিল। অযোধ্যার জনসাধারণের পক্ষে কোন সুবিধাই প্রাপ্য হয়নি। সাধারণ মানুষের দেয় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তার উপর তাদের উপর খাদ্যদ্রব্য, বাড়ী-ঘর, খেয়া-ঘাট, আফিং এবং বিচার প্রভৃতি

খাতেও কর ধার্য হয়েছিল। সমগ্র ভারতের মতই এখন অযোধ্যা প্রদেশে কৃষক এবং প্রাচীন জমিদারদের হাত থেকে জমি-জমা কুসীদ-জীবী মহাজন অথবা নতুন গজিয়ে উঠা জমিদারদের হাতে চলে যাচ্ছিল। শাসনব্যবস্থা নবাবের হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে হাজার হাজার রাজকর্মচারী, সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও সৈনিকেরা বৃত্তিচ্যুত হয়েছিল, এদের উপর নির্ভরশীল বহুসংখ্যক মানুষেরও রুজি-রোজগারের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই বেকারির ধাক্কা প্রতিটি কৃষকের কুটির পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছিল। অযোধ্যার রাজদরবার ও আমীর-ওমরাহ শ্রেণীর মানুষের আর্থিক দুর্দশার ফলে এঁদের উপর নির্ভরশীল বণিক্, ব্যবসায়ী, হাতের কাজের কারিগরদের চোখের সামনে অনশনের অন্ধকার নেমে এসেছিল। এই বৃত্তিচ্যুত মানুষদের কর্মসংস্থানের জন্য অযোধ্যা প্রদেশের নতুন মালিক অর্থাৎ ইংরাজদের কোন আগ্রহ বা চেষ্টা দেখা যায়নি। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অযোধ্যা প্রদেশ অধিকার করে অধিকাংশ তালুকদার বা জমিদারের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এইগুলি নিজেদের খাসদখলে এনে ফেলেছিল। হৃতসর্বস্ব এই তালুকদার শ্রেণী অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই ব্রিটিশ-রাজের বিপজ্জনক শত্রুশ্রেণীভুক্ত হয়েছিল।

অযোধ্যা প্রদেশের এবং অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ অন্যান্য দেশীয় রাজ্য শাসকদেরও ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। এঁরা এখন বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদের ব্রিটিশ-রাজের প্রতি চরম রাজভক্তি এবং আনুগত্য সত্ত্বেও ব্রিটিশের রাজ্যজয় ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয়নি। এই সময়ে দেশীয় রাজ্যের শাসক এবং ভারতীয় জনসাধারণের কাছে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশ-রাজের মর্যাদা বেশ হ্রাস পেয়েছিল, কারণ এ পর্যন্ত দেশীয় রাজ্যের শাসকদের সঙ্গে চুক্তি করার সময় তাদের দেওয়া মৌখিক বা লিখিত কোন প্রতিশ্রুতি তারাই রক্ষা করেনি। সুবিধা পাওয়া মাত্রই পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তারা রাজ্যটিকে গ্রাস করে ফেলত। বন্ধু বা ত্রাণকর্তা হিসেবে বহু দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পরিণামে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এই চুক্তিভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা একের পর এক রাজ্যগ্রাস নীতি প্রয়োগের কারণেই নানাসাহেব, ঝাঁসীর রাণী এবং বাহাদুর শা কোম্পানীর ঘোরতর শত্রু হয়ে উঠেছিলেন। নানাসাহেব ছিলেন শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র। দ্বিতীয় বাজীরাওকে ব্রিটিশ সরকার একটা নির্দিষ্ট পেনশন বা মাসোহারা দিত। 1851 খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর কোম্পানী তাঁর

দত্তক পুত্র নানাসাহেবকে এই মাসোহারা বা বৃত্তি দিতে অস্বীকার করেছিল। ঝাঁসীর রাজার মৃত্যুর পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঝাঁসী রাজ্য জোর করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিল। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর দাবি ছিল যে তাঁর দত্তক পুত্রকেই ঝাঁসীর অধীশ্বর বলে স্বীকার করে নেওয়া হ'ক। কোম্পানী এতে রাজী হয়নি। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ অতি তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। এই ঘটনায় তিনি বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 1849 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী ঘোষণা করেন যে বাহাদুর শা'র উত্তরাধিকারীকে ঐতিহাসিক লালকেল্লা ছেড়ে দিল্লীর প্রান্তভাগে কুতুবের দিকে গিয়ে একটা সাধারণ ধরনের বাড়ীতে বাস করতে হবে। এই প্রস্তাবটি মুঘল বংশের উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে মর্যাদাহানিকর রূপে বিবেচিত হয়েছিল। 1856 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করেছিলেন যে বাহাদুর শা'র মৃত্যুর পর মুঘলদের 'বাদশা' উপাধি আর বহাল থাকবে না, তারা অতঃপর কুমার বা বাদশাজাদা আখ্যা দ্বারা অভিহিত হবে।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরাগের একটা ধর্মীয় কারণও ছিল। ভারতীয় মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে ইংরাজ শাসনে তারা ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হবে। এই আতঙ্কের কারণ ছিল খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের ব্যাপক কর্মসূচী। বিদ্যালয়, হাসপাতাল, জেলখানা এমন কি হাটে-বাজারেও এদের সক্রিয় দেখা যেত। এই খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেরা সাধারণ মানুষকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হতে প্রলুব্ধ করত আর এই উদ্দেশ্যে যত্রতত্র প্রকাশ্য-ভাবে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে জঘন্য ও মিথ্যা প্রচার চালাত। সাধারণ মানুষের চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কারগুলি ছিল এদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল। এমন কি, এদের কাজের যাতে কেউ কোন বিরোধিতা না করতে পারে তার জন্য এদের পুলিশী প্রহরা দিয়ে সাহায্যও করা হত। এরা যাদের ধর্মান্তরিত করেছিল, তাদের উপস্থিতি থেকেই জনসাধারণ বুঝে নিত যে তাদের পিতৃ-পুরুষের ধর্ম যে বিপন্ন এটা অলীক আশঙ্কা নয়, এটা রূঢ় সত্য। বিদেশী শাসকশ্রেণীর যোগসাজসেই এদেশে ধর্মান্তরীকরণের ঘটনাগুলি ঘটছে জন-সাধারণের এই বিশ্বাস যে মিথ্যা ছিল না, তা খোদ সরকার কর্তৃক প্রচলিত কয়েকটি আইন ও কিছু রাজকর্মচারীর আচরণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 1850 খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার এমন একটি আইন বিধিবদ্ধ করেছিল যার মর্ম ছিল এই যে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বনকারীকে তার পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার

থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। সৈন্যবাহিনীর সুবিধার জন্য যেমন চিকিৎসক রাখা হত তেমনি তাদের দৈনন্দিন ধর্মচর্যার জন্য খ্রীষ্টান পুরোহিত বা চ্যাপলেনও রাখা হত। এই জন্য যে খরচ হত, সেটা গভর্নমেণ্টই বহন করত। উচ্চপদস্থ বহু বেসামরিক সরকারী কর্মচারী এবং সামরিক কর্মচারী খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারকার্যে সহায়তাদান ব্যাপারটিকেই পুণ্যকর্ম বলে মনে করত এবং এদের উৎসাহে সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ও জেলখানার কয়েদীদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা তাদের ধর্মপ্রচারের সুযোগ পেত। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উচ্চ রাজকর্মচারীদের এই উৎসাহদান জনসাধারণের মনে বেশ আশঙ্কার সঞ্চার করেছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দে আর. ডি. ম্যানগেলস্-এর হাউস অফ কমন্সে প্রদত্ত একটি ভাষণে বলা হয়েছিল "খ্রীষ্টধর্মের বিজয় পতাকা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সগৌরবে উড্ডীন রাখার জন্যই ভাগ্য-বিধাতা হিন্দুস্তানের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ইংল্যাণ্ডের হাতে তুলে দিয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কাজে প্রত্যেককেই আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবেই।" এই ভাষণটি পাঠ করার পর ভারতবাসীর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়েছিল—যে ভারতীয়গণের ধর্মান্তরিত হওয়া অনিবার্য হয়ে উঠতে চলেছে।

ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদের পরামর্শে ইতিপূর্বে গভর্নমেণ্ট কিছু মানবতা বিরোধী কুপ্রথা আইন দ্বারা রদ করে দিয়েছিল। রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন বহু মানুষ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ইংরাজ সরকারের উপর বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এদের মত এই ছিল যে, এই বিদেশী সরকারের তাদের ধর্ম এবং আচার-আচরণ নিয়ে মাথা ঘামানো নিতান্ত অনধিকার চর্চা। সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবার পুনর্বিবাহ বিষয়ে আইন প্রণয়ন, স্ত্রীলোকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচার প্রভৃতি সংস্কারমূলক কাজগুলিকে তারা এই অনধিকার চর্চা বা অযথা হস্তক্ষেপের নিদর্শনরূপে গণ্য করে নিয়েছিল। মন্দির বা মসজিদ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট ভূমি ও এদের পরিচালক পুরোহিত বা মোল্লাদের এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির জমির উপর করভার আরোপের সরকারী নীতি ভারতীয় মানুষদের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত করেছিল, কারণ এর পূর্বে ভারতীয় শাসকদের আমলে এই ধরনের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি করভার থেকে মুক্ত ছিল। এইসব নিষ্কর জমির উপর নির্ভরশীল বহু ব্রাহ্মণ ও মুসলমান পরিবার এই করভারের চাপে বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচার করতে

আরম্ভ করেছিল যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় ধর্মগুলিকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছে।

1857-এর বিদ্রোহ প্রথম জেগে উঠেছিল কোম্পানীর সিপাহীদের মধ্যে। যে সিপাহীদের নির্ভেজাল আনুগত্যের বলে কোম্পানী ভারতবর্ষ জয় করতে পেরেছিল সেই সিপাহীরা কেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তা আমাদের ভালভাবে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে সিপাহীরা ব্রিটিশের বেতনভুক্ হলেও আসলে ছিল তারা ভারতবর্ষেরই মানুষ। তাদের দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতা ও বোধশক্তি সাধারণ ভারতীয়দের থেকে আলাদা ছিল না। অসামরিক ভারতীয় সমাজের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও হতাশা তাদের অন্তঃকরণেও প্রতিফলিত হত। ব্রিটিশ শাসনের শোষণমূলক অর্থনীতি সামরিক ছাউনির বাইরে অবস্থিত তাদের আত্মীয়স্বজনকে যে দুর্দশার কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল সেই বেদনা তাদের মনকেও ভারাক্রান্ত করে তুলত। জনসাধারণের মত এদের মনেও এই আশঙ্কার উদ্ভব হয়েছিল যে ইংরাজ-শাসক তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করছে এবং এরা ভারতের জনসাধারণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার সঙ্কল্প নিয়েছে। তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেও তারা ইংরাজের এই কু-মতলবের আভাস লাভ করেছিল। এরা জানত যে সৈন্যবাহিনীতে সরকারী খরচে খ্রীষ্টান পাদ্রী পোষা হয়ে থাকে। কিছু কিছু উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারীকেও নিজের নিজের ধর্মোন্মাদনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সিপাহীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করতে দেখা যেত। সৈন্যবাহিনীতে নিজ নিজ ধর্মাচরণ ও জাত-পাত রক্ষার পথের বাধাগুলিও এদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করত। তখনকার দিনে ভারতীয় সমাজে জাতি-রক্ষা সম্বন্ধে বিধিনিষেধগুলি বেশ কঠোর ছিল। অবশ্য এই বিধিনিষেধগুলি নিষ্ঠাসহকারে সকলেই মেনে চলত। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল যে কোন সিপাহী তার জাতিনির্দেশক কোন চিহ্ন ধারণ করতে পারবে না, এমন কি দাড়ি রাখা বা পাগড়ী পরাও নিষিদ্ধ ছিল। 1856 খ্রীষ্টাব্দে আইন জারী করা হয়েছিল যে নবনিযুক্ত যে কোন সিপাহীকে প্রয়োজনবোধে ভারতের বাইরে অর্থাৎ সাগরপারের কোন দেশে যেতে হতে পারে, এক্ষেত্রে কোন আপত্তি টিকবে না। এই আইন সিপাহীদের কাছে তাদের ধর্মমতের পরিপন্থীরূপে বিবেচিত হয়েছিল।

কারণ তখনকার দিনের হিন্দুদের মধ্যে এমনই একটা বিশ্বাস ছিল যে সাগর পার হওয়া নিষিদ্ধ, সাগর পার হওয়ার অনিবার্য পরিণাম জাতি-নাশ।

নিয়োগ-কর্তা প্রভুদের বিরুদ্ধে সিপাহীদের বিক্ষোভের আরও অনেক কারণ ছিল। ব্রিটিশ-জাতীয় উচ্চতম সামরিক কর্মচারীগণ ভারতীয় সিপাহীদের ঘৃণার চোখে দেখত। সমসাময়িক কালের একজন ইংরাজ পর্যবেক্ষক এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে "সিপাহী ও ব্রিটিশ উচ্চতম সামরিক কর্মচারী মধ্যে কোন বন্ধুত্ব বা সহমর্মিতা বোধ ছিল না। দুই দলই যেন ছিল বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরের অপরিচিত। সামরিক বাহিনীতে সিপাহীদের নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব রূপে গণ্য করা হত। তাদের গালিগালাজ করা হত, তাদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহারও চলত। তাদের বলা হত 'নিগার', শূয়োর ইত্যাদি। বয়সে তরুণ ইংরাজ সেনানী তার অধস্তন বয়োজ্যেষ্ঠ সিপাহীর সঙ্গেও এইরূপ ব্যবহার করত।" একজন ভারতীয় 'সিপাহী' ও একজন সাধারণ ব্রিটিশ সৈনিক সমশ্রেণীর যুদ্ধ-নৈপুণ্য সত্ত্বেও, ভারতীয় সিপাহীকে তুলনামূলকভাবে বেশ অল্প বেতন দেওয়া হত। ব্রিটিশ সৈনিকের তুলনায় ভারতীয় সিপাহীদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থাও নিকৃষ্ট ছিল। একজন ভারতীয় সিপাহীর পদোন্নতির সুযোগও ছিল নিতান্ত অল্প। একজন ভারতীয় সিপাহীকে সুবেদার পদের চেয়ে উচ্চতর কোন পদে নিযুক্ত করা হত না। এই সর্বোচ্চ পদের বেতন ছিল 60-70 টাকার মধ্যে। বস্তুতঃ একজন সিপাহীর জীবন ছিল যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। ভারতীয় হওয়ার অপরাধে এইভাবে হীনতার বোঝা বহন করে চলা সিপাহীদের পক্ষে অতঃপর দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এ সম্বন্ধে ইংরাজ ঐতিহাসিক টি. আর. হোমস লিখেছিলেন যে একজন ভারতীয় সিপাহী হায়দরআলির মত সামরিক নৈপুণ্য দেখিয়েও কখনও আশা করতে পারত না যে তার বেতন একজন সাধারণ ইংরাজ সৈনিকের সমতুল্য হবে। তিরিশ বছর যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করার পরও তার পদমর্যাদা বাড়ত না। ইংল্যাণ্ড থেকে সদ্য-আগত একজন তরুণ সৈনিকের (Ensign) উদ্ধত আচরণ বা হুকুম তাকে মেনে চলতে হত।

দূরদেশে যুদ্ধ করতে গেলে ভারতীয় সেপাইদের কিছু অতিরিক্ত ভাতা বা বাট্টা পাওনা হত। বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার কিছু পূর্বে সামরিক বিভাগ একটা হুকুম জারী করেছিল যে সিন্ধু অথবা পাঞ্জাবের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত সিপাহীদের এই বাট্টা দেওয়া হবে না। বহু সৈনিকের আয় এই বাট্টা বন্ধ

করে দেওয়ার জন্য বেশ কমে গিয়েছিল। কোম্পানীর বহু সিপাহী 'আউধ' রাজ্যের অধিবাসী ছিল। তাদের নিজস্ব মুলুক কোম্পানী দখল করে নেওয়ার ফলেও সিপাহীদের মনে প্রচুর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল।

সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। 1764 খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে একবার সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ ত্রিশজন বিদ্রোহী সিপাহীকে কামানের মুখে ফেলে উড়িয়ে দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করেছিল। 1806 খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরের সিপাহী বিদ্রোহ ভয়াবহ নৃশংসতা সহকারে দমন করা হয়েছিল। 1824 খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরের 47th রেজিমেণ্টভুক্ত সিপাহীরা জলপথে ব্রহ্মদেশ অভিযানে যেতে অস্বীকার করেছিল। এই রেজিমেণ্টটি ভেঙ্গে দিয়ে, এর সিপাহীদের নিরস্ত্র করে তাদের সকলকে কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সিপাহীদের যারা নেতা ছিল তাদের কামানের সাহায্যে হত্যা না করে ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে মারা হয়েছিল। 1844 খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যবাহিনীর সাতটি 'ব্যাটেলিয়ান' বা দল বেতন ও বাট্টা বৃদ্ধির দাবিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। আফগান যুদ্ধ চলাকালে আফগানিস্থানে ভারতীয় সিপাহীরা প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণার মুখোমুখি এসেছিল। দুজন সুবাদার সিপাহীদের মুখপাত্র হিসেবে তাদের অসন্তোষের কথা কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে এসেছিল, এদের মধ্যে একজন ছিল হিন্দু অন্যজন মুসলমান। সামরিক কর্তৃপক্ষ এই দুইজনকেই গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে ফ্রেডরিক হ্যালিডেকে মন্তব্য করতে হয়েছিল যে 'বেঙ্গল আর্মি' সব সময় কম-বেশি বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন, যে কোন সময় তারা বিদ্রোহ করতে পারে। একটা উস্‌কানি বা সুবিধা পেলে এরা অনেক আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারত। এই ফ্রেডরিক হ্যালিডে 1858 খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার লেপ্টনাণ্ট্ গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় জনসাধারণের এবং কোম্পানীর সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব বেশ ব্যাপক রূপই ধারণ করেছিল। পরবর্তীকালে সৈয়দ আহম্মদ তাঁর লিখিত **Causes of the Indian Mutiny** (ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ) গ্রন্থে বিদ্রোহের কারণগুলি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন "অবশেষে ভারতীয়দের মনের অভ্যাসই দাঁড়িয়ে গেল যে ব্রিটিশেরা যা কিছু আইনকানুন প্রচলিত করছে

তার উদ্দেশ্য হ'ল তাদের অপমান ও ধ্বংসসাধন সর্বোপরি তাদের নিজের নিজের ধর্ম-নাশ।...একেবারে শেষদিকে জনসাধারণ ইংরাজ সরকারকে কম-মাত্রায় বিষ প্রয়োগ দ্বারা পরিণামে হত্যাকারী, প্রতারণার উদ্দেশ্যে চোখে ধূলি নিক্ষেপকারী, অথবা আগুনের সাহায্যে গৃহদাহকারী রূপে গণ্য করতে অভ্যস্ত হল। তাদের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে একটি বিশেষ দিনে তারা সরকারের কবল থেকে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেলেও কাল অর্থাৎ পরের দিন তার খপ্পরে পড়্‌বে। ভাগ্যক্রমে 'কাল' রক্ষা পেলে পরশু দিন তার সর্বনাশ অবধারিত। আজ হ'ক কাল হ'ক, বা পরশুই হ'ক তার সর্বনাশ সুনিশ্চিত।...জনসাধারণ এই সরকারের অপসারণ কামনা করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সম্ভাবনায় তারা আন্তরিকভাবে হৃষ্ট হয়েছিল।"

এই মর্মে দিল্লী থেকে বিদ্রোহীদের প্রচারিত একটি ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে "যেখানে রাজস্ব হওয়া উচিত 200 টাকা সেখানে ইংরাজ সরকার 300 টাকা রাজস্ব নিচ্ছে। যেখানে 400 প্রাপ্য সেখানে আদায় করছে 500 টাকা, এতেও এদের তৃপ্তি নেই এরা আরও বেশী টাকা উশুল করতে চাইছে। এর ফলে জনসাধারণের সর্বনাশ হবে, তারা ভিক্ষুক হতে বাধ্য হবে। দ্বিতীয়তঃ, এরা চৌকিদারী করের হার দ্বিগুণ, চারগুণ ধার্য করে সন্তুষ্ট থাকেনি, এই হার দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এর উদ্দেশ্য শুধু প্রজাদের সর্বনাশ। (ইংরাজ শাসনে) সকল সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিতশ্রেণীর জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি জীবিকাচ্যুত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনধারণের উপযোগী নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে গভীর দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। জীবিকার অন্বেষণে এক জেলা থেকে আর এক জেলায় যাওয়ার পথে প্রতিটি লোককে ছয় পাই পথ-কর দিতে বাধ্য করা হয়, গাড়ী পিছু চার থেকে আট আনা আদায় করা হয়। যারা এই 'কর' দিতে পারে শুধু তারাই রাজপথ ব্যবহার করতে পারে। এই অত্যাচারীদের অত্যাচারের কটা নিদর্শনই আমরা দিতে পারি! এমন একটা অবস্থা এসেছে যখন এই সরকার আমাদের দেশের সকলের ধর্মের উপরই হস্তক্ষেপ করছে।"

ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ চরমসীমায় পৌঁছানোর বহিঃপ্রকাশ রূপে 1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল। তবে এই ঘটনা মোটেই আকস্মিক ছিল না, জনবিক্ষোভ বহুদিন ধরে ধূমায়িত হয়ে আসছিল। বহু চতুর ব্রিটিশ রাজকর্মচারী এই অসন্তোষের লক্ষণগুলি ধরতে পেরে গভর্নমেণ্টকে সতর্ক করে দিতে ভোলেনি।

1757 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের সূচনা কাল থেকেই একের পর এক বহু গণ-বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ এটাই জানিয়ে দিয়েছিল যে একদিন না একদিন এই বিক্ষোভ প্রবল ঝঞ্ঝার আকারে ফেটে পড়্বে। ঐতিহাসিকেরা 1857 খ্রীষ্টাব্দের আগে সংঘটিত বহু বিদ্রোহের বিবরণ লিপি-বদ্ধ রেখে গিয়েছিলেন। এই বিদ্রোহ বা বিপ্লবগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ কচ্ছ বিদ্রোহ, 1831-এর কোল-বিদ্রোহ এবং 1855 খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহই ইতিহাসে বিশেষভাবে খ্যাত হয়েছে। 1816 থেকে 1852 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাচ্ছী নেতাদের নেতৃত্বে কচ্ছ বিদ্রোহ কোন না কোনরূপে অর্থাৎ কখনও কম বা কখনও বেশী এইভাবে টিকে ছিল। ছোটনাগপুরের কোল আদি-বাসীগণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল কারণ ব্রিটিশ শাসকেরা এদের মধ্যে বাইরে থেকে লোক এনে তাদের জমিদাররূপে খাড়া করে দিয়ে-ছিল। ব্রিটিশেব পৃষ্ঠপোষকতায় সুদখোর মহাজনশ্রেণীর লোকেরাও তাদের এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। সহস্র সহস্র কোল বিদ্রোহীব প্রাণ-নাশ করে ইংবাজেরা এই অঞ্চলে পুনরায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক। সাঁওতালদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল, সুদখোর মহাজনশ্রেণী এবং তাদের পৃষ্টপোষক ব্রিটিশ সরকার। সহস্র সহস্র সাঁওতাল বিদ্রোহী হয়ে ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাদের নিজস্ব স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিল। শেষপর্যন্ত 1856 খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ

1857 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবের একটা পটভূমিকা গড়ে উঠেছিল। বিদ্রোহের মালমশলা বলতে যা বোঝায় তা তৈরীই হয়েছিল। সেই মালমশলায় মাত্র একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সংযোগেরই শুধু অপেক্ষা ছিল। মানুষের মনের চাপা আগুন ফেটে পড়তে চাইছিল ; শুধু একটা ইন্ধনের প্রয়োজন ছিল। এমন একটা কিছু ঘটনা যাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবের ডাক দিতে পারা যায়। চর্বিযুক্ত বন্দুকের গুলির ঘটনাই সিপাহীদের মধ্যে এই ইন্ধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে দিয়েছিল। এই সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করেই সাধারণ মানুষও বিদ্রোহের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল।

ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে নূতন ধরনের এনফিল্ড নামের একজাতীয় বা রাইফেলের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছিল। এই রাইফেলের টোটা-

গুলি চর্বিমাখানো মোড়কের মধ্যে মোড়া থাকত। দাঁত দিয়ে এই মোড়কটি ছিঁড়ে টোটাগুলি বন্দুকের মধ্যে ভরে নিতে হত। কখনও কখনও গরু অথবা শূকরের চর্বি এই মোড়কে ব্যবহৃত হত। সিপাহীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়েরই মানুষ ছিল। এই চর্বিমাখানো মোড়ক দাঁত দিয়ে কেটে নেওয়ার হুকুম দুই ধর্মাবলম্বী সিপাহীদেরই ধর্মবোধকে আঘাত করেছিল। সিপাহীদের মধ্যে অনেকেরই মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে সরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের দিয়ে ধর্মহানিকর কাজ করাতে চাইছে। এবার বিদ্রোহ ঘোষণা না করলে আর চলে না।

বিদ্রোহের সূচনা

1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ পূর্বপরিকল্পনাহীন একটা আকস্মিক বিস্ফোরণ অথবা সযত্নকল্পিত গুপ্ত-সংগঠনের ফল কিনা সেটা নির্ধারণ করা কঠিন কাজ। 1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের আলোচনা বা চর্চার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা অসুবিধা এই যে, যে উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে এটা চালাতে হয় সেগুলি সবই ইংরাজদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিবরণ বা তথ্য। বিদ্রোহে যারা নেতৃত্ব করেছিল তাদের লিখিত কোন তথ্য বা নথিপত্র পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ যেহেতু তারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সেটা তৎকালীন সরকারের চোখে আইনবিরুদ্ধ সেই-হেতু বিদ্রোহীরা কোন লেখা-লিখির ব্যাপারে হাত দেয়নি, কাগজপত্র কিছু ব্যবহার করা হলেও সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে ফেলা হত। বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়েছিল, কেউ কেউ বা মারাও গিয়েছিল, যারা বেঁচেছিল তারা ছিল হয় পলাতক নয় বন্দী। এই ঘটনা সম্বন্ধে তাদের যা বক্তব্য, তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহ দমনের দীর্ঘকাল পরেও বিদ্রোহের সপক্ষে অথবা বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিসূচক কোন মন্তব্যের সন্ধান পেলে ব্রিটিশ সরকার সেগুলি নষ্ট করে ফেলত। সংশ্লিষ্ট পক্ষকেও কঠোর সাজা দেওয়া হত। একদল ঐতিহাসিক ও লেখক এই মত প্রকাশ করেছেন যে এক ব্যাপক এবং সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এই বিদ্রোহের কারণ। তারা দেখিয়েছেন যে বিদ্রোহের প্রাদুর্ভাবের আগে চাপাটি ও রক্তপদ্ম বিলি করা হয়েছিল এবং ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী, ফকির ও মাদারীগণ বিদ্রোহের সপক্ষে প্রচারে নেমেছিল। এঁরা আরও দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভারতীয় সিপাহীদের নিয়ে গঠিত 'রেজিমেণ্ট'গুলি এক গোপন সংগঠন গড়ে

নিয়ে 1857 খ্রীষ্টাব্দের 31শে মে দিনটিতে তাদের সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণায় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিল। এঁদের মতে নানাসাহেব এবং ফৈজাবাদের মৌলভী আহাম্মদ শা এই দুজন ছিলেন বিদ্রোহীদের সর্বাধিক সক্রিয় নেতা। আর একদল লেখক বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চান যে এই বিদ্রোহের পিছনে কোন সযত্ন পরিকল্পনা কার্যকর ছিল না। এঁদের যুক্তি এই যে বিদ্রোহের আগে বা পরে এমন এক টুকরো কাগজও মেলেনি যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে এই বিপ্লবের পূর্বে একটা সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ছিল। বিদ্রোহের পরিকল্পনা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল কেউ কোন দিন এটা প্রমাণ করতে এগিয়েও আসেনি। আগেভাগে ষড়যন্ত্রজাল পরিকল্পনা থাকলে এর অনুকূলে কিছু না কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যেত। এই দুই বিপরীত মতবাদের মাঝামাঝি কিছু একটা এই বিদ্রোহের কারণ হওয়াই সম্ভব। অর্থাৎ এই দুই মতাবলম্বীদের ধারণার মধ্যেই কিছুটা সত্য কিছুটা মিথ্যা। আমাদের মনে হয় বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র আগেভাগেই সংঘটিত হয়েছিল, তবে সংগঠনের কাজ বা প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই আকস্মিকরূপেই এই বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

বিদ্রোহ সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল 1857 খ্রীষ্টাব্দের দশই মে দিল্লী থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত মীরাট শহরে। এই বিদ্রোহ অতি প্রবল আকার নিয়ে সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোষমুক্ত অসির মতই ছিল এই বিদ্রোহের ক্ষিপ্র ও হিংস্র গতি। উত্তরে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে নর্মদার তীরভূমি, পূর্বে বিহার থেকে পশ্চিমের রাজপুতানা, এই চতুঃসীমাভুক্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড এই বিদ্রোহের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

মীরাটে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করার আগেই মঙ্গল পাণ্ডেকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। মঙ্গল পাণ্ডে ছিলেন একজন তরুণ সিপাহী। এককভাবে বিদ্রোহী হয়ে তিনি তাঁর উচ্চতর ইংরাজ সৈনিকদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। এই অপরাধে 1857 খ্রীষ্টাব্দের উনত্রিশে মার্চ তাঁকে ফাঁসীকাঠে ঝোলান হয়েছিল। এই ঘটনা এবং এরই অনুরূপ কতকগুলি ঘটনা থেকে এটা বোঝা যায় যে সিপাহীদের মধ্যে একটা অসন্তোষ ও বিদ্রোহের মনোভাব ধূমায়িত হচ্ছিল। এবং তারপরই মীরাটে এর বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ হয়েছিল। চব্বিশে এপ্রিল তৃতীয় ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর নব্বই জন সিপাহী তাদের বন্দুকে ব্যবহারের জন্য চর্বিযুক্ত টোটা নিতে অস্বীকার

করেছিল। মে মাসের ন' তারিখে এদের মধ্যে পঁচাশি জন সিপাহীকে বরখাস্ত করে দীর্ঘ দশ বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, শুধু তাই নয়, এদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখার শাস্তিও দেওয়া হয়েছিল। মীরাটে অবস্থিত অবশিষ্ট ভারতীয় সিপাহীগণ এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে বিদ্রোহ করে বসেছিল। ঠিক পরের দিন অর্থাৎ দশই মে, এরা এদের ঊর্ধ্বতম সামরিক কর্মচারীদের হত্যা করে বন্দী সহকর্মীদের উদ্ধার করেছিল এবং বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছিল। চুম্বক দ্বারা লোহা যেভাবে আকৃষ্ট হয় সেইভাবে অতঃপর এই বিদ্রোহী সৈনিকেরা সূর্যাস্তের পর দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হয়েছিল। পরের দিন সকালবেলা মীরাটের সৈন্যদল দিল্লীতে উপস্থিত হওয়া মাত্র দিল্লীর অশ্বারোহী সিপাহীরা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইউরোপীয় সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যা করে দিল্লী শহরটি দখল করে নিয়েছিল। এই বিদ্রোহী সিপাহীরা বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য বাহাদুর শা'কে ভারতের সম্রাট্ রূপে বরণ করে নিয়েছিল। এই ঘটনার পর দিল্লীই মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল। বাহাদুর শা'কে এই মহাবিদ্রোহের নায়ক বা প্রতীক হিসেবে খাড়া করা হয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেষ মুঘল নৃপতিকে মহা-বিদ্রোহের সর্বোচ্চ পদে বরণ করে নেওয়ার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। মুঘলবংশের দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্ব ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে একটা ঐক্য-বিধায়ক শক্তি ছিল তারই এটা স্বীকৃতি। বাহাদুর শা'কে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়ে সিপাহীরা এটা বোঝাতে চেয়েছিল যে এটা শুধু সিপাহী বিদ্রোহ নয় এটা বিদেশীর বিরুদ্ধে একটা বৈপ্লবিক সংগ্রাম। শুধু এইমাত্র কারণেই ভারতের সকল প্রান্ত থেকে সিপাহীরা দিল্লী অভিমুখে ছুটে গিয়েছিল, কাউকে কোন নির্দেশই এ সম্বন্ধে দেওয়া হয়নি। যেসব ভারতীয় রাজন্য বা নেতৃবৃন্দ এই বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরাও বিনা নির্দেশে মুঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ঘোষণায় বিলম্ব করেননি। সিপাহীদের প্ররোচনায় এবং সম্ভবতঃ তাদের চাপের বশীভূত হয়ে স্বয়ং বাহাদুর শা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্ত রাজা, নবাব, সর্দার প্রভৃতির উদ্দেশ্যে একটি করে পত্র পাঠিয়ে-ছিলেন। এই পত্রে ভারতীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে এমন একটি রাজ-নৈতিক সংস্থা বা ব্যবস্থা গঠনের প্রস্তাব ছিল যা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে তাদের হটিয়ে একটি দেশীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

'বেঙ্গল-আর্মি'তে শুধু বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তাই নয়, এটা দ্রুত বিস্তীর্ণও হয়েছিল। আউধ, রোহিলখণ্ড, দোয়াব, বুন্দেলখণ্ড, মধ্যভারত, বিহারের অধিকাংশ এবং পূর্ব-পাঞ্জাব—এইসব প্রান্তে ব্রিটিশের কর্তৃত্ব মুছে ফেলা হয়েছিল। বহু সামন্ত-শাসিত রাজ্যের নবাব বা রাজা তাদের ব্রিটিশ প্রভুদের প্রতি আনুগত্যে অটল থাকলেও ঐসব রাজ্যের সৈনিকেরা হয় বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল অথবা বিদ্রোহের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দোরের সেনাবাহিনীর অনেকেই বিদ্রোহী হয়ে সংগ্রামী সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করেছিল। গোয়ালিয়র রাজ্যের 20,000 হাজার সৈনিক তাঁতিয়া টোপীর অথবা ঝাঁসীর রাণীর দলে যোগ দিয়েছিল। রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের ছোট ছোট বহু সামন্ত রাজা তাদের প্রজাগণের সমর্থনে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই বিপ্লবে সামিল হয়েছিল। প্রজাদের এই বিপ্লব সমর্থনের কারণ ছিল তাদের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ। হায়দ্রাবাদে ও বাংলার বিক্ষিপ্ত এলাকাতেই এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।

দৈর্ঘ ও প্রস্থে ব্যাপক এলাকা জুড়ে এই মহাবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল, এর গভীরতা ও তীব্রতাও ব্যাপক হয়েছিল। উত্তর এবং মধ্যভারতের সর্বত্র সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে জনসাধারণের বিদ্রোহও মিলিতরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সিপাহীরা ব্রিটিশের প্রভুত্ব অমান্য ঘোষণা করার সঙ্গে প্রায়শই দেখা গিয়েছিল যে সাধারণ মানুষও বর্শা, টাঙ্গি, তীর-ধনুক, লাঠি, কাস্তে বা গাদা বন্দুক জোগাড় করে ইংরাজ নিধনে উদ্যত হয়েছে। কোন কোন জায়গায় সিপাহীরা বিদ্রোহ আরম্ভ করার আগেই সাধারণ মানুষ ইংরাজের সঙ্গে লড়াই-এ নেমে পড়েছিল। সিপাহীদের ছাউনি নেই এমন সব জায়গাতেও জনসাধারণকে বিদ্রোহে মেতে উঠতে দেখা গিয়েছিল। বিশেষভাবে বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার নামে পরিচিত রাজ্য দুটিতে চাষী-মজুর শ্রেণীর সাধারণ মানুষের ব্যাপকভাবে বিদ্রোহে যোগদান এই মহাবিদ্রোহকে প্রচুর শক্তিশালী করে তুলেছিল। সাধারণ মানুষের এই বিপ্লবে অংশগ্রহণের জন্য এটা আর শুধু সিপাহী বিদ্রোহ পর্যায়ে থাকেনি, এটা হয়ে উঠেছিল একটা গণ-বিপ্লব। এই অঞ্চলগুলিতে কৃষক ও প্রাচীন জমিদারকুল কুসীদজীবি মহাজন এবং টাকার জোরে প্রাচীন জমিদারদের উৎসাদনকারী নয়া জমিদারদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের বহুদিনের অবরুদ্ধ ক্ষোভ তৃপ্ত করেছিল। বিদ্রোহের সুযোগে এরা মহাজনশ্রেণীর হিসাব বই, টাকা ধারের খৎ

প্রভৃতি কাগজপত্র নষ্ট করে দিয়েছিল। এই বিদ্রোহীরা ব্রিটিশরাজ স্থাপিত আদালত, খাজনার নথিপত্র সমন্বিত খাজনা আদায়ের কার্যালয় (তশীল), থানা প্রভৃতির উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। এই বিদ্রোহ প্রসঙ্গে একটা গুরুত্ব-পূর্ণ তথ্য এই যে ইংরাজের বিরুদ্ধে এই লড়াই-এর বহু রণাঙ্গনে সিপাহীদের চেয়ে জনসাধারণের সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হয়েছিল। একটা হিসেব থেকে জানা যায় যে ইংরাজ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই-এ আউধ রাজ্যে 150,000 বিদ্রোহী নিহত হয়েছিল, এর মধ্যে অসামরিক অর্থাৎ সিপাহী নয় এমন মৃত বিদ্রোহীর সংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক ছিল।

এটা আরও লক্ষণীয় বিষয় যে যেখানে জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি, সেইসব স্থানেও জনমত বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বিদ্রোহীদের সাফল্যের সংবাদে এরা উল্লাস প্রকাশ করত। যে সব সিপাহী বিদ্রোহে যোগ না দিয়ে তাদের রাজভক্তি দেখিয়েছিল, জনসাধারণ সামাজিকভাবে তাদের 'একঘরে' হিসেবে বর্জন করে চলত। জনসাধারণ খোলাখুলিভাবে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর প্রতি শত্রুমনোভাব প্রকাশ করত। এদের কোনভাবেই সাহায্য দেওয়া হত না। সিপাহীদের সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর এরা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে দিত না। এমন কি অনেক সময় অনুসন্ধানকারী ব্রিটিশ সৈন্যদের ভুল খবর দিয়ে বিপদে ফেলা বা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করত। 'লণ্ডন টাইমস্' পত্রের সংবাদদাতারূপে ডব্লু. এইচ. রাসেল (W. H. Russel) 1858-1859 খ্রীষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণ করেন। ইনি লিখেছেন, "শ্বেতকায় অর্থাৎ ইংরাজদের গাড়ী রাস্তা দিয়ে গেলে বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে, সেই গাড়ীর দিকে দেশীয় মানুষেরা যেভাবে তাকিয়ে থাকত তার থেকে তাদের এই গাড়ীর আরোহীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাবই প্রকাশ পেত। তাদের চোখের আগুনে, নিঃসন্দেহে তাদের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ফুটে উঠত। এতে কোন ভুল হবার কথা ছিল না। শুধু জনসাধারণের এই নীরব অভিব্যক্তি থেকেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে এমন একটা সময় এসেছে যখন ভারতের বহু লোক আর ব্রিটিশজাতকে বিশেষ ভয়ের চোখে দেখে না। যারা ভয় করে তাদের মনোভাবও ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ। মোট কথা ব্রিটিশকে ভয় করে বা করে না এমন দুই শ্রেণীর দেশীয় মানুষই ব্রিটিশজাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকে।"

ইংরাজ বিদ্রোহ-দমনের কাজে নামার পর এই বিদ্রোহের পেছনে যে

জনসমর্থন ছিল তা ধরা পড়েছিল। শুধু বিদ্রোহী সিপাহীদের দমন করেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাজ শেষ হয়নি। দিল্লী, অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ, আগ্রা, মধ্যভারত, পশ্চিম বিহার প্রভৃতি প্রান্তগুলির সাধারণ মানুষকে সায়েস্তা করতে গ্রামের পর গ্রাম জনপদ ইত্যাদি আগুনে জ্বালিয়ে বহু-সংখ্যক গ্রাম ও নগরবাসীকে তাদের হত্যা করতে হয়েছিল। বিদ্রোহী জনসাধারণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেওয়ার জন্য বিনা বিচারে ফাঁসি দিয়ে বা অন্য উপায়ে তাদের প্রাণনাশও করা হয়েছিল। ইংরাজের এই 'মরিয়া' আচরণ থেকেই বোঝা যায় যে এইসব অঞ্চলে বিদ্রোহের মনোভাব কতদূর ব্যাপক ও বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল। সিপাহী এবং তাদের সমর্থনকারী জনগণ শেষ পর্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গেই লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। এরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছিল বটে তবে মনোবল এরা হারায়নি। এ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড ডাফ্ মন্তব্য করেছিলেন, "এই বিদ্রোহ যে সিপাহী বিদ্রোহ নয় এটা যে একটা যুদ্ধ বা বিপ্লব তার প্রমাণ এই যে, এপর্যন্ত এই বিদ্রোহ নির্বাপিত করার কাজ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি।" লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকার সংবাদদাতার মন্তব্যেও ঠিক অনুরূপ মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন যে বিদ্রোহের পর প্রকৃতপক্ষে ইংরাজকে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়বার জয় করতে হয়েছে।

1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের শক্তির প্রধান উৎস হয়ে উঠেছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। যেমন সিপাহীদের মধ্যে তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমান বিদ্রোহের ঘটনায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে নেমেছিল। অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এই ব্যাপারে পরস্পরের সহযোগী হয়েছিলেন। প্রতিটি বিদ্রোহী বাহাদুর শা—যিনি মুসলমান ছিলেন, তাঁকে সম্রাট্ বলে মেনে নিতে দ্বিধা করেনি। মীরাটের হিন্দু সিপাহীগণ বিদ্রোহী হয়ে সর্বপ্রথম দিল্লীর দিকেই অগ্রসর হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান বিদ্রোহীরা একে অন্যের ধর্মমতাদি মনোভাবের প্রতি সহন-শীলতা দেখাত। এর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কোন বিশেষ অঞ্চল ইংরাজদের কবল থেকে সিপাহীদের অধিকারভুক্ত হওয়া মাত্র সেখানে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হত। গো-হত্যা বিষয়ে হিন্দুদের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই এটা করা হত। বিদ্রোহের সকল স্তরে নেতা-নির্বাচন কালে লক্ষ্য রাখা হত যাতে উভয় সম্প্রদায়েরই যোগ্য ব্যক্তিদের স্থান হয়। এই মহা-

বিদ্রোহ কালে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ঘটনা যে বাস্তব ছিল সেটা ইংরাজ-দেরও বোধগম্য হয়েছিল। পরবর্তীকালে আইটুসিসিন (Aitchisin) নামে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারী আপসোস প্রকাশ করে লিখেছিলেন, "এই একটা উপলক্ষ্য, যেখানে আমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের খেপিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলাম।" 1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে মধ্যযুগে এবং অন্ততঃ 1858 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের মানুষ সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিল না। ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত ছিল।

1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের মুখ্য কেন্দ্র ছিল দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী, ঝাঁসী এবং বিহারের আরা। দিল্লীতে বিদ্রোহের নামমাত্র নেতা বা প্রতীক ছিলেন বাহাদুর শা। তবে এটা পরিচালনার দায়িত্ব একদল সেনানীর উপর ন্যস্ত ছিল। এদের আবার সর্বাধক্ষ্য ছিলেন সেনাপতি বখ্‌ত খান। ইনিই বেরিলীর বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর নেতারূপে এই বাহিনীকে দিল্লীতে নিয়ে এসেছিলেন। ইনি ছিলেন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর গোলন্দাজশ্রেণীর এক সাধারণ সুবেদার। বিদ্রোহীদের সদর দপ্তরে তাঁকে নিম্নতর অথচ নিষ্ঠাবান জনপ্রিয় সেনানীদের প্রতিভূ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হত। 1857 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক দিল্লী পুনর্দখলের পর বখ্‌ত খান্ লক্ষ্ণৌ-এ চলে আসেন। এখানে এসে তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে আমৃত্যু দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। 1859 খ্রীষ্টাব্দের তেরই মে ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রামরত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যে নেতৃবৃন্দের দ্বারা মহাবিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল তার মধ্যে সম্ভবতঃ বাহাদুর শা'ই ছিলেন সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি। বিদ্রোহের ব্যাপারেও তাঁর একটা খুব দৃঢ় সমর্থন ছিল না। দরিদ্র ও নিম্নপদস্থ সিপাহীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির বেশ অভাব ছিল, আবার এই সিপাহীরাও কোনদিন তাঁর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে সক্ষম হয়নি। সিপাহী নায়কদের হুকুম জারি বা প্রভুত্ব প্রদর্শন তাঁর ক্রোধের উদ্রেক করত। একদিকে সম্রাট্ পদের প্রলোভন আর একদিকে ব্যর্থ বিদ্রোহের পরিণামে নিজের জান-মান রক্ষার ব্যবস্থা—এই দুই পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতির কোনটি তাঁর কর্তব্য এটা তিনি স্থির করে উঠতে পারেননি। সুতরাং তাঁর চিত্ত দোলায়মান অবস্থায় আটকে-ছিল। তাঁর অবস্থাটা তাঁর আদরিণী পত্নী বেগম জিন্নতমহল ও তাঁর

পুত্রদের জন্য আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছিল কারণ এঁরা শত্রুপক্ষের সঙ্গেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতেন। বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর মত জরাগ্রস্থ, দুর্বল-চিত্ত এবং নেতৃসুলভ গুণাবলী রহিত ব্যক্তির উপস্থিতি মহাবিদ্রোহকে রাজনৈতিক দিক্ থেকে দুর্বল করে রেখেছিল। এই দুর্বলতা মহাবিদ্রোহের অসামান্য ক্ষতিসাধন করেছিল।

কানপুরে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেব। নানাসাহেব সিপাহীদের সাহায্যে ইংরাজদের কানপুর থেকে বিতাড়িত করে নিজেকে পেশোয়ারূপে ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি বাহাদুর শা'কে ভারতসম্রাট্ রূপে স্বীকৃতি দিয়ে নিজেকে তাঁর 'গভর্নর' বা পরিচালক বলে ঘোষণা করেন। নানাসাহেবের পক্ষে সংগ্রাম পরিচালনার গুরুভার তাঁতিয়া টোপীর উপর ন্যস্ত ছিল। ইনি নানাসাহেবের সবচেয়ে বেশী অনুরক্ত সহকারী ছিলেন। দেশপ্রেম, একাগ্র সংগ্রাম ও লুকিয়ে থেকে অতর্কিতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার গেরিলাসুলভ রণ-কৌশল কুশলতার কারণে তাঁতিয়া টোপীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নানাসাহেবের আর এক বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন আজিমুল্লা। রাজনৈতিক প্রচারের কাজে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে নানাসাহেব তাঁর শৌর্যমণ্ডিত জীবনকাহিনীতে নিজেই কলঙ্কলেপন করে গিয়েছিলেন। অবরুদ্ধ ইংরাজ বাহিনীকে প্রাণ নিয়ে কানপুর পরিত্যাগ করতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তিনি এই অসহায় ইংরাজদের হত্যা করেছিলেন।

লক্ষ্ণৌর বিদ্রোহ অযোধ্যার বেগমের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। এই বেগম সাহেবা তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বিরজিস্ কাদিরকে অযোধ্যার নবাব-রূপে ঘোষণা করে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। লক্ষ্ণৌর সিপাহীবৃন্দ এবং অযোধ্যার জমিদার ও কৃষকদের সাহায্যে বেগম ইংরাজদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ সংগঠন করেন। বিদ্রোহীদের হাতে শহরটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে ইংরাজেরা শহরের রেসিডেন্সীতে আশ্রয় নিয়ে সেইখানেই নিজেদের ঘাঁটি তৈরী করে নিয়েছিল। পরিশেষে বিদ্রোহীদের 'রেসিডেন্সী' অবরোধ ব্যর্থ হয়। রেসিডেন্সীতে অবস্থিত মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ সৈন্য অতুলনীয় সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করতে সমর্থ হয়েছিল।

1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী ছিলেন ঝাঁসির তরুণী

রাণী লক্ষ্মীবাঈ। ভারতীয় ইতিহাসে তিনি অন্যতমা বীর-রমণী হিসাবে খ্যাত হয়েছেন। নিঃসন্তানা লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসির সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরূপে একটি শিশুকে 'দত্তক'রূপে গ্রহণ করেন। ইংরাজ সরকার তাঁর এই দত্তক গ্রহণের অধিকার অস্বীকার করে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল। ঝাঁসির সিপাহীদের বিদ্রোহের উস্কানিদাত্রী হিসেবে ইংরাজদের পক্ষ থেকে তাঁকে ভীতিপ্রদর্শনও করা হয়েছিল। তখন বহু ভাবনাচিন্তার পর বাধ্য হয়ে রাণী প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেন। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর অবশেষে বিদ্রোহে যোগদান করে, রাণী লক্ষ্মীবাঈ যথার্থ একজন বীর-নারীসুলভ রণনৈপুণ্য ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর শৌর্য, বীর্য ও রণকুশলতার কাহিনী পরবর্তীকালে তাঁর স্বদেশবাসীকে প্রেরণা দিয়েছে। একটা তীব্র সংঘর্ষের পর তিনি ইংরাজদের দ্বারা ঝাঁসি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এই যুদ্ধের সময় মহিলাদেরও যুদ্ধে অংশ নিয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে গোলাগুলি ছুঁড়তে দেখা গিয়েছিল। যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর লক্ষ্মীবাঈ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে মিলিতভাবে এই শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে তাঁরা কোনক্রমেই তাঁদের স্বাধীনতা (আজাদি) ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না। নিজের বিশ্বস্ত আফ্গান রক্ষী ও তাঁতীয়া টোপীর সহায়তায় তিনি গোয়ালিয়র দখল করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ব্রিটিশের অনুগত মহারাজা সিন্ধিয়া রাণী লক্ষ্মীবাঈকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু তিনি এবিষয়ে ব্যর্থ হন, কারণ তাঁর নিজের সৈন্যবাহিনীর বহু লোকও রাণীর পক্ষে যোগদান করেছিল। সিন্ধিয়া আগ্রায় পলায়ন করে ইংরাজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রণ-সাজে সজ্জিতা, অশ্বারূঢ়া লক্ষ্মীবাঈ সংগ্রামরত অবস্থায় 1858 খ্রীষ্টাব্দের সতেরই জুন মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর চিরজীবনের সঙ্গিনী একটি মুসলমান তরুণীও তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

বিহারে বিদ্রোহের মুখ্য-সংগঠক ছিলেন কুনওয়ার সিং। ইনি ছিলেন আরার নিকটস্থ জগদীশপুরের ভূতপূর্ব ভূস্বামী। তৎকালে হৃতসর্বস্ব হয়ে বিশেষ বিক্ষুব্ধ অবস্থায় তিনি দিনযাপন করতেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হয়েও তিনি অসাধারণ সমর-নিপুণ ও কুশলী সংগঠক ছিলেন। বিদ্রোহের নায়কদের মধ্যে এটাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। বিহার প্রান্তে ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে অবশেষে তিনি নানাসাহেবের সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এর পর তিনি আউধ ও মধ্যভারতেও বিদ্রোহ পরিচালনা করেন।

গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন কালে আরার নিকটে এক যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাস্ত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ। যুদ্ধে গুরুতর-ভাবে আহত হয়ে 1858 খ্রীষ্টাব্দের সাতাশে এপ্রিল ইনি জগদীশপুরে অবস্থিত তাঁর পৈত্রিক বাসভবনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

ফৈজাবাদের আহম্মদুল্লা ছিলেন এই বিদ্রোহের আর এক বিশিষ্ট নেতা। তিনি মাদ্রাজের অধিবাসী ছিলেন, এখানে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে প্রচারকার্য চালাতেন। 1857 খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি উত্তর ভারতে এসে ফৈজাবাদে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। তাঁর রাজদ্রোহ প্রচার বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশের পক্ষ থেকে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল। মে মাসে বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ কালে অযোধ্য প্রদেশে তিনি এই বিদ্রোহের একজন অবিসম্বাদী নেতারূপে গণ্য হয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এ বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর তিনি রোহিলখণ্ডে বিদ্রোহ পরিচালন করেন। এই সময় পুওয়েনের রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করেন। আহম্মদুল্লাকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যার জন্য পুওয়েনের রাজাকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উপঢৌকন দিয়েছিল। এমন কি ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরাও মৌলভী আহম্মদুল্লার দেশ-প্রেম, শৌর্য ও রণনৈপুণ্যের উচ্চপ্রশংসা করেছেন। কর্ণেল সি. বি. ম্যালেসান তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন "অন্যায়ভাবে স্বদেশের স্বাধীনতা হরণকারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রামকে যদি দেশপ্রেমের নিদর্শন বলে গণ্য করা হয়, তবে মৌলভী (আহম্মদুল্লা) নিঃসন্দেহে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন।...ইনি সাহস ও শৌর্যের সঙ্গে প্রকৃত সৈনিকোচিত আচরণ দেখিয়ে যে বিদেশীরা তাঁর দেশকে অধীনতা পাশে বদ্ধ করেছে তাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করেছিলেন। পৃথিবীর যে কোন দেশের সাহস ও সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছেই এমন একজন ব্যক্তির স্মৃতি শ্রদ্ধার্হ।"

তবে এই বিদ্রোহের সবচেয়ে বীরত্বের সম্মান সিপাহীদেরই প্রাপ্য। এদের অনেকেই রণক্ষেত্রে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল। এটাই সবচেয়ে বড় কথা যে এই সিপাহীদেরই দৃঢ়সঙ্কল্প ও আত্মত্যাগের কারণে ভারতভূমি থেকে ব্রিটিশের উৎসাদন প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। গভীর স্বদেশ প্রেমের প্রেরণায় এরা নিজেদের মধ্যে বদ্ধমূল

পরধর্ম বিদ্বেষকেও বলি দিয়েছিল। একদিন তারা ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে চর্বিযুক্ত টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু ঘৃণিত বিদেশী শত্রুকে দেশ থেকে বিতাড়নের প্রয়োজনে বিদ্রোহের কালে এরা এই টোটাই বিনা আপত্তিতে ব্যবহার করেছিল।

1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ভারতের একটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ব্যাপ্ত হয়েছিল এবং বেশ কিছু জনসমর্থনও পেয়েছিল কিন্তু এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েনি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন বা সহ-যোগিতাও এর পেছনে অবশ্য ছিল না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা বা বড় বড় জমিদারগণ এই বিদ্রোহে কোন রকম অংশগ্রহণ করেনি, কারণ এরা ছিল অতিরিক্ত মাত্রায় স্বার্থপরায়ণ। ব্রিটিশ শক্তির ভয়েও এরা ভীত ছিল। বিদ্রোহে যোগদান করা দূরের কথা, এদের মধ্যে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, হায়দ্রাবাদের নিজাম, যোধপুরের রাজা সহ রাজপুতানার নৃপতিগণ, ভূপালের নবাব, পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ এবং কাশ্মীরের রাজা, নেপালের রাণা এমনি আরও অনেক শাসক এবং বহু বড় বড় ভূস্বামী বিদ্রোহ দমনে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ রাজকে সাহায্য করেছিল। বস্তুতঃ ভারতের দেশীয় শাসকবৃন্দের শতকরা একভাগের অধিক অংশও বিদ্রোহে যোগদান করেনি। বিদ্রোহোত্তর কালে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এ সম্বন্ধে মন্তব্য করে লিখেছিলেন যে "ঝড়ের মুখে ঝড়ের প্রথম ধাক্কাগুলো এরা ঠেকিয়ে রেখেছিল তাই এই বিদ্রোহ তার সব শক্তি নিয়ে আমাদের উড়িয়ে ধূলিসাৎ করে দিতে পারেনি। এরা না থাকলে আমরা ভেসে যেতাম।" মাদ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গদেশ এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে এই বিদ্রোহের কোন প্রভাবই অনুভূত হয়নি। তবে এইসব অঞ্চলে সাধারণ মানুষের সমর্থন বিদ্রোহীদের সপক্ষেই ছিল। জমিদারী থেকে বঞ্চিত ক্ষুব্ধ কয়েকজন ভূস্বামী ছাড়া ভারতীয় সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের অধিকাংশই এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করত। সম্পদশালী ধনী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই বিদ্রোহের বিপক্ষে ছিল, যারা বিপক্ষে যায়নি তারা বিদ্রোহীদের কোন প্রকার সহায়তা দেয়নি। ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকে নিজ নিজ সম্পত্তি অটুট থাকার আশ্বাস পেয়ে অযোধ্যার তালুকদার (বড় জমিদার) সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা বিদ্রোহে যোগদান করেছিল তারাও বিদ্রোহী পক্ষ ত্যাগ করে বিদ্রোহের স্বার্থহানি করেছিল। এই কারণেই

অযোধ্যার সিপাহী ও কৃষক বিদ্রোহীদের পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে গেরিলা যুদ্ধ চালানো সম্ভবপর হয়নি।

মহাবিদ্রোহ কালে গ্রামবাসীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল সুদখোর মহাজনশ্রেণী। স্বাভাবিক কারণেই এই শ্রেণী বিদ্রোহের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ক্রমশঃ বণিক্‌শ্রেণীও বিদ্রোহীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবের খরচ চলানোর জন্য বিদ্রোহীগণ বণিক্‌শ্রেণীর উপর উচ্চহারে 'ট্যাক্স' চাপিয়েছিল। অনেক সময়ে বিদ্রোহী বাহিনীর খোরাক্ যোগানোর জন্য এদের মজুদ করা খাদ্যশস্য বিদ্রোহীরা বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হত। প্রায়ই এই বণিক্‌শ্রেণী তাদের টাকাকড়ি ও মালপত্র বিদ্রোহীদের ভয়ে লুকিয়ে ফেলত। নিখরচায় এগুলি বিদ্রোহীদের হাতে যাতে না যায় তার জন্য তারা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করত। বাংলার জমিদারগণও ব্রিটিশের অনুগতই রয়ে গিয়েছিল। কারণ ব্রিটিশরাজের প্রসাদেই এই শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। বাংলার জমিদারশ্রেণীর বিদ্রোহ-বিতৃষ্ণার আর একটা কারণ ছিল। বিহারে জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধেই সেখানকার কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। অনুরূপ গোষ্ঠীস্বার্থের কারণে বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের বড় বড় ব্যবসায়ীগণ বিদ্রোহের কালে ব্রিটিশরাজের পক্ষাবলম্বন করেছিল কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আর্থিক লেন-দেনদেন তাদের ব্যবসায় ও লাভের মূল উৎস ছিল।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়গণও এই বিদ্রোহ সমর্থন করেনি। বিদ্রোহীগণ ব্রিটিশরাজ প্রবর্তিত সমাজসংস্কারমূলক আইনকানুনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করত, জনসাধারণের মনে তারা অন্ধ বিশ্বাস জাগ্রত করত। এই ব্যাপারগুলিও শিক্ষিত ভারতীয় সমাজকে বিদ্রোহীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ দেশের পশ্চাদগতির অবসান চেয়েছিল। এদের বিশ্বাস ছিল এই যে ইংরাজ-শাসন দেশকে প্রগতির মুখে অগ্রসর করে দেবে, অবশ্যই এটা ছিল তাদের ভ্রান্ত-বিশ্বাস। আরও কথা ছিল এই যে, এই শিক্ষিত শ্রেণীর ধারণা এই ছিল যে বিদ্রোহীরা দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাবে, দেশের এতে অবনতি হবে। পরবর্তীকালে অবশ্য এই শিক্ষিতশ্রেণীর ভারতীয়েরা নিজেদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে বিদেশী শাসনে দেশের উন্নতি অসম্ভব উপরন্তু এই শাসন দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে বাধা-

স্বরূপ। 1857 খ্রীষ্টাব্দে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তারা এবিষয়ে এদের চেয়ে দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল একথা বলতে হবে। বিদেশী শাসনের অনিষ্টকরতা এবং এর উৎসাদনের গুরুত্ব বিদ্রোহীরা যেন একটা ষষ্ঠেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে পেরেছিল। তবে বিদ্রোহীদের হিসেবে একটা ভুল ছিল, শিক্ষিত সমাজ এই ভুল করেনি। শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ ভারতের পরাধীনতার মূল কারণটি ধরতে পেরেছিল। এদের মত এই ছিল যে গলিত অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান, অন্ধ-বিশ্বাস ও অনুদার সমাজব্যবস্থার কারণেই ভারতকে বিদেশীর অধীনতা স্বীকার করতে হয়েছে। বিদ্রোহীরা ভারতের পরাধীনতার এই কারণগুলি যাচিয়ে দেখেনি, এই ভুল তারা করেছিল। বিদ্রোহীরা এটা চিন্তা করে দেখেনি যে একটা জাতির প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের অর্থ সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন নয়, প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ হল আধুনিক সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি ও আধুনিক রাষ্ট্র-নীতির প্রবর্তন। যাই হোক্ না কেন, শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের বিদ্রোহের প্রতি অসহযোগিতা থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে এই শিক্ষিত সমাজ জাতীয়তা বিরোধী অথবা ব্রিটিশের অনুগত ছিল। 1858 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল যে এই সমাজের নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী ও আধুনিক রাজনীতিসম্মত জাতীয় আন্দোলন প্রবর্তিত হয়েছে।

ভারতীয়ের মধ্যে ঐক্যের অভাব যে কারণবশতই থাকুক না, এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই সংহতি-হীনতা বিপ্লবের পক্ষে মারাত্মকরূপ ক্ষতি-জনক হয়েছিল। তবে এটাই বিদ্রোহের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ ছিল না। বিদ্রোহীগণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক উপকরণ যথেষ্টরূপে জোগাড় করতে পারেনি। অধিকাংশ বিদ্রোহীকেই শড়্‌কি বা তলোয়ারের মত সেকেলে অস্ত্রসম্ভার নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাদের সংগঠনও তেমন মজবুত ছিল না। সিপাহীরা অবশ্যই নিঃস্বার্থভাবে বিদ্রোহে নেমেছিল, সাহস ও বীরত্বের অভাবও তাদের মধ্যে ছিল না, ছিল শুধু শৃঙ্খলা-বোধের অভাব। সময়ে সময়ে এদের ব্যবহার দেখে মনে হত এরা একটা সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী নয়, এরা একটা দাঙ্গাসৃষ্টিকারী উন্মত্ত জনতা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বিদ্রোহী দলগুলির মধ্যে একটা সাধারণ কর্মসূচির অভাব ছিল, একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারাও এটা পরিচালিত হয়নি। বিদ্রোহীদের মধ্যে

অনেক সময় এই সন্দেহ জেগে উঠত যে ঠিক কার হুকুম তাদের মেনে চলতে হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বটে, তবে এই বিদ্রোহী দলগুলির পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিদ্বেষই বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দকে একসঙ্গে মিলিত করেছিল। এদের মধ্যে একতাসাধনের আর কোন সূত্রই ছিল না কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে ইংরাজদের বিতাড়িত করার পর সেই শূন্যস্থানে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হবে সে সম্বন্ধে কোন পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনারও অভাব ছিল। একযোগে কাজ করার মত কোন নীতি বিদ্রোহীরা অবলম্বন করতে পারেনি। এরা নিজেরা পরস্পরকে সন্দেহ করত, একে অপরকে হিংসা করত। কখনও কখনও এরা আত্মঘাতী কলহেও লিপ্ত হত। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। অযোধ্যার বেগম মৌলভী আহমতুল্লার সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন। মুঘল বাদশাজাদারাও সিপাহী নেতাদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়েছিল। নানাসাহেবের রাজনৈতিক উপদেষ্টা আজিমুল্লা নানাসাহেবকে দিল্লী যেতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ তার মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে বাহাদুর শা'র সঙ্গে দেখা করলে নানাসাহেবের মর্যাদাহানি হতে পারে। এইভাবে বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতা, গোষ্ঠীতান্ত্রিক মনোবৃত্তি বিদ্রোহের প্রাণ-শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল, বিপ্লব প্রচেষ্টাকে এককেন্দ্রিক করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিদ্রোহে যোগদানকারী কৃষকেরা খাজনা এবং কুসীদজীবী মহাজনদের টাকা ধার সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ সব নষ্ট করে দিয়েছিল। নতুন জমিদারদেরও এরা তাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু এর পর তারা কি করবে বুঝতে না পেরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। এই অবসরে ব্রিটিশ রাজ একের পর এক বিদ্রোহী নায়কদের ধরে ধরে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে সুরু করেছিল।

ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটির থেকেও এই বিদ্রোহের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা আরও বেশী ছিল। সমস্ত আন্দোলনের মধ্যেই একটা একমুখী লক্ষ্যের অভাব ছিল। ক্ষমতা অধিকারের পরবর্তী সৃজনমুখী কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয়নি। ভিন্নমুখী কতকগুলি লক্ষ্য নিয়ে এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেছিল। একমাত্র ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিদ্বেষই ছিল এর মূলধন। আবার এই ব্রিটিশ-বিদ্বেষও এক এক গোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কারণে জন্মলাভ করেছিল। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক রূপরেখা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা বিদ্রোহী অথবা

নেতৃবৃন্দ কারো মধ্যেই ছিল না। এক একটি গোষ্ঠীর মনে এক একটি ধারণা ছিল। একটি আধুনিক প্রগতিশীল পরিকল্পনা না থাকায় প্রতিক্রিয়াশীল রাজন্য ও ভূস্বামী শ্রেণী এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করায়ত্ত করে ফেলেছিল। মুঘল, মারাঠা ও এদের মতই সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কারণে যে সব রাজা, নবাব অনেক আগেই নিজ নিজ রাজ্যে তাদের স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল তারা যে একটা সর্বভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে ব্যর্থ হবে সেটা মোটেই আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল না। এই ব্যর্থতা প্রত্যাশিতই ছিল। তবে এই বিদ্রোহের সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের উপর খুব বেশী মনোযোগ দেওয়া সঙ্গত হবে না। বিদ্রোহের সময় থেকেই সৈনিক শ্রেণী এবং জনসাধারণ একটা ভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এই বিদ্রোহকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রচেষ্টাকালেই তারা নূতন ধরনের একটা সংগঠনের কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিল। বিদ্রোহ চলার সময় বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্যে এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "এই বিদ্রোহ সময় থাকতে যদি প্রশমিত না করা হয় তবে ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সরকারকে নূতন ধরনের একদল বিদ্রোহীর সম্মুখীন হতে হবে, এই দলে রাজা-নবাবেরা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।" ভারত ইতি-হাসের এই পর্যায়ে ভারতবাসীর মধ্যে একতার অভাবের কতকগুলি কারণও ছিল। আধুনিক কালের 'জাতীয়-চেতনা' ভারতবাসীর মনে তখনও জাগ্রত হয়নি। তখন স্বাদেশিকতা বা স্বদেশপ্রেমের গণ্ডী ছিল যে যেখানে বাস করে সেই স্থানটি বা সেই অঞ্চল। বড় জোর স্বাদেশিকতা একটি প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। সর্বভারতীয় চেতনা বা সমস্ত ভারতবাসীর স্বার্থ একই—এই ধরনের মনোভাব জেগে উঠার দিন তখনও আসেনি। বস্তুতঃ 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহই সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষের জন্যে এই চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিল যে ভারতবাসীমাত্রেরই স্বার্থ এক, আর তারা সবাই একই দেশের মানুষ।

তখনকার দিনে সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল ব্রিটিশ জাতি। এই ব্রিটিশ জাতির পেছনে ছিল ভারতের অধিকাংশ রাজন্যবৃন্দের সক্রিয় সমর্থন। এহেন শক্তিধর ব্রিটিশরাজের সামরিক শক্তির তুলনায় বিদ্রোহীদের শক্তি-সামর্থ্য ছিল নগণ্য। ব্রিটিশরাজ পালে পালে সৈন্য-সামন্ত, অর্থ এবং সামরিক উপকরণ ভারতে আমদানি করে বিদ্রোহের

অবসান ঘটিয়েছিল। এতে যে অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল তা' অবশ্য ভারতবর্ষের রাজকোষ থেকেই আদায় করা হয়েছিল। অর্থাৎ ভারতবাসীর অর্থেই ভারতীয় বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। শুধুমাত্র দুঃসাহস সম্বল করে একটি প্রভূত শক্তিশালী ও দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ শত্রুকে জয় করা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ যে শত্রু প্রতিটি পদক্ষেপের আগে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগে অভ্যস্ত। 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিশে সেপ্টেম্বর ইংরাজ তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পর বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে দিল্লী দখল করে নিয়েছিল। বৃদ্ধ সম্রাট্ বাহাদুর শা'কে বন্দী করা হয়েছিল। মুঘল বাদশাজাদাদের ধরে ধরে সঙ্গে সঙ্গেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বিচারের পর সম্রাট্‌কে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। 1862 খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। যে শহরে জন্ম সেই দিল্লী থেকে বহুদূরে রেঙ্গুনে তাঁকে কবরস্থ হতে হবে তার জন্যে মৃত্যুকালে অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ে বাহাদুর শা তাঁর ভাগ্যকে ধিক্কার জানিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। বাহাদুর শা'র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহান মুঘল সম্রাট্ বংশের গৌরব-রবি চিরতরে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

দিল্লীর পতনের পর বিদ্রোহের মুখ্য পটভূমি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহের অন্যান্য নায়কগণ শৌর্যের সঙ্গে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে অসম-সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল, কারণ ব্রিটিশের সর্বাত্মক আক্রমণের ধাক্কা সহ্য করার সামর্থ্য তাদের ছিল না। জন লরেন্স, আউটরাম, হ্যাভলক, নেইল, কেম্পবেল, হিউরোজ প্রভৃতি ইংরাজ সেনাপতিগণ বিদ্রোহ দমন অভিযানে কৃতিত্বের জন্য সামরিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একে একে বিদ্রোহের সকল নেতারই পতন হয়েছিল। নানাসাহেব কানপুরে পরাজিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশরাজের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশে বিরত হননি। আত্মসমর্পণ করা এড়াতে 1859 খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি নেপালে পালিয়ে যান। এর পর তাঁর কথা আর শোনা যায়নি। তাঁতিয়া টোপি মধ্যভারতের জঙ্গলে আত্মগোপন করে 1859 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত গেরিলা পদ্ধতিতে ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁর এক জমিদার বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক নিদ্রিত অবস্থায় তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল। একটা নামমাত্র বিচারের পর 1859 খ্রীষ্টাব্দের পনেরই এপ্রিল তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এর বেশ কিছু আগে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সতেরই জুন ঝাঁসীর রাণী ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে

করতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। 1859-এর মধ্যেই কুনওয়ার সিং, বখ্‌ত খান, বেরিলীর খান বাহাদুর খান, নানাসাহেবের ভ্রাতা রাওসাহেব, মৌলভী আহম্মদুল্লা প্রভৃতি বিদ্রোহী নেতাগণ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। একমাত্র অযোধ্যার বেগম নেপালে পালিয়ে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

1859 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের সর্বত্রই ব্রিটিশরাজ পূর্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তবে এই বিদ্রোহ একেবারে নিষ্ফল হয়েছিল একথা বলা যাবে না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এই মহাবিদ্রোহ একটি গৌরবময় অধ্যায় যুক্ত করেছে। প্রাচীনপন্থী নেতাদের দ্বারা পরিচালিত এবং সেকেলে যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত এই বিদ্রোহ ছিল ভারতকে পরশাসন থেকে মুক্ত করার একটা বেপরোয়া প্রচেষ্টা। এর দুর্বলতা যাই থাকুক না কেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস থেকে ভারতকে উদ্ধার করার জন্য ভারতীয় জনগণের এটাই হয়ে উঠেছিল প্রথম মুক্তিসংগ্রাম। এই বিদ্রোহ আধুনিক কালের জাতীয় জাগরণের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। শৌর্য ও দেশাত্মবোধে সমুজ্জ্বল 1857 খ্রীষ্টাব্দের এই মহাবিদ্রোহ ভারতবাসীর মনে একটা অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গিয়েছিল। পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেটাই একটা অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল।

অনুশীলনী

1. বিদেশী শাসনের প্রতি অসন্তোষ 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য কতটুকু দায়ী ছিল?
2. কোম্পানীর সিপাহীদের বিদ্রোহের কারণ কি?
3. বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।
4. নিম্নলিখিত বিষয়ে ছোট ছোট মন্তব্য লিখ:

   (a) বিদ্রোহে ভারতীয় রাজন্যগণের ভূমিকা (b) বিদ্রোহে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের ভূমিকা (c) বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য (d) বাহাদুর শা (e) নানাসাহেব (f) তাঁতিয়া টোপি (g) ঝাঁসীর রাণী (h) কুনওয়ার সিং (i) ফৈজাবাদের মৌলভী আহম্মদুল্লা।

নবম অধ্যায়

1858 খ্রীষ্টাব্দের পর প্রশাসনিক পরিবর্তন

1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের ভিত্তিতে একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনে, তার পুনর্গঠন অনিবার্য করে তুলেছিল। এর ফলে বিদ্রোহোত্তর কালে ভারতীয় সমাজ, ভারত-সরকার ও ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রচুর রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়েছিল।

শাসনব্যবস্থা

1858 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ একটি আইনের বলে ভারতের শাসনক্ষমতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের অধিকারীর হাতে এসে গিয়েছিল। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড যে রাজা অথবা রাণী দ্বারা শাসিত হবে, ভারতও তাঁর দ্বারা শাসিত হবে, এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক-বর্গ এবং তাদের একটি নিয়ন্ত্রক বোর্ড (বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল)-এর উপর ভারত শাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। নূতন আইনে এই ক্ষমতা ভারতসচিবের (সেক্রেটরী অফ্ স্টেট্) উপর ন্যস্ত হয়েছিল। ভারতসচিবকে কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একটি সমিতি বা পরিষদ্ গঠিত করে দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন সদস্যকেই সেক্রেটরী অফ্ স্টেট্ করা হত, এর অর্থ ছিল এই যে ভারতসচিবকে পার্লামেণ্টের আদেশ মেনে চলতে হত বা তাঁকে পার্লামেণ্টের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে থাকতে হত। ভারতসচিবের কাউন্সিল বা পরিষদ্ 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল' নামে পরিচিত হয়েছিল। ভারত-সচিবকে পরামর্শদানের দায়িত্ব এই সদস্যদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। অবশ্য এই পরামর্শ মেনে চলা ভারতসচিবের পক্ষে বাধ্যতামূলক রাখা হয়নি। তিনি এঁদের পরামর্শ উপেক্ষাও করতে পারতেন। তবে আর্থিক ব্যাপারে ভারতসচিবকে এদের অনুমোদন নিতে হত। 1869 খ্রীষ্টাব্দের পর সেক্রেটরী অফ্ স্টেট্ বা ভারতসচিবকেই এই কাউন্সিল বা পরিষদের কর্তৃত্বভার দিয়ে দেওয়া হয়। ভারত থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদেরই সাধারণতঃ ভারতসচিবের পরিষদ বা কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করা হত।

এই নতুন বিধানে আগেকার মতই ভারত-শাসনব্যবস্থা গভর্নর-জেনারেল

বা বড়লাটের উপরই ন্যস্ত রাখা হয়েছিল। তবে এই সময় থেকে তিনি 'ভাইসরয়' বা ব্রিটিশ সিংহাসনাসীন রাজা বা রাণীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধির মর্যাদা দ্বারাও ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর বাৎসরিক বেতন ধার্য হয়েছিল আড়াই লক্ষ টাকা, এছাড়াও এই পদের জন্য বহুবিধ 'ভাতা'রও ব্যবস্থা হয়েছিল। কালক্রমে গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করে ফেলা হয়েছিল, আগের মত এই পদাধিকারীকে ভারত-শাসন ব্যাপারে 'সর্বেসর্বা' করে রাখা হয়নি, ব্রিটেনে অবস্থিত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টই ভারত শাসননীতি ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্ধারণ করত। গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা হ্রাসের ব্রিটিশ নীতি অবশ্য নতুন কিছু ছিল না। ইতিপূর্বেই নিয়ন্ত্রক আইন (রেগুলেটিং এ্যাক্ট), পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট এবং সর্বশেষ চার্টার য্যাক্টগুলিতেও এমনি ধরনের একটা ভঙ্গি ছিল যার থেকে বোঝা গিয়েছিল যে ইংরাজদের উদ্দেশ্য লণ্ডন থেকে ভারত শাসন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতস্থ রাজধানী তথা গভর্নর-জেনারেলকে পুরোপুরি ব্রিটিশ রাজধানী লণ্ডনের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি বা সুবিধার জন্যই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ জয় করেছিল তবে এই জয়ের সুযোগসুবিধা-গুলি কোম্পানীর হাত থেকে ধীরে ধীরে ব্রিটেনে প্রভাবশালী অন্যান্য গোষ্ঠীরও হাতে চলে গিয়েছিল, কোম্পানী এই সুযোগসুবিধা এককভাবে ভোগ করতে পারেনি। 1858 খ্রীষ্টাব্দের নূতন আইন এই নীতিকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অতীতে ভারতের শাসননীতি নির্ধারণে গভর্নর-জেনা-রেলেরই ভূমিকা মুখ্য ছিল। লণ্ডন থেকে কোন নির্দেশ এসে পৌছুতে বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে যেত, কাজেই প্রয়োজন স্থলে গভর্নর-জেনারেলই তাড়াতাড়ি যা কিছু হয় ব্যবস্থা নিতেন। লণ্ডন থেকে যা কিছু কাগজপত্র আসত তার ধরন ছিল, গভর্নর-জেনারেলের কৃতকর্মের অনুমোদন বা মূল্যায়ন। নির্দেশ বা হুকুম হিসেবে লণ্ডন থেকে বিশেষ কিছু আসত না। এক কথায় বলা যেতে পারে যে লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ ভারত-শাসন ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ করত মাত্র, ভারত-শাসন পরিচালনা করত না। 1870 খ্রীষ্টাব্দের আগেই লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের জলপথে একটা তার-সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছিল। এর দ্বারা লণ্ডন থেকে প্রেরিত কোন আদেশ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতে পৌছান সম্ভবপর হয়েছিল। ভারতসচিবের পক্ষে এখন ভারত-শাসন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি জ্ঞাত হয়ে সে

সম্বন্ধে নিজের হুকুম বা মতামত জানাবার সুযোগ এসে গিয়েছিল। দিনে বা রাতের যে কোন সময়েই এই সুযোগ বর্তমান ছিল। কাজেই এমন একটা অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছিল যখন ভারত থেকে বহু সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত কিছু ব্যক্তি ভারত-শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করত। 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল', ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা অথবা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতবাসীর কোন অধিকার ছিল না, তার কোন অভাব-অভিযোগ জানানোর সুবিধাও ছিল না। এই সুদূরস্থিত ভাগ্যনিয়ন্তাদের কাছে কোনভাবে পৌছানোরও কোন সুবিধা ভারতবাসীর ছিল না। ভারত-শাসন নীতিকে কোনরূপে প্রভাবিত করার সুযোগ ভারতবাসী হারিয়ে ফেলেছিল। পূর্ব ব্যবস্থায় অর্থাৎ কোম্পানীর আমলে ভারত গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে এতখানি উপেক্ষা করতে পারত না। নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ভারত-শাসন নীতিতে ব্রিটিশ শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক পরিচালকদের প্রভাব ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছিল। এর ফলে 1858 খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় এখন ভারত গভর্নমেণ্ট অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ উদারনীতির মুখোশটিও ধীরে ধীরে অপসৃত হয়েছিল।

1858 খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত নূতন ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী এই ব্যবস্থা হয়েছিল যে গভর্নর-জেনারেলের অধীনে একটি শাসন পরিষদ (Executive Council) থাকবে এবং এর সদস্যগণ এক একটি বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে কার্য পরিচালনা করবেন। এছাড়া তাঁরা গভর্নর-জেনারেলকে সর্বময় কর্তৃত্ব পরিচালনায় পরামর্শ দেবেন। শাসন পরিষদের সদস্যদের মন্ত্রিমণ্ডলীর মন্ত্রীদের তুল্য ক্ষমতা বা মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। প্রথম দিকে শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচ। কিন্তু 1914 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ছয়জন সদস্য নিয়ে শাসন পরিষদ গঠিত ছিল। এই সঙ্গে অতিরিক্ত আরও একজন ছিলেন ভারতের প্রধান সেনাপতি বা জঙ্গীলাট। এঁর হাতে ছিল সামরিক বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব। শাসনসংক্রান্ত সর্ববিধ জরুরী কাজকর্মের আলোচনান্তে সদস্যদের মতামত বা 'ভোট' গ্রহণ করা হত। যে প্রস্তাবের পক্ষে 'ভোট' বেশী হত, সেই প্রস্তাবটি গৃহীত হত। তবে গভর্নর-জেনারেলের হাতে এমন ক্ষমতা ছিল যার বলে তিনি ভোটাধিক্যে গৃহীত প্রস্তাব নাকচ করে নিজের মনোমত প্রস্তাব কার্যকরী করাতে পারতেন। বস্তুতঃ গভর্নর-জেনারেলের হাতেই সর্বাধিক ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছিল।

1861 খ্রীষ্টাব্দের একটি য়্যাক্ট বা আইনে গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্যে ছিল নূতন নূতন আইন প্রণয়ন, এই জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছিল ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিল বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ্। গভর্নর-জেনারেলকে তাঁর শাসন পরিষদে ছয় থেকে বার জন সদস্য নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, এর মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক সংখ্যক সদস্য বেসরকারী স্তর থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই বেসরকারী সদস্যদের ইংরাজ অথবা ভারতীয়দের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হত। ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিল বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের হাতে বস্তুতঃ কোন ক্ষমতা ন্যস্ত হয়নি। এটাকে পার্লামেন্টের অনুরূপ একটি শক্তিশালী সংস্থা বলে ভাবা ঠিক হবে না, এটা ছিল বেশ দুর্বল সংগঠন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ বড় জোর একটা পরামর্শদাতা সংস্থার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল বলা যেতে পারে। কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আলোচনা করা হত না, অর্থনৈতিক বিষয়ও নয়। এবিষয়ে কোন আলোচনা করতে হলে আগে থেকে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হত। সরকারী আয়-ব্যয় বা 'বাজেট' ছিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের এক্তিয়ার বহির্ভূত বিষয়। শাসনব্যবস্থার কোন সমালোচনার অধিকারও পরিষদের ছিল না। শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন তোলার অধিকারও এর সদস্যদের দেওয়া হয়নি। মোট কথা, ব্যবস্থা পরিষদ প্রশাসন-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে নাক গলানোর কোন অধিকারই পায়নি। ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত কোন প্রস্তাবকে আইনে পরিণত করা যেত না। এর জন্য গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন প্রয়োজন হত। আবার ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত কোন প্রস্তাব গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন পেলেও ভারতসচিব বা সেক্রেটারী অফ্ স্টেট্ এটি নাকচ করে দিতে পারতেন। ব্যবস্থা পরিষদের একমাত্র কাজ ছিল সরকার কর্তৃক অনুসৃত ব্যবস্থাগুলি নির্বিচারে সমর্থন। এতদ্বারা জনসাধারণকে এইভাবে বোঝান হত যে সরকারী সব ব্যবস্থার পেছনে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সমর্থন রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় সদস্য নিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনমতকে উপযুক্ত মর্যাদাদান, কারণ বহু ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও রাজনীতিজ্ঞদের এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে 1857-এর বিদ্রোহের কারণ শাসকবৃন্দের সঙ্গে ভারতীয় জনমতের বিচ্ছিন্নতা। ভারতীয় জনমতের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর পরিচয় লাভের সুযোগ সৃষ্টিই ছিল কাগজে-কলমে ব্যবস্থা পরিষদের

ভারতীয় সদস্য গ্রহণের উদ্দেশ্য। কিন্তু বস্তুতঃ এটা হয়ে উঠেছিল একটা ধাপ্পাবাজি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় সদস্য সংখ্যা ছিল খুবই কম, আবার এই সদস্যদের নির্বাচন করতেন স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল, দেশের জনসাধারণকে এই সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়নি। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে গভর্নর-জেনারেল দেশীয় রাজন্য, তাদের মন্ত্রী, বড় বড় ব্যবসায়ী বা বড় বড় ভূস্বামী অথবা অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীদের মধ্যে থেকে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনোনীত করতেন। ভারতীয় জনসাধারণ অথবা ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব করার কোন যোগ্যতা বা অধিকার এই মনোনীত সদস্যদের থাকত না। ভারত-শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীকে কোন প্রকার কর্তৃত্ব বা অধিকারই দেওয়া হয়নি। 1858 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার মতই ভারতবর্ষ স্বৈরাচারী বিদেশী শাসনের নাগপাশেই বদ্ধ ছিল। এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না, 1858-এর পরেও পূর্বের ধরনেই ভারত-শাসন ব্যবস্থা সুপরিকল্পিতই ছিল। 1861 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ সংক্রান্ত আইনটি উত্থাপনের কালে ভারতসচিব স্বীকার করেছিলেন যে অভিজ্ঞতা থেকে এটাই জানা গিয়েছে যে একটা শক্তিশালী জাতি যখন অন্য একটি জাতিকে শাসন করার অধিকার পায় তখন যত সহৃদয়তার সঙ্গেই শাসন পরিচালিত হ'ক না কেন, সেটা স্বৈরাচারেরই রূপ ধারণ করে থাকে।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিল। এর মধ্যে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই 'প্রেসিডেন্সি' রূপে পরিচিত ছিল। প্রেসিডেন্সিসমূহ একজন গভর্নর এবং ইংলণ্ডের সম্রাট্ কর্তৃক মনোনীত তিন-সদস্যযুক্ত একটি শাসন পরিষদ কর্তৃক শাসিত হত। এই তিনটি প্রেসিডেন্সির কর্তৃপক্ষের হাতে অন্যান্য প্রদেশের কর্তৃপক্ষের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি ব্যতীত অন্য প্রদেশগুলির শাসনভার লেফ্‌টেনাণ্ট্ গভর্নর অথবা চীফ্ কমিশনারদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। গভর্নর-জেনারেলের উপর এদের নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হত। 1833 খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট বা সরকারকে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়া হত। তবে 1833 থেকে প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব আইন প্রণয়নের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীনভাবে

টাকা খরচ করার পথও বন্ধ করা হয়েছিল। খরচপত্র ঠিকমত হচ্ছে কিনা কেন্দ্রীয় সরকার তার উপর কড়া নজর রাখত। কিছুদিন পর দেখা গিয়েছিল যে ভারতবর্ষের মত একটা বিশাল দেশে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রাখা সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

1861 খ্রীষ্টাব্দের আইন বা য়্যাক্টে দেখা গেল যে কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী। কেন্দ্রের অনুরূপ ব্যবস্থা পরিষদ(লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিল) প্রথমে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলা প্রেসিডেন্সিতে প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। পরে বাকী প্রদেশগুলিতেও এই পরিষদ প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয়। তবে এই প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলি শুধু একটা পরামর্শদায়ী সংস্থা হিসেবেই সৃষ্ট হয়েছিল। প্রতিটি ব্যবস্থা পরিষদে রাজকর্মচারীদেরই সংখ্যাধিক্য রাখা হয়েছিল। বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা ছিল চার থেকে আটজন, দেশীয় ও ইংরাজ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই বেসরকারী সদস্য মনোনীত করা হত। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের মতই এই প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলিও গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থাপক সভা বা পার্লামেণ্টের ভূমিকা পালনে অশক্ত ছিল।

অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে বাড়াবাড়ি ধরনের কেন্দ্রীয় প্রভুত্বের পরিণাম শুভ প্রমাণিত হয়নি। সমস্ত প্রদেশ থেকে আহৃত রাজস্ব ও অন্যবিধ আয় কেন্দ্রীয় রাজকোষে জমা হত। তারপর এই অর্থ শাসন পরিচালনের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করা হত। প্রাদেশিক সরকারের ব্যয়ের প্রতিটি ভগ্নাংশের উপরও কেন্দ্রীয় সরকার কড়া নজর রাখত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা অসুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক সরকারগুলি ঠিকমত রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারছে কিনা অথবা টাকাকড়ি খরচ করা ঠিকমত করছে কিনা তার খবরদারির কাজটা খুব সোজা ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক খুটিনাটি বিষয় নিয়ে মতান্তর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। অপরদিকে প্রাদেশিক সরকারগুলি টাকাকড়ি খরচের ব্যাপারে অসংযমেরই পরিচয় দিত, অপব্যয় রোধের চেষ্টা করা হত না। এইসব কারণে কর্তৃপক্ষ স্থির করেছিল যে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আর্থিক বিষয়ে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করে রাখার নীতি পরিত্যাগ করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির ব্যয়বরাদ্দ ইত্যাদি পৃথকীকরণের কাজটি 1870 খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল লর্ড মেয়োর কার্যকালে সুরু

হয়। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে পুলিশ, জেল, শিক্ষা, চিকিৎসা, রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজে ব্যয়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করে দিয়ে এইসব খাতে তাদের ইচ্ছামত এই টাকা ব্যয় করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকাটা প্রাদেশিক সরকার বিভিন্ন খাতে তাদের ইচ্ছামতই ব্যয় করত, কোন বিভাগে বেশী টাকা খরচ করা হবে আর কোন বিভাগে কম টাকা খরচ হবে এসম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীনতা ছিল। 1877 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেয়োর প্রবর্তিত এই নীতি লর্ড লিটন কর্তৃক আরও পরিবর্ধিত হয়েছিল। তিনি ভূমিরাজস্ব, আবগারি, সাধারণ প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগের খরচ-খরচার অধিকারও প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। একটি বিশেষ প্রদেশ থেকে স্ট্যাম্প, আবগারি শুল্ক ও আয়কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের যে অর্থ আয় হত তারই একটা নির্দিষ্ট অংশ আবার প্রাদেশিক সরকারকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রাপ্ত এই বাড়তি টাকা থেকে প্রাদেশিক সরকার যে অতিরিক্ত বিভাগগুলি পেয়েছিল তার খরচ মেটানোর জন্য এই নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। এই আর্থিক ব্যবস্থার আরও কিছু পরিবর্তন 1882 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপনের শাসনকালে সাধিত হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারগুলিকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে এই নিয়ম করা হয়েছিল যে প্রতিটি প্রাদেশিক সরকার কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে যে রাজস্ব অর্জন করবে তার সবটুকুই সে নিজে খরচ করবে। এছাড়া আরও কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশও তার প্রাপ্য হবে। এখন থেকে সকল সূত্র থেকে সরকারী আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। যথা—এক—সাধারণ আয়, দুই—প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব আয়, তিন—কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের আয়। এই শেষোক্ত আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রাদেশিক সরকারকেও দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এটাও স্থির হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে অর্থ বণ্টন ব্যবস্থা প্রতি পাঁচবছর অন্তর অন্তর পর্যালোচনা করে দেখা হবে অর্থাৎ এই ব্যবস্থা পরিবর্তন সাপেক্ষ করে রাখা হয়েছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের যে নীতি অবলম্বিত হয়েছিল সেটা প্রাদেশিক সরকারের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য করা হয়নি।

প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছু স্বাধিকার অবশ্যই দেওয়া হয়েছিল, তবে সেটা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নয়। নূতন আর্থিক বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাদেশিক সরকার পরিচালনায় ভারতীয়েরা কোন অংশ নিতে পারে, এমন ব্যবস্থাও রাখা হয়নি। এটা ছিল একটা নিছক প্রশাসনিক সংস্কার প্রচেষ্টা যার মূল উদ্দেশ্য ছিল আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস। কাগজে-কলমে এবং বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারেরই সর্বময় প্রভুত্ব কায়েম রাখা হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারের কাজকর্মের উপর পূর্বের মতই কেন্দ্রীয় সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অব্যাহত ছিল। এই সম্পর্কটা একরূপ অপরিহার্যই হয়ে দাঁড়িয়েছিল কারণ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার উভয় পক্ষই পরিপূর্ণভাবে ভারত-সচিব তথা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অধীনতাপাশে বদ্ধ ছিল।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা

আর্থিক চাপের কারণে সরকারকে কিছু কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। সরকারী প্রশাসনের উপর আর্থিক চাপ কমানোর উদ্দেশ্য সরকার পুর-সভা (মিউনিসিপ্যালিটি) ও জেলা পরিষদ (ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড) গঠনের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সংযোগও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের নিত্যনূতন কর্মধারা ও শোষণনীতি ক্রমশঃ ভারতবাসীর চোখে স্পষ্টতর হয়ে উঠ্ছিল। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে ইউবোপীয় সমাজব্যবস্থার কিছু প্রগতিমূলক সংস্কার প্রচেষ্টা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যরক্ষা বাঁধ, শিক্ষা ইত্যাদির প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এর প্রধান কারণ এই যে, ভারতে জাতীয়-চেতনা ক্রমশঃ জাগ্রত হয়ে উঠ্ছিল। ভারতবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দাবিও জেগে উঠেছিল। জনশিক্ষা, সুস্বাস্থ্য বিধায়ক ব্যবস্থা, পানীয় জল, পথ-নির্মাণ ও সংস্কার প্রভৃতি পৌর সুযোগসুবিধাগুলি ছিল এইসব দাবির অন্তর্ভুক্ত। সরকারের পক্ষে এই দাবিগুলি উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আর্থিক কারণে এই দাবিগুলি পূরণ করার সাধ্যও সরকারের ছিল না। রেলওয়ে প্রবর্তন ও সামরিক বাহিনী পোষণের গুরুভার সরকারের অর্থভাণ্ডার ক্ষয় করে ফেলেছিল। সরকারী আয়বৃদ্ধির একমাত্র পথ ছিল জনসাধারণের দেয় কর বৃদ্ধি। কিন্তু কর বৃদ্ধি দ্বারা আয় বৃদ্ধির পথ অবলম্বন করতে সরকারের সাহস হয়নি, কারণ

দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে চলতি হারেই কর দেওয়া কঠিন হয়েছিল, সেটা তখনই ছিল বেশ গুরুভার। নূতন করে ট্যাক্স চাপিয়ে সরকার জনসাধারণের মধ্যে আরও অসন্তোষ বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক হয়নি। ধনীশ্রেণীর উপর নূতন 'ট্যাক্স' ধার্য করে তাদেরও সরকার অসন্তুষ্ট করতে চায়নি। তবে সরকারী কর্তৃপক্ষ এটা অনুমান করে নিয়েছিল যে নতুনভাবে কর ধার্য করে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে এই নতুন কর-লব্ধ অর্থ তাদের সেবাতেই ব্যয়িত হবে, তাহলে জনসাধারণ নতুন 'ট্যাক্স' দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। এই ধরনের চিন্তা-ভাবনার পর স্থির করা হয়েছিল যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় ও জলসরবরাহ প্রভৃতি জনসাধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলির দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থা গঠন করে তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই স্থানীয় সংস্থাগুলি জনসাধারণের কাছ থেকে এই উদ্দেশ্যে 'ট্যাক্স' আদায় করে এগুলি পরিচালন করবে। বহু ইংরাজ আর একটি ভিন্ন কারণে স্থানীয় সংস্থা গঠনের সমর্থনে অগ্রসর হয়েছিল। এদের বক্তব্য ছিল এই যে স্থানীয় সংস্থা সংগঠনগুলি গড়ে উঠলে বহু ভারতীয়ের সঙ্গে কোন না কোন রকমে রাজকীয় প্রশাসনের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে, এতে ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ হ্রাস পাবে। স্থানীয় সংস্থাগুলি গঠিত হলে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং এই যোগাযোগের ফলে ভারতের উপর ব্রিটিশ জাতির একাধিপত্যের কোনই হানি ঘটতে পারবে না।

1864 থেকে 1868 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলি স্থাপিত হতে থাকে। তবে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এর সদস্যগুলি কর্তৃপক্ষের দ্বারা মনোনীত হত, আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে এর অধ্যক্ষ বা সভাপতি করা হত। কাজেই এটাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনরূপে ঠিক স্বীকার করা যেতে পারে না। শিক্ষিত ভারতীয় সমাজও এটাকে স্বায়ত্তশাসনরূপে মেনে নেয়নি। তাদের কাছে এই সংস্থাগুলি জনসাধারণের কাছ থেকে বাড়তি টাকা 'ট্যাক্স'রূপে আদায়ের একটা চাতুরীরূপে বিবেচিত হয়েছিল।

1882 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপনের রাজত্বকালে এই 'স্বায়ত্বশাসন' নীতি কিয়ৎ পরিমাণে উদারতর করার চেষ্টা হয়েছিল। তবে এই পরিবর্তনও যথেষ্ট ছিল না, এই পরিবর্তনের গতিও বেশ সতর্ক ছিল। সরকারীভাবে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল যে গ্রামাঞ্চলে ও শহরের প্রয়োজনীয়

সুযোগসুবিধাগুলির প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির উপর দেওয়া হবে, এবং এইসব স্থানীয় সংস্থাগুলিতে বেসরকারী সদস্যের সংখ্যাধিক্য থাকবে। কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ গভর্নমেণ্ট যে যে জায়গায় নির্বাচন সম্ভব বলে মনে করবে সেই বিশেষ জায়গাগুলিতে জনসাধারণের ভোটে বেসরকারী সদস্যদের নির্বাচিত হতে হবে। এই প্রস্তাবে একজন বেসরকারী নির্বাচিত সদস্যকে বিশেষ সংস্থাটির চেয়ারম্যান বা সভাপতি রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই প্রস্তাবগুলি কার্যকর করতে প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক যথোপযুক্ত আইন বা 'য়্যাক্ট' প্রবর্তন করা হয়েছিল। এরপর দেখা গিয়েছিল যে প্রায় প্রতিটি জেলা-বোর্ড (ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড) ও পুরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি)-তেই নির্বাচিত সদস্যেরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আবার অতি অল্পসংখ্যক ভোটদাতা কর্তৃকই নির্বাচিত হয়েছিল কারণ কঠোরভাবে ভোটদাতার সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছিল। প্রায়ই দেখা যেত যে, জেলাবোর্ডগুলি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (যথা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটই এই বোর্ডের সভাপতি। তবে পুরসভাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বেসরকারী সভাপতি বা চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে এটাই দেখা গিয়েছিল। এই স্থানীয় সংস্থাগুলির উপরও সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছিল। এই স্থানীয় সংস্থাগুলির পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা অধিগ্রহণের অধিকারও সরকারের হাতে ছিল। এর ফলে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মত কতকগুলি প্রধান প্রধান শহরের পুর-শাসনব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন নীতি কিছুটা সফল হয়েছিল। অবশিষ্ট স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলি সরকারের যে কোন একটা সংস্থার মতই চলত। সুষ্ঠু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ বহু দূরেই থেকে গিয়েছিল। এতৎসত্ত্বেও রাজনৈতিক সচেতনতাসম্পন্ন ভারতীয়-সমাজ লর্ড রিপনের এই নূতন পদক্ষেপকে সমর্থন করে সক্রিয়ভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিতে যোগ দিয়েছিল। তাদের মনে এই আশা জেগেছিল যে এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিকে কালক্রমে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনাধীন প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলা যাবে।

সামরিক বিভাগে পরিবর্তন

1858 খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে অতি যত্নের সঙ্গে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল। কোম্পানীর হাত থেকে ভারতশাসন কর্তৃত্ব মহারাণী

ভিক্টোরিয়ার হাতে চলে যাওয়াতে এই পুনর্গঠন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।[৫] অতঃপর কোম্পানীর ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীকে ব্রিটিশ রাজকীয় সৈন্য-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের আর একটা কারণ ছিল—বিদ্রোহের পুনরাবির্ভাব রোধ। শাসন-কর্তৃপক্ষ এটা বুঝেছিল যে শাসন চালাতে হল বেয়নেট্‌ই তাদের সর্বোত্তম সহায়। ভারতীয় সৈনিকরা আর কখনও যাতে বিদ্রোহ না করতে পারে বা করলেও সাফল্য লাভ না করতে পারে তার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। প্রথম কাজ হয়েছিল যে ব্রিটিশ সৈন্য এবং ভারতীয় সৈন্যসংখ্যার মধ্যে তারতম্য হ্রাস। বেঙ্গল আর্মিতে খবরদারির জন্য দুটি, ভারতীয়ের উপরে একটি, এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে পাঁচটি ভারতীয় সৈনিকের উপরে দুইটি ব্রিটিশ সৈনিক রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভৌগোলিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিতেই শুধুমাত্র ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েনের ব্যবস্থা হয়েছিল। গোলন্দাজ বাহিনীর মত সামরিক বিভাগের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশটি শ্বেতকায় সৈনিকদেরই হাতে রাখা হয়েছিল যেভাবে বিংশ শতাব্দীতেও ভারতীয় সৈনিকদের ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়নি। সামরিক বাহিনীর দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারী বা 'অফিসার' শ্রেণীতে ভারতীয়দের গ্রহণ না করার নীতি অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে কার্যকর রাখা হয়েছিল। 1914 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীতে কোন ভারতীয় 'সুবেদার' পদের চেয়ে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, সামরিক বিভাগের যে অংশ ভারতীয়দের নিয়ে সংগঠিত ছিল সেখানে ভারসাম্য বজায় রাখা বা বিভেদ-মূলক নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে একটা ঐক্য-পরিপন্থী পরিবেশ সৃষ্টি। ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে উঠলে তারা আবার একদিন সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ করতে পারে এই আশঙ্কাতেই ইংরাজ ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে একটা বৈষম্য সৃষ্টির কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। সৈন্য সংগ্রহকালে 'রংরুট'দের জাতি, ধর্ম, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি বিচার করা হত, অর্থাৎ সৈন্য সংগ্রহের পদ্ধতি এক ধরনের রাখা হয়নি। আউধ, বিহার, মধ্যভারত ও দক্ষিণ-ভারতের সৈনিকদের সাহায্যেই ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতে প্রভুত্ব বিস্তার সম্ভব হয়েছিল কিন্তু এরাই আবার 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বিদ্রোহান্তে সামরিক বিভাগে সংস্কারের কাজে হাত দেওয়ার পর একটা অজুহাত হিসেবে

ভারতবাসীদের সামরিক ও অসামরিক জাতি এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল। যদিও এটা একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। এই সময় থেকে আউধ, বিহার, মধ্য ও দক্ষিণ-ভারত থেকে সামরিক বিভাগে প্রবেশেচ্ছুদের নিয়োগ প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষের মতে এরা ভারতের যোদ্ধা জাতগুলির অন্যতম রূপে গণ্য হয়নি। শিখ, গোর্খা ও পাঠান সৈন্যদেব সাহায্যে ইংবাজ বিদ্রোহ দমন করেছিল। এখন থেকে এদেরই যোদ্ধ'-জাত রূপে চিহ্নিত করে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করার নীতি গৃহীত হয়েছিল। সৈন্য-বাহিনীর ভারতীয় বিভাগ (Regiment)-গুলির প্রত্যেকটি দলে নানা জাত ও নানা প্রদেশের সৈনিকদের সমাবেশ রাখা হয়েছিল, কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায় যেন সংখ্যায় ভারী না হয়ে উঠে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হত। সৈন্যদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, অঞ্চল ও গোষ্ঠীগত সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব গড়ে উঠবার ব্যাপারে সামরিক কর্তৃপক্ষ বেশ প্রশ্রয় দিত কারণ তারা বুঝেছিল যে সাম্প্রদায়িক চেতনা অব্যাহত থাকার জন্য ভারতীয় সৈনিকদেব মধ্যে জাতীয়-চেতনা জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে থাকবে। ব্রিটিশেব এই বিভেদ-নীতির একটা প্রমাণ এই যে অধিকাংশ বাহিনীই একটা সম্প্রদায়-গত ভিত্তিতে সংগঠিত করা হয়েছিল। এই বিষয়ে ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিংকে 1861 খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সচিব চার্লস উডের লেখা একটা চিঠির মর্ম ছিল "আমি আর কখনও এমন ধরনের একটা বিরাট সামরিক বাহিনী দেখতে চাই না যে বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্যের আনুগত্য, বৈরিতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক একই প্রকার হবে, এই ধরনের ঐক্য যে কোন সামরিক বাহিনীকে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সজাগ করে দেয় এবং মিলিতভাবে বিদ্রোহের প্রেরণা দেয়। আমি চাই বাহিনীগুলি এমনভাবে গঠিত হ'ক যাতে প্রয়োজন হলে একটি বাহিনী অপর একটি বাহিনীর প্রতি বন্দুক ছোঁড়ার মত মনোভাব রাখতে পারে।"

যাই হোক্, ভারতীয় বাহিনী মুলতঃ হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি বেতনভুক্। অর্থাৎ শুধু টাকার জন্যই ভারতীয়গণ সৈন্যদলে ভর্তি হত কোন আদর্শ তাদের প্রেরণাস্থল ছিল না। আরও একটা কথা এই যে সামরিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সৈন্যদের ভারতীয় জনজীবনের ধারা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করত। কোন রকম জাতীয়তাবোধ তাদের মধ্যে যাতে গড়ে না উঠে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হত। জাতীয়তাবোধ জাগ্রত

করতে পারে এমন কোন বই, সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র যাতে সৈন্যদের হাতে না পড়তে পারে সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হত। পরবর্তীকালে অবশ্য দেখা গিয়েছিল যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় সৈনিকদের একাংশ আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ভারতের সামরিক বাহিনী কালক্রমে একটা বিরাট ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। 1904 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রাজস্বের বাহান্ন শতাংশ সামরিক বাহিনীর পেছনে ব্যয়িত হত। একাধিক উদ্দেশ্যে এই বিরাট ব্যয়ের ঝুঁকি নেওয়া হত। ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির কাছে ভারতবর্ষ ছিল পরমলোভনীয় সম্পদ। রুশ, ফ্রান্স ও জার্মানী ছিল এই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অন্যতম, ভারতের প্রতি এদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। এদের সম্ভাব্য আক্রমণ রুখতে ব্রিটিশের পক্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার আবশ্যকতা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সামরিক বাহিনী শুধু ভারতের প্রতিরক্ষার জন্যই গঠিত হয়নি। এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবিস্তার অথবা এখানকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কাজেও প্রায়শঃ এই বাহিনীকে নিয়োগ করা হত। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ইংরাজ সৈন্যরা বস্তুতঃ ছিল দখলদারী বাহিনী। ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অব্যাহত রাখার এঁরাই ছিল নির্ভরযোগ্য স্তম্ভ। তবে এদের সব খরচই ভারত থেকে সংগৃহীত রাজস্ব থেকে মেটানো হত। অর্থাৎ ভারতবাসীর অর্থেই এই দখলদারী বাহিনী পোষা হত। কার্যতঃ এই খরচের বোঝা ভারতবাসীর পক্ষে বেশ গুরুভার হয়ে উঠেছিল।

প্রশাসনিক চাকুরী

পূর্বেই বলা হয়েছে যে গভর্নমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া বা ভারত-সরকারের উপর ভারতবাসীর প্রভাব অতি অল্পই ছিল। আইনকানুন প্রবর্তন অথবা প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ভারতবাসীকে কোন অংশই নিতে দেওয়া হত না। সরকারী আইনকানুন অথবা প্রশাসনিক নীতিকে কার্যকর করার ভার যে আমলাতন্ত্রের উপর, সেই আমলাতন্ত্রেও ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুযোগসুবিধাগুলি একচেটিয়াভাবে 'ভারতীয় সিভিল সার্ভিস'ভুক্ত কর্মচারীরাই ভোগ করত। লণ্ডনে গৃহীত বাৎসরিক প্রতিযোগিতামূলক একটি পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়

'সিভিল সার্ভিস'-এর জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হত। ভারতীয়দের মধ্যে 1863 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ (মেজদা)। এরপর প্রায় প্রতি বৎসরই একটি দুটি ভারতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই লোভনীয় পদে যোগদান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তবে প্রতি বৎসরই ব্রিটিশ পরীক্ষার্থীরাই বিপুল সংখ্যায় উত্তীর্ণ হত, ভারতীয়দের সংখ্যা তুলনায় নগণ্য ছিল। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় প্রার্থীদের সংখ্যাল্পতার বহু কারণও ছিল। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়া হত ভারত থেকে বহুদূরস্থ লণ্ডন শহরে। বিদেশী ইংরাজী ভাষা ছিল এই পরীক্ষার মাধ্যম। প্রাচীন গ্রীক্ ও ল্যাটিন ভাষায় দক্ষতা এই পরীক্ষার পক্ষে ছিল অপরিহার্য। দীর্ঘ সময় ইংলণ্ডে থেকে বহু অর্থ ব্যয়ে এই ভাষা দুটি শিখতে হত। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার উচ্চতম বয়ঃসীমা 1859 খ্রীষ্টাব্দে তেইশ বছর ধার্য ছিল। এই বয়ঃসীমা 1878 খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বৎসরে নামিয়ে আনা হয়েছিল অর্থাৎ কোন প্রার্থীকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে হলে তার বয়স উনিশের অনধিক হওয়া আবশ্যক ছিল। তেইশ বৎসর বয়সের ভারতীয় যুবকদের পক্ষেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন ছিল, সুতরাং এই বয়ঃসীমা উনিশে নামিয়ে দেওয়ার পর ভারতীয় যুবকদের পক্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আরও সুদূরপরাহত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

প্রশাসনের আরক্ষা (Police), পূর্ত (Public Works Dept.), চিকিৎসা, ডাক ও তার, শুল্ক ও পরবর্তী সময়ে প্রচলিত রেলওয়ে প্রভৃতি বিভাগে মোটা বেতনের উচ্চ পর্যায়ের পদগুলি সবই ছিল সাদা' চামড়ার ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য সংরক্ষিত।

প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদে ইংরাজদের সংখ্যাধিক্য একটা আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। ভারতের শাসক কর্তৃপক্ষ ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদে ইংরাজ নিয়োগ অত্যাবশ্যক বলেই বিশ্বাস করত। 1893 খ্রীষ্টাব্দে ভারত সচিব (Secretary of State) লর্ড কিম্বারলি (Lord Kimberly) এই নিয়ম করেছিলেন যে ব্রিটিশজাতীয় সিভিল সার্ভিস পদাধিকারীর সংখ্যাধিক্য সর্বদাই বজায় রাখতে হবে। এ সম্বন্ধে ভাইসরয় লর্ড ল্যান্সডাউন বিশেষ জোর দিয়ে লিখেছিলেন যে ব্রিটিশের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য

রক্ষা করতে হলে শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ কর্মচারীদের হাতেই রাখতে হবে।

1918 খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতীয়দের চাপে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে অধিকতর সংখ্যক ভারতীয় প্রার্থী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিশেষ দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি ব্রিটিশ জাতীয়দের জন্য সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তন করা হয়নি। প্রশাসনিক পদে বেশ কিছু ভারতীয় নিয়োগ প্রথা চালু হবার পরও দেখা গিয়েছিল যে ভারতীয় প্রশাসনিক পদাধিকারীদের বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাও দেওয়া হয়নি, তারা শুধু ভুয়ো ক্ষমতা পেয়েছে। উচ্চ-পদাধিকারী ভারতীয়েরা ব্রিটিশরাজেব দালালরূপে শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সেবা করে চলেছে।

দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক

1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পব দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি ব্রিটিশ নীতির আমূল পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দেশীয় রাজ্যগ্রাসই ছিল ব্রিটিশ নীতি। বিদ্রোহের পর এই নীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল। বিদ্রোহের সময় অধিকাংশ দেশীয় নৃপতি ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা এই বিদ্রোহ দমনেও সক্রিয় সহায়তা দিয়েছিল। লর্ড ক্যানিং-এর ভাষায় ঝড়-তুফানের বিরুদ্ধে পোতাশ্রয়ের সম্মুখস্থ বাঁধ-এর কাজটি এরাই করেছিল। অর্থাৎ এরা না থাকলে ব্রিটিশরাজ ভেসে যেত। এখন এই রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ দেশীয় নৃপতিদের দত্তক পুত্রদের উত্তরাধিকারের স্বত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। তাদের নিজ নিজ রাজ্যের নির্দিষ্ট এলাকা অক্ষুণ্ণ রাখা হবে এই মর্মে আশ্বাসবাণীও ঘোষিত হয়েছিল। বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে দেশীয় রাজ্যগুলি ভবিষ্যতে ভারতে কোন গণবিদ্রোহ দেখা দিলে ব্রিটিশ শক্তিকে সমর্থন ও সহায়তা দেবে। এ সম্বন্ধে 1860 খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিং-এর মত এই ছিল "অনেকদিন পূর্বে সার জন ম্যালকম বলেছিলেন যে আমরা যদি সমগ্র ভারতবর্ষকে কতকগুলি জেলায় (District) ভাগ করে ফেলি, তবে আমাদের সাম্রাজ্য পঞ্চাশ বছরের অধিক টিকে থাকবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম। এর পরিবর্তে আমরা যদি রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাহীন কতকগুলি দেশীয় রাজ্য সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসেবে বজায় রাখি তবে আমরা যতদিন জলপথে আমাদের প্রভুত্ব রাখতে পারব ততদিন

পর্যন্ত ভারতে আমাদের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকবে। উপরোক্ত মন্তব্য যে খুবই যুক্তিযুক্ত এ সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে আমাদের নীতি স্থির করতে আশু মনোযোগ দিতে হবে।"

এই মনোভাববশতঃই দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুদৃঢ় খুঁটিরূপে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। পি. ই. রবার্টস (P. E. Roberts) নামে এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিকও ব্রিটিশ নীতির এই দিকটি লক্ষ্য করে লিখেছেন যে বিদ্রোহের পরবর্তী সময় থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তথা ভারত গভর্নমেণ্টের দেশীয় রাজ্যনীতির লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর রূপে দেশীয় রাজ্যগুলিকে প্রশ্রয়দান। সাম্রাজ্যের অধিকার অব্যাহত রাখা ব্রিটিশের দেশীয় রাজ্যনীতির একটি দিক্ মাত্র। এর আর একটি দিক ছিল এই রাজ্যগুলিকে পরিপূর্ণরূপে পদানত করে রাখা। 1857 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বহুক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করলেও কাগজে-কলমে এই রাজ্যগুলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। এখন এই অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। অস্তিত্ব বজায় রাখার মূল্য হিসেবে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশের সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হয়েছিল। 1862 খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিং ঘোষণা করেন যে "ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনাধিকারীই (তৎকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া) সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র শাসক এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাধিকারী। এ বিষয়ে কোন প্রশ্নের স্থান নেই।" 1876 খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়াকে "ভারতের সম্রাজ্ঞী" আখ্যা দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেওয়া যে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত। পরবর্তীকালে লর্ড কার্জন এটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন যে ইংলণ্ডেশ্বর বা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধিরূপেই দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ স্ব স্ব রাজ্য শাসন করেন। দেশীয় নৃপতিগণ এই অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 'ছোট তরফ' হিসেবেই টিকে থেকেছিল। তারা এই ভেবে আশ্বস্তবোধ করেছিল যে ব্রিটিশরাজের অধীনেও তারা নিজ নিজ রাজ্যের রাজাই থেকে যাবে।

সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারীরূপে ব্রিটিশরাজ দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে 'খবরদারি' করার অধিকার গ্রহণ করেছিল। নিজস্ব প্রতিনিধি বা রেসিডেন্টের মাধ্যমে তারা শুধু দেশীয় রাজ্যগুলির দৈনন্দিন

শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেই ক্ষান্ত থাকেনি। মন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিয়োগ বা বরখাস্ত করার ব্যাপারেও তারা হস্তক্ষেপ করত। এমন কি কখনও কখনও বিশেষ রাজ্যের নৃপতিকেও তারা অপসারণ করত। ক্ষেত্রবিশেষে এই নৃপতিদের ক্ষমতাও হ্রাস করা হত। দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় ইংরাজদের হস্তক্ষেপের একটি কারণও ছিল। কারণটি হল এই যে, তারা অবশিষ্ট ভারতেব মত দেশীয় রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থাকে আধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন করতে চেয়েছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল যে, ব্রিটিশের দ্বারা প্রত্যক্ষশাসিত ভারতের অন্যান্য স্থানের মত শাসনব্যবস্থা দেশীয় রাজ্যগুলিতে বর্তমান থাকার পরে একদিন এই রাজ্যগুলি ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে। সর্বভারতে রেলওয়ে ও ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন, একই ধরনের মুদ্রা প্রচার এবং একই ধরনের অর্থনীতি সর্বোপরি প্রাচীন শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের ফলে দেশীয় রাজ্য ও ভারতের অবশিষ্টাংশকে প্রায় একই করে ফেলেছিল। দেশীয় রাজ্যের শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের একটা হেতু বা অজুহাতও জুটেছিল। এই হেতু ছিল অনেকগুলি দেশীয় রাজ্যে গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একহাতে দেশীয় শাসকদের এই আন্দোলন দমনে সহায়তা করত, সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যগুলিতে শাসনব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ ত্রুটিগুলি সংশোধনও করার চেষ্টা করত।

মহীশূর ও বরোদা এই দুটি দেশীয় রাজের প্রতি ব্রিটিশরাজের অনুসৃত নীতির পর্যালোচনা করলে এই নীতির বিবর্তনের ধারাটি বোধগম্য করা যায়। 1831 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক মহীশূরের নৃপতিকে সিংহাসনচ্যুত করে মহীশূর রাজ্যকে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করেন। 1868 খ্রীষ্টাব্দের পর ব্রিটিশরাজ পূর্বতন নৃপতির দত্তক পুত্রকে মহীশূর রাজ্যের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল। শুধু তাই নয় 1881 খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্যের অধিকারও তরুণ মহারাজাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। 1874 খ্রীষ্টাব্দে বরোদার নৃপতি মলহর রাও গায়-কোয়াড়কে কুশাসন এবং বরোদায় নিযুক্ত ব্রিটিশ প্রতিনিধি (Resident)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে পদচ্যুত করা হয়েছিল। পদ-চ্যুতির আগে একটা সংক্ষিপ্ত বিচারের ব্যবস্থা অবশ্য করা হয়েছিল। তবে বরোদা রাজ্য ব্রিটিশরাজ অধিকার করেনি। গায়কোয়াড় পরিবারের

একজন তরুণকে বরোদার অধিপতি বা গায়কোয়াড়রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

প্রশাসনিক নীতি

1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর ভারতের প্রতি ব্রিটিশের মনোভাব তথা শাসননীতি পরিবর্তিত হযেছিল। তবে এই পরিবর্তন ভারতের পক্ষে ক্ষতি-করই প্রমাণিত হয়েছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ব্রিটিশরাজ খুব ধীরগতিতে এবং অনেকটা অনিচ্ছার সঙ্গে ভারতের আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ নিয়েছিল। বিদ্রোহোত্তর কালে বেশ ভাবনাচিন্তা করেই ভারতে ব্রিটিশনীতি প্রতিক্রিয়া-শীলতার পথ বেছে নিয়েছিল। একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ার-এব ভাষায় আধুনিকীকরণের প্রতি ব্রিটিশরাজের অনুরাগে ভাটা পড়েছিল। ইংলণ্ডেব সরকার এবং ভারত সরকার ভাবতীয় সামরিক বাহিনী ও প্রশাসন ব্যবস্থা যেভাবে পুনঃ সংগঠিত করেছিল তাতে ভারতবাসীর কোন স্থানই ছিল না, এ বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আগেকার দিনে অন্ততঃ মৌখিকভাবেও ইংরাজদের পক্ষ থেকে বলা হত যে তারা ধীরে ধীরে ভারতীয়দের নিজেদের দেশশাসনের উপযুক্ত করে তুলতে চায়, এটাই তাদের নীতি। বিদ্রোহোত্তরকালে প্রকাশ্যে বলা হয়েছিল যে ভারতবাসীর তাদের নিজেদের দেশ শাসনের কোন যোগ্যতা নেই, সুতরাং অনির্দিষ্টকাল যাবৎ ইংরাজকেই ভারত শাসন করে যেতে হবে। ইংরাজের এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব দেশ-শাসনের নানাক্ষেত্রেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

বিভেদনীতির সাহায্যে শাসন

অতীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকবর্গের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। ইংরাজেরা এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে একেকে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ভারতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। 1858 খ্রীষ্টাব্দের পর ব্রিটিশরাজের নীতি দাঁড়িয়েছিল দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিভেদের বীজরোপন এবং নির্বিবাদে ভারত শাসন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিভেদ ঘটানো হত। দেশীয় রাজাদের প্রজাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হত। একটি প্রদেশকে অন্য প্রদেশের বিরুদ্ধে, এক জাতির মানুষকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে, কোন একটি দলকে অন্য একটি দলের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট করে তোলা হত। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষাক্ত করার দিকেই ব্রিটিশরাজের সবিশেষ মনোযোগ ছিল।

1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান—এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও একতা দেখা গিয়েছিল সেটা ইংরাজের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের মূলে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে তথা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ধ্বংস করার জন্য ইংরাজ-রাজ বদ্ধপরিকর হয়েছিল। হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার কোন সুযোগই ইংরাজ কাজে লাগাতে ভোলেনি। বিদ্রোহের অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশরাজ ব্যাপকভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সম্পত্তি ও জমি-জায়গা বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছিল। হিন্দুরাই তাদের বন্ধু খোলাখুলিভাবে তারা এই মতও প্রকাশ করেছিল। 1870 খ্রীষ্টাব্দের পর তারা এই মত ও পথ পরিবর্তন করে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে হাত দিয়েছিল। ভারতের শিক্ষিত সমাজকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবগ্রস্থ করার জন্য ইংরাজ সুকৌশলে চাকুরীর ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে এনেছিল। দেশে শিল্প-বাণিজ্যের দুর্দশা এবং সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার কারণে সরকারী চাকুরীই শিক্ষিত সমাজের জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায়ে পরিণত হয়েছিল। জীবিকার্জনের অন্য সুযোগসুবিধা না থাকায় যতগুলি সরকারী চাকুরী খালি হত তার জন্য প্রার্থীদের মধ্যে একটা তীব্র প্রতি-যোগিতা স্বাভাবিক কারণেই বর্তমান ছিল। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুযোগে ইংরাজ সরকার ভারতীয় মানুষদের মধ্যে আঞ্চলিক ও ধর্মীয় বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সরকারী দাক্ষিণ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইংরাজ শিক্ষিত মুসলমানদের শিক্ষিত হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন করে তুলেছিল। এর বিনিময়ে তারা মুসলমান সম্প্র-দায়ের আনুগত্য ক্রয় করতে চেয়েছিল।

শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের প্রতি বিরূপতা

1833 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ভারত গভর্নমেন্ট প্রত্যক্ষভাবে ভারতে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহ দেখাতে সুরু করেছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত হয়েছিল। এর পর দেশে উচ্চশিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। শিক্ষিত ভারতীয়েরা 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে কোন অংশগ্রহণ করেনি। এই ঘটনা বহু রাজকর্মচারীর প্রশংসা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভারতীয় শিক্ষিত

প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই নেক্‌-নজর কিন্তু অতি দ্রুত অপসৃত হয়েছিল। তার কারণ এই যে আধুনিক শিক্ষার আলোকে বহু শিক্ষিত ভারতীয় ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী গড়নের প্রতি বিরূপ হয়ে ভারত শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকারের দাবি তুলতে সুরু করেছিল। এই সময় শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ একটা জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এদেরই উদ্যোগে 1885 খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উচ্চশিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষিত ভারতীয সমাজেব বিরুদ্ধতার নীতি অবলম্বন করেছিল। কর্তৃপক্ষ এখন থেকে উচ্চশিক্ষা বিস্তার রুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। শিক্ষিত ভারতীয়দের তাবা 'বাবু' আখ্যায় অভিহিত করত। এই আখ্যার মধ্যে তাদের ঘৃণামিশ্রিত মনোভাব প্রকাশ পেত।

আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধাবা প্রণোদিত ভারতীয় সমাজের যে অংশ আধুনিক রীতিতে দেশের উন্নতিসাধনে তৎপর হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি বিরুদ্ধতা প্রদর্শন করেছিল। তার কারণ এই যে, শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের কাছে স্বদেশের যে উন্নতি বাঞ্ছিত ছিল সেটা ছিল মূলতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিপন্থী। শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ ও উচ্চ-শিক্ষার প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধ মনোভাব থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে ভারতের প্রতি ব্রিটিশরাজের সদিচ্ছার অস্তিত্ব কোন সময়ে কিছু পরিমাণ থাকলেও তৎকালে সেটা সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিল।

জমিদারদের প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাব

প্রগতিপন্থী শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখন ভারতীয়দের মধ্যে রাজা মহারাজা, জমিদার ও ভূস্বামী শ্রেণীর প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ দেখিয়েছিল। এর আগেই বলা হয়েছে যে, কিভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জাতীয় আন্দোলন প্রতি-রোধের জন্য দেশীয় রাজ্যের শাসকদের কাজে লাগিয়েছিল। দেশীয় রাজ্য-গুলির শাসকদের হাত করে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখন আনুগত্যের প্রয়োজনে জমিদার ও ভূস্বামীদেরও তোয়াজ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। এর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। অযোধ্যার তালুকদারদের সবাইকেই বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জমিদার ও ভূস্বামীদেরই এখন থেকে

ভারতীয় জনগণের স্বভাব-সিদ্ধ ও চিরস্বীকৃত নেতা বা সমাজপতিরূপে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছিল, অনেক সুযোগসুবিধারও ব্যবস্থা হয়েছিল। চাষীদের স্বার্থহানি করে জমিদার শ্রেণীর সম্পত্তির স্থায়িত্ব বিধান করা হয়েছিল। জাতীয়তাবোধসম্পন্ন শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে শক্তি হিসেবেই এদের প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই অনুগ্রহ বর্ধিত হয়েছিল। 1876 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে "শক্তিশালী ভারতীয় অভিজাত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ ও সহমর্মিতার প্রতি ব্রিটিশ সিংহাসন এখন থেকে একাত্ম হয়ে থাকবে।" অর্থাৎ ব্রিটিশরাজ অভিজাতশ্রেণীর সর্ববিধ স্বার্থ রক্ষায় তৎপর থাকবে। এই প্রতিশ্রুতির ফলে ভারতীয় জমিদার ও ভূস্বামী শ্রেণী এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে তাদের ভালো-মন্দ ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের সঙ্গেই একসূত্রে বিজড়িত। এই কারণে তারা ব্রিটিশরাজের দৃঢ় সমর্থকে পরিণত হয়েছিল।

সামাজিক সংস্কার নীতি

সমাজের রক্ষণশীল শ্রেণীর সঙ্গে জোট বাঁধার ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অতঃপর সমাজ সংস্কারকদের সহায়তা দানের পূর্ব অনুসৃত নীতি বিসর্জন দিয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে আগেকার দিনে সরকারী সাহায্যে সতীদাহ প্রথা নিরোধ ও বিধবার পুনর্বিবাহ আইন প্রবর্তন 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিশেষ কারণ। এর পর থেকেই সরকারী কর্তৃপক্ষ রক্ষণশীল সমাজের পক্ষাবলম্বনের নীতি গ্রহণ করেছিল। সমাজ-সংস্কারকদের আর মোটেই উৎসাহিত করা হত না।

এবিষয়ে জওহরলাল নেহেরু তাঁর "ভারত আবিষ্কার" (Discovery of India) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে "বহু অনিষ্টকর প্রথা ও ব্যবস্থা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেরও মনঃপূত ছিল না কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে এরা নিজেরাই এই কুপ্রথাগুলির সংরক্ষকের ভূমিকা নিয়েছিল।" বস্তুতঃ এই ব্যাপারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমাজ-সংস্কার সম্পর্কিত কোন আইন প্রবর্তনে সরকারী উদ্যোগ দেখা দিলে ভারতের রক্ষণশীল সমাজ তার বিরুদ্ধতা করত, সঙ্গে সঙ্গে এই বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে বলা হত যে এই বিদেশী শাসকদের ভারতের অভ্যন্তরীণ সমাজব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই। সমাজসংস্কার বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখিয়ে অপরদিকে কর্তৃপক্ষের ভাগ্যে প্রগতিপন্থী ভারতীয় সমাজের ধিক্কার লাভ

ঘটত। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সমাজসংস্কার বিষয়ে সব সময়ে ঔদাসীন্য দেখায়নি। স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে গিয়ে সমাজ-সংস্কারে উদাসীন থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিশেষ কতকগুলি কুপ্রথার সংরক্ষকের কাজ করেছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জাতিভেদ প্রথা ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা দিয়েছিল।

সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির একান্ত অনগ্রসরতা

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষামূলক পরিবেশ ও সুস্বাস্থ্য, জল সরবরাহ ও পথঘাটের ব্যবস্থা প্রভৃতি জনসেবামূলক প্রকল্পগুলির প্রভূত উন্নতি হলেও ভারতে এই ব্যবস্থাগুলির অবস্থা বেশ শোচনীয়ই থেকে গিয়েছিল। জনসেবামূলক এই কাজগুলিকে উপেক্ষা করে ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের বিরাট অঙ্কের আয়ের টাকা সামরিক বাহিনী, যুদ্ধ ও সরকারী আমলা পোষণেই ব্যয় করে ফেলত। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে 18৭6 খ্রীষ্টাব্দে রাজস্বখাতে গভর্নমেন্টের আয় হয়েছিল 47·00 কোটি টাকা। এই আয়ের মধ্যে সৈন্যবাহিনী ও অসামরিক প্রশাসনের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল যথাক্রমে 19·41 ও 17·00 কোটি টাকা। শিক্ষা, ঔষধপত্র ও জনস্বাস্থ্যখাতে দুই কোটিরও কিছু কম টাকা ব্যয়িত হয়েছিল। সেচখাতে ব্যয় করা হয়েছিল মাত্র 65·00 লক্ষ টাকা। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও জলসরবরাহ খাতে সামান্য যে অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল তা আবার নগরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। নগরাঞ্চলের প্রতি এই ঈষৎ কৃপাও ব্রিটিশ অসামরিক কর্তৃপক্ষ ও দেশীয় অভিজাতশ্রেণী অধ্যুষিত অঞ্চলে বর্ষিত হয়েছিল। এতে শুধু ইউরোপীয় এবং এই অঞ্চলের মুষ্টিমেয় অভিজাত ভারতীয় বাসিন্দাদেরই উপকার সাধিত হয়েছিল।

শ্রমসংক্রান্ত আইন

উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ধাঁচের কলকারখানায় ও ক্ষেতে খামারে শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। এই শ্রমিকদের দৈনিক বারো থেকে ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হত, সপ্তাহে একদিনও তারা ছুটি পেত না। শিশু ও স্ত্রী-শ্রমিকদেরও পুরুষ শ্রমিকদের মতই দৈনিক বারো থেকে ষোল ঘণ্টা কাজ করতে হত। শ্রমিকদের মজুরির হারও ছিল খুব কম, মাসে চার থেকে কুড়ি টাকার মধ্যে। কারখানাগুলি ছিল খুবই অপরিসর এবং আলোবাতাস-

হীন, এক কথায় খুবই অস্বাস্থ্যকর। কারখানার যন্ত্রপাতিগুলিও ছিল বিপজ্জনক, এই কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটত।

ভারত সরকার বা গভর্নমেণ্ট অক্ ইণ্ডিয়া সাধারণভাবে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিল। এইজন্য আধুনিক ধরনের কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের দুরবস্থা দূর করার বিষয়ে তারা কোন বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। শ্রমিকদের স্বার্থে যে ব্যবস্থা চালু ছিল সেই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের বিশেষ কোন সুবিধা হয়নি। শ্রমিকদের দুরবস্থা দূর করার বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিকতারও বেশ অভাব ছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই কলকারখানার অনেকগুলিই পুঁজিপতি ভারতীয়দের সম্পত্তি ছিল। শ্রমিক সম্পর্কিত আইনকানুন যা কিছু করা হয়েছিল তার মধ্যে মানবতাবোধের বেশ অভাব ছিল। ভারত সরকারকে চাপে পড়েই কিছু কিছু শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ ভারত সরকারকে ভারতে কারখানা-সংক্রান্ত আইন প্রবর্তনের জন্য চাপ দেওয়া সুরু করেছিল। এটাও তারা মানবিকতা বোধের জন্য করেনি, করেছিল নিজেদের স্বার্থে। ভারতীয় পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত কলকারখানাগুলিতে মজুরির হার অত্যন্ত কম থাকায় ব্রিটিশ শিল্পপতিদের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে ভারতে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের দাম কম পড়লে, সেই কম দামের জিনিসই বিক্রি হবে বেশী, চড়া দামে ব্রিটেনে প্রস্তুত দ্রব্যাদি কেউ কিনতে চাইবে না। এতে ভারতীয় পুঁজিপতিরাই লাভবান হবে কারণ শ্রমিক-মজুরিখাতে তাদের ব্যয় খুবই নগণ্য হয়ে থাকে। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা চেয়েছিল যে ভারতীয় শ্রমিক বেশী মজুরি পেলে বা মালিক শ্রেণীর কাছ থেকে অন্যান্য সুবিধা পেলে ভারতীয় কারখানার মালিকেরা শিল্পদ্রব্য সস্তায় বেচতে পারবে না। যাই হোক্ ব্রিটিশ শিল্পপতিদের চাপে ভারত সরকার কর্তৃক প্রথম কারখানা আইন 1881 খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল। এই আইনটি মূলতঃ শিশু-শ্রমিক বিষয়েই বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এই আইনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে সাত বছরের কম বয়সের কোন শিশুকে কারখানায় নিয়োগ করা চলবে না এবং সাত থেকে বারো বছর বয়সের শিশুশ্রমিকদের দৈনিক নয় ঘণ্টার অধিক খাটানো চলবে না। শিশুশ্রমিকদের মাসে চারদিন ছুটি বা বিশ্রাম দিতে হবে। এই আইনে বিপজ্জনক যন্ত্রপাতিগুলিকে ঘিরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় কারখানা আইন চালু হয়েছিল 1891 খ্রীষ্টাব্দে।

এই আইনে সপ্তাহে সকল শ্রমিককে একদিন ছুটি দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নারী শ্রমিকদের কাজের সময় নির্ধারিত হয়েছিল দৈনিক এগার ঘণ্টা। দ্বিতীয় কারখানা আইনে শিশুশ্রমিকদের কাজের সময় দৈনিক নয় ঘণ্টা থেকে নামিয়ে সাত ঘণ্টা করা হয়েছিল। পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদেব কাজের সময় এই আইনেও অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছিল।

উপরোক্ত দুটি কারখানাসংক্রান্ত আইনই ব্রিটিশ মালিকাধীন চা ও কফি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি অর্থাৎ এই চা ও কফি বাগিচার শ্রমিকদেব এই আইনের সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া হয়নি। উপরন্তু ভারত সরকার এই বিদেশী বাগিচা মালিকদের অতি নির্দয়রূপে শ্রমিক শোষণেব প্রতি কোন বিরুদ্ধতা দেখায়নি বরং সাহায্যই করত। চা বাগিচাগুলিব অধিআংশই ছিল আসামে। এই অঞ্চলে জনসংখ্যা খুব কম ছিল, এখানকার জলবায়ুও অস্বাস্থ্যকর ছিল। কাজেই চা বাগিচাগুলি চালু রাখার জন্য এখানে অন্য জায়গা থেকে শ্রমিক আমদানি করতে হত। বেশী মজুরির লোভ দেখিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক সংগ্রহে চা বাগিচা মালিকদের স্পৃহা ছিল না। এর বদলে তারা ছলনা ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা শ্রমিক সংগ্রহ করত। একবার চা বাগিচায় শ্রমিকদের এনে ফেলে মালিকেরা এদের ক্রীতদাসের মত কাজে লাগাত। ভারত সরকার এ বিষয়ে বিদেশী চা বাগিচা মালিকদের সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য 1863, 1865, 1870, 1873 ও 1882 খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি শাস্তিমূলক আইন প্রবর্তন করেছিল। কোন শ্রমিক একবার চা বাগিচায় গিয়ে শ্রমিকরূপে কাজ করার চুক্তিপত্রে সই বা টিপ-ছাপ দিলে তার আর চিরদাসত্ব থেকে নিস্তার ছিল না। কোন শ্রমিক চুক্তিভঙ্গ করলে সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ রূপে গণ্য হত। সেক্ষেত্রে মালিকের স্বার্থে তাকে গ্রেপ্তার করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

নবজাগ্রত শ্রমিক আন্দোলনের চাপে অবশ্য বিংশ শতাব্দীতে শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে কতকগুলি আইন প্রবর্তিত হয়েছিল। এতৎ সত্ত্বেও ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা ছিল অতিশোচনীয়রূপ দুর্দশাগ্রস্থ।

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ

ইংরাজ রাজ ভারতে ছাপাখানা ও মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তন করে আধুনিককালের সংবাদপত্র প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। জনমত গঠনে এবং সমালোচনা দ্বারা সরকারের শাসননীতিকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে

সংবাদপত্র যে প্রভূতভাবে উপযোগী এই সত্যটি শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ খুব দ্রুতই বুঝে নিয়েছিল। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দাদাভাই নৌরোজী, বিচারপতি রাণাডে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকমান্য তিলক, জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, সি. করুণাকর মেনন, মদনমোহন মালবীয়, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল এবং অন্যান্য কয়েকজন ভারতীয় নেতা সংবাদপত্র প্রবর্তন করে এই সংবাদপত্রগুলিকে রাজনীতির দিক থেকে প্রভূত শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। এর ফলে সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল।

সংবাদপত্রের উপর যে নিয়ন্ত্রণ ছিল 1835 খ্রীষ্টাব্দে চার্লস মেট্‌কাফ্ তা তুলে দেন। শিক্ষিত ভারতীয়গণ মুদ্রাযন্ত্রের এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঘটনায় বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত বোধ করেছিল। শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ এর পর বেশ কিছুকাল ধরে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই মোহমুক্ত হয়ে সংবাদ-পত্রগুলিকে জাতীয়চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যম করে নিয়েছিলেন। এইসব সংবাদপত্রে ইংরাজ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের কঠোর সমালোচনা প্রকাশ করা হত। এই ঘটনায় শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির উপব বিদ্বিষ্ট হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছিল। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে 1878 খ্রীষ্টাব্দে বিশেষভাবে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র সম্বন্ধে একটি আইন প্রবর্তিত হয় (Vernacular Press Act 1878)। এই আইনে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির উপর কঠোরভাবে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে ভারতে জনমত বেশ গড়ে উঠেছিল। এই আইনের বিরুদ্ধেও জনমত বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিবাদ বিফল হয়নি। 1882 খ্রীষ্টাব্দে এই আইনটি বাতিল করা হয়েছিল। এর পর প্রায় পঁচিশ বছর ধরে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। 1905 খ্রীষ্টাব্দের পর স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী বর্জন আন্দোলনের প্রভাবে পুনরায় সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ-সূচক দুটি আইন যথাক্রমে 1908 ও 1910 খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল।

জাতি বৈরিতা

ভারতবর্ষে এসে ইংরাজেরা সর্বদাই সামাজিক স্তরে ভারতবর্ষের মানুষকে পরিহার করে চলত, তারা মনে করত যে জাতি হিসেবে তারা ভারতীয়দের

চেয়ে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ ও ভারতীয় এই উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি খুব নৃশংস ব্যবহার করেছিল। এই ঘটনার পর থেকে দুই জাতির মধ্যে বৈরিতার মনোভাব খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ইংরাজেরা প্রকাশ্যেই নিজেদের শ্রেষ্ঠতর জাতি হিসেবে জাহির করত এবং ভারতীয়দের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করত। রেলগাড়ীর কামরা, রেলস্টেশনের প্রতীক্ষালয়, বাগান (পার্ক), হোটেল, সাঁতারের স্থান (Swimming Club), প্রভৃতি সাধারণ ব্যবহার্য কতকগুলি স্থানে ইউরোপীয়দের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষণ থেকে এই জাতি বিদ্বেষ বা শ্রেষ্ঠ জাতিত্বের অভিমান প্রকাশ পেত। জওহরলাল নেহেরু এ সম্বন্ধে লিখেছেন—"ব্রিটিশ শাসনের গোড়া থেকেই ভারতবাসী আমরা জাতিবৈরীতার সকল দিক সম্বন্ধেই তিক্ত অভিজ্ঞতা ভোগ করে এসেছি। ইংরাজ শাসনের ভিত্তি যে তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সে তত্ত্ব হল স্বভাবতঃ শ্রেষ্ঠজাতিত্ব বা প্রভুজাতিত্বের অহমিকা। ভারতে ইংরাজের শাসনব্যবস্থায় এই প্রভু-জাতিত্বের নীতি প্রতিফলিত হত। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠজাতিত্বের দাবি ওতপ্রোতই থাকে। ভারতে ইংরাজ তার এই শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব গোপন রাখেনি। শাসন কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিত যে তারা হল প্রভুর জাত। তবে ভাষায় তাদের এই প্রভুত্বের মনোভাব যতটা না প্রকাশ পেত ভারতীয়দের প্রতি তাদের ব্যবহার ও আচরণে তা পরিস্ফুট হয়ে পড়ত। বছরের পর বছর ধরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ভারতবাসী জাতি হিসেবে এবং ব্যক্তিস্তরে শাসকজাতির কাছে অপমান, লাঞ্ছনা ও ঘৃণা পেয়ে এসেছে। আমাদের বলা হত যে ইংরাজ হচ্ছে রাজার জাত। আমাদের উপর প্রভুত্ব করা বা আমাদের শাসন করার অধিকার তাদের প্রতি ঈশ্বর-দত্ত। আমরা কোন প্রতিবাদ করলে আমাদের ভয় দেখিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত যে—রাজার জাতের ব্যাঘ্রসুলভ গুণগুলির কথা আমরা যেন ভুলে না যাই।"

অনুশীলনী

1. 1858 খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতশাসন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর ঃ বিশেষভাবে সাংগঠনিক রূপান্তর, প্রদেশশাসন ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, জনবিভাগীয় প্রশাসনিক চাকুরী ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

2. 1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ভারতীয় সংহতি, শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ, জমিদার, দেশীয় রাজ্যশাসক এবং সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে ব্রিটিশ নীতি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল ?

3. নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ—
(a) 1861 খ্রীষ্টাব্দের পর ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল (b) সমাজসেবামূলক সংস্থার অভাব ও দুরবস্থা (c) 1881 ও 1891 খ্রীষ্টাব্দের কারখানা শ্রমিক আইন (d) বাগিচা শ্রমিক (e) মুদ্রাযন্ত্র বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

দশম অধ্যায়

ভারত ও তাহার প্রতিবেশী দেশসমূহ

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার প্রাতিবেশী দেশগুলির সম্পর্ক নূতন-ভাবে গড়ে উঠেছিল। এর মূলে দুটি কারণ ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ভারতের সংহতিসাধনের কারণে ভারত গভর্নমেণ্ট বা সরকারের পক্ষে ভারতের স্বাভাবিক ও ভৌগোলিক সীমান্তের দিকে দৃষ্টিদান প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। ভারতের প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ সুস্থিতির কারণেই এটা ছিল অপরিহার্য। সীমান্তের দিকে মনোযোগ দেওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে সীমান্ত-সংঘর্ষও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন সময়ে ভারত গভর্নমেণ্ট্ ভারতের স্বাভাবিক এবং স্বীকৃত সীমান্ত লঙ্ঘন করার চেষ্টাও করত। এর দ্বিতীয় কারণটি হল এই যে, ভারত গভর্নমেণ্ট্ মূলতঃ ছিল একটি বিদেশী শাসন সংস্থা। একটি স্বাধীন দেশের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে বিদেশী কর্তৃক পরিচালিত সরকারের মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্বাধীন দেশের বৈদেশিক নীতি দেশের জনগণের প্রয়োজন ও স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিদেশী শাসনাধীন দেশের বৈদেশিক নীতি শাসকজাতির নিজের স্বদেশের স্বার্থেই পরিচালিত হয়ে থাকে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের বৈদেশিক নীতির নিয়ন্তা ছিল লণ্ডনে অবস্থিত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট্। এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্রিটিশের লক্ষ্য ছিল—দুটি। অমূল্য ভারত সাম্রাজ্যের সুরক্ষা এবং অবশিষ্ট এশিয়া ও আফ্রিকায় নিজেদের বাণিজ্য ও শিল্পদ্রব্যের প্রসার। এই দুটি লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য ইংরাজ ভারতের ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশ জয় করে তা' কুক্ষিগত করতে তৎপর হয়েছিল। এই অভিযানে ইংরাজকে ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যলিপ্সু জাতিগুলির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল, কারণ শেষোক্ত জাতিগুলিও আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে আগ্রহী হয়েছিল।

বস্তুতঃ 1870 থেকে 1914 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকার ভূখণ্ড ও

বাণিজ্যক্ষেত্র দখল করার জন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ পরিলক্ষিত হয়েছিল। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতে যে পরিমাণ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হত তার বহুলাংশ এ দেশগুলির জনসাধারণের ভোগের পরও উদ্বৃত্ত থেকে যেত। এই সময় এইসব উন্নত দেশগুলিতে ব্যবসায়ে খাটানোর মত অপর্যাপ্ত অর্থসম্পদও ছিল। নিজেদের কলকারখানার জন্য কৃষি ও খনিজ কাঁচামালও এদের নিজ নিজ দেশ থেকে সংগ্রহের সুবিধা ছিল না, এগুলি আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ থেকেই সংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল। এইসব কারণে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। নিজেদের জাতির বাণিজ্যিক স্বার্থে ইউরোপীয় দেশগুলির সরকার প্রতিযোগিদের এবং এশিয়া-আফ্রিকার সংশ্লিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে বাহুবল প্রয়োগেও প্রস্তুত ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর একটা দেশকে রাজনৈতিক দিক থেকে অধিকারের সুবিধাগুলিও এদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। কোন একটি দেশ অধিকার করলে সেই দেশের বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের ক্ষেত্রটিও মুঠোর মধ্যে এসে যায়। নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থলগ্নী করার সুবিধা পাওয়া যায়। ব্যবসায়ের জন্য কাঁচামালও অনায়াসেই সংগ্রহ করা যায়। সর্বোপরি বিজিত দেশে বসে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিকেও অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখা যায়। এতসব সুযোগসুবিধা লাভের আশায় সাম্রাজ্যলিপ্সু জাতিগুলির মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক সঙ্ঘর্ষ বা যুদ্ধবিগ্রহ তাই অনিবার্য হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ ইউরোপীয় জাতিগুলি যার যেমন সাধ্য তেমনিভাবে ভাগাভাগি করে দখল করে নিয়েছিল। রুশ জাতি মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার অনেকাংশ গ্রাস করেছিল। জার্মানী, ব্রিটেন ও রুশ দেশ—তুরস্ক, পশ্চিম এশিয়া ও ইরাণ—ক্ষীয়মান অটোমন সাম্রাজ্যের এই তিন অংশ গ্রাস করার জন্য তুমুল সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। 1880 খ্রীষ্টাব্দের পর ফ্রান্স ইন্দো-চায়না বা ইন্দো-চীন দখল করার পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স থাইল্যাণ্ড এবং উত্তর ব্রহ্মদেশের অধিকার নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.) 1898 খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপাইন ও হাওয়াই অধিকার করে নিয়েছিল। 1905 খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া জাপানের অধিকারভুক্ত হয়। 1895 খ্রীষ্টাব্দের পর চীন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল দখলের জন্যও বিভিন্ন শক্তিধর জাতিগুলির মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী

এই জবর-দখলের সিংহভাগ ব্রিটিশ জাতির আয়ত্ত হয়ে পড়াতে স্বাভাবিক কারণে তাদের চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত থাকতে হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন সময়ে স্বার্থের সংঘাতে ফ্রান্স, রুশ, জার্মেনীর সঙ্গে ব্রিটেনের বিরোধ বেধেছিল।

নিজেদের ভারতসাম্রাজ্য রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ভারত থেকে আক্রমণেচ্ছু শত্রুদের শত হস্ত দূরে রাখার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভারত সরকারকে বহুবার ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি আক্রমণ করতে হয়েছিল। এক কথায়, ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের সঙ্গে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির যা কিছু ভালো বা মন্দ সম্পর্ক তা' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের উপরই নির্ভরশীল ছিল।

ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতি একান্তভাবে ব্রিটিশ স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হলেও শুধুমাত্র ভারত সরকারের অর্থে এই নীতির রূপায়ণ হত। ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার্থে ভারতকে বহুবার তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ভারতীয় সৈনিকদের এইসব যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে আর ভারতীয় জনসাধারণকে এই যুদ্ধের খরচ জোটাতে হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে বহুবার আফ্রিকা ও এশিয়ার সমরাঙ্গনে ব্রিটিশ জাতির সপক্ষে লড়াই করতে হয়েছে। ভারত সরকারের অর্থভাণ্ডারের একটা বিরাট অংশ দিয়ে এইসব যুদ্ধের ব্যয় মেটানো হয়েছিল। একটা দৃষ্টান্ত হল এই যে 1904 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রাজস্বের শতকরা বাহান্ন ভাগ অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী অংশ সামরিক খাতে ব্যয় করা হয়েছিল।

1814 খ্রীষ্টাব্দের নেপাল যুদ্ধ

ইংরাজের উচ্চাশা এই ছিল যে ভৌগোলিক দিক থেকে সমগ্র ভারতকে তার ছত্র-ছায়াতলে নিয়ে আসবে। ভারতবর্ষের চতুঃসীমায় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে তারা ভারতের ভৌগোলিক সীমান্তের বাইরেও তাদের আগ্রাসন নীতি চালাতে চেয়েছিল। প্রথমেই তাদের দৃষ্টি পড়েছিল ভারতের উত্তর সীমান্তবর্তী দেশ নেপালের উপর। নেপাল উপত্যকাটি 1768 খ্রীষ্টাব্দে গোর্খা জাতি কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। এই গোর্খারা ছিল পশ্চিম হিমালয়ের একটি উপজাতি গোষ্ঠী। ধীরে ধীরে গোর্খারা একটা শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলে পূর্বে ভুটান থেকে পশ্চিমে শতদ্রু নদী (Sutlej) পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় তাদের আধিপত্য স্থাপন করেছিল। অতঃপর নেপালের

তরাই ভূমি থেকে তারা দক্ষিণমুখে বিজয়াভিযান সুরু করেছিল। ইতিমধ্যে 1801 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইংরাজেরা গোরখ্‌পুরের দখল নিয়েছিল। অতঃপর ইংরাজ ও নেপালের গোর্খা শক্তি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই এলাকার মালিকানা খুব সুস্পষ্টরূপে তখনও পর্যন্ত চিহ্নিত হয়নি। 1814 খ্রীষ্টাব্দে নেপাল ও ভারত এই দু'দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে একটা সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। এই সংঘর্ষ পরে যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ সীমান্তের ছয়শত মাইল এলাকা জুড়ে আক্রমণ চালিয়ে অতি সহজেই গোর্খাদের পরাজিত করার আশা মনে পোষণ করেছিল। কিন্তু গোর্খা বাহিনী অপরিসীম বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে তাদের সীমান্ত রক্ষা করেছিল। ব্রিটিশ বাহিনীকে একবার নয় বারে বারে তারা পরাজিত করেছিল। ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী চার্লস মেটকাফের সেই সময়ের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে— "আমাদিগকে আমাদের সৈন্যবাহিনীর চেয়ে সুনিশ্চিতভাবে অধিকতর সাহসী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন একটি শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিণাম কি হবে তা বলা এখন খুবই দুঃসাধ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে আমাদের ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈনিকদের মুষ্টিমেয় গোর্খা সৈন্য শুধু লাঠি ও পাথরের সাহায্যে হটিয়ে দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শত্রুরা তলোয়ার হাতে নিয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে মেষপালের মত মাইলের পর মাইল তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।...এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে আমি সর্বদাই এই ভাবনা নিয়ে থাকি যে ভারতে আমাদের প্রভুত্বের মূল খুব সুদৃঢ় নয়। আমার আশঙ্কা এই যে আমাদের পতনের সবে সুরু হয়েছে। আমরা শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরেই ভারতে টিকে আছি। এখন দেখা যাচ্ছে যে এমন একটি শত্রুর সঙ্গে আমরা সম্মুখীন যাদের কাছে আমাদের সেই সামরিক শক্তি মোটেই অধিক নয়।"

অবশ্য শেষ পর্যন্ত গোর্খা শক্তি ব্রিটিশ শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছিল। সৈন্যসংখ্যা, অর্থ ও রণসম্ভারের দিক থেকে ব্রিটিশ বাহিনী গোর্খাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। 1815 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংরাজেরা কুমায়ুঁ দখল করেছিল। পনেরই মে তাদের নিকট সবিশেষ রণকুশল গোর্খা সেনাপতি অমর সিং থাপাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। এই অবস্থায় শান্তি প্রস্তাব করা ছাড়া নেপাল সরকারের পক্ষে আর কোনও পথ উন্মুক্ত

ছিল না। ইংরাজেরা সন্ধির সর্ত হিসেবে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি বা 'রেসিডেন্ট' মোতায়েন করতে চেয়েছিল। তবে নেপাল সরকার এই সর্তে সম্মতি দেয়নি। নেপাল বুঝেছিল যে বশ্যতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নামান্তর নেপালের স্বাধীনতা ব্রিটিশের কাছে বিকিয়ে দেওয়া। এর ফলে 1816 খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে পুনরায় ইংরাজের সঙ্গে নেপালের লড়াই বেধেছিল। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী বেশ কয়েকটি যুদ্ধে বিজয়লাভ করে কাঠমাণ্ডুর পঞ্চাশ মাইল দূরত্বের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। পরিশেষে নেপাল সরকার ব্রিটিশের সর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। গাড়োয়াল ও কুমায়ুঁ জেলা দুটি তারা ইংরাজকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। তরাই অঞ্চলের উপর নেপালের যে দাবি ছিল সেটিও তারা ছেড়ে দিয়েছিল। নেপালের রাজধানীতে ব্রিটিশ প্রতি-নিধির নিয়োগও তারা মেনে নিয়েছিল। সিকিম থেকেও তারা সরে এসেছিল। এই সন্ধি চুক্তিটি ইংরাজদের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক দাঁড়িয়ে-ছিল। ব্রিটিশের ভারত সাম্রাজ্য এখন হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এতদ্বারা মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তাদের ব্যবসাবাণিজ্যেরও খুব সুবিধা হয়েছিল। পরবর্তীকালের পার্বত্য নিবাসের জায়গাগুলিও এই সময় ইংরাজদের হাতে এসেছিল। এর মধ্যে ছিল সিমলা, মুসৌরি ও নৈনিতাল। এছাড়াও বহু গোর্খা সৈনিক ইঙ্গ-ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে এই বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল।

এর পর থেকে ব্রিটিশ-নেপাল বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থায়ী হয়েছিল। 1814 খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে দুই পক্ষই পরস্পরের শক্তিসামর্থ্য বিষয়ে সচেতন থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথই বেছে নিয়েছিল।

ব্রহ্ম বিজয়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপর্যুপরি তিনটি যুদ্ধের পর ব্রিটিশ কর্তৃক স্বাধীন ব্রহ্মদেশ বিজিত হয়েছিল। সূচনায় সীমান্ত সংঘর্ষের ফলে এই যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়। ব্রিটিশের আগ্রাসন স্পৃহাও এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ। অনেকদিন থেকে ব্রহ্মের বনসম্পদ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ব্রহ্মদেশ তাদের শিল্পদ্রব্য কাটতির বাজার হিসেবেও আকৃষ্ট করেছিল। ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবশিষ্টাংশে ফ্রান্সের রাজ-

নৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব রোধও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

প্রথম ব্রহ্ম-যুদ্ধ (1824-26)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্ম ও ভারতের ব্রিটিশ শক্তি এই উভর পক্ষই রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে আগ্রাসন নীতির আশ্রয় নিয়েছিল। এর ফলে দুই শক্তিই একটি সীমান্তে এসে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গৃহ-বিবাদের পর 1752 থেকে 1760 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজা আলাওঙ্গ পায়া ব্রহ্মদেশের সংহতি সাধন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী বোডাউপায়া ইরাবতী তীরবর্তী আভায় রাজত্ব করতেন। ইনি একাধিকবার শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড) অভিযান করেন। আক্রমণকারী চীনাদের হঠিয়ে দিয়ে ইনি নিজের রাজ্যরক্ষাও করেছিলেন। সীমান্তবর্তী আরাকান ও মণিপুর রাজ্য-দুটিও ইনি যথাক্রমে 1785 ও 1813 খ্রীষ্টাব্দে নিজের অধিকারভুক্ত করেন। এইভাবে এঁর রাজত্বের সীমানা ব্রিটিশ ভারতের সীমান্ত স্পর্শ করেছিল। পশ্চিম অভিমুখে অভিযান চালিয়ে তিনি আসাম ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পৌঁছেছিলেন। অবশেষে 1822 খ্রীষ্টাব্দে আসাম ব্রহ্মদেশের কবলিত হয়েছিল। আরাকান ও আসাম ব্রহ্মদেশ কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর ব্রহ্মের সঙ্গে সীমান্তর প্রশ্ন নিয়ে ইংরাজের সংঘর্ষ সুরু হয়েছিল, এর কারণ ব্রহ্ম ও বঙ্গদেশের (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর) সীমানা ঠিকভাবে কোন দিনই নির্ধারিত হয়নি। কিছু অঞ্চল অচিহ্নিতই ছিল।

ইংরাজ-ব্রহ্ম বিরোধের একটি কারণ ছিল চট্টগ্রামে আশ্রয়প্রাপ্ত কিছু আরাকানী অধিবাসী। চট্টগ্রামকে ঘাঁটি করে এরা ব্রহ্ম কর্তৃক বিজিত আরাকান অঞ্চলে হানা দিত। পরাজিত বা বিতাড়িত হয়ে এরা ইংরাজদের এলাকায় ঢুকে লুকিয়ে থাকত। ব্রহ্ম সরকার এই বিদ্রোহীদের ধরে শাস্তি দেবার জন্য ইংরাজদের উপর চাপ দিত। ইংরাজদের অনুরোধ জানান হত যে এদের যেন বন্দী করে ব্রহ্ম সরকারের হাতে সমর্পণ করা হয়। এই আক্রমণকারী আরাকানীদের তাড়া করার সময় ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যেরা অনেক সময় ব্রিটিশ এলাকাতেই ঢুকে পড়ত। চট্টগ্রাম-আরাকান সীমান্তে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের সংঘর্ষ সাপুরি নামে একটি দ্বীপের অধিকারকে কেন্দ্র করে 1823 খ্রীষ্টাব্দে চরমসীমায় এসে পৌঁছেছিল। এই দ্বীপটি প্রথমে ব্রহ্মের অধীনে থেকে পরে ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয়। ব্রহ্মদেশ চেয়েছিল যে এই দ্বীপটি ব্রিটিশ ও ব্রহ্ম কারোরই অধিকারে থাকবে না। অর্থাৎ ব্রিটিশ

তার দাবি ছেড়ে দিলে ব্রহ্মদেশও ঐ দ্বীপটি আর দাবি করবে না। ব্রিটিশ পক্ষ এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়াতে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

ব্রহ্মদেশের আসাম ও মণিপুর বিজয় ব্রহ্ম-ইংরাজ বিরোধের আর এক কারণ। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই ঘটনাটি ব্রিটিশ ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করেছিল। প্রতিষেধক হিসেবে তারা সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী কাছাড় ও জয়ন্তিয়া রাজ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই ঘটনায় রুষ্ট হয়ে ব্রহ্মদেশের পক্ষ থেকে কাছাড়ে একটি সামরিক অভিযানের আয়োজন করা হয়। এর ফলে দুই পক্ষে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্ম বাহিনীকে পিছু হঠে মণিপুরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

মণিপুরে ব্রহ্ম বাহিনীর প্রবেশের সুযোগ নিয়ে ইংরাজ ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কয়েক যুগ ধরেই ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশকে একটা বাণিজ্যিক চুক্তিতে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে এসেছিল, এই চুক্তির একটা সর্ত ছিল এই যে ব্রহ্মদেশ থেকে ফরাসী বণিক্ বা ব্যবসায়ীদের বিতাড়িত করা হবে। নিজেদের সাম্রাজ্যের পাশেই একটা শক্তিশালী ইউরোপীয় জাতির অস্তিত্ব এবং এই শক্তির যখন তখন আস্ফালন ইংরাজদের ব্রহ্ম-বিদ্বেষের আরও একটা কারণ ছিল। ইংরাজেরা মনে করত যে নিঃসন্দেহে ব্রহ্মদেশের চেয়ে সামরিক সামর্থ্য তাদের বেশী, সুতরাং তাদেব দম্ভ চূর্ণ করা প্রয়োজনীয় এবং সহজসাধ্য। ব্রহ্মদেশ ইংরাজের এই সমরলিপ্সার মনোভাব ধরতে পেরেও ইংরাজের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের কোন প্রয়াস গ্রহণ করেনি। সুদীর্ঘ-কাল ধরে ব্রহ্মের শাসককুল বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় তারা শত্রুর শক্তিমত্তার পরিমাপ করতে অক্ষম হয়েছিল। তাদের আরও একটা বিশ্বাস ছিল যে ইংরাজ ব্রহ্মদেশের সঙ্গে একটা সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া মাত্র ভারতের অন্যান্য শক্তিগুলি ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।

সরকারীভাবে 1824 খ্রীষ্টাব্দের চব্বিশে ফেব্রুয়ারী ইংরাজ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।

প্রথমদিকের যুদ্ধে বিশেষ সাফল্যলাভ করতে না পারলেও শেষদিকে ব্রিটিশ বাহিনী ব্রহ্ম-বাহিনীকে আসাম, কাছাড়, মণিপুর ও আরাকান থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিল। ব্রিটিশের নৌবাহিনী 1824 খ্রীষ্টাব্দের

মে মাসে জলপথে অভিযান চালিয়ে রেঙ্গুন অধিকার করে নিয়ে রাজধানী আভার পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরত্বের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। ব্রহ্মবাহিনীর সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি মহাবণ্ডুলা 1825 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিহত হয়েছিলেন। তথাপি ব্রহ্মবাহিনী দৃঢ়ভাবে ব্রিটিশ বাহিনীর বিজয়াভিযানের গতিরোধ করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। বনাকীর্ণ অঞ্চলে তাদের গেরিলা যুদ্ধকৌশল খুবই কাজে লেগেছিল। বর্ষার আবহাওয়া এবং মারাত্মক রোগের আক্রমণ এই যুদ্ধকে ভয়াবহ করে তুলেছিল। দুই পক্ষেই যুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যার চেয়ে জ্বর ও আমাশয় রোগে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক দাঁড়িয়েছিল। রেঙ্গুনেব হাসপাতালে 3,160 জনের মৃত্যু হয়েছিল আর যুদ্ধক্ষেত্রে মরেছিল মাত্র 166 জন। ব্রহ্মে অভিযানকারী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর 40,000 সৈন্যের মধ্যে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল 15,000 হাজার। এই যুদ্ধ ইংরাজের পক্ষে বেশ ব্যয়সাধ্যও হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ যুদ্ধে জয়লাভ করে এসেছিল, আর ব্রহ্মবাহিনীকে বারবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে দুই পক্ষই একটা সন্ধি করতে ইচ্ছুক হয়েছিল। উভয়পক্ষের ইচ্ছাক্রমে 1826 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী উভয়পক্ষ ইয়ানডাবু নামক স্থানে একটি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল।

ব্রহ্ম সরকার ইংরাজের অনুকূলে নিম্নলিখিত সর্ত মেনে নিয়েছিল : (1) এক কোটি টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দান, (2) উপকূলবর্তী আরাকান ও টেনাসেরিম-এর অধিকার, (3) আসাম, কাছাড় ও জয়ন্তিয়া রাজ্যের অধিকার ত্যাগ (4) স্বাধীন রাজ্য হিসেবে মণিপুরের স্বীকৃতি, (5) ব্রিটিশের সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি. (6) আভায় একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি (Resident) গ্রহণ ও কলিকাতায় একজন ব্রহ্মদেশীয় দূত (Envoy) নিয়োগ। এই চুক্তির ফলে ইংরাজ উপকূল অঞ্চলের প্রায় সমস্তটুকু ব্রহ্মদেশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ভবিষ্যতে ব্রহ্মদেশ অধিকার করার পক্ষে এটা খুবই সুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ (1852)

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের কারণ ছিল দুই পক্ষের সীমান্তসংক্রান্ত বিবাদ। কিন্তু 1852 খ্রীষ্টাব্দের ইংরাজ-ব্রহ্ম যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিল ব্রিটিশ জাতির ব্যবসায়গত লালসা। উত্তর-ব্রহ্মের কাষ্ঠসম্পদ ব্রিটিশ কাষ্ঠব্যবসায়ীদের প্রলুব্ধ করে তুলেছিল। ব্রহ্মের জনসংখ্যাও ছিল বিপুল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ী-

গণ এই জনসমাজের মধ্যে তাদের দেশজাত সুতিবস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের একটা লাভজনক বাজার গড়ে তুলতে ইচ্ছুক ছিল। ব্রহ্মের উপকূলবর্তী দুটি প্রদেশের আধিপত্য লাভ করে ইংরাজেরা ব্রহ্মের বাকী অংশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হয়েছিল। কিন্তু ব্রহ্ম-সরকার দেশের অভ্যন্তরে ইংরাজদের বাণিজ্যবিস্তারে বাধার সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণ এই অভিযোগ উত্থাপন করেছিল যে ব্রহ্ম সরকার তাদের ব্যবসা করতে দিতে অনিচ্ছুক। তাদের আরও একটা অভিযোগ ছিল যে ব্রহ্ম-সরকারের কর্তৃপক্ষ রেঙ্গুনে অবস্থিত ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নির্যাতনমূলক আচরণ করে থাকে। আসল কথা ছিল এই যে, এই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার গৌরবের চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল এবং এই গর্বে ইংরাজেরা নিজেদের বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও বণিকরা এই সময়ে মনে করত যে তাদের পণ্য-সম্ভার অন্যদেশের মানুষ ব্যবহার করতে বাধ্য, এটা যেন কতকটা ঈশ্বর-দত্ত অধিকার। এই সময়ে আগ্রাসন নীতির ধ্বজাধারী লর্ড ডালহৌসী বড়লাট (গভর্নর-জেনারেল) রূপে ভারতে বর্তমান ছিলেন। ব্রিটিশের রাজকীয় মহিমা বৃদ্ধিই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশের স্বার্থসিদ্ধি অতঃপর তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। একটা সভার কার্যবিবরণীতে তাঁর মন্তব্য এইরূপ লেখা ছিল "ভারত গভর্নমেণ্ট মাত্র একটা দিনের জন্যও এদেশীয় কোন শক্তির কাছে কোনরূপ নতি-স্বীকারের ভাব দেখাবে এই প্রস্তাব কোন প্রকারেই অনুমোদন করা যায় না। এতে তার অস্তিত্বকেই বিপদগ্রস্থ করা তোলা হবে। বিশেষভাবে আভা সরকার (ব্রহ্ম)-এর কাছে আমাদের কোন প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন চিন্তারও অতীত।"

অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মদেশের উপর সশস্ত্র আক্রমণের একটা অজুহাত লর্ড ডালহৌসি পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে দুজন ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপটেন অনুযোগ করেছিল যে রেঙ্গুনের গভর্নর তাদের কাছ থেকে জোর করে এক হাজার টাকা আদায় করে নিয়েছে। এই তুচ্ছ ও ছেলেমানুষি অভিযোগ পেয়ে ডালহৌসি একজন দূতসহ কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। দূত মারফৎ এই দুজন ব্রিটিশ নাগরিকের ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। ব্রহ্মে প্রেরিত ব্রিটিশ দূত কমোডোর ল্যামবার্ট অকারণে আক্রমণাত্মক আচরণ করেন। রেঙ্গুনে পৌছে কথাবার্তা সুরুর আগেই তিনি রেঙ্গুনের গভর্নরের

অপসারণ দাবি করেন। আভায় অবস্থিত ব্রহ্মের শাসনকর্তৃপক্ষ ব্রিটিশের শক্তির আস্ফালনে ভীত হয়ে রেঙ্গুনের গভর্নরকে অপসারণ করতে ও দুই ব্রিটিশ নাগরিকের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিল। কিন্তু উদ্ধত ব্রিটিশ দূতের মনোগত বাসনা ছিল, কোন মীমাংসা নয় একটা বিরোধের অজুহাত সৃষ্টি। রেঙ্গুন বন্দর অবরোধ করে বন্দরে অবস্থিত এক-শত পঞ্চাশটি ছোট জাহাজের উপর আক্রমণ চালিয়ে সেগুলির ধ্বংসসাধন করা হয়েছিল। অতঃপর ব্রহ্ম-সরকার রেঙ্গুনে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি (রেসিডেণ্ট) নিয়োগ ও ইংরাজদের ক্ষতিপূরণ করতে সম্মতি দিয়েছিল। ভারত-সরকার এবার আরও প্যাঁচকষার নীতি নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি ধরনের বিবিধ দাবি তুলতে লেগেছিল। রেঙ্গুনের নবনিযুক্ত গভর্নরকে পদচ্যুত করতে হবে এবং ব্রিটিশ দূতের প্রতি তথাকথিত অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য সরকারীভাবে ক্ষমা চাইতে হবে—দাবিগুলির প্রকৃতি ছিল এই রকম। এই ধরনের উদ্ভট দাবি মেনে নেওয়া যে কোন স্বাধীন দেশের পক্ষে অসম্ভব ও অসম্মানজনক। বস্তুতঃ ইংরাজের মনোগত বাসনা এই ছিল যে যুদ্ধ করেই হক বা সন্ধি করেই হক ব্রহ্মদেশকে তাদের হাতে পেতেই হবে। ব্রহ্মদেশ তথা ব্রহ্মদেশের সরকারের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ হলে অতি-শীঘ্রই ব্যবসায় জগতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী বা আমেরিকান বণিকেরা ব্রহ্মদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নেবে।

1852 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটি সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীকে ব্রহ্ম অভিযানের জন্য প্রেরণ করা হয়। 1825-26 খ্রীষ্টাব্দের চেয়ে এই ব্রহ্ম অভিযান অল্প সময় স্থায়ী হয়েছিল। ব্রিটিশের বিজয়লাভের পুরস্কারগুলিও বেশ মূল্য-বান দাঁড়িয়েছিল। সর্বপ্রথমে রেঙ্গুন এবং পরে বেসিন, পেগু ও প্রোম ইংরাজের করতলগত হয়েছিল। এই সময়ে ব্রহ্মদেশের মধ্যেই একটা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। ব্রহ্মরাজ মিনডন তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজা পাগান মিনকে 1853 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অপসারিত করে ব্রহ্মসিংহাসন অধিকার করেন। ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করা এই নূতন রাজার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। আবার তাঁর পক্ষে প্রকাশ্যভাবে আত্মসমর্পণ করাও ছিল কঠিন। এর ফলে ব্রহ্মের তরফে সরকারীভাবে শান্তিপ্রস্তাব উত্থাপন করা হয়নি। কোন চুক্তি হওয়ার আগেই যুদ্ধ শেষ হয় এবং ইংরাজ পেগু প্রদেশ অধিকার করে। পেগু ইংরাজ অধিকারভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মরাজ্যের

শেষ সমুদ্রোপকূলভুক্ত অঞ্চলটুকুও ইংরাজের দখলে চলে যায়। তবে তিন বৎসর ধরে ব্রহ্মের সাধারণ মানুষ গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে ইংরাজশক্তিকে বিব্রত করতে সক্ষম হয়েছিল। বস্তুতঃ নিম্ন ব্রহ্ম অঞ্চল নিরুপদ্রব রাখার কাজে ইংরাজকে তিন বৎসর যাবৎ ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এই সময়ের পর ব্রহ্মের সমগ্র উপকূল অঞ্চলে এবং নৌবাণিজ্যে ইংরাজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে ইংরাজের সংগ্রামের ক্ষয়ক্ষতি মূলতঃ ভারতীয় সৈনিকদেরই বহন করতে হয়েছিল। আর এই যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতীয় রাজস্বের থেকেই মেটানো হয়েছিল।

তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ (1885)

পেগু জয়ের পর ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ইংরাজের সম্পর্ক কয়েক বৎসর যাবৎ শান্তিপূর্ণই ছিল। অবশ্য ইংরাজেরা উত্তর ব্রহ্ম অভিযানের চেষ্টার ত্রুটি করেনি। বিশেষভাবে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মনে এই চিন্তা জেগেছিল যে কিভাবে উত্তর ব্রহ্মের মধ্য দিয়ে চীনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। খোদ ব্রিটেনে এবং রেঙ্গুনে ব্রহ্মদেশ থেকে চীনের পশ্চিম অংশ পর্যন্ত একটি স্থলপথ নির্মাণের দাবিও বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। পরিশেষে 1862 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা ব্রহ্ম-সরকারকে দিয়ে একটা বাণিজ্যিক চুক্তি স্বীকার করিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল। এই চুক্তির সর্ত ছিল এই যে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের ব্রহ্মের যে কোন অংশে বসবাস ও ব্যবসায়ের অধিকার থাকবে উপরন্তু ব্রিটিশ বাণিজ্যজাহাজগুলির ইরাবতীর উজানপথে চীনদেশে যাওয়ার কোন বাধা থাকবে না। এত সুবিধা পেয়েও ব্রিটিশ বণিক্‌দের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়নি। চিরাচরিত প্রথানুসারে ব্রহ্মদেশে একমাত্র ব্রহ্মরাজই কতকগুলি বিশেষ বস্তু যথা তুলা, গম এবং গজদন্ত প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবসায়ের অধিকারী ছিলেন, এই দ্রব্যগুলির আমদানি রপ্তানিতে আর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারত না। কতকগুলি দ্রব্যের ব্যবসায় একান্তভাবে ব্রহ্মরাজেরই এক্তিয়ারে থাকবে ব্রিটিশ বণিকেরা এমন ব্যবস্থা মেনে নিতে খুবই অনিচ্ছুক ছিল। লাভজনক বস্তুগুলির ব্যবসায়ে মোটা উপার্জনের জন্য অধীর হয়ে ইংরাজেরা চেয়েছিল যে ব্রহ্ম-সরকারকে চাপ দিয়ে তাদের সংরক্ষিত বস্তু-গুলিরও কেনাবেচার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হোক। ব্রিটিশ বণিকদের মধ্যে অনেকেই আবার উত্তর ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত করার পক্ষে দাঁড়িয়ে-

ছিল। যাই হোক্, 1882 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রহ্ম সরকার বাধ্য হয়ে নিজেদের একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

এই ধরনের বহু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়েই ব্রহ্মরাজ ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সংঘাত ঘটেছিল। 1871 খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজকে অপমান করার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে অতঃপর তাঁর সঙ্গে ব্রিটিশ পক্ষ থেকে যা কিছু আলাপ-আলোচনা হবে তা চালানোর দায়িত্ব থাকবে 'ভাইসরয়'-এর উপর। ভারতের গভর্নর-জেনারেল ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর প্রতিনিধি (ভাইসরয়) রূপে ভারতের দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এটাই হয়েছিল তখনকার রীতি। ব্রহ্মরাজকে এই ঘটনায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ইংরাজ তাঁকে অতঃপর স্বাধীন সার্বভৌম নৃপতির মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক নয়। ইংরাজের দৃষ্টিতে ভারতের দেশীয় রাজ্যের নৃপতি-গণের মত তিনিও একজন আশ্রিত রাজা মাত্র। ব্রহ্মরাজ অপর ইউরোপীয় শক্তিগুলি সঙ্গে একটা মিত্রতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। ব্রহ্মরাজের প্রতি ইংরাজের বিদ্বেষের এটাও ছিল অন্যতম কারণ। 1873 খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ থেকে একটি কূটনৈতিক মিশন ফ্রান্সে প্রেরিত হয়েছিল। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন এবং সেখান থেকে কিছু আধুনিক ধরনের সমরাস্ত্র আমদানি। ফ্রান্সের সঙ্গে এ বিষয়ে ব্রহ্ম-সরকারের একটা প্রাথমিক চুক্তি হয়েছিল কিন্তু ইংরাজের চাপে ফরাসী সরকার শেষ পর্যন্ত এই চুক্তির জন্য প্রদত্ত সম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

1878 খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ মিনডন পরলোক গমন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীর নাম রাজা থিবো। আরও অনেক রাজকুমার ব্রহ্ম-সিংহাসনের দাবিদার ছিল। ইংরাজেরা প্রকাশ্যভাবে থিবোর শত্রুদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। রাজা থিবোর তথাকথিত নিষ্ঠুরতা সংযত করার অজুহাত নিয়ে ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলিয়েছিল। ইংরাজেরা তাদের এই অনধিকার চর্চার পক্ষে একটা যুক্তি দেখিয়েছিল যে উত্তর-ব্রহ্মের প্রজাদের তাদের নিষ্ঠুর রাজার অত্যাচার থেকে রক্ষার নৈতিক অধিকার তাদের আছে।

আসলে ইংরাজের থিবো বিরোধিতার কারণ ছিল এই যে থিবো তাঁর পিতার মতই ফ্রান্সের সঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন। 1885 খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে তিনি নিছক একটি বাণিজ্যিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ব্রহ্মদেশে ফরাসী জাতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইংরাজদের মনে

বেশ ঈর্ষার উদ্রেক করেছিল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের মনে এখন এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে ব্রহ্মের সমৃদ্ধ বাজার তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী ও মার্কিন ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যাবে। অন্যদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা জন্মেছিল যে ফরাসীদের সঙ্গে মিত্রতার ফলে উত্তর-ব্রহ্মের অধিপতি ব্রিটিশের যে অধীনতা মেনে নিয়েছে তা অব্যাহত থাকবে না। এই সম্ভাব্য মিত্রতার পরিণামে ফরাসীশক্তি ব্রহ্মদেশে একটা উপনিবেশও গড়ে তুলতে পারবে এবং এই উপনিবেশ ভারত সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। এই আশঙ্কা খুব অলীকও ছিল না কারণ এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া খণ্ডে ফরাসীরাই হয়ে উঠেছিল ইংরাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। 1883 খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা আনাম (মধ্য ভিয়েতনাম) অধিকার করে এই স্থানকে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করছিল। উত্তর ভিয়েতনাম জয়ের জন্য তারা সক্রিয় হয়ে 1885 ও 1889 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই অঞ্চল জয় করেছিল। পশ্চিমদিকে থাইল্যাণ্ড ও ব্রহ্মের দিকেও তারা হাত বাড়িয়েছিল। সম্পূর্ণ ব্রহ্মদেশ দখল ভারতের ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রেতই ছিল, তার উপর স্বদেশের ও রেঙ্গুনের ইংরাজ ব্যবসায়ীদের প্ররোচনাও সক্রিয় ছিল। এখন শুধু একটা অজুহাতের অপেক্ষা ছিল। এই অজুহাতটি বোম্বাই ব্রহ্ম কাষ্ঠব্যবসায়ী সমিতি নামে একটি ইংরাজ ব্যবসায়ী সংস্থার কল্যাণে জুটে গিয়েছিল। এই কোম্পানী ব্রহ্মদেশের সেগুন বনগুলির ইজারা (লীজ্) নিয়েছিল। ব্রহ্মদেশের সরকার এই কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল যে যে পরিমাণ সেগুন বৃক্ষ বা কাঠ আহরণের সর্ত আছে স্থানীয় কর্মচারীদের ঘুষ খাইয়ে কোম্পানী তার চেয়ে অনেক বেশী কাঠ বা গাছ সংগ্রহ করে নিয়েছে। এর জন্য ব্রহ্ম-সরকারের ক্ষতিপূরণ করতে হবে। ব্রিটিশ সরকার ইতিমধ্যেই উত্তর ব্রহ্মে সমরাভিযানের একটা পরিকল্পনা ছকে নিয়েছিল। ব্রহ্ম-সরকারের ক্ষতিপূরণের দাবিকে ব্রিটিশ সরকার কাজে লাগাবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। এখন ব্রিটিশ সরকার নানা ধরনের উল্টো দাবি ব্রহ্ম-সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল। এই দাবির অন্যতম একটি এই ছিল যে, ব্রহ্ম-সরকারের বৈদেশিক নীতি ভারতের রাজপ্রতিনিধি (ভাইসরয়) কর্তৃক পরিচালিত হবে। নিজের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিসর্জন না দিয়ে এই দাবিটি মেনে নেওয়া ব্রহ্মসরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্রহ্মসরকার এই দাবি মানতে অস্বীকার করায় 1885 খ্রীষ্টাব্দের তেরই নভেম্বর ইংরাজেরা

ব্রহ্মদেশে অভিযান সুরু করেছিল। এই অভিযানকে আক্রমণাত্মক আগ্রাসন নামেই অভিহিত করা উচিত। একটা স্বাধীন দেশ হিসেবে বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করার পরিপূর্ণ অধিকার ব্রহ্ম সরকারের ছিল। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি প্রতি নিয়তই বিদেশী বণিকদের নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত রেখে থাকে, এক্ষেত্রে ব্রহ্মসরকার কিছু অন্যায় করেনি। ঠিক তেমনি ফরাসী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকারও স্বাধীন ব্রহ্ম সরকারের ছিল। একটি স্বাধীন দেশ যে কোন দেশ থেকে সমরাস্ত্র আমদানি করতে পারে। এই বিষয়েও ব্রহ্ম সরকারের কোন দোষ ছিল না।

ব্রহ্ম-সরকার ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর আক্রমণ রোধ করতে সমর্থ হয়নি। ব্রহ্মরাজ এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাছাড়া তিনি ছিলেন অকর্মণ্য, দেশের মানুষের কাছেও তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না। রাজদরবারে বিরোধ লেগেই থাকত, এই কারণে দেশবাসীর নিজেদের মধ্যেও ঐক্য ছিল না। ইংরাজের ব্রহ্ম আক্রমণকালে দেশে একটা গৃহযুদ্ধের অবস্থা বর্তমান ছিল। এই পরিস্থিতিতে ব্রহ্মরাজ থিবো 1885 খ্রীষ্টাব্দের আঠাশে নভেম্বর আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর অনতিকালের মধ্যেই তাঁর রাজ্য ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ব্রহ্মদেশ অতি সহজেই বিজিত হয়েছিল। কিন্তু এই বিজয় প্রকৃত বিজয়ের আকার নিতে পারেনি। ব্রহ্মরাজ আত্মসমর্পণ করলেও ব্রহ্মের স্বদেশপ্রেমিক সৈন্য ও সেনানায়কগণ সহসা আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হয়নি। এরা সবাই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে লুক্কায়িত অবস্থায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে গেরিলা ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। ইত্যবসরে পূর্ব অধিকৃত নিম্নব্রহ্মের অধিবাসীগণও ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ব্রহ্মের জনসাধারণের এই বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পাচ বছর সময় লেগেছিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য 40,000 সৈন্য নিয়োগেরও প্রয়োজন হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে ব্রহ্ম-যুদ্ধ অভিযান ও বিদ্রোহ দমনের ব্যয় ভারতের রাজকোষ থেকেই নির্বাহিত হয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের পর আধুনিক ধরনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্রহ্মদেশে বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। জন-সাধারণের দাবী ছিল দেশের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন। ব্রহ্মের জাতীয়-

তাবাদী নেতৃবৃন্দ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে-ছিলেন। 1935 খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করে দেওয়ার গূঢ় অভিসন্ধি নিয়ে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এযাবৎ ব্রহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে বিচ্যুত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে উ আউঙ্গশানের নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। পরিশেষে 1948 খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের চার তারিখে ব্রহ্মদেশ পুনরায় স্বাধীন হয়।

আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক

আফগানিস্তানের সঙ্গে একটা স্থিতাবস্থার পরিস্থিতি সৃষ্টির পূর্বে ভারতের ব্রিটিশ রাজ আফগানিস্তানের সঙ্গে দুবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইন্দো-আফগান সম্পর্কের বিষয়টি ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। ইংরাজ যেভাবে পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিল ঠিক সেইভাবে তারা মধ্য এশিয়া পর্যন্ত নিজের অধিকার বিস্তৃত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। এর ফলে দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে এশিয়া ভূখণ্ডে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতঃ 1855 খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও তুরস্কের সহযোগিতায় ইংরাজেরা রুশদের সঙ্গে এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, এটি ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে আখ্যাত। এই সময়ে ইংরাজেরা তাদের ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে সর্বদাই এই আশঙ্কা জেগে থাকত যে যেকোন সময় রুশ আফগানিস্তান অথবা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পথে অগ্রসর হয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে। এইজন্য তারা রুশকে ভারত থেকে বেশ কিছু নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখতে ব্যগ্র ছিল। এই অবস্থাটা আরও জটিল আকার লাভের আর একটা কারণ ছিল মধ্য এশিয়ার ব্যবসায় বাণিজ্য দখলের জন্য ইঙ্গ-রুশ প্রতিযোগিতা। ইংরাজের কাছে একটা সমস্যা খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সমস্যাটা ছিল এই যে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় আধিপত্য স্থাপনের ফলে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে তাদের ব্যবসায় বাণিজ্য চালানো সম্ভব হবে না।

আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থিতি ব্রিটিশের দৃষ্টিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ

মনে হয়েছিল। রুশের সম্ভাব্য ভারত আক্রমণ রোধ করতে হলে অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে আফগানিস্তান বিশেষ সুবিধাজনক আবার মধ্য এশিয়ার ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসারের ব্যাপারেও আফগানিস্তান বেশ একটি ভাল কেন্দ্র। আফগানিস্তানের আর সব উপযোগিতার কথা ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও এটা স্বতঃসিদ্ধ যে আফগানিস্তান দেশটি দুই বিবদমান শক্তির মধ্যে একটা প্রাচীর অথবা সেতুর কাজ করতে সক্ষম।

1835 খ্রীষ্টাব্দে প্রগতিবাদী 'হুইগ্' দল ব্রিটেনের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। লর্ড পামারস্টোন এই সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সচিব পদ লাভ করেন। ব্রিটিশ সরকারের আফগানিস্তান সংক্রান্ত নীতি এই সময় থেকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময় আফগানিস্তানের অধিপতি ছিলেন দোস্ত মহম্মদ। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক স্থিতি বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। দোস্ত মহম্মদের নেতৃত্বে এই অবস্থা দূর হয়ে কিছু সুস্থিতি এসেছিল বটে তবে এই সুস্থিতি স্থায়ী হতে পারেনি। গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রু দুপক্ষই রাজ্যের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করে তুলত। দেশের উত্তর ভাগে তাঁকে অন্তর্বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, সেই সঙ্গে মিশেছিল রুশ আক্রমণের সম্ভাবনা। দেশের দক্ষিণ অংশে কান্দাহারে দোস্ত মহম্মদের এক ভাই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছিল। দেশের পূর্ব দিকে মহারাজা রণজিৎ সিং পেশোয়ার পর্যন্ত দখল করেছিলেন এবং তার পরেই ছিল ইংরাজদের অবস্থিতি। পশ্চিমে হীরাট অঞ্চলে দোস্ত মহম্মদের শত্রুরা সক্রিয় ছিল, পারস্য (ইরাণ) থেকেও বিপদের আশঙ্কা ছিল। কাজেই দোস্ত মহম্মদের পক্ষে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। ইংরাজদের শক্তি সম্বন্ধে দোস্ত মহম্মদের খুব উচ্চ-ধারণা ছিল, সুতরাং এদের সঙ্গে কোন রকম একটা মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি বেশ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলেন।

ইতিপূর্বে রুশেরা দোস্ত মহম্মদকে দলে টানার চেষ্টা করেছিল। দোস্ত মহম্মদ তাদের আহ্বানে সাড়া দেননি। রুশ দূতকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে তিনি ব্রিটিশ দূতের সঙ্গে বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। ব্রিটিশ দূতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে অবশ্য তিনি হতাশ হয়েছিলেন, ব্রিটিশের তরফ থেকে তাঁর চারিদিকে ঘনায়মান বিপদের জন্য মৌখিক সহানুভূতি দেখানো হলেও তাঁকে কোন প্রকারের সাহায্যের প্রস্তাব এমন

কি আশ্বাসও দেওয়া হয়নি। আফগানিস্তানে রুশের প্রভাব হ্রাসই ব্রিটিশের অভীষ্ট ছিল, তবে আফগানিস্তান একটা শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ক এটা তাদের পক্ষে মোটেই কাম্য ছিল না। তারা চেয়েছিল আফগানিস্তান অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জর একটা দুর্বল রাষ্ট্র রূপেই যেন থেকে যায়, এই অবস্থা বর্তমান থাকলে এই দেশের উপর তারা হুকুমদারি চালাতে পারবে। এ বিষয়ে গভর্নমেণ্ট অফ্‌ ইণ্ডিয়া বা ভারত সরকার বার্নস নামে এক কর্মচারীকে এই-রূপ একটি নির্দেশ পাঠিয়েছিল "আমাদের সাম্রাজ্যের সীমান্তে একটা সুসংহত ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে মোটেই প্রয়োজনীয় নয় বরং এটা আমাদের পক্ষে নিরাপদও নয়। আফগানিস্তানের শক্তি এখন কাবুল, কান্দাহার ও হীরাটের মধ্যে ত্রিধাবিভক্ত। আমাদের স্বার্থের দিক থেকে আফগানিস্তানের এই দুর্বলতা স্পৃহনীয় বলেই মনে হয়।"

ব্রিটিশের এই মনোভাবের কারণ শুধু ভারতের বিরুদ্ধে রুশ আক্রমণ প্রতিরোধই ছিল না। আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় ঢুকে পড়ে সেখানে আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনাও তার ছিল। ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে একটা অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। দোস্ত মহম্মদ ব্রিটিশের কাছ থেকে নির্ভেজাল সহানুভূতি ও সমর্থন চেয়েছিলেন তবে সেটা সমপর্যায়ের মিত্র রূপে। সাহায্যের বিনিময়ে নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে ব্রিটিশের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ব্রিটিশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে গিয়ে যখন তিনি দেখলেন যে এদের কাছ থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না তখন তিনি বিশেষ অনিচ্ছার সঙ্গেই রুশদের সঙ্গেই একটা মৈত্রীর সন্ধান করেছিলেন।

প্রথম আফগান যুদ্ধ

ভারতের গভর্নর-জেনারেল যখন দেখলেন যে দোস্ত মহম্মদ শক্ত ধাতের মানুষ, এঁকে তাঁদের আজ্ঞাবহ 'বন্ধু', প্রকারান্তরে দাসে পরিণত করা যাবে না তখন তিনি দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করে একজন মনোমত ব্যক্তিকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। লর্ড অক্‌-ল্যাণ্ড এই 'পুতুল' রাজা রূপে শাহ্‌ সুজাকে মনোনীত করেন। 1809 খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানের রাজপদ থেকে অপসারিত হয়ে ইনি লুধিয়ানায় ইংরাজের বৃত্তিভোগী রূপে বসবাস করছিলেন। অতঃপর ভারত গভর্নমেণ্ট,

মহারাজা রণজিৎ সিংহ এবং শাহ্ সুজা এই তিন পক্ষের মধ্যে 1838 খ্রীষ্টাব্দের ছাব্বিশে জুন লাহোরে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার ও পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ শাহ্ সুজাকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দেন। এর প্রতিদানে শাহ্ সুজাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে আফগানিস্তানের নৃপতি হিসেবে তিনি ব্রিটিশ সরকার ও পাঞ্জাব সরকারের বিনা সম্মতিতে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন-রকম চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন না। এইভাবে অকারণে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে শুধু হস্তক্ষেপই করেনি রীতিমত আক্রমণও চালিয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকার, পাঞ্জাব সরকার এবং স্বয়ং শাহ্ সুজা এই তিন পক্ষের মিলিত বাহিনী 1839 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান সুরু করেছিল। চতুর রণজিৎ সিংহের বাহিনী যুদ্ধে যোগ দিয়েও পেশোয়ার থেকে আর অগ্রসর হয়নি। কাজেই ইংরাজদেরই এই অভিযান পরিচালন করতে হয়েছিল। তবে যুদ্ধ খুব তীব্র হয়নি। আফগান উপ-জাতিদের ঘুষ খাইয়ে আগে থেকেই ইংরাজেরা তাদের বিজয় সুনিশ্চিত করে রেখেছিল। 1839 খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের সাত তারিখে কাবুল ইংরাজের হস্তগত হয়। অতঃপর শাহ্ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়।

শাহ্ সুজাকে দেশের জনসাধারণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেনি। বিশেষ-ভাবে, বিদেশীর সাহায্যে রাজত্ব লাভ করার জন্য তিনি লোকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়ম কে (Kaye) লিখেছেন যে শাহ্ সুজার কাবুল প্রত্যাবর্তনের সময় যে দৃশ্য দেখা গিয়েছিল সেটা একজন নির্বাসিত নৃপতির স্বরাজ্যে পুনরাগমনের মত উৎসাহ ও উদ্দীপনা মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারেনি। শোভাযাত্রাটি শবযাত্রার মতই ছিল উত্তাপহীন, জনসাধারণের মধ্যে স্ফূর্তির খুবই অভাব ছিল। তার উপর, দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশের হস্তক্ষেপেও জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ধীরে ধীরে স্বদেশভক্ত স্বাধীনতাপ্রেমিক আফগানগণ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে, দোস্তমহম্মদ ও তার সহকর্মীদের নেতৃত্বে ইংরাজ দখলদার বাহিনীকে ইতস্ততঃ আক্রমণ সুরু করে দিয়েছিল। 1840 খ্রীষ্টাব্দে দোস্তমহম্মদকে গ্রেপ্তার করে বন্দীরূপে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এতেও আফগানদের বিদ্রোহ শান্ত হয়নি। আফগান উপজাতিদের যোগদানে

বিদ্রোহের আগুন ক্রমাগত বিস্তৃত হয়েছিল। অবশেষে, আকস্মিকভাবে দুঃসাহসী আফগান বিদ্রোহীগণ কাবুলে অবস্থিত ব্রিটিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

1841 খ্রীষ্টাব্দের এগারোই ডিসেম্বর ইংরাজেরা আফগান সর্দারদের সঙ্গে একটা সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল। এই চুক্তির সর্ত ছিল যে ব্রিটিশ বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে এবং দোস্তমহম্মদকে কাবুলের সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তবে ঘটনার নিষ্পত্তি এখানেই হয়নি। ব্রিটিশ বাহিনীকে কাবুল ছেড়ে ভারতে ফিরে যাওয়ার পথের মাঝে সর্বত্র আফগান বিদ্রোহীদের আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ বাহিনীর 16,000 সৈনিকের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত অবস্থায় সীমান্তে পৌছাতে পেরেছিল। বাকী সৈন্যেরা হয় প্রাণ হারিয়েছিল নয়ত আফগানদের হাতে বন্দী হয়েছিল। এইভাবে ব্রিটিশের আফগান-অভিযান ব্যর্থ হয়। ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির এমন নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটনা বেশ বিরল।

এই শিক্ষালাভের পর ভারতের ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানে আর একটি যুদ্ধাভিযানের আয়োজন করে 1842 খ্রীষ্টাব্দের ষোলই সেপ্টেম্বর কাবুল দখল করেছিল। অপমান ও পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে ইংরাজ এবার দোস্তমহম্মদের সঙ্গে একটা সন্ধি-চুক্তিতে বদ্ধ হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেছিল। এই চুক্তিতে তারা কাবুল ছেড়ে চলে যেতে এবং দোস্তমহম্মদকে আফগানিস্তানের স্বাধীন নরপতি রূপে স্বীকার করে নিতে রাজী হয়েছিল।

ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত মত এই যে প্রথম আফগান যুদ্ধের কোন যুক্তিসঙ্গত- কারণই ছিল না। এই যুদ্ধ ছিল আগ্রাসনমূলক, অনৈতিক ও নির্বুদ্ধিতা-প্রসূত। এই যুদ্ধে 20,000 সৈনিক নিহত হয়েছিল আর ভারত-সরকারের ব্যয় হয়েছিল দেড়কোটি টাকারও কিছু বেশী। এর উপর ভারত-সরকারের প্রতি আফগানিস্তানের অবিশ্বাস ও শত্রুতার মনোভাবও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মনোভাব দূর হতে বহু সময় অতিবাহিত হয়েছিল।

অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হীনতার নীতি

1855 খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-আফগান মৈত্রীর এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়। এই সময় ভারত-গভর্নমেন্ট ও দোস্তমহম্মদ এই উভয় পক্ষের মধ্যে

মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দুই পক্ষই শান্তিপূর্ণ বন্ধুত্বের নীতি মেনে নিয়ে পরস্পরের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ও অনাক্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দোস্তমহম্মদ আরও একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যারা মিত্র, তাদের সঙ্গেও তাঁর মিত্রতার সম্পর্ক থাকবে এবং যারা কোম্পানীর সঙ্গে শত্রুতা দেখাবে, তিনি তাদের সঙ্গে শত্রুর মতই ব্যবহার করবেন। দোস্তমহম্মদ তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। ইংরাজদের বিশ্বস্ত মিত্র হিসাবে তিনি 1857 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিদ্রোহীদের কোনরূপ সাহায্য করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন।

1864 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে লর্ড লরেন্স এবং তাঁর দুই উত্তরাধিকারীর আমলে পররাজ্যে বিশেষতঃ আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর রুশেরা পুনরায় মধ্য এশিয়ায় নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিল। ইংরাজেরা এই সময়ে আফগানিস্তানকে রুশদের প্রতিহত করার উপযোগী রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। রাজ্যের মধ্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুদের দমন করতে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ রুখতে ইংরাজেরা আফগানিস্তানের আমীরকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। সাহায্য দিয়ে এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইংরাজ আমীরকে এতটা বশীভূত করে ফেলেছিল যে তিনি রুশদের সঙ্গে কোনরূপ মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপনের কথা চিন্তায়ও আনতে পারেননি।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ

আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্য ইংরাজের এই নীতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 1870 খ্রীষ্টাব্দ থেকে পৃথিবীর সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পরদেশ গ্রাস স্পৃহা আবার নূতনভাবে জেগে উঠেছিল। এই সময় ইঙ্গ-রুশ প্রতিযোগিতাও তীব্র হয়ে উঠেছিল। মধ্য এশিয়ার ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সন্ধান এই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আশু প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম এশিয়ার বল্কান রাজ্যগুলিতেও এশিয়ার ইঙ্গ-রুশ সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

এই সময় ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনে এই বিশ্বাস জেগে উঠেছিল যে মধ্য এশিয়ার নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার ঘাঁটি বা

পশ্চাৎভূমিরূপে আফগানিস্তানের উপর সরাসরি রাজনৈতিক কর্তৃত্বলাভ একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া এই সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এমনকি ব্রিটিশ জনসাধারণের মনে ভারতে রুশ আক্রমণের আশঙ্কা বিভীষিকার আকারে দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ভারতবর্ষ রুশ কবলিত হবে এই চিন্তা এদের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এই মনোভাবের ফলে লণ্ডন থেকে ভারত সরকারের কাছে নির্দেশ এসেছিল যে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব বিলোপ করে তাকে একটা অধীন রাজ্য করে নিতে হবে। আর এই দেশের প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি অতঃপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে।

আফগানিস্তানের শাসক বা আমীর শেরআলি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে রুশদের অভিযানের ফলে তাঁর দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণে উত্তর দিক থেকে অর্থাৎ রুশ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রাখতে বেশ আগ্রহীই হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি প্রতিরক্ষা এবং আক্রমণমূলক চুক্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবের সর্ত ছিল যে ইংরাজ আফগানিস্তানকে অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণ কালে পর্যাপ্ত সাহায্য করবে। ভারত সরকার এইরূপ পারস্পরিক চুক্তি প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হয়নি। এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে ভারত গভর্নমেণ্ট একতরফাভাবে কাবুলে একটা ব্রিটিশ দূতাবাস স্থাপন এবং আফগানিস্তানের বিদেশনীতির উপর নিয়ন্ত্রণের দাবী জানিয়েছিল। শের আলি এই দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করায় তাঁকে ব্রিটিশবিরোধী ও রুশের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। 1876 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন ভারতে গভর্নর-জেনারেলরূপে কর্মভার গ্রহণ করেন। তিনি বলেছিলেন যে "শের আলি রুশের হাতিয়ার হতে চায়, আমি তা হতে দেব না। রুশ শের আলিকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করার আগে তাকে ধ্বংস করাই হবে আমার কাজ।" লর্ড অকল্যাণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে লর্ড লিটন আফগানশক্তিকে বহুধা বিভক্ত ও দুর্বল করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কাবুলে দূতাবাস স্থাপন এবং বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার আফগানিস্তানের আমীরকে মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য 1878 খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানে একটি যুদ্ধাভিযান চালানো হয়েছিল। 1879 খ্রীষ্টাব্দে শের আলির পুত্র ইয়াকুব খান্ গণ্ডামাক্ নামক স্থানে ব্রিটিশের সঙ্গে একটি সন্ধি-চুক্তিতে

আবদ্ধ হন। এই চুক্তিতে ইংরাজদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল। সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলার অধিকার লাভ করার পরও তারা কাবুলে ব্রিটিশ দূতাবাস স্থাপন ও আফগানিস্তানের বিদেশ নীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়েছিল।

তবে ব্রিটিশের এই সাফল্য স্থায়ী হয়নি। আফগানদের জাতীয়তাবোধে আঘাত লাগায় তারা আর একবার তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে যত্নবান হয়েছিল। 1879 খ্রীষ্টাব্দের তেসরা সেপ্টেম্বর কাবুলে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট (রাষ্ট্রদূত) মেজর কাভাগনারি (Cavagnari) এবং তার দেহরক্ষী বিদ্রোহী আফগান সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হন। অতঃপর ইংরাজেরা আফগানিস্তান আক্রমণ করে দেশ অধিকার করে নিয়েছিল। তবে আফগানদের এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়নি। 1880 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারে পুনর্গঠনের ফলে লর্ড লিটনের পরিবর্তে, লর্ড রিপনকে রাজপ্রতিনিধি বা গভর্নর-জেনারেল রূপে ভারতে পাঠানো হয়। রিপন লর্ড লিটনের আগ্রাসী নীতির দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে পূর্ব নীতি অর্থাৎ মিত্রভাবাপন্ন ও শৌর্যশালী আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেন। দোস্ত মহম্মদের এক পৌত্র আবদুর রহমানকে তিনি কাবুলের অধিপতিরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কাবুলে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি (রেসিডেন্ট্) বহাল রাখার দাবিও তিনি প্রত্যাহার করেন। এর পরিবর্তে আবদুর রহমান ব্রিটিশ ছাড়া আর কারো সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক না রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। এর বিনিময়ে ভারত সরকার থেকে তাঁকে একটি বার্ষিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বৈদেশিক আক্রমণের ক্ষেত্রে আমীরকে সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে আফগানিস্তানের আমীর বৈদেশিক নীতি পরিচালনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে কার্যতঃ পরনির্ভরশীল বা অধীনতা পাশবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তবে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁর সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণই থেকে গিয়েছিল।

তৃতীয় আফগান যুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও 1917 খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের ফলে ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক একটা নূতন দিকে মোড় নিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিদ্বেষের মনোভাব দেখা দিয়েছিল। আবার অন্যদিকে রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্তে পৃথিবীর সর্বত্র জনগণের মধ্যে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, আফগান জনসাধারণের মধ্যে তার ব্যক্তি-

ক্রম দেখা যায়নি। সম্রাট শাসিত রুশ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটায় আফগানেরা তাদের উত্তরদিকস্থ প্রতিবেশীর প্রতিনিয়ত আক্রমণের ভীতি থেকে মুক্তি পেয়েছিল। এই ভীতির কারণেই একের পর এক আফগান নৃপতিগণকে ব্রিটিশ সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অন্তে এখন আফগানগণ ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরে পেতে চেয়েছিল। আমীর হবিবুল্লা 1919 খ্রীষ্টাব্দের বিশে ফেব্রুয়ারী আততায়ীর হাতে নিহত হন। ইনি 1901 খ্রীষ্টাব্দে আবদুর রহমানের পর আমীর হয়েছিলেন। হবিবুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নূতন আমীর আমানুল্লা ভারতের ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। 1921 খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-আফগান সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তির ফলে আফগানিস্তান তাঁর নিজস্ব বৈদেশিক নীতি পরিচালনার অধিকার পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল।

তিব্বতের সঙ্গে সম্পর্ক

তিব্বত দেশ ভারতের উত্তরে অবস্থিত। হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি ভারত ভূখণ্ড থেকে তিব্বতকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তিব্বত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী একটি অভিজাত সম্প্রদায় (লামা) দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র। লামারা স্থানীয় অধিবাসীদের ভূমিদাস এমনকি দাসে পরিণত করে রেখেছিল। এদেশে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন দালাই লামা। ইনি নিজেকে ভগবান বুদ্ধের জীবন্ত প্রতীক হিসেবে দাবি করতেন। লামাগণ তিব্বতকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাইলেও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে চীন সাম্রাজ্যের নামমাত্র প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। চীন-সরকার ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ সন্দেহের চোখে দেখত, তবে এতে তারা কোনপ্রকার আগ্রহ দেখাত না। তা সত্ত্বেও, তিব্বতের সঙ্গে সীমিত ব্যবসায় ও তীর্থযাত্রা সূত্রে ভারতের একটা সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাঞ্চু সম্রাট্‌দের রাজত্বকালে চীন সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রুশ, জার্মানী, জাপান ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ব্যবসায় ও রাজনৈতিক সূত্র ধরে চীনে অনুপ্রবেশ করে মাঞ্চু সম্রাটগণের উপর অপ্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা সুরু করে দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনের জনসাধারণ মাঞ্চু সম্রাট ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে 1911 খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চু

সম্রাটদের রাজত্বের অবসান ঘটে। ডঃ সান্ ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে চীনের জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলি অবশ্য তাদের শক্তিকে একটা সংহত রূপ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী বেশ কয়েক বছর চীন গৃহযুদ্ধের কবলে পড়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে চীনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্রমশঃ হীন হওয়ার ফলে তিব্বতের উপর নামমাত্র প্রভুত্ব বজায় রাখাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্য কোন শক্তির অনুপ্রবেশ রুখতে তিব্বতের শাসনকর্তৃপক্ষ অবশ্য চীনের আধিপত্য ব্যবহারিকভাবে না হলেও মৌখিকভাবে স্বীকৃত রেখেছিল। তা সত্ত্বেও তিব্বত সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেনি।

রুশ এবং ব্রিটিশ এই দুই শক্তিই তিব্বতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিল। ব্রিটিশেরা তিব্বতের সঙ্গে শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই আগ্রহান্বিত হয়নি, একটা রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনেও তারা ইচ্ছুক ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত-তিব্বতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নত করা ছাড়াও ইংরাজের উদ্দেশ্য ছিল তিব্বত থেকে খনিজ সম্পদ সংগ্রহ। রাজনীতির দিক থেকে ভারতের উত্তর সীমান্তের সুরক্ষাও তাদের অভীষ্ট ছিল। মনে হয়, এইসব কারণেই ইংরাজেরা তিব্বতের উপর কিছুটা রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের জন্যই চেষ্টিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত তিব্বত কর্তৃপক্ষ ইংরাজদের পক্ষ থেকে তিব্বত অনুপ্রবেশের সব চেষ্টার প্রতিরোধ করেছিল। ঠিক এই সময় রুশের দৃষ্টিও তিব্বতের উপর পড়েছিল। তিব্বতের উপর রুশের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইংরাজদের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ভারতের উত্তর-সীমান্ত সংলগ্ন তিব্বতে রুশ প্রভাবের বিস্তৃতি তাদের কাছে খুবই বিরক্তিকর ও ভীতিপ্রদ মনে হয়েছিল। লর্ড কার্জনের কর্তৃত্বাধীন ভারত সরকার তিব্বতে রুশ প্রভাবের মূলোৎপাটন করার জন্য তিব্বতকে আশ্রিত সীমান্ত রাজ্য নীতির আওতায় আনতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। লর্ড কার্জনের একজন জবরদস্ত সাম্রাজ্য সংগঠকরূপে খ্যাতি ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক এই মত প্রকাশ করেছেন যে রুশ আক্রমণের প্রকৃত সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও এই ভীতিকে একটা অজুহাতরূপে খাড়া করা হয়েছিল। তিব্বতের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করার জন্যই এই সম্ভাব্য রুশ-আক্রমণের ভীতিকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

1904 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লর্ড কার্জন ফ্রান্সিস ইয়ংহাজ্ব্যাণ্ডের নেতৃত্বে তিব্বতের রাজধানী লাসা অভিমুখে একটি সামরিক অভিযানের আয়োজন করেন। তিব্বতীদের হাতে আধুনিক সমরাস্ত্র কিছুই ছিল না, প্রায় নিরস্ত্র তিব্বতবাসীগণ তথাপি অতিশয় সাহসের সঙ্গে ইংরাজ-আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল। তবে তাদের ভাগ্যে জয়লাভ ঘটেনি। গুরু নামক স্থানে মাত্র একটি যুদ্ধেই 700 জন তিব্বতী যোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছিল। 1904 খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইংরাজ বাহিনী লাসা পৌছে গিয়েছিল, পথে কোন রুশ সৈন্যের চিহ্নও দেখা যায়নি। দীর্ঘকাল আলোচনান্তে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তিব্বতকে পঁচিশ লক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হয়েছিল। তিন বৎসরের জন্য চাম্বী উপত্যকা এবং গ্যাংসী নামক স্থানে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের অধিকারও ইংরাজেরা লাভ করেছিল। তিব্বতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা ইংরাজেরা অক্ষুণ্ন রাখতে সম্মতি দিয়েছিল। অপরদিকে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধিকে দেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না, তিব্বতীরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তিব্বত অভিযানে ইংরাজ পক্ষের বিশেষ কোন লাভ হয়নি। তিব্বত প্রবেশের দ্বার রুশদের কাছে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বটে তবে সেই সঙ্গে তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ব-পরিস্থিতি রুশ ও ব্রিটিশ শক্তিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল। 1907 খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ সম্মেলন দ্বারা এই মৈত্রীর সূচনা হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত চুক্তিগুলির একটি ধারায় বলা হয়েছিল যে উভয় পক্ষই তিব্বতের ভূমি দখলের প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত থাকবে এবং দুই শক্তির মধ্যে কেউই লাসায় কোন কূটনৈতিক প্রতিনিধি পাঠাবে না। উভয় দেশই সরাসরি তিব্বতের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা না করে চীনের মাধ্যমেই তা করবে এটাও স্থির হয়েছিল। তিব্বত নিয়ে মতবিরোধ পরিহারের উদ্দেশ্যেই ইঙ্গ-রুশ শক্তি তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার মেনে নিয়েছিল। মনে মনে উভয় পক্ষই বুঝেছিল যে ধ্বংসোন্মুখ মাঞ্চু সম্রাটের তিব্বতের উপর সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করায় কোন ক্ষতি হবে না, কারণ এই অধিকার কার্যকর করার মত সামর্থ্য মাঞ্চু সাম্রাজ্য হারিয়ে ফেলেছে। দুর্বল চীনের তিব্বতের উপর অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার সময় ইঙ্গ-রুশ কর্তৃপক্ষ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেনি।

অচির কালের মধ্যেই একটি শক্তিশালী স্বাধীন চীন-সরকারের আবির্ভাব তাদের চিন্তার বাইরেই থেকে গিয়েছিল।

সিকিমের সঙ্গে সম্বন্ধ

বঙ্গদেশের উত্তরে নেপালের সহিত সংলগ্ন তিব্বত এবং ভারতের সীমান্তের মধ্যবর্তী স্থানে সিকিম দেশ অবস্থিত। 1835 খ্রীষ্টাব্দে সিকিমের রাজা বাৎসরিক কিছু অর্থ অনুদানের বিনিময়ে দার্জিলিং এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল ইংরাজকে হস্তান্তরিত করেছিল। ইংরাজ এবং সিকিমবাসীদের মধ্যে 1849 খ্রীষ্টাব্দে একটা সামান্য বিরোধের উপলক্ষে মিত্রতার সম্পর্ক ক্ষুন্ন হয়। এই সময় লর্ড ডালহৌসি একদল সৈন্যবাহিনীকে সিকিম আক্রমণের উদ্দেশ্যে পাঠান। এই অভিযানের ফলে সিকিমের রাজা তাঁর রাজ্যের 1700 বর্গ মাইল এলাকা ইংরাজকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ইংরাজের সঙ্গে 1860 খ্রীষ্টাব্দে সিকিমের আর একটি সংঘর্ষ ঘটেছিল। সিকিমের দেওয়ান বা মন্ত্রীর জন্যই এই খণ্ডযুদ্ধের ব্যাপারটি ঘটেছিল। 1891 খ্রীষ্টাব্দের একটা সন্ধি চুক্তির ফলে সিকিম কার্যতঃ তার স্বাধীনতা হারিয়ে একটা আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সিকিমের রাজা তাঁর 'দেওয়ান'কে আত্মীয়স্বজন সহ দেশ থেকে নির্বাসিত করতে বাধ্য হন। তাঁকে 7,000 টাকা জরিমানা ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ সব টাকা দিতে হয়েছিল। ইংরাজকে সিকিমে ব্যবসাবাণিজ্য করবার অবাধ অধিকার স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। সিকিমের মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ভারত-তিব্বত বা তিব্বত-ভারত পণ্যদ্রব্য চলাচলের জন্য সিকিমের প্রাপ্য শুল্ক হারও যথেষ্ট কমিয়ে আনতে হয়েছিল।

1866 খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত কর্তৃপক্ষ সিকিমের শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগসাজসে সিকিমকে তিব্বতের নিয়ন্ত্রণাধীন করার চেষ্টা চালিয়েছিল। এই ঘটনার ফলে আর একবার ইঙ্গ-সিকিম বিরোধ দেখা দিয়েছিল কারণ ব্রিটিশ শাসিত ভারত-সরকারের পক্ষে সিকিমের তিব্বতের সঙ্গে সংযুক্তি বা মৈত্রী সুনজরে দেখা সম্ভব ছিল না। ভারতের উত্তর সীমান্ত বিশেষ করে দার্জিলিং এবং তৎসংলগ্ন চা-বাগিচা অঞ্চলের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সিকিমের অপরিসীম গুরুত্বের কথা ভেবেই ইংরাজেরা এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন বোধ করেছিল। 1888 খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতীদের বিরুদ্ধে ইংরাজ সিকিমে সমরাভিযান চালাতে বাধ্য হয়েছিল। 1890 খ্রীষ্টাব্দে একটি ইঙ্গ-চীন চুক্তিতে এই

ব্যাপারের নিষ্পত্তি ঘটেছিল। এই চুক্তিতে সিকিমকে ব্রিটিশের আশ্রিত রাজ্য (Protectorate) রূপে মেনে নেওয়া হয়েছিল। আশ্রিত রাজ্য হিসেবে সিকিমের অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সিকিমের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল।

ভুটানের সঙ্গে সম্পর্ক

ভারতের উত্তর সীমান্তে সিকিমের পূর্বদিকে অবস্থিত ভুটান একটি পার্বত্য রাজ্য। 1744 খ্রীষ্টাব্দের পর ওয়ারেন হেস্টিংস এই রাজ্যের রাজার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। অতঃপর ভুটান ইংরাজকে তার দেশের মধ্য দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাবার অনুমতি দিয়েছিল। 1815 খ্রীষ্টাব্দের পর ইঙ্গ-ভুটান সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। ভুটানের পাহাড়-গুলির পাদদেশে অবস্থিত 1000 বর্গমাইল সঙ্কীর্ণ অঞ্চলের উপর ব্রিটিশের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয়েছিল। এই অঞ্চলে অনেকগুলি গিরি-পথ বা 'দুয়ার' ছিল। এই সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডটুকু ব্রিটিশের অধিকাবভুক্ত হলে ভুটানের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের সীমান্ত সুচিহ্নিতঃ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। প্রতিরক্ষাব প্রয়োজনেও এই অঞ্চলের বেশ গুরুত্ব ছিল। ব্রিটিশ চা-করদের চায়ের চাষেব জন্যও এটি লোভনীয় ছিল। 1863 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্রতিনিধি বা দূতরূপে এশলি ইডেন ভুটানে গিয়েছিলেন। তিনি ডুয়ার্স অঞ্চল অধিকারের সুবিধার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন, "এই প্রদেশ ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রদেশগুলির অন্যতম। আমাদের গভর্নমেণ্ট এটি অধিকারে আনতে সক্ষম হলে এটি একটি অতি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের এমন সর্বোৎকৃষ্ট স্থান আমি ভারতের আর কোথাও দেখতে পাইনি। এখানে একটি বেশ ভাল ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে।"

1841 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অক্ল্যাণ্ড আসামের গিরিপথ বা ডুয়ার্সগুলি দখল করেন। ভারতের সঙ্গে ভুটানের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার আর একটি কারণ ছিল। ভুটিয়ারা ইংরাজ অধিকৃত বাঙ্গলা দেশে ঢুকে মাঝে মাঝে লুঠতরাজ চালাত। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এই উৎপাত চলে আসছিল। 1865 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের সঙ্গে ভুটানের একটা যুদ্ধ বেধেছিল, তবে এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যুদ্ধটা বলতে গেলে ছিল একতরফা, ইংরাজেরই এতে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। 1865 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দুই পক্ষের মধ্যে একটা সন্ধিচুক্তি

স্বাক্ষরিত হয়। বার্ষিক 50,000 হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে বাঙ্গলা ও আসামের দিক্ থেকে ভুটানের সকল গিরিপথগুলির অধিকার ইংরাজদের হাতে এসেছিল। ইংরাজেরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ভুটানের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না তবে ভুটানের প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতির নিয়ন্ত্রণ ভারতের ব্রিটিশ সরকারের হাতেই থাকবে।

অনুশীলনী

1. উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত-সরকারের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিশেষ বিষয়গুলি এই সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী ছিল সেগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
2. উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির উদ্দেশ্য কি ছিল? এই উদ্দেশ্যগুলি কিভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল?
3. উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আফগানিস্তান নীতির বিচার ও বিশ্লেষণ কর। এই নীতির পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতার কারণ কি?
4. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ:

   (a) তিব্বত সংক্রান্ত ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা (b) ইয়ংহাসব্যাণ্ড অভিযান (c) উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত-সিকিম সম্পর্ক (d) 1865 খ্রীষ্টাব্দের ভুটান-ভারত চুক্তি (e) 1814 খ্রীষ্টাব্দের নেপাল যুদ্ধ।

একাদশ অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত অধিকার ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থায় একটা সুস্পষ্ট এবং দূরপ্রসারী সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল। 1947 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ব্রিটিশ অধিকার কালে ভারতের অর্থনীতির এমন কোন ক্ষেত্র ছিল না যেখানে এই ব্রিটিশ প্রভাব সক্রিয় থাকেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রভাব শুভদায়ক হয়েছিল আবার কোথাও বা এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল।

প্রচলিত অর্থনীতির বিপর্যয়

ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাকে অতিদ্রুত পরিবর্তিত করে তার জায়গায় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির প্রবর্তন করেছিল। এই অর্থনীতি ব্রিটিশ অর্থনীতির পরিপুষ্টির জন্যই পরিকল্পিত ছিল। এই দিক দিয়ে ইংরাজ কর্তৃক ভারত বিজয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিদেশী শক্তি কর্তৃক ভারত বিজয়ের বিশেষ পার্থক্য ছিল। আগে যারা ভারতীয়দের যুদ্ধে পরাস্ত করে ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল তারা কেউই ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিশেষ কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। বিজেতারা ধীরে ধীরে ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। বিদেশী প্রভুত্ব স্থাপনের পরেও ভারতীয় কৃষক, ব্যবসায়ী এবং হাতের কাজে নিযুক্ত কারিগর শ্রেণীর জীবনধারা ঠিক পূর্বের খাতেই প্রবাহিত হত। স্ব-নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিই ছিল ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তি। বিদেশী শাসন এই দৃঢ় ভিত্তিকে শিথিল করে দেয়নি। কৃষকদের উদ্বৃত্ত ফসল বা অর্থ শোষণের জন্য একটি গোষ্ঠী সর্বদাই সক্রিয় ছিল। শাসক পরিবর্তনের ফলে এই মুনাফাভোগীদের শ্রেণীই শুধু পরিবর্তিত হত। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত অধিকারের পর পূর্ববর্তী বিদেশী শাসনের অভ্যস্ত এই চিত্রটি ভিন্নরূপ নিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন ভারতে চিরপ্রচলিত এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি ধ্বংস করে দিয়েছিল। আর একটা বড় কথা এই যে, অতীতে যারা ভারত জয় করেছিল তারা ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে

একাত্ম-রূপ মিলে গিয়েছিল। বিজয়ী ইংরাজ কোনদিন ভারতীয় জন-জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি, তার সে চেষ্টাও ছিল না। এরা সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতে বিদেশীরূপেই বাস করে গিয়েছিল। ভারতের সম্পদ শোষণ করে এই সম্পদ সে তার রাজকীয় প্রাপ্যরূপে গণ্য করে স্বদেশে নিয়ে যেত।

ইংরাজের ব্যবসায়বাণিজ্যও শিল্পোদ্যোগের স্বার্থে পরিচালিত হওয়ার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার নানা বিচিত্র পরিবর্তন ঘটেছিল।

কারিগর ও শিল্পীশ্রেণীর বিনাশ

বিশ্বের সভ্যসমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের কারুশিল্পীদের দ্বারা নির্মিত নগর-জীবনের উপযোগী শিল্প-বস্তুর প্রভূত সমাদর ছিল। ভারতের কারুশিল্প নাম শুনলেই বিশ্ববাসী তার চারুত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হত। ইংরাজদের ভারত জয়ের পর এই কারুশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ব্রিটেন থেকে আমদানি যন্ত্রনির্মিত শিল্পদ্রব্য দামে সস্তা পড়ত, কাজেই ভারতীয় শিল্প-বস্তু অসম-প্রতিযোগিতায় বাজার থেকে হঠে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে 1813 খ্রীষ্টাব্দের পরে ইংরাজেরা ভারতে একতরফাভাবে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তিত করেছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শিল্প-জাত দ্রব্য বিশেষভাবে সূতিবস্ত্র ভারতের বাজার দখল করে ফেলেছিল। পুরাতন ব্যবস্থায় প্রস্তুত ভারতীয় পণ্যবস্তুর পক্ষে বাষ্পচালিত যন্ত্র সাহায্যে বহুসংখ্যায় উৎপন্ন ব্রিটেন জাত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে

রেলপথ প্রসারের পর ভারতীয় পণ্যশিল্প বিশেষভাবে গ্রাম্য কারিগর-দের হাতের কাজের দ্রব্যাদি উৎপাদনের ধ্বংস অতি দ্রুত ঘটেছিল। ব্রিটেন জাত পণ্য-বস্তু রেলপথ প্রবর্তনের পর দেশের সুদূর গ্রামপ্রান্তেও সুলভ হয়ে উঠায় গ্রাম্য কারিগরদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদির চাহিদা গ্রামের মানুষদের কাছেও আর ছিল না। পুরুষানুক্রমে অনুসৃত নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন থেকে কারিগর শ্রেণী বঞ্চিত হয়েছিল। ডি. এইচ. বুকানন (D. H. Buchanan) নামে একজন আমেরিকান লেখক এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "স্ব-নির্ভরতার যে বর্ম ভারতের গ্রামগুলিকে এতদিন রক্ষা করে

এসেছিল, ইস্পাতের রেল সেই বর্ম ভেদ করে গ্রাম-জীবনের রক্ত শোষণ সুরু করে নিয়েছিল।”

রেল প্রবর্তনের পর সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সুতোকাটা ও বস্ত্র বয়ন শিল্প। রেশম ও পশম উৎপাদন ও বয়ন, লোহা, মৃৎশিল্প, কাচ, কাগজ, ধাতব পদার্থ, নৌ-চলাচল, তৈলনিষ্কাশন, চর্ম ও রঞ্জন শিল্প উদ্যোগ-গুলিরও কিছু কম ক্ষতি হয়নি।

ব্রিটেন জাত পণ্যবস্তুর বাজার দখল ছাড়া ব্রিটিশের ভারত-বিজয় ভারতীয় শিল্পের অন্যভাবেও ধ্বংসসাধনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তার কর্মচারীগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় কারিগরদের উপর জোর-জুলুম করে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাজার দরের চেয়ে অনেক কম দামে নিজেদের কাছে বেচতে বাধ্য করত। এর পর তারা কারিগরদের ভয় দেখিয়ে অতি অল্প মজুরির বিনিময়ে এই সব শিল্পদ্রব্য তৈরী করিয়ে নিজেদের ব্যবসা চালাত। এইভাবে বহু কাবিগরকে তাদের পারিবারিকবৃত্তি চ্যুত করা হয়েছিল! সাধারণভাবে কোম্পানীর কর্তব্য ছিল এই কারিগরদের সুযোগসুবিধা দিয়ে বিদেশে এগুলির রপ্তানির ব্যবস্থা। তৎ পরিবর্তে কোম্পানী শুধু জুলুমবাজির পথ নিয়েছিল।

চড়া রপ্তানি শুল্ক এবং নানা প্রকার বিধিনিষেধের বেড়াজালে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের ইউরোপীয় বাজার এমনিতেই সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল, তার উপর আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইউরোপে পণ্যউৎপাদনের ফলে 18`0 খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতীয় পণ্যের চাহিদা ইউরোপে একেবারেই নিঃশেষ হয়েছিল। ভারতীয় রাজা নবাব এবং তাদের সভাসদ শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ধ্বংসোন্মুখ হওয়ায় যে কারিগরেরা নাগরিক জীবনের উপভোগ্য পণ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করত তাদের জীবিকার উপরও একটা প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যে-কারিগরশ্রেণী তলোয়ার, কামান ইত্যাদি সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করত, দেশীয় রাজ্যসমূহ তার খরিদ্দার ছিল। ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিটি সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সবই স্বদেশ থেকে কিনে আনত। ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীকে স্থানচ্যুত আর যেসব ব্রিটিশ কর্মচারী ও ব্যবসায়ী অভিজাত জীবনযাত্রার অভিলাষী

হয়েছিল এরা সকলেই পারতপক্ষে ভারতজাত কোন বিলাস-দ্রব্য মোটেই ব্যবহার করত না, ব্রিটেনে প্রস্তুত ভোগ্যদ্রব্যই তারা ব্যবহার করত। ভারতীয় কারু শিল্প ধ্বংসের আর একটি কারণ ছিল তুলা চামড়া প্রভৃতি কাঁচামালের বিদেশে ব্যাপক রপ্তানি। এই জিনিসগুলির মূল্যবৃদ্ধির দরুণও ভারতীয় কারুশিল্পের দারুণ ক্ষতি হয়েছিল। কারণ কাঁচামালের মূল্য-বৃদ্ধির দরুণ দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বেড়ে যেত, এবং সস্তা অনুরূপ বিদেশী দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উৎপাদনকারীদের হঠে যেতে হত।

ভারতীয় কারুশিল্প ধ্বংসের ফলে এইসব কারুশিল্পের জন্য বিশিষ্ট ভারতের নগর ও গ্রামগুলিও ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছিল। এইসব জনপদ-গুলি অতীতে লুণ্ঠন ও যুদ্ধের তাণ্ডব সত্ত্বেও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত বিজয়ের ধাক্কা তারা সামলাতে পারেনি। ঢাকা, সুরাট, মুর্শিদাবাদের মত আরও অনেক জনবহুল শিল্প-সমৃদ্ধ জনপদ জনশূন্য ও শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। এ সম্বন্ধে 1834-35 খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এই মন্তব্য করেছিলেন—"ব্যবসাবাণিজ্যের ইতিহাসে এই শ্রীহীনতার কোন তুলনা পাওয়া যায় না। ভারতের মাঠে-ঘাটে তাঁতীদের শুকনো হাড় গড়াগড়ি যাচ্ছে।"

ব্রিটেন ও পশ্চিম ইউরোপে পুরাতন প্রথায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন লুপ্ত হলেও সেই সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ক্ষোভের বিষয় ভারতে পুরাতন পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা শুধু ধ্বংসই হয়েছিল, আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি সৃষ্ট হয়নি। এর ফলে শিল্পী বা কারিগর শ্রেণী তাদের পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। চাষবাসের সীমিত এলাকায় ভীড় জমানোর পথটিই তাদের পক্ষে খোলা ছিল। ব্রিটিশ শাসনে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল একথাও স্মরণীয়। গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগ ও কৃষি, গ্রামীণ অর্থব্যবস্থায় এরা একে ছিল অপরের পরিপূরক। ব্রিটিশ শাসন গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগ ধ্বংস করে দিয়ে গ্রামীণ স্বনির্ভরতারও মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে-ছিল। ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষক চাষবাসের অবসরে সুতো কেটে বা কাপড় বুনে কিছু আয় করে নিত, এই বাড়তি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তারা একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছিল। গ্রাম্য কারিগর শ্রেণীর মানুষেরা পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিচ্যুত হয়ে উপায়ান্তর না পেয়ে চাষবাসের দিকেই ঝুঁকে

ছিল। খেতমজুরি অথবা সামান্য কিছু জমি চাষই তাদের জীবিকা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে মানুষের এত বেশী প্রয়োজনের তুলনায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল বেশ অল্প।

ব্রিটিশ শাসনে শিল্পোদ্যোগবিহীন দেশে জনসাধারণকে জীবিকার জন্য একমাত্র কৃষিনির্ভর করে রাখা হয়েছিল। আগেকার দিনের হিসাবপত্র জানা না গেলেও 1901 থেকে 1941 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আদমশুমারী প্রতিবেদন (Census Reports) থেকে জানা যায় যে দেশের কৃষিনির্ভর মানুষের সংখ্যা 63·7 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 70 শতাংশ দাঁড়িয়েছিল। একান্তভাবে কৃষিনির্ভরতাই ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণ হয়ে উঠেছিল।

বস্তুতঃ ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষকে তার নিজস্ব একটি কৃষি উপনিবেশে পরিণত করেছিল, এবং এই কৃষি উপনিবেশের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শিল্প উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন ও সরবরাহ। সুতীবস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রেই এই বিষয়টি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বে তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের স্থান সর্বপ্রথম ছিল। ব্রিটিশ রাজত্বে আবার এই ভারতকেই ব্রিটেন থেকে সুতীবস্ত্র আমদানি করতে হত। কাঁচা তুলার উৎপাদন ও রপ্তানির ভূমিকাই তার ভাগ্যে জুটেছিল।

কৃষকের দুরবস্থা

ব্রিটিশ শাসনে ধীরে ধীরে কৃষকসমাজের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। দেশের মধ্যে আর যুদ্ধবিগ্রহ দেখা যেত না তথাপি কৃষকদের আর্থিক অবস্থা তাদের দারিদ্র্যের মুখোমুখি এনে ফেলেছিল।

ব্রিটিশ শাসনের সূচনাকালে ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে তাদের নীতি ছিল চড়া হারে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ। এর ফলে চারিদিকে হাহাকার রব উঠেছিল। এমনকি কর্ণওয়ালিসও মন্তব্য করেছিলেন যে এই চড়া হারে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ নীতির ফলে বাঙলার এক-তৃতীয়াংশ বন্যপশুর বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন সহজে হয়নি। চিরস্থায়ী বা অস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত এলাকায় চাষীদের অবস্থা বেশ শোচনীয়ই হয়ে পড়েছিল। এদের অস্তিত্ব জমিদারের খেয়ালখুশি বা মর্জির উপর নির্ভর করত। জমিদারেরা তাদের দেয় খাজনার পরিমাণ ইচ্ছামত এতদূর বাড়িয়ে দিত যে তাদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠত। এছাড়াও ছিল নানা অজুহাতে

বাড়তি পয়সা আদায়, বিনা মজুরিতে বেগার খাটানো প্রভৃতি জমিদারি উৎপীড়ন।

রায়তওয়ারি বা মহলওয়ারি ব্যবস্থা যেসব এলাকায় প্রচলিত ছিল সেই-সব অঞ্চলেও প্রজাদের অবস্থা জমিদারি প্রথার অধীন প্রজাদের থেকে কিছু-মাত্র ভাল ছিল না। এইসব এলাকায় খোদ সরকার বা গভর্নমেণ্ট জমি-দারের পরিবর্তে নিজেরাই সাধ্যাতিরিক্ত খাজনা আদায় করে নিত। প্রথম-দিকে এই খাজনার হার ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধাংশ ভাগ। ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষকের দারিদ্র্য ও কৃষিব্যবস্থার অবনতির মূল কারণ। সমসাময়িক কালের বহু লেখক ও রাজ-কর্মচারীর চোখেই এই কারণটি ধরা পড়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশপ হেবারের অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে, এটি 1826 খ্রীষ্টাব্দে লিখিত—

"বর্তমানে ভূমিরাজস্বের যে হার প্রচলিত তাতে চাষবাসে কারো লাভ-বান হওয়া মুস্কিল। এই অবস্থায় ইউরোপীয়রাও কৃষিকার্যে লাভবান হতে পারে না, দেশীয়দের সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কৃষিজাত অর্ধেক ফসলই গভর্নমেণ্ট গ্রাস করে নিয়ে থাকে। হিন্দুস্তানে (উত্তর ভারত) থাকার সময় রাজার কর্মচারীদের মনোভাব থেকে আমি জানতে পেরে-ছিলাম যে তাদের ধারণা এই যে দেশীয় রাজ্যবাসী প্রজাগণের থেকে কোম্পানীর (ব্রিটিশ) শাসনাধীন প্রদেশগুলিতে প্রজাগণ অধিকতর দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের মধ্যে বাস করে। মাদ্রাজে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এদেশের জমি উর্বরা না হলেও দেশীয় রাজ্য ও কোম্পানীর রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব-শোষণের বেশ তফাৎ আছে। আমাদের (অর্থাৎ ইংরাজদের) মত দেশীয় নৃপতিগণ প্রজা-শোষণ করে না।"

রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ বছরের পর বছর বেড়েই চলেছিল। 1857-58 খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল 15·3 কোটি টাকা, এটা বৃদ্ধি পেতে পেতে 1936-37 খ্রীষ্টাব্দে 35·8 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল। জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই রাজস্ব-সংগ্রহ তুলনায় কমই ছিল বলতে হবে। রাজস্ব বৃদ্ধির অবকাশ থাকলেও আরও করভার চাষীদের উপর চাপানো বিপজ্জনক বিবেচিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে চাষের জমির উপর চাপ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, গোড়ার দিকের তুলনায়

রাজস্বের হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও চাষীর পক্ষে এটা বহন করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

চাষীর পক্ষে খাজনা মেটানো এত কঠিন হওয়ার কারণ খাজনার অর্থের বিনিময়ে তারা প্রতিদানে সরকারের কাছ থেকে কিছুই পেত না। চাষের উন্নতির জন্য দেশের সরকার কোন অর্থব্যয়ই করত না। রাজস্বরূপে সংগৃহীত অর্থ থেকে প্রশাসনিক খরচ ছাড়াও ইংলণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেলামি পাঠানো হত। বাকী অর্থ ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে লাগানো হত। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার খাতে যে প্রশাসনিক ব্যয় হত তার সুবিধা-টুকুও জনসাধারণ পেত না। আইন ও শৃঙ্খলারক্ষক কর্মচারীরা কৃষকদের চেয়ে ব্যবসায়ী ও কুসীদজীবী মহাজনদের স্বার্থ রক্ষার্থেই অধিক তৎপর ছিল।

ব্রিটিশ সরকার জনসাধারণের ঘাড়ে উচ্চহারে খাজনা ধার্য করেই ক্ষান্ত থাকত না। রাজস্ব সংগ্রহকালে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারও চলত। ফসলের ফলন কম হয়েছে বা একেবারেই হয়নি এমন ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট খাজনার টাকা মিটিয়ে দিতে হবেই এই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ছিল। সাধারণ অবস্থায় কৃষকের খাজনা মেটাতে অসুবিধা না হলেও অজন্মার বছরে কৃষকের পক্ষে খাজনা মেটাতে বেশ বেগ পেতে হত।

কৃষক খাজনা মিটিয়ে না দিতে পারলে, তার জমি নীলামে চড়িয়ে খাজনার টাকা উশুল করে নেওয়া হত। তবে এই বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে বহুক্ষেত্রে কৃষক তার জমির কিছু অংশ বিক্রি করে দিয়ে এই বাকী খাজনা পরিশোধ করত। উভয় ক্ষেত্রেই তাকে জমির অধিকার হারাতে হত।

খাজনা পরিশোধের জন্য বহুক্ষেত্রে চাষীরা চড়া হারে মহাজনের কাছে টাকা ধার করত। খাজনা বাকীর জন্য জমি নীলামে চড়ে বিক্রি হয়ে যাওয়ার থেকে কৃষকেরা কোন মহাজন অথবা সম্পন্ন চাষী প্রতিবেশীর কাছে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার নিয়ে খাজনা শোধ করা পছন্দ করত। অনেক সময় সাংসারিক দায় দেনা মেটাতেও চাষীদের নিজের জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে হত। কিন্তু একবার এইভাবে টাকা ধার নিলে তার আর এই ঋণ-জাল থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হত না। কুসীদজীবী মহাজন খুব চড়া সুদে টাকা ধার দিত, তার উপর ভুল হিসাব দেখানো, জাল সই, ধার নেওয়া আসল টাকার অঙ্কের চেয়ে বেশী টাকার অঙ্ক ধার নেওয়ার স্বীকৃতির

সই আদায় ইত্যাদি বিভিন্ন ধূর্ততাপূর্ণ উপায়ে ঋণগ্রস্ত চাষীকে দিনের পর দিন ডুবিয়ে দেওয়া হত। সর্বশেষে সামান্য অর্থ ঋণের জন্য তার সব জমি-জমা মহাজনের কুক্ষিগত হত।

নূতন আইন ও নূতন রাজস্ব নীতি সুদখোর মহাজনদের পক্ষে বেশ সহায়ক হয়েছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে সুদখোর মহাজন শ্রেণী গ্রামীণ সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। মহাজন কোন খাতকের সঙ্গে জুয়োচুরি বা দুর্ব্যবহার করতে সাহস পেত না। কারণ অবশিষ্ট গ্রামবাসী তার এই অসাধুতা বা অত্যাচার বরদাস্ত করবে না তার মনে এই ভয় থাকত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন মহাজন টাকা ধার দিয়ে যা খুসী তাই সুদ দাবী করতে পারত না। গ্রাম্য সমাজে সুদের একটা হার প্রচলিত ছিল, সবাই এটা মেনে চলত। সুদ বা আসল টাকা মেটাতে না পারলে মহাজনের পক্ষে খাতকের জমি দখল করার অধিকার ছিল না, বড় জোর সে খাতকের কোন অস্থাবর সম্পত্তি যথা অলঙ্কার, আসবাবপত্র ইত্যাদি দখল করতে পারত। অনেক সময় তাকে জমির ফসল থেকেও প্রাপ্য আদায় করতে দেওয়া হত। ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থায় জমি হস্তান্তরযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়, সম্পন্ন চাষী অথবা মহাজনদের পক্ষ থেকে খাতকের জমি দখল করে নেওয়াতে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃক আইন ও পুলিশ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর যে শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল তার সুযোগসুবিধাগুলি মহাজন শ্রেণীর মানুষেরাই বেশী মাত্রায় ভোগ করত। আইন মহাজনদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দিয়েছিল। ব্যয়বহুল মামলা চালিয়ে টাকার জোরে মামলা জয়ের যে সুযোগ ছিল হতভাগ্য প্রতিপক্ষের বা খাতকের তা পাওয়ার সুযোগ ছিল না। তাছাড়া, টাকার জোরে সব সময়েই মহাজন শ্রেণী পুলিশের সাহায্য পেত। লেখাপড়া জানা ধূর্ত মহাজনদের পক্ষে চাষী খাতকের নিরক্ষরতা ও সারল্যের সুযোগ নিয়ে এবং আইনের জটিল মারপ্যাঁচ প্রয়োগ করিয়ে যেকোন মামলায় জয়লাভ করা সম্ভব হত। ফলে খাতক চাষীর সর্বনাশ ঘটত।

রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি রাজস্ব-ব্যবস্থা যুক্ত এলাকার চাষীরাও ক্রমশঃ ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। ঋণভারগ্রস্ত এই চাষী খাতকদের জমিজমা ক্রমশঃ কুসীদজীবী, ব্যবসায়ী, সম্পন্ন কৃষক প্রভৃতি পয়সাওলা শ্রেণীর লোকের অধিকারে এসে পড়ছিল। জমিদারী এলাকাতেও চাষীরা খাজনা

দিতে অপারগ হওয়ায় নিজের জমি থেকে 'উচ্ছেদ' হচ্ছিল, অনেক সময় সে নিজের জমিই মহাজনের 'ঠিকে প্রজা' হিসেবে চাষ করতে বাধ্য হত।

অজন্মা বা দুর্ভিক্ষের সময় জমি হস্তান্তরের ঘটনা সবচেয়ে বেশী দেখা যেত। ভারতের কৃষককুলের হাতে দুঃসময়ের জন্য কোন 'সঞ্চয়' মজুত থাকে না। কাজেই অজন্মার সময় শুধু খাজনা মেটাতে নয়, পেটের ভাত জোটাতেও তাকে কুসীদজীবী মহাজনের শরণাপন্ন হতে হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে গ্রামাঞ্চলে কুসীদজীবী মহাজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিভীষিকার নামান্তর। গ্রামীণ মানুষদের দারিদ্র্যের মূল কারণও ছিল এই শ্রেণী। 1911 খ্রীষ্টাব্দে গ্রামীণ মানুষের ঋণের পরিমাণ ছিল 300 কোটি টাকা। 1937 খ্রীষ্টাব্দে এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 1800 কোটি টাকায় ঠেকেছিল। মহাজনী ব্যবসা ছিল একটা পাপ-চক্র। এই পাপ-চক্র দারিদ্র্য এবং জমির খাজনা মেটাবার জন্য চাষীদের ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য করত আবার এই ঋণেরই বেড়াজালে তাদের সর্বস্বান্ত হতে হত। সাম্রাজ্য-বাদী শোষণযন্ত্রে সুদখোর মহাজন ছিল মাত্র একটি দাঁত, চাষীরা এটা অনেক সময় বুঝতে পারত না। তাই সরকারী শোষণব্যবস্থার প্রাপ্য ঘৃণা ও ক্রোধ অনেক সময় এই মহাজনের ঘাড়েই চাপত কারণ চোখের সামনে তারা এই মহাজনকেই দেখতে পেত—সাম্রাজ্যবাদী শোষণব্যবস্থাটি তাদের চোখে পড়ত না। 1857 খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের সময় তাই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে, যেখানে যেখানে কৃষকশ্রেণী বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেখানে তাদের প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় সুদখোর মহাজন আর তার হিসেবের খাতাপত্র। এর পরও মহাজনের বিরুদ্ধে চাষীদের হামলার ঘটনা প্রায়ই ঘটত।

চাষের কাজ ধীরে ধীরে একটা ব্যবসায়ে পরিণত হওয়াতে সুদখোর মহাজন সেই সঙ্গে ব্যবসায়ী শ্রেণীর পক্ষে চাষীদের শোষণ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঠিক ফসল উঠার মুখেই যে কোন মূল্যে চাষী তার ফসল বেচে দিতে বাধ্য হত কারণ তাকে সরকার, জমিদার ও মহাজনের দেনা তখনই শোধ করতে হত। কাঁচা টাকার আশু প্রয়োজন থাকায় চাষী নিজে ফসলের দাম নির্দিষ্ট করতে পারত না। শস্য ব্যবসায়ীর মর্জিমত দামে তাকে ফসল বেচতে হত। বলা বাহুল্য যে, শস্য ব্যবসায়ী বাজারদরের চেয়ে অনেক কম দামে এই শস্য কিনে নিত এবং এই শস্য অনেক বেশী দামে বিক্রি

করে প্রচুর টাকা কামিয়ে নিত। কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসায় দ্বারা ব্যবসায়ীরা যে প্রচুর ধন উপার্জন করে নিত আর চাষী বঞ্চিতই থেকে যেত একথা বলাই বাহুল্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বহুক্ষেত্রে গ্রাম্য মহাজনকেই এই শস্য ব্যবসায়ী রূপে দেখা যেত।

গ্রামীণ শিল্পের অবলুপ্তি, আধুনিক শিল্পোদ্যোগের অভাব, দেনার দায়ে জমি বিক্রি হয়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে দেশে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপযুক্ত জীবিকার অভাবে এই সব বেকার মানুষের দল জমিদার অথবা মহাজন শ্রেণীর অধীনে ক্ষেত-মজুর অথবা ঠিকে-প্রজারূপে বাঁচার চেষ্টা করত। এই সব উট্‌কো কাজে যে রোজগার হত তাতে তাদের পেটও ভরত না। সব দিক আলোচনা করে বুঝতে পারা কঠিন নয়, যে দেশের চাষীসমাজ গভর্নমেণ্ট, জমিদার ও সুদখোর মহাজন এই ত্রিবিধ শোষক শ্রেণীর চাপেই পিষ্ট হ'ত। এই তিন শোষকের প্রাপ্য মিটিয়ে চাষীর নিজের বা পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য অবশিষ্ট বিশেষ কিছুই থাকত না। 1950-51 খ্রীষ্টাব্দের একটা হিসেব থেকে দেখা যায় যে ঐ বৎসর দেশের চাষীদের ভূমিরাজস্ব ও মহাজনের প্রাপ্য সুদ বাবদ 14,000 কোটি টাকা দেয় ছিল। এই বছরে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় তিনগুণ বেশী টাকা। এই হিসেব থেকে বোঝা যায় যে ঐ বৎসরে দেশে যে ফসল উৎপন্ন হয়েছিল তার এক-তৃতীয়াংশ চাষীদের খাজনা ও ঋণশোধ বাবদ ব্যয় করতে হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় কৃষক সমাজের দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান হত। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবও ঘটত। খরা অথবা বন্যার কারণে অজন্মা দেখা দিলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অন্নাভাবে মরতে হত।

প্রাচীন জমিদার সমাজের ধ্বংস ও নূতন ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক যুগের মধ্যেই বাংলা ও মাদ্রাজের প্রাচীন জমিদারকুলের অবলুপ্তি ঘটেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের নীতি ছিল এই যে নীলাম ডাকার পর সব চেয়ে বেশী দর যে হাঁকবে তাকেই রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দেওয়া হবে। এই নীতির ফলেই প্রাচীন জমিদারকুল ধ্বংস হয়েছিল। 1793 খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার প্রথম দিকেও প্রাচীন জমিদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রাজস্বের হার বেশ চড়া ছিল। আদায়ীকৃত রাজস্বের এগার ভাগের দশ ভাগ ছিল সরকারের প্রাপ্য। জমিদারদের সরকারে রাজস্ব দেওয়ার আইন

ছিল বেশ কড়া। এই নিয়ম এত কড়া ছিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমিদার রাজস্ব জমা না দিলে তার জমিদারী কেড়ে নিয়ে অন্য ব্যক্তিকে বিক্রি করে দেওয়া হত। এই নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ার পর কয়েকবৎসর ধরে জমিদার শ্রেণীকে বিশেষ আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়েছিল। এই যুগে বাঙলার বহু সম্ভ্রান্ত নামজাদা জমিদারের সর্বনাশ ঘটেছিল। 1815 খ্রীষ্টাব্দের পর অর্ধেকেরও বেশী সম্ভ্রান্ত জমিদারের জমিদারি স্বত্ব ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদের হাতে চলে গিয়েছিল। এই নয়া জমিদার শ্রেণীর প্রায় সকলেই ছিল নগরবাসী। এরা প্রজাদের দুঃখদুর্দশার প্রতি বিনা ভ্রূক্ষেপে প্রজাদের কাছ থেকে তাদের পাওনা প্রতিটি পাই-পয়সা আদায় করে নিত। বিবেকবর্জিত এই নয়া জমিদারগণ প্রজাদের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতিই মনে পোষণ করত না। এরা রাজস্ব কর্ষণ পদ্ধতিতে অর্থাৎ যেমন খাজনা ততটা জমি চাষের ভিত্তিতে জমিদারি চালাত, খাজনা উশুলে কোন রকম হেরফের হওয়া মাত্রই এরা প্রজাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিত। পুরাতন আমলের জমিদারগণ প্রায়শঃই প্রজাদের সঙ্গে গ্রামে বাস করত, প্রজাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে এদের পরিচয় থাকায় এই জমিদার শ্রেণীর প্রজা-পীড়নের দুর্নাম খুব ছিল না।

উত্তর মাদ্রাজ অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং মাদ্রাজের বাকী অঞ্চলে রায়তওয়ারি প্রথা এই দুটি ব্যবস্থাই মাদ্রাজের স্থানীয় জমিদার শ্রেণীকেও বিব্রত করে তুলেছিল।

তবে নয়া জমিদার শ্রেণীর সুযোগসুবিধাগুলি অল্পকালের মধ্যেই বেশ বেড়ে গিয়েছিল। জমিদারেরা যাতে ঠিক সময় মত সরকারের প্রাপ্য খাজনা মিটিয়ে দিতে পারে তার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ জমিদারের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দিয়েছিল। জমির উপর প্রজাদের চিরস্বীকৃত অধিকার বিলোপ করে জমিদারকেই জমির মালিক করে দেওয়া হয়েছিল। এই সুযোগে জমিদারগণ প্রজাদের দেয় খাজনার হার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

রায়তওয়ারি প্রথা যেসব এলাকায় চালু ছিল সেখানেও জমিদার-প্রজা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পর প্রজাদের জমি জায়গা ধীরে ধীরে কুসীদজীবী মহাজন, বণিক্ এবং সম্পন্ন চাষীদের হাতে চলে এসেছিল। জমির অধিকার পেয়ে এরা ঠিকে

চাষী দিয়ে জমি চাষ করিয়ে নিত। ভারতের ধনাঢ্য শ্রেণীর জমি জমিদারি কেনার প্রবণতা বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে তাদের কাছে সঞ্চিত অর্থ লগ্নী করার আর অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। দেশে শিল্পোদ্যোগে টাকা খাটানোর সুযোগ না থাকার জন্যই ধনী ব্যক্তিদের জমিজমা বা জমিদারি কেনার ঝোঁক বেড়ে গিয়েছিল। জমি কেনার প্রতি এই আকর্ষণের আর একটা কারণ এই ছিল যে এই জমির স্বত্ব আবার ভাড়ায় খাটানো চলত। জমির মালিক বহু চাষী ভূমিহীন অপর এক চাষীকে খুব চড়া লাভের বিনিময়ে জমি চাষ করতে দিতে পারত, নিজের জমি না থাকায় ভূমিহীন চাষী পরের জমি চাষ করে যেটুকু পারত ভোগ করত, আর এর সিংহভাগ ভোগ করত জমির মালিক। অপরের শ্রম অর্জিত ফল বিনা শ্রমে ভোগ করার সুবিধা অনেকেই নিত। কৃষি-সংক্রান্ত সমাজ-ব্যবস্থায় জমির মালিকের ভূমিকাটি শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকাতেই প্রাধান্য পায়নি, রায়তওয়ারি এলাকাতেও 'ভূস্বামীত্ব' বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল।

জমিদারি প্রথা বেশ চালু হয়ে যাওয়ার পর পত্তনিদার অথবা মধ্যস্বত্ব-ভোগী প্রথারও উদ্ভব হয়েছিল। ঠিকা প্রজাদের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কর্ষণ-যোগ্য জমির অভাব থাকায় ঠিকা চাষীদের মধ্যে কে কোন জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করবে এই ব্যাপারে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যেত। এই সুযোগে খাজনার হারও বেশ বেড়ে যেত। জমিদার বিশেষ করে নবীন ভূস্বামী শ্রেণী তাদের নিজ এলাকার খাজনা আদায়ের অধিকার চড়াদরে অস্থায়ীভাবে 'পত্তনি' দিত। এতে তাদের বেশ লাভ থাকত, আর এই 'পত্তনি' স্বত্ব পাওয়ার জন্য লোকেরও অভাব হত না। খাজনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যাও বেড়েছিল। পত্তনিদার অনেক সময় আবার তার অধীনে একজনকে খাজনা আদায়ের স্বত্ব দিত। এই-ভাবে করদাতা চাষী ও কর-গ্রাহক গভর্নমেণ্ট বা সরকারের মাঝখানে বহু দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হয়েছিল। বঙ্গদেশে এমনও দেখা গিয়েছিল যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারীর সংখ্যা পঞ্চাশে পৌঁচেছে।

এতগুলি মুনাফা-শিকারী মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাঁই মেটাতে অসহায়

চাষী-প্রজার প্রাণান্ত হত। এদের অনেকেরই অবস্থা কেনা গোলামের মতই হয়ে উঠত।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে এই জমিদার ও ভূস্বামী শ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকা বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছিল। আশ্রিত দেশীয় রাজ্যগুলির রাজা-মহারাজাদের মত এই শ্রেণীও ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ় সমর্থক হয়ে নব-জাগ্রত জাতীয়তাবাদের বিরোধিতায় নেমেছিল। ব্রিটিশ শাসনের উপর নিজেদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে জেনে এবা ব্রিটিশ শাসনকে চিরস্থায়ী রাখার জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছিল।

কৃষির অনগ্রসরতা ও অবনতি

কৃষিকাজে প্রয়োজনের অতিবিক্ত লোকের আত্ম-নিযুক্তি, অত্যধিক করভার, জমিদারি প্রথার প্রবর্তন, চাষীদের ঋণের বোঝা এবং তাদের অত্যধিক দারিদ্র্যের কারণে কৃষিব্যবস্থার উন্নতি না হয়ে ক্রমশঃ তা অবনতির দিকেই ঝুঁকেছিল। কৃষিব্যবস্থার অবনতির কারণে প্রতি একরে ফসল ফলনের হারও খুব নেমে এসেছিল।

কৃষি-কর্মে জনসংখ্যার চাপ এবং পত্তনি প্রথার কারণে কর্ষণযোগ্য ভূমি বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ এক চাষীর ভাগে এত কম জমি পড়ত যে তার দ্বারা তার ভরণপোষণ সম্ভব হত না। অধিকাংশ কৃষকের দারিদ্র্য এত নীচে নেমে এসেছিল যে তাদের পক্ষে কৃষির কোন উন্নতিসাধন অসম্ভব হয়ে উঠত। কৃষিকার্যে উৎপাদন বাড়াতে ভাল বীজ, ভাল চাষের বলদ, সার এবং উন্নততর কৃষিপদ্ধতি যথা সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয়। গভর্নমেণ্ট অথবা ভূস্বামীর অধীন নিছক ঠিকে-প্রজাদের পক্ষে জমির উন্নতির জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কোন গরজ স্বাভাবিক কারণেই লক্ষিত হত না। একজন চাষী নিজ হাতে যে জমি চাষ করত তার উপর তার নিজস্ব অধিকার বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। কৃষির কোন উন্নতি হলে, তার সুবিধা ভোগ করত—কুসীদজীবী শ্রেণীর মহাজন অথবা শহুরে জমিদার। জমিগুলি টুকরো বা খণ্ড বিখণ্ড অবস্থায় থাকার জন্য জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করাও ছিল প্রায় অসম্ভব।

ইংলণ্ডসহ ইউরোপের দেশগুলিতে ভূস্বামীরা জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য অর্থব্যয় করত কারণ তারা জানত যে উৎপাদন বৃদ্ধি হলে শুধু চাষীই লাভবান হবে না, তারা নিজেরাও লাভবান হবে। ভারতবর্ষে পুরাতন এবং

নূতন জমিদার শ্রেণীর কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে কোন যোগই ছিল না, এরা সবাই ছিল শহরবাসী, চাষের উন্নতির জন্য এদের কোন মাথাব্যথাই ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমিদারি এলাকার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এই জমিদার-শ্রেণীর প্রজাদের সঙ্গে কোন মানবিকতার যোগসূত্রও থাকত না। এদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়। জমির উন্নতিসাধন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেয়ে এরা আয়বৃদ্ধি করার পথ হিসেবে খাজনা বৃদ্ধিই শ্রেয়ঃ মনে করত। দেশের সরকার বা গভর্নমেণ্ট স্বচ্ছন্দে কৃষি-উন্নয়ন বা কৃষিপদ্ধতি আধুনিকীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু তারা কোনদিন এই দায়িত্ব নেয়নি। ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতিক ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সরকারী রাজস্বের সিংহভাগ কৃষকদের ঘাড় ভেঙে আদায় করা হত কিন্তু এদের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ অতি অল্পই নির্দিষ্ট ছিল। চাষী এবং কৃষিব্যবস্থার প্রতি সরকারের এই বিমাতৃসুলভ আচরণের এই দৃষ্টান্ত হল পূর্ত ও কৃষিখাতে অর্থব্যয়ে কার্পণ্য। ব্রিটিশ ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রবর্তিত রেলব্যবস্থা খাতে 1905 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকারী অর্থভাণ্ডার থেকে 360 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। এই সময়সীমার মধ্যে সেচ-খাতে ব্যয় করা হয়েছিল মাত্র 50 কোটি টাকা। সেচ-ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত অর্থ-ব্যয় করা হলে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় চাষীর অশেষ উপকার সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে একমাত্র এই সেচব্যবস্থার প্রতিই সরকারী নেকনজর পড়েছিল এটা স্বীকার করে নিতে হবে।

যৎকালে পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীন কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে আধুনিক পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানো হচ্ছিল তখনও ভারতের কৃষি-ব্যবস্থায় সেই পুরাতন ধারাই বজায় ছিল, কোন নূতন ধরনের কৃষি সরঞ্জামই প্রবর্তিত করা হয়নি। এমনকি কৃষিকাজের সাধারণ যন্ত্রপাতিগুলিও শত শত বৎসরের পুরানো ছিল। 1951 খ্রীষ্টাব্দের একটা হিসেব থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে তখন দেশে ব্যবহৃত লোহার লাঙলের সংখ্যা ছিল মাত্র 930,000 হাজার, সেই জায়গায় সেকেলে ধরনের প্রায় অকেজো লাঙলের সংখ্যা ছিল 310,80 লক্ষ। রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রায় অজ্ঞাত ছিল আর গোবর, বিষ্ঠা, মৃতপশুর অস্থি প্রভৃতি জৈব সার বিনা ব্যবহারে নষ্ট হয়ে যেত। 1922-23 খ্রীষ্টাব্দে কৃষিযোগ্য জমিতে উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহারের হার ছিল 1·9% শতাংশ। 1939 খ্রীষ্টাব্দে এই হার বৃদ্ধির পরিমাণ 11%

শতাংশে উঠেছিল। কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের দিক্‌টিও সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছিল। 1939 খ্রীষ্টাব্দে কৃষি শিক্ষাদানের জন্য মাত্র ছয়টি শিক্ষাকেন্দ্র বা কলেজ ছিল, আর ছাত্রসংখ্যা ছিল 1,306 জন। বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও সিন্ধু প্রদেশে একটিও কৃষিশিক্ষাকেন্দ্র বা কলেজ ছিল না। নিজেদের চেষ্টায় কৃষক সম্প্রদায় উন্নত কৃষিবিজ্ঞান আয়ত্ত করে নেবে তারও পথ ছিল না। কারণ গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাদান অথবা সাক্ষর মানুষের সংখ্যা-বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা প্রায় অস্তিত্বহীন ছিল।

আধুনিক শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছিল যন্ত্রনির্ভর শিল্পোদ্যোগের বহুল প্রসার। 1850 খ্রীষ্টাব্দের পর বস্ত্র, পাট ও কয়লা শিল্প প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যন্ত্রযুগের সূচনা হয়েছিল বলা যেতে পারে। 1853 খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে কাউয়াসজী নানাভাই সর্বপ্রথম কাপড়ের কল খোলেন। প্রথম চটকল স্থাপিত হয়েছিল 18?5 খ্রীষ্টাব্দে রিষড়ায় (কলকাতার নিকট)। ধীরে ধীরে অথচ অবিচ্ছিন্নভাবে এই শিল্পগুলি বিস্তার লাভ করেছিল। 1879 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মোট ছাপ্পান্নটি সুতিবস্ত্র কল ছিল, এই শিল্পে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ছিল 43,000 জন। 1882 খ্রীষ্টাব্দে চটকলের সংখ্যা ছিল কুড়িটি, এর বেশির ভাগই বাঙলায় অবস্থিত ছিল, এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 20,000 জন। 1905 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাপড়-কলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল 206টি আর এতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 196,000 জন। 1901 খ্রীষ্টাব্দে ছত্রিশটিরও অধিক চটকলের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় 115,000 জন। 1906 খ্রীষ্টাব্দে কয়লা খনির কাজে প্রায় একলক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যেসব যন্ত্রচালিত শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ছিল তুলো বীজ নিষ্কাষণ, চাল, ময়দা, কাঠ চেরাই, চামড়া, পশম বস্ত্র, কাগজ, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির কল। লবণ, অভ্র, সোরা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ ব্যবহারের উপযোগী যন্ত্রও এদের মধ্যে ছিল। 1930 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে সিমেণ্ট, কাগজ, দেয়াশলাই, চিনি ও কাচ শিল্পের উন্নতি দেখা দিয়েছিল। তবে এদের উন্নতির ধারা ছিল খুব ক্ষীণ এবং এই উন্নতির পথও বাধাবিঘ্ন সঙ্কুল ছিল।

ভারতের এই শিল্পোদ্যোগের মালিকানা অথবা পরিচালন ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরাজদের কুক্ষিগত ছিল। খুব চড়ালাভের সম্ভাবনা থাকায় বিদেশী ধনিকশ্রেণী ভারতের শিল্পোদ্যোগে টাকা লগ্নী করতে উৎসাহী হত। এদেশে শ্রমিকেব মজুরির হার কম, কাঁচমাল প্রচুর পাওয়া যায় এবং তার দামও বেশ সস্তা। অধিকাংশ উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা ভারত ও তাব প্রতিবেশী দেশগুলিতে থাকায় কাটতিরও সম্ভাবনা প্রচুব ছিল। ভারতজাত চা, পাট ও ম্যাঙ্গানীজের বিশ্বব্যাপী চাহিদা ছিল। বিদেশী ধনিকদের পক্ষে স্বদেশের শিল্পোদ্যোগে অর্থলগ্নী করে এত লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত ছিল। প্রচুর লাভের সম্ভাবনা ছাড়াও আর একটি বিষয় বিদেশী ধনপতিদের ভারতের শিল্পোদ্যোগেব প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এটি ছিল ঔপনিবেশিকতাবাদী ইংরাজ সরকাব ও তার কর্মচারীদের কাছ থেকে সর্ব-বিধ সাহায্য এমনকি পক্ষপাতমূলক সুযোগসুবিধা লাভের প্রতিশ্রুতি।

ভারতের অনেকগুলি শিল্পোদ্যোগেই বিদেশী মূলধন দেশীয় সূত্রে প্রাপ্ত মূলধনকে বহুগুণে ছাপিয়ে গিয়েছিল। একমাত্র বস্ত্র শিল্পে প্রথম থেকেই ভারতীয় মূলধন বেশী ছিল। 1930-এর পর থেকে ভারতীয় উদ্যোগে চিনি শিল্পও বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতীয় ধনপতিদেব প্রথম অবস্থা থেকেই 'ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী' প্রথা ও ব্রিটিশ পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলিব তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কোন একটা শিল্পোদ্যোগে প্রবেশ করার আগে ভারতীয় শিল্পপতিদের পক্ষে ঐ শিল্পে প্রভুত্ব সম্পন্ন ইংরাজ "ম্যানেজিং এজেন্সী" বা মধ্যবর্তী পরিচালকমণ্ডলীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হত। অনেক সময় ভারতীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা ব্রিটিশ অধিকৃত বা পরিচালিত 'ম্যানেজিং এজেন্সী' সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হত। ভারতীয় শিল্পপতিদের পক্ষে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণপ্রাপ্তির সুবিধাও ছিল না, কারণ ঐ ব্যাঙ্কগুলি ছিল ব্রিটিশ ধনপতিদের মূলধনের দ্বারা সংগঠিত. কোন রকমে ঋণের ব্যবস্থা হলেও ভারতীয়দের খুব চড়া হারে সুদ দিতে হত যদিও এই সুদের চড়া হার ইংরাজ ঋণগ্রাহীদের পক্ষে প্রযোজ্য হত না, তারা অল্পহারেই ঋণের সুবিধা পেত। অবশ্য, পরে ধীরে ধীরে ভারতীয়দের নিজস্ব প্রচেষ্টায় ব্যাঙ্ক ও বীমা-ব্যবসায়ী কিছু সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। 1914 খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে আমানতি অর্থের 70 শতাংশ বিদেশী ব্যাঙ্কে লগ্নী ছিল। 1937 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এই হার 57% শতাংশে নেমে এসেছিল।

ভারতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বজায় রাখা ব্রিটিশ শিল্পোদ্যোগের পক্ষে যে সম্ভব হয়েছিল তার বহুবিধ কারণ ছিল। এই ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সঙ্গে ব্রিটেনে যন্ত্রপাতি নির্মাতা ও আমদানিকারী সংস্থা, জাহাজ, বীমা সংস্থা ও মাল বিক্রেতা সংস্থাগুলির সঙ্গে বেশ পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এছাড়াও এদের পেছনে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ভারতীয় রাজনৈতিক শ্রেণীর সমর্থনও সক্রিয় ছিল। সরকারী শাসন-ব্যবস্থাও বেশ জেনেশুনেই শিল্পোদ্যোগে ভারতীয় মূলধনের চেয়ে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগে প্রশ্রয় দিত।

সরকারী রেল-প্রশাসনও ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের চেয়ে ব্রিটিশ শিল্পোদ্যোগকে অধিকতর সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করে দিত। রেলের মাশুল ভারতীয় পণ্য চলাচলের ব্যাপারে এত চড়া হারে নির্ধারিত হত যে পরিবহনের খরচ মিলিয়ে বাজারে এই পণ্যের মূল্য চড়েই থাকত। একই ধরনের ব্রিটিশ পণ্যের চেয়ে দাম বেশী হওয়ায় ভারতীয় পণ্যের চাহিদা কমে যেত।

ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের একটা বড় ত্রুটি ছিল ভারী এবং মূলধন সৃষ্টিকারক শিল্পের অভাব (যন্ত্রপাতি, লৌহ ইত্যাদি)। এই দুটি বাদ দিয়ে কোন শিল্পোদ্যোগের স্বাধীন অগ্রগতি হতে পারে না। লোহা, ইস্পাত অথবা যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য কোন কলকারখানা ভারতে গড়ে উঠতে পারেনি। পূর্ত-সংক্রান্ত বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলতে এদেশে ছিল মাত্র কয়েকটি মেরামতি কারখানা। ধাতুশিল্প বলতে ছিল মাত্র কয়েকটি লৌহ ও পিতল ঢালাইয়ের কারখানা। ভারতে ইস্পাত তৈরী সুরু হয় 1913 খ্রীষ্টাব্দে মাত্র। দেখা যাচ্ছে যে ভারত ইস্পাত, ধাতব শিল্প, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, তৈল প্রভৃতি সম্পর্কিত শিল্পোদ্যোগে অনগ্রসর ছিল। বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ভারত পশ্চাৎপদ ছিল।

যন্ত্রনির্ভর শিল্পোদ্যোগ ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে নীল, কফি ও চা-এর মত কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন শিল্প হিসাবে বিকাশলাভ করেছিল। এই কৃষিজাত পণ্যশিল্পের মালিকানা প্রায় ইউরোপীয়দেরই একচেটিয়া হয়ে উঠেছিল। বস্ত্র-ব্যবসায়ে নীল রঞ্জন পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে নীল চাষ প্রবর্তিত হয়। এটির বেশী চাষ চলত বাঙলায় ও বিহারে। চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করতে নীলকর মালিক শ্রেণীর অত্যাচারের কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই অত্যাচারের কাহিনী বাঙ্গালী লেখক দীনবন্ধু মিত্র রচিত ও 1860 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নীলদর্পণ নাটকে যথাযথ রূপে বর্ণিত হয়েছে। কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যের আবিষ্কার হওয়ার ফলে নীলের চাহিদা কমে যাওয়াতে ধীরে ধীরে নীল চাষ ব্যবসায় ধ্বংস হয়ে যায়। 1850 খ্রীষ্টাব্দের পর আসাম, বঙ্গদেশ, দক্ষিণ ভারত এবং হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে চা-শিল্প প্রসার লাভ করেছিল। চা বাগিচাগুলির স্বত্বাধিকারী ইংরাজদের করমুক্ত জমি দিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে সরকারী তরফ থেকে সাহায্য ও উৎসাহদান করা হত। যথাকালে চা পান ভারতে বহুলভাবে প্রসার লাভ করেছিল। রপ্তানি-যোগ্য পণ্য হিসেবেও চা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এই সময়ের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে কফি চাষও প্রসার লাভ করেছিল।

চা-কফি প্রভৃতি কৃষিজ পণ্য এবং বিদেশী মালিকানাধীন অন্যান্য শিল্পোদ্যোগের প্রসারে ভারতবাসীর বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয়নি। বেতন বাবদ এই শিল্পগুলির পক্ষ থেকে যে টাকা খরচ হত তার বিপুল অংশ দেশের বাইরে চলে যেত। কারণ এই শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীগণ বিশেষভাবে যারা কোনরকম প্রযুক্তিবিদ্যামূলক কাজে নিযুক্ত থাকত তারা সবাই ছিল বিদেশী। বাগিচা মালিকেরা তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম বিদেশ থেকেই কিনে আনত। এদের উৎপন্ন পণ্যও বেশীরভাগ বিদেশেই বিক্রীত হত। বিদেশের বাজার থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আবার ব্রিটেনেই ব্যয়িত হত। এইসব শিল্প থেকে ভারতবাসীর একমাত্র লাভ ছিল এই যে কিছু অদক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হত। এইসব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি ছিল নিতান্ত অল্প। এদের চাকুরির পরিবেশও ছিল অত্যন্ত নির্মম, কাজের সময়ও ছিল খুব দীর্ঘ। চা-কফি বাগিচাগুলির শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অনেকটা ক্রীতদাসের মত।

মোটের উপর ভারতে শিল্পের অগ্রগতি বেশ সুষ্ঠু হতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে শিল্পোদ্যোগ বলতে ছিল তুলা, পাট ও চা উৎপাদন। 1930-এর মধ্যে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছিল চিনি ও সিমেন্ট। 1946 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কারখানা শ্রমিকদের 40% শতাংশ সুতি ও চটকলেই নিযুক্ত ছিল। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে আধুনিক ধরনের শিল্পোদ্যোগের অগ্রগতি বেশ নগণ্যই ছিল। অথচ এত বড় বিরাট দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে শিল্পোদ্যোগের অগ্রগতি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। বস্তুতঃ স্ব-

শিল্প বা কারিগরি শিল্পের অবনতি বা বিলুপ্তির কারণে যে অর্থনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল আধুনিক শিল্পোদ্যোগের মন্থরতা সেই অভাব পূর্ণ করতে পারেনি। জনসাধারণের অত্যধিক কৃষি-নির্ভরতা বা দারিদ্র্যও দূর হয়নি। ভারতে শিল্প বিস্তারের দৈন্য কতদূর পৌঁছেছিল তা একটা পরিসংখ্যানের সাহায্যে বোঝা যেতে পারে। 1951 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা ছিল 357 মিলিয়ন (35·7 কোটি)। এই বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে আধুনিক শিল্পের মাধ্যমে 2·3 মিলিয়ন (23 লক্ষ) কর্মসংস্থান হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে হস্তশিল্প বা কারুশিল্প 1858 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে দ্রুত বিনাশের পথে এগিয়েছিল—তা রোধ করা যায়নি। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের হিসেবে হাতের কাজের কারিগর ও যোগানদার-এর সংখ্যা 1901 খ্রীষ্টাব্দে ছিল 10·3 মিলিয়ন (130 লক্ষ); 40% শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কারিগরি কাজে নিযুক্তির সংখ্যা 1951 খ্রীষ্টাব্দে 8·8 Million (88 লক্ষে) নেমে এসেছিল। তদানীন্তন ভারত সরকার কারিগর শ্রেণীকে রক্ষা করতে কোন রকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। ইচ্ছা থাকলে, এই কারিগরি শিল্পকে আধুনিক ছাঁচে ঢেলে বেকার কারিগর শ্রেণীর কর্মসংস্থান বা পুনর্বাসন করা যেতে পারত।

ভারতে যতটুকু আধুনিক ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছিল তার পেছনে কোন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। অনেক সময় এই শিল্পোদ্যোগের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরোধিতাও দেখা যেত। ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পগুলিকে তাদের স্বার্থহানিকর বলে মনে করত। ভারতের শিল্পোদ্যোগকে কোন রকম সাহায্য না করা অথবা তাদের বিরোধিতা করার জন্য ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করা হত। কাজেই ব্রিটিশ নীতি ছিল নানা ছলে ভারতে শিল্পপ্রসারে বাধা সৃষ্টি ও তার অগ্রগতি রোধ।

এই শৈশবাবস্থাতে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের পক্ষে পৃষ্ঠপোষকতার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতে শিল্পোদ্যোগগুলির যখন সূচনা হয় তখন ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের এই শিল্পোদ্যোগগুলি বেশ উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছিল। এদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য ভারতে এবং অন্যত্র বিক্রি হত। কাজেই এই বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে দুঃসাধ্যই দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটেন সহ অন্যান্য দেশে স্বদেশের কোন নতুন শিল্পকে রক্ষা করার জন্য বিদেশী পণ্যের আমদানি চড়া হারে বহিঃশুল্ক ধার্য

করে নিয়ন্ত্রিত বা সঙ্কুচিত করা হত। ভারতবর্ষ ছিল বিদেশীর অধীন। তার শাসন-ব্যবস্থা কি হবে তা নির্ধারিত হত ব্রিটেন থেকে। এই নীতি ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হত। নিজেদের স্বদেশে বিদেশী পণ্যের আমদানি রুদ্ধ করে এই ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ ভারত সহ অন্যান্য উপনিবেশ-গুলিতে নিজেদের অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করে নিত। অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বহিঃশুল্ক বাবদ টাকা গুণে দেওয়া থেকে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা রেহাই পেত। ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে ভারত-সরকার নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় শিল্পোদ্যোগকে কোন আর্থিক সাহায্য দিত না, এমনকি কোন প্রকার সাহায্যও নয়। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ইউরোপের দেশগুলিতে এবং জাপানে সরকারী নীতি ছিল স্বদেশের নব-স্থাপিত শিল্পোদ্যোগকে উপযুক্ত সাহায্য দান। ভারতে প্রযুক্তিবিজ্ঞান-মূলক শিক্ষা বিস্তারেও ব্রিটিশ সরকার বিশেষ ঔদাসীন্য দেখিয়েছিল। প্রযুক্তি-বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার অভাব ভারতে শিল্প-অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর 1951 খ্রীষ্টাব্দ থেকে এদিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। 1939 খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশে মাত্র সাতটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। এইগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র 2,217 জন। জাহাজ, রেলওয়ে ইঞ্জিন, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন প্রভৃতি নির্মাণ প্রকল্পগুলির কাজ ভারতীয় উদ্যোগে হাতে নেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ দেশের ব্রিটিশ সরকার এইসব কাজে কোন প্রকার সাহায্য দিতে অসম্মত ছিল।

অবশেষে 1920 থেকে 1930 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং পরে ভারতের ক্রম-বর্ধমান জাতীয়তাবাদের এবং ভারতীয় শিল্পপতিদের চাপে ভারত সরকার ভারতীয় শিল্পকে কিছু রক্ষা-মূলক করের (Tariff) সুবিধা মঞ্জুর করেছিল। তবে এই ব্যাপারেও পক্ষপাত প্রদর্শন করা হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের মালিকানা ভারতীয় ও অভারতীয় তথা ব্রিটিশ এই দুই শ্রেণীরই হাতে ছিল। ভারতীয় মালিকানায় ছিল সিমেণ্ট, লৌহ ও ইস্পাত এবং কাঁচ শিল্প। এই শিল্পগুলির জন্য বিশেষভাবের রক্ষামূলক কর-নীতি প্রয়োগ করা হয়নি, যেটুকু করা হয়েছিল তা ছিল নাম মাত্র। অন্যদিকে ব্রিটিশ মালিকানাধীন কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে (যথা দিয়াশালাই) মালিকদের ইচ্ছামতই রক্ষামূলক কর নীতি প্রযুক্ত হয়েছিল। ভারতীয়দের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে দেশে ব্রিটেন-

জাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যের স্বার্থ সাধনের যুক্তিতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানিতে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল।

ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ বিকাশের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ দুর্বলতা এই ছিল যে এই শিল্পোদ্যোগ সমগ্র দেশে সুবিন্যস্ত হয়নি। এই শিল্পক্ষেত্রগুলি মাত্র কয়েকটি কয়েকটি বিশেষ নগরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হয়েছিল। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অনুন্নত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল। দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের সমৃদ্ধি ও অবশিষ্ট অঞ্চলের অনগ্রসরতা যে শুধু দেশবাসীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যই সৃষ্টি করেছিল তাই নয়, সমগ্র দেশের সংহতিও এই বৈষম্যের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুসংহত ভারতীয় জাতি সংগঠনের কাজ বেশ দুরূহ হয়ে পড়েছিল।

ভারতের শিল্পোন্নয়ন সীমিত রূপে দেখা দিলেও এই উদ্যোগ ভারতের সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তনের সৃষ্টি করেছিল। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ হয়। এর একটি হল শিল্পপতি ধনিক-শ্রেণী আর একটি হল আধুনিক শ্রমিক সমাজ, এই দুইটি পৃথক শ্রেণী ভারতের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আবির্ভূত হয়নি। তার কারণ একালের খনি, শিল্পকারখানা ও পরিবহন ব্যবস্থা আগের দিনে অনুপস্থিত ছিল।

ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে নগণ্য হলেও আধুনিক শিল্পনির্ভর শ্রেণীর মানুষেরা নতুন ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক তথা নতুন চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির বাহকের ভূমিকা নিয়েছিল। এই শ্রেণী পুরাতন ঐতিহ্য, পুরাতন আচার-আচরণ বিসর্জন দিয়ে নূতন ধরনের জীবনযাত্রার পথে পা বাড়িয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা ছিল এই যে, এই শ্রেণীর মধ্যে একটা সর্বভারতীয় বোধ জেগে উঠেছিল। কোন বিশেষ অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের কথা না ভেবে তারা নিজেদের ভারতবাসী বলেই ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিল। আধুনিক শিল্পনির্ভর দুটি শ্রেণীই নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে দেশে শিল্প বিস্তারে আগ্রহান্বিত ছিল। সংখ্যায় অল্প হলেও দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ

ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে তাদের অর্থনীতির কল্যাণে ভারতের জন-

সাধারণের ভাগ্যে শুধু তীব্র দারিদ্র্যই জুটেছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারত-বাসীর দারিদ্র্য কমেছে কি বেড়েছে এই প্রশ্ন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যত মতভেদই থাকুক না কেন, তারা সকলে অবশ্যই এটা মেনে নিত যে ব্রিটিশের শাসনকাল জুড়ে সাধারণ ভারতবাসীকে প্রায় নিত্য অনশনের মধ্যে দিনযাপন করতে হত। ব্রিটিশ শাসন ভারতে যতই বিস্তীর্ণ ও দৃঢ়মূল হচ্ছিল ভারতবাসীর পক্ষে ততই একটা বাঁচার মত কাজ বা জীবিকার উপায় খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণ, দেশীয় কারিগরি শিল্পের অবলুপ্তি এবং আধুনিক শিল্প কর্তৃক এই ক্ষতিপূরণের অক্ষমতা, সরকারের প্রাপ্য ট্যাক্সের গুরুভার, ব্রিটেনে সম্পদ চালান, কৃষি ব্যবস্থার অনগ্রসরতা ও তজ্জনিত কৃষিসমস্যা, জমিদার, মহাজন, রাজা মহা-রাজা ও বণিক্‌গণ কর্তৃক দরিদ্র কৃষক শোষণ ইত্যাদির সমাহার ভারতের সাধারণ মানুষকে ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের শেষ সীমায় ঠেলে ফেলেছিল, তাদের উন্নতির আশাও সুদূরপরাহত হয়েছিল। ঔপনিবেশিকতাকেন্দ্রিক ভারতীয় অর্থব্যবস্থা যার পর নাই দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। জনসাধারণের এই দারিদ্র্যের পরিণামস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের সর্বত্র পর পর কয়েকটি দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। প্রথম দুর্ভিক্ষটি বর্তমান উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষে দুইলক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। 1865-66 খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশা, বঙ্গদেশ, বিহার ও মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, একমাত্র ওড়িশাতেই দশলক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। 1868-70 খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে চোদ্দ লক্ষেরও অধিক মানুষের মৃত্যু হয়। এই সময়ে রাজপুতানার বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যও দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছিল। এইসব অঞ্চলে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ মানুষ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

তবে এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল 1876-78 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাদ্রাজ, মহীশূর (কর্ণাটক), হায়দ্রাবাদ, মহা-রাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল এবং পাঞ্জাব প্রদেশে। এই দুর্ভিক্ষে মহা-রাষ্ট্র ও মাদ্রাজে যথাক্রমে আট লক্ষ ও পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। মহীশূরে মৃত্যুর হার ছিল জনসংখ্যার প্রায় কুড়ি শতাংশ। উত্তর প্রদেশে মৃত্যুর হার ছিল বার লক্ষের উপর। অনাবৃষ্টির কারণে একবার 1896-97

খ্রীষ্টাব্দে এবং ঠিক তার পরেই 1899-1900 খ্রীষ্টাব্দে আবার সমগ্র ভারতে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। 1896-97 খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে সাড়ে নয় কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। ঠিক তার পরেই 1899-1900 খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে দেশে ব্যাপক দুর্গতি দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ দমনে সরকারী সাহায্য সত্ত্বেও পঁচিশ লক্ষের অধিক মানুষ অনশনে প্রাণত্যাগ করেছিল। এইসব বড় ধরনের ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ছাড়াও দেশের এখানে সেখানে আঞ্চলিকভাবে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাবের অবস্থা দেখা যেত। উইলিয়ম ডিগ্‌বি নামে এক ইংরাজ লেখকের মতে 1854 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 1901 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের কারণে 28,825,000 জন মানুষের মৃত্যু হয়। 1943 খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এই ধরনের দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত বহু লোকের প্রাণহানি থেকে বোঝা যায় যে দারিদ্র্য ও অন্নাভাব ভারতের মাটিতে কিভাবে দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র্যের বাস্তবতা বহু ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গভর্নর-জেনারেলের শাসন পরিষদের একজন সদস্য চার্লস ইলিয়ট (Charles Elliot) এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, "একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, ভারতের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের অর্ধেক মানুষ সারাবৎসর ধরে দুবেলা পেট ভরে খাওয়া যে কেমন তা জানে না।" ইম্পিরীয়্যাল গেজেটিয়ারের সম্পাদক উইলিয়ম হাণ্টার একথা মেনে নিয়েছিলেন যে, ভারতের অন্ততঃ 40 মিলিয়ন (চার কোটি) মানুষের পেট ভরে খাওয়ার সামর্থ্য নেই। অর্থাৎ এরা অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীতেও এই শোচনীয় অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি, বরং অবস্থা আরও খারাপ দাঁড়িয়েছিল। 1911 থেকে 1941 খ্রীষ্টাব্দ-এই ত্রিশ বৎসরে একজন ভারতবাসীর ভাগে প্রাপ্য খাদ্যের পরিমাণ উনত্রিংশ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্যের চরিত্র নানাভাবেই ধরা পড়ে যেত। জাতীয় আয় বিষয়ে খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ কলিন ক্লার্ক (Colin Clark) হিসেব করে দেখিয়েছেন যে 1925-34 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবাসী ও চীনাদের মাথাপিছু আয় বিশ্বের মধ্যে ন্যূনতম ছিল। একজন ইংরাজের মাথাপিছু আয় ছিল একজন ভারতীয়ের চেয়ে পাঁচগুণ বেশী। চিকিৎসা-

বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষামূলক উন্নত ব্যবস্থার অভূতপূর্ব অগ্রগতি সত্ত্বেও 1930 খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় একজন ভারতবাসীর প্রত্যাশিত গড় আয়ুসীমা ছিল মাত্র বত্রিশ বৎসর। এই সময়ে পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলির মানুষের গড় আয়ুসীমা ষাট বছরেরও অধিক দাঁড়িয়েছিল।

মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতির কৃপণতার কারণে ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থা অথবা ভারতবাসীর দারিদ্র্য ঘটেনি। এই দুর্গতি ছিল মনুষ্য-সৃষ্ট। ভারতের অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথ কাজে লাগালে এই সম্পদ ভারতের জনজীবনে সমৃদ্ধির স্রোত বইয়ে দিতে পারত। বিদেশী শাসন এবং শোষণ, এবং অনগ্রসর কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা এই দ্বিবিধ ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে একটি সমৃদ্ধ দেশের অধিবাসী হয়েও ভারতবাসীকে এই নিদারুণ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছিল।

অনুশীলনী

1. ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ভারতের অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপ বর্ণনা কর।
2. ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের উপর কি প্রভাব পড়েছিল? কিভাবে এই শাসনব্যবস্থায় ভূস্বামী শ্রেণীর প্রাধান্য গড়ে উঠেছিল?
3. ভারতে আধুনিক শিল্প বিকাশের মূল বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
4. নিম্নলিখিত বিষয়ে মন্তব্য লিখ:

   (a) প্রাচীন জমিদার সম্প্রদায়ের অবলোপ (b) কৃষি-ব্যবস্থার অনগ্রসরতা (c) আধুনিক কালে ভারতের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ।

দ্বাদশ অধ্যায়

নবভারতের অভ্যুত্থান—জাতীয়তাবাদী আন্দোলন
1858-1905

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার এবং সংগঠিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবির্ভাব দেখা দিয়েছিল। 1885 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (Indian National Congress) জন্ম হয়। এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বাধীনে ভারতবাসী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে সাহসিকতার সঙ্গে স্বাধীনতাসংগ্রামে লিপ্ত থেকে 1947 খ্রীষ্টাব্দের পনেরই আগষ্ট দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিদেশী শাসনের পরিণাম

মূলতঃ বিদেশী শাসনের সঙ্গে সংগ্রামের উদ্দেশ্যেই ভারতে আধুনিক কালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যার জন্য ভারতবাসীর মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধ স্বতঃই গড়ে উঠতে পেরেছিল। ব্রিটিশ শাসন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভাবেই ভারতে জাতীয় চেতনার উন্মেষের উপাদান এবং এর উপযুক্ত নৈতিক ও বুদ্ধিগত পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

ভারতে জাতীয়তাবাদ বিকাশের একটা মূল প্রেরণা ছিল ভারতীয় ও ব্রিটিশের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত। ইংরাজ ভারত অধিকার করেছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্য সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তারা দেশ শাসন করত, ভারতবাসীর মঙ্গলসাধনের কথা না ভেবে ব্রিটিশ জাতির স্বার্থরক্ষাই ছিল তাদের শাসননীতি। ধীরে ধীরে ভারতবাসী এটা বুঝতে পেরেছিল যে ল্যাঙ্কাশায়ার ও অন্যান্য স্থানের ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেখাই হল শাসক শ্রেণীর আদর্শ। ভারতের শিল্পী-কারিগর সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা বা শ্রীবৃদ্ধি তাদের মোটেই কাম্য নয়। বিদেশী শাসনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে ভারতবাসী সচেতন হয়েছিল। ভারত সরকার বিদেশী স্বার্থ রক্ষণে দৃষ্টি না দিয়ে ভারতবাসীর কল্যাণের দিকে মনোযোগ

দিলে ভারতের মানুষের দুঃখকষ্ট মোচন করা সম্ভব হত, এই সত্যটি বহু বুদ্ধিমান ভারতীয় ব্যক্তির পক্ষেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন হীন হয়ে উঠেছিল, আর এই অর্থনৈতিক দুর্গতিই ভারতবর্ষে জাতীয়-চেতনা সঞ্চারের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছিল। পরশাসন এবং তজ্জনিত অর্থনৈতিক হীনাবস্থা ভারতবর্ষের বৈষয়িক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছিল। দিনে দিনে অধিকতর সংখ্যায় ভারতবাসী এই পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষের সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ধীরে ধীরে আবিষ্কার করেছিল যে তাদের সকলেরই স্বার্থ বিদেশী শাসনে পদদলিত হচ্ছে। ভারতের চাষী-সমাজ বুঝে নিয়েছিল যে তার বহু পরিশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন ফসলের বেশীর ভাগ সরকারী খাজনা জোগাতেই খরচ হয়ে যায়। সরকার এবং সরকারী শাসনযন্ত্র যথা পুলিশ, আদালত, কর্মচারী সবাই জমিদার তালুকদারদের, ব্যবসায়ী মহাজনদেরই স্বার্থ দেখে থাকে। এই শ্রেণী বহু উপায়ে তাদের ঠকিয়ে নিজেদের উদরপূর্তি করে, এমনকি এদের অত্যাচারে তার নিজের চাষের জমিও হারাতে হয়। জমিদার বা মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষী রুখে দাঁড়াতে গেলেই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে পুলিশ অথবা সৈন্যবাহিনী চাষীর গলা টিপে ধরে। অত্যাচারের কোন প্রতিকার হয় না।

দেশের কারিগরশ্রেণীও তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝে নিয়েছিল যে বিদেশী শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের জীবিকার উপায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পৈত্রিক ব্যবসায় নিযুক্ত থেকে পেটের ভাত জোটানোর আর পথ নেই। তাদের বৃত্তিহীন করে দিয়ে সরকার তাদের জন্য কোন বিকল্প জীবিকার পথ করে দেয়নি।

আরও কিছুকাল পরে বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ধাঁচের কল-কারখানা খনি এবং চা কফি ইত্যাদি বাগিচায় কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণী দেখতে পেয়েছিল যে সরকারী শাসনব্যবস্থা তাদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি দেখালেও আসলে তারা সর্বব্যাপারে শিল্পপতি ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। বিদেশী মালিকানাধীন শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা অবধারিত হয়ে থাকে। শ্রমিকশ্রেণী শ্রমিক-সংগঠন গড়তে চেষ্টা করলে সরকারী শাসনযন্ত্র তাতে বাধা দিয়ে থাকে। ধর্মঘট, মালিকের অত্যাচারের

বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সরকার মালিকের পক্ষাবলম্বন করে। শ্রমিকশ্রেণী আরও বুঝে নিয়েছিলেন যে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা দূর করতে হলে দেশের শিল্পোদ্যোগ বৃদ্ধি বা অধিকতর কল-কারখানা স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শ্রমিকশ্রেণীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে বিদেশী সরকার ভারতীয় শ্রমিকের স্বার্থে শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করতে মোটেই আগ্রহী নয়। দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীন সরকারই একমাত্র এই উদ্যোগে আগ্রহী হবে।

চাষী, কারিগর ও শ্রমিক—ভারতীয় জনসমষ্টির এই তিন প্রধান শরিক্ এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দূরে থাক কোন প্রকার রাজনৈতিক অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। তাদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। দেশে যে সামান্য শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সেটা তাদের হাতের নাগালের বাইরেই থেকে গিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কোথাও বা কোন স্কুলের অস্তিত্ব শুধু নামমাত্র ছিল। সুপরিচালন ব্যবস্থা তথা সরকারী ঔদাসীন্যই এই অবস্থার জন্য দায়ী ছিল। বস্তুতঃ উচ্চশিক্ষার দ্বার দেশের সাধারণ মানুষের কাছে রুদ্ধই রাখা হয়েছিল। এই সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ছিল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীভুক্ত। তখনও পর্যন্ত উচ্চবর্ণের মানুষেরা এদের উপর সামাজিক অবিচার ও অর্থনৈতিক উৎপীড়ন অব্যাহত রেখেছিল।

উপরোক্ত তিনশ্রেণী ব্যতীত ভারতীয় সমাজের অপরাপর মানুষেরও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের মাত্রা কম ছিল না। ভারতের উদীয়মান বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সমাজ তাদের নবার্জিত আধুনিক বিদ্যার কল্যাণে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্রিটিশ শাসনকালে যে কতটা শোচনীয় হয়ে উঠেছে সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিল। পূর্বে অর্থাৎ 1857 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে শিক্ষিত সমাজ এই বিদেশী শাসনের সমর্থক ছিল তারাও ধীরে ধীরে মোহমুক্ত হয়েছিল। আগে এদের মনে এই আশা ছিল যে এই সরকার বিদেশী হলেও ভারতবর্ষকে এরা একটি আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করবে। কিন্তু এবিষয়ে ব্রিটিশের ঔদাসীন্য অচিরেই এদের পর-শাসন বিরোধী করে তুলেছিল। এদের মনে আগে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে ব্রিটিশ মূলধন তাদের স্বদেশের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে ব্রিটেনকে সমৃদ্ধ করেছে। ব্রিটিশের মূলধনের সহায়তায় ঠিক এইভাবেই ভারতেও

সমৃদ্ধি আসবে। কিছুদিন পরেই ভারতের শিক্ষিত সমাজের চোখে ধরা পড়েছিল যে ইংরাজের ভারতশাসন নীতির প্রকৃত পরিচালক হচ্ছে ব্রিটেনের ধনপতি গোষ্ঠী। এই ধনপতি গোষ্ঠী ভারতবর্ষে শিল্প-বিস্তার করতে দিতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। ভারতবর্ষের সম্পদ উৎপাদনক্ষমতা ব্যাহত করে তাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত রাখাই তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য। বস্তুতঃ এই সময় ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণই ভারতকে দিন দিন দারিদ্র্যের চরমসীমায় ঠেলে দিচ্ছিল। ভারতের শিক্ষিত-শ্রেণী এখন থেকে ভারতশাসন পরিচালনার অত্যধিক ব্যয়, প্রজাদের বিশেষতঃ চাষীদের উপর গুরুতর করভার, ভারতের দেশজ শিল্পের ধ্বংস, ব্রিটেনের স্বার্থে শুল্ক বিধিনিষেধ দ্বারা ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের অগ্রগতি রোধের চেষ্টা, শিক্ষা, সেচব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি জাতিগঠন ও জনকল্যাণমূলক এই কর্মকাণ্ডের প্রতি ঔদাসীন্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ উত্থাপন করতে সুরু করেছিল। এরা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল যে ভারতকে সম্পদ আহরণের একটি অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করাই ব্রিটেনের উদ্দেশ্য। ভারত থেকে তারা তাদের শিল্প উৎপাদনের উপযোগী কাঁচামাল নিয়ে যাবে এবং এই কাঁচামাল পণ্যরূপে ভারতের নিজস্ব পণ্য-দ্রব্যকে হঠিয়ে ভারতের বাজার দখল করে নেবে, সর্বোপরি ভারতরূপী উপনিবেশ ব্রিটিশ মূলধন লগ্নীর সুবিধাও করে দেবে। শিক্ষিতশ্রেণী আরও হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছিল যে ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যতদিন সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা সুদূর-পরাহতই থেকে যাবে। ভারতে শিল্পবিস্তারের আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হবে।

ভারত-জয়ের পর ব্রিটিশ শাসকেরা এমন একটা ভাব দেখাত যার থেকে ভারতবাসীর মনে এমনি একটা ধারণা জন্মেছিল যে তারা ধীরে ধীরে ভারত-বাসীকে স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত করে দিয়ে তাদের হাতেই ভারত শাসনের ভার ছেড়ে দেবে। রাজনৈতিক দিক্ থেকে শিক্ষিত ভারতবাসী এখন বুঝতে পেরেছিল যে এই মনোভাব ব্রিটিশের মধ্যে আর কাজ করছে না। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষদের এবং ব্রিটেনের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই খোলাখুলি-ভাবেই জানিয়ে দিয়েছিল যে ব্রিটেন ভারতের উপর তার প্রভুত্ব কখনই ছেড়ে দেবে না। সংবাপত্রে মত প্রকাশ, সভাসমিতিতে বক্তৃতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

বিষয়ে উদারনীতি অবলম্বনের পরিবর্তে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে নানা নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্মচারী ও ব্রিটিশ লেখকবৃন্দ এই মত প্রচার করা সুরু করেছিল যে ভারতবাসী গণতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থা বা স্বায়ত্ত-শাসন লাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। শাসকশ্রেণী ভারতের সাংস্কৃতিক উন্নতি বিষয়েও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করত। উচ্চশিক্ষা অথবা আধুনিক চিন্তা-ভাবনা থেকে ভারতবাসীকে বঞ্চিত রাখাই তাদের নীতি হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষে বুদ্ধি-নির্ভর শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল। মুষ্টিমেয় সংখ্যক যে সব ভারতীয় কষ্ট করে কোন রকমে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করত তাদের পক্ষে কোন চাকুরি পাওয়া কঠিন হয়ে উঠত। সামান্য যে কজনের ভাগ্যে চাকুরী জুটত তারাও দেখতে পেত যে মোটা বেতনের সম্মানজনক পদগুলি সব ইংল্যাণ্ডের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের জন্য সংরক্ষিত। ইংল্যাণ্ডের মানুষের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে তাদের সন্তানেরাই ভারতের যা কিছু ভাল তা ভোগ দখলের একমাত্র অধিকারী। এইসব কারেণে ভারতের শিক্ষিতসমাজ এবিষয়ে নিঃসংশয় হয়েছিল যে দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং বিদেশী শাসনের অবসান না হলে তাদের ভালভাবে জীবিকার্জনের কোন পথ নেই।

ভারতের উদীয়মান ধনপতি সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষকালে এতে সাড়া দেয়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে এই শ্রেণীও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিল যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনে তারাও নিপীড়িত হচ্ছে। ভারতীয় ধনিকশ্রেণী দেখেছিল যে ভারতের ব্রিটিশ সরকার তাদের ধনার্জনের পথে নিত্যনূতন বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। সরকারের বাণিজ্যনীতি, শুল্কনীতি, কর আদায় ও পরিবহন ব্যবস্থা সবকিছুই তাদের শিল্পোদ্যোগের উন্নতির পরিপন্থী। ভারতে ধনপতিদের শিল্পোদ্যোগে অর্থ নিয়োগ এবং নূতন নূতন কলকারখানা গড়ে তোলার প্রথম পর্যায়ে নানা অসুবিধা ছিল। ভারতীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্পোদ্যোগের শৈশবাবস্থায় ভারত সরকারের পক্ষে এদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা কর্তব্য ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারত সরকার কোন সাহায্যই দেয়নি, অথচ এই সরকার ও তার আমলাতন্ত্র বিদেশী ধনপতিদের শিল্পোদ্যোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে নানাবিধ সুযোগসুবিধার সৃষ্টি করে দিত। বিদেশী শিল্পপতিদের মূলধনের অভাব ছিল না। ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ প্রতিষ্ঠার সূচনা কালেই ভারতীয় শিল্পপতি-

গণকে এই পরাক্রান্ত ও প্রভূত ধনশালী বিদেশী শিল্পপতিদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দেশীয় শিল্পপতিগণ বিদেশী শিল্পপতিদের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার ব্যাপারে খুবই বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করত। 1940 খ্রীষ্টাব্দে বহু ভারতীয় শিল্পপতির এই দাবি ছিল যে সমস্ত ব্রিটিশ মূলধন এদেশ থেকে তুলে নিয়ে ব্রিটেনে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হবে। 1945 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বণিকসভার (Indian Merchants' Chamber) সভাপতি এম. এ. মাস্টার (M. A. Master) এই মর্মে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে ভারতবর্ষের মানুষ ভারতে শিল্প প্রসারের গতি রুদ্ধ হয়ে যাক্ এটাই বরং বাঞ্ছনীয় মনে করবে যদি তারা দেখতে পায় যে আবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত ব্রিটেনের বনিক্‌কুল শিল্পবিস্তারের নামে আমাদের ধনসম্পদে হরণের চেষ্টায় নেমে পড়েছে। শিল্পপতিরূপে ব্রিটিশ ধনপতিদের প্রাদুর্ভাবে ভারতবাসীকে অর্থনীতির দিক চিরকাল ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এদেশে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে, ভারতবাসী কোনদিনই স্বাধীনতার মুখ দেখতে পাবে না।

ভারতের ধনপতি সম্প্রদায় কিছু দেরীতে হলেও পরবর্তীকালে এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শাসনে তাদের শিল্প-বাণিজ্য উদ্যোগের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত থেকে যাবে। তারা এটাও হৃদয়ঙ্গম করেছিল যে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নতিসাধন স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই সম্ভব হবে নচেৎ নয়।

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, ভারতীয় সমাজের মধ্যে একমাত্র রাজা-মহারাজা—জমিদার ও ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ঐক্য ছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে, মোটের উপর এই শ্রেণী শেষদিন পর্যন্ত বিদেশী শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। তবে এই বিশেষ শ্রেণীর অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। জাতীয়-চেতনা জাতির জীবনে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করায় দেশপ্রেম দেশের বহু মানুষকেই উদ্বুদ্ধ করেছিল। বস্তুতঃ ভারতীয়দের জাতি হিসেব পদানত করে রাখা এবং জাতি বিচারে তাদের অপাংক্তেয় রূপে গণ্য করার সরকারী নীতি শ্রেণী নির্বিশেষে ভারতের প্রতিটি বুদ্ধিমান ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিকে সন্ত্রস্ত ও আত্মসচেতন করে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসকগণ বিদেশী এই বোধই ভারতবাসীর মনে বিরূপ

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। বিদেশী শাসন শাসিত জাতির মনে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটিয়ে থাকে।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসন তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে ভারতবাসীর জীবনে যে অশুভ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হয়েছিল। এই আন্দোলন যে জাতীয় রূপ নিয়েছিল তার প্রমাণ এই যে বিভিন্ন স্তর বা সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের পারস্পরিক বিভেদ বাদ-বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে বিদেশী শাসনরূপ সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল।

দেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংহতি

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসী একটি জাতি হিসেবে সংগঠিত হয়ে উঠেছিল, কাজেই জাতীয় চেতনার উন্মেষ স্বাভাবিকরূপেই ত্বরান্বিত হয়েছিল। ইংরাজেরা ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে একই ধরনের একটি প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তন করেছিল। আঞ্চলিক বা গ্রাম্য স্বনির্ভরতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটিয়ে সর্বভারতে বিস্তৃত একটি আধুনিক ধাঁচের শিল্প-বাণিজ্য পদ্ধতি তার স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। এই কারণে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বাস করলেও ভারতবাসী একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়েছিল। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই অবস্থাটা বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভারতের একাংশে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব ঘটলে ভারতের অন্যান্য অংশেও তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ খাদ্যবস্তুর অনটন অথবা মূল্যবৃদ্ধি দেখা যেত। বোম্বাই শহরের কারখানায় উৎপন্ন কোন বিশেষ পণ্যদ্রব্য সুদূর উত্তরে অবস্থিত লাহোর অথবা পেশোয়ার শহরে বিক্রি হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সচরাচর এই ব্যাপার ঘটত না। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে মাদ্রাজ, বোম্বাই বা কলকাতার ধনপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রা গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ কৃষকের সঙ্গে একই সূত্রে জড়িয়ে পড়েছিল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাম ও সংহত ডাকব্যবস্থা এক অঞ্চলের মানুষকে আর এক অঞ্চলের মানুষের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। এইসব যোগাযোগ ব্যবস্থার দৌলতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসী জনগণের মধ্যে মেলামেশা বা মত বিনিময়ের সুযোগ অবারিত হয়েছিল। বিশেষভাবে এক অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় মানুষের

পক্ষে অন্য অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় মানুষদের সঙ্গে পরামর্শ বা আলাপ আলোচনার সুযোগও উপস্থিত হয়েছিল।

এক্ষেত্রেও বিদেশী শাসন দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে প্রেরণা দিয়েছিল। দেশের সর্বত্রই মানুষ দেখতে পেত যে তারা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বাস করলেও একই শত্রুর দ্বারা নিপীড়িত—এই শত্রু ব্রিটিশ-রাজ বা ব্রিটিশ-শাসন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনাই দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে সকলের মনে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করে দিয়েছিল।

পাশ্চাত্য ভাবধারা ও শিক্ষা

উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা প্রচারের ফলে ভারতের বহু মানুষের মনে আধুনিক যুগোচিত যুক্তিবাদী, ধর্ম-নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী চিন্তা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। ভারতের শিক্ষিত-সমাজ সমকালীন ইউরোপীয় জাতিগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিষয় অধ্যয়ন করে এই জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রবহমান জাতীয় আন্দোলন ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বদেশে অনুরূপ কর্মধারা অনুসরণের প্রেরণাও জুগিয়েছিল। রুশো, (Rousseau), পেইন (Paine), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এবং অন্যান্য কয়েকজন পাশ্চাত্য চিন্তাবিদকে ভারতের শিক্ষিতসমাজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। অর্থাৎ এই পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দের ভাবধারার সাহায্যেই ভারতের শিক্ষিতসমাজের রাজনৈতিক চিন্তা জাগ্রত বা পরিপুষ্ট হয়েছিল। মাৎসিনি, গারিবল্ডি ও জাতীয়তাবাদী কয়েকজন আইরিশ নেতা ভারতের শিক্ষিতসমাজের কাছে আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

পরাধীনতার গভীর গ্লানি সর্বপ্রথম এই শিক্ষিতসমাজ কর্তৃকই অনুভূত হয়েছিল। আধুনিক চিন্তায় অভ্যস্ত এই সমাজের কাছে বিদেশী শাসনের অবশ্যম্ভাবী অশুভ পরিণামের বিষয়টি ধরা পড়ে যেতে বিলম্ব হয়নি। এরা একটি ঐক্যবদ্ধ, আধুনিক, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে তোলার প্রেরণা মনের মধ্যে অনুভব করতে পেরেছিল। কালে কালে এই শ্রেণীর মানুষদের মধ্য থেকেই জাতীয় আন্দোলনের সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের উদ্ভব হয়েছিল। এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে শুধু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কারণেই জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব হয়নি, ব্রিটিশ ও ভারতীয় স্বার্থের সংঘাতেই এই

আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা সুশিক্ষিত ভারতীয় সমাজ পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল এবং তাকে আধুনিক রাজনীতিসম্মত গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত করেছিল। সুতরাং ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকেই জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল একথা সত্য নয়। বস্তুতঃ স্কুল ও কলেজগুলিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিদেশী শাসনের প্রতি অনুগত ও বাধ্য থাকাব শিক্ষাদানেরই চেষ্টা করত। আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে স্বদেশ-চিন্তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশে যথা চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় এবং আফ্রিকার সর্বত্র আধুনিক ধরনের স্কুল কলেজের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও আধুনিক এবং জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ দেখা গিয়েছিল।

আধুনিক শিক্ষার কারণে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির সমতা এসে গিয়েছিল। এই বিষয়ে ইংরাজী ভাষা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই ভাষার মাধ্যমেই ভারতবাসীর সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় সাধিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকলেও ইংরাজী ভাষা তাদের মধ্যে মত-বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। তবে মনে রাখতে হবে যে দেশের মধ্যে একটি সাধারণ ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত যে অভূতপূর্ব ঘটনা ছিল তা নয়। অতীতে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের মধ্যে যোগাযোগের একটি ভাষা অবশ্যই ছিল। সেই ভাষা ছিল—সংস্কৃত। পরবর্তীকালে ফার্সী তার স্থান কিছুটা অধিকার করেছিল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইংরাজী মোটেই অপরিহার্য ভাষা ছিল না। এশিয়ার অন্যান্য দেশে যথা চীনে ও জাপানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ঐ দেশের মাতৃভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ সাধারণ মানুষের কাছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে ইংরাজী ভাষা প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করেছিল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নগরবাসী ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীর মধ্যে একটি বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলেছিল। যেসব দেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তাধারা প্রচারের ব্যবস্থা ছিল সেই দেশগুলির জন-সাধারণ অতি দ্রুত ভারতের জনসাধারণের চেয়ে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। ইংরাজীভাষা শিক্ষার মাধ্যম থাকার জন্য নগরাঞ্চলের মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই শিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। ইংরাজী

ভাষাকে একমাত্র শিক্ষা মাধ্যম ধার্য রাখার কুফল সম্বন্ধে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে বিলম্ব হয়নি। দাদাভাই নৌরোজী, সৈয়দ আহম্মদ খান্, বিচারপতি রানাড়ে থেকে তিলক ও গান্ধীজী পর্যন্ত মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর মর্যাদা দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। বস্তুতঃ আধুনিক চিন্তার সঙ্গে ভারতের সাধারণ মানুষের পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে নয়। ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে এই ভাষাগুলির সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই সাহিত্য পাঠ এবং সেই সঙ্গে জনপ্রিয় দেশীয় সংবাদপত্র পাঠের কল্যাণেই জন-সাধারণের সঙ্গে আধুনিক চিন্তা বা ভাবধারার পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল। তবে ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষা-নীতি সর্বভারতে ইংরাজী ভাষাকে একটি যোগসূত্রের ভাষারূপে গড়ে তোলার অতিরিক্ত আর একটি সুফল প্রসব করেছিল। ইংরাজেরা সর্বভারতে একই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রেখেছিল। সর্বভারতে স্কুল ও কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলি একই ধরনের হওয়াতে ছাত্রদের মধ্যে একই ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তার লাভ করত। এর ফলে ভারতের সর্বত্রই শিক্ষিত সমাজে মতামত, অনুভূতি, আশা-আশঙ্কা ও আদর্শ একই ধরনে গড়ে উঠত।

সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ভূমিকা

জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে যে স্বদেশপ্রেম ও আধুনিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং সর্বভারতীয় চেতনা দেশবাসীর মধ্যে প্রসার লাভ করেছিল তার প্রধান বাহনের ভূমিকা নিয়েছিল সংবাদপত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী অনেকগুলি সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছিল। এই সংবাদপত্রগুলির স্তম্ভে সরকারী কাজ-কর্মের সমালোচনা করা হত, দেশবাসীর অভিমত তুলে ধরা হত, জন-সাধারণের কাছে একতাবদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বান জানান হত। স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র, দেশে শিল্পবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে জনমত জাগ্রত করা হত। এই সংবাদপত্রের মাধ্যমেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তবাসী জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত বিনিময় ঘটত। তখনকার দিনের জাতীয়তাবাদী কতকগুলি প্রধান সংবাদপত্রের নাম—হিন্দু প্যাট্রিয়ট, অমৃতবাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান মিরর, বেঙ্গলী, সোম প্রকাশ ও সঞ্জীবনী—এইগুলি ছিল বঙ্গদেশ থেকে প্রকাশিত। বোম্বাই থেকে

প্রকাশিত হত রাস্ত গফতার, দি নেটিভ্ ওপিনিয়ন, ইন্দুপ্রকাশ ও মারাঠা এবং কেশরী। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হত—হিন্দু, স্বদেশমিত্র, অন্ধ্র প্রকাশিকা ও কেরল পত্রিকা। উত্তর প্রদেশ বা তদানীন্তন সংযুক্ত প্রদেশ থেকে প্রকাশিত হত- এড্ভোকেট্ হিন্দুস্তানী ও আজাদ। পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ছিল ট্রিবিউন, আখ্বরই আম্ ও কোহিনূর।

জাতীয় ভাবধারা প্রচারে এইযুগে লিখিত উপন্যাস, প্রবন্ধ ও স্বদেশপ্রেম উদ্দীপক কাব্য কবিতাগুলিরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলাভাষায় বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসমীয়ায় লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, মারাঠী ভাষায় বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুনকর, তামিল ভাষায় সুব্রহ্মণ্যভারতী, হিন্দীতে ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র, উর্দু ভাষায় আলতাফ্ হুসেন হালি প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অতীত ভারতের ঐতিহ্য সন্ধান

বহু ভারতীয় মানুষ হীনাবস্থায় পড়ে তাদের আত্মবিশ্বাস একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল। তারা যে কোন দিন স্বাধীন হয়ে দেশের শাসনকার্যের ভার নিতে পারবে এ বিশ্বাস তাদের ছিল না। বহু ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও অন্যান্য ইংরাজ লেখক তাদের রচনায় প্রায়ই লিখতেন যে অতীতে ভারতীয়েরা কখনই নিজেদের শাসন করেনি, হিন্দু মুসলমানে অবিরত লড়াই চলত। অপরের অধীনে থাকার জন্যই ভারতীয়দের সৃষ্টি। ভারতবাসীর ধর্ম, সামাজিক অবস্থা সবই নীচুস্তরের। মোটের উপর ভারতবাসী এত অসভ্য যে তারা গণতন্ত্র অথবা স্বাধীনতায় অনুপযুক্ত। বহু জাতীয় নেতা এই ধরনের প্রচারের বিরোধিতা করে জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা চালাতেন। এঁরা গর্বের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চিত্র দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতেন। ভারতের রাজনৈতিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে এদের কাছে অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্র-মাদিত্য এবং আকবরের বিষয় তুলে ধরা হত। বহু ভারতীয় ও ইউ-রোপীয় লেখক এই সময় অতীত ভারতের চারুকলা, স্থাপত্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিষয়ে তথ্য আবিষ্কার করে এই তথ্যগুলি পুস্তক বা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দের জনসাধারণের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় এই রচনাগুলি প্রভূত সহায়তা দিয়েছিল। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি এই বিষয়ে

কিছু বাড়াবাড়ি রকম গর্ববোধ জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। অতীত ভারতের সামাজিক দোষত্রুটি ও দুর্বলতার দিকগুলির সমালোচনা না করে এঁরা অতীতের সবকিছুকেই আদর্শস্থানীয় রূপে দেখাতে চাইতেন। মধ্যযুগীয় ভারতে বহু বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ঘটনাগুলি উপেক্ষা করে শুধু প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য নিয়ে মাতামাতির ফল শুভকর হয় নি। এর জন্য হিন্দুসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। হিন্দু-সমাজ তাদের অতীত ঐতিহ্য নিয়ে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠেছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতের মুসলমান সমাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাব জেগে উঠেছিল। পাল্টা হিসেবে, মুসলমান সমাজ তুর্কী ও আরব জাতির ইতিহাস থেকে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেরণা সংগ্রহ করতে চেষ্টিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসী প্রভাবের সম্মুখীন হবার চেষ্টায় বহু ভারতীয় মানুষ একথা ভুলেই যেত যে সংস্কৃতির দিক থেকে পাশ্চাত্যের তুলনায় তাদের অনগ্রসরতা বর্তমান রয়েছে। একটা মিথ্যা গর্ববোধ এবং আত্মতুষ্টির ফলে এরা নিজেদের সামাজিক দোষত্রুটিগুলি সম্বন্ধে অনবহিতই থেকে গিয়েছিল। এই আত্মতুষ্টি ও বৃথা গর্ববোধ ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পক্ষে হানিকর প্রমাণিত হয়েছিল। বহু মানুষ বাইরের জগৎ থেকে আগত শুভদায়ক ভাবনাচিন্তার সঙ্গে একাত্ম না হয়ে কূপমণ্ডুকের মত জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছিল।

শাসকশ্রেণীর জাতিগত ঔদ্ধত্য

ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা উন্মেষের মূল না হলেও তার অন্যতম কারণ ছিল ভারতবাসীর প্রতি বহু ইংরাজের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ। এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের উৎস ছিল ইংরাজের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান। বহু ইংরাজ প্রকাশ্যেই এমনকি শিক্ষিত ভারতীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গেও অপমানজনক ব্যবহার করত, এমনকি দৈহিকভাবেও লাঞ্ছনা করত। এই জাতিগত ঔদ্ধত্য ও শ্রেষ্ঠতার অভিমানের কুৎসিত রূপটি ইংরাজের সঙ্গে কোন ভারতীয়দের বিবাদের ক্ষেত্রে বেশ ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠত। ভারতীয় সংবাদ-পত্রগুলিতে প্রায়ই এই ধরনের সংবাদ দেখা যেত যে কোন ইংরাজ কোন ভারতীয়কে আঘাত করার ফলে শেষোক্তের প্রাণহানি হয়েছে এবং আদালতের বিচারে হত্যাকারী ইংরাজকে বেশ লঘু দণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই দণ্ড

ছিল বহুক্ষেত্রে নামমাত্র কিছু জরিমানা। এই যে বিচারের প্রহসন অভিনীত হত তার কারণ শুধু বিচারক এবং আইন-শৃঙ্খলার রক্ষকদের সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্বই ছিল না, এর মূল কারণ ছিল ইংরাজের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার তথা ভারতীয় বিদ্বেষ। 1864 খ্রীষ্টাব্দে জি. ও. ট্রিভেলিয়েন (G. O. Trevelyan) লিখেছিলেন যে "আমাদের একজন মাত্র দেশবাসীর (অর্থাৎ ইংরাজ) প্রদত্ত সাক্ষ্যকেই আদালতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, বহু হিন্দু সাক্ষী বিপরীত সাক্ষ্য দিলেও তাকে আদালত কোন গুরুত্ব দেয় না। একজন বিবেচনাহীন লোভী ইংরাজের পক্ষে কতদূর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠার সুযোগই না এই বিচার-ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকে।"

জাতি, ধর্ম, শ্রেণী ও অঞ্চল নির্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রই ইংরাজের এই ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের শিকারে পরিণত হয়েছিল। যে কোন অবস্থারই হক না কেন, কোন ভারতীয়ের কোন ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত 'ক্লাবে' প্রবেশাধিকার ছিল না। কোন ইউরোপীয় যাত্রী থাকলে ট্রেনের সেই কামরায় কোন ভারতীয় যাত্রীকে টিকিট থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণ করতে দেওয়া হত না, এমন ঘটনাও ঘটত। অপমানিত ভারতবাসী এ ধরনের ঘটনাগুলিকে সমগ্র জাতির অপমানরূপে গ্রহণ করে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণ নিজেদের ঐক্যসূত্র স্থাপনে যত্নবান হয়েছিল।

আশু প্রতিক্রিয়া

1870 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ভারতে জাতীয়তাবাধ যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার বিরাট ভূমিকা রয়েছে এটা বোঝা গিয়েছিল।

তবে এই জাতীয়-জাগরণের বহিঃপ্রকাশ তথা একটি সংগঠনরূপে তার আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে পৃষ্ঠভূমির প্রয়োজন ছিল সেটি জুগিয়ে দিয়েছিল লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা এবং ইলবার্ট বিল কেন্দ্রিক তর্ক-বিতর্ক।

লর্ড লিটনের ভাইসরয় বা গভর্নর-জেনারেল রূপে কার্যকালে 1876 থেকে 80 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেনের কাপড়ের কলের মালিকদের খুসী করার জন্য বিলাতী বস্ত্র আমদানির জন্য যে শুল্ক ধার্য ছিল তা রহিত করা হয়। এই ঘটনা থেকে ভারতবাসী বুঝতে পেরেছিল যে ভারতে নবজাত অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করার জন্যই বিলাতী বস্ত্রের আমদানিশুল্ক তুলে

নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় দেশব্যাপী ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় ভারতীয় রাজস্ব থেকে নির্বাহিত হয়েছিল। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মহল থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছিল। 1878 খ্রীষ্টাব্দের অস্ত্র আইনে ভারতীয়দের কাছ থেকে অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ভারতবাসী এর মধ্যে ব্রিটিশের গূঢ় অভিসন্ধি যে সমগ্র ভারত-বাসীকে ক্লীবে পরিণত করা এটা বুঝতে পেরে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। 1878 খ্রীষ্টাব্দের দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র দমনের আইনটির উদ্দেশ্য যে বিদেশী গভর্নমেণ্টের সমালোচনার সুযোগ নষ্ট করা এটাও দেশবাসী বেশ হৃদয়ঙ্গম করে এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। সমগ্র দেশ যখন এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে বিপন্ন ঠিক সেই সময়ে দিল্লীতে রাজকীয় আড়ম্বর সহকারে একটি দরবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দেশের মানুষের এই বিপদের সময় এই দরবার উৎসব থেকে দেশবাসী বুঝে নিয়েছিল যে বিদেশী প্রভুরা ভারতবাসীর অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাতে মোটেই বিচলিত হয়নি। তাদের কাছে ভারতবাসীর জীবনের কোন গুরুত্বই নেই। 1877 খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সিভিল সারভিস্ পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা একুশ থেকে নামিয়ে উনিশ করে দেওয়া হয়েছিল। পূর্বব্যবস্থা চলাকালেই ভারতীয় পরীক্ষার্থীদের পক্ষে ইংরাজ পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা খুব দুরূহ ছিল কারণ এই পরীক্ষা ইংলণ্ডে গৃহীত হত এবং এর মাধ্যম ছিল ইংরাজী ভাষা। এখন এই নূতন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের পক্ষে ইণ্ডিয়ান সিভিল সারভিসে প্রবেশ লাভের সম্ভাবনা বেশ ভালভাবেই হ্রাস পেয়েছিল। ভারতেন মানুষ এখন বেশ বুঝে নিয়েছিল যে প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত সব উচ্চ-বেতন ও মর্যাদাপূর্ণ চাকুরিগুলি ইংরাজেরা একচেটিয়াভাবে দখলে রাখতে চায়। ভারতীয়েরা উচ্চপদে আসীন থাকুক এটা ভারতের বিদেশী সরকারের অভিপ্রেত নয়।

উপরোক্ত ঘটনালীর জন্য লর্ড লিটনের শাসনকালে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জনমত বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ভারতের জনসাধারণকে তাদের অত্যন্ত জড়তা থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল, এই আঘাতে

জনগণ তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে একজন দুষ্ট শাসক ছদ্মবেশী বন্ধুর কাজই করে থাকে। এই দুষ্ট শাসকের অত্যাচারমূলক শাসন অত্যাচারিত মানুষদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। বহুদিনব্যাপী আন্দোলন যে ঈপ্সিত লক্ষ্য সাধন করতে অপারগ হয় সেখানে অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার জনজাগরণের কাজটি দ্রুত ফলপ্রসূ করে দিয়ে থাকে।"

লর্ড লিটনের অপশাসনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষানল জেগে উঠেছিল সেটা যেন ধিকি ধিকি করে জ্বলেছিল। তবে এই আগুন ইলবার্ট বিল বিতর্ককালে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। 1883 খ্রীষ্টাব্দে লিটনের উত্তরাধিকারী লর্ড রিপন এমন একটি আইন প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন যে আইনের বলে কোন ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ বা দায়রা জজের ফৌজদারী মামলায় ইউরোপীয় আসামীদেরও বিচার করার অধিকার থাকবে। ইতিপূর্বে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির বিচারের অধিকার কোন ভারতীয় বিচারপতিকে দেওয়া হত না। কোন ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারের অধিকার ভারতীয়দের থাকবে না এই আইন, জাতিবৈষম্য চিন্তা ইংরাজদের যে কতদূর আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তবে তখনকার কালে এটা এমন কিছু একটা গুরুতর ব্যাপার বলে মনে করা হত না। প্রচলিত আইনে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসভুক্ত কোন ভারতীয় বিচারকের আদালতে ও ইউরোপীয় অভিযুক্তের বিচারের অধিকার ছিল না। গভর্নর-জেনারেলের শাসন পরিষদের আইন বিষয়ক সদস্য (ল' মেম্বার) মিঃ ইলবার্ট ইউরোপীয় অভিযুক্তদের বিচারের অধিকার ভারতীয়দের থাকবে না এইরূপ একটি বিসদৃশ আইন তুলে দিয়ে একটি আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এঁর নামানুসারে বিলটি ইলবার্ট বিল নামে খ্যাত হয়েছিল। এই বিলটি প্রস্তাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যে তুমুল প্রতিবাদ ও আন্দোলন জেগে উঠেছিল। এরা ভারতবাসীর সংস্কৃতি ও চরিত্র নিয়ে তীব্র নিন্দা ও গালাগালির ঝড় বইয়ে দিয়েছিল। এরা বলতে চেয়েছিল যে ভারতবাসীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিও একজন ইউরোপীয় অভিযুক্তের বিচার-কাজের অনুপযুক্ত। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এই প্রস্তাবিত আইনের প্রবর্তক বড়লাট লর্ড রিপনকে বলপূর্বক অপহরণ করে ইংলণ্ডে চালান করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

হয়েছিল। এই প্রবল প্রতিবাদের মুখে ভারত সরকার এই বিলটি তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ইলবার্ট বিলের সমালোচনায় ভারতের ইউরোপীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ-জাতিত্বের অহমিকা ও ভারত-বিদ্বেষের যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছিল ভারত-বাসীকে তা স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ অধীনতা তাদের জাতীয় মর্যাদাকে যে কত অবনত করে রেখেছে এতদিনে ভারতবাসী সে সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা লাভ করেছিল। ইলবার্ট বিল যাতে আইনে পরিণত হতে পারে তার জন্য সর্বভারতব্যাপী অভিযান বা প্রচার চালানো হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে সবচেয়ে বেশী লাভ হয়েছিল যে তারা এর থেকে একটা প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছিল। এই শিক্ষা ছিল এই যে, তাদের দাবি সরকারকে দিয়ে মানিয়ে নিতে হলে সর্বভারতীয় স্তরে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে এবং একটা সম্মিলিত উদ্যোগ সহকারে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম বা আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রজ প্রতিষ্ঠানসমূহ

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে একটা সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য 1885 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনেল কংগ্রেস বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা হয়। তবে ইতিপূর্বে অনুরূপ কয়েকটি সংস্থাও সংগঠিত হয়েছিল।

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্ব-প্রথম রাজা রামমোহন রায় ভারতে রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন। আধুনিক ভারতে বেসরকারিভাবে দেশসেবার উদ্দেশ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তার মধ্যে সর্বাগ্রে ভূস্বামী সভার (Land Holders' Society) নাম উল্লেখযোগ্য। 1837 খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সভা বাংলা, বিহার ও ওড়িশার জমিদারদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তবে এই সভার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক ছিল না, এটি জমিদার বা ধনী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল। এর পর 1843 খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্ভব হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের স্বার্থ-রক্ষা ও তাদের কল্যাণসাধন। এই দুটি প্রতিষ্ঠান 1851 খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নাম ধারণ করেছিল। এইভাবে 1852 খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ নেটিভ্ এসোসিয়েশন ও বোম্বাই এসোসিয়েশন নামের

প্রতিষ্ঠানগুলিও স্থাপিত হয়েছিল। ছোটখাট আরও এমনি অনেক স্বল্প-খ্যাত প্রতিষ্ঠান ভারতের নানা স্থানে গড়ে উঠেছিল। সৈয়দ আহম্মদ খান্ সাইন্টিফিক্ সোসাইটি বা বিজ্ঞানচর্চা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর ভারতীয়দের আধিপত্য ছিল। এরাই ছিল তখনকার দিনের 'বিশিষ্ট পুরুষ'। এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব একটি প্রদেশ বা অনেক সময় একটি নগরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এইসব প্রতিষ্ঠান-গুলির কর্মসূচী ছিল প্রশাসনিক সংস্কার, প্রশাসনে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগ ও শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি। ভারতীয়দের নানা দাবি পূরণের জন্য এরা ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে বড় বড় দরখাস্ত বা আবেদনপত্র প্রেরণ করত।

1858 খ্রীষ্টাব্দের পর শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ ও সরকারী প্রশাসনের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষিত ভারতবাসী এতদিনে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ এবং এই শাসনের ফলে ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরে দিন দিন ব্রিটিশের ভারত শাসননীতির সততা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই সময় থেকে কর্তৃপক্ষের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর ভারতবাসীর লক্ষ্য নিবদ্ধ হয়েছিল। ভারতবাসীর এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে প্রেরণা দিয়েছিল। তবে দেশে এ যাবৎ যে কয়েকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, রাজনীতি সচেতন ভারতীয়গণ তাদের উপর একান্তভাবে নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত মনে করেনি।

1866 খ্রীষ্টাব্দে দাদাভাই নওরোজি লণ্ডনে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের অবস্থার পর্যালোচনা এবং ভারতের অবস্থার উন্নতি-কল্পে ব্রিটেনে জনমত গঠন। পরে তিনি ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলি-তেও ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের শাখা স্থাপন করেন। দাদাভাই নওরোজির জন্ম হয় 1825 খ্রীষ্টাব্দে। জাতীয় আন্দোলন সংগঠনের জন্য তিনি সমগ্র জীবন ব্যাপী পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁকে লোকে "ভারতের চমৎকার বৃদ্ধ মানুষ" (Grand old man of India) বলেই জানত। ভারতের অর্থনীতি-চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রদূত। তাঁর অর্থনীতি-বিষয়ক রচনাগুলিতে তিনি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতের দারিদ্র্যের মূল কারণ হল, ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতের অর্থশোষণ এবং এই অর্থ স্বদেশে প্রেরণ। দেশ-বাসী বার বার তিনবার দাদাভাইকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি

নির্বাচিত করে তাঁর প্রতি তাদের সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। ভারতের জনপ্রিয় জাতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকের মত তাঁর নামও দেশের মানুষের মনে গভীর শ্রদ্ধা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করত।

বিচারপতি রাণাড়ে কয়েকজন সহযোগীর সহযোগিতায় 1870 খ্রীষ্টাব্দে পুনে শহরে 'সার্বজনিক সভা' স্থাপন করেন। 1881 খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে 'মহাজনসভা' ও 1885 খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসন' প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপক (Legislative) সংস্থাগুলির সমালোচনা এই প্রতিষ্ঠানগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল। বিচারপতি রাণাড়ের পরিচালনায় পুনা সার্বজনিক সভার উদ্যোগে একটি ত্রৈমাসিক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হত। এই পত্রিকাটি শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের কাছে খুবই শিক্ষাপ্রদরূপে বিবেচিত হত। ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এই পত্রিকাটিতে অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে আলোচিত হত।

প্রাক্-কংগ্রেস যুগের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী ছিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা ভারত-সভা। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের তরুণ জাতীয়তাবাদী সদস্যবৃন্দ এই প্রতিষ্ঠানের রক্ষণশীল ও জমিদারি স্বার্থরক্ষা প্রবণতায় ধীরে ধীরে এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। শুধুমাত্র একশ্রেণীর নয় সর্বস্তরের দেশবাসীর স্বার্থে স্থায়ী রাজনৈতিক আন্দোলন এই তরুণ নেতাদের অভীষ্ট ছিল। এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি উচ্চশ্রেণীর বাগ্মী ও লেখক ছিলেন। এঁকে অন্যায়ভাবে ভারতীয় সিভিল সারভিসের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তার কারণ সুরেন্দ্রনাথের উচ্চতন কর্তাব্যক্তিরা সিভিল সার্ভিসে তাঁর মত একজন স্বাধীন-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ভারতীয়কে বরদাস্ত করতে পারেনি। কলকাতার ছাত্র-সমাজে জাতীয় চেতনা উদ্দীপক বক্তৃতাদানের মধ্য দিয়ে 1875 খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের জনসেবামূলক জীবনের সূত্রপাত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে 1876 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাঙলার তরুণ জাতীয়তাবাদীগণ 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন। সমগ্র দেশের রাজনৈতিক সমস্যাগুলি বিষয়ে জনমত সংগঠন এবং একই রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা সূত্রে সমগ্র ভারতে উপযুক্ত কর্মপ্রণালী অনুসরণ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের পতাকাতলে বহুসংখ্যক দেশবাসীকে সম্মিলিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের

সদস্যদের দেয় চাঁদার হার খুব কম হারেই ধার্য ছিল। কোন দেশবাসী চাঁদা দেওয়ার সামর্থ্যের অভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হবে না, এটা এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ মোটেই চায়নি।

এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার পর সর্বাগ্রে এই প্রতিষ্ঠান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নূতন নিয়মকানুন রদ তথা পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা কম ধার্য করার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেছিল। 1877-78 খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। নব প্রচলিত অস্ত্র-আইন, দেশীয় সংবাদপত্রের অধিকার সঙ্কোচ এবং প্রজাদের উপর জমিদার শ্রেণীর জুলুম রোধ প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়েও 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' আন্দোলন চালিয়েছিল। 1883-85 খ্রীষ্টাব্দে 'খাজনাআইন' (Rent-Bill) যাতে কৃষক-সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী না হয় তার জন্য 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' সহস্র সহস্র কৃষক-সমাবেশ ও বিক্ষোভ-প্রদর্শনের আয়োজন করেছিল। ইংরাজের মালিকানাধীন চা-বাগিচায় শ্রমিকদের উপর অপরিসীম অত্যাচার করা হত। এদের অবস্থা ছিল প্রায় ক্রীতদাসদের অবস্থার মত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এই চা-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্যও আন্দোলনে নেমেছিল। কলকাতার বাইরে বাঙলার বহু শহরে ও গ্রামে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এমনকি বাঙলার বাইরে ভারতের কোন কোন শহরেও এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভারতের জনজীবনে এই সময়ে একটা নূতন চেতনা এসেছিল। জাতীয় ভাবনায় অনুপ্রাণিত নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একই মঞ্চ থেকে বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নেওয়ার মত যে কয়েকটি সংস্থা ছিল তারা তাদের কর্তব্য পালন অবশ্যই করেছিল কিন্তু তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ এবং কর্মশক্তিও ছিল পরিমিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ স্থানীয় সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকত, এদের সদস্যত্ব ও নেতৃত্বও একটা বিশেষ শহর বা প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি ভারত-সভা বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও একটা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি।

এই ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে 1883 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের উদ্যোগে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের (All

India National Conference) আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে বাঙলার বাইরে থেকেও কিছু নেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সম্মেলন যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল সেটা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচির অনুরূপই ছিল। সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন 1886 খ্রীষ্টাব্দে তার পৃথক সত্তা বিসর্জন দিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল। কারণ এই National Conference প্রতিষ্ঠানটি দেশের সকল অংশের রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের রূপ গ্রহণ করতে পারেনি।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress)

বহু ভারতীয়ের মনে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার সঙ্কল্প জেগে উঠেছিল। তবে এই সঙ্কল্পটিকে বাস্তবে পরিণত করার কৃতিত্ব এ. ও. হিউমের প্রাপ্য। হিউম (A. O. Hume) ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী। হিউম বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সহযোগিতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। এই প্রথম অধিবেশন 1885 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বাহাত্তর জন প্রতিনিধি বা (ডেলিগেট) এই সম্মেলনে যোগদান করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নলিখিত :

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রী, জাতি-ধর্ম-অঞ্চল নির্বিশেষে সমস্ত ভারতের মানুষের মধ্যে এক-জাতীয়তার মনোভাব সঞ্চারও এই ভাবের পরিপুষ্টি সাধন, জনসাধারণের সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণ এবং এই সমস্যা দূরীকরণের দিকে শাসন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ, সর্বোপরি দেশে জনমত সংগঠন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টিতে হিউমের আগ্রহের আর একটি কারণ ছিল। দেশে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছিল। হিউম জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি করে এই অবরুদ্ধ অসন্তোষ প্রকাশ করার একটা পথ খুলে দিতে চেয়েছিলেন। বাষ্প নির্মাণ পাত্রের একটি যন্ত্র আপনা থেকে খুলে গিয়ে বাষ্পের অতিরিক্ত চাপ কমিয়ে দেয়, এর ফলে বাষ্প নির্মাণ যন্ত্রটি বাষ্পের অতিরিক্ত চাপে বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। আপনা থেকে খুলে

গিয়ে বাষ্পের চাপ কমিয়ে দেওয়া যন্ত্রটিকে 'সেফ্‌টি ভাল্‌ভ' বলা হয়, হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে ব্রিটিশরাজের সেফ্‌টি- ভালভে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেসের আবির্ভাবের মাত্র কিছুকাল আগে 1879 খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যদের রসদ সরবরাহকারী বিভাগের বাসুদেব বলবন্ত ফাড়্‌কে নামে এক কর্মচারী কতকগুলি কৃষককে নিয়ে একটি দল গড়ে মহারাষ্ট্রে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এই অভ্যুত্থানের ধরনটি একেবারেই অনাধুনিক এবং অসময়োচিত বিবেচিত হয়েছিল। কাজেই সরকারী কর্তৃপক্ষ অতি সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করতে পেরেছিল। তবে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়ার পক্ষে এই বিদ্রোহ অশুভ-সঙ্কেতবাহীর ভূমিকা নিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিউম এবং তাঁর মত অনেক ব্রিটিশ কর্মচারীর মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে ভারতের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের সহযোগিতায় বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী বিপ্লব বা গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে সক্ষম হতে পারে। হিউম নিজেই লিখেছেন যে, "আমাদের কৃতকর্মের ফলে ভারতবাসীর মনে যে পরিমাণ তীব্র ব্রিটিশ বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, সেটা নির্গমনের জন্য একটা সেফ্‌টি ভালভের আশু প্রয়োজন।" হিউমের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে যে সব অভাবঅভিযোগ বোধ আছে সেগুলি শান্তিপূর্ণ ও বৈধভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করার সুযোগ পাওয়া যাবে। অভাব-অভিযোগের এই অভিব্যক্তির কারণে একটা গণবিদ্রোহের অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বিলীন হবে।

তবে হিউমের এই 'সেফ্‌টি ভালভ' তত্ত্বই জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ বা সারকথা এটা মনে করা উচিত হবে না। জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির একটা বড় কারণ ছিল এই যে, ভারতের রাজনীতি-সচেতন সমাজ দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিধানের জন্য একটি সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা কিছুদিন আগে থেকেই বেশ ভালোভাবে অনুভব করতে পেরেছিল। কতকগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার চাপে দেশে একটা জাতীয় আন্দোলন যে ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সুতরাং জাতীয় আন্দোলনের বা জাতীয়-চেতনার উন্মেষ সাধনের কৃতিত্ব কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীর উপর আরোপ করা সঙ্গত নয়। এমনকি হিউমের মনোবাসনাও একমুখী বা

স্বার্থদুষ্ট ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আকস্মিক গণবিপ্লব ঠেকানোর জন্য জাতীয় কংগ্রেস রূপ 'সেফ্‌টি ভালভ' সৃষ্টির চেয়েও তিনি আরও কিছু মহৎ ভাবনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। হিউম ভারতবর্ষকে মনেপ্রাণে ভালবাসতেন, বিশেষভাবে ভারতবর্ষের দরিদ্র কৃষকরা তাঁর ভালবাসার পাত্র ছিল। হিউমের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের স্বদেশপ্রেম ও চরিত্রবল সন্দেহাতীত ছিল। এঁরা বিদেশী হিউমের সাহায্য নিতে কোন দ্বিধা অনুভব করেননি, বরং আগ্রহই দেখিয়েছিলেন। তাঁদের মনে এই চিন্তারও উদয় হয়েছিল যে একজন ইংরাজ জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির ব্যাপারে জড়িত থাকায় এই প্রতিষ্ঠান শৈশব অবস্থাতে সরকারী কোপদৃষ্টি থেকে রেহাই পাবে।

এইভাবে 1885 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। অবশ্য কংগ্রেসের এই আবির্ভাবের পেছনে লোকবল ও আড়ম্বরের মাত্রা বেশ কম ছিল। যাই হোক, জাতীয় আন্দোলন দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত এই সংগ্রামের গতি বিরামহীন হয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজন বাঙালী নেতা কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি কারণ ঐ সময়ে তাঁরা কলকাতায় জাতীয় সম্মেলন বা ন্যাশনেল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। 1886 খ্রীষ্টাব্দে এঁরা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যাওয়াতে জাতীয় সম্মেলন বা ন্যাশনেল কনফারেন্সের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছিল একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 1886 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন দাদাভাই নওরোজীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই দ্বিতীয় অধিবেশন থেকেই কংগ্রেস সর্বভারতীয় সংস্থারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই অধিবেশনে 436 জন প্রতিনিধির (Delegates) সমাবেশ হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত হয়ে এঁরা সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এর পর থেকে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হত। ক্রমে কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতে প্রতিনিধি সংখ্যা একসহস্রে পরিণত হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আইনজীবী, সংবাদিক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, শিক্ষক ও ভূস্বামী শ্রেণীর মানুষেরা প্রতিনিধি বা ডেলি-

গেট রূপে কংগ্রেস অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতেন। 1890 খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নাতক শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। এই ঘটনাটির তাৎপর্য যেন এই ছিল যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতিতে যুগ-যুগান্ত ধরে নারী-জাতিকে যে অবমাননার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার অবসান ঘটবে।

অতঃপর জাতীয় ভাবধারা শুধুমাত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের খাতেই শুধু প্রবাহিত হয়নি। নবজাগ্রত এই জাতীয়তাবাদ—প্রাদেশিক সম্মেলন, প্রাদেশিক ও স্থানীয় সংগঠন এবং জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র প্রভৃতি বিবিধ মাধ্যমের সাহায্যে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করেছিল। বিশেষভাবে সংবাদপত্র-গুলি জাতীয় ভাবধারা প্রচারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বে যে সব বরেণ্য নেতা এর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁদের নাম—দাদাভাই নওরোজী, বদরুদ্দীন তায়েবজী, ফিরোজ শা মেহ্‌তা, পি. আনন্দচালু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু, গোপালকৃষ্ণ গোখলে। এই যুগে জাতীয় কংগ্রেস তথা জাতীয় আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় উল্লেখযোগ্য অন্যান্য নাম—মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, বালগঙ্গাধর তিলক, শিশিরকুমার ঘোষ ও মতি-লাল ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়, মদনমোহন মালবীয়, জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, সি. বিজয় রাঘবাচার্য এবং দীনশা. ই. ওয়াচা। কংগ্রেসের প্রথম পর্বের (1885-1905) কর্মসূচির বিভিন্ন ধারাগুলি এখন পর্যালোচন করা যেতে পারে।

শাসন-সংস্কার

প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ তাঁদের নিজের দেশের সরকারী শাসনব্যবস্থায় অধিকতর অংশগ্রহণ করতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। এঁদের আর একটি দাবি ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন। কিন্তু এঁরা এই সুযোগ-গুলি যে খুব দ্রুত লাভ করবেন এমন আশা এঁরা মনে পোষণ করতেন না। খুব দ্রুত যে সুযোগসুবিধাগুলি তাঁদের কাম্য ছিল তাদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। এঁদের আশা ছিল যে এঁরা ধীরে ধীরে স্বাধীনতা অর্জন করবেন। তাছাড়া এঁদের কাজকর্ম বা গতিবিধি ছিল খুব সতর্ক, এঁদের ভয় ছিল কোন রকম বাড়াবাড়ি করলেই সরকার তাঁদের আন্দোলনকে একেবারে নিঃশেষ জাওঁয় দেবে। 1885 থেকে 1892 পর্যন্ত এঁদের দাবি ছিল ব্যবস্থাপক সভা-গুলোর (Legislative Councils) সম্প্রসারণ ও সংস্কার। এঁদের দাবি ছিল

যে ব্যবস্থাপক সভায় জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই সদস্য রাখা হবে এবং ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হবে।

ব্রিটিশ সরকার এই দাবী অগ্রাহ্য করতে না পেরে 1892 'ভারতীয় কাউন্সিল য়্যাক্ট' নামে একটি আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। এই আইনের ফলে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা (Imperial Legislative Council) ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা (Provincial Legislative Council)-গুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই সদস্যদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সদস্যের ভারতীয়দের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তবে সুকৌশলে এই ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সরকার মনোনীত সদস্যদেরই সংখ্যাধিক্য বজায় রাখা হয়েছিল। এই ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বেসরকারী নির্বাচিত সদস্যদের বাজেট বিষয়ে সমালোচনামূলক বক্তৃতা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল তবে বাজেট 'পাশ' করার জন্য তাদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়নি।

1892 খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিল য়্যাক্ট জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে নিরাশায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল, এর ফাঁকি কোথায় তা নেতৃবৃন্দের বুঝতে দেরী হয়নি। তাঁরা ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে আরও অধিক সংখ্যক নির্বাচিত সদস্য গ্রহণও এই সভাগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ-ভাবে তাঁদের দাবি এই দাঁড়িয়েছিল যে সরকারী অর্থভাণ্ডার জনসাধারণের অর্থেই গঠিত। এই অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হবে সেটা ভারতবাসীর বিবেচনার উপর নির্ভর করবে, সরকারী কর্তাদের খেয়ালখুসী মত তা ব্যয় করা চলবে না। কিছুকাল পূর্বে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ কালে আমেরিকাবাসীও ঠিক এই ধ্বনি সহকারেই ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রামে নেমেছিল। তারা ব্রিটিশকে জানিয়ে দিয়েছিল যে সরকারী শাসনব্যবস্থায় তাদের অর্থাৎ আমেরিকাবাসী প্রতিনিধি নিতে হবে, যারা আমেরিকার স্বার্থ দেখবে। এই ব্যবস্থা না হলে আমেরিকাবাসী সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সরকারকে খাজনা দেবে না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের দাবী আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই তাঁরা স্বয়ং-শাসিত অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার ধরনে স্বরাজ্য বা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 1905 ও 1906

খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে গোখলে এবং দাদাভাই নওরোজী এই দাবি উত্থাপিত করেছিলেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার

জাতীয় জাগরণের প্রথম দিকেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, আধুনিক ধরনের শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হয়েছিলেন। ব্রিটিশরাজের শাসননীতিকেই তাঁরা দেশের দুর্দশার কারণরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। 1881 খ্রীষ্টাব্দেই দাদা-ভাই নওরোজী ঘোষণা করেছিলেন যে "ব্রিটিশ-শাসন একটা স্থায়ী এবং ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনস্বরূপ। এই শাসন অতি ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংসের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।" জাতীয় নেতৃবৃন্দ' ভারতের দেশজ শিল্পের ধ্বংসের জন্য ব্রিটিশ শাসনকেই দায়ী করেন। এঁদের মত এই ছিল যে ভারতের দারিদ্র্যমোচনের জন্য দেশে আধুনিক ধরনের শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে। এঁরা চেয়েছিলেন যে দেশের সরকার পক্ষ থেকে ভারতে আধুনিক ধরনের শিল্পোদ্যোগ প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এই উদ্যোগে সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে হবে এবং রক্ষামূলক শুল্ক ধার্য করতে হবে। এই জাতীয় নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের মনে 'স্বদেশী' ভাবনা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই 'স্বদেশী'র অর্থ ছিল দেশে প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যবহার এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের উপর এই জন্য জোর দেওয়া হয়েছিল যে এটা না হলে স্বদেশী দ্রব্যের কাটতি বা চাহিদা বাড়বে না। এই স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে 1896 খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের পুনে এবং অন্যান্য কয়েকটি শহরে প্রকাশ্যভাবে বিদেশী বা বিলাতী বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলার আয়োজন করা হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদীদের এই অভিযোগ ছিল যে ভারতের ধনসম্পদ শোষণ করে তা ব্রিটেনে চালান করে দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের এই দাবি ছিল যে এই শোষণ বন্ধ করতে হবে। জাতীয়তাবাদীগণ কৃষকদের উপর আর্থিক চাপ কমানোর জন্য জমির উপর ধার্য কর কমানোর জন্য আন্দোলন চালিয়ে-ছিলেন। চা-বাগিচা প্রভৃতিতে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্যও আন্দোলন চলেছিল। জাতীয়তাবাদীদের মতে ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্যের অন্য-তম কারণ ছিল সরকারী করভারের অত্যধিক চাপ। তাঁদের দাবি ছিল জমির উপর খাজনার হার কমাতে হবে এবং নিত্যব্যবহার্য লবনের উপর

থেকে সবরকম কর তুলে নিতে হবে। ভারত সরকারের সামরিক ব্যয়ের বাহুল্যও জাতীয়তাবাদীদের শিরঃপীড়া ঘটিয়েছিল, তাঁদের দাবি ছিল যে এই অনাবশ্যক ব্যয় হ্রাস করতে হবে। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসী বুঝতে পেরেছিল যে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে দেশের দারিদ্র্য দিন দিন বেড়েই চলেছে, এই দারিদ্র্যের কবল থেকে কোন দিনই উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, বিদেশী শাসন থেকে যা কিছু সুফল দেশবাসী পেয়েছে নিদারুণ অর্থনৈতিক দুরবস্থার তুলনায় তা অতি যৎ-সামান্য। দেশবাসীর ধন-প্রাণের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে দাদাভাই নওরোজী এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—

"মজার কথা এই যে খাতায় কলমে ভারতে ধন-প্রাণের নিরাপত্তা আছে, তবে কার্যতঃ তা নেই। ধন-প্রাণের নিরাপত্তা এই অর্থে যে, কোন ব্যক্তি অপরের ধন-প্রাণের হানি করতে সাহস পায় না, স্থানীয় কোন অত্যাচারী ব্যক্তিও সে চেষ্টা করে না।···কিন্তু ইংরাজের খপ্পর থেকে দেশবাসীর ধন এমনকি প্রাণও বাঁচান কঠিন। ভারতবাসীর সম্পত্তি নিরাপদ বা সুরক্ষিত নয়। নিরাপত্তা শুধু এক পক্ষেরই আছে, সেই পক্ষ ইংল্যাণ্ড। এই নিরাপত্তা এত সুদৃঢ় যে সে বিনা বাধায় ভারত থেকে যা কিছু তুলে নিয়ে আসতে পারে এমনকি ভারতকে গলাধঃকরণও করে ফেলতে পারে। ভারতে আয় বর্তমান হিসেবে বাৎসরিক £ 30,000,000 থেকে £ 40,000,000···আমি অতএব এই কথা সাহসের সঙ্গে বলতে চাইছি ভারতবাসীর সম্পদ ও জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই।···ভারতের কোটি কোটি মানুষের জীবনের অর্থ হল অনশন বা অর্ধাশন, দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারী।" আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে দাদাভাই লিখেছিলেন, "ভারতে একটা কথা আছে—যে পিঠে মারতে হয় মারো, পেটে মেরো না অর্থাৎ ভাতে মেরো না। দেশী প্রভুদের আমলে সাধারণ মানুষ তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে পেত, অর্থাৎ পেটে খেতে পেত। দেশী প্রভুর মারধর অবশ্য তাদের হজম করতে হত। ইংরাজ প্রভুদের আমলে মানুষ বেশ শান্তিতে আছে, কোন অত্যাচার নেই। তবে তার যা কিছু বিষয়-আশয় খুব সঙ্গোপনে ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় মানুষ পরম শান্তির সঙ্গে না খেয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, আইন ও শৃঙ্খলার মহিমা অবশ্য অক্ষুণ্ণই থেকে যাচ্ছে।"

প্রশাসনিক ও অন্যবিধ সংস্কার

জাতীয় আন্দোলনের এই পর্যায়ে ভারতবাসীর যে দাবিটি বেশ প্রবল-ভাবে উত্থাপিত হয়েছিল তা ছিল প্রশাসনিক স্তরে উচ্চবেতন ও মর্যাদাসম্পন্ন পদগুলিতে ভারতীয় নিয়োগ। অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে এই দাবি উপস্থিত করা হয়েছিল। উচ্চতর চাকুরীগুলিতে ইংরাজের একচেটিয়া অধিকার অর্থনৈতিক দিক থেকে দু'ভাবে ভারতের স্বার্থহানি করত। প্রথমতঃ এদের বেতনের হার ছিল বেশ ভারি, এব ফলে ভারতের প্রশাসনিক ব্যয়ের অঙ্ক স্ফীত হত, ঠিক এই ধবনের চাকুরীতেই ভারতীয়দের বেতন অনেক কম দিতে হত। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজেরা ভাবতে চাকুরীকালে যে বেতন পেত তার অতি অল্প অংশই ভারতে খরচ করা হত, বেতনের একটা মোটা অংশ ইংল্যাণ্ডে চলে যেত। অবসর গ্রহণের পর ইংরাজ কর্মচারীগণ স্বদেশে থেকেই পেন্সন নিত, সুতরাং পেন্সনের টাকাও ঐ দেশেই খরচ হত। এইভাবে ভারতের অর্থ ইংলণ্ডে চলে যেত। এইত গেল অর্থনীতির দিক্। বাজনীতিক দিক্ থেকে জাতীযতাবাদীদেব আশা ছিল যে উচ্চ সরকাবী পদে ভারতীয়দেব নিয়োগ কবা হলে এই কর্মচাবীগণ শাসন ব্যাপারে জনসাধাবণের সুখসুবিধার দিকে অধিকতর মনোযোগী হবে। সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের নৈতিকতার প্রসঙ্গে 1897 খ্রীষ্টাব্দে গোপালকৃষ্ণ গোখলে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—

"বিদেশী ইংরাজদের দিয়ে গঠিত শাসনব্যবস্থা শুধু ব্যয়বহুল রূপেই অশুভ-কর নয়। নৈতিক দিক থেকেও এই ব্যবস্থা যথেষ্ট আপত্তিজনক ও হানি-কব। এই ব্যবস্থা ভারতীয় জাতির মানসিক গঠনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। আমরা চিরজীবন একটা হীনমন্যতার পরিবেশে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়ে থাকি। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরও মাথা নীচু করে চলতে হয়। মানুষের পক্ষে যতটা উন্নত হওয়া সম্ভব আমাদের মধ্যে কেউ ততটা উন্নত অবস্থায় পৌছাবার যোগ্যতা দেখালেও বর্তমান অবস্থায় সেই সুযোগ পাবার সম্ভাবনা সুদূর পবাহত। স্বাধীন জাতির মানুষ যে নৈতিক স্ফূর্তি জীবনে উপভোগ কবে আমরা সেই স্ফূর্তি থেকে বঞ্চিত। আমাদের দেশের বহু মানুষের মধ্যে যে সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা আছে তা অব্যবহারের ফলে নষ্ট হয়ে যাবে। অবশেষে আমাদের নিজেদের স্বদেশেই আমাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায় হবে প্রভুশ্রেণীর জন্য জল বয়ে আনা আর কাঠ

কাটা।” জাতীয়তাবাদী-গোষ্ঠী বিচার বিভাগকে প্রশাসনের প্রভুত্ব মুক্ত করারও দাবি তুলেছিল। জুরিদের ক্ষমতা হ্রাসেরও বিরোধিতা করা হয়েছিল। জনসাধারণকে নিরস্ত্র রাখার সরকারী নীতিরও বিরোধিতা করা হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সরকারপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে দেশের লোকদের উপর আস্থা রেখে আত্মরক্ষার জন্য তাদের অস্ত্র রাখা ও ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া উচিত। আপৎকালে এই অস্ত্র দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারেও সহায়ক হবে।

জাতীয়তাবাদীদের আরও দাবী ছিল যে জনসেবামূলক কর্মধারা গ্রহণ সরকারের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা বিষয়ে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা হয়েছিল। উচ্চ-শিক্ষা ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবিও এইসঙ্গে ছিল।

জাতীয়তাবাদীগণের আরও অনেক দাবি ছিল। এইগুলি একে একে উল্লেখ করা যেতে পারে। কৃষকদের কৃষিকাজ চালানোর জন্য মহাজনের কাছ থেকে চড়াসুদে টাকা ধার করতে হয়, এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকারের উচিত হবে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন। এই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে চাষী চাষ করবে এবং ফসল উঠলে ঋণ শোধ করবে। দেশে জলাভাবের জন্য উৎপাদন কম হ'ত, দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত। জাতীয়তাবাদীগণের দাবি এই ছিল যে সেচব্যবস্থা সম্প্রসারিত করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গভর্নমেণ্টের গ্রহণ করা উচিত। দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার ও রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যও দাবি জানান হয়েছিল। দেশের আরক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারও চাওয়া হয়েছিল। পুলিশি ব্যবস্থায় দক্ষতা ও সাধুতা ও জনসাধারণের প্রতি তাদের দরদী মনোভাব গঠনের আবেদন জানান হয়েছিল।

দেশে অন্ন-সংস্থানের উপায় না থাকায় বহু ভারতীয় শ্রমিক সুদূর দক্ষিণ অফ্রিকা, মালয়, মরিশাস্, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রিটিশ গায়েনা প্রভৃতি স্থানে চলে যেতে বাধ্য হত। কিন্তু এখানেও তাদের উপর অতিরিক্ত জুলুম চালানো হত, 'কালা-আদমি'দের জন্য নির্দিষ্ট বর্ণ-বৈষম্য নীতি এদের উপরও প্রযুক্ত হত। জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা এ বিষয়েও সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। এই সময়ে বর্ণ-বৈষম্য নীতি প্রয়োগের একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এখানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতীয়দের মানবিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে একটি সংগ্রাম পরিচালনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা

আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রথম থেকেই অবহিত ছিলেন। এই স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁদের তৎপরতাও লক্ষিত হয়েছিল। বস্তুতঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। 1897 খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সরকার বালগঙ্গাধর তিলক ও অন্যান্য কয়েকজন নেতাকে রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে গভর্নমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। আদালতের বিচারে তাঁদের প্রতি দীর্ঘকাল দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এই একই সময় পুনের দুই নেতা নাথু ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনা বিচারে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর এই আঘাত হানার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের জনমত প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিল। এ যাবৎ তিলকের পরিচিতি অধিকতর রূপে মহারাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই ঘটনার পর তিনি রাতারাতি সমগ্র ভারতের নেতারূপে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। এ সমন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল' "এই বিশাল দেশে এমন একটি গৃহ পাওয়া যাবে না যেখানে তিলকের নামটি গভীর বেদনার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে না তাঁর কারাদণ্ড ভারতের প্রতিটি গৃহে একটি পারিবারিক দুর্যোগের রূপ ধারণ করেছে।" তিলকের এই গ্রেপ্তার সমগ্র দেশে একটা বৈদ্যুতিক চেতনা সঞ্চার করে জাতীয় আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির ধারা

1905 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলন যাঁদের নেতৃত্বাধীন ছিল তাঁদের সাধারণভাবে নরম-পন্থী বা 'মডারেট্'রূপে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। এই নরমপন্থীদের কর্মধারা অল্প কথায় ব্যাখ্যা করতে গেলে এই দাঁড়ায় যে এঁরা সরকারের প্রচলিত আইনকানুন বা বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই শাসনসংস্কার আন্দোলন চালাতে চাইতেন। এঁরা খুব ভেবে-চিন্তে শৃঙ্খলা বজায় রেখে রাজনৈতিক উন্নতিসাধন করতে চাইতেন। এঁদের বিশ্বাস এই ছিল যে জনমত গঠন করে জনসাধারণের দাবিদাওয়াগুলি সভা-সমিতিতে প্রস্তাব রূপে গ্রহণ করে, বক্তৃতা বা আবেদনপত্রের মাধ্যমে সেগুলি

সরকারী কর্তৃপক্ষের গোচরে আনলেই কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে সেইসব দাবি-দাওয়াগুলি পূরণ করে দেবে বা মেনে নেবে।

দেখা যাচ্ছে, এঁদের কর্মপদ্ধতি ছিল দ্বিমুখী। প্রথমে এরা ভারতে একটা প্রবল জনমত, রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে ভারত-বাসীর মনকে রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট করতেন। কংগ্রেসে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হত তারও উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। মডারেট্ রাজনীতির দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের নিকট তাঁদের ঈপ্সিত ও জনসাধারণ-সমর্থিত শাসন-সংস্কারমূলক প্রস্তাবগুলি উত্থাপন এবং এইগুলি পূরণের প্রার্থনা জ্ঞাপন। ভারতের মডা-রেট্ নেতৃবৃন্দের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আসলে ভারতবর্ষের প্রতি সুবিচারই করতে চায়। আসল অসুবিধা এই যে ভারতের প্রকৃত অবস্থা যে কি সেটা তারা জানতে পারে না। ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের প্রকৃত অবস্থা তাদের কাছে গোপন রেখে দেয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মডারেট্ নেতৃবৃন্দ ভারতের জনসাধারণের সামনে যেমন তাদের প্রকৃত অবস্থার কথা তুলে ধরতেন ঠিক তেমনিভাবেই এঁরা ভারতের সপক্ষে ব্রিটিশ জনমত জাগ্রত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্রিটেনে বেশ জোর প্রচারকার্য চালাতেন। ভারতের রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অগ্রগণ্য ভারতীয় নেতাদের দ্বারা গঠিত প্রতিনিধি দলও ব্রিটেনে প্রেরিত হত। 1889 খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি কমিটিও স্থাপিত হয়েছিল। 1890 খ্রীষ্টাব্দে এই কমিটির উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়া' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। দাদাভাই নওরোজী তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ইংলণ্ডেই অতিবাহিত করেন, তাঁর আয় বা অর্থ সবই সেই দেশেই ব্যয়িত হত। ভারতের দুরবস্থা বিষয়ে ব্রিটেনবাসীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই দাদাভাই নওরোজী এই স্বার্থ ত্যাগ করেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস অনুশীলন করতে গিয়ে যে কোন অনুসন্ধিৎসুর মনে একটা বেশ খটকা লেগে যায়। এই ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখা যায় যে বেশ বড় বড় জাতীয় নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ তখনকার দিনের মডারেট্ নেতৃগণ কত উচ্ছ্বসিতভাবে রাজভক্তি তথা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। তবে এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা ভুল হবে,

যে এঁদের স্বদেশপ্রেমে কোন ফাঁকি ছিল কিম্বা এঁরা ভীরু বা কাপুরুষ ছিলেন বা এঁদের সাহসের অভাব ছিল। আসল ব্যাপার ছিল এই যে, তখনকার দিনে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে এই নেতৃবৃন্দের মনে এই আন্তরিক বিশ্বাস ছিল যে ভারতের ব্রিটিশ শাসন ভারতের স্বার্থেই অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। এই কারণে এঁরা তৎকালে ইংরাজকে ভারত থেকে বিতাড়িত না করে, শাসনব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তুলতে চাইতেন যেখানে ভারতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হবে না এবং যে শাসন হবে স্বায়ত্তশাসনের নামান্তর। ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শাসনের কুফলগুলি সম্বন্ধে এঁরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং দেখতে পেয়েছিলেন যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে জাতীয় দাবিগুলি উপেক্ষা করে চলেছে। এই অবস্থায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলতে আরম্ভ করেছিলেন। আর একটা কথা এই যে, যেসব নেতৃবৃন্দ নরমপন্থী বা মডারেট্ রূপে পরিচিত ছিলেন তাঁদের অনেকের মনেই এই ধারণা জন্মেছিল যে এই-ভাবে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হলে একদিন জাগ্রত ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবে। সরাসরি বিদেশী শাসনের সঙ্গে সংগ্রামে নেমে পড়ার উপযুক্ত সময় তখনও আসেনি, মডারেট্ নেতৃবৃন্দের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তৎকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দের সকলেই যে নরমপন্থী বা মডারেট্ ছিলেন তা নয়। এঁদের অনেকেই প্রথম থেকেই ইংরাজের দুরভিসন্ধি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয় এই ছিল যে আবেদন-নিবেদনে কোন কাজ হবে না। ভারতবাসীকে তার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করেই রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে হবে। এঁরা একটা সংগ্রামী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি উদ্ভাবন করেছিলেন। তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও কিছু সংবাদপত্র সম্পাদক এই আপোষহীন সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেন। এই নেতৃবৃন্দকে চরমপন্থী অথবা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী রূপে আখ্যাত করা হত। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি পরবর্তী অধ্যায়ে বিবৃত হবে।

সরকারী মনোভাব

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জাতীয় চেতনা উন্মেষের সূচনা কাল থেকেই এই আন্দো-লনের প্রতি বিরূপতা দেখিয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও তাদের

সন্দেহের শিকার হয়েছিল। বড়লাট্ ডাফ্‌রিন থেকে শুরু করে তাঁর অধস্তন সব ব্রিটিশ রাজকর্মচারী জাতীয় নেতৃবৃন্দকে 'রাজদ্রোহী বাবুর দল', 'ষড়যন্ত্রকারী ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী', 'সাংঘাতিক দুষ্টগণ' ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত করেছিল। তবে তাদের এই বিদ্বেষের মনোভাব প্রথম দিকে চেপে রাখা হয়েছিল। সম্ভবতঃ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে এই আশা ছিল যে হিউমের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন এবং তার ধারক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ-রাজের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। 1886 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এমন কি স্বয়ং বড়লাট জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গকে একটি প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ এটা দেখা গিয়েছিল যে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছে না, ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপাত্রে পরিণত হতে চলেছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই সময় থেকে প্রকাশ্যে জাতীয় কংগ্রেস এবং তার নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করা সুরু করেন। এদের নিন্দাও প্রকাশ করা হয়। 1887 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডাফ্‌রিন একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় জাতীয় কংগ্রেসের নিন্দা করে এক মত প্রকাশ করেন যে এই জাতীয় কংগ্রেস ভারতের অতি অল্প সংখ্যক মানুষের সংগঠন, এদের পেছনে জনসাধারণের কোন সমর্থন নেই। 1900 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন সেক্রেটারী অফ্ স্টেট্ বা ভারত সচিবকে একটি প্রতিবেদন মারফৎ জানিয়েছিলেন যে, "কংগ্রেস ধ্বংসোন্মুখী হয়ে ঢলে পড়্‌ছে। আমার মনে এই একটা উচ্চ আশা আমি পোষণ করে চলেছি যে আমার কার্যকালেই আমি এই প্রতিষ্ঠানকে পরম শান্তি সহকারে কবরস্থ করে যাব।" ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই-সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদনীতি প্রয়োগও সুরু করে দিয়েছিল। সৈয়দ আহম্মদ খান, বারাণসীর রাজা শিবপ্রসাদ প্রভৃতি ব্রিটিশভক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কর্তৃপক্ষ একটা কংগ্রেস-বিরোধী সংগঠন খাড়া করতে চেষ্টা করেছিল। তবে জাতীয় আন্দোলনের গতিরোধে এই সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

জাতীয় আন্দোলনের সূচনাকালের মূল্যায়ন

অনেক সমালোচকের মতে প্রথম যুগের জাতীয় আন্দোলন অথবা জাতীয় কংগ্রেস বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। জাতীয়তাবাদীগণ শাসনব্যবস্থায় যে সব পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, তার অনেকগুলিই সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এই সমালোচকেরা

এটাও বলে থাকেন যে প্রথম যুগের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের কোন যোগ ছিল না। সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়েই এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।

উপরোক্ত সমালোচনা যে সম্পূর্ণ অসত্য ও অমূলক তা অবশ্য বলা চলে না। তবে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্যায় যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এমন ধারণাটি ঠিক সমর্থনযোগ্য নয়। এই আন্দোলন সমগ্র জাতির মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি জাগরণ এনে দিয়েছিল, সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে এই আন্দোলন এই চেতনা এনে দিয়েছিল যে ভারতবর্ষ আমাদের স্বদেশ, আমরা সবাই ভারতবাসী। এই আন্দোলনই জনসাধারণকে রাজনৈতিক কর্মধারা অনুসরণ করতে শিখিয়েছিল সেই সঙ্গে শিখিয়েছিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তা-বাদ। জগৎ-জীবনকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচারের শিক্ষা দেশের মানুষ এই আন্দোলন থেকেই পেয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধেও এই আন্দোলন জনসাধারণকে সর্বপ্রথম অবহিত করে দিয়েছিল। এই আন্দোলন থেকেই সর্বপ্রথম দেশের সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপটি বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল যে ভারত-বর্ষের কাজ হচ্ছে ব্রিটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামালের সরবরাহ ও ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্য ক্রয়। ভারতবর্ষ যে ব্রিটিশ মূলধন লগ্নীর উর্বর ক্ষেত্র এটাও তাদের চোখে ধরা পড়েছিল। এই জাতীয় আন্দোলন জাতির সামনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা আদর্শও গড়ে তুলে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ছিল যে পরবর্তী কালে এই আদর্শে উপনীত হওয়ার জন্য ভারতবাসী রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এঁরা এটা স্পষ্টভাবে ভারতবাসীকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন যে ভারতের স্বার্থে ভারতবাসীকেই দেশ শাসনের দায়িত্ব নিতে হবে। জাতীয়তাবাদকে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ভারতীয় জীবনচর্যার মূল মন্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। প্রথম যুগের জাতীয় আন্দোলনের যে দুর্বলতাগুলি বর্তমান ছিল পরবর্তী কালের নেতৃবৃন্দ সেই দুর্বলতাগুলিকে অপসৃত করে-ছিলেন। প্রথম যুগের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যে ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন সেই ভিত্তির উপর নির্ভর করেই পরবর্তী কালে জাতীয় আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করা সম্ভবপর হয়েছিল একথা অস্বীকার করা চলে না।

অনুশীলনী

1. ব্রিটিশ স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় স্বার্থের সংঘাতের ফলে কিভাবে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল বর্ণনা কর।
2. উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কি কি কারণে ভারতে আধুনিক ধরনের জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল তা পর্যালোচনা কর। এই ব্যাপারে বিদেশী প্রভুত্ব, দেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক একীকরণ, পাশ্চাত্য ভাবধারা ও শিক্ষা, সংবাদপত্র, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শাসকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্বাভিমান, এবং লিটন ও রিপনের শাসনকালের কি ভূমিকা ছিল তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ কর।
3. প্রথম যুগের জাতীয় আন্দোলনের (1885-1905) ফল কি হয়েছিল ? এই যুগকে কেন "নরম-পন্থী" বা "মডারেট" রাজনীতির যুগ বলা হয়ে থাকে ?
4. নিম্নলিখিত বিষয়ে ছোট ছোট মন্তব্য লিখ :

   (a) ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার এবং জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার উপর তার প্রভাব (b) ইলবার্ট বিল (c) দাদাভাই নওরোজী (d) দি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (e) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম (f) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি সরকারী মনোভাব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নবভারতের অভ্যুত্থান

1858 খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের উত্তাল তরঙ্গ শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিবেগ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি। ভারতের সামাজিক অবস্থা ও ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রেও এটা একটা বিপুল আলোড়ন এনে দিয়েছিল। বহু ভারতীয়ের মনেই এই চিন্তা জেগে উঠেছিল যে আধুনিক ধারায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিধানের জন্য ভারতবর্ষে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের কর্মসূচি গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। জাতীয়তাবোধের বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক বিপ্লব, শিক্ষার সম্প্রসারণ, পাশ্চাত্য ভাবধারা ও সংস্কৃতির প্রসার এবং সমসাময়িক বিশ্বের সহিত পরিচয়ের ফলে ভারতবাসী স্বদেশীয় সমাজের দুর্গতি ও অনগ্রসরতা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠেছিল এবং এই সচেতনতা থেকেই শিক্ষিত ভারতবাসী সমাজ ও ধর্ম সংস্কারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন বলেছিলেন, "আজ আমরা আমাদের চারপাশে একটা অধঃপতিত জাতি দেখতে পাচ্ছি, এই জাতির পূর্বগৌরবের স্মৃতি ধ্বংসস্তুপের মধ্যে চাপা পড়ে আছে। এই জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সামাজিক উন্নতি, পারিবারিক সারল্য, মাধুর্য সবই অতীতের স্মৃতি মাত্র। চারদিকে তাকালে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও চিন্তাশক্তির ক্ষেত্রে একটা শোকাবহ শূন্যতাই শুধু দৃশ্যমান হয়। এই শ্মশানভূমিতে বৃথাই আমরা কালিদাসের দেশকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি, যে দেশ ছিল শ্রেষ্ঠ কাব্য, বিজ্ঞান ও সভ্যতার লীলাক্ষেত্র।"

অনুরূপভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীর অবস্থা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন—

"এখানে সেখানে ঘোরাফেরার কালে আমরা ছেঁড়া কাপড় পড়া জীর্ণশীর্ণ চেহারার যেসব বালক বা বৃদ্ধ দেখতে পাই তাদের মুখে আঁকা রয়েছে

অজস্র বলি রেখা। সুচির কালস্থায়ী দারিদ্র্য ও হতাশা তাদের মুখে এই দাগগুলি এঁকে দিয়েছে। এমনকি গরু, মহিষ, ষাঁড় যা দেখতে পাওয়া যায় তাদের শরীরও তেমনি জীর্ণশীর্ণ, তাদের মুখেচোখেও সেই করুণ বুভুক্ষু দৃষ্টি···পথের দু'পাশে শুধু নোংরা আবর্জনার পাহাড় জমে আছে—এই হল আমাদের বর্তমান যুগের ভারতবর্ষ। রাজপ্রসাদের পাশেই ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর, মন্দিরের ধারেই জঞ্জালের স্তুপ, সুসজ্জিত ব্যক্তির সঙ্গে কটিবাস পরিহিত সন্ন্যাসী, সুখাদ্যভোজী হৃষ্টপুষ্ট আরাম লালিত ব্যক্তি আর সেইসঙ্গে বুভুক্ষু মানুষের কাতর নিষ্প্রভ দৃষ্টি—এই নিয়ে আমাদের স্বদেশ। বিধ্বংসী প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া আমাদের জাতির প্রাণ-শক্তি ক্ষয় করে ফেলছে। অনশন আর অর্ধাশন এটাই যেন আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। মৃত্যু-রূপী দুর্ভিক্ষের করাল নৃত্য নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমরা কয়েক কোটি মানুষের সমষ্টি শুধু চেহারাতেই মানুষের মত···আমাদের জীবন বিধ্বস্ত আর এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী দেশের মানুষ এবং বিদেশী আক্রমণ। আমরা আশাহীন জাতি, আমাদের অতীত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল ভবিষ্যতও তাই। আমাদের মধ্যে দাস-মনোভাবযুক্ত এমন মানুষ আছে যারা তাদের পরিচিত মানুষের কোন সমৃদ্ধি সহ্য করতে পারে না, এরা প্রবলের পদলেহন করে আর দুর্বলকে আঘাত করে পরম আনন্দ লাভ করে। এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আবার আছে নানাবিধ কুসংস্কার. এদের কোন নৈতিক মেরুদণ্ড নেই···এইসব মানুষ ভারতের জনসমাজে পোকার মত কিলবিল করে বেড়াচ্ছে—এরা যেন দুর্গন্ধময় মৃত পশুর শব। আমাদের সমাজের এই যে অন্ধকারময় দিক্‌, ইংরাজ শাসকদের চোখে এটাই পড়ে থাকে।"

দেখা যাচ্ছে যে, 1858 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালে সমাজ-সংস্কারের ধারা আরও ব্যাপক হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের মত আদি যুগের সমাজ-সংস্কারদের সংস্কার প্রচেষ্টার ঐতিহ্যে ধর্মীয় ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়েছিল।

ধর্মীয় সংস্কার

বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও জাতীয় চেতনাসম্পন্ন আধুনিক বিশ্বের উপযোগী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কিছু চিন্তাশীল ভারতীয় মনীষী ভারতের প্রথাগত ধর্মগুলির সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। ধর্মের প্রকৃত

ভিত্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে ভারতের মানুষের পক্ষে যুগোপযোগী করে তোলা এই সংস্কারকদের অভীষ্ট ছিল।

ব্রাহ্ম-সমাজ

1843 খ্রীষ্টাব্দের পর রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্ম ভাবধারা প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি বেদ যে অভ্রান্ত এটা স্বীকার করেন নি। 1866 খ্রীষ্টাব্দের পর কেশবচন্দ্র সেনও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রচলিত হিন্দুধর্মের ত্রুটিগুলি শুধরে নিয়ে বেদ ও উপনিষদের ভিত্তিতে একেশ্বরবাদ অর্থাৎ এক ঈশ্বরের পূজা বা উপাসনা প্রবর্তন করেছিল। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলিও এই ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্মের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, যা কিছু যুক্তিগ্রাহ্য তাই ধর্মের মধ্যে গ্রহণীয়, অতীত বা বর্তমানে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা যদি যুক্তিগ্রাহ্য না হয় তবে তা বর্জন করতে হবে। এই যুক্তি মেনেই ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিত শ্রেণীর উপর নির্ভরতা ত্যাগ করেছিল। ব্রাহ্মনেতাদের যুক্তি এই ছিল যে প্রতিটি মানুষ নিজের বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করে এই ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের কি ভাল বা কি মন্দ তা বুঝে নেবে, তার এ অধিকার জন্মগত। এই কারণে ব্রাহ্মেরা মূর্তিপূজা ও কুসংস্কারাপন্ন আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন। বলতে গেলে ব্রাহ্মণ প্রভাবিত ধর্মকেই তাঁরা বিসর্জন দিয়েছিলেন। এঁরা কোন পূজারী বা পুরোহিতের বিনা সাহায্যেই একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। এই ব্রাহ্মেরা বেশ উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। এঁরা জাতিভেদ এবং বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করতেন এবং সাধারণভাবে স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতি ও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনে উৎসাহ দিতেন। দেশে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারেও এঁদের আগ্রহ ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অন্তর্বিরোধের ফলে ব্রাহ্ম-সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব নগরাঞ্চলবাসী শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। তথাপি এটা স্বীকার করতে হবে যে বাংলার এবং ভারতের অবশিষ্ট অংশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক জীবনে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে এই সমাজের প্রভাব বিশেষ কার্যকর হয়েছিল।

মহারাষ্ট্রে ধর্ম-সংস্কার

1840 খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে পরমহংসমণ্ডলী কর্তৃক ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছিল। এই মণ্ডলী মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করত। সম্ভবতঃ পশ্চিম ভারতের সর্বপ্রথম ধর্মসংস্কারক ছিলেন গোপাল-হরি দেশমুখ। জনসাধারণের কাছে ইনি 'লোকহিতবাদী' নামেই পরিচিত ছিলেন। ইনি মারাঠি ভাষায় রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে হিন্দু-রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ আক্রমণ চালাতেন। ধর্মীয় ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। 1840 খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন "পুরোহিত সমাজ অশ্রদ্ধেয়, কারণ তারা অর্থ না বুঝে কতকগুলি শ্লোক আওড়ে যায়, এইভাবে এই শ্লোকগুলির অমর্যাদা করা হয়। পণ্ডিতেরা পুরোহিতদের থেকেও অধম ; এরা পুরোহিতদের থেকেও অজ্ঞান আর এদের ঔদ্ধত্যও খুব বেশী। এই ব্রাহ্মণ কারা ? এরা আমাদের থেকে কি ভাবে আলাদা ? এদের কি কুড়িটা করে হাত আছে? এদের এমন কি আছে যা আমাদের নেই। আজকাল আমরা ব্রাহ্মণদের সামনে এইসব প্রশ্ন রাখছি, এখন ব্রাহ্মণদের উচিত এটা মেনে নেওয়া যে সব মানুষই সমান এবং জ্ঞান অর্জনের অধিকার কারো এক-চেটিয়া নয়।"

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে হিন্দুধর্ম চিন্তা ও আচার-আচরণ সংস্কারের জন্য পরবর্তী কালে এই অঞ্চলে প্রার্থনা সমাজ স্থাপিত হয়েছিল। এই সমাজ একেশ্বরবাদ প্রচার করত। জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ ও পুরোহিত-প্রাধান্য খর্ব করাও এই সমাজের লক্ষ্য ছিল। এই প্রার্থনা সমাজের দুইজন মহান নেতার নাম রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এবং মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে (1842-1901)। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ছিলেন একজন খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ ও ঐতিহাসিক। এই প্রার্থনা সমাজের পেছনে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব বেশ গভীর ছিল। তেলেগু সমাজ-সংস্কারক বীরেশলিঙ্গমের চেষ্টায় প্রার্থনা সমাজের প্রভাব দক্ষিণ ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে গোপাল গণেশ আগরকর নামে একজন প্রথম শ্রেণীর সমাজসংস্কারকের কর্মক্ষেত্রও ছিল মহারাষ্ট্র। আগরকর সে যুগের একজন মুখ্য চিন্তানায়ক ছিলেন। ইনি সবার উপরে মানুষের বিচার-বুদ্ধির স্থান দিতেন। চিরাচরিত প্রথার অন্ধ অনুসরণ অথবা অতীত ভারতের কল্পিত মহিমা প্রচারের ইনি তীব্র বিরোধিতা করতেন।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ পরমহংস (1834-1886) ছিলেন একজন সাধু মহাপুরুষ। প্রাচীন পন্থায় বৈরাগ্য, তপস্যা ও ভক্তি অবলম্বন করে তিনি ধর্মীয় মোক্ষ লাভ করতে চেয়েছিলেন। ধর্মীয় সত্যের সন্ধান এবং ঈশ্বরোপলব্ধির সাধনা করতে গিয়ে তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধকদের সংস্রবেও এসেছিলেন, এঁদের মধ্যে মুসলিম ও খ্রীষ্টান সাধকেরাও ছিলেন। তিনি জোর দিয়ে সর্বদাই এই উপদেশ দিতেন যে ঈশ্বরকে লাভ করা অথবা মোক্ষ লাভের পথ একটা নয়, অনেক পথই আছে। আর মানুষের সেবা করাই হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা, কারণ মানুষই হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টি, এই অর্থে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান।

তাঁর এক মহান শিষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ (1863-1902)। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মচিন্তাকে সমসাময়িক কালের ভারতীয় সমাজের প্রয়োজনের উপযোগী রূপদান করে তিনি জনসমাজে তা প্রচার করেছিলেন। এর চেয়ে বড় কথা এই যে সমাজ-সেবার দিকেই স্বামী বিবেকানন্দের লক্ষ্য বেশী ছিল। তিনি বলতেন যে সেই জ্ঞানের কি প্রয়োজন যা মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, যে সংসারে আমরা বাস করি তার কোন কাজে আসে না? তিনি তাঁর গুরুর মতই জোর গলায় বলতেন যে সব ধর্মই এক : ধর্মীয় ব্যাপারে কোন সঙ্কীর্ণতাকেই তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। 1898 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর একটি রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে—"আমাদের জন্মভূমির পক্ষে একমাত্র আশার কথা এই যে এখানে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম একত্র হয়েছে।" এই সঙ্গে বিবেকানন্দের মনে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি নিজে বেদান্ত দর্শনপন্থী ছিলেন। তিনি এই বেদান্ত মতকে পুরোপুরি একটি যুক্তিবাদী দর্শন বলে গণ্য করতেন। বহির্জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে কূপমণ্ডুকতার মনোভাব পোষণ ও জাড্যতাগ্রস্থ হওয়ার জন্য বিবেকানন্দ তাঁর স্বদেশবাসীকে তিরস্কার করতেন। তিনি লিখেছিলেন, "জগতের অন্য সব জাতির সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগহীনতার ফলেই আমাদের এই অবনতি ঘটেছে। সমগ্র বিশ্বের জীবনস্রোতের সঙ্গে আমাদের জীবনধারা মিশিয়ে দিতে না পারলে আমাদের উন্নতির কোন আশা নেই। স্ফূর্তিই হচ্ছে জীবনের লক্ষণ।"

বিবেকানন্দ জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করতেন তৎকালীন হিন্দু-

সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-অনুষ্ঠানের তিনি নিন্দা করতেন। তিনি তাঁর দেশবাসীকে স্বাধীনতা, সাম্য ও মুক্ত-বুদ্ধির অনুশীলন করতে প্ররোচিত করতেন। তিনি তীব্র ভাষায় এই মত প্রকাশ করেছিলেন, "আমাদের ধর্মের হয়েছে এক বিপদ, এটা রান্না ঘরেই আটকে গিয়েছে। আমরা বেদান্তপন্থীও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই। আমরা শুধু অচ্ছুতপন্থী, 'আমাকে ছুঁয়ো না'। আমাদের ধর্ম হেঁসেলে। রান্নার বাসনে আমাদের ঈশ্বর ঢুকে বসেছেন, আমাদের ধর্ম হল 'আমাকে ছুঁয়ো না, আমি ভারী পবিত্র'। এটা যদি আরেক শতাব্দী ধরে চলে তবে আমাদের সবাইকে পাগলা গারদে আশ্রয় নিতে হবে।"

চিন্তার স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "জীবন, বৃদ্ধি ও সুস্থিতির একমাত্র পথ হচ্ছে, চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতা। যেখানে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা নেই, সেখানে মানুষ, এমনকি সমগ্র জাতি ও সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য।"

তাঁর গুরুর মতই বিবেকানন্দ ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ মানবতাবাদী। দেশের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য, দুর্দশা এবং যন্ত্রণা দেখে নিরতিশয় বেদনার সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, "আমি একমাত্র সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যে ঈশ্বর সব আত্মার সমষ্টিভূত। আমার ঈশ্বরের অধিষ্ঠান সর্বদেশের পাপী, যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে।"

শিক্ষিত ভারতবাসীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, "লক্ষ লক্ষ মানুষ যতদিন ক্ষুধা ও অশিক্ষার মধ্যে বাস করবে, ততদিন আমি এদেরই শ্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিটি মানুষকে বিশ্বাসঘাতক রূপে গণ্য করব। যদি না এরা তাদের দুঃখমোচনের জন্য কিছু না করে।"

1896 খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ মানবসেবার উদ্দেশ্যে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ভারতের বিভিন্ন অংশে এই প্রতিষ্ঠানের বহু শাখা স্থাপিত হয়েছিল। স্কুল, হাসপাতাল, ঔষধালয়, অনাথাশ্রম, পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাগুলি সমাজসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছে। দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন ব্যক্তিগত মুক্তি বা মোক্ষের ঊর্ধ্বে সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবাকেই স্থান দিয়েছে।

স্বামী দয়ানন্দ ও আর্য-সমাজ

আর্য-সমাজ উত্তরভারতে হিন্দুধর্ম সংস্কারের ব্রত নিয়েছিল। 1৪75 খ্রীষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ (1824-1883) এই সমাজ প্রবর্তন করেন। স্বামী দয়ানন্দের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে স্বার্থপর ও অজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা কতকগুলি পুরাণের সাহায্যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হিন্দুধর্মকে বিকৃত করেছে। সত্যধর্মকে খুঁজে পেতে স্বামী দয়ানন্দ বেদের উপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি জানতেন যে বেদ ঈশ্বরের বাণী, অভ্রান্ত এবং সর্বজ্ঞানের আকর। বেদ পরবর্তী কালের যেসব ধর্মগ্রন্থ বেদে প্রতিপাদিত তথ্যের বিপরীত সেইসব ধর্মগ্রন্থকে তিনি অগ্রাহ্য করে দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র বেদ-নির্ভরতা ও তার অভ্রান্ততায় বিশ্বাসের জন্য দয়ানন্দের মতবাদে কিছু পরিমাণে রক্ষণশীলতার ছোঁয়া লেগেছিল, কারণ কোন কিছুকেই আপ্তবাক্য মনে করলে সেখানে যুক্তির অভাব থেকে যায়। এতৎসত্ত্বেও তাঁর মতামতকে নস্যাৎ করে দেওয়ার উপায় ছিল না কারণ তিনি বৈদিক চিন্তাগুলিকে তাঁর নিজের এবং অপরের ব্যাখ্যা দিয়ে যুক্তিগ্রাহ্যরূপে উপস্থিত করতেন। তিনি বলতেন যে নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেই বেদ-বাণীর যাথার্থ্য বিচার করে নিতে হবে। তাঁর মত এই ছিল—যে কোন ব্যক্তিরই ঈশ্বরের কাছে পৌছাবার অধিকার আছে। হিন্দু-সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে চিন্তাজগতে তিনি একটা বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে বেদ ব্যাখ্যা করে তিনি যেসব সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন সে সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে তৎকালে অন্যান্য ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকদের প্রচারিত মতবাদের আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য ছিল। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত প্রচলিত হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা, অনুষ্ঠানসমূহ, জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতির তিনি ঘোর বিরোধিতা করেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মে মৃত্যুর পরপারে ব্যক্তির পরিণাম নিয়ে যে মাথাব্যথা দেখা যায় সেদিক থেকে মন ফিরিয়ে নিয়ে ব বনের সমস্যার দিকেই তিনি মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনেও তাঁর উৎসাহ ছিল। এটা একটা খুব চিত্তাকর্ষক ঘটনা যে, এই স্বামী দয়ানন্দের সঙ্গে তৎকালীন অপরাপর ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকদের দেখাসাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং তাঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও চলেছিল। এই ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর, বিচারপতি রাণাড়ে, গোপালহরি দেশমুখ প্রভৃতির নাম

করা যেতে পারে। বস্তুতঃ আর্যসমাজের রবিবাসরীয় অধিবেশনগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনাসমাজের অধিবেশনগুলির বেশ সাদৃশ্য ছিল।

স্বামী দয়ানন্দের অনুগামীবৃন্দ পরবর্তী কালে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষা প্রবর্তনকল্পে অনেকগুলি স্কুল ও কলেজ স্থাপন করে-ছিলেন। এবিষয়ে লালা হংসরাজের ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল। 1902 খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারের নিকট গুরুকুলে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রাচীন ধারার একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

আর্যসমাজীগণ সমাজ-সংস্কারের কাজে খুবই উৎসাহী ছিলেন। নারীদের অবস্থার উন্নতি তথা নারী শিক্ষা বিস্তারেও এঁদের বিশেষ চেষ্টা ছিল। অস্পৃশ্যতা ও জন্মসূত্রে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এঁদের কর্মোদ্যম নিয়োজিত হয়েছিল। এঁরা সমাজে সাম্যভাব এনে সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা করতেন। জনসাধারণের মনে এঁরা আত্ম-সম্মান ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চারের চেষ্টা করতেন। এইসঙ্গে আর্যসমাজের আর একটি কাজ ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বীগণের ধর্মান্তরগ্রহণ রোধ। হিন্দুদের ধর্মান্তর-গ্রহণ রোধ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে আর্যসমাজীদের সঙ্গে অন্য ধর্মা-বলম্বীদের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বিংশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের এটাও অন্যতম কারণ। আর্যসমাজের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা একদিকে যেমন সমাজে একতা আনার চেষ্টা করেছিল অন্যদিকে তেমনি এদের ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টার পরিণামে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয়েছিল। অবশ্য এই সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব আর্যসমাজীদের ইচ্ছাকৃত ছিল না, এঁদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সংহতিসাধন ও ধর্মান্তরগ্রহণ রোধ। এঁরা ঠিক বুঝতে পারেননি যে ভারতের জাতীয় সংহতি হবে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়জীবনের ভিত্তি হবে সকল ধর্মাবলম্বীগণের সহাবস্থান।

থিয়োসফিকেল সোসাইটি

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাডাম এইচ. পি. ব্লাভাটস্কি এবং কর্ণেল এইচ্. এস. অলকট্ কর্তৃক থিয়োসফিক্যাল্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই দুইজন ভারতে এসে 1886 খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের নিকট আদিয়ারে এঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। শ্রীযুক্তা আনি বেসাণ্টের (Mrs. Annie Besant) পরিচালনায় এই থিয়োসফি আন্দোলন ভারতে খুব শক্তিশালী

হয়ে উঠেছিল। শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট 1893 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন। থিয়োসফিস্টগণ প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জরথুস্ত্র ধর্মের পুনরুভ্যুত্থান ঘটিয়ে এইগুলিকে ভারতে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। এঁরা আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন। এঁরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের শিক্ষা প্রচার করতেন। প্রাচীন ধর্মের পুনরভ্যুত্থান বিষয়ে থিয়োসফিস্টদের প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। কিন্তু তাঁরা আধুনিক ভারতের বিবর্তনে একটি বিশেষ সাহায্য দিয়েছিলেন। প্রতীচ্যাগত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত এই 'থিয়োসফি' আন্দোলন ভারতের ধর্ম ও দর্শনের প্রতি সবিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করেছিল। বিদেশবাসীদের কাছ থেকে লব্ধ এই মর্যাদা ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছিল। তবে এর আর একটা মন্দ দিকও ছিল। বহু ভারতবাসীর মধ্যে এটা তাদের অতীত সম্বন্ধে একটা বৃথা গর্ববোধও এনে দিয়েছিল।

শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট ভারতের উন্নতিকল্পে বহু ভাল কাজ করেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল বারাণসীতে 'সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুল' বা কেন্দ্রীয় হিন্দু বিদ্যালয় নামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। পরবর্তী কালে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের চেষ্টায় এটি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

সৈয়দ আহম্মদ খান্ ও আলিগড় বিদ্যালয়

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত একটু দেরীতে হয়েছিল। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বহুদিন পর্যন্ত পরিহার করে চলেছিলেন। 1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর এদিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়েছিল। 1863 খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 'মহমেডান লিটারারি সোসাইটি' বা মুসলমান সাহিত্য সমিতি স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে মুসলমান সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই সমিতি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনার প্রবর্তন করেছিল। উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী মুসলমানদের এই সমিতি পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমাজসংস্কারক ছিলেন সৈয়দ আহম্মদ-খান্ (1817-1898)। তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এই চিন্তাধারাকে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তিনি জীবনব্যাপী চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই কাজে

হাত দেওয়ার আগে সর্বপ্রথমে তিনি ঘোষণা করেন যে ইসলাম ধর্মের সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'কোরান'। অন্যান্য যেসব মুসলমানী ধর্মগ্রন্থ আছে কোরানের তুলনায় তাদের স্থান গৌণ। তিনি আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তা ও বিজ্ঞানের আলোকে কোরান ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে কোরানের কোন স্থানে বিজ্ঞান, প্রকৃতি বা যুক্তিনির্ভর নয় এমন কোন কিছু কথা যদি পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে যে এখানে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। ইনি আজীবন চিরাচরিত কু-প্রথা, ঐতিহ্যের উপর অন্ধ নির্ভরতা, অজ্ঞতা ও যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন যে জনসাধারণ যেন যুক্তিনির্ভর ও মুক্তমনের অধিকারী হয়। তিনি বলতেন যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি যে পর্যন্ত না অর্জিত হয় সে পর্যন্ত কাকেও 'সভ্য' আখ্যা দেওয়া যায় না। তিনি ধর্মান্ধতা, সঙ্কীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরোধী ছিলেন। তিনি ছাত্র-সম্প্রদায় সহ সাধারণ মানুষকে পরমতসহিষ্ণু ও উদারমতাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন যে সঙ্কীর্ণচিত্ততা হচ্ছে মানসিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার লক্ষণ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গ্রন্থগুলি পাঠের সুফল সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "এইসব গ্রন্থ পড়ে পাঠক বুঝতে পারবে যে উচ্চধীসম্পন্ন মানুষেরা বড় বড় সমস্যাগুলি সমাধানে কি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। পাঠক বুঝতে পারবে যে সত্যের নানা দিক আছে, একজন যেভাবে দেখতে পায় সেটাই তার স্বরূপ নয়। সদ্ গ্রন্থ পাঠের আর এক সুফল এই যে পাঠক তার থেকে বুঝতে পারে যে বিশ্বজগৎ বেশ বিস্তীর্ণ। তার নিজের সম্প্রদায়, সমাজ বা শ্রেণীর মধ্যেই এই জগৎ সীমাবদ্ধ নয়।"

সৈয়দ আহম্মদ উপলব্ধি করেছিলেন যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতিচর্চা দ্বারাই মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নতি সম্ভব। এই কারণে আধুনিক শিক্ষা প্রচারই তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে উঠেছিল। একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবে তিনি অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং বহু বিদেশী ভাষার বই উর্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। 1875 খ্রীষ্টাব্দে আলিগড়ে তিনি মহমেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টেল কলেজ নামে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রচার। পরবর্তী কালে এটি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।

পরধর্মসহিষ্ণুতায় সৈয়দ আহম্মদ খানের বিশেষ আস্থা ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই যে সর্ব ধর্মের মধ্যেই একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। এই ঐক্যের সূত্র হল বাস্তবজীবনের নৈতিকতা। তিনি মনে করতেন যে ধর্ম হচ্ছে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতাকে তিনি নিন্দা করতেন। তিনি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষেরও বিরোধী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "বর্তমানে আমরা ভারতের বায়ুতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে বেঁচে আছি। আমরা উভয়েই গঙ্গা যমুনার পবিত্র বারি পান করি। ভারতের মৃত্তিকাজাত শস্য খেয়েই আমরা বেঁচে আছি। আমাদের জীবন ও মৃত্যু একই প্রকার। ভারতে বাস করে আমাদের শোণিত ধারা একই প্রকার হয়ে গিয়েছে, আমাদের দেহগঠনও একই রকম, আমাদের আকৃতিতেও কোন তফাৎ নেই। মুসলমানগণ বহু হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হয়েছে। হিন্দুরাও মুসলমানদের বহু আচার গ্রহণ করেছে। আমরা এমনভাবে মিলে গিয়েছি যে আমরা উভয়ে একটি নূতন ভাষাই গড়ে তুলেছি। এটি মুসলমান বা হিন্দু কারোরই পূর্ব-ব্যবহৃত ভাষা ছিল না। আমরা যদি আমাদের নিজদিগকে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব বলে মনে করি তবে বলতে হবে যে আমরা ভারতেরই মানুষ, আমরা হিন্দু মুসলমান একটি জাতি। দেখা যাচ্ছে, আমাদের উন্নতি ও সুস্থিতি সবই নির্ভর করেছে আমাদের একতাবোধ, পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রেমের উপর। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ, একগুঁয়েমি, ঝগড়া-বিবাদ বা ঈর্ষাদ্বেষের পরিণাম হবে আমাদের নিশ্চিত সর্বনাশ।"

সৈয়দ আহম্মদ খানের উপরোক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য হিন্দু, পার্শী, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরাই মুক্ত হস্তে অর্থদান করেছিল। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দ্বারও সকল সম্প্রদায়ের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। 1898 খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল 64 আর মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল 285; সাতজন অধ্যাপকের মধ্যে দুইজন হিন্দু ছিলেন, এদের মধ্যে ছিলেন একজন সংস্কৃতের শিক্ষক। যাই হোক, জীবনের শেষ দিকে এই সৈয়দ আহম্মদ তাঁর অনুগামীরা যাতে ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনে যোগ না দেয় তার জন্য তিনি এই আন্দোলনে হিন্দু-প্রাধান্যের জন্য আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে এই জাতীয় আন্দোলন শুধু হিন্দুদের ব্যাপার। সৈয়দ আহম্মদের উপরোক্ত মতটি বেশ দুঃখজনক, কারণ সৈয়দ

আহম্মদ খান্ স্বভাবধর্মে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন না। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে অনগ্রসরতার নিরাকরণ তাঁর অভীষ্ট ছিল। তাঁর রাজনৈতিক ধারণা এই ছিল যে রাজনীতির দিক থেকে দেশের আশু উন্নতির কোন আশা নেই, কারণ ব্রিটিশ সরকারকে হঠানোর কাজটা মোটেই সোজা নয়। আর একদিকে তাঁর মনে এই ভয় দেখা দিয়েছিল যে সরকারী কর্তৃপক্ষকে চটিয়ে দিলে দেশে শিক্ষাবিস্তার ব্যাহত হবে। রাজনৈতিক অগ্রগতির চেয়ে দেশে শিক্ষাবিস্তারের কাজকেই তাঁর বেশী আবশ্যক বলে মনে হয়েছিল। তাঁর মনে এই বিশ্বাস ছিল যে যখন ভারতবাসী ঠিক ইংরাজদের মতই আধুনিকতা সম্পন্ন ও কর্মঠ হয়ে উঠবে তখনই তারা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। এই কারণে তিনি ভারতবাসী বিশেষভাবে শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়কে কিছুকালের জন্য সকল প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন রাজনীতিতে যোগদানের সময় তখনও আসেনি। বস্তুতঃ তিনি এই সময়ে তাঁর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিস্তার কার্যে এতদূর ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি অন্যসব কর্মকাণ্ডগুলি আপাততঃ স্থগিত রাখতে চেয়েছিলেন। পাছে রক্ষণশীল মুসলমানগণ তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এই আশঙ্কায় তিনি ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলন থেকেও বিরত হয়েছিলেন। ঠিক এই কারণে অর্থাৎ তাঁর স্ব-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ জন্মাতে পারে এমন কোন কাজে লিপ্ত হতেন না। অন্যদিকে এই সময় তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতা প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতে সুরু করেন। তাঁর পক্ষে এটা ছিল একটা বড় রকমের রাজনৈতিক মতিভ্রম, কারণ উত্তরকালে এর পরিণাম খুবই ক্ষতিকর হয়েছিল। তদুপরি, তাঁর অনুগামীদের অনেকেও তাঁর উদারমতবাদী আদর্শচ্যুত হয়ে ইসলাম ও তার অতীত গৌরব প্রচারে অত্যুৎসাহী ভাবে অন্যান্য ধর্মের নিন্দা প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন।

সৈয়দ আহম্মদের ধর্মপ্রবণতা তাঁকে সমাজ-সংস্কারেও আকৃষ্ট করেছিল। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে মধ্যযুগ সুলভ আচার, চিন্তা ও আচরণ পরিত্যাগ করাতে চেয়েছিলেন। বিশেষভাবে তিনি মুসলমান সমাজে নারীর অবস্থার উন্নতিকল্পে প্রবন্ধাদি লিখতেন। তিনি মুসলমান নারীদের পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করতেন এবং তাদের শিক্ষার উন্নতিও চাইতেন। মুসলমান

সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ এবং যথেচ্ছ তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদেরও তিনি বিরোধী ছিলেন।

সৈয়দ আহম্মদ খান্‌কে তাঁর কাজকর্মে তাঁর একদল বিশ্বস্ত অনুগামী যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। মোটামুটিভাবে এঁরা আলিগড় সম্প্রদায় নামে আখ্যাত। এই আলিগড় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন চিরাগ আলি, উর্দু ভাষার কবি আলতাফ্‌ হুসেন হালি, মৌলানা শিবলি নোমানি ও নাজির আহম্মদ।

মহম্মদ ইকবাল

আধুনিক ভারতের একজন অতি বিশিষ্ট কবি মহম্মদ ইকবাল (1876-1938) তাঁর কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে তরুণ ভারতীয় সমাজের দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর এই প্রভাব শুধু মুসলিম যুবকদের নয় সমানভাবে তা' হিন্দু তরুণদেরও চিত্ত স্পর্শ করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মতই তিনি প্রবল কর্মোদ্যোমের সপক্ষে এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে নৈরাশ্য, নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করেছিলেন। তিনি চাইতেন একটা বৈপ্লবিক ভাবধারা ও কর্মোদ্যম যা জগতকে নূতনরূপে গড়ে তুলবে। মূলতঃ তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। মানুষের কর্মশক্তিকে তিনি সর্বোত্তম গুণ রূপে বিবেচনা করতেন। তাঁর আদর্শ ছিল এই যে প্রকৃতির কাছে অথবা প্রচলিত ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে দুর্গতিবহন মানব ধর্ম নয়। তাঁর মতে প্রবল কর্মনিষ্ঠা প্রয়োগ করে বিশ্বব্যাপারকে নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মানব ধর্ম। যা ঘটছে ঘটুক, নির্বিচারে তাই ঘটতে দেওয়া তাঁর মতে ছিল ঘোরতর নৈতিক বিচ্যুতি। তিনি ধর্মানুষ্ঠান, অনাবশ্যক কৃচ্ছ্রসাধন, ও ইহলোক চিন্তা বাদ দিয়ে পরকাল চিন্তা যারা করে থাকে তাদের নিন্দা করতেন। তাঁর শিক্ষা ছিল কর্মের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে ইহজগতেই সুখের সন্ধান মানুষের কর্তব্য। তাঁর প্রথম যুগের রচনায় তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমের প্রবক্তা। তবে পরবর্তী কালে তিনি মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

পার্শী সমাজে ধর্মীয় সংস্কার

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বোম্বাইয়ে পার্শীদের মধ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। 1851 খ্রীষ্টাব্দে নওরোজী ফার্দুনজী, দাদাভাই নওরোজী, এস্‌.এস. বেঙ্গলী প্রভৃতি পার্শী নেতৃবৃন্দ—'রেহ্‌নুমাই মাজদায়াসন

সভা' বা ধর্মসংস্কার সভার প্রবর্তন করেন। ধর্মীয় ব্যাপারে রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এঁরা পার্শী সমাজকে আধুনিক রূপ দান করার চেষ্টা করেছিলেন। নারীশিক্ষা প্রচার, বিবাহবিধি সংস্কার এবং সমাজের নারীদের দুরবস্থার প্রতিকার এঁদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালে ভারতীয়দের মধ্যে পার্শী-সম্প্রদায় সবচেয়ে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন রূপে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

শিখদের মধ্যে ধর্মসংস্কার

অমৃতসরে খালসা কলেজ স্থাপনের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শিখদের মধ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তবে 1920 খ্রীষ্টাব্দে অকালি আন্দোলনের উদ্ভবের পরই এই আন্দোলন বেশ ফলপ্রসূ হতে পেরেছিল। অকালিদের মূল লক্ষ্য ছিল শিখদের ধর্মীয় কেন্দ্র গুরুদ্বারগুলির সুপরিচালনা বা এদের দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখা। ধর্মানুরাগী শিখদের বদান্যতায় গুরুদ্বারগুলি প্রচুর অর্থ ও জমিজায়গার অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু এইগুলির পরিচালনভার স্বেচ্ছাচারী দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর মোহান্তদের অধিকারভুক্ত ছিল। অকালি নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় শিখ জনসাধারণ 1921 খ্রীষ্টাব্দে মোহান্তদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হয়েছিল কারণ সরকারী কর্তৃপক্ষ ছিল এই দুর্নীতিপরায়ণ মোহান্তদের পৃষ্ঠপোষক। অকালি নেতৃবৃন্দ 1922 খ্রীষ্টাব্দে সরকারকে 'শিখ গুরুদ্বার আইন' নামে একটি আইন প্রবর্তন করতে বাধ্য করেছিলেন। এই আইনটি 1925 খ্রীষ্টাব্দে আর একবার সংশোধিত হয়। কখনও বা এই আইনের সাহায্যে কখনও বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মারফৎ শিখ জনসাধারণ ধীরে ধীরে গুরুদ্বারগুলি থেকে দুর্নীতিপরায়ণ মোহান্তদের অপসারিত করতে সমর্থ হয়েছিল। তবে এই ব্যাপারে বহু সংগ্রামী শিখকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

আগে যে সংস্কার আন্দোলন ও সংস্কার কর্মীদের কথা বলা হয়েছে এ ছাড়াও উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বহু সংস্কার আন্দোলনের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল।

বর্তমান যুগের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে একধরনের ঐক্য বা সাদৃশ্য অবশ্য লক্ষণীয়। এই আন্দোলনগুলির পেছনে দ্বিবিধ প্রেরণা কার্যকর

ছিল। এর একটি উৎস ছিল যুক্তিবাদ অপরটি ছিল মানবতাবাদ। তবে এই দ্বিবিধ প্রেরণার সঙ্গেই কখনও কখনও প্রাচীন অনুশাসন ও মতবাদেরও আশ্রয় নেওয়া হত। কারণ কোন প্রাচীন অনুশাসনের সমর্থন স্বভাবতই জনগণকে অধিকতরভাবে আকৃষ্ট করে থাকে। এই সংস্কার আন্দোলন নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই বেশী আকৃষ্ট করত, কারণ এতে তাদেরই আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি রূপায়িত হত। এই সংস্কার আন্দোলনগুলির লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারগুলি থেকে মুক্ত করে মানুষের মনে চিন্তা-শক্তির সঞ্চার ও যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা। অর্থহীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, অন্ধ-বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে ভারতীয় ধর্মগুলিকে যুক্তিগ্রাহ্যরূপে প্রতিষ্ঠা দান এই সংস্কার আন্দোলনগুলির লক্ষ্য ছিল। ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে অনেকে ধর্মগ্রন্থের সবটুকুই বিনাবিচারে মেনে নিতে অস্বীকার করেন, ধর্মগ্রন্থের যেসব বক্তব্যে যুক্তিহীনতা ও অবৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিকে তাঁরা নিজেরা বর্জন করেছিলেন এবং অন্যদেরও এগুলি বর্জন করতে শিখিয়ে-ছিলেন। এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন "প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তথ্য যুক্তি দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে তবেই জনসমাজে গৃহীত হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের মতই যুক্তি প্রয়োগ করা হয়। যদি তাইই হয় তবে ধর্ম-বিজ্ঞানকেও যুক্তির নিরিখে যাচাই করে নেওয়া উচিত। আমার মতে ধর্মও যুক্তি-বিচার সাপেক্ষ এবং যত দ্রুত ধর্ম-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যুক্তি প্রয়োগ হয় ততই মঙ্গল।"।

কোন কোন ধর্মসংস্কারক আবার অতীতের দোহাই দিতেন। তাঁরা বলতেন যে তাঁরা নুতন কিছুই বলছেন না, শুধু তাঁরা প্রাচীনকালীন সেইসব খাঁটি মত, বিশ্বাস ও প্রথা পুনরুজ্জীবিত করতে চাইতেন। তবে মুস্কিলের ব্যাপার ছিল এই যে অতীতের অবস্থা কি ছিল তাই নিয়ে মতভেদ থেকে যেত। অতীতের পুনরুজ্জীবনের আহ্বানে কতকগুলি সমস্যা দেখা দিত। বিচারপতি রাণাড়ে অনেক সময় জনসাধারণকে অতীতের ভাল দৃষ্টান্তগুলি অবলম্বনের পরামর্শ দিতেন। কিন্তু অতীতের দিকে নির্ভর করা সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তিনি লিখেছিলেন, "কোন্ অতীতকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করব? আমরা কি আমাদের পূর্বপুরুষদের সেইসব অভ্যাসগুলি ফিরিয়ে আনব? এখন ত আমরা জানতে পেরেছি যে অতীতে আমাদের উচ্চতম বর্ণের মানুষেরাও পশুমাংস ভক্ষণ ও মাদক-

জাতীয় পানীয় পান করত। আগের দিন বার রকমের পুত্র ছিল, বিবাহ-পদ্ধতি ছিল আট প্রকার, এই বিবাহ আবার বলপূর্বক অপহরণ, অবৈধ সহবাসজাতও হতে পারত।…বৎসরের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পশুবধ যজ্ঞ চলত, অনেক সময় ঈশ্বরের তৃপ্তি বিধানের জন্য নরবলিও দেওয়া হত…আমরা অতীতের সতীদাহ প্রথা, শিশুহত্যা ইত্যাদি প্রথাগুলি কি ফিরিয়ে আনব?”

এই ধরনের সমালোচনার শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সমাজ একটা গতিময় বস্তু, জড় পদার্থ নয়। প্রতিনিয়ত এর পরিবর্তন ঘটছে সুতরাং আগের সমাজে ফিরে যাওয়া বর্তমান কালের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত যা তা' মৃত, পুড়িয়ে দেওয়া বা পুঁতে ফেলা যা কিছু তা ঐ অবস্থাতে থাকুক। যে কাল কেটে গেছে, তা কেটেই যাক, আর তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার নেই। যে সংস্কারকগণ অতীতকালের সমাজব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে চাইতেন, তারাই এটা এমনভাবে ব্যাখ্যা করতেন যাতে তাঁদের প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি অতীতসম্মত রূপে জনগ্রাহ্য হয়। অনেক সময় নূতন দৃষ্টিকোণ থেকেই এই সংস্কার প্রচেষ্টাগুলির উদ্ভব হত, এগুলিকে লোকগ্রাহ্য করার জন্য বলা হত এই বস্তুগুলি আমাদের দেশে অতীতেও বর্তমান ছিল। যেখানে সংস্কার প্রস্তাবগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতের পরিপন্থী হত সেখানে বলা হত শাস্ত্রমতে এইগুলি যুক্তি-যুক্ত হত, শাস্ত্রগুলিকে বিকৃত করা হয়েছে বলেই এই বৈসাদৃশ্য। যাঁরা রক্ষণশীল তাঁরা শাস্ত্র বিকৃতির এই যুক্তি মেনে নিতেন না, কাজেই সংস্কারকদের সঙ্গে এঁদের বিরোধ উপস্থিত হত। প্রথম দিকে এইজন্য এইসব সংস্কারকগণ ধর্ম বা সমাজদ্রোহী রূপে নিন্দিত হতেন। স্বামী দয়ানন্দের মত ধর্মসংস্কারককেও এই রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সম্বন্ধে লালা লাজপত রায়ের রচনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে—“জীবদ্দশায় স্বামী দয়ানন্দকে বহু অপমান ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের উদ্যোগে তাঁকে বহুবার হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তাঁকে হত্যা করার জন্য হত্যাকারীও নিযুক্ত করা হয়েছিল। বক্তৃতামঞ্চে আলোচনাচক্রে তাঁকে লক্ষ্য করে ইঁট পাটকেল বা গুলি ছোঁড়া হত। তাঁকে নাস্তিক, পাষণ্ড ইত্যাদিও বলা হত। আবার অনেকে বলত যে তিনি খ্রীষ্টানদের দ্বারা হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।”

ঠিক একইভাবে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ সৈয়দ আহম্মদ খানের উপর

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁকে গালিগালাজ করা হত; তাঁর নামে ধর্মের নিন্দা করার 'ফতোয়া' জারী করা হয়েছিল। তাঁর প্রাণনাশেরও চেষ্টা হয়েছিল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলিতে মানবতাবাদের দিক থেকে পুরোহিততন্ত্র ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির বিরোধিতা করা হত। এই আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল এই যে ধর্মশাস্ত্রগুলিকে যুক্তিনির্ভর হতে হবে এবং এটাও বিচার করে দেখতে হবে যে শাস্ত্র-বচনগুলি মানুষের কল্যাণসাধক কি না? যে ধর্মশাস্ত্র যুক্তিনির্ভর নয়, যার অনুশাসনগুলি মানবতাবাদ-প্রণোদিত নয় তা বাতিল করতে হবে। এই মানবতাবাদের একটা সংজ্ঞাও নির্ধারিত হয়েছিল। এই নীতি অনুসারে মানুষ উন্নতিশীল এবং যে নৈতিক মূল্যবোধগুলি এই উন্নতি এনে দিয়ে থাকে শুধু সেইগুলিই গ্রহণীয়। কাজেই ভারতে যেসব সংস্কার-মূলক আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল তাতে মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলিই সমধিক মর্যাদা পেয়েছিল।

এই সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি নিছক ধর্মীয় ভাবনা ছাড়াও ভারতীয় সমাজে অধিকতর আত্মমর্যাদা বোধ, আত্মবিশ্বাস ও স্বদেশের জন্য গৌরব বোধ সঞ্চারের চেষ্টা করেছিল। ভারতের অতীত ধর্মচিন্তাকে যুক্তিগ্রাহ্য রূপে রূপায়ণ এবং উনবিংশ শতাব্দীর দুর্নীতিমূলক যুক্তিহীন আচার অনুষ্ঠান ও কুপ্রথাগুলির মূলোচ্ছেদ করে ধর্মসংস্কারকগণ তাদের অনুগামীদের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। কারণ অতঃপর সরকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একথা আর বলার উপায় ছিল না যে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ অনুন্নত বা ধ্বংসোন্মুখ। জওহরলাল নেহেরু এই অবস্থার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে এই সময়ে নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে রাজনীতির বা দেশের উন্নতির দিকেই ঝুঁকেছিল। তবে এদের একটা সাংস্কৃতিক খুঁটি অবলম্বনেরও প্রয়োজন ছিল। কারণ তারা একটা প্রেরণা লাভ করতে চেয়েছিল এবং তারা কারো চেয়ে হীন নয় এই আশ্বাসের প্রয়োজন ছিল। দীর্ঘ দিনের বিদেশী শাসনের গ্লানি, অপমান ও হতাশা থেকে তারা অব্যাহতি পেতে চেয়েছিল।

ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন বহু ভারতীয় ব্যক্তিকে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে সাহায্য করেছিল। এখন তারা তাদের প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাসকে আধুনিক ছাঁচে ঢেলে নিয়ে তাকে নবোদ্ভূত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের উপযোগী করে দিতে পেরেছিল। ভারতের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে

মনে গর্ববোধ পোষণ করেও আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের মহত্ত্ব স্বীকার করে নিতে ভারতবাসীর অতঃপর কোন অসুবিধা হয়নি। অবশ্য এমন অনেক লোক ছিল যারা বলত যে সবই ভারতে একদিন ছিল, এসব কিছু নোতুন ব্যাপার নয়। যাই হোক সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বহু ভারতবাসী জাতি এবং ধর্মের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে একটা আধুনিক, বাস্তব-সম্মত ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করে নিয়েছিল। তবে জাতিভেদ বা ধর্মান্ধতা প্রবণতা যে একেবারে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল এটা বলা চলে না। নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে বহু ভারতীয় মানুষ তাঁদের জীবনকালের মধ্যেই শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। এটা ছিল আগের কালের বিপরীত ঘটনা, তখন মানুষ সব দোষ অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকত, আশা করত পরজন্মে যদি কিছু অবস্থার উন্নতি হয়। নবজাগরণের আর একটি সুফল হয়েছিল এই যে ভারতবাসী সংস্কৃতি ও চিন্তার দিক থেকে আর কূপমণ্ডুক হয়ে থাকেনি, বিশ্বের অবশিষ্ট অংশের মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতে আগ্রহান্বিত হয়েছিল। আবার বিশ্বের সঙ্গে যোগ রাখতে গিয়ে পাশ্চাত্যের সবকিছুকেই তারা অন্ধভাবে গ্রহণ করেনি। এমনকি পাশ্চাত্যের সবকিছু অন্ধভাবে যারা অনুকরণ করত ভারতীয় সমাজ তাদের নিন্দা করতেও দ্বিধা বোধ করেনি।

এই সঙ্গে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের দুটি নেতিবাচক দিকের আলোচনারও প্রয়োজন। প্রথমতঃ এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলি দেশের বৃহত্তর জন-সমাজকে প্রভাবিত করতে পারেনি। নগরকেন্দ্রিক মুষ্টিমেয় মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। নগরবাসী দরিদ্রশ্রেণী এবং দেশের কৃষক-চাষীদের কাছে এই আন্দোলন পৌছাতে পারেনি। এই সমাজ মোটা-মুটি চিরাচরিত ধরনে চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। ভারতীয় সমাজের শিক্ষিত নাগরিকেরাই মুখ্যতঃ এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফল ভোগ করেছিল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতিবাচক আর একটি দিকও ছিল, এটি বেশ ক্ষতিকরও দাঁড়িয়েছিল। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পেছনের দিকে তাকানোর একটা প্রবণতা ছিল, অতীত কত মহিময় ছিল এর উপর বেশ জোর দেওয়া হত। শাস্ত্রনির্ভরতাও ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ। সংস্কার আন্দোলন

যে বাস্তব উন্নতিসাধন করতে চাইত কার্যতঃ সেটা অতীতের দিকে চেয়ে থাকার প্রবণতায় বেশ ব্যাহত হত। কারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও যুক্তি প্রবণতার এটা ছিল বিপরীত ধারা। এই ধারা পরিচ্ছন্ন বা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সৃষ্টির পরিবর্তে নুতন ধরনের এক অতীন্দ্রিয়তাবাদী মানসিকতার সৃষ্টি করত। ভারতের অতীত মহিমার দিকে পুনঃপুনঃ দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে সাধারণের মনে একটা বৃথা দম্ভ ও আত্মতুষ্টির মনোভাব সৃষ্ট হত। অতীতের 'স্বর্ণযুগ'-এর মোহ সৃষ্ট হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার একটা অজুহাত গড়ে তুলত। এতে বাস্তবে জাতীয় অগ্রগতির সাধনায় বাধার সৃষ্টি হত। অতীতবাদী ধ্যান ধারণার পুনরুজ্জীবনের ফলে হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি দেখা দিয়েছিল এমনকি হিন্দু-সমাজের মধ্যেও উচ্চজাতি ও নিম্নজাতির মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি প্রকট হয়ে উঠা সম্ভব হয়েছিল। যে দেশে বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস সেখানে ধর্মের উপর সবটুকু গুরুত্ব অর্পণের পরিণামে সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রাদুর্ভাব নিশ্চিত হয়ে পড়ে। আমাদের ধর্মসংস্কারকেরা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সব দিকের প্রতি লক্ষ্য দেননি, তাঁরা ধর্মতত্ত্বের উপরই বেশী জোর দিয়েছিলেন। এই ধর্মচিন্তা বা দর্শন যে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ঐতিহ্যের ধারাবাহী নয় এটা তাঁরা বোঝেননি। ভারতের স্থাপত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে যে কোন সম্প্রদায়ের ভারতবাসীই গৌরব অনুভব করার অধিকারী। দুঃখের বিষয় এই সাধারণ ঐতিহ্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা হয়নি, এটি উপেক্ষিত হয়েছিল। হিন্দু ধর্মসংস্কারকেরা ভারতের ঐতিহ্যের উল্লেখ করতে গিয়ে ভারতের প্রাচীন যুগের কথাই আলোচনা করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত উদারমনা ব্যক্তিও অতীতের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সুপ্রাচীন যুগের আলোচনার উপর গুরুত্ব অর্পণ করতেন। এই সংস্কারকেরা ভারতের মধ্যযুগকে অবক্ষয়ের যুগ রূপে গণ্য করতেন। এই ধারণা অবশ্যই ইতিহাস-বিরোধী। এই ধারণা সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও হানিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ধারণা থেকেই দুই জাতি তত্ত্বের ধারণা অঙ্কুরিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের দোষ-ত্রুটিগুলি ঢেকে রেখে তার নির্জলা মহিমাপ্রচার হিন্দু সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর

মানুষদেরও শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা যুগ-যুগান্তর ধরে যে নির্যাতন ভোগ করে এসেছিল তার সূচনা হয়েছিল এই প্রাচীন যুগেই। কাজেই প্রাচীন যুগের মহিমাপ্রচার তাদের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। যাই হোক, প্রাচীন ভারতের ঐহিক সভ্যতা বা সংস্কৃতির মহিমা প্রচারিত হওয়ার ফলে ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষ তাতে গর্ব অনুভব করতে পারেনি, এই অতীত ইতিহাস তাদের মনে কোন নবপ্রেরণার সঞ্চার করতে পারেনি। কারণ ভারতের বহু জনগোষ্ঠিই সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীরূপে নিজেদের চিন্তা করতে পারেনি। অতীতের মহিমা উদ্ঘাটনের আর একটা কুফলও দেখা দিয়েছিল। ইতিহাস এখন এক একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের ইতিহাস হয়ে উঠেছিল। মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকে এখন তাদের ঐতিহ্য চর্চা ও গর্ববৃদ্ধির জন্য পশ্চিম এশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল। ক্রমশঃ দেখা গেল যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও পার্শী এমনকি নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে কেউই নিজেদের এক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে ভাবছে না, তারা সকলেই এক একটি ভিন্ন ঐতিহ্যের ধারক বা বাহক বলে মনে করতে সুরু করেছিল। একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা দিয়েছিল এই যে, ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সমাজের যে অংশকে একেবারেই স্পর্শ বা প্রভাবিত করতে পারেনি সেই ক্ষেত্রে এরা নিজের নিজের ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানে নিমগ্ন থেকেই পরস্পরের সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বাস করছে। আনুষ্ঠানিক হিন্দুত্ব বা মুসলিমত্ব তাদের প্রীতিবন্ধন ছিন্ন করে দেয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি একত্র বাস করার ফলে একটা যে সম্মিলিত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ধর্মের পুনরুজ্জীবনের ফলে সেই সংস্কৃতিবন্ধন শিথিল হয়ে যাওয়ার দিকে ঝুঁকেছিল। তথাপি একথা বলা চলে যে ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কাজ বন্ধ থাকেনি। আবার একটি দুর্লক্ষণ দেখা গিয়েছিল যে একদিকে যেমন জনসাধারণের মনে যে পরিমাণ জাতীয় চেতনার বৃদ্ধি ঘটেছিল ঠিক তেমনি পরিমাণে মধ্যবিত্ত সমাজমনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিরও প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। আধুনিক কালে সাম্প্রদায়িক চেতনা সঞ্চারের একাধিক কারণ থাকলেও এটা বলা যেতে পারে যে বিগত শতাব্দীর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন এর জন্য বেশ কিছুটা দায়ী।

সামাজিক সংস্কার

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জাগরণের প্রভাব সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয়েছিল সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে। নতুন ধারায় শিক্ষিত সমাজের মানুষেরা অধিকতর সংখ্যায় কঠোর সামাজিক নিয়মকানুন ও অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এদের পক্ষে অর্থহীন ও অমানবিক সামাজিক প্রথাগুলি বরদাস্ত করা সম্ভব হয়নি। সামাজিক সাম্যের মানবিক আদর্শ ও সকল মানুষের সমান অধিকারেব চিন্তাই ছিল এদের প্রধান প্রেরণা।

প্রায় সব ধর্মসংস্কারকই সমাজ-সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তার কারণ জাতিভেদ প্রথা, নারীজাতির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রভৃতি ভারতীয় সমাজের ত্রুটিগুলির পেছনে অতীতে ধর্মীয় সমর্থন ছিল। ধর্ম-সংস্কারকগণ ছাড়াও সোস্যাল কনফারেন্স, ভারতসেবক সমাজ (সারভেন্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং খ্রীষ্টান মিশনারীগণ সক্রিয়-ভাবে সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জোতিবা গোবিন্দ ফুলে, গোপালহরি দেশমুখ, বিচারপতি রাণাড়ে, কে. টি. তেলঙ্গ, বি. এম. মালাবারী, ডি. কে. কার্ভে, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বীরেশ লিঙ্গম, বি. আর. আম্বেদকব প্রভৃতির মত বহু বিখ্যাত ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে 1919 খ্রীষ্টাব্দের পর সমাজ-সংস্কারেব কাজ জাতীয় জাগরণ আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সংস্কারের কাজে যাঁরা ব্রতী হতেন তাঁরা এখন থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষাগুলিকে তাঁদের প্রচারমাধ্যম রূপে বেছে নিয়েছিলেন। আঞ্চলিক ভাষার বহুল ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁদের বক্তব্যগুলি উপস্থিত করা। এঁরা উপন্যাস, নাটক, কবিতা, ছোট গল্প এবং সাময়িক ও সংবাদপত্রগুলিকে সমাজ-সংস্কারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সমাজ-সংস্কারের প্রচার-মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রও স্থান পেয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মসংস্কারের অঙ্গ হিসেবেই অনেক সময় সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হত। পরবর্তী কালে এই সমাজ-সংস্কার ক্রমশঃ ধর্মনিরপেক্ষ রূপে পরিচালিত হয়েছিল। এমনকি ধর্ম বিষয়ে রক্ষণশীল এমন বহু ব্যক্তিও

সমাজ-সংস্কারের কাজে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে উচ্চবর্ণের নব্য-শিক্ষিত সমাজ আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও নীতিবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্যই সমাজ-সংস্কার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ এই সংস্কারধর্মী চেতনা সমাজের দুঃস্থতর স্তরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে সমাজের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন তথা পুনর্গঠনের পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল। যথাকালে সমাজ-সংস্কারকদের আদর্শ ও লক্ষ্যগুলি সর্বজনসম্মত হয়ে উঠেছিল। এই আদর্শ ও লক্ষ্যগুলি বর্তমানে ভারতের সংবিধানের অঙ্গীভূত।

সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথম লক্ষ্য ছিল স্ত্রী-স্বাধীনতা ও তাদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার দান। আর দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল জাত-পাতের কঠোরতা হ্রাস ও বিশেষভাবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ।

স্ত্রী-স্বাধীনতা

বহু শতবর্ষ ধরে ভারতে স্ত্রী-জাতিকে পুরুষের অধীনতাপাশে বদ্ধ রাখা হয়েছিল। সামাজিকভাবেও নারী নির্যাতন বর্তমান ছিল। ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম-ব্যবস্থা ও এই ধর্ম-ব্যবস্থা সম্মত আইনে নারীর স্থান ছিল পুরুষের নীচে। এই ব্যাপারে উচ্চতর শ্রেণীর মহিলাদের অবস্থা কৃষকশ্রেণীর সাধারণ রমণীদের থেকেও হীনতর ছিল। কৃষকশ্রেণীর মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে হত এই জন্যে চলাফেরার ব্যাপারে তাদের কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। আর এই জন্যই নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে তারা কিছু মর্যাদাও ভোগ করত। উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের এই সুবিধা বা মর্যাদা ছিল না। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের 'পর্দা' মেনে চলার বিশেষ বাধ্যবাধকতা ছিল না, অনেকক্ষেত্রে এই শ্রেণীর মেয়েদের পুনর্বিবাহের অধিকারও দেওয়া হত। ভারতের প্রাচীন চিন্তায় মাতা ও স্ত্রীকে খুবই উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখা হলেও ব্যক্তি হিসেবে সমাজে এদের স্থান ছিল বেশ নীচে। মেয়েদের নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্বও স্বীকৃত হত না, একমাত্র স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই সমাজে তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হত। মেয়েদের নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের কোন ক্ষেত্র ছিল না, তার সমস্ত কর্মদক্ষতা বা প্রতিভাকে গৃহকর্ত্রীত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হত। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছারও

কোন মূল্য দেওয়া হত না। মোট কথা নারীকে পুরুষের সাহায্যকারিণী বা সঙ্গিনী ছাড়া আর কোনভাবে দেখা হত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে হিন্দুদের মধ্যে নারী একবারই বিবাহ করতে পারত, কিন্তু একজন পুরুষের একই সঙ্গে একাধিক বিবাহের অধিকার ছিল। মুসলমান পুরুষদের পক্ষেও এই বহু বিবাহের অধিকার ছিল। দেশের অধিকাংশ স্থানে মেয়েদের অবরোধ বা পর্দাপ্রথার মধ্যে বাস করতে হত। দেশের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রবল ছিল। অনেক সময় আট নয় বছর বয়সেরও ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত। বিধবারা আর বিবাহ করতে পারত না, তাদের কঠোরভাবে আচারনিষ্ঠ জীবনযাপন করতে হত। দেশের বহু স্থানে ভয়াবহ সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। মৃত স্বামীর দেহের সঙ্গে জীবন্ত স্ত্রীকেও পুড়িয়ে মারার নাম ছিল সতীদাহ। হিন্দু নারীগণের সম্পত্তির উপর কোন অধিকার ছিল না। অবাঞ্ছিত বিবাহবন্ধন থেকেও তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ছিল না। মুসলমান সমাজে মেয়েদের সম্পত্তির উপর অধিকার স্বীকৃত ছিল, তবে পুরুষ উত্তরাধিকারীদের যা প্রাপ্য তার অর্ধাংশ মাত্র তাদের প্রাপ্য ছিল। মুসলমান রমণীদের বিবাহবিচ্ছিন্নতার অধিকার ছিল, কিন্তু কার্যতঃ পুরুষ ও রমণীদের ক্ষেত্রে এই বিবাহবিচ্ছেদ আইনের সুবিধা বেশীরভাগ পুরুষেরাই ভোগ করত। এর ফলে মুসলিম রমণীরা নিজেদের দিক থেকে বিবাহবিচ্ছিন্না হতে ভয় পেত। হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণীরই নারীদের সামাজিক অবস্থা মর্যাদা একই প্রকার ছিল, অর্থাৎ দুই সমাজেই নারীদের অবস্থা হীন ছিল। দুই সমাজেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীদের পুরুষশাসিত হয়ে জীবনযাপন করতে হত। সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার এই ছিল যে উভয় সমাজের মেয়েদেরই শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত করে রাখা হত। মেয়েদের এমনভাবে গড়ে তোলা হত যে তাদের মনে পুরুষ-শাসন সম্পর্কে কোন বিরোধিতার সঞ্চার হত না, এমনকি তারা যে একান্তভাবে পুরুষ-সমাজ নির্ভর তার জন্য তাদের মনে এক ধরনের অহঙ্কার বা আত্মতুষ্টির মনোভাবও সঞ্চারিত করা হত। এটা অবশ্য বাস্তব সত্য যে মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে রাজিয়া সুলতানা, চাঁদবিবি বা অহল্যাবাঈ হোলকারের মত প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও উন্নতমনা মহিলার আবির্ভাব ঘটেছে। তবে ভারতের সাধারণ নারীসমাজের মধ্যে তাঁদের ব্যতিক্রম বলেই ধরে নেওয়া যায়। ভারতীয় নারীসমাজের সাধারণ অবস্থা

যে খুব ভাল ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসাধারণ মহিলার আবির্ভাবে তা প্রমাণ করা অসম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর মানবিকতাবাদ ও সামাজিক সুবিচার প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ সমাজ-সংস্কারকেরা নারীজাতির অবস্থার উন্নতির জন্য একটা প্রবল আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিলেন। কোন কোন সংস্কারক মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি অবহেলা অন্যায় এবং সব মানুষের প্রতি ভাল ব্যবহার করা উচিত এই যুক্তি দেখিয়ে সমাজের প্রতি আবেদন জানাতেন যে নারীকে তার সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে দেওয়া উচিত, তাঁদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ অন্যায়। আবার একদল সংস্কারক শাস্ত্র ঘেঁটে এই প্রচারে নেমেছিলেন যে স্ত্রী-জাতিকে অবনত করে রাখা শাস্ত্র-বিরোধী। ভারতে প্রচলিত হিন্দু, ইসলাম বা পার্শী কোন ধর্মশাস্ত্রেই মেয়েরা পুরুষের তুলনায় নগণ্য এমন কথা বলা হয়নি। ধর্মের প্রকৃত বাণী হল নারীদের উচ্চসম্মানের আসন দান।

বহু ব্যক্তি, সমাজ-সংস্কারক ও ধর্মীয় সংস্থা নারীশিক্ষা বিস্তার, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বিধবাদের অবস্থার উন্নতি, বাল্যবিবাহ নিরোধ, পর্দাপ্রথার বিলোপ, বহুবিবাহ নিরোধ এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর মহিলাদের স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অথবা চাকুরিতে নিয়োগ ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 1880 খ্রীষ্টাব্দের পর গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিনের স্ত্রীর নামে লেডি ডাফরিন হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল। এখানে ভারতীয় মহিলাদের সাধারণ চিকিৎসা বিশেষভাবে প্রসূতিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠার ফলে নারীমুক্তি আন্দোলনও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেও মহিলাগণ সক্রিয় ও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও 'হোমরুল' বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে বহু মহিলা অংশগ্রহণ করেন। 1918 খ্রীষ্টাব্দের পর মহিলারা রাজনৈতিক শোভাযাত্রা, মদ এবং বিলাতীবস্ত্রের দোকানগুলিতে 'পিকেটিং' এবং চরকা বা খাদি প্রচারে অংশগ্রহণ করতেন। অসহযোগ আন্দোলন কালে তাঁরা জেলে যেতেন। শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পুলিশের লাঠির আঘাত, কাঁদানে গ্যাস এমনকি বন্দুকের গুলিও সহ্য করতেন। বহু মহিলা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আন্দোলনেও অংশ

নিয়েছিলেন। দেশের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচনে মহিলাগণ শুধু ভোটই দিতেন না, এঁদের অনেকে নির্বাচন প্রার্থীও হতেন। ভারতীয় মহিলাদেরই একজন বিখ্যাত কবি সরোজিনী নাইডু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। 1937 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে জনপ্রিয় সরকার অর্থাৎ কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ে কয়েকজন মহিলা মন্ত্রী অথবা পরিষদীয় সম্পাদক (পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী) পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। 1920 খ্রীষ্টাব্দের পর দেশে ট্রেড-ইউনিয়ন বা শ্রমিক আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল। এই দুই আন্দোলনেই বহু ক্ষেত্রে মহিলাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিস্তারের অনেকগুলির উপলক্ষ্যের মধ্যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগদানই স্ত্রী-সমাজের জাগরণ ও মুক্তিকে সর্বাধিক সহায়তা দিয়েছিল। ব্রিটিশের জেল ও বন্দুকের গুলিকে যে নারী-জাতি ভয় পায়নি, তাদের পুরুষের চেয়ে কোন অংশে হীন ভাবা পুরুষ-সমাজের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেনি কি? এর পর তাদের গৃহকোণে দাসী বা খেলার পুতুল রূপে বদ্ধ রাখা আর সমাজের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে সসম্মানে বেঁচে থাকার জন্য নারীসমাজও কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল। শুধুমাত্র স্ত্রীস্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই আন্দোলনের উদ্ভব এদেশের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। 1920 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রগতিবাদী নেতৃবৃন্দই নারীমুক্তির জন্য কর্মরত ছিলেন। এই সময় থেকেই শিক্ষিতা এবং আত্মবিশ্বাসসম্পন্না মহিলাবৃন্দ এই আন্দোলনে অংশ নিতে সুরু করেন। এঁরা এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স্' (সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন) প্রতিষ্ঠানটি 1927 খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নারীজাতির মুক্তি আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল। ভারতীয় সংবিধানের চতুর্দশ ও পঞ্চদশতম অধ্যায় দুটিতে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। 1956 খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে পুত্র-সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে কন্যা-সন্তানদেরও সমান অধিকার অর্পিত হয়েছে। 1955 খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু বিবাহ আইনে কতকগুলি নির্দিষ্ট কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এক বিবাহ পুরুষ এবং নারী উভয়ের পক্ষেই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পণ দাবী

করা আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হলেও এই কুপ্রথাটি দুর্ভাগ্যক্রমে থেকেই গিয়েছে। সংবিধানে সরকারি চাকুরিতে মেয়েদেরও কর্মসংস্থান ও কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের নির্দেশক নীতি অনুযায়ী একই ধরনের কাজের জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই একই ধরনের বেতন বা পারি-শ্রমিক নির্ধারিত হয়েছে। তবে এটা স্বীকার করতে হবে স্ত্রী-পুরুষের সমা-নাধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু দৃশ্য এবং অদৃশ্য বাধা থেকে গিয়েছে। এর উপযোগী একটা সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টির কাজ এখনও বাকী আছে। সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, নারীদের নিজস্ব আন্দোলন এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান এই কাজ অনেকটা অগ্রসর করে দিয়েছে।

জাতপাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন

সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতিভেদ প্রথার অবসান। হিন্দুসমাজ এই সময়ে নানা জাতিতে (জাত্) বিভক্ত ছিল। কোন একটি বিশেষ জাতের ঘরে জন্মগ্রহণই হিন্দুসমাজকে মানুষের জীবনের ধারাটি সীমাবদ্ধ করে দিত। কোন একটি বিশেষ জাতে জন্মগ্রহণই ঠিক করে দিত যে তাকে কাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতে হবে বা বিয়ে চলবে। এই 'জাত' থেকেই ঠিক হয়ে থাকত সে জীবনে কোন বৃত্তি গ্রহণ করবে, এবং তাকে কোন কোন নিয়মগুলি সামাজিক জীবনে মেনে চলতে হবে। জাতগুলির ধরন ছিল নীচু থেকে ক্রমশঃ উঁচু। এই ধাপের সর্বনিম্নে ছিল অচ্ছুত বা অস্পৃশ্যগণ (এরা পরবর্তী কালে তফ্‌শীলভুক্ত জাতি রূপে পরিগণিত হত)। এই অস্পৃশ্য বা তফ্‌শীলভুক্তেরা ছিল সমগ্র হিন্দুসমাজের এক-পঞ্চমাংশ। এই অস্পৃশ্য বা অচ্ছুতদের বহুবিধ কঠোর বিধিনিষেধের অধীনতা ভোগ করতে হত, এদের 'অধিকার'গুলিও বেশ সীমাবদ্ধ ছিল। তবে অঞ্চলভেদে এই 'বিধি-নিষেধ' বা অধিকার নিয়ে তারতম্য ছিল। অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করলে অন্যেরা অপবিত্র বা দূষিত হয়ে যায়—এমনি ধারণাও সমাজে প্রচলিত ছিল। দেশের কোন কোন অংশে বিশেষভাবে দক্ষিণাঞ্চলে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের ছায়া দেখলেও তা এড়িয়ে যাওয়া হত, এইজন্য কোন ব্রাহ্মণ রাস্তা দিয়ে হাঁটছে বা আসছে শুনলে তথাকথিত অচ্ছুতদের সেখান থেকে সরে যেতে হত বা সরিয়ে দেওয়া হত। অস্পৃশ্য শ্রেণীদের পোষাক, খাদ্য ও বাসস্থান সবই নির্দিষ্ট থাকত, এর বাইরে তাদের কিছু করার

উপায় ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা যে পুকুর বা কূপ থেকে জল সংগ্রহ করত সেগুলি অচ্ছুতদের ব্যবহার করতে দেওয়া হত না। তাদের জন্য আলাদা কূপ ও পুকুর নির্দিষ্ট করা থাকত। যেখানে এই বিশেষ ব্যবস্থা থাকত না সেখানে অচ্ছুতদের সেচের খাল বা এঁদো পুকুরের দূষিত জল ব্যবহার করতে হত। অচ্ছুতদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠেরও অধিকার ছিল না। বর্ণ হিন্দুশ্রেণীর সন্তানেরা যে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত সেখানে অচ্ছুত শ্রেণীর সন্তানেরা পড়তে পেত না, কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম ছিল। অচ্ছুত শ্রেণীর মানুষদের সামরিক অথবা পুলিশ বিভাগে চাকুরীর সুযোগ দেওয়া হত না। অচ্ছুত শ্রেণীর মানুষেরা ভৃত্যের কাজ করতে বাধ্য হত, এছাড়া যেসব কাজ 'ঘৃণিত' বা অপবিত্র মনে করা হত সেই কাজগুলি করেই তাদের জীবনধারণ করতে হত। এইসব কাজ ছিল আবর্জনা সাফ করা (ধাঙ্গর বা মেথরের বৃত্তি) জুতা তৈরী, মড়া-ফেলা, মৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো, চামড়া তৈরী ইত্যাদি। সাধারণত অচ্ছুতদের কোন জমির মালিক হতে দেওয়া হত না। ঠিকা শ্রমিক অথবা ক্ষেতমজুরের কাজই তারা করতে পেত।

জাতিভেদ প্রথার আর একটি অনিষ্টকর দিকও ছিল। জন্মসূত্রে কোন মানুষকে ছোট করে রাখার চেষ্টা গণতন্ত্র বিরোধী। অবমাননাজনক, অমানবিক ও গণতন্ত্র বিরোধী এই জাতিভেদ প্রথা সামাজিক সংহতির পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিজনক প্রমাণিত হয়েছিল। দেশের মানুষকে এই জাতিভেদ প্রথা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। আধুনিক কালে জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্র প্রচারে এই জাতিভেদ প্রথা, প্রচুর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই জাতিভেদ ভাবনা থেকে মুসলিম, খ্রীষ্টান ও শিখ সমাজও মুক্ত ছিল না। বিশেষভাবে বিবাহ ব্যাপারে কে বড় কে ছোট বিচার করা হত। এই সমাজগুলিও স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতার ভেদ-বুদ্ধি থেকে মুক্ত ছিল না। তবে এই সমাজগুলিতে বাছ-বিচারের তীব্রতা হিন্দু-সমাজ থেকে কিছু কমই ছিল।

ব্রিটিশ শাসনের আওতায় এমন কতকগুলি পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটেছিল যেগুলি জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিমূল শিথিল করে দিয়েছিল। আধুনিক শিল্পকারখানা, রেলওয়ে ও মোটরবাসের প্রবর্তন হওয়াতে বিশেষভাবে নগরাঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মানুষদের পরস্পরের সান্নিধ্যে আসা অপরিহার্য

হয়ে উঠেছিল। আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার যে কোন মানুষের সামনেই অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ এনে দিয়েছিল। এখানে একটা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ অথবা অন্য উচ্চবর্ণের একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে জুতো অথবা চামড়ার ব্যবসা করার সুযোগ এলে তার পক্ষে এটা 'ছোট কাজ' মনে করে তা অবহেলা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। চিকিৎসক অথবা সৈনিকদের পদ পেলে কোন ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে তা উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। জমি বিক্রয় অবাধ হয়ে যাওয়াতেও জাতপাতের কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শিল্প-নির্ভর আধুনিক সমাজব্যবস্থায় লাভ করা বা অধিক অর্থ উপার্জন সকলেরই লক্ষ্য হয়ে উঠায় কোন একটা পেশার সঙ্গে কোন একটা জাতের চিরায়ত বন্ধনেরও মূলোচ্ছেদন হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিটিশরাজের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় 'জাত' ব্যাপারটি অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। আইনের চোখে সব 'জাত'কেই একই স্তরে আনা হয়েছিল। বিচারব্যবস্থায় কোন একটি বিশেষ জাতের পঞ্চায়েতের অধিকার হরণ করা হয়েছিল। প্রশাসনিক চাকুরীতে ধীরে ধীরে যেকোন জাতেরই অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা জাতিভেদ প্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতিভেদ প্রথা বিরোধী বাতাবরণ সৃষ্টি করে দিয়েছিল, এটা হয়ে তা বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

নবযুগের গণতান্ত্রিক ও যুক্তিবাদী ভাবধারায় নিষ্ণাত-ভারতের শিক্ষিত-সমাজ জাতিভেদ প্রথার অনিষ্টকারিতা বুঝতে পেরে এই প্রথার বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্ম-সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, থিয়োজফিস্টগণ এবং সোসাল কনফারেন্স বা সমাজোন্নয়ন সমিতি প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজসেবা বা সংস্কারমূলক প্রায় সব প্রতিষ্ঠানগুলিই জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোন কোনটি চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন সত্ত্বেও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধতা করেছিল। বিশেষভাবে অস্পৃশ্যতার মত অমানবিক কুপ্রথার বিরুদ্ধেই ছিল এদের আক্রমণ বা জেহাদ। সমাজ-সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দের দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য বা জাতীয় উন্নতিসাধন দেশের

লক্ষ লক্ষ মানুষকে সসম্মানে বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কখনই সম্ভব হতে পারে না।

জাতীয় আন্দোলনের গতিবৃদ্ধির ফলেও জাতিভেদপ্রথা বা 'জাত্‌পাত্‌' প্রবণতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতবাসীর মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগাতে বা বাঁচিয়ে রাখতে পারে এমন সবকিছু আচার-আচরণ বা প্রথার বিরুদ্ধতা করাই ছিল জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। বিক্ষোভ-মিছিল, বিরাট ধরনের জনসভা ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সকল শ্রেণীর মানুষের যোগদানে দেশের মধ্যে জাতিভেদ চেতনা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। স্বাধীনতা ও সকলের সমানাধিকারের দাবী নিয়ে যারা বিদেশী শাসন উচ্ছেদের জন্য সংগ্রামে নেমেছিল তাদের পক্ষে জাতিভেদ প্রথা সমর্থন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, কারণ স্বাধীনতা ও সাম্য-নীতির সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার সহাবস্থান অকল্পনীয়। বস্তুতঃ সমগ্র জাতীয় আন্দোলন বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুদয় কাল থেকেই কোন বিশেষ 'জাত্‌'-এর বিশেষ সুযোগসুবিধার দাবীর বিরোধিতা করা হয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের সূচনা কাল থেকেই তার লক্ষ্য ছিল জাতিধর্ম এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সমান সামাজিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা।

জনসেবার ক্ষেত্রে গান্ধীজি আমরণ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণেরই কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। 1932 খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই উদ্দেশ্যে 'নিখিল ভারত হরিজন সঙ্ঘ' (All India Harijan Sevak Sangh) নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বহু ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান অস্পৃশ্যদের (পরবর্তী কালে এদের অনুন্নত শ্রেণী এবং তফ্‌শীলী জাতি বলা হত) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছিল। বিদ্যালয় ও দেবমন্দিরে যাতে এরা ঢুকতে পারে এবং সাধারণ ব্যবহার্য কূপ ও পুষ্করিণীগুলি যাতে এরা ব্যবহার করতে পারে তার জন্য আন্দোলন সুরু করা হয়েছিল। তথাকথিত অস্পৃশ্যেরা যেসব সামাজিক অবিচার ও ভেদনীতির শিকার সেইসব অবিচার ও ভেদনীতি দূর করার কাজও পূর্ণোদ্যমে সুরু করা হয়েছিল।

শিক্ষা এবং জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরাও জেগে উঠেছিল। মানুষের জন্মগত অধিকারগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে

তারাও এই অধিকারগুলি অর্জনের চেষ্টা সুরু করেছিল। উচ্চবর্ণের মানুষদের হাতে আবহমান কাল তারা যে দুর্ব্যবহার পেয়ে এসেছে তার প্রতিকারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তারাও আন্দোলনে নেমেছিল। তথাকথিত নিম্নবর্ণের ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর স্বয়ং জাতিভেদমূলক অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'নিখিল ভারত অনুন্নত সমাজ' (All India Depressed Classes' Federation) নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তফ্‌শীলভুক্ত শ্রেণীর অন্য কয়েকজন নেতা এমনি ধরনের আর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন (অল ইণ্ডিয়া ডিপ্রেসড্‌ ক্লাসেস্‌ এসোসিয়েশন)। 1920 খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণেতর সাধারণ মানুষের চেষ্টায় আর একটি সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছিল। এটির উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক তাদের উপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল সেগুলি অপসারিত করে আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠা। মন্দির প্রবেশের এবং এই জাতীয় অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা সারা ভারতে অসংখ্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেছিল।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন বিদেশী শাসনকালে পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তার কারণ বিদেশী সরকার অস্পৃশ্যতাকে আইনবিরুদ্ধ ঘোষণা করে দেশের রক্ষণশীল অংশের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে একমাত্র স্বাধীন ভারতের সরকারই বৈপ্লবিক সমাজ-সংস্কারের কাজ সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে। এক্ষেত্রে আর একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি না হলে সামাজিক উন্নতি প্রশ্নটির মীমাংসা অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে নিম্নবর্ণের মানুষদের সামাজিক অবস্থার উপর তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রভাবও সক্রিয় ছিল। অর্থনৈতিক দুর্দশা না ঘুচিয়ে এদের সামাজিক উন্নয়ন সাধন ছিল অসাধ্য ব্যাপার। অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণেই এদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার বা রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের কাজও ছিল বেশ কঠিন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই সমস্যাটি সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে ডঃ আম্বেদকরের অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তথাকথিত অচ্ছুতদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "কেউ তোমাদের দুঃখদুর্দশা তোমরা যেভাবে নিজেরা ঘোচাতে পারবে সেইভাবে তা দূর

করতে পারবে না। আর তোমরা নিজেরা শত চেষ্টা করেও তোমাদের দুঃখদুর্দশার লাঘব করতে পারবে না, যদি তোমরা স্বাধীনতা না অর্জন করতে পার।...আমাদের প্রয়োজন এমন একটা সরকার (গভর্নমেণ্ট) যে সরকার এমন দৃঢ়চেতা মানুষদের নিয়ে গঠিত হবে যাঁরা বর্তমানে প্রচলিত অসঙ্গত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত পরিবর্তন বা সংস্কার করতে ভয় পাবেন না। ব্রিটিশ রাজ এই কাজ করতে পারবে না। একমাত্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনকল্যাণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ জনগণের সরকারই এ কাজ করতে পারবে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় 'স্বরাজ' এলেই এই আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব, অন্যথা নয়।"

1950 খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতার চির-মূলোচ্ছেদের আইনগত কাঠামো বা নির্দেশগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। এখানে অস্পৃশ্যতাকে শুধু নিষিদ্ধই ঘোষণা করা হয়নি, কোনভাবে এই ভেদ ভাবনার আচরণও দণ্ডনীয় রাখা হয়েছে। সংবিধানে আরও স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কোন কূপ, পুষ্করিণী বা স্নানের ঘাট তথাকথিত অস্পৃশ্যদের ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ রাখা চলবে না। দোকান, রেস্তোরাঁ, হোটেল বা সিনেমাগৃহে প্রবেশাধিকার থেকেও অস্পৃশ্যদের বঞ্চিত করা চলবে না। এ ছাড়াও ভবিষ্যৎকালের শাসনব্যবস্থা ও সরকারের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশক নীতিগুলি প্রযোজ্য তার একটি এই অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধীয়। এই নির্দেশে বলা হয়েছে "রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হবে জনসাধারণের কল্যাণসাধনের চেষ্টা। এমন একটি সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে সকল শ্রেণীর মানুষের সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে।" জাতিভেদ-প্রথা দুর্ভাগ্যক্রমে থেকেই গিয়েছে—বিশেষ করে দেশের গ্রামাঞ্চলে। জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজন ভারতীয় জনসাধারণের কাছে এখনও রয়েছে। সমস্যাটির গুরুত্ব কিছু কম নয়।

অনুশীলনী

1. উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কার আন্দোলনে মানবিকতা ও যুক্তিবাদ কতটুকু অন্তর্নিহিত ছিল তা পর্যালোচনা কর। আধুনিক ভারত গঠনে এই মানবিকতা ও যুক্তিবাদী চিন্তার মূল্যায়ন কর।

2. রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজে নারীগণকে কি কি অবিচার ভোগ করতে হত তা বর্ণনা কর। আধুনিক কালের সংস্কার আন্দোলন নারীমুক্তির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করেছিল তা আলোচনা কর।

3, আধুনিক কালে সংস্কারমূলক আন্দোলনের পক্ষে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে অভিযানের কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা কিভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল তা উল্লেখ কর।

4. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ--

(a) ব্রাহ্ম-সমাজ (b) মহারাষ্ট্রে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন (c) রামকৃষ্ণ (d) স্বামী বিবেকানন্দ (e) স্বামী দয়ানন্দ ও আর্য-সমাজ (f) সৈয়দ আহম্মদ খান্ (g) অকালি আন্দোলন।

চতুর্দশ অধ্যায়

জাতীয় আন্দোলন 1905-1918

সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব

ধীরে ধীরে, কালের অগ্রগতির সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একটা সংগ্রামী ধারা প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই সংগ্রামী ধারাটি 'চরম-পন্থা' (Extremism) নামে পরিচিত হয়েছে। 1905 খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই এটি বিকাশ লাভ করেছিল।

ভারতে জাতীয়-চেতনার উন্মেষ তথা জাতীয় আন্দোলনের সূচনা কাল থেকেই বহুসংখ্যক মানুষের মনে বিদেশী শাসনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণার সঞ্চার হয়েছিল। এই আন্দোলন দেশের মানুষকে দেশাত্ম-বোধের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু সেটাও বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। শিক্ষিত ভারতীয়-জনগণকে এই আন্দোলন রাজনীতি বিষয়েও অভিজ্ঞতা দান করেছিল। বস্তুতঃ এই আন্দোলন জনমানসে একটা পরিবর্তন এনে দেশে একটা নবজীবনের পরিবেশ গড়ে তুলেছিল।

ঠিক এই সময়ে ব্রিটিশরাজ দেশহিতৈষী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রার্থিত একান্ত প্রয়োজনীয় দাবিগুলি পূরণে কোন আগ্রহ দেখায়নি। এর ফলে রাজনীতি সচেতন দেশবাসীর মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে তদানীন্তন কালের নরমপন্থী (Moderates) নেতৃবৃন্দের চিন্তা-ভাবনা বা কর্মধারাগুলির উপর আস্থা স্থাপন মূর্খতা কারণ এই নেতৃবৃন্দের আবেদন-নিবেদন নীতি ব্রিটিশ-রাজের কাছ থেকে কোন সুযোগসুবিধা আদায় করতে অক্ষম; এক কথায় নরমপন্থী রাজনীতির ব্যর্থতা দেশবাসীকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করে তুলেছিল। এর ফলে দেশের মানুষের মধ্যে এই মনোভাবই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে রাজনৈতিক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং এই আন্দোলন শুধু সভা-সমিতি, আবেদন-নিবেদন, আর ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। অন্য পথ আবিষ্কার করতে হবে।

ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত রূপ আবিষ্কার

নরমপন্থী জাতীয় নেতাদের রাজনীতির মূল সূত্র এই ছিল যে ভারতে

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সংস্কার এই শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু দেশের মানুষ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মধ্যে থেকে ব্রিটিশের কাছ থেকে কোন সুবিধা লাভ বা দাবি-পূরণের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। নরমপন্থী নেতাদের কর্মপদ্ধতি বা আন্দোলনের ধারা থেকেই জনসাধারণ তাদের উপর আস্থা হারিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী লেখক ও জাতীয় আন্দোলনের কর্মিবৃন্দ দেশের দারিদ্র্যের জন্য ব্রিটিশ শাসনকেই দায়ী করতেন। রাজনীতি-সচেতন ভারতীয়দের মনে এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ ছিল না যে আর্থিক দিকে ভারতবর্ষের উপর নির্মম শোষণ চালিয়ে স্বদেশ ইংল্যাণ্ডকে সমৃদ্ধ করাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একমাত্র লক্ষ্য। এরা বুঝে নিয়েছিল যে একমাত্র ভারতবাসীদের নিজেদের দ্বারা পরিচালিত সরকারই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে সক্ষম এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরিবর্তে ভারতবাসীর নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দুর্গতি মুক্তির সম্ভাবনা অতি অল্প। জাতীয়তাবাদী ভারতীয়েরা বিশেষভাবে এটা বুঝে নিয়েছিল যে দেশীয় শিল্পোদ্যোগগুলি ভারতের জাতীয় সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না এবং একমাত্র জাতীয় সরকারই এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে ও উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে পারবে। 1896 থেকে 1900 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কয়েকটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে নব্বই লক্ষেরও অধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। বিদেশী শাসন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে মানুষকে কিভাবে অনশন ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে এই ঘটনা থেকে তা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল।

1892 থেকে 1905 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল সেগুলিও জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের মনে গভীর হতাশার সঞ্চার করেছিল। এরা অভ্যস্থ কর্মধারা ত্যাগ করে বিকল্প হিসেবে একটা বিপ্লবী কর্মধারা গ্রহণের কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিল। 1892 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন (Indian Councils Act of 1892) জাতীয়তাবাদীদের সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করেছিল (দ্বাদশ অধ্যায়ে এটি আলোচিত হয়েছে)। এমনকি ইতিপূর্বে জনসাধারণ যেসব রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করত, সেগুলিও এই নূতন আইনে প্রত্যাহৃত হয়েছিল। 1898 খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে

বিদ্বেষ প্রচার দণ্ডনীয় ঘোষণা করে একটি আইন জারী করা হয়েছিল। 1899 খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা পুর-সভায় (করপোরেশন) দেশীয় সদস্যদের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছিল। 1904 খ্রীষ্টাব্দে সরকারী গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করে একটি আইন চালু করা হয়েছিল (Indian Official Secrets Act)। বলা বাহুল্য এই আইনটি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ হয়েছিল। 1897 খ্রীষ্টাব্দে নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনা বিচারে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এমনকি এদের যে কি অপরাধে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল তাও জনসাধারণকে জানানো হয়নি। এই বৎসরই লোকমান্য তিলক প্রমুখ কয়েকজন সংবাদপত্র সম্পাদককে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে ব্রিটিশ-রাজ তাদের নূতন কোন রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া দূরে থাক, যে অধিকার-গুলি এতদিন তারা ভোগ করে আসছিল তাও কেড়ে নিচ্ছে। লর্ড কার্জনের কংগ্রেস-বিরোধী নীতি থেকে এটা ক্রমশঃ বহু মানুষের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে যতদিন ব্রিটিশ রাজত্ব বহাল থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির আশা কিছুতেই বাস্তবে পরিণত হবে না। গোখলের মত মধ্যপন্থী বা নরমপন্থী নেতাও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে ভারতে ব্রিটিশের শাসনতন্ত্র খোলাখুলিভাবেই ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে, দেশীয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণই তার লক্ষ্য।

সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার দিক থেকেও এই সময়ে ব্রিটিশরাজের প্রগতি-বিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রাথমিক শিক্ষা এবং বৃত্তিগত শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির কোন চেষ্টাই করা হয়নি। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে উচ্চশিক্ষা বিস্তারকেও সন্দেহের চোখে দেখা আরম্ভ করেছিল। উচ্চশিক্ষা বিস্তার রোধ করতেও এরা উদ্যত হয়েছিল। 1904 খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের মনে এই আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছিল যে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চশিক্ষার প্রসার রোধই এই আইনের প্রকৃত লক্ষ্য।

এইভাবে ভারতে এমন মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল যারা বেশ বুঝে নিয়েছিল যে আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারতের উন্নতি স্বায়ত্বশাসন বা স্বরাজ অর্জন ব্যতীত কোনরূপেই সম্ভব

নয়। দেশের মানুষ আরও বুঝে নিয়েছিল যে বিদেশী শাসনের নাগপাশ ভারতবাসীকে কোনভাবেই উন্নতির পথে অগ্রসর হতে দেবে না।

আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতার বিকাশ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মনে একটা আত্মসম্মান বোধ জেগে উঠেছিল, একই সঙ্গে তাঁদের মনে আত্মনির্ভরতা বা নিজেদের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসও জেগে উঠেছিল। তাঁদের মনে এই বিশ্বাসও দেখা দিয়েছিল যে তাঁরা নিজের দেশ নিজেরাই শাসন করতে সক্ষম, এবং ভবিষ্যতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সামর্থ্যও তাঁদের আছে। তিলক এবং বিপিন-চন্দ্র পালের মত নেতৃবৃন্দ দেশের মানুষকে আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচারে নেমেছিলেন। জাতীয়ভাবাপন্ন জনসাধারণের মনে তাঁরা এই ধারণা জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন যে ভারতের মানুষের কর্মদক্ষতা কিছু কম নয়, সুযোগ পেলে ভারতের মানুষ যে কোন দায়িত্বই ভালভাবে পালন করতে পারবে। এঁরা দেশের মানুষের মধ্যে এই ধারণার উদ্ভব ঘটাতে চেয়েছিলেন যে তাদের দুরবস্থার প্রতিকারের উপায় তাদের নিজেদেরই হাতে রয়েছে, এখন শুধুমাত্র সাহস ও শক্তির সাধনা করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক নেতা না হলেও স্বামী বিবেকানন্দ পুনঃ পুনঃ দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে এই আবেদনই জানাতেন। জাতির উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "পৃথিবীতে পাপ বলে যদি কিছু থাকে তবে সেটা হল দুর্বলতা ; তোমরা দুর্বলতা পরিহার কর, কারণ এটা শুধু পাপ নয়, এটা মৃত্যু ও বিনষ্টির নামান্তর।…শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে যা কিছু তোমাদের মধ্যে দুর্বলতার সঞ্চার করবে তাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করবে। দুর্বলতা একটা প্রাণহীন অসত্য ছলনা মাত্র।"

তিনি দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে এই আবেদন জানিয়েছিলেন যে তারা যেন অতীত গৌরবের স্মৃতিতে বৃথা গৌরবান্বিত না হয়ে দেশের ভবিষ্যতকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। তিনি লিখেছিলেন, "হে ভগবান, কবে আমাদের দেশের মানুষ অতীত গৌরবের অহঙ্কার ত্যাগ করে ভবিষ্যতের দিকে তাকাবে ?"

আত্মশক্তির উপর আস্থা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দো-লনের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল। এখন আর এই আন্দোলন মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এখন দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যেই রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের সুযোগ এসে

পড়েছিল। এই সময় বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, "ভারতের আশা-ভরসা ভারতের সাধারণ মানুষ। উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা ত দেহে মনে মৃতের তুল্য।" সবারই মনে এই বোধ জেগে উঠেছিল যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বিপুল আত্মত্যাগ প্রয়োজন, দেশের সাধারণ মানুষই তা করতে পারে। এছাড়া এখন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজনৈতিক কর্মধারা বা প্রচার অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে; সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অথবা প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনের দিনগুলিতেই শুধু এই রাজনৈতিক প্রচারকে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না।

শিক্ষাবিস্তার ও বেকার সমস্যা

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা দৃশ্য-গোচর ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রিটিশরাজের প্রশাসনে বহু লোকের চাকরির সংস্থান হয়েছিল, তবে এই চাকরিতে বেতনের হার ছিল বেশ কম। বাকী শিক্ষিত মানুষদের চাকরি জুটত না। চাকরিহীন বা চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এদের এই আর্থিক দুরবস্থা এদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাতে সাহায্য করেছিল। পরিবর্তন-কামী জাতীয় আন্দোলন এদের অনেককেই আকৃষ্ট করেছিল।

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের মনে একটা আদর্শগত পরি-বর্তন বা মানসিক বিপ্লবও দেখা দিয়েছিল। শিক্ষিত ভারতবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও পরিবর্তনমুখী ভাব-ধারার ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছিল। শিক্ষিত ভারতবাসীগণই সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনের সর্বাধিক অনুগামী ও প্রবক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এর পেছনে ছিল একদিকে চাকরি না পাওয়া অথবা স্বল্পবেতনের চাকরি। এর আর একটা কারণ ছিল আধুনিক চিন্তাধারা ও রাজনীতিজ্ঞান এবং ইউরোপীয় তথা বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে এদের পরিচয়।

আন্তর্জাতিক প্রভাব

এই সময়ে বহির্বিশ্বের কয়েকটি ঘটনা ভারতের সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনে গতিবেগের সঞ্চার করেছিল। 1868 খ্রীষ্টাব্দের পর নবীন জাপানের অভ্যুদয় দেখিয়ে দিয়েছিল যে এশিয়ার একটা অনুন্নত দেশ পাশ্চাত্যের সাহায্য ছাড়াই কিভাবে নিজেকে একটা উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে পারে। মাত্র কয়েক যুগের মধ্যেই জাপানের নেতৃবৃন্দ তাদের দেশকে

সামরিক ও শিল্প-সমৃদ্ধির দিক থেকে একটা প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করে ফেলেছিল। এই দেশে তারা সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করেছিল। একটি কর্মতৎপর ও আধুনিক শাসনব্যবস্থাও তারা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ইথিয়োপীয় বাহিনী কর্তৃক 1896 খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় সামরিক বাহিনীর এবং 1905 খ্রীষ্টাব্দে জাপানের হাতে রুশ সামরিক বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় থেকে বোঝা গিয়েছিল যে ইউরোপীয় সামরিক বাহিনীর দুর্ধর্ষতা একটা কথার কথা মাত্র, তারা অজেয় নয়, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের রণক্ষেত্রে হঠিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। এশিয়া মহাদেশের সর্বত্র মানুষ পরম আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দেশ জাপানের কাছে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিসম্পন্ন রুশ দেশের পরাজয় সংবাদটি গ্রহণ করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মারাঠী ভাষায় প্রকাশিত কেশরী নামক একটি সাপ্তাহিকের মন্তব্যটি উদ্ধৃত হল—এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন তিলক। সংবাদটি 1904 খ্রীষ্টাব্দের 6 ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়—"এতদিন পর্যন্ত মনে করা হত যে এশীয় মহাদেশের জাতিগুলির মধ্যে জাতীয়ভাবের অভাব আছে। ব্যক্তিগতভাবে সাহসী ও বীর হলেও এই স্বদেশপ্রেমের অভাবের জন্যই এরা ইউরোপীয় জাতিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয়ী হতে পারে না। অনেকের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে বিধাতা যেন এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের দ্বারা শাসিত বা শোষিত হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন।...রুশ-জাপান যুদ্ধ এই ধারণার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। যারা উপরোক্ত ধারণার বশবর্তী ছিল তারা বুঝতে পেরেছে যে এশীয় জাতিবৃন্দের স্বাধীন জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব। ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্যতাও এদের কিছু কম নয়।"

'করাচী ক্রনিকল্' নামক একটি সংবাদপত্রে 1905 খ্রীষ্টাব্দের আঠারোই জুন সংখ্যায় এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল—"একটি এশীয় জাতি যা পেরেছে, অন্য এশীয় জাতিও তা অনায়াসে করতে পারে...জাপান যদি রুশকে হঠিয়ে দিতে পারে তবে ভারতও তেমনিভাবে ইংল্যাণ্ডকে হঠিয়ে দিতে পারবে। আমাদের উচিত ইংরাজকে সাগরে নিক্ষেপ করে জাপানের সঙ্গে পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিপুঞ্জের পাশে আসন গ্রহণ।" আয়ারল্যাণ্ড, রুশ, ঈজিপ্ট, তুরস্ক এবং চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধ ভারতবাসীর মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিল যে আত্মত্যাগের সঙ্কল্প

নিয়ে কোন্ একতাবদ্ধ জাতির পক্ষে প্রবল শক্তিশালী যে কোন অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব। তবে এই অত্যাচারী শাসনের উচ্ছেদের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন গভীর স্বদেশপ্রেম এবং আত্মোৎসর্গের প্রেরণা।

সংগ্রামমুখী জাতীয়তাবাদী চিন্তার অস্তিত্ব

জাতীয় আন্দোলনের প্রায় সূচনা কাল থেকেই দেশের মধ্যে সংগ্রামমুখী জাতীয়তাবাদের একটি ধারারও উদ্ভব দেখা দিয়েছিল। এই সংগ্রামমুখী জাতীয় চেতনার অন্যতম ধারক বা প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাংলার রাজনারায়ণ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং মহারাষ্ট্রের বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপ্‌লুঙ্কর প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। এই জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক, পরে ইনি লোকমান্য তিলক রূপেই সবিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। 1856 খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হওয়ার পর থেকে ইনি সারাজীবন দেশসেবাতেই অতিবাহিত করেন। 1880 খ্রীষ্টাব্দের পরে তিনি অন্যদের সহযোগিতায় পুনেতে নিউ ইংলিস স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন; পরে এটি ফার্গুসন কলেজে পরিণত হয়েছিল। এছাড়া তিলক ইংরাজী ভাষায় 'মারাঠা' ও মারাঠি ভাষায় 'কেশরী' নামে দুটি সংবাদপত্র প্রবর্তন করেন। 1889 খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি 'কেশরী' সম্পাদকরূপে এর মাধ্যমে দেশাত্মবোধ প্রচার সুরু করেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশবাসীকে তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সাহসী, আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীনতা যুদ্ধের নিঃস্বার্থ সৈনিক হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। 1893 খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহারাষ্ট্রে সুপ্রচলিত গণপতি উৎসবকে সঙ্গীত ও বক্তৃতার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রচারের কাজে লাগিয়েছিলেন। 1895 খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের তরুণ সমাজকে তিনি শিবাজীর দৃষ্টান্তে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। 1896-97 খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে তিনি একটি রাজস্ব-বর্জন আন্দোলন সংগঠন করেন। মহারাষ্ট্রে এইসময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাদের তিনি সরকারী রাজস্ব প্রদান বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ যে ফসল উৎপাদনের ভিত্তিতে সরকারের রাজস্ব ন্যায্যতঃ প্রাপ্য, সেই ফসলই উৎপন্ন হয়নি। রাজস্ব প্রদান বন্ধ করার পক্ষে তাঁর এই ছিল যুক্তি। সাহস ও স্বার্থত্যাগের একটি জলন্ত আদর্শ স্থাপন করে 1897 খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারারুদ্ধ হন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি ও বিদ্বেষ প্রচারের

অভিযোগে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সরকার পক্ষ থেকে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছিল, এটা করলে তাঁকে জেলে যেতে হত না। কিন্তু তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতে অস্বীকার করায় তাঁর প্রতি আঠারো মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে তিনি জাতীয় স্বার্থে আত্মোৎসর্গের একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের অনুকূল একটা বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সুযোগে বিপ্লবপন্থীগণ জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিলক ব্যতীত এই চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও লালা লাজপত রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এই চরমপন্থী রাজনৈতিক কর্মসূচীর কিছু বিশেষত্ব বর্ণনা করা আবশ্যক। চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতবাসীকে নিজেদের চেষ্টাতেই মুক্তি অর্জন করতে হবে, এবং দেশের দুরবস্থা দূর করার জন্য তাদের নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে; এর জন্য তাদের প্রচুর স্বার্থত্যাগ করতে হবে, নানাবিধ নির্যাতনও সহ্য করতে হবে। এই চরমপন্থী নেতাদের ভাষণ, রচনা ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মধারায় প্রচুর সাহস ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যেত। দেশের মঙ্গলের জন্য যে কোন স্বার্থত্যাগ করতে এঁদের কোন দ্বিধা ছিল না। ব্রিটিশের বদান্যতা বা উদারতায় দেশের উন্নতি হবে এমন কোন বিশ্বাস তাঁদের মনে স্থান পায়নি। অন্য অনেকের মনে অবশ্য এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ পর-শাসন বা পরাধীনতাকে তীব্র ঘৃণার চোখে দেখতেন, এঁরা স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে জাতীয় আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য হল স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ।

ভারতীয় জনসাধারণের উপর এঁদের প্রগাঢ় আস্থা ছিল এবং জনসাধারণের সহায়তায় স্বরাজ অর্জন এঁদের লক্ষ্য ছিল। এই কারণে তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা এঁদের ঈপ্সিত বিষয় ছিল।

সুশিক্ষিত নেতৃত্ব

1905 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ভারতবর্ষে বহু নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁরা এর পূর্ববর্তী সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা

করে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। সুশিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দের বিনা সাহায্যে কোন জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে না। বর্তমান ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর অভাব হয়নি।

বঙ্গভঙ্গ

1905 খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ ঘোষণা চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল। এটা ভারতে জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় হয়ে উঠেছিল। 1905 খ্রীষ্টাব্দের বিশে জুলাই লর্ড কার্জন তদানীন্তন বাংলা প্রদেশ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে দ্বিখণ্ডিত করার একটি আদেশ জারী করেন। এই আদেশের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সহ একটি পৃথক প্রদেশ গঠিত হয়। নবসৃষ্ট এই প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল 31,000000 লক্ষ (31 Millions), বাংলা প্রদেশের অবশিষ্টাঞ্চল সহ নূতন বাংলা প্রদেশ গঠিত হয়, এই অংশের জনসংখ্যা ছিল 54,000000 লক্ষ (54 Millions)। এই জনসংখ্যার মধ্যে 18,000000 (18 Millions) ছিল বাঙ্গালী। বিহারী ও ওড়িয়া জনসংখ্যা ছিল 36,000000 (36 Millions)। বঙ্গপ্রদেশের অঙ্গচ্ছেদের সপক্ষে এই যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে তদানীন্তন বঙ্গপ্রদেশের মত বিপুলায়তন অঞ্চলকে একটি প্রদেশে সীমাবদ্ধ রাখার প্রশাসনিক অসুবিধা আছে। তবে এটা ছিল একটা অজুহাত মাত্র, বঙ্গপ্রদেশের বিভাজনের পেছনে কর্তৃপক্ষের অন্য মতলবও ছিল। ব্রিটিশ-রাজ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিল। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলী (Risley) 1905 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি সরকারী প্রতিবেদনে লিখেছিলেন "সম্মিলিত বাংলাদেশ একটা গণনীয় শক্তি। এই প্রদেশ ভেঙ্গে দিলে এই শক্তি আর থাকবে না, বিভিন্ন স্বার্থের টানে এটা দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মনে এই আশঙ্কাই দেখা দিয়েছে, তাদের এই আশঙ্কা মিথ্যা নয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই আশঙ্কা থেকেই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সাম্রাজ্যের স্বার্থে কতটা প্রয়োজন তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের এই পরিকল্পনা বেরার ও মধ্যপ্রদেশের সংযুক্তির পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল তদ্রূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই গৃহীত হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হোল বিভেদ

জাগিয়ে তোলা এবং আমাদের শাসনবিরোধী একটা সম্মিলিত শক্তিকে দুর্বল করে ফেলা।" 1905 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কার্জন এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে অনুরূপভাবেই লিখেছিলেন, "কলকাতা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের চিন্তা-ভাবনা সমগ্র বাংলা প্রদেশে তথা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।...বঙ্গভাষা-ভাষী জনসাধারণের ঐক্যে ফাটল ধরানো নীতি প্রয়োজন, কারণ বঙ্গভাষা-ভাষীদের এই ঐক্য স্বাধীন-চিন্তার দুর্গ গড়ে তুলবে ও এর প্রভাব ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। আমাদের এই নূতন পরিকল্পনায় কলকাতার গৌরব আর থাকবে না। কলকাতা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একটা ফলপ্রসূ ঘাঁটি, কলকাতাকে তার গৌরবের স্বর্ণাসন থেকে চ্যুত করতেই হবে...ষড়যন্ত্রকারীগণ এটা ধরতে পেরেছে এবং তাই এরা আমাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।"

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বাংলা প্রদেশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণ যেমন জমিদার, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, ছাত্র, নগরবাসী দরিদ্র মানুষ, এমনকি নারী-সমাজও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের প্রদেশ বিভাজনের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জনসাধারণ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রূপ সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাটি নিছক প্রশাসনিক সংস্কার রূপে গ্রহণ করতে মোটেই রাজী হয়নি, তাদের কাছে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রচেষ্টা—ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল। তারা বুঝেছিল বাঙালীদের বিচ্ছিন্ন রাখার জন্যই বঙ্গবিভাগ। এই পরিকল্পনা বাংলাদেশে জাতীয়তা-বাদকে দুর্বল করে দেবে। বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী সংস্কৃতিও বঙ্গ-বিভাগের ফলে বিপন্ন হবে। এটাও দেখান হয়েছিল যে প্রশাসনিক স্বার্থে হিন্দীভাষী বিহার অঞ্চল ও ওড়িয়াভাষী ওড়িশা অঞ্চলকে বঙ্গভাষী এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারত কিন্তু ওই ধরনের কোন পরিকল্পনা করা হয়নি। কর্তৃপক্ষের এই বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাব জনমতকে পদদলিত করে কার্যে পরিণত করা হয়েছিল। স্পর্শকাতর ও সাহসী বাঙালী জনসাধারণের উপর আঘাত এসে পড়াতেই বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন এতটা তীব্র হয়ে উঠেছিল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী অথবা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল সামগ্রিক ধরনের একটা জাতীয় আন্দোলন, এটা মাত্র কোন একটি বিশেষ শ্রেণীগত আন্দোলন রূপে আবির্ভূত হয়নি। এই আন্দোলনের প্রথম পর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নরমপন্থী বা মধ্যপন্থী নেতাগণ এই আন্দোলন পরিচালন করেন। কিন্তু এর পরবর্তী পর্যায়ে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব চরমপন্থী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের হাতে চলে গিয়েছিল। তবে এই আন্দোলনে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতারও অভাব হয়নি। দুপক্ষই যুক্তভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে গিয়েছিলেন। 1905 খ্রীষ্টাব্দের সাতই আগষ্ট বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। ঐ দিন কলকাতার টাউন হলে একটা বিরাট প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়েছিল। এই সভার শেষে প্রতিনিধিবর্গ সমগ্র প্রদেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

1905 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ষোলই তারিখে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী নেতৃবৃন্দের নির্দেশে এই দিন সমগ্র বাংলা প্রদেশ জুড়ে জাতীয় শোক দিবস প্রতিপালিত হয়। এই দিনটি উপবাস বা অনশনের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কলকাতায় এদিন 'হরতাল' পালন করা হয়। কলকাতায় জনসাধারণ ঐ দিন প্রভাতে নগ্নপদে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপলক্ষ্যে যে সঙ্গীতটি রচনা করেন সেই গানটি গাইতে গাইতে বিশাল জনতা নগর প্রদক্ষিণ করেছিল। কলকাতার পথঘাট সেদিন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছিল। রাতারাতি 'বন্দেমাতরম্' বাঙলার জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। অচিরে এই 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনেরও মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'রক্ষা-বন্ধন' বা 'রাখীবন্ধন' উৎসবটিও নূতনভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ দিন জনসাধারণ একে অন্যের হাতে 'রাখী' বেঁধে দিয়েছিল, এর তাৎপর্য ছিল প্রতিটি বাঙালীর মধ্যে এবং দ্বি-খণ্ডিত বাংলার মধ্যে ঐক্য স্থাপন।

এই দিন অপরাহ্নে এক বিরাট জনতার সামনে প্রবীণ নেতা আনন্দমোহন বসু "ফেডারেশান হল" নামে একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, এই ভবনটি উভয় বঙ্গের অবিভাজ্যতার প্রতীকরূপে পরিকল্পিত হয়েছিল। আনন্দমোহন 50,000 সংখ্যক সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দান

করেছিলেন। এই সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে উভয় বঙ্গের ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জনসাধারণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল।

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন

বাংলার নেতৃবৃন্দ এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শন, জনসভা এবং প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা ব্রিটিশ-রাজের মতিপরিবর্তন করানো সম্ভব নয়। জনসাধারণের মনে যে তীব্র বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে কোন ধরনের একটা কাজের মধ্যে দিয়েই তা' শাসকশ্রেণীকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাঁরা ঠিক করেন যে এই কাজটি হবে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন। সারা বাংলা জুড়ে এই উদ্দেশ্যে বহু জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এইসব সভায় স্বদেশী অর্থাৎ ভারত-জাত দ্রব্য ব্যবহার ও ইংল্যাণ্ড-জাত বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য প্রস্তাব ও সঙ্কল্প গৃহীত হয়েছিল। বহুস্থানে প্রকাশ্যে বিলাতী বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। যেসব দোকানে বিলাতী বা ব্রিটেনে প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয় হত সেখানে স্বেচ্ছাসেবীরা ধর্ণা দিয়ে ক্রেতাদের বিদেশী বস্ত্র ক্রয় না করার অনুরোধ করত বা বাধা দিত। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কেন্দ্রিক এই স্বদেশী আন্দোলন বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। (এসম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন "স্বদেশী আন্দোলনের দিনগুলিতে আমাদের সামাজিক বা পারিবারিক জীবনও স্বদেশী ভাবনায় আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। কোন বিবাহ উপলক্ষ্যে যদি এমন কোন বিদেশ-জাত দ্রব্য উপহার পাওয়া যেত যার স্বদেশী বিকল্প আছে তবে সেটি গৃহীত হত না, উপহারদাতাকে তা' ফেরৎ দেওয়া হত। কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানে দেবার্চনার উপচারে কোন বিদেশী দ্রব্য থাকলে পুরোহিতেরা সেই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে অসম্মত এটাও দেখা যেত। উৎসব অনুষ্ঠানে অতিথি-অভ্যাগতগণও খাদ্যবস্তুতে বিলাতী চিনি বা লবণ ব্যবহৃত হলে সেই নিমন্ত্রণ বর্জন করতেন।")

স্বদেশী আন্দোলন দেশীয় শিল্পোদ্যোগকে বেশ শক্তিশালী করেছিল, কারণ স্বদেশে প্রস্তুত জিনিসের চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশের মধ্যে বহু কাপড়ের কল, সাবান ও দেশলাই কারখানা, তাঁতবস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান, স্বদেশী ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর প্রসিদ্ধ "বেঙ্গল কেমিক্যাল"

প্রতিষ্ঠানটি এই সময়েই প্রতিষ্ঠা করেন। মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটি স্বদেশীদ্রব্য বিপণি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দিয়েছিলেন।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই আন্দোলন স্বদেশ ভাবনায় সমৃদ্ধ গদ্য ও পদ্য সাহিত্য এবং সংবাদপত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন ও মুকুন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণের রচিত স্বদেশী গান এখনও বাঙলায় গাওয়া হয়ে থাকে। এই সময়ে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন রূপ গঠনমূলক কাজটিও শুরু হয়েছিল। স্বদেশীযুগের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন যে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বহু ত্রুটি আছে, বিশেষ করে এই শিক্ষা ছাত্রদের মধ্যে কোনরূপ স্বদেশ-চেতনা জাগাতে অক্ষম। এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে তাঁরা কতকগুলি জাতীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাহিত্যগত সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও প্রযুক্তিগত বিদ্যা ও শরীরচর্চা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 1906 খ্রীষ্টাব্দের পনেরই আগষ্ট 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় একটি ন্যাশনেল কলেজও স্থাপিত হয়েছিল, এর অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ (উত্তরকালের শ্রীঅরবিন্দ)।

ছাত্র, নারী, মুসলমান সমাজ ও জনসাধারণের ভূমিকা

স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার ছাত্রসমাজ একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারা স্বদেশী প্রচার করত, নিজেরাও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করত। বিদেশী বস্ত্র বিক্রয়কারী দোকানগুলিতে 'পিকেটিং'-এর কাজেও এরা অগ্রণী ছিল। সম্ভবতঃ স্বদেশী-ভাবনা প্রচারে এদেরই দান সর্বাধিক হয়েছিল। সরকার পক্ষ থেকে এই ছাত্রদের দমন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যেসব স্কুল বা কলেজের ছাত্রেরা স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেছিল, সেই স্কুল ও কলেজগুলিকে সরকারী পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ করার চেষ্টা চলেছিল। সরকারী অনুদান বা অন্যবিধ সুযোগসুবিধাগুলি থেকে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং এইগুলির স্বীকৃতিও প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রদের সরকারী বৃত্তিদান বন্ধ করা হয়েছিল। এমনকি, এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের সরকারী চাকরি প্রাপ্তিও নিষিদ্ধ হয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিও দেওয়া হয়েছিল। বহু ছাত্রকে জরিমানা দিতে হয়েছিল, বহু ছাত্রকে স্কুল বা

কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। বহু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আবার এদের অনেককে পুলিশের লাঠির আঘাতও খেতে হয়েছিল। তবে এত নির্যাতনের পরেও ছাত্র-সমাজ মোটেই ভীত হয়ে পড়েনি। তাদের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—এই আন্দোলনে নারী-সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ। নগরবাসিনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মহিলারা সাধারণতঃ গৃহকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হলেও এইসময়ে তাঁরা শোভাযাত্রায় এবং পিকেটিং-এর কাজ করতে পথে নেমেছিলেন। পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে দেশের নারী-সমাজের অংশগ্রহণের সূত্রপাত স্বদেশী আন্দোলন কালেরই ঘটনা। বহু খ্যাতনামা মুসলমান এই স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল, জনপ্রিয় স্বদেশপ্রেমিক লিয়াকৎ হোসেন ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী গজনভী। তবে মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর বহু মুসলমান বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে হয় নিরপেক্ষতা অবলম্বন অথবা সমর্থন জানিয়েছিল। বঙ্গ-বিভাজনের যারা সপক্ষে ছিল সেই মুসলমানদের নেতা ছিলেন ঢাকার নবাব (ভারত সরকার এঁকে চোদ্দ-লক্ষ টাকা হাওলাৎ দিয়েছিল)। ঢাকার নবাবের নেতৃত্বাধীন মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের কারণ এই যে তাদের বোঝানো হয়েছিল যে নবগঠিত পূর্ব-বঙ্গ প্রদেশে মুসলমানদেরই সংখ্যাধিক্য থাকবে। ঢাকার নবাব ও তাঁর অনুগামীদের এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মনোভাবের পিছনে সরকারী কর্তৃপক্ষের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। ঢাকায় একটি ভাষণে লর্ড কার্জন ঘোষণা করেন যে বঙ্গ বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য হল পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের একতাবদ্ধ করা বা তাদের সংহতিসাধন। তাঁর মতে মুসলমান শাসন-কালের রাজা বা নবাবদের দিনের পর এতকাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার মুসলমানদের মধ্যে সংহতি স্থাপনের কোন চেষ্টা এপর্যন্ত করা হয়নি।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রচুর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী দল এই জাতীয় আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইলেও এই আন্দোলন আশাপ্রদ রূপে বাংলার চাষী-কৃষক সমাজকে স্পর্শ করতে পারেনি। মোটের উপর এই আন্দোলন নগরকেন্দ্রিক অভিজাত, মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল।

সর্বভারতীয় আন্দোলন

'স্বদেশী' এবং 'স্বরাজ'-এর যে দাবী বঙ্গদেশকে আলোড়িত করেছিল তা দ্রুত ভারতের অবশিষ্টাংশের অঞ্চল বা প্রদেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বঙ্গবিভাগ রদ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন সমর্থন করে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর ভারতেও আন্দোলন জেগে উঠেছিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে দেশময় ব্যাপ্ত করার কাজে নেতৃত্ব করেছিলেন তিলক। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সূচনামাত্র তিলক হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হতে চলেছে। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম সুরু করার এবং সমগ্র দেশকে স্বাধীনতা ভাবনায় সম্মিলিত করে তোলার এটাই হবে একটা সুবর্ণ সুযোগ।

সংগ্রামী শক্তির আবির্ভাব

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব অল্পকালের মধ্যে তিলক, বিপিন-চন্দ্র পাল এবং অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের হাতে চলে এসেছিল। এই নেতৃত্ব বদলের কতকগুলি কারণও ছিল।

প্রথমতঃ নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ যে আন্দোলন সুরু করেন তা বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। এই সময় উদারনীতিক দলভুক্ত জন মর্লি ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভায় ভারত সচিবের পদে আসীন ছিলেন। বাংলার নরমপন্থী বা মডারেট নেতৃবৃন্দের এঁর উপর প্রগাঢ় আস্থা ছিল। নরমপন্থী নেতাদের আস্থাভাজন স্বয়ং মর্লিই ঘোষণা করে দেন যে বঙ্গ বিভাজন নীতি পরিবর্তন করা যাবে না, এটা করতেই হবে। দ্বিতীয়তঃ বিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের দুই অংশেরই শাসন কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে পূর্ববাংলার গভর্ণমেণ্ট হিন্দু-মুসলমান-দের মধ্যে বিভেদ সঞ্চারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতির বীজ রোপন সম্ভবতঃ এই সময়েই সুরু হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি নাশ ও ভেদবুদ্ধির বীজ বপন বাংলার জাতীয়তবাদী নেতাদের মনে গভীর ক্ষোভ ও বিরক্তির সৃষ্টি করেছিল। সর্বোপরি, এইসময়ে সরকারী দমন নীতি নিষ্ঠুরভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছিল। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেই জাতীয়তাবাদীদের চরমপন্থী ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। বিশেষভাবে, পূর্ববাঙলায় কর্তৃপক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনে বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র আন্দোলন দমনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক

কি কি উপায় অবলম্বিত হয়েছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে। পূর্ববঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তোলা নিষিদ্ধ করা হয়। জনসভার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হত, অনেকসময় জনসভা মাত্রই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হত। সংবাদপত্রগুলি যাতে স্বদেশী আন্দোলনের সংবাদ না ছাপতে পারে তার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনে অংশ-গ্রহণকারীদের গ্রেপ্তার করে দীর্ঘদিন স্থায়ী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। বহু ছাত্রকে শাস্তিস্বরূপ শারীরিক যন্ত্রণাভোগ করতেও হয়েছিল। 1906 থেকে 1909 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় 550টিরও অধিক রাজনৈতিক মামলা চলেছিল। বহু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। এইভাবে সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করা হয়। বহু শহরে সামরিক পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, এদের সঙ্গে জনসাধারণের সঙ্ঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছিল। 1906 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরিশালে (বর্তমান বাংলাদেশ) অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উপর পুলিশ নির্যাতন চালিয়েছিল। এই প্রতিনিধিগণ কোনরূপ আইন ভঙ্গ করেননি, তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। পুলিশী নির্যাতনের এটি একটি কুখ্যাত দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই সম্মেলনের বহু তরুণ স্বেচ্ছা-সেবককে পুলিশ নির্মমভাবে প্রহার করেছিল। পুলিশ বলপূর্বক এই সম্মেলনের অধিবেশনটি ভেঙ্গে দিয়েছিল। 1908 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অশ্বিনীকুমার দত্তের মত বয়োবৃদ্ধ পূজনীয় নয়জন বাঙ্গালী নেতাকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। এর কিছু আগে 1907 খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের সেচের খাল উপনিবেশে দাঙ্গাহাঙ্গামার পর লালা লাজপত রায় ও অজিত সিংহকে পাঞ্জাব থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। 1908 খ্রীষ্টাব্দে মহান নেতা তিলককে গ্রেপ্তার করে তাঁর প্রতি ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রযুক্ত হয়েছিল। মাদ্রাজের চিদাম্বরম পিলাই এবং অন্ধ্রের হরিসর্বোত্তম রাও এবং আরও কয়েকজন নেতাকেও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীগণ আন্দোলনের পুরোভাগে এসে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা জনসাধারণকে সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসহযোগের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সরকারী চাকরী, সরকারী আইন আদালত ও সরকারী স্কুল কলেজ বর্জন।

এইসময় অরবিন্দ ঘোষ ঘোষণা করেন যে "অসহযোগের কর্মসূচি সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় এমনভাবে রূপায়িত হবে যাতে বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে যায়। এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে বাণিজ্য সূত্রে ইংরাজেরা ভারতের সম্পদ স্বদেশে নিয়ে যেতে না পারে। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এই অসহযোগ আন্দোলন দেশবাসীকে চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যে শাসনব্যবস্থা চাই সেই শাসনব্যবস্থা না আসা পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন স্থায়ী থাকবে।" স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সুযোগে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীগণ এইভাবে দেশবাসীকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। বিদেশী শাসনের অবসান সাধন এবং স্বাধীনতা অর্জনের আহ্বানও এঁদের কাছ থেকে এসেছিল। অরবিন্দ ঘোষ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে "রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে কোন জাতির পক্ষে প্রাণ-বায়ু স্বরূপ। স্বাধীনতা বিনা কোন জাতির পক্ষে টিঁকে থাকা অসম্ভব।" আন্দোলন যেভাবেই সুরু হোক না কেন বঙ্গভঙ্গ রোধ ক্রমশঃ একটা গৌণ ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই সময়ে জাতীয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভ। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে স্বার্থত্যাগ বা আত্মোৎসর্গের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন কারণ আত্মোৎসর্গ ছাড়া কোন মহৎ লক্ষ্যে পৌছানো যায় না। ভারতের তরুণ সমাজ এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। জওহরলাল নেহেরু এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে পাঠরত ছিলেন। ভারতীয় তরুণদের মনে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের আহ্বানের প্রতিক্রিয়া তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"1907 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে কয়েক বছর ধরে ভারতে প্রবল অশান্তি ও উত্তেজনার সঞ্চার লক্ষিত হয়েছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দের পর এই প্রথম ভারতবাসীর মধ্যে সংগ্রামী মনোভাবের স্ফুরণ ঘটেছিল। বিনা প্রতিবাদে বিদেশী শাসনভার বহন করতে তারা অসম্মত হয়েছিল। তিলকের কাজকর্ম এবং কারাদণ্ড, অরবিন্দ ঘোষের কীর্তি, তদুপরি বাঙ্গালী জনগণের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সংবাদে ইংলণ্ডে অবস্থিত আমাদের মত ভারতীয়দের মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। আমরা প্রায় সকলেই তিলকপন্থী বা চরমপন্থী হয়ে উঠেছিলাম। তিলক অনুগামীবৃন্দ তৎকালে চরমপন্থীরূপেই আখ্যাত হত।"

এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এই চরমপন্থীগণও দেশবাসীকে একটা

সুস্পষ্ট পথে চালিত করতে পারেননি। নেতৃবর্গ আন্দোলন পরিচালনার জন্য কোন সক্রিয় সংগঠন গড়ে তুলতে পারেননি, তাঁদের নেতৃত্বও বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। তাঁরা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ অবশ্যই এনে দিয়েছিলেন কিন্তু এই নবজাগ্রত শক্তিকে সংহত করে তাঁরা তাকে কাজে লাগাতে পারেননি। জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে এঁদের চিন্তায় বৈপ্লবিক ও আমূল পরিবর্তনের পরিকল্পনা অবশ্যই ছিল, কিন্তু এঁদের কাজকর্মে নিয়মতান্ত্রিকতার ধারাই অনুসৃত হত। এঁরা জাতির প্রকৃত মেরুদণ্ড কৃষক-সমাজের চিত্ত স্পর্শ করতে পারেননি। এঁদের আন্দোলন নগরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। এর বাইরের মানুষদের তাঁরা একটি সক্রিয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি। এর ফলে সরকারী কর্তৃপক্ষের দিক থেকে এঁদের আন্দোলন বেশ ভালভাবেই স্তিমিত করে রাখা সম্ভব হয়েছিল। আন্দোলনের মূল নেতা তিলকের কারাদণ্ড এবং বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণের পর চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন টিঁকে থাকতে পারেনি।

কিন্তু এই সময়ে যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, সেটা শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে পারেনি। যুগ-যুগান্তের মোহনিদ্রা থেকে জনসাধারণ অবশ্যই জেগে উঠেছিল। দেশের মানুষ রাজনৈতিক সংগ্রামের উপযোগী নির্ভীকতা ও সাহসের প্রেরণা হারিয়ে ফেলেনি। এরা একটা নূতন আন্দোলনের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ অতীতের ইতিহাস থেকে কিছু পরিমাণ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও সাধারণ দেশবাসী লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে, এই কালের উল্লেখ প্রসঙ্গে গান্ধীজী লিখেছিলেন যে, "বঙ্গভঙ্গের পর, দেশের মানুষ বুঝেছিল, যে শুধু আবেদন নিবেদনে কোন কাজ হবে না, কিছু জোর খাটাতেই হবে এবং তার জন্য ক্লেশ-বরণেও অভ্যস্ত হতে হবে।" বস্তুতঃ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একটা বিরাট বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের সূচনা

সরকারী দমননীতি এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত হিংসাত্মক বিপ্লববাদের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষের ঔদ্ধত্য ও

দমননীতি বাংলার তরুণ সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। বাংলার তরুণ সমাজের মনে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠেছিল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই বিদ্বেষাগ্নির বহিঃপ্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়াতে বাঙ্গালী-তরুণ বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য বোমা-তন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিল অর্থাৎ বিস্ফোরক বোমা তৈরী করে সেগুলি দিয়ে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার নীতি গ্রহণ করেছিল। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের মারফৎ জাতীয় মুক্তির নীতিতে আর তারা আস্থা রাখতে পারেনি। ব্রিটিশ শক্তিকে বলপ্রয়োগে ভারত থেকে বিতাড়িত করা হবে—এই কর্মপদ্ধতিটি তারা গ্রহণ করেছিল। বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন পণ্ড হওয়ার পর 1906 খ্রীষ্টাব্দের বাইশে এপ্রিল "যুগান্তর" পত্রিকায় এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল, "এর প্রতিকার দেশের মানুষের হাতেই আছে। ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর ষাট কোটি হাতকে কাজে লাগিয়ে এই অত্যাচারের অভিশাপ দূর করতে হবে। বাহুবলের মোকাবিলা বাহুবল দ্বারাই সম্ভব।" তবে এই বাঙালী বিপ্লবী তরুণেরা একটা গণবিপ্লব সংগঠনের পথ গ্রহণ করতে পারেনি। আইরিশ সন্ত্রাসবাদী ও রুশ নৈরাজ্যবাদী নিহিলিষ্টদের অনুকরণে অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের হত্যা করাই এদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের হত্যাকাণ্ড প্রথম ঘটেছিল 1897 খ্রীষ্টাব্দে পুনায় (পুনে)। এই সময় চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় দুজন বিরাগভাজন রাজকর্মচারীকে হত্যা করেন। 1904 খ্রীষ্টাব্দে বিনায়ক দামোদর সাভারকর 'অভিনব ভারত' নামে একটি গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। 1905 খ্রীষ্টাব্দের পর একাধিক সংবাদপত্রে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের সমর্থনে প্রচার চালানো হয়েছিল। হিংসাত্মক বিপ্লবের সমর্থক এই সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বাঙলার 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' এবং মহারাষ্ট্রের 'কাল'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 1907 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঙলার লেঃ গভর্নর বা ছোটলাটের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছিল। 1908 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুর শহরে সেখানকার জেলাজজ কিংসফোর্ডের প্রাণনাশের জন্য একটি গাড়ী লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিলেন। এঁদের বিশ্বাস ছিল যে ঐ গাড়ীতে কিংসফোর্ড আছেন। ইতিপূর্বে বিপ্লবীদের কঠোর সাজা দেওয়ার জন্য কিংসফোর্ড বিপ্লবীদের বিশেষ বিদ্বেষভাজন হয়ে উঠেছিলেন। প্রফুল্ল চাকী নিজের বন্দুকের গুলিতে

নিজে আত্মহত্যা করেন। বিচারের পর ক্ষুদিরামকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে বাঙলা প্রদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের সূচনা হয়। বাঙালী তরুণেরা বহু গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি সংগঠন করেছিল। এই সমিতি-গুলির মধ্যে 'অনুশীলন সমিতি'ই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। অনুশীলন সমিতির একমাত্র ঢাকা কেন্দ্রের অধীনেই পাঁচশতটি শাখা ছিল। অল্পকালের মধ্যেই বহু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সমিতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই বিপ্লবী যুবকেরা এতদূর দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল যে ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে এরা তাঁর উপরও বোমা নিক্ষেপ করেছিল। একটি সরকারী শোভাযাত্রায় লর্ড হার্ডিঞ্জের হস্তিপৃষ্ঠে অবস্থিতিকালে তাঁর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমার আঘাতে লর্ড হার্ডিঞ্জ আহত হয়েছিলেন।

ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীগণ বিদেশেও তাদের কর্মকেন্দ্র সংগঠিত করেছিল। লণ্ডনে এই কর্মকেন্দ্রের নেতা ছিলেন শ্যাম কৃষ্ণবর্মা, বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও হরদয়াল। ইউরোপের অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে উল্লেখযোগ্য নেতা বা নেত্রী ছিলেন মাদাম কামা, অজিত সিংহ প্রভৃতি।

তবে এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এর কারণ এই যে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এর ব্যর্থতা অনিবার্য হতে বাধ্য। ইংরাজকে ভারত থেকে বিতাড়ন ছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্য। সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য একরকম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তবে ভারতীয় বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ভারতের জাতীয়তাবাদকে দৃঢ়মূল করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল, একথা কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। একজন ঐতিহাসিক সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন "এঁরা আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব পুনরুদ্ধার করে দিয়েছিলেন।" রাজনীতি সচেতন বহু দেশবাসী সন্ত্রাসবাদী কর্মধারার অনুমোদন করেনি, এর উপযোগিতায় তাদের বিশেষ আস্থাও ছিল না, তত্রাচ অতুলনীয় সাহস প্রদর্শনের জন্য স্বদেশপ্রেমিক মানুষ মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রাপ্য হয়েছিল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (1905-1914)

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের সর্বশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ একযোগে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। 1905 খ্রীষ্টাব্দের বাৎসরিক অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে গোখ্‌লে এক কথায় বঙ্গভঙ্গ নীতি এবং কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের নিন্দা প্রকাশ করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস বাঙলা প্রদেশে অনুসৃত স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের প্রতিও সমর্থন জানিয়েছিল।

নরমপন্থী ও চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে প্রকাশ্যেই বহু বাদানুবাদ ও মতান্তর ঘটেছিল। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বাঙলার এই গণআন্দোলন সমগ্র দেশে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু নরমপন্থী বা 'মডারেট্' নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলন বাঙলা প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। এমনকি এঁরা এটাও চাননি যে এই আন্দোলনের মধ্যে 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' ব্যতীত অন্য কোন কর্মপন্থা অনুসৃত হয়। ঐ বৎসর কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিত্ব কোন দলের নেতাকে দেওয়া হবে এই ব্যাপারটি নিয়েও বেশ বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। শেষকালে, দুই দলেরই আস্থাভাজন মহান্ স্বদেশপ্রেমিক দাদাভাই নওরোজী সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিল। ইংলণ্ড (UK) বা উপনিবেশসমূহে যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন বা 'স্বরাজ' কার্যকর আছে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যও সেই জাতীয় স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন, কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে দাদাভাই নওরোজীর এই ঘোষণা দেশের জাতীয়তাবাদী জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

তবে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে বিরোধ দূর বা দুই মতবাদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন সম্ভব হয়নি। নরমপন্থী বা মডারেট্ নেতৃবৃন্দের অনেকেই সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সমতালে এগিয়ে যেতে অক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। তাঁরা এটা মোটেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি যে তাঁদের যে কর্মপন্থা অতীতে কার্যকর হয়েছিল সমসাময়িক কালে তা' উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়, তাঁদের অস্ত্রগুলি সব অকেজো হয়ে পড়েছে। জাতীয় আন্দোলন যে স্তরে পৌছেছিল তাকে আরও সক্রিয় করে তোলা বা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য নরমপন্থী বা মডারেটদের

আর ছিল না। চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের সংযত রাখার সাধ্যও তাদের ছিল না। 1907 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুরাট অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলের মধ্যে মতবিরোধ সুপ্রকট হয়ে উঠেছিল। শেষপর্যন্ত নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠন হস্তগত করে চরমপন্থীদের সংগঠন থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু, কিছুদিন পরে দেখা গিয়েছিল যে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে এই কলহ বা বিচ্ছেদে দুই পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোন পক্ষেরই কোন সাফল্য লাভ হয়নি। মডারেট্ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তরুণ ও নবজাগ্রত চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের যোগসূত্র বলতে কিছুই ছিল না। সরকারী কর্তৃপক্ষ এই সুযোগে তাদের ভেদ-নীতির খেলা খেলতে সুরু করে দিয়েছিল। চরমপন্থীদের দুর্বল করে ফেলা ও তাদের ওপর দমননীতি প্রয়োগ করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ নরমপন্থী বা মডারেট্ নেতাদের তোয়াজ করে তাদের দলে টানার চেষ্টা করেছিল। নরমপন্থী নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য 1909 খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল। আইনে শাসন-সংস্কারমূলক কিছু ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। এই আইনটি 1909 খ্রীষ্টাব্দের মিণ্টো মর্লি রিফর্মস্ বা শাসন-সংস্কার রূপে খ্যাত। 1911 খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের আদেশ বা ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয়েছিল। পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলাকে পুনরায় যুক্ত করা হয়েছিল তবে এইসঙ্গে বাঙলা প্রদেশের অঙ্গচ্ছেদ করে বিহার ও ওড়িশা নামে নূতন একটি প্রদেশের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তও ঘোষিত হয়েছিল। মিণ্টো মর্লি শাসনসংস্কার আইনে 'ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল' অর্থাৎ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়েছিল। তবে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যের অপ্রত্যক্ষ-ভাবে নির্বাচিত হওয়ার সুবিধা ছিল, সোজাসুজি জনসাধারণের ভোটের অপেক্ষা না করে যে কেউ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হতে পারে—কৌশলটা এমনি ছিল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ বা সভা থেকে নির্বাচিত হয়ে আসবে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। প্রদেশেই মিউনিসিপ্যালিটি (পুর-সভা) ও জেলা বোর্ড (জেলা পরিষদ)

গুলিকে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্যদের নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এই সদস্যদের তথাকথিত 'নির্বাচিত' বলাই উচিত। আবার এই 'নির্বাচিত সদস্য' সংখ্যার কিছু অংশ জমিদার শ্রেণী এবং ব্রিটিশ জাতীয় ব্যবসায়ী ধনিক গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যা ছিল 68, এব মধ্যে 36 জন ছিল সরকারী কর্তৃপক্ষভুক্ত, আর পাঁচজন ছিল বেসরকারী অথচ সরকার কর্তৃক মনোনীত। কাজেই 68 জনের মধ্যে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মোট সাতাশটি। এই সাতাশ জনের মধ্যে আবাব ছয়জন জমিদার এবং দুইজন ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর মানুষ। 27 জন তথা-কথিত নির্বাচিত সদস্যের এই ছিল স্বরূপ। শাসন-সংস্কারের ফলস্বরূপ নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভাগুলির হাতে কোন প্রকৃত ক্ষমতা অর্থাৎ আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। এইগুলি শুধু পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান রূপেই সৃষ্টি হয়েছিল। এই তথাকথিত শাসন-সংস্কার ব্রিটিশরাজের পূর্বতন অগণতান্ত্রিক ও বিমাতৃসুলভ শাসনব্যবস্থায় কোন পরিবর্তনের উদ্যোগ দেখায়নি, ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক শোষণযন্ত্রটিকে ঠিক আগেব মতই সক্রিয় রাখা হয়েছিল। ভারতের শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রমূলক করার কোন ক্ষীণতম প্রয়াসও এই শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় পবিলক্ষিত হয়নি। এই সময় মর্লি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে "কেউ যদি বলেন যে এই শাসন সংস্কার ভারতে গণতান্ত্রিক বা পার্লামেণ্টীয় ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনেব পথ অব্যাহত রাখবে তবে তিনি তা বলতে পারেন, তবে আমি এমন কথা বলব না।" অর্থাৎ মর্লি নিজেই বুঝেছিলেন যে এই শাসন-সংস্কার কতদূর অন্তঃসার শূন্য। ভারত সচিব রূপে তাঁর উত্তরাধিকারী লর্ড ক্রুই (Lord Crewe) 1912 খ্রীষ্টাব্দে অবস্থাটা আরও বিশদরূপে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন "ভারতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের ডোমিনিয়ন (উপনিবেশ) গুলিতে যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত আছে অল্পবিস্তর তারই অনুরূপ কিছ পাওয়ার আশা করে থাকে। আমি কিন্তু এদের এই আশা পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না।" মিণ্টো-মর্লি শাসন-সংস্কারের আসল উদ্দেশ্য ছিল নরমপন্থী নেতাদের বিভ্রান্ত করে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং জাতীয় ঐক্যের পথে বাধার সৃষ্টি।

এই শাসন-সংস্কার আইনে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল।

মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল। একমাত্র মুসলমানেরাই এই কেন্দ্রগুলি হতে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার পেয়েছিল। সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা, সরকারী কর্তৃপক্ষের এই অজুহাত ছিল। তবে, বস্তুতঃ এটা ছিল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে তিক্ততা ও বিভেদ সৃষ্টি করে নির্বিবাদে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখার একটা কৌশল মাত্র। হিন্দু ও মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ যে এক নয় এমন একটা ধারণার উপর ভিত্তি করে এই পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ধারণাটি যে অবাস্তব ও ভ্রান্ত সেটা সুস্পষ্ট। ধর্মভেদের জন্য কোন একটা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ কখনই ভিন্নমুখী হওয়া সম্ভব নয়, ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগঠন পৃথক হবে এই ধারণাও ভ্রান্ত। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হল এই যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে বেশ অনিষ্টজনক প্রতিপন্ন হয়েছিল। ইতিহাসের ধারায় ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ঐক্যবন্ধন এতদিন ধরে গড়ে উঠেছিল, তা' এই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় বেশ ব্যাহত হয়েছিল। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পারস্পরিক বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের আর্থিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতা দূর করে তাদের ভারতের মূল জাতীয়তাবাদী ভাবধারার অঙ্গীভূত করা সহজসাধ্য ছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ সে চেষ্টা না করে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ থেকে এদের স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছিল। এই ব্যবস্থা বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রকট করে তুলেছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা আছে, সেগুলি সমাধানের জন্য ভারতবাসীর মন কেন্দ্রীভূত হতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক ভাবনাই দেশবাসীর চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল।

নরমপন্থী বা 'মডারেট' নেতৃবৃন্দ কখনই মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার পুরোপুরিভাবে সমর্থন করেননি। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা এই শাসন-সংস্কারের অসারতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। তবে এঁরা এই নব-প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। একদিকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা অপরদিকে চরমপন্থী রাজনীতির

সঙ্গে নিত্য সঙ্ঘর্ষ এঁদের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর হয়েছিল। এঁরা ক্রমশঃ জনসাধারণের সম্মান ও শ্রদ্ধা হারিয়ে একটা নগণ্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। রাজনীতি-সচেতন ভারতের বিরাট সংখ্যক মানুষ তিলক প্রভৃতি চরমপন্থী নেতৃবৃন্দকেই নেতা রূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তবে রাজনৈতিক কোন আন্দোলন না থাকায় এর সমর্থন অনেকটা নিষ্ক্রিয় ছিল।

মুসলিম লীগ ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার

মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক কালের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হতে বেশ সময় লেগেছিল। নিম্নবিত্ত হিন্দু ও পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিদ্রুত যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিস্তৃতি লক্ষিত হয়েছিল মুসলমানদের মধ্যে বিশেষতঃ নিম্নবিত্ত স্তরে তা দেখা যায়নি।

ইতিপূর্বে আমরা 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখেছি। বস্তুতঃ, বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি বিশেষ প্রতিহিংসাপরায়ণতার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। একমাত্র দিল্লীতেই 27,000 মুসলমানকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল। এই সময় থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাধারণত মুসলমানদের বিশেষ সন্দেহের চোখেই দেখত। 1870 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছিল। ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সুরু হওয়ার পর ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃগণ তাদের ভারত সাম্রাজ্য বজায় রাখা ও তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাতের জন্য এরা এখন বেশ সক্রিয়ভাবে ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদ এনে নিজেদের আধিপত্য অব্যাহত রাখার নীতি গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ নীতি হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের মানুষের মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টি। এক কথায়, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিয়ে তোলা ও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্রিটিশ রাজনীতির লক্ষ্য। এই দুষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তারা মুসলমানদের অভিভাবক সেজে মুসলমান ভূস্বামী ও নব্য-শিক্ষিত মুসলমানদের নিজেদের দলে টেনে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভারতীয় সমাজে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ

অন্যভাবেও বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছিল। বাঙালীরা ভারতবর্ষে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই ধরনের চিন্তা প্রচার করে এরা ভারতে প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিক বিভেদ এনে দিয়েছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ সমাজে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্বের সুযোগে অব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলত। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের মানুষদের মনে উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগানো হত। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে চিরকালই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষিত ছিল। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ সৃষ্টির জন্য সরকারী কাজকর্মে উর্দু ভাষাকে হঠিয়ে তার স্থানে হিন্দী প্রচলন আন্দোলনের পেছনেও সরকারী প্রশ্রয় ছিল। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিকারসাধ্য কতকগুলি বিশেষ অভাব বা অসুবিধা থাকে। এইসব অভাব বা অসুবিধা-ভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেও অবশিষ্ট সমাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা হত। এক কথায় ভারতে গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত অনৈক্য ও বিদ্বেষ জাগ্রত করা ও তাতে ইন্ধন জোগানই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের শাসন-কৌশল হয়ে উঠেছিল।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার পরিপুষ্টিতে সৈয়দ আহম্মদ খানের বিশেষ ভূমিকা ছিল। একজন মহান্ শিক্ষাবিদ্ ও সমাজসংস্কারকরূপে পরিচিত সৈয়দ আহম্মদ খান তাঁর জীবনের শেষভাগে রাজনীতি ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতাবাদী বা রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলেন। পূর্ব অভ্যস্ত চিন্তাধারা বিসর্জন দিয়ে 1880 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থের স্বরূপ এক ত নয়ই বরং বিপরীতমুখী। তাঁর এই মতবাদই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তিনি তাঁর অনুগামীদের ব্রিটিশরাজের প্রতি একান্ত অনুগত থাকার পরামর্শ বা নির্দেশ দিতেন। 1886 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকালে তিনি এর বিরোধিতার জন্য বারাণসীর রাজা শিবপ্রসাদের সাহায্যে ব্রিটিশশাসন সমর্থক একটি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ খান এই মত প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন যে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটলে বা ব্রিটিশ-শাসন দুর্বল হয়ে উঠলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের অধীনতা স্বীকার করতে হবে। মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত জাতীয়তাবাদী নেতা বদরুদ্দীন তায়েবজী মুসলমান সম্প্রদায়কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য যে আহ্বান জানিয়ে-

ছিলেন সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের তা অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করতে বলেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক স্বার্থ ভিন্ন বা বিপরীতমুখী, ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে মুসলমানেরা বিপন্ন হবে এই ধরনের মতবাদ ভ্রান্ত বা বাস্তবতা বিবর্জিত ছিল, এটা বলাই বাহুল্য। হিন্দু ও মুসলমান-গণের ধর্মমত ভিন্ন হতে পারে কিন্তু তাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ যে এক, এটা ত দিবালোকের মতই স্পষ্ট। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকেও অভিজাত ও অনভিজাত হিন্দু-মুসলমানের জীবনধারা একই প্রকার এটাও সর্বজনবিদিত। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত শ্রেণী একই জীবনধারায় অভ্যস্ত, অন্যদিকে দরিদ্রশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের জীবনযাত্রার ধারা একই প্রকার। ধর্মের বিভেদ অতীতে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের জীবনধারায় কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি—এটাই সত্য কথা। একজন বাঙ্গালী হিন্দুর সঙ্গে একজন বাঙ্গালী মুসলমানের সর্ববিষয়ে যে সাদৃশ্য আছে, সেই সাদৃশ্য এক বাঙ্গালী মুসলমানের সঙ্গে এক পাঞ্জাবী মুসলমানের মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে নিষ্পেষিত ও অত্যাচারিত হত—এটা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। এমনকি স্বয়ং সৈয়দ আহম্মদ খান্ 1884 খ্রীষ্টাব্দে নিজেই বলেছিলেন যে "তোমরা কি সবাই একই দেশে বাস কর না? তোমরা কি একই মৃত্তিকায় প্রোথিত বা দগ্ধ হও না? মনে রেখো যে হিন্দু বা মুসলমান আখ্যা কে কোন ধর্মাবলম্বী সেটাই চিহ্নিত করে দেয়, ধর্মের নাম আলাদা হলেও হিন্দুই হোক, বা মুসলমানই হোক, এমনকি এদেশে বাসকারী খ্রীস্টানরাও এক হিসেবে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও সকলেই একজাতিভুক্ত। কাজেই ভারতের সকলেরই ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের মঙ্গলের জন্য একযোগে কাজ করে যাওয়া উচিত।" একটি প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন গড়ে উঠেছিল?

এর একটা কারণ দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে মুসলিম সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃতভাবে অবনত অবস্থাভোগী ছিল। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ সকলেই ছিল অভিজাত বা জমিদার শ্রেণীর মানুষ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সত্তর বৎসর জুড়ে অর্থাৎ 1870 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উচ্চবর্গের মুসলিম শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ছিল

তীব্র ব্রিটিশ বিদ্বেষ, রক্ষণশীলতা ও আধুনিক শিক্ষা বিরোধিতা। তৎকালে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা দেশে অতি অল্পই ছিল। এর ফলে বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার ধারক সমসাময়িক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পরিচয় সাধিত হতে পারেনি। সুতরাং এই সমাজ রক্ষণশীল ভাবাপন্ন ও অনগ্রসরই থেকে গিয়েছিল। পরবর্তী কালে সৈয়দ আহম্মদ খান্, নবাব আব্দুল লতিফ্, বদরুদ্দীন তায়েবজী প্রভৃতির চেষ্টায় মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রসার হয়েছিল। তবে হিন্দু, পার্শী অথবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের হার কম ছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার জন্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এদের প্রভাবও অল্প ছিল। প্রতিক্রিয়াশীল বড় বড় ভূস্বামীরাই সাধারণতঃ মুসলমানদের নেতৃত্ব করত। আগেই দেখানো হয়েছে যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জমিদার বা ভূস্বামী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশ শাসনের উগ্র উৎসাহী সমর্থকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উচ্চশিক্ষা বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে নব্যশিক্ষিত হিন্দু ও এই সমাজের উদীয়মান ব্যবসায়ী শিল্পোদ্যোগী শ্রেণী জনসাধারণের নেতৃত্ব দখল করে নিয়েছিল, জমিদার শ্রেণীর চেয়ে সাধারণ মানুষের কাছে এই শিক্ষিত শ্রেণীর মর্যাদা বেশী হয়ে উঠেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, মুসলিম সমাজের অবস্থা ছিল বিপরীত।

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতা তাদের পক্ষে একদিকে বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারী চাকরি অথবা কোন ভদ্র পেশার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা ছিল নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই শিক্ষার দৈন্যের কারণে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত সরকারী চাকরি বা ভদ্র পেশা গ্রহণের সুযোগ মুসলমানেরা পায়নি। সেদিক থেকে তারা বঞ্চিতই ছিল। 1858 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও মুসলিম-দ্বেষী মনোভাব দেখিয়েছিল, তাদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে প্রধানত মুসলিম সম্প্রদায়ই 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের কারণ। মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তৃতির পরও এই সমাজের মানুষেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য বা চিকিৎসা, আইন ব্যবসা ইত্যাদি পেশা গ্রহণের সুযোগসুবিধা খুব কমই পেত। কাজেই এদের সরকারি চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করতেই হত। ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশের একটি অনগ্রসর উপনিবেশ মাত্র, সরকারী চাকরি লাভের সুযোগসুবিধা

অতি অল্প সংখ্যক ভারতবাসীর ভাগ্যেই জুটত। এই অবস্থার সুযোগে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও রাজভক্ত মুসলিম ভূস্বামী শ্রেণীর পক্ষে মুসলিম জনসাধারণকে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তোলা সম্ভব ছিল এবং এরা এই অবস্থার সুযোগও নিয়েছিল। সৈয়দ আহম্মদ খান্ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ সরকারী চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষ অধিকারের দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁরা এই প্রচার চালিয়েছিলেন যে শিক্ষিত মুসলমানেরা যদি ব্রিটিশের অনুগত বা রাজভক্ত হয় তবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তাদের সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করবে, অন্যান্য অনেক প্রকার বিশেষ অনুগ্রহও তারা ভোগ করতে পাবে। কিছু রাজভক্ত হিন্দু ও পার্শী নেতা ঠিক এইভাবে তাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মানুষদের সরকারী অনুগ্রহ লাভের জন্য 'রাজভক্ত' হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু এঁদের পরামর্শে বিশেষ কেউ কর্ণপাত করেনি, আর এই ধরনের রাজভক্ত নেতার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল। এই অবস্থা চলার পর দেখা গিয়েছিল দেশের প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বাধীনচিত্ত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী, সাংবাদিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণের হাতে এসে পড়েছে, এর ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে একমাত্র মুসলমান সমাজে। ব্রিটিশের অনুগত মুসলিম ভূস্বামী অথবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীবৃন্দ মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব দখল করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। একমাত্র বোম্বাই প্রদেশেই মুসলিম সম্প্রদায় ব্যবসায়বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের তুলনায় বহু পূর্ব থেকে এগিয়ে এসেছিল, এবং এই কারণেই এই প্রদেশেই বহু সুযোগ্য মুসলিম নেতার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। তৎকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বদরুদ্দীন তায়েবজী, আর. এম. সয়ানী, এ. ভিমজি এবং তরুণ ব্যবহারজীবী মহম্মদ আলি জিন্নার নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরু রচিত 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া' বা ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—"হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব একসঙ্গে হয়নি। মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল হিন্দুসমাজের এক প্রজন্ম অন্তে। এক প্রজন্মের এই ব্যবধান শুধু মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভবের ক্ষেত্রেই নয় নানা দিকেই ছিল এই ব্যবধান, বিশেষভাবে রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের অনগ্রসরতা সমগ্র মুসলিম সমাজের মানসিক ভীতির উৎস হয়ে উঠেছিল।"

ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমাদের জানা উচিত যে তখনকার দিনে স্কুল কলেজগুলিতে কি ধরনের ইতিহাস পড়ানো হত। যেভাবে ইতিহাস চর্চা হত, তাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদের পারস্পরিক বিদ্বেষের শিকার হতে হত। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ এবং তাঁদের অনুকরণে ভারতীয় ঐতিহাসিকেরাও ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসকে মুসলিম শাসনকাল (Muslim Period) রূপে চিহ্নিত করতেন। সমগ্র তুর্কী, আফগান ও মুঘল শাসনকালকে মুসলিম শাসন বা মুসলিম যুগ আখ্যা দেওয়া হত। সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানেরা হিন্দু জনসাধারণের মতই দারিদ্র্য ও করভারক্লিষ্ট জীবন বহন করত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জনসাধারণ রাজা, অভিজাত সম্প্রদায়, সর্দার ও জমিদারি শ্রেণীর ঘৃণা ও অবজ্ঞাভাজন ছিল। সুবিধাভোগী ও ক্ষমতাস্পন্ন শ্রেণীর মানুষেরা হিন্দু-মুসলমান যে কোন ধর্মাবলম্বী হোক না কেন অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল মানুষ মাত্রকেই মানুষ বলে গণ্য করত না। মুসলমান ধর্মাবলম্বী এক বিশাল জনগোষ্ঠীকেও বঞ্চনা ও অত্যাচার ভোগ করতে হত। এতৎসত্ত্বেও আমাদের ইতিহাস লেখক মাত্রই দেখাতে চেয়েছিলেন যে মধ্যযুগে মুসলমান মাত্রই ছিল শাসক শ্রেণীর মানুষ আর সব হিন্দুই ছিল শাসিত বা পরাধীন। তাঁরা তাঁদের রচনায় এটা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারতে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতই শাসননীতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভীষ্টসিদ্ধির জন্য পরিচালিত হত, ধর্মীয় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কখনও শাসননীতি প্রযুক্ত হয়নি। শাসক সম্প্রদায় বা বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ বৈষয়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য বহুক্ষেত্রে ধর্মের জিগির তুলে জন-সমর্থন পেতে চাইত। তবে এই ধর্মের দোহাই ছিল একটা মুখোস বা ছদ্মবেশ মাত্র। আরও একটা কথা এই যে, ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির অস্তিত্ব অস্বীকারই ব্রিটিশ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকদের স্বভাব দাঁড়িয়েছিল। ভারতে মিশ্র সংস্কৃতির ধারণাটিকেই এই ঐতিহাসিকগণ চূর্ণ করে দিতে চাইতেন। এটা অবশ্য সত্য কথা যে ভারতে বহুসংস্কৃতির ধারা বর্তমান। তবে এই সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার মূল মোটেই ধর্মীয় নয়। এক এক অঞ্চলের উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণীর মানুষদের সংস্কৃতির চরিত্র প্রায়ই এক ধরনের হয়ে পড়ত। এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকেরা

লিখে গিয়েছেন যে ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের সংস্কৃতির ধারা বিভিন্ন ছিল।

রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার আমদানি এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এর মূল্যায়নের মূলে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা। এর পেছনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ভেদ-নীতির খেলাও সক্রিয় ছিল। যাই হোক, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে এই পরিস্থিতি সংখ্যালঘু শ্রেণীর মনে নিরাপত্তার অভাব জাগিয়ে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতে উচিত ছিল এমন বিচক্ষণ পদক্ষেপ বা কার্যপ্রণালীর অনুসরণ যদ্বারা সংখ্যাগুরু অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা সংখ্যালঘু মুসলমানেরা নেহাৎ সংখ্যাল্পতার জন্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, মুসলমানদের মন থেকে এই আশঙ্কার অপনোদন। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েব দৃষ্টিভঙ্গি ও সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদের আচরণ দ্বারাই শেষোক্তদের মন থেকে সন্দেহের বীজ তুলে ফেলা সম্ভব ছিল। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েব এক্ষেত্রে উচিত কর্তব্য ছিল আচার-আচরণের দ্বারা সংখ্যালঘুদের এই দুটি বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ করে তোলা। প্রথমতঃ তাদের ধর্মের কোন ক্ষতি করা হবে না, এবং তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ থাকবে। দ্বিতীয়তঃ আর্থিক ব্যবস্থা বা শাসনতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। ভারতে যে নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদ প্রবর্তনে অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁরা উপরোক্ত নীতিতে আস্থাবান ছিলেন। তাঁরা এটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ও বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতবাসীকে একটি মহাজাতি রূপে সংগঠিত করার কাজটি কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ, এর জন্য প্রয়োজন হবে দীর্ঘকাল ধরে দেশবাসীকে সমুচিত রাজনৈতিক শিক্ষাদান। কারণ রাজনীতি সচেতনতাই ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম। এই জন্যই এঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের এটাই বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীকে তাঁরা একই ধরনের জাতীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের অংশভোগী করতে চান—এটাই হল তাঁদের আদর্শ। 1886 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে দাদাভাই নওরোজী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে কংগ্রেস শুধু জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলি নিয়েই মাথা ঘামাবে। ধর্ম বা সামাজিক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয়। 1899 খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস এই নীতি গ্রহণ করেছিল

যে অধিকাংশ মুসলমান প্রতিনিধির বিনা সম্মতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কর্মসূচি কংগ্রেস গ্রহণ করবে না। কংগ্রেসের প্রথমযুগে বহু মুসলমান কংগ্রেসে যোগদান করেছিল। এককথায় বলা যায় যে আমাদের দেশের প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীগণ আধুনিক ধরনের জাতীয়তাবাদই দেশের মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে রাখাই ছিল এঁদের নীতি বা লক্ষ্য।

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বহু দিক থেকেই দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বিপুল অগ্রগতি এনে দিলেও দুর্ভাগ্যক্রমে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিক্ থেকে আন্দোলনকে এক ধাপ পিছিয়ে দিয়েছিল। কিছু কিছু চরমপন্থী নেতার বক্তৃতায় ও রচনায় বেশ হিন্দুয়ানির ছাপ থাকত। ভারতের মধ্যযুগের সংস্কৃতির উপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে এঁরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে দেশের মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতেন। ভারতে যে মিশ্র-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল সেটির দিকে এঁরা দৃষ্টি দিতেন না। উদাহরণস্বরূপ তিলক প্রবর্তিত গণপতি ও শিবাজী উৎসবের উল্লেখ করা যেতে পারে। অরবিন্দ ঘোষের পৌরাণিক ধাঁচে ভারতকে মাতৃরূপে চিন্তা ও জাতীয়তাবাদ ও ধর্মের অভিন্নতার ধারণা, সন্ত্রাসবাদীগণের কালিকাদেবীর কাছে শপথ গ্রহণ, গঙ্গা-স্নানান্তে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের স্বচনা—এই ধরনের ব্যাপারগুলি মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুমোদন বা সমর্থন লাভ করতে পারেনি। এই ব্যাপারগুলি ইসলাম ধর্মসম্মত ছিল না, সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে এই ধরনের ক্রিয়াকর্মে যোগদানও সম্ভব হয়নি। দেশের মধ্যে শিবাজী অথবা রাণা প্রতাপকে কেন্দ্র করে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারের চেষ্টা চলেছিল তাতে তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও শৌর্যের প্রতি ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই জাতীয়-বীরেরা 'বিদেশীর' বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এটার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। বস্তুতঃ এই ধরনের চিন্তায় আকবর বা আওরঙ্গজেবকে 'বিদেশী' রূপেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। এঁরা ধর্মে মুসলমান অবশ্যই ছিলেন কিন্তু তাই বলে এঁদের 'বিদেশী' আখ্যা কি প্রাপ্য? একটা বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ক্ষমতালাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপেই আকবর-প্রতাপ ও আওরঙ্গজেব-শিবাজীর সঙ্ঘর্ষ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই সংঘাতের উৎস ছিল রাজনৈতিক প্রভুত্ব মাত্র। আকবর বা আওরঙ্গজেব 'বিদেশী' এবং প্রতাপ-

শিবাজীকে জাতীয় বীর আখ্যা দেওয়াটা বিংশ শতাব্দীর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের আলোকে ভারতের অতীত ইতিহাস ব্যাখ্যায় পর্যবসিত হয়েছিল। এই ধরনের ব্যাখ্যা শুধু অসত্য ইতিহাস রচনাই নয়, এই ধরনের অপ-ব্যাখ্যা জাতীয় সংহতির মূলেও কুঠারাঘাত করেছিল।

তবে একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে কোন কোন ক্ষেত্রে অসতর্কতা দেখালেও চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীগণ মুসলিম-বিদ্বেষী অথবা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন না। সাম্প্রদায়িকতা এঁদের মোটেই আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিলকসহ এই জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় প্রত্যেকেই হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনে সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা বলতেন যে দেশকে ভারতমাতারূপে কল্পনা একটি আধুনিক ধারণা, এর সঙ্গে ধর্ম বা হিন্দুত্বের কোন সম্পর্ক নেই। চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেরই রাজনৈতিক ধ্যানধারণা আধুনিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিল, এঁরা অতীতের রোমন্থনকারী মোটেই ছিলেন না। যে বিদেশী দ্রব্য বর্জন বা শত্রুপক্ষের সঙ্গে অর্থনৈতিক অসহযোগিতা বা নীতি চরমপন্থী রাজনৈতিকবৃন্দের অন্যতম হাতিয়ার ছিল, তা ছিল আধুনিক কৌশল। এদের রাজনৈতিক সংগঠনের ধরনেও প্রগতিমুখিতা পরিলক্ষিত হত। এমনকি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস ছিল ইউরোপের বিপ্লববাদী আন্দোলন। কালী অথবা ভবানীর কাছে এঁরা প্রেরণা নেননি। আয়ারল্যাণ্ড, রাশিয়া ও ইতালিতে সংগঠিত বিপ্লবই ছিল এঁদের প্রেরণার উৎস। তবে আগে যা বলা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি করেই বলা যেতে পারে যে চরমপন্থী রাজনৈতিক কার্যকলাপে কিছুটা হিন্দু-ভাবনার ছায়াপাত ঘটেছিল। রাজনৈতিক কর্ম-ধারায় হিন্দুত্বের এই ঈষৎ প্রলেপন দেশের রাজনৈতিক কর্মধারার পক্ষে নিঃসন্দেহে অনিষ্টকর প্রমাণিত হয়েছিল। চতুর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও তাদের স্বপক্ষীয় ব্যক্তিরা জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের উপর হিন্দুধর্মীয় প্রভাবের দিকটির ফলাও প্রচার করে মুসলমানদের মনে জাতীয়তাবাদের প্রতি সন্দেহ ও বিতৃষ্ণা সঞ্চারের সুযোগ পেয়েছিল। এই প্রচারের ফলে বহুসংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন; কেউ কেউ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণও করেছিলেন। বস্তুতঃ এঁরা সহজেই সাম্প্রদায়িকতাবাদের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। এইসব ব্যাপার সত্ত্বেও ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল ও হজরত মোহানির ন্যায় বহু-

সংখ্যক প্রগতিশীল শিক্ষিত মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহম্মদ আলি জিন্না জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম তরুণ নেতা হয়ে উঠেছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাও সাম্প্রদায়িকতাবাদ উদ্ভবের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল। আধুনিক ধাঁচের শিল্পোদ্যোগের অভাবে বিশেষতঃ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারি বা কর্মহীনতা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল। যে স্বল্পসংখ্যক চাকরি প্রাপ্তির সুবিধা ছিল তার জন্য প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে উঠাই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভারতীয়গণ বেকারি রূপ রোগের কারণ নির্ণয় করে দেশে এমন একটা আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যার ফলে দেশের আর্থিক অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই দেশের মানুষকে জীবিকার সুযোগ এনে দিতে পারে এটা এঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। এই দূরদৃষ্টি সকলের ছিল না, অনেকেই মনে করতেন যে সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা বা জাতের ভিত্তিতেই চাকরি সংরক্ষিত করা হলেই সমস্যার সমাধান হবে। এই জাতীয় চিন্তায় অভ্যস্ত মানুষেরা সীমায়িত চাকরির সংখ্যায় নিজেদের সুবিধাপ্রাপ্তির আশায় সম্প্রদায়গত, ধর্মীয় বা আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তুলত। চাকরি প্রাপ্তির জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এমন মানুষেরা এই সংকীর্ণ মনোভাবের আবেদনে বেশ সাড়া দিত। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং বিভেদনীতি প্রয়োগে দেশ শাসনে বিশ্বাসী কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের কুঅভিসন্ধি ব্যর্থ হয়নি। বহু হিন্দু হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও বহু মুসলমান মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলেছিল। রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ মানুষ এটা বুঝতে পারেনি যে তাদের আর্থিক, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিগত অনগ্রসরতা বা দৈন্যের মূল কারণ বিদেশী শাসন। তারা বুঝতে পারেনি যে সম্প্রদায় নির্বিশেষে তারা সকলে একইভাবে বিদেশী শাসনের কারণে নানাবিধ অভাব দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছে। তারা এটাও বুঝতে পারেনি যে যদি তারা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে দেশের স্বাধীনতা আনতে পারে এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করতে পারে তবেই তারা সবাই যে দুর্গতির মধ্যে বাস করছে তার প্রতিবিধান সম্ভব। আর এই দুর্গতিগুলির অন্যতম হল বেকারি বা কর্মহীনতা।

1906 খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা দ্বারা একশ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমান এবং বড় বড় মুসলমান নবাব ও ভূস্বামীদের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও

ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য বা রাজভক্তির চরম অভিব্যক্তিরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। এই সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব করেছিলেন—আগা খান্ ঢাকার নবাব এবং নবাব মহ্সীন-উল-মুল্ক। মুসলিম লীগ বঙ্গবিভাগে সম্মতি দিয়েছিল এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান প্রার্থীদের জন্য আসন-সংরক্ষণ বা রক্ষা-কবচের দাবি তুলেছিল। পরে, বড়লাট লর্ড মেয়োর প্ররোচনায় লীগ পৃথক নির্বাচনের অধিকার তুলে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার পেয়েছিল। বড়লাট লীগকে এবিষয়ে সাহায্যও করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে যে, যে সময় ভারতীয় কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানে আত্মনিয়োগ করেছে ঠিক সেই সময়েই মুসলিম লীগ এবং তার প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব এই প্রচার চালিয়ে গিয়েছিল যে মুসলমানদের স্বার্থ হিন্দুদের স্বার্থ থেকে পৃথক, অতএব তাদের লক্ষ্য এক নয়। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে না গিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় ও জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ হয়েছিল। এই সময় থেকে লীগের লক্ষ্য দাঁড়িয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অভিযান। এইভাবে মুসলিম লীগ মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থসংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিদানকারী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলন রুখতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে অস্ত্রগুলি ব্যবহার করতে চেয়েছিল, অতি অল্পকালের মধ্যেই মুসলিম লীগ ব্রিটিশের সেই অস্ত্রগুলির মধ্যে মুখ্য স্থান নিয়েছিল।

মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করার জন্য মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রচারকার্য চালিয়ে এই সমাজের নেতৃত্ব দখলের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ লীগকে প্ররোচিত করেছিল। এটা অবশ্য সত্য কথা যে ভারতে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কর্মী এবং নেতাদের মধ্যে সকলেই প্রায় ছিল শিক্ষিত নগরবাসী, সাধারণ মানুষের কোন প্রাধান্য এই আন্দোলনে ছিল না। এতৎসত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থ সাধনই ছিল সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য। অন্যদিকে, মুসলিম লীগ ও এর অভিজাত শ্রেণীভুক্ত নেতারা সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান জনতার স্বার্থরক্ষার দিকে মনোযোগ দেয়নি। সাম্রাজ্যবাদী

শাসনে হিন্দু জনসাধারণের মতই মুসলমান জনসাধারণেরও অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হত এটা বলাই বাহুল্য।

স্বদেশপ্রেমিক মুসলমানদের কাছে মুসলিম লীগের এই ত্রুটি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিশেষভাবে শিক্ষিত মুসলমান তরুণেরা প্রগতিপন্থী জাতীয়ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই সময়ে অড়র (Ahar) আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এটি ছিল একটি সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান্, হাসান ইমাম, মৌলানা জাফর অলি খান এবং মজহরউল হক্। আলিগড় সম্প্রদায়ের এবং বড় বড় নবাব জমিদারগণের ব্রিটিশ তোষণ নীতি এই তরুণ নেতাদের মনে বিতৃষ্ণার সঞ্চার করেছিল। স্বরাজ লাভের ন্যায় আধুনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ এই তরুণেরা সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়ার জন্য প্রচার-অভিযান সুরু করেছিলেন।

এই ধরনেরই জাতীয় মনোভাব দেওবন্দ সম্প্রদায় নামে পরিচিত কিছু-সংখ্যক নিষ্ঠাবান মৌলভিদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। দেওবন্দ নামক স্থানের মুসলিম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মৌলভিরা দেওবন্দ সম্প্রদায়রূপে আখ্যাত হয়ে থাকেন। জাতীয়তাবাদী ও নিষ্ঠাবান এই মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন তরুণ 'মৌলানা' আবুল কালাম আজাদ। ইনি কায়রোস্থিত সুপ্রসিদ্ধ আল্ আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করেন। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে 1912 খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'আল্ হিলাল্' নামে একটি সংবাদপত্র প্রবর্তন করেন। এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি যুক্তিসম্মত জাতীয়তাবাদ প্রচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলি, আজাদ এবং এঁদের সহকর্মিরা নির্ভীকতা ও সাহসের সঙ্গে সকলকে জাতীয় আন্দোলনের অংশীদার হতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এদের বক্তব্য এই ছিল যে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চিন্তার কোন বিরোধ নেই অর্থাৎ কোন মুসলমানের পক্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান ইসলাম ধর্মবিরুদ্ধ কাজ নয়।

1911 খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান সাম্রাজ্য (তুর্কী) ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল। 1913 খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের বল্কান শক্তিগুলির বিরুদ্ধেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তুরস্ক বা তুর্কী সম্রাট্ এই সময়ে নিজেকে বিশ্বের মুসলিম সমাজের শাসক বা 'খলিফা' বলে দাবি করতেন; মুসলিম সম্প্র-

দায়ের অধিকাংশ পবিত্র তীর্থস্থানগুলি খলিফা বা তুর্কী সম্রাটের সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। যুদ্ধরত বা আক্রান্ত তুরস্ক ও তুর্কীদের প্রতি সমগ্র ভারতে একটা সহানুভূতির বন্যা জেগে উঠেছিল। তুর্কীদের সাহায্যের জন্য ভারত থেকে ডাঃ এম. এ. আন্সারীর নেতৃত্বে একটি চিকিৎসক দল (মেডিক্যাল মিশন) প্রেরিত হয়েছিল। বল্কানযুদ্ধ কালে অথবা তার পরেও ব্রিটিশ সরকারের নীতি তুরস্ক বা তুর্কীর অনুকূল না থাকায় তুরস্ক বা তুরস্ক-শাসক 'খলিফা'র প্রতি যাদের সহানুভূতি ছিল তাদের সকলেরই মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী মনোভাবের সঞ্চার হয়েছিল। খলিফার অনুকূলে খিলাফৎ মনোভাব বা একটা আন্দোলনও জেগে উঠেছিল। বস্তুতঃ 1912 থেকে 1924 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশের অনুগত মুসলিম লীগ সদস্যদের থেকে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী তরুণ মুসলিম নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা মুসলমান সমাজে বেশ বেড়ে উঠেছিল।

তবে এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, চরমপন্থী মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের অনেকেই রাজনীতি ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টি পরিহার করতে পারেননি। আধুনিক রাজনীতিতে যে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই এটা তাঁরা বুঝতে চাননি। অবশ্য আজাদের মত মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান তরুণ নেতা ছিলেন যাঁরা যুক্তিনির্ভর বুদ্ধি-প্রয়োগে রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস স্থাপন করতে ভোলেননি। চরমপন্থী মুসলিম রাজনৈতিক নেতারা দেশের স্বাধীনতার মত গুরুতর সমস্যাটি অমীমাংসিত রেখে মুসলিম তীর্থস্থানগুলির নিরাপত্তা ও তুর্কী সাম্রাজ্যের সুরক্ষার জন্যই আন্দোলনে নেমেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের ফলে পরাধীন জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে এঁদের অভিযান পরিচালিত হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এঁদের অভিযানের কারণ ছিল এই যে খলিফাকে এরা বিপন্ন করেছিল এবং মুসলিম তীর্থস্থানগুলি তাঁর হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল। তুরস্কের প্রতি এঁদের সহানুভূতির উৎসও ছিল ধর্মীয় উন্মাদনা। এঁরা দেশে যে রাজনৈতিক বিক্ষোভ সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন তার আবেদনও ছিল ধর্মীয়। মুসলিম জনসাধারণের কাছে এঁরা মুসলমানদের অতীত ইতিহাস সংস্কৃতি, মুসলিম বীরবৃন্দের কাহিনী প্রচার করে খিলাফৎ আন্দোলনকে পুষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এই প্রচার প্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীন ও মধ্য-যুগের কোন উল্লেখ রাখা হত না। পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম ইতিহাসকেই

এঁরা উপজীব্য করেছিলেন। অবশ্য, পশ্চিম এশিয়ায় অতীতে মুসলিম গৌরব কাহিনীর প্রচারে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোন ক্ষতি হয়নি। খিলাফৎ নেতাদের প্রচার কৌশলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষতঃ নগরাঞ্চলের মুসলিম সমাজে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল। তবে কিছুকালের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল ধর্মীয় কারণে যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় সেই ধরনের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা থেকেই যায়। এই ধরনের রাজনৈতিক কাজকর্ম থেকে মুসলমান জনসাধারণের মনে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার কলুষমুক্ত কোন রাজনৈতিক চেতনা আসেনি। এই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতামূলক কোন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে না উঠলেও হিন্দুসমাজের মধ্যেও ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার মনোভাব জেগে উঠতে দেখা গিয়েছিল। বহু হিন্দু লেখক এবং রাজনৈতিক কর্মী মুসলিম লীগ অনুসৃত কর্মসূচির অনুরূপ ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতামূলক ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ করেছিল। এরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলেছিল, এরা মুসলমানদের ভারতে 'বিদেশী' রূপে চিহ্নিত করত। মুসলিম লীগের অনুকরণে এরা ব্যবস্থাপক সভা, পৌর-প্রতিষ্ঠান ও চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবিতে রীতিমত আন্দোলন সুরু করেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদী বৃন্দ

1914 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল গ্রেট ব্রিটেন (ইংলণ্ড), ফ্রান্স, ইতালী, রুশ, জাপান ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A)। আর অপর পক্ষে ছিল জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এবং তুরস্ক (টার্কী)। দশম অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কিভাবে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি অন্যত্র নিজেদের একচেটিয়া বাজার এবং উপনিবেশ দখলের জন্য পরস্পরের সঙ্গে কি ধরনের প্রতিযোগিতা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর সুরুতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র এবং তিক্ত হয়ে উঠেছিল, কারণ 'দখল' করার এলাকা বেশ কমে এসেছিল, সাম্রাজ্য-বাদের কবলমুক্ত এলাকা ভূমণ্ডলে আর অল্পই অবশিষ্ট ছিল। সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে কিছু রাষ্ট্র বেশ কিছু পরে নেমেছিল কাজেই তাদের ভাগ্যে বেশি

কিছু জোটেনি। সাম্রাজ্যবিস্তার বিষয়ে অগ্রণী ইংল্যাণ্ড (গ্রেট্ ব্রিটেন) ও ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক অঞ্চল বা বাণিজ্যক্ষেত্র স্বভাবতই বহুবিস্তৃত হয়ে উঠেছিল। এখন জার্মানী ও ইতালির মত নয়া-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিও চেয়েছিল যে উপনিবেশগুলির যথাযথ বণ্টন হোক, যাতে তাদের ভাগের অংশও ভারী হবে। এরা চেয়েছিল যে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করেও ফ্রান্স ও ব্রিটেনের হাত থেকে কিছু উপনিবেশ অধিকার করে নিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে পৃথিবীর তাবৎ বৃহৎ শক্তিগুলি নিজেদের অর্জিত সম্পত্তি রক্ষা করতে অথবা অনার্জিত অঞ্চল দখল করতে একটি সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি নিজেদের শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে মারণাস্ত্র সংগ্রহের প্রতিযোগিতাও সুরু করে দিয়েছিল। যুদ্ধলিপ্সু রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণও এই ধরনের উপনিবেশ লাভের প্রচেষ্টা সমর্থন করত, অর্থাৎ তারাও তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্র পরিচালকেরা জনসাধারণের মধ্যে এই ধরনের প্রচার চালাত যে নিজের দেশের ভূমিখণ্ডের বাইরে এক বা একাধিক দেশ বা রাজ্যের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে একটা রাষ্ট্র বা জাতির মর্যাদার হানি হয়। অন্য দেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের অর্থই হল প্রচুর ক্ষমতা ও খ্যাতি অর্জন। ইউরোপের স্বদেশাভিমানী সংবাদপত্রগুলি এইরূপ প্রচারের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। ইংরাজ জাতি একথা বলতে গর্বে আত্মহারা হয়ে উঠত যে ব্রিটিশ রাজত্বে 'সূর্য কখনও অস্ত যায় না'। জার্মান জাতি সূর্যেরও ভাগ চাইত, এতই ছিল তাদের ধৃষ্টতা। রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে কোনঠাসা হয়ে পড়ার আশঙ্কায় প্রতিটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে তাকে দলে টেনে আনতে চাইত। এর ফলে খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটি করে রাষ্ট্র জোট বেঁধে ফেলত। দুইটি বিবদমান পক্ষই হয়ে দাঁড়াত একটি করে রাষ্ট্রজোট, অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রগোষ্ঠী অপর একটি রাষ্ট্র জোট বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়ত। যাই হোক এই-ভাবে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ 1914 খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসেই সুরু হয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধে বিশ্বের রাজনীতি ক্ষেত্রেও দ্রুত পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ চলার সময় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বুনিয়াদ যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করতে পেরেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনাকালে তিলক সহ ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ স্থির

করেন যে তাঁরা ভারত গভর্নমেণ্ট তথা ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করবেন। ইতিমধ্যে 1914 খ্রীষ্টাব্দে তিলক কারামুক্ত হয়েছিলেন। তবে ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য বা ব্রিটিশ স্বার্থের সমর্থনে নেতৃবৃন্দ এই সংকল্প গ্রহণ করেননি। এই সম্বন্ধে জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে "সরব ব্রিটিশ আনুগত্য প্রকাশ সত্বেও ব্রিটিশের প্রতি কারও কোন সহানুভূতি আসলে ছিলই না। নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই দলই জার্মানদের বিজয়লাভে উল্লসিত হয়ে উঠত। জার্মানদের প্রতি ভারতীয়দের মনে যে কোন সহানুভূতি ছিল এমন নয়। আমাদের ব্রিটিশ প্রভুদের যে জার্মানরা কাবু করে ফেলছে, সাধারণ ভারতবাসী এই জন্য আনন্দিত হয়ে উঠত।"

জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশের যুদ্ধপ্রচেষ্টা সমর্থনের একটি গূঢ় কারণও ছিল। এদের মনে একটা ভ্রান্ত-বিশ্বাস জন্মেছিল যে ইংরাজ জাতি যুদ্ধে জয়ী হলে ভারতের এই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করার জন্য যুদ্ধান্তে এমন ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করবে যার দ্বারা ভারতবাসীর স্বরাজ লাভের পথ সুগম হয়ে উঠবে। ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতায় উৎসুক ভারতীয় মানুষ এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি যে মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শক্তিরই মূল লক্ষ্য ছিল বিজিত সাম্রাজ্য রক্ষা অথবা নূতনভাবে সাম্রাজ্য স্থাপন।

হোমরুল লীগ

এই সময় আবার বহু ভারতীয় নেতা সুস্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে জনসাধারণের দিক্ থেকে প্রচণ্ড চাপ না পেলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীকে বিশেষ কোন সুযোগসুবিধা দিতে চাইবে না; সুতরাং এর জন্য চাই দেশব্যাপী ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন। এমন আরও কিছু ঘটনা ঘটেছিল যেগুলি দেশকে এমনি একটি আন্দোলনের দিকে অগ্রসর করে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুযুধান দুইপক্ষই ছিল ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই দুই শক্তির সঙ্ঘর্ষের সময় একটা মিথ্যা-সংস্কারের মুখোশ খুলে গিয়েছিল। এ যাবৎ এমন একটা মিথ্যা ধারণা বলবৎ ছিল যে পাশ্চাত্য জাতিগুলি এশীয় জাতিদের থেকে জাতি হিসেবে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। মহাযুদ্ধ ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুর্বহতর করে তুলেছিল। এই

যুদ্ধে দরিদ্র ভারতবাসীর উপর গুরু করভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ও ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এদের জীবনকে বিভীষিকায় পরিণত করেছিল। জনসাধারণের অন্তরের এই ক্ষোভ তাদের মনে যেকোন প্রতিবাদমূলক সক্রিয় আন্দোলনে যোগদানের প্রেরণা এনে দিয়েছিল। এর ফলে মহাযুদ্ধকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এই গণআন্দোলন পরিচালনার যোগ্যতা তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই সময় কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছিল নরমপন্থী বা মডারেট্ নেতাদের হাতে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জন-সাধারণের যোগ না থাকায় এটি একটি নামসর্বস্ব রাজনৈতিক সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। এই কারণে দেশে একই সঙ্গে দুটি হোমরুল লীগ্ বা স্বায়ত্তশাসন-কামী সংস্থার আবির্ভাব ঘটেছিল। এর একটির নেতা ছিলেন লোকমান্য তিলক। অপরটির নেতা ছিলেন আনি বেশান্ত এবং এস্. সুব্রহ্মণ্য আয়ার। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই যুদ্ধের অবসানে ভারতের স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ লাভের দাবিতে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন সুরু করেছিল। এই আন্দোলনের সময়েই তিলক ঘোষণা করেছিলেন "স্বরাজে আমার অধিকার জন্মের সময় থেকেই আছে, এটা আমাকে পেতেই হবে।" তিলকের এই উক্তিটি দেশব্যাপী প্রচুর উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। 'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার' এই বাণীটি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। দুটি হোমরুল লীগ্'ই বেশ সক্রিয় হয়ে উঠায়, স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। এই মহাযুদ্ধকালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। এই সন্ত্রাসবাদীর দল বাঙলা ও মহারাষ্ট্র থেকে সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়াও এ সময়ে বহু ভারতীয় একটা প্রচণ্ড বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ থেকে ব্রিটিশ-শাসন উচ্ছেদের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়গণ 1913 খ্রীষ্টাব্দে গদর বা বিপ্লবী দল সংগঠন করেছিল। এই বিপ্লবী গদর দলের অধিকাংশ সদস্য ছিল শিখ ধর্মাবলম্বী কৃষক অথবা সৈনিক, তবে এদের নেতৃত্বে যারা অধিষ্ঠিত ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল শিক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ব্যতীত মেক্সিকো, জাপান, চীন, ফিলিপাইন, মালয়, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড (শ্যাম),

ইন্দোচীন (ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়া) পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে এই গদর দলের বহু সক্রিয় সদস্য ছিল।

গদর পার্টির লক্ষ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশের সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগ্রাম। 1914 খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গদর দল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ভারতে বেশ কিছু বিপ্লবীকে অস্ত্রশস্ত্রসহ পাঠানো হবে এবং এই বিপ্লবীরা স্থানীয় বিপ্লবী ও ভারতীয় সৈনিকদের সহযোগিতায় দেশে একটি সামরিক অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহ ঘটাবে। গদর-পার্টির কয়েক সহস্র সদস্য স্বেচ্ছায় এই কাজে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এই কাজের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার চাঁদা সংগৃহীত হয়েছিল। বহু প্রবাসী ভারতীয় তাদের সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ এই উদ্দেশ্যে দান করেছিল। যাদের নগদ টাকা হাতে ছিল না তারা জমি-জমা ও অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রি করে সেই অর্থ এই উদ্দেশ্যে চাঁদা হিসেবে দান করেছিল। গদর কর্মীগণ দূর প্রাচ্যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভারতে অবস্থিত ভারতীয় সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কয়েকটি ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে বিদ্রোহে যোগদানের জন্য প্ররোচিত করেছিল। চূড়ান্তভাবে 1915 খ্রীষ্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই সম্ভাব্য বিদ্রোহের খবর পেয়ে অবিলম্বে তা' দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। বিদ্রোহী বাহিনী (রেজিমেন্ট)-গুলি ভেঙ্গে দিয়ে এর নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়, আবার অনেক নেতাকে ফাঁসীকাঠে ঝোলানও হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ত্রয়োবিংশ অশ্বারোহী বাহিনীর বারজন সৈনিককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। পাঞ্জাব প্রদেশে গদর পার্টির সকল নেতা ও সদস্যকে একযোগে গ্রেপ্তার করে তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এদের মধ্যে 42 জনকে ফাঁসী দেওয়া হয়। 114 জনকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। 93 জনকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কারামুক্তির পর এই দণ্ডিত বিপ্লবীগণের অনেকেই পাঞ্জাবে কীর্তি ('Kirti') ও সাম্যবাদী (কম্যুনিস্ট) আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিল। গদর দলের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার নাম বাবা গুরুমুখ সিং, কর্তার সিং সরাবা, সোহন সিং ভাখ্‌না, রহমৎ আলি শা, ভাই পরমানন্দ ও মহম্মদ বরকৎউল্লা।

গদর পার্টির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সিঙ্গাপুরস্থ পঞ্চম লাইট্ ইন্ফ্যানট্রি বা পদাতিক বাহিনীর সাতশত সৈনিক জমাদার চিস্তিখান্ ও সুবেদার ডুণ্ডে-খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য কঠিন সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিদ্রোহীদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছিল। 37 জন বিদ্রোহীকে প্রকাশ্যভাবে ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে মারা হয়। 41 জন বিদ্রোহীকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

এইভাবে ভারতে এবং ভারতের বাইরেও বিপ্লবীগণের সক্রিয়তা লক্ষিত হয়েছিল। 1915 খ্রীষ্টাব্দে একটি বৈপ্লবিক অভিযানে বালেশ্বরে পুলিশের সঙ্গে একটি খণ্ডযুদ্ধের ফলে যতীন মুখোপাধ্যায় নিহত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য বিপ্লবীদের এই অভিযানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। যতীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ 'বাঘা যতীন' নামেই সমাধিক পরিচিত। ভারতের বাইরে যাঁরা বৈপ্লবিক প্রচার ও ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাসবিহারী বসু, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, লালা হরদয়াল, আব্দুল রহিম, মৌলানা ওবেদউল্লা সিন্ধী, চম্পক রামন পিলাই, সর্দার সিং রাণা, মাদাম কামা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন

ভারতের জাতীয়তাবাদীগণ এই সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁরা বহু-দলে বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন এবং একতার অভাবে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম বিশেষ প্রয়োজন। দেশে জাতীয়তার মনোভাব ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্তরে ঐক্যের প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। এই পারিপার্শিক অবস্থায় 1916 খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ইতিহাসের দিক থেকে তাৎপর্যময় দুটি ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল। প্রথমটি ছিল কংগ্রেসের মধ্যে বিবদমান নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের বিরোধের অবসান ও মিলন। দুই দলের পুরাতন বিবাদ বিসংবাদ এখন অর্থহীন হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের ভিতর দুটি দলের সৃষ্টিতে কোন দলেরই বিশেষ কোন ইস্টও সাধিত হতে পারেনি। জাতীয় আন্দোলনের প্রবল প্রবাহ পুরাতন আমলের নেতৃবৃন্দকে লোকমান্য তিলক ও তাঁর অনুগামী চরমপন্থীদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ-

দানের আহ্বান জানাতে বাধ্য করেছিল। 1907 খ্রীষ্টাব্দের পর এই লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেই নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলের মধ্যে পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছিল।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের দ্বিতীয় তাৎপর্যময় ঘটনাটি ছিল পুরাতন ভেদ বিসংবাদ বিস্মৃত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিলন, তথা একযোগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রাজনৈতিক অধিকার আদায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। একদিকে মহাযুদ্ধ অন্যদিকে দুটি হোমরুল লীগের অবিশ্রান্ত আন্দোলনের কারণে দেশবাসির মানসিকতায় একটা পরিবর্তন এসেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের কর্মধারায় এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছিল। ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, শিক্ষিত মুসলিম তরুণেরা রাজনীতি ক্ষেত্রে দৃঢ়তর পদক্ষেপের দিকে ঝুঁকেছিল। যুদ্ধকালে তাদের এই মনোভাবের গতিবেগ বেড়ে উঠেছিল। উগ্রপন্থী প্রচারকার্যের অভিযোগে 1914 খ্রীষ্টাব্দে আবুল কালাম আজাদের 'আল্ হিলাল' ও মৌলানা মোহাম্মদ আলির 'কমরেড্' এই দুটি পত্রিকার প্রকাশ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ-বিরোধিতার জন্য মৌলানা মহম্মদ আলি ও তাঁর ভ্রাতা মৌলানা সৌকৎ আলি, হজরত মোহানি এবং আবুল কালাম আজাদকে অন্তরীণ করা হয়েছিল। মুসলিম তরুণ-সমাজের এই চরমপন্থী মানসিকতাকে মুসলিম লীগ উপেক্ষা করতে পারেনি। আলিগড় সম্প্রদায় নামে খ্যাত গোষ্ঠির সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে মুসলিম লীগ আর নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি। রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে অতঃপর মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই পরস্পরের কাছাকাছি এসে পৌছেছিল।

একটা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণত এই চুক্তিটি লক্ষ্ণৌ চুক্তি বা 'প্যাক্ট' নামে খ্যাত। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্যস্থাপনে লোকমান্য তিলকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই দুটি প্রতিষ্ঠানই তাদের নিজের নিজের অধিবেশনসভায় এক ধরনেরই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। শাসনব্যবস্থা সংস্কার সম্বন্ধে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে এক ধরনেরই দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। দুই পক্ষ থেকেই এই দাবি উত্থাপিত হয়েছিল যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে ঘোষণা করতে হবে যে অধিক কালবিলম্ব না করে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার

দেওয়া হবে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ‘লক্ষ্ণৌ চুক্তি’ ছিল একটি অতি আবশ্যকীয় পদক্ষেপ। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে এই চুক্তিতে একটি ত্রুটি বা গলদ থেকে গিয়েছিল। এই চুক্তিতে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে নিজ নিজ পৃথক সত্তা বজায় রেখে মিলিত করার চেষ্টা হয়েছিল। এই চুক্তিতে ধর্মকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে আনা হয়েছিল, একথা বোঝা বা বোঝানর চেষ্টা হয়নি যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের স্বার্থই সমান, কে হিন্দু বা কে মুসলমান এই ভেদ-ভাবনা রাজনীতির ক্ষেত্র অবাস্তব এবং অবান্তর। দেখা যাচ্ছে, যে এই লক্ষ্ণৌ চুক্তি ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার পুনরাগমনের দ্বার উন্মুক্ত করেই রেখেছিল। তবে এই লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফলে বেশ কিছু লাভও হয়েছিল। নরমপন্থী ও চরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান এবং কংগ্রেস ও লীগের মিলন দেশের মধ্যে প্রচুর রাজনৈতিক উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল। এমনকি, সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে আপোষ নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। এ যাবৎ সরকারী নীতি ছিল কঠোর হস্তে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন। এপর্যন্ত বহুসংখ্যক চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবীগণকে কুখ্যাত ভারত রক্ষা আইন অথবা অপর কোন দমনমূলক আইন বলে কারারুদ্ধ অথবা অন্তরীণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখন জাতীয়তাবাদী জনমতকে সপক্ষে আনার জন্য 1917 খ্রীষ্টাব্দের বিশে আগষ্ট একটি ঘোষণা মারফৎ জানিয়েছিল যে ভারত শাসন বিষয়ে তাদের নীতি এই যে “ভারতে এমন কতকগুলি স্বশাসক সংস্থার সৃষ্টি ও বিবর্ধনের চেষ্টা করা হবে যদ্বারা ধীরে ধীরে ভারতবাসীগণের পক্ষে একটি দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার অধিকারী হওয়া সম্ভব হবে। এই সরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি বিশিষ্ট অংশও হবে।” 1918 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কারের প্রস্তাব ঘোষিত হয়। তবে এই অন্তঃসার শূন্য প্রস্তাব ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মোটেই খুসী করতে পারেনি। বস্তুতঃ এর পরই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন তার তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। এই অধ্যায়টিকে সংগ্রামমুখর গান্ধী-যুগ রূপে অভিহিত করা যেতে পারে।

অনুশীলনী

1. বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ বা চরমপন্থী ক্রিয়াকলাপ উদ্ভবের কারণ কি?
2. চরমপন্থী ও নরমপন্থী বা মডারেট রাজনৈতিকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কি পার্থক্য ছিল? রাজনৈতিক অভীষ্ট সাধনে এই দুই দলের কতদূর সাফল্য লাভ হয়েছিল তাহা বর্ণনা কর।
3. স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বর্ণনা কর।
4. বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কি কি কারণে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখাও। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ বিভেদ-নীতি, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলিম শ্রেণীর আর্থিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতা, ভারতীয় ইতিহাস শিক্ষা-পদ্ধতি, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও দেশের আর্থিক দুরবস্থার কি ভূমিকা ছিল সেগুলিও বিশদভাবে আলোচনা কর।
5. নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ—

   (a) লোকমান্য তিলক (b) বিপ্লবাত্মক সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি (c) সুরাটে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব (d) মিন্টো-মর্লি শাসনসংস্কার (e) মুসলিম লীগ (f) মুসলিম সমাজে উগ্র জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি (g) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (h) হোমরুল লীগ (i) গদর দল বা পার্টি (j) লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট বা চুক্তি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্বরাজ-সংগ্রাম

আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে 1914 থেকে 1918 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেশে একটি নূতন ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। জাতীয়তাবাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল এবং জাতীয়তাবাদীগণের মনে এই আশা জেগেছিল যে যুদ্ধের অবসানের পর ভারতবাসীগণ রাজনৈতিক দিক থেকে বেশ লাভবান হবে। এই আশা পূর্ণ না হলে তারা আবার রাজনৈতিক সংগ্রাম স্থরু করার সঙ্কল্প নিয়েছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী কালে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বাজারও বেশ মন্দ হয়ে উঠেছিল। ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যুদ্ধ চলাকালে শিল্পদ্রব্য রপ্তানী করে বেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শিল্পদ্রব্যের চাহিদা কমে যাওয়াতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে লাভের পরিবর্তে লোকসান দেখা দিয়েছিল। এই লোকসানের ধাক্কায় বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পপতিগণ চেয়েছিল যে বিদেশী পণ্যের উপর চড়াহারে আমদানি শুল্ক চাপিয়ে তাদের উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের কাটতি বাড়ানো হক, এছাড়া তাদের দাবি ছিল যে গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে তাদের অর্থসাহায্য দেওয়া হক। বিদেশী সরকার থাকলে তাদের এই ইচ্ছা পূরণের কোন সম্ভাবনা নেই, একমাত্র তীব্র জাতীয় আন্দোলন এবং তার পরিণামে স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা দ্বারাই তাদের এই ইচ্ছা পূরণ সম্ভব এটাও তারা বুঝেছিল ; শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা অথবা কর্মচ্যুতি দেখা দিয়েছিল। উচ্চ দ্রব্যমূল্যের জন্য দারিদ্র্য-পিষ্ট শ্রমিকশ্রেণীও সক্রিয়ভাবে জাতীয় আন্দোলনের সাফল্য কামনা করেছিল। আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন স্থান এবং ইউরোপের রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত বিজয়ী ভারতীয় সৈনিকেরা গ্রামাঞ্চলে বহির্বিশ্বের নানা অভিজ্ঞতা গ্রামবাসীদের শোনাতে আরম্ভ করেছিল—এতে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জ্ঞান-চক্ষু খুলে যেত। দারিদ্র্য-জর্জর ও করভার নিপীড়িত-ভারতের কৃষক-সমাজ এই দুঃসহ অবস্থা

থেকে তাদের পরিত্রাণ করতে পারে এমন একজন নেতার আবির্ভাব মনে মনে প্রার্থনা করেছিল। নগরাঞ্চলবাসী শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেও জীবিকা নির্বাহের পথ রুদ্ধ হয়েছিল। মোটকথা, প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে অর্থনৈতিক দুর্গতির প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতে জাতীয় আন্দোলন পুনরুজ্জীবনের পক্ষে বেশ অনুকূল হয়ে উঠেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটনাটি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বিশ্বের জনসাধারণের সমর্থন ও সহায়তা লাভের আশায় ব্রিটেন, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান প্রভৃতি মিত্রতাবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি এই ধরনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিল যে যুদ্ধে তাদের জয় ঘটলে বিশ্বে তারা গণতন্ত্র ও সর্বজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রত হবে। কিন্তু মিত্র-শক্তির যুদ্ধে জয়লাভের পর দেখা গেল, তারা সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিক নীতি ত্যাগ করতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। উল্টো, প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে এবং বিভিন্ন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরকালে যুদ্ধের সময়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছিল। পরাজিত রাষ্ট্র জার্মানী ও তুরস্কের অধীন আফ্রিকা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় যে উপনিবেশগুলি ছিল ব্রিটেন সহ বিজয়ী শক্তিগুলি লুটের মালের মত এগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই উপনিবেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বা স্বাধীনতা প্রাপ্য ছিল। মিত্র-শক্তির এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশসমূহের অধিবাসীগণ উচ্চাশার স্বর্ণশৃঙ্গ থেকে গভীর হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল। এই অবস্থায় হতাশার পীড়নে ভারতে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম শ্বেতচর্ম বা সাদা চামড়ার অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতিসমূহের মর্যাদায় বিশেষভাবে আঘাত হেনেছিল। সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রথম যুগ থেকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের কায়েমি স্বার্থ অব্যাহত রাখতে এমন একটা ধারণা মনে মনে পোষণ করত ও বিজিত জাতির মধ্যে প্রচার করত যে, জাতি হিসেবে শিক্ষা-দীক্ষায় তারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলি বিশেষতঃ কৃষ্ণকায়দের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। যুদ্ধকালে, পরস্পর বিবদমান এই ইউরোপীয় জাতিরাই তাদের বিরুদ্ধপক্ষীয় শক্তিদের সম্মুখীন

হয়ে নিজেদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার নজির তুলে ধরত। স্বাভাবিকভাবেই উপনিবেশগুলির অধিবাসিরা দুই পক্ষের প্রচারেই প্রভাবিত হয়ে এটা বুঝে গিয়েছিল যে ইউরোপীয় জাতিরা জাতি হিসেবে কেউ উঁচু নয়। এর ফলে ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে তাদের মনে যে সম্ভ্রমমিশ্রিত ভীতির ভাব ছিল তা দূর হয়ে পড়েছিল।

এই সময়ে সংঘটিত রুশ-বিপ্লব ভারতে জাতীয় আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। 1917 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের সাত তারিখে ভি-আই-লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিক্ (কম্যুনিস্ট) পার্টি রুশ দেশে পরাক্রান্ত জার (Czar) শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র 'সোভিয়েত ইউনিয়ন'এর আবির্ভাব ঘোষণা করেছিল। নব অভ্যুদিত সোভিয়েট্ রাষ্ট্রের অনুসৃত কর্মপন্থা ঔপনিবেশিক শাসন-পীড়িত দেশগুলির অধিবাসিদের মনে একটা অপূর্ব উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল। এই নবীন রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় চীন ও এশিয়ার রুশ উপনিবেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী অধিকার প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এশিয়ার জার-শাসিত উপনিবেশগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। খাস রুশ দেশে বহুসংখ্যক এশীয় মানুষ বসবাস করত। জার শাসন কালে এদের নিকৃষ্ট ধরনের নাগরিকরূপে গণ্য করা হত এবং তাদের উপর নানাবিধ নির্যাতনের বোঝা চাপানো হত। এদের পরাজিত বা বিজিত জাতি রূপে গণ্য করা হত। সোভিয়েট শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর এই হতভাগ্য মানুষদের যে কোন একজন রুশ নাগরিকের প্রাপ্য সকল সুযোগসুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। রুশ-বিপ্লব ঔপনিবেশিক শাসন-পীড়িত জনসাধারণের কাছে এই সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিল যে, যে কোন দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অফুরন্ত শক্তি ও উদ্যম প্রচ্ছন্ন রয়েছে। রুশ দেশের জনসাধারণই প্রভূত শক্তিশালী জার-শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। এই জার-শাসন প্রজাপুঞ্জের উপর অকথ্য নিপীড়ন চালাতে অভ্যস্ত ছিল। সামরিক দিক থেকে তদানীন্তন জার গভর্নমেণ্ট প্রভূত শক্তিশালীও ছিল। শুধুমাত্র নিজের মিলিত শক্তি প্রয়োগ করে জার-শাসনের অবসান ঘটানোর মধ্যেই রুশ জনসাধারণের কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া রূপে রুশ-ভূখণ্ডে ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জাপানের সামরিক অভিযানের প্রতিরোধও তাদের করতে হয়েছিল এবং এই প্রতিরোধে তাদের সাফল্য

লাভও সম্ভব হয়েছিল। পর শাসন পিষ্ট দেশগুলি বিশেষতঃ ভারতবাসীর মনে এই বিশ্বাস জেগে উঠেছিল যে প্রবল পরাক্রান্ত রুশ সম্রাট্ জারকে যদি সিংহাসনচ্যুত করা সম্ভব হয় তবে যে কোন শাসনব্যবস্থাকেই ক্ষমতাচ্যুত করা জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব নয়। অস্ত্রশস্ত্র বিহীন রুশ কৃষকেরা তাদের নিজের দেশের অত্যাচারী শাসকদের যদি উৎখাত করতে পেরে থাকে তবে বুঝতে হবে যে বিজিত দেশের জনসাধারণের হতাশার কোন কারণ নেই অর্থাৎ বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো অসম্ভব হবে না। তবে তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে, দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে।

দেখা যাচ্ছে যে, এইভাবে রুশ বিপ্লবের ঘটনা ভারতবাসীর মনে আত্ম-বিশ্বাস জাগ্রত করে দিয়েছিল। রুশ-বিপ্লব ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে আর একটি সত্যও উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল। শিক্ষাটি এই যে, দেশের জনসাধারণই শক্তির প্রধান উৎস। জনসাধারণের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। 1919 খ্রীষ্টাব্দে এই সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন "জার্মান সামরিক শক্তি এবং জারের অত্যাচারী শাসনের পতনের পর সমগ্র বিশ্বে একটি নূতন শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে, এই নবজাগ্রত শক্তি হচ্ছে সর্বত্র স্বাধিকার অর্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প গণশক্তি। জনগণ চাইছে স্বাধীন ও সুখী জীবনের অধিকার—যে জীবন-যাত্রায় তথাকথিত অভিজাত ও ধনশালী সমাজের অত্যাচার বা শোষণের কোন সুযোগ থাকবে না।" মহাযুদ্ধের অবসানে আফ্রিকা ও এশিয়ার অবশিষ্টাংশের জাতিগুলির মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও জাতীয় আন্দোলনের গতিবৃদ্ধি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকেও প্রভাবিত করে-ছিল। জাতীয় আন্দোলনের খরস্রোত শুধু ভারতেই নয় তুরস্ক, উত্তর আফ্রিকার আরব দেশসমূহ, পশ্চিম এশিয়া, ইরাণ আফগানিস্তান, ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, চীন এবং কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলির উপর দিয়েও প্রবাহিত হয়েছিল।

ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জাতীয়তাবাদ ও সরকার বিদ্বেষী চেতনার তীব্রতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে বেশ অবহিত হয়েছিল। আর একবার তারা কৌশলে কার্যসিদ্ধির পথ ধরেছিল। এই কৌশল ছিল লোভনীয় কোন বস্তু সামনে ঝুলিয়ে রেখে বিরোধী পক্ষকে আয়ত্তের মধ্যে টেনে এনে পরিশেষে তাদের

লগুড়াঘাত। ইংরাজী প্রবাদ অনুযায়ী একে "Carrot and Stick" নীতি বলা হয়ে থাকে। এই কৌশল ছিল মাঝে মাঝে কিছু প্রসাদ-বিতরণ এবং তার পরেই নির্যাতনের পন্থা গ্রহণ।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার

1918 খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সচিব এডুইন মণ্টেগু (Edwin Montagu, Secretary of State for India) এবং লর্ড চেমস্‌ফোর্ড (Lord Chelmsford, the Viceroy) একটি শাসনসংস্কারমূলক বিধি প্রস্তুত করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করে 1919 খ্রীষ্টাব্দে "গভর্নমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট" বা ভারত-সরকার আইন প্রবর্তিত হয়। এই নূতন আইনে প্রাদেশিক আইনসভা (ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদ)গুলির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এই সভাগুলিতে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই নূতন বিধানে প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই নূতন শাসনব্যবস্থায় দ্বৈত শাসননীতি বা "Dyarchy" অনুসরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটাকে "Dyarchy" বা 'দ্বৈত-শাসন'রূপে অভিহিত করার কারণ এই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকারের অর্থ (Finance) এবং আইন ও শৃঙ্খলা (Law and Order) বিভাগকে বলা হত সংরক্ষিত (Reserved) বিভাগ, কারণ এই দুইটি বিভাগের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা 'Governor'এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local self-Govt) প্রভৃতি বিভাগগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল 'হস্তান্তরিত বিভাগ'। এইগুলির দায়িত্ব মন্ত্রী বা 'মিনিস্টার'দের দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই মন্ত্রীদের ব্যবস্থাপক সভাগুলির নিকট তাদের কাজকর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হবে—এই ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার অর্থ ছিল যে মন্ত্রীদের কাজকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা তাদের কর্মধারা নির্ধারণের ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সভাই সর্বেসর্বা হয়ে থাকবে। হস্তান্তরিত বিভাগগুলির (যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) কাজকর্ম পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্থবিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। এই অর্থবিভাগটিকে অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে গভর্নরের বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে, তথাকথিত হস্তান্তরিত বিভাগের মন্ত্রীদের নিজ নিজ বিভাগের খরচপত্র চালানোর জন্য গভর্নরের মুখাপেক্ষী করে রাখার বন্দোবস্তটি বেশ পাকা রাখা হয়েছিল। কোন বিশেষ কারণ দেখিয়ে 'গভর্নর'

মন্ত্রীদের দ্বারা গৃহীত যেকোন সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারেন এমন ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। এইত হল প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থা। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের কথায় আসা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারে রাখা হয়েছিল দুটি আইন বা ব্যবস্থাপক সভা। একটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেমব্লী' বা ব্যবস্থা পরিষদ। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল 144, এর মধ্যে 41 জন ছিল সরকার কর্তৃক মনোনীত। ব্যবস্থা পরিষদের বা এসেম্ব্লীর একটি উচ্চতর পরিষদ বা সভা ছিল এটিকে বলা হত 'কাউন্সিল অব স্টেট্' বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ্। এই সভার সদস্য সংখ্যা ছিল 60, এর মধ্যে 34 জন ছিল নির্বাচিত, বাকী 26 জন সরকার মনোনীত। এই ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদকে গভর্নর জেনারেল বা তাঁর শাসন পরিষদের উপর কোন কর্তৃত্বের অধিকার দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ গভর্নর জেনারেলকে তাঁর কাজকর্মের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ বা রাষ্ট্রীয় পরিষদের কাছে কোনভাবে দায়বদ্ধ রাখার ব্যবস্থা ছিল না। এছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব করার অবাধ-অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছিল। ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটদানের অধিকার অতি অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। 1920 খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থা পরিষদ বা এসেমব্লীর নির্বাচক সংখ্যা ছিল 909,874 ; রাষ্ট্রীয় সভা বা কাউন্সিল অফ্‌ স্টেট্-এ ভোটদাতার সংখ্যা ছিল মাত্র 17,364 ; ভারতের জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ থেকে এই ধরনের ছিঁটেফোঁটা সুযোগসুবিধা পেয়েই তৃপ্ত হবার মত অবস্থা তখন আর ছিল না। এত অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার যুগ তারা বহুদিন পূর্বেই অতিক্রম করে এসেছিল। একটি বিদেশী সরকার ভারতীয়েরা স্বাধীন হওয়ার উপযুক্ত কিনা তা বিচার বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেবে অথবা ছিটে-ফোঁটা রাজনৈতিক অধিকার দিয়ে নিজেদের মহত্ব দেখাবে—ভারতের জাতীয়তাবাদীগণ এই অবস্থা আর মেনে নিতে চায়নি। 1918 খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বোম্বাই শহরে হাসান ইমামের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনার জন্যই এই অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। এই অধিবেশনে এই শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের ধারাগুলি বিবেচনার পর এইগুলি "অসন্তোষজনক ও হতাশাব্যাঞ্জক"রূপে চিহ্নিত ও নিন্দিত হয়েছিল। এর পরিবর্তে এই অধিবেশনে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের

দাবি উত্থাপন করা হয়। ইতিপূর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন প্রবীণ জননেতা মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করার মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস তাঁদের এই মনোভাবের প্রবল বিরোধিতা করেছিল। এই মতভেদের কারণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সমমতাবলম্বী নেতৃবৃন্দ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। বোম্বাই-এর বিশেষ অধিবেশনে যোগদানের আহ্বান তাঁরা গ্রহণ করেননি, কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে বোম্বাই-এর অধিবেশনে তাঁদের সমর্থক সংখ্যা অতি অল্পই হবে। অতপরঃ এঁরা ভারতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘ বা ইণ্ডিয়ান লিবারেল ফেডারেশন নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন। উত্তরকালে এই ধরনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ লিবারেল বা উদারনীতিকরূপে পরিচিতি লাভ করেন। অতঃপর ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়েছিল।

রাউলাট আইন (Rowlatt Act)

একদিকে জনসাধারণকে তোষণের নীতি নিয়ে, একই সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্ট অপরদিকে দমননীতি অবলম্বনেরও আশ্রয় নিয়েছিল। মহাযুদ্ধ চলার সময়ে জাতীয়তাবাদীদের উপর দমননীতি প্রযুক্ত হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবীদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে হয় ফাঁসী দেওয়া হত নয়ত কারারুদ্ধ করা হত। আবুল কালাম আজাদের মত জাতীয়তাবাদী নেতাদেরও কারারুদ্ধ রাখা হয়েছিল। যুদ্ধের অবসানে গভর্নমেণ্ট এমন সব আইন কানুন বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছিল যার সাহায্যে যদৃচ্ছা দমননীতি প্রয়োগ সম্ভব। ভারত সরকারের প্রচলিত আইনে এই ধরনের কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করা সম্ভবপর ছিল না। নূতন দমননীতিকে আইনসম্মত করে ও তার সাহায্যে নূতন শাসন-সংস্কার গ্রহণে অনিচ্ছুক জাতীয়তাবাদীদের ভীত ও সন্ত্রস্থ করে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। 1919 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারত গভর্নমেণ্ট 'রাওলাট য়্যাক্ট' নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ করে নিয়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের (Central Legislative Council) প্রতিটি ভারতীয় সদস্যের বিরোধিতা সত্বেও এই আইন চালু করা হয়েছিল। এই আইনের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের তিন জন সদস্য তাঁদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এই তিন জনের নাম—মহম্মদ আলি জিন্না, মদনমোহন মালবীয় ও মজহর-উল-হক্‌। 'রাউলাট য়্যাক্ট' আইনে

গভর্নমেণ্টকে যেকোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে ও আদালতে অভিযুক্ত না করেই কারারুদ্ধ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটেনে প্রচলিত Habeas Corpus অধিকার ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে একটি মহান্ রক্ষাকবচ, বিনা কারণে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না এটাই হল Habeas Corpus। 'রাউলাট য়্যাক্ট্' এই সভ্যসমাজসম্মত Habeas Corpus অধিকারকেও অকেজো করে গভর্নমেণ্টের হাতে যদৃচ্ছা যে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করার অধিকার তুলে দিয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব গ্রহণ

'রাউলাট য়্যাক্ট্' দেশবাসির উপর এক অচিন্তিত দুর্বিপাকরূপে নেমে এসেছিল। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্টার আশ্বাস-প্রাপ্ত ভারতবাসীর কাছে এই আইন একটি নিষ্ঠুর পরিহাস বলে মনে হয়েছিল। একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তাকে কাছে ডেকে এনে পাথর ছুঁড়ে মারার মতই ছিল এই নূতন আইন। গণ-তান্ত্রিক অগ্রগতি দূরের কথা—এই আইনে দেশের মানুষের যে সামান্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল তাও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ভারতের মানুষ এই ঘটনাতে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেছিল, তাদের ক্রোধও সীমাহীন হয়ে উঠেছিল। দেশের দিকে দিকে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছিল। রাউলাট য়্যাক্টের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলনেরও সৃষ্টি হয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য একজন নূতন নেতা এগিয়ে এসেছিলেন—ইনিই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ভারতের জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের এটিই তৃতীয় বা শেষ পর্যায়। শুধু তাই নয়, এই অন্তিম পর্যায়েই ভারতে ব্রিটিশ শাসন সমাধি লাভ করেছিল।

গান্ধীজী ও তাঁর চিন্তাধারা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী 1869 খ্রীষ্টাব্দের দোসরা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটেনে আইন অধ্যয়ন করে তিনি আইন ব্যবসায়ের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। প্রখর ন্যায়-অন্যায় বোধশালী গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকার উপনিবেশসমূহে তখন সেখানকার ভারতীয়দের যে অবিচার, পক্ষপাতিত্ব ও অপমান সহ্য করতে হত তা' দেখে অতিরিক্তভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। এই পরিস্থিতি তাঁর মনে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলেছিল।

যেসব ভারতীয় শ্রমিক ও ব্যবসায়ী জীবিকান্বেষণের প্রয়োজনে এইসব উপনিবেশগুলিতে বাসা বেঁধেছিল তাদের কোন ভোটাধিকার ছিল না। তাদের নাম আলাদাভাবে নথিভুক্ত করা হত ও এক ধরনের বিশেষ কর বা ট্যাক্স তাদের কাছ থেকে আদায় করা হত। তারা কোন ভাল জায়গায় বাস করতে পেত না। একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই তাদের বাস করতে হত। এই এলাকাগুলি ছিল ঘিঞ্জি এবং অস্বাস্থ্যকর। দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন উপনিবেশে এশিয় বংশোদ্ভূত এমনকি আফ্রিকার মানুষদেরও রাত্রি নটার পর ঘরের বাইরে থাকার অধিকার ছিল না। রাজপথের 'ফুটপাথ্' অংশ দিয়েও এদের হাঁটার অধিকার ছিল না। এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে আন্দালন সৃষ্ট হয়েছিল গান্ধীজী তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 1893-94 খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষী প্রভুদের বিরুদ্ধে একটি বীরত্বপূর্ণ অসম সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। প্রায় দুই যুগ ব্যাপী এই দীর্ঘ আন্দোলন কালে তিনি সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সত্যাগ্রহের কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে একজন আদর্শ সত্যাগ্রহীর পক্ষে সত্য-সন্ধ এবং শান্তিপ্রিয় হওয়া প্রয়োজন তবে এতৎ সত্ত্বেও যা তার মতে অন্যায় তার বিরুদ্ধে তাকে রুখে দাঁড়াতেই হবে; অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে তাকে সকল দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করতে হবে; অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই যে সত্যাগ্রহ এটা আদর্শ সত্যাগ্রহীর সত্যানুরাগেরই একটা অঙ্গ; অন্যায়ের প্রতিরোধে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করতে গিয়েও সত্যাগ্রহীর পক্ষে অন্যায়কারীকে হিংসা করা বা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা চলবে না; একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহীর পক্ষে মনে কোন ঘৃণার ভাব পোষণ করা চলবে না, এটা হবে সত্যাগ্রহীর পক্ষে প্রকৃতি বিরুদ্ধ; যাই কিছু ঘটুক না কেন, অন্যায় ও অন্যায়কারীর কাছে নত হওয়া সত্যাগ্রহীর পক্ষে অনুচিত। গান্ধীজীর মনে এই উপলব্ধিও জন্মেছিল যে অহিংসা দুর্বল ও কাপুরুষের পক্ষে অবলম্বনীয় নয়; একমাত্র শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তির পক্ষেই সত্যাগ্রহ অবলম্বন সম্ভব। গান্ধীজীর মতে কাপুরুষতার চেয়ে হিংসা-পন্থী হওয়াও ভাল। তাঁর নিজস্ব সাপ্তাহিক পত্রে 1920 খ্রীষ্টাব্দে এই সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—"মনুষ্যজাতির ধর্মই হল অহিংসা, আর হিংসা হল পশুজাতির ধর্ম। তবে যেখানে কাপুরুষতা এবং হিংসার আশ্রয় গ্রহণ এই দুটোর মধ্যে একটা বেছে নেওয়ারই পথ থাকে, সেখানে আমি হিংসার আশ্রয়

গ্রহণেরই পরামর্শ দেব…,ভারতবর্ষ অসহায়ভাবে তার নিজের অসম্মান সহ্য করে যাবে এমন অবস্থার চেয়ে ভারতবর্ষ তার সম্মান রক্ষার জন্য বাহুবল বা হিংসার আশ্রয় নিক্ এটাই আমি চাইব।" গান্ধীজীর এই প্রবন্ধটি স্মরণীয় হয়ে আছে। একবার তিনি তাঁর জীবনদর্শন এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন— "আমার একমাত্র বিশেষত্ব এই যে আমার কাছে সত্য ও অহিংসাই একমাত্র ধর্ম। আমি কোন অতি মানবিক ক্ষমতার অধিকারী নই, আমার এতে কোন প্রয়োজনও নেই।"

গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর চিন্তা ও কাজে কোন তফাৎ ছিল না। অর্থাৎ তিনি মুখে যা বলতেন বা ভাবতেন কাজেও তাই করতেন। বিশ্বাস অনুযায়ী কাজই তিনি করে যেতেন। তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রাও সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর সত্য ও অহিংসা বক্তৃতা বা রচনার চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তুরূপেই মাত্র ব্যবহৃত হয়নি।

ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে 1915 খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে স্বদেশ ও স্বদেশবাসির সেবায় আত্ম-নিয়োগ করার ইচ্ছা তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নেওয়ার জন্য তিনি ভারতের তৎকালীন অবস্থা বেশ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 1916 খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেদাবাদে তাঁর সবরমতী আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁর অনুগামী ও বন্ধুদের সত্য ও অহিংসা বিষয়ে শিক্ষাদান ও তার বাস্তব প্রয়োগের উদ্দেশ্যেই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

চম্পারণ সত্যাগ্রহ (1917)

বিহারের চম্পারণ জেলায় 1917 খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ নীতি বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হয়েছিল। ইউরোপীয় নীল ব্যবসায়ীগণ এই জেলায় নীল-চাষীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। এরা চাষীদের তাদের জমির অন্ততঃ 3/20 অংশে নীলের চাষ করতে বাধ্য করত। চাষের দ্বারা উৎপন্ন এই নীল, চাষীরা নীলকরদের কাছে তাদেরই নির্দিষ্ট একটা দামে বিক্রি করতে বাধ্য হত। এর আগে বাঙলা প্রদেশে নীল চাষীদের উপর নীলকরেরা এই ধরনেরই উৎপাত চালাত। 1859-61 খ্রীষ্টাব্দে বেশ একটা

বড় রকম বিদ্রোহের ফলে বাঙলার চাষীরা নীলকরের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ অভিযানের বিষয়টি জানতে পেরে চম্পারণ জেলার কিছু কৃষকশ্রেণীর মানুষ গান্ধীজীকে তাদের কাছে আসতে এবং তাদের সাহায্য করতে আহ্বান জানিয়েছিল। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মজহরুল হক, জে. বি. কৃপালনি এবং মহাদেব দেশাইকে সঙ্গে নিয়ে 1917 খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী চম্পারণে পৌছান। এখানে পৌছে নীলচাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করতে থাকেন। ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে চম্পারণ ত্যাগ করে যেতে আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু তিনি চম্পারণ ত্যাগ করে যাননি। সরকারী নির্দেশ ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড ভোগের জন্যও তিনি নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিলেন। গান্ধীজীর দৃঢ়তা দেখে কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীকে বিহার থেকে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করে নীলচাষ সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান সমিতি (Enquiry Committee) নিযুক্ত করেছিল। গান্ধীজীকে এই কমিটির একজন সদস্যও রাখা হয়েছিল। এর ফলে নীলচাষীদের দুঃখ কষ্টের লাঘব হয়েছিল। এটি ছিল ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজীর প্রথম বিজয় লাভ। চম্পারণ সত্যাগ্রহ কালে ভারতের কৃষক সমাজের অপরিসীম দুঃখ ও দারিদ্র্যের সম্বন্ধে গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভও ঘটেছিল।

আমেদাবাদ মিল ধর্মঘট

1918 খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদের মিল মালিকগণ ও শ্রমিকদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, গান্ধীজী তাতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন অর্থাৎ মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। একটা আপোষ-মীমাংসার জন্য তিনি আমরণ অনশনের সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর অনশনের চতুর্থ দিন মিল মালিকেরা তাদের অনমনীয় মনোভাব পরিত্যাগ করে শ্রমিকদের বেতন শতকরা 35% ভাগ বৃদ্ধি করে দিতে সম্মত হয়েছিল। অজন্মার জন্য গুজরাটের খয়রা নামক স্থানের কৃষকেরা সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এই খাজনা বন্ধ আন্দোলনটি গান্ধীজী সমর্থন করেন। এই আন্দোলনে গান্ধীজীকে সাহায্য করার জন্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর লাভজনক আইন ব্যবসায় ছেড়ে দিয়েছিলেন।

চম্পারণ ও খয়রা আন্দোলনকালে গান্ধীজীকে ভারতের দীন-দুঃখী

মানুষদের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে গান্ধীজী এদের গভীর দুঃখ দুর্দশার সম্যক্ পরিচয় লাভ করেছিলেন। এই কারণেই গান্ধীজী দেশের এই মূক জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘব মানসে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বস্তুতঃ গান্ধীজীই প্রথম ভারতীয় নেতা যিনি ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। যথাকালে গান্ধীজী দরিদ্র, জাতীয়তাবাদী ও বিদ্রোহী ভারতের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীজীর জীবনে আরও তিনটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রথমটি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, দ্বিতীয়টি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তৃতীয় বিষয়টি ছিল ভারতীয় নারীগণের সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন। এক সময় তিনি তাঁর এই আদর্শগুলি ব্যাখ্যা করে লিখেছিলেন, "আমি এমন এক ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও ভাবতে পারবে যে এটা তাদেরই দেশ এবং এই দেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা ও প্রয়াসের প্রয়োজন। আমি এমন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে চাই যেখানে ধনী-দরিদ্রে ভেদ থাকবে না এবং এই ভারতে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই পরিপূর্ণ সম্প্রীতির পরিবেশের মধ্যে বাস করতে পারবে···এই ভারতে অস্পৃশ্যতার অভিশাপও মোটেই থাকবে না·· এই ভারতে নারীগণ পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করবে···এই আমার স্বপ্নের ভারত।"

গান্ধীজী নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন কিন্তু তাঁর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টি ছিল উদার, সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্রও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি লিখে-ছিলেন, "ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দু বা মুসলমান কারো নিজস্ব নয়; অন্য কোন সম্প্রদায়েরও নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতি, এতে সবারই দান আছে।" তিনি চাইতেন যে, ভারতবাসী ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে নিষ্ণাত থেকেও বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অংশগুলির অনুশীলন করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "আমি চাই আমার ঘরের চারিদিকে নির্বাধরূপে সকল দেশের সংস্কৃতির বাতাস বয়ে চলুক। তবে আমি এই হাওয়ার বেগে ছিন্নমূল হয়ে যেতে মোটেই প্রস্তুত নই। অন্য লোকের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশকারী, ভিক্ষুক অথবা দাস রূপে বাস করতে আমি কখনই সম্মত হতে পারি না।

রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ

অন্য ভারতীয় নেতাদের মত গান্ধীজীর মনেও 'রাওলাট য়্যাক্ট্' গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। 1919 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি 'সত্যাগ্রহ সভা' নামক একটি সংস্থা গঠন করেন। এর সদস্যগণ 'রাওলাট য়্যাক্ট্' অমান্য করে গ্রেপ্তার ও কারাবরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। এটি ছিল একটি নূতন ধরনের সংগ্রাম। মডারেট্ বা এক্সট্রিমিস্ট (চরমপন্থী বা নরমপন্থী) যে কোন ধরনের নেতাদের দ্বারাই প্রবর্তিত হক' না কেন, বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থেকে যেত। জাতীয় নেতৃবৃন্দ এযাবৎ আন্দোলন বলতে বুঝতেন বড় বড় জনসভা, মিছিল, সরকারের প্রতি অসহযোগ ঘোষণা, বিদেশী বস্ত্র বর্জন, স্কুল-কলেজ বর্জন অথবা বিশেষ কোন সরকারী ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত ব্যক্তিবিশেষের বা দলের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ জাতীয় আন্দোলনকে একটা উচ্চতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জাতীয়তাবাদী কর্মীগণের কাছে 'সত্যাগ্রহ' শুধুমাত্র মৌখিক ক্রোধ বা বিক্ষোভ প্রকাশের পরিবর্তে প্রত্যক্ষভাবে কিছু কাজ করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এখন থেকে সক্রিয় রাজনৈতিক কাজকর্মের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিশেষত্ব এই ছিল যে আন্দোলনে দেশের দরিদ্রতর মানুষদের সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজী দেশের সাধারণ মানুষদের এই সমর্থন সংগ্রহের জন্য তাঁর অনুগামী জাতীয় কর্মীদের গ্রামাঞ্চলে প্রচার চালাতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে, ভারত বলতে গ্রাম, ভারতবাসীর মূল ত গ্রামেই নিবদ্ধ। ক্রমে ক্রমে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের লক্ষ্যকে সাধারণ মানুষের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই একাত্মতা প্রতিষ্ঠার প্রতীক রূপে তিনি 'খাদি' বেছে নিয়েছিলেন। খাদি হল হাতে বোনা বস্ত্র। এই খাদি হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদীদের 'সরকারি' পরিধেয় বা Uniform। শ্রমের মর্যাদা এবং স্ব-নির্ভরতার দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি প্রত্যহ সুতো কাটতেন। তিনি বলতেন ভারতের মুক্তি তখনই সম্ভব যখন জনগণ তাদের মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে। ভারতীয় জনগণ গান্ধীজীর এই আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিল।

1919 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে ভারতে অভূতপূর্ব এক রাজনৈতিক

চেতনার জাগরণ পরিলক্ষিত হয়েছিল। দিকে দিকে হরতাল, ধর্মঘট ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর ধ্বনিতে ভারতের আকাশ মুখরিত হয়েছিল। সমগ্র দেশের উপর দিয়ে যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় জনগণ আর পর-শাসন রূপ অভিশাপের কাছে নতিস্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড

সরকারী কর্তৃপক্ষ এই গণআন্দোলন দমনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল। বোম্বাই, আমেদাবাদ, কলকাতা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে নিরস্ত্র বিক্ষোভ মিছিল লক্ষ্য করে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী লাঠি ও বন্দুক ব্যবহার করেছিল। গান্ধীজী 1919 খ্রীষ্টাব্দের 6 এপ্রিল দেশে সর্বাত্মক 'হরতাল' পালনের ডাক দিয়েছিলেন। জনগণ অভূতপূর্ব উত্তেজনার সঙ্গে এই আহ্বান সার্থক করে তুলেছিল। গভর্নমেণ্ট জনসাধারণের এই বিক্ষোভ আন্দোলন দমনে বদ্ধ-পরিকর হয়েছিল। বিশেষভাবে এই দমননীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে তারা পাঞ্জাব প্রদেশকেই বেছে নিয়েছিল। এই সময় আধুনিক কালের ইতিহাসে একটি জঘন্যতম রাজনৈতিক অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 1919 খ্রীষ্টাব্দের তেরই এপ্রিল একটি বিরাট জনতা পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর শহরের 'জালিয়ানওয়ালা বাগ' নামে একটি উদ্যানে সমবেত হয়েছিল। জনতা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিল, পাঞ্জাবের জনপ্রিয় নেতা ডাঃ সইফুদ্দীন কিচ্‌লু ও ডাঃ সত্যপালের গ্রেপ্তারে প্রতিবাদ জ্ঞাপনই ছিল এই জমায়েতের উদ্দেশ্য। অমৃতসরের ভারপ্রাপ্ত সামরিক অধ্যক্ষ জেনাবেল ডায়ারের উদ্দেশ্য ছিল অমৃতসরেব জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার করে তাদের একান্তভাবে বাধ্য রাখা। জালিয়ানওয়ালা বাগ ছিল একটা ফাঁকা জমি, এর তিনদিক ঘর-বাড়ী বেষ্টিত ছিল। আগমন বা নির্গমনের জন্য মাত্র একটি রাস্তা ছিল। জেনারেল ডায়ার তার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী দ্বারা জালিয়ানওয়ালা বাগ চারিদিক দিয়ে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল, এমনকি একটি মাত্র নির্গমন পথটিও সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছিল। সমবেত জনতার নির্গমন পথ রুদ্ধ করে, ডায়ার অবরুদ্ধ জনতাকে লক্ষ্য করে রাইফেল ও মেসিনগান ব্যবহার করার জন্য সৈন্যদের আদেশ দিয়েছিল। গুলি-গোলা ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রাইফেল ও মেসিনগানগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল। গুলি-গোলার আঘাতে হাজার হাজার মানুষ আহত বা নিহত হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের পর

সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সভ্য-সমাজ বিগর্হিতভাবে পাঞ্জাবের জনসাধারণের উপর নির্যাতনও চলেছিল। 'লিবারেল' বা উদারনীতিক দলভুক্ত ও সরকার কর্তৃক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত শিবস্বামী আয়ার নামে এক আইন ব্যবসায়ী পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত নির্যাতনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, "জালিয়ান-ওয়ালা বাগে সমবেত নিরস্ত্র জনতাকে সেই স্থান ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে কোন সাবধানবাণী জ্ঞাপন না করেই তাদের পাইকারী হারে হত্যা করা হয়েছিল ; বহু মানুষ গুলির আঘাতে হত হয়েছিল, অনেক মানুষ ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছিল, তখনও তাদের উপর গুলিবর্ষণ ক্ষান্ত হয়নি, জেনারেল ডায়ারের বিবেক এমনই নিদ্রিত ছিল। এরপর বহু লোককে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে চাবুক মারা হয়েছিল। প্রত্যহ ষোল মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে ছাত্রদের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাঁচশত জন শিক্ষক ও ছাত্রকে বন্দী করা হয়েছিল। পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সের স্কুলের ছাত্রদের প্যারেডে (কুচকাওয়াজ) যোগ দিয়ে সরকারী পতাকা অভিবাদনের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। একটি বিবাহ শোভাযাত্রায় অংশ-গ্রহণকারী প্রতিটি মানুষকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। চিঠিপত্র 'সেন্সর' করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দু সপ্তাহের জন্য বাদশাহী মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ কোন কারণ না দেখিয়েই বহু লোককে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়েছিল। ইসলামিয়া স্কুলের হৃষ্টপুষ্ট ছটি বালককে বেছে নিয়ে চাবকানো হয়েছিল, দেখতে বেশ বাড়ন্ত এই অপরাধেই তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। একটা সুবৃহৎ খাঁচায় গ্রেপ্তার করা মানুষদের রাখার ব্যবস্থা হয়ে-ছিল। শাস্তিদানের উপায়গুলিও ছিল বেশ বৈচিত্র্যময়—গুঁড়িমেরে বা বুকের উপর দিয়ে চলা, লাফিয়ে লাফিয়ে চলা প্রভৃতি। সামরিক বা অসামরিক কোন আইনেই এই শাস্তিগুলির উল্লেখ নেই। হাতকড়া পরিয়ে অথবা দড়ি দিয়ে বেঁধে মানুষজনদের ছাদহীন গাড়ী বা ট্রাকের উপর ফেলে রাখা হত। বিমান ও 'লিউয়িস' কামান থেকে গুলি বর্ষণ প্রভৃতি আধুনিক সমর বিজ্ঞান উদ্ভাবিত কৌশলগুলিও নিরস্ত্র জনতার প্রতি প্রযুক্ত হয়েছিল। একজনকে না পেয়ে 'হোস্টেজ' রূপে আর একজনকে আবদ্ধ রাখা, বা পলাতকদের হাজিরা দিতে বাধ্য করার জন্য তাদের সম্পত্তি 'বাজেয়াপ্ত' বা ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একজন হিন্দুর সঙ্গে একজন মুসলমানকে জোড়ায় জোড়ায়

একই হাতকড়ায় আবদ্ধ রাখা হত, এর অর্থ ছিল লোককে দেখানো যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য মানেই হচ্ছে দুই ধর্মের মানুষের সর্বনাশ। ভারতীয়েরা বাস করে এমন এলাকায় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সংযোগ যন্ত্রগুলি বিকল করে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয়দের বাসগৃহ থেকে ফ্যান বা পাখাগুলি খুলে তা ইউরোপীয়দের ব্যবহারের জন্য বিলি করে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি ভারতীয়ের গাড়ী-ঘোড়া, মোটরগাড়ী প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে তা ইউরোপীয়দের ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল।······পাঞ্জাবের সামরিক শাসন কি মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিল· তার কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এই সামরিক শাসন পাঞ্জাবে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। জনসাধারণ এতে বেশ ভয়চকিত হয়ে উঠেছে।”

পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর বিবরণ দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ায় সমগ্র দেশে একটা বিভীষিকার স্রোত বয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুতের চকিত আলোর মত পাঞ্জাবের ঘটনাবলী দেশের জনসাধারণের কাছে সভত্যা ও সাম্রাজ্যবাদের মুখোসধারী বিদেশী শাসনের কদর্য ও ভয়াবহ রূপটি উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল। জনসাধারণের এই মর্মবেদনা মহান্ কবি ও মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত সরকারী নৃশংসতার প্রতিবাদে ‘নাইট্‌হুড্’ বা ‘সার’ উপাধি পরিত্যাগ করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন: “এমন একটা সময় এসেছে যখন সম্মানসূচক চিহ্নগুলি আমাদের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ আমরা একটি সীমাহীন অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে পতিত রয়েছি। এই কারণে, আমি আমার পক্ষ থেকে, সকল সামাজিক মর্যাদামুক্ত হয়ে আমার দেশবাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চাই। আমার এই দেশবাসী আসলে যাই হোক না কেন, খুবই তুচ্ছ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। মানুষের পক্ষে অনুপযুক্ত ও সহ্যাতীত অপমান ভোগ যাদের নিয়তি আমিও তাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে চাই।”

খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন (1919-22)

খিলাফৎ আন্দোলনটি জাতীয় আন্দোলনের একটি স্রোতধারা রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিক্ষিত তরুণ মুসলমান, নৈষ্টিক মুসলমান ধর্মগুরু ও ধর্মবেত্তাদের একাংশ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তনপন্থী ও জাতীয়তা-

বাদী হয়ে উঠেছিলেন। লক্ষ্ণৌ চুক্তি দুই সম্প্রদায়ের মিলিতভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের পটভূমি রচনা করে দিয়েছিল। রাওলাট য়্যাক্টের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল তা' ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষকেই প্রভাবিত করেছিল। এই আন্দোলন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কেই ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিল। এর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। একজন কট্টর আর্যসমাজী নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক দিল্লীর জামা মসজিদের ধর্মোপদেষ্টার আসন থেকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার জন্য আহ্বান জ্ঞাপন করা হয়েছিল। ডাঃ কিচ্‌লু ধর্মে ছিলেন মুসলমান। শিখ ধর্মপীঠ অমৃতসরের 'স্বর্ণমন্দির' (Golden Temple)-এ প্রবেশের বিশেষ অধিকারী হিসেবে তাঁর হাতে একটি চাবি তুলে দেওয়া হয়েছিল। বিশ্ববাসীর সামনে রাজনীতিক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম একতা জ্ঞাপনই ছিল এই ঘটনাগুলির তাৎপর্য। সরকারী দমননীতিই অমৃতসরে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান দু' শ্রেণীর মানুষকে একই হাতকড়ায় বদ্ধ করা হত। একই সঙ্গে তাদের বুকে হেঁটে অথবা গুঁড়ি মেরে যেতে বলা হত। একই পাত্র থেকে হিন্দু-মুসলমান বন্দীদের জলপানে বাধ্য করা হত, যদিও একজন মুসলমানের ছোঁয়া জলপান একজন সাধারণ হিন্দুর পক্ষে রীতি বিরুদ্ধ। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা থেকে খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল। ব্রিটেন ও তার মিত্রশক্তিগুলি অটোমন বা তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি যে বৈরিতামূলক আচরণ করেছিল—রাজনীতি সচেতন ভারতীয় মুসলিম সমাজে তা ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। ব্রিটেন ও তার মিত্রশক্তিগুলি তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দিয়েছিল, থ্রেস অঞ্চলকে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ করা হবে না এই পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেই তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল। এর আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের মুসলিম সমাজকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে এশিয়া মাইনরের কতকগুলি সমৃদ্ধ ভূখণ্ড ও থ্রেস তুরস্কের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে আমরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইনি। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তুর্কীরাই প্রধান।" তুরস্কের সুলতানকে সাধারণভাবে মুসলিম দুনিয়ার ধর্মগুরু বা খালিফারূপেও মান্য করা হত। ভারতের মুসলিম সমাজের মনে একই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিণামে তুরস্ক সম্রাট বা খলিফার মর্যাদাহানি হতে পারে। অতঃপর আলি ভ্রাতৃদ্বয়

(সৌকৎ ও মহম্মদআলি), মৌলানা আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ, হজরত মোহানি প্রভৃতির নেতৃত্বে একটি খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই খিলাফৎ কমিটি দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু করে দিয়েছিল। নিখিল ভারত খিলাফৎ কনফারেন্স 1919 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে যদি তাদের দাবিগুলি মেনে না নেওয়া হয় তবে খিলাফৎ কমিটি গভর্নমেণ্টের কোন কাজেই সহ-যোগিতা করবে না। এই সময় মুসলিম লীগের নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদীদের হাতে এসে পড়েছিল ও এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগের সমর্থন থাকত। লোকমান্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধীর মত কংগ্রেস নেতারা খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্ভবকে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী প্রচেষ্টার স্বর্ণ-সুযোগ বলে মনে করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে খিলাফৎ আন্দোলনের সুযোগে মুসলিম জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদের পথে টেনে আনা সহজ হবে। তাঁরা এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান, ধনিক্, শ্রমিক, কৃষক, নারী, যুবক, আদিবাসী, উপজাতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী এদের সবারই সমবায়ে ভারতীয় জাতি গঠিত হয়েছে। প্রতিটি সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা শ্রেণী নিজ নিজ বিভিন্ন ধরনের দাবির লড়াই-এ নেমে দেখতে পাবে তাদের বিশেষ বিশেষ দুঃখ কষ্ট অভাবের মূলে রয়েছে বিদেশী শাসন। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বিশেষভাবে খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের একটি সুবর্ণ সুযোগ রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, এমন সুযোগ আগামী একশত বর্ষের মধ্যে আর পাওয়া যাবে না। 1920 খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন যে খিলাফৎ প্রশ্নটি শাসন-সংস্কার ও পাঞ্জাবে দমননীতির গুরুত্ব হ্রাস করে দিয়েছে অতএব তুরস্কের সঙ্গে মিত্রশক্তির সন্ধিচুক্তি যদি ভারতীয় মুসলমান-দের মনঃপূত না হয়, তবে তিনি একটি অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনায় ব্রতী হবেন। বস্তুতঃ অল্পকালের মধ্যেই গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলনেরও অন্যতম নেতারূপে গৃহীত হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ রাওলাট য়্যাক্ট্ প্রত্যাহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। পাঞ্জাবে অমানবিক অত্যাচার চালানোর জন্য কোন অনুতাপ জানানো বা ক্ষতিপূরণ করা হয়নি। জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা প্রার্থিত স্বায়ত্ত-

শাসনের দাবিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। 1920 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এলাহাবাদে সর্বদলীয় একটি সম্মেলনে স্কুল-কলেজ বয়কট ও আইন আদালত বর্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়। খিলাফৎ কনফারেন্সের উদ্যোগে 1920 খ্রীষ্টাব্দের তিরিশে আগষ্ট একটি অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনে সর্বপ্রথম অংশগ্রহণকারী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এই সময় তিনি যুদ্ধকালে বিশিষ্ট সেবার জন্য সরকার প্রদত্ত 'কাইজার-ই-হিন্দ্' পদকটি সরকারকে প্রত্যর্পণ করেছিলেন।

1920 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়েছিল। এর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আগষ্ট মাসের পয়লা তারিখে লোকমান্য তিলক মাত্র চৌষট্টি বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান নিদারুণভাবে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছিল। তবে অতিশীঘ্র গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন দাস এবং মতিলাল নেহেরু তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করেছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিকার, তুরস্কের খলিফার আধিপত্য হ্রাসের ক্ষতি-পূরণ এবং স্বরাজলাভ না হওয়া পর্যন্ত গান্ধীজী পরিকল্পিত সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ নীতি অবলম্বন সমর্থিত হয়েছিল। জনসাধারণকে সরকারী স্কুল, কলেজ, আইন আদালত ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। খাদি বস্ত্র উৎপাদনের জন্য জনসাধারণকে হাতে সুতো কাটা ও কাপড় বোনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। শান্তিপূর্ণভাবে গভর্নমেণ্টের আইন লঙ্ঘনের এই প্রস্তাবটি 1920 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে পুনর্গৃহীত হয়েছিল। নাগপুর অধিবেশনে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে "ব্রিটিশ জাতিকে এটা মনে রাখতে হবে, যে তারা যদি ন্যায়-বিচারে পরাঙ্মুখ হয়, তবে প্রতিটি ভারতবাসীর আবশ্যিক সঙ্কল্প ও কর্তব্য হবে তাদের সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন।" কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের মধ্যেও কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। এই পরিবর্তনের অন্যতম পদক্ষেপ রূপে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি ভাষাভিত্তিক রূপে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল। এখন থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পনের জন কার্যকরী সমিতির সদস্য (Working Committee) দ্বারা পরিচালিত হবে, এই ব্যবস্থা হয়। এই পনের জনের মধ্যে একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদক বা সেক্রেটারী রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে একটা নিয়ত সক্রিয় সংস্থায় পরিণত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করার জন্য এইরূপ একটি স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে বার্ষিক চার আনা চাঁদা দানকারী একুশ বা তার উর্ধ্ব'বয়স্ক যে কোন নরনারীকেই কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। 1921 খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস সদস্য হওয়ার জন্য বয়ঃসীমা আঠারোয় নামিয়ে আনা হয়েছিল।

এখন কংগ্রেসের চরিত্র বেশ পরিবর্তিত হয়ে পড়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান এখন বিদেশী শাসন থেকে মুক্তিকামী জনসাধারণের সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। দেশে সাধারণভাবে একটা উদ্দীপনারও সঞ্চার হয়েছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের বহু বিলম্ব সম্ভাবনা সত্ত্বেও দেশের মানুষ তাদের দাস-মনোভাব বিসর্জন দিতে শুরু করেছিল। এমনই একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যাতে মনে হত যে ভারতবাসিগণ যেন একটা নূতন বায়ুস্তর থেকে নিশ্বাস গ্রহণ করেছে। এই দিনগুলিতে অভূতপূর্ব হর্ষোচ্ছলতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। এ যেন ছিল একটা ঘুমন্ত শক্তিশালী দৈত্যের পুনর্জাগরণ। আর একটা ব্যাপার ছিল হিন্দু-মুসলমানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান। তবে, এই সময়ে কংগ্রেসের কিছু পুরাতন নেতা কংগ্রেসকে ত্যাগ করেন। জাতীয় আন্দোলনের এই গতিপরিবর্তন তাঁদের মনোমত হয়নি। আইনশৃঙ্খলার চারদেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ক্ষোভ প্রদর্শন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাচীন ধারাটির উপর তখনও তাঁদের আস্থা হারায়নি। এঁরা সাম্প্রতিক কালে কংগ্রেসের জনসংগঠন, হরতাল, ধর্মঘট, সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, কারাবরণ ইত্যাদি চরমপন্থী কর্মধারার বিরোধিতা করেছিলেন। এই সময়ে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান তাঁদের মধ্যে মহম্মদ আলি জিন্না, জি. এস. খাপর্দে, বিপিনচন্দ্র পাল এবং আনি বেশান্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

1921 ও 1922 এই দুটি বছরে ভারতে অভূতপূর্ব জাতীয় জাগরণ তথা আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়েছিল। হাজার হাজার ছাত্র সরকারী স্কুল ও কলেজ বর্জন করে নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় স্কুল ও কলেজগুলিতে শিক্ষালাভের জন্য ভর্তি হয়েছিল। এই সময়ে আলিগড়ের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া (জাতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়), বিহার বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ ও গুজরাট

বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি শিক্ষাসংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া' প্রতিষ্ঠানটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এইসব জাতীয় বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আচার্য নরেন্দ্র দেব, ডঃ জাকির হোসেন, লালা লাজপত রায় প্রভৃতির ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শিক্ষকতার কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাস (দেশবন্ধু নামে পরিচিত), মতিলাল নেহেরু এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদের ন্যায় খ্যাতনামা আইনজীবীদের সঙ্গে শত শত আইনজীবী তাঁদের আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'তিলক স্বরাজ্য ফণ্ড' নামে একটি 'তহবিল' খোলা হয়েছিল, ছয় মাসের মধ্যেই এই তহবিলে এককোটিরও অধিক টাকা চাঁদা জমা পড়েছিল। মহিলারা এই 'তহবিল' ভারী করার উদ্দেশ্যে নির্দ্বিধায় এবং বিশেষ উৎসাহ সহকারে তাঁদের অলঙ্কারাদি দান করেছিলেন। দেশের চারিদিকে বিদেশী বস্ত্রের 'বহ্ন্যুৎসব' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। খদ্দর বস্ত্র ব্যবহার স্বাধীনতার চিহ্ন রূপে পরিগণিত হয়েছিল। 1921 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সর্বভারতীয় খিলাফৎ সমিতি (All India Khilafat Conference) কর্তৃক এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কোন মুসলমানের চাকরি করা অনুচিত। সেপ্টেম্বর মাসে আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী হাজার হাজার জনসভায় খিলাফৎ সমিতির উপরোক্ত প্রস্তাবটির সমর্থনে বক্তৃতা দেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পঞ্চাশ জন সদস্য এই মর্মে একটি আবেদন প্রকাশ করেছিলেন যে গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষকে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দীন-হীন করে রেখেছে কোন ভারতবাসীর পক্ষে সেই গভর্নমেণ্টের অধীনে চাকরি করা অন্যায়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও এই ধরনের একটি বিবৃতি প্রচার করেছিল।

কংগ্রেস এখন এই জাতীয় আন্দোলনকে আরও উর্ধতর স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিল। কংগ্রেসের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি-গুলিকে জনমতের অনুমোদন নিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন অর্থাৎ ব্রিটিশ আইনভঙ্গ আন্দোলন সুরু করার স্বাধীনতা দিয়েছিল। এই আইন আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ ছিল সরকারী প্রাপ্য খাজনা বা কর না দেওয়া।

গভর্নমেণ্ট এবারও দমননীতির আশ্রয় নিয়েছিল। কংগ্রেস ও 'খিলাফৎ' স্বেচ্ছাসেবকেরা এক সঙ্গে 'ড্রিল' 'কুচকাওয়াজ' প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে

উঠেছিল, এতে সাধারণ স্তরের হিন্দু ও মুসলমান রাজনৈতিক কর্মীদের মিলনের ও মত বিনিময়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে উঠত। সরকার পক্ষ থেকে এই সম্মিলিত 'ড্রিল' বে-আইনি ঘোষিত করা হয়। 1921 খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত অপর সকল জাতীয়তাবাদী নেতাকেই কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কারারুদ্ধ রাজনৈতিক কর্মীদের মোট সংখ্যা তিন সহস্রে দাঁড়িয়েছিল। 1921 খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী 'প্রিন্স অফ্ ওয়েলস' ভারতে আসেন। তাঁকে বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারী বিপুল শোভাযাত্রার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভারত-সরকার প্রিন্স অফ্ ওয়েলসকে এই উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যে তাঁর ভারত আগমনে ভারতবর্ষের জনসাধারণ ও দেশীয় রাজন্যবৃন্দের মধ্যে রাজভক্তির মনোভাব বৃদ্ধি পাবে। বোম্বাই-এ সরকারী কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভ প্রদর্শক শোভাযাত্রাটির 53 জনকে নিহত ও প্রায় চার হাজার বা ততোধিক ব্যক্তিকে আহত করে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালিয়েছিল। 1921 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, "কংগ্রেস এযাবৎ যে ভাবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে এসেছে তা আরও তীব্রতর করে তোলা হবে। পাঞ্জাব ও খিলাফৎ-এর প্রতি অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার এবং স্বরাজ লাভ না হওয়া পর্যন্ত এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকবে।" এই প্রস্তাবে প্রতিটি ভারতবাসী বিশেষতঃ যুবসমাজকে শান্তভাবে বিনাড়ম্বরে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার বরণের আহ্বান জানানো হয়েছিল। এইরূপ প্রতিটি সত্যাগ্রহীকে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করতে হত যে সে কায়মনোবাক্যে অহিংস থাকবে, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, খ্রীষ্টান, ইহুদী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করতে চেষ্টা করবে এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করবে। একমাত্র খাদি বস্ত্রই হবে তার পরিধেয়। হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকদের এরও অতিরিক্ত একটি শপথ গ্রহণ করতে হত, সেটি ছিল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি। কংগ্রেসের উপরোক্ত প্রস্তাবে যেখানে সম্ভব সেখানেই ব্যক্তিগত অথবা গণ আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। তবে সর্বক্ষেত্রে এই আন্দোলনে অহিংসা অবলম্বনের সর্ত যুক্ত হয়েছিল।

জনসাধারণ এই সময়ে আরও তীব্র সংগ্রামের ডাকের জন্য মানসিক দিক

থেকে প্রস্তুত হয়েছিল। ইতিমধ্যেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে বেশ দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গলার ও বর্তমান উত্তর প্রদেশের অসংখ্য কৃষক অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। পাঞ্জাবে শিখ-সম্প্রদায় অকালি আন্দোলনে নেমেছিল। শিখ ধর্মস্থান গুরু-দ্বারা (গুরুদোয়ারা)-গুলি থেকে অসৎ 'মোহান্ত'দের বিতাড়নই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। উত্তর কেরালার মালাবারের মোপ্‌লা বা মুসলমান চাষী সমাজ একটা শক্তিশালী জমিদার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ভাইসরয় 1919 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, "নগরাঞ্চলের দুঃস্থশ্রেণী অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়ে পড়েছে।···দেশের কোন কোন অংশে কৃষক সমাজেরও এই অবস্থা, বিশেষভাবে আসাম উপত্যকার কিছু অংশে, সংযুক্ত প্রদেশে (বর্তমান উত্তর প্রদেশে), বিহার ও ওড়িশায় এবং বাঙ্গলায় অবস্থা ভাল নয়।" 1922 খ্রীষ্টাব্দের পয়লা ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে যদি সাতদিনের মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না দেওয়া হয় এবং সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ না তুলে নেওয়া হয়, তবে তিনি গণঅসহযোগ আন্দোলন সুরু করবেন, খাজনা দেওয়া বন্ধ করাও হবে এই আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ।

এই সংগ্রামী মনোভাব অতি শীঘ্র পশ্চাদপসরণে পরিবর্তিত হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের পাঁচ তারিখে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরী-চৌরা গ্রামে 3,000 কৃষকের একটি শোভাযাত্রার উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। ক্রুদ্ধ জনতা পুলিশের থানা আক্রমণ করে তাতে অগ্নি সংযোগ করেছিল। এতে বাইশজন পুলিশ প্রাণ হারিয়েছিল। গান্ধীজী এই ঘটনায় খুব গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি এখন বেশ ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে জাতীয় কর্মীগণ তখনও পর্যন্ত অহিংসার মর্ম কি তা বুঝতে পারেনি এবং অহিংসায় তারা অভ্যস্তও হয়নি। তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে অহিংসার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হলে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। হিংসাত্মক কাজকর্ম তিনি শুধু অপছন্দ করতেন বলেই তার অভ্যাস তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন এটা সম্ভবত ঠিক নয়, এই নিষেধাজ্ঞার আরও একটা কারণ ছিল। গান্ধীজীর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যে কোন হিংসাত্মক প্রতিরোধ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া

সম্ভব, কারণ দেশবাসী তখন পর্যন্ত এমন কোন শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি যা দিয়ে সরকারী পক্ষের প্রচণ্ড দমনলীলার প্রতিরোধ সম্ভব। অর্থাৎ বাহুবলে বা অস্ত্রবলে ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখীন হওয়ার সামর্থ্য ভারতবাসীর ছিল না। অতঃপর গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে-ছিলেন। গুজরাটে বরদৌলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বারই ফেব্রুয়ারির বৈঠকে আইনভঙ্গমূলক সকল আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবে কংগ্রেস কর্মীগণকে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। চরকা, জাতীয় বিদ্যালয় ও মদ্যপান নিবারণ ছিল এইসব গঠনমূলক কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারমূলক বরদৌলি প্রস্তাব দেশবাসিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী শিবিরেও এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়েছিল। কেউ কেউ গান্ধীজীর নির্দেশে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। অনেকে আবার এই পশ্চাৎ-অপসারণ নীতির প্রয়োগে বিরক্ত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের অন্যতম তরুণ ও জনপ্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'দি ইণ্ডিয়ান্ স্ট্রাগল' (ভারতের সংগ্রাম) নামক গ্রন্থে এই ঘটনা সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন "জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যখন তুঙ্গে পৌঁচেছে তখন এই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার প্রস্তাব যেন একটা জাতীয় দুর্ঘটনার রূপ নিয়েছিল। মহাত্মার মুখ্য সেনাপতিদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও লালা লাজপত রায় এই তিনজনই এই সময়ে কারারুদ্ধ ছিলেন। সাধারণ মানুষদের মত এঁরাও এই ঘটনায় বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমি এই সময় জেলখানায় দেশবন্ধুর সঙ্গেই ছিলাম। এই ঘটনায় তিনি ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ঘটনা পরম্পরা নিয়ে বারবার মহাত্মা গান্ধীর এই অবোধ্য আচরণ তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল।"

জওহরলাল নেহেরুর মত বহু তরুণ নেতাও এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবে জনগণ ও নেতৃবৃন্দ এই দুই পক্ষেরই মহাত্মার উপর আস্থা ছিল, তাই কোন পক্ষই প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়নি। প্রকাশ্য বিরোধিতার পথে না গিয়ে তাঁর এই প্রস্তাব সবাই মেনে নিয়েছিল। প্রথম অসহযোগ বা আইন অমান্য আন্দোলন কার্যতঃ এই সময়েই থেমে গিয়েছিল।

এখন সরকারী কর্তৃপক্ষ এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে দেশবাসির উপর দোর্দণ্ড পীড়ননীতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 1922 খ্রীষ্টাব্দের দশই মার্চ মহাত্মা গান্ধীকে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে গান্ধীজীর প্রতি ছয় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজীর এই বিচারটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তার কারণ হল, বিচার-আদালতে গান্ধীজীর একটা বিবৃতি। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী অভিযোগগুলি মেনে নিয়ে গান্ধীজী বিচার-আদালতের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন "আমাকে সর্বোচ্চ দণ্ডই দেওয়া হক, কারণ সরকারী আইনে যা সুপরিকল্পিত অপরাধ বলে গণ্য, সেটাই আমার কাছে একজন (ভারতীয়) নাগরিকের সর্বশ্রেষ্ঠ পালনীয় কর্তব্য বলে মনে হয়েছে।" আদিতে একজন ব্রিটিশ-নীতি সমর্থক হয়েও কিভাবে তাঁর রাজনৈতিক মতি পরিবর্তিত হয়ে তাঁকে ব্রিটিশ শাসনের প্রবলতম সমালোচকে পরিণত করেছে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "অত্যন্ত দুঃখ এবং অনিচ্ছার সঙ্গে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছি যে ব্রিটিশ সম্পর্কের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সবিশেষ দুর্গতিগ্রস্ত হয়েছে। এত দুর্গতির অবস্থা ভারতে ইতিপূর্বে কখনও ছিল না। ভারতবাসীকে নিরস্ত্র রাখা হয়েছে, অত্যাচার বা আগ্রাসন রুখবার কোন শক্তিই ভারতের নেই…ভারত আজ এতই দরিদ্র যে দুর্ভিক্ষ দমনেও সে অক্ষম! নগরাঞ্চলে বাস করে এটা বুঝবার কোন উপায়ই নেই যে ভারতের অর্ধভুক্ত জনগণ কিভাবে ধীরে ধীরে নিস্প্রাণ হয়ে উঠছে। নগরাঞ্চলের অধিবাসিগণ জানতেই পারে না যে সামান্য সুখ-সুবিধা তারা ভোগ করতে পায় সেটা তাদের দালালির মজুরি ছাড়া আর কিছু নয়। বিদেশী শোষকদের দেশবাসীকে শোষণের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যই তারা সামান্য কিছু মজুরি পেয়ে থাকে। তাদের উপার্জন এবং তাদের দালালির মজুরিও জনসাধারণের শোষণলব্ধ। এই শ্রেণী এটা বুঝতে অক্ষম যে ব্রিটিশ ভারতের আইনসঙ্গত সরকারের উদ্দেশ্যই হল ভারতের জন-সাধারণের উপর শোষণনীতি প্রয়োগ। বড় বড় নীতিবাক্য অথবা পরিসংখ্যানের অঙ্কের খেলা দিয়ে বহু গ্রামে সাদা চোখে যে জীবন্ত কঙ্কাল-গুলির দেখা মেলে তাদের অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব।…আমার মতে এদেশে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আইনের বিকৃতি ঘটিয়ে তাকেই আইন-রূপে প্রয়োগ করা হয়। এই আইন শুধু শোষকশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্যই

বহাল রয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সরকারী প্রশাসনভুক্ত ইংরাজ কর্তাব্যক্তি এবং তাঁদের ভারতীয় সহযোগীবৃন্দ আমি আগে যে পাপাচারের উল্লেখ করেছি তারই সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। আমি জানি যে বহু ইংরাজ ভারতীয় রাজকর্মচারী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে থাকেন যে তাঁরা এপর্যন্ত বিশ্বে অনুসৃত সর্বোৎকৃষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারত শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের এই বিশ্বাসও রয়েছে যে মন্থরতা সত্ত্বেও ভারত ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এঁরা জানেন না যে একটা অদৃশ্য অথচ সবিশেষ শক্তিশালী ভীতি সঞ্চারক প্রশাসনিক নীতি এবং এই প্রশাসনের সুসংগঠিত শক্তির প্রকাশ্য আস্ফালন রয়েছে একদিকে। আর একদিকে রয়েছে তাদেরই তরফ থেকে ভারতবাসীর আত্মরক্ষার অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের সর্বপ্রকার উপায় হরণ। এই দুই পরিস্থিতির চাপে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সাহস ও বীর্যের অভাব দেখা দিয়েছে। ভাল থাকার ভান করে তারা বাস করে। আর প্রশাসন সেইটাই সত্য বলে মনে করে।"

পরিশেষে গান্ধীজী বলেন যে তাঁর বিশ্বাস এই যে, "কোন কিছু ভালো ব্যাপারে সহযোগিতা যদি মানবিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয় তবে এটাও মেনে নিতে হয় যা কিছু মন্দ তার সঙ্গে অসহযোগিতা বা বিরুদ্ধতাও মানুষের পক্ষে একটা পবিত্র কর্তব্য।" বিচারের রায় লেখার সময় বিচারকের মনে পড়েছিল যে তিনি 1908 খ্রীষ্টাব্দে লোকমান্য তিলকের প্রতি যে দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন অনুরূপ দণ্ডেই এখন গান্ধীজীকে দণ্ডিত করা হচ্ছে।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই 'খিলাফৎ' প্রসঙ্গ অবান্তর হয়ে উঠেছিল। তুরস্কের জনগণ মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে 1922 খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে সুলতানের (খলিফার) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা তাঁকে রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। কামাল পাশা তুরস্ককে একটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তুরস্ককে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। 'খলিফা' পদটি তিনি তুলেই দিয়েছিলেন। তুরস্কের নূতন শাসনতন্ত্রেও ইসলামী প্রভাব মুছে দেওয়া হয়েছিল। কামাল পাশা শিক্ষাবিস্তারকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে পরিণত করেন। নারীগণকে বহু অধিকার দেওয়া হয়েছিল। দেশের প্রচলিত আইনকানুনগুলিকে তিনি ইউরোপীয় আইনের ধাঁচে সংস্কার করে দিয়েছিলেন। তিনি দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ও আধুনিক শিল্পসংস্থা গঠনেরও উদ্যোগ নিয়ে-

ছিলেন। কামাল পাশার এই জাতীয় কর্মধারা খিলাফৎ আন্দোলনের মেরুদণ্ড চূর্ণ করে দিয়েছিল।

তবে খিলাফৎ আন্দোলন ভারতের অসহযোগ আন্দোলনকে বিশেষ পরিপুষ্ট করে তুলেছিল। নগরাঞ্চলে মুসলমানদের টেনে এনে খিলাফৎ আন্দোলন তাদের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিল, এতে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক খিলাফৎবাদী নেতৃবৃন্দের রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্মীয় মনোভাবের আমদানি করার সমালোচনা করে থাকেন। তাঁদের মতে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই আন্দোলন যে ধর্মীয় চেতনার সঞ্চার করেছিল তারই পরিণামস্বরূপ একদিন সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠতে পেরেছিল। এটা অবশ্য আংশিকভাবে সত্য। তবে এটা বলতে হবে যে জাতীয় আন্দোলন পরিচালন কালে জাতীয়তাবাদী নেতারা বহু দাবির সঙ্গে শুধুমাত্র মুসলিম স্বার্থ সংক্রান্ত আর একটি দাবি উত্থাপন করে একটা খুব অসঙ্গত কাজ করেননি। ভারতীয় সমাজ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অসুবিধা ও অত্যাচার ভোগের মধ্য দিয়েই এই শ্রেণীগুলি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিতে স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারত। স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সেদিন প্রায় অপরিহরণীয়ই ছিল। তবে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাজের মধ্যে একটা ত্রুটি দেখা গিয়েছিল। মুসলমান সমাজের ধর্ম-ঘেঁষা রাজনীতিক মনোভাবকে এঁরা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে দিতে বহুলাংশেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মনে রাখা উচিত ছিল যে মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য খলিফার ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। বস্তুগতভাবে মুসলমানদের মনে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল, এই আন্দোলন ছিল তারই একটি অভিব্যক্তি। 'খিলাফৎ'কে আশ্রয় করেই এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সুরু হয়েছিল। যাই হোক, কামাল পাশা 1924 খ্রীষ্টাব্দে যখন 'খলিফা' পদটির অবলোপ ঘটালেন, তখন ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উত্থিত হয়নি।

অসহযোগ তথা আইন অমান্য আন্দোলন কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও, একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই পরিবেশে জাতীয় আন্দোলন

স্তিমিত হয়ে যায়নি বরং নানাভাবে আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই সময়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় আন্দোলনের ধারা দেশের সুদূরতম অঞ্চল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। শিক্ষিত ভারতবাসী দেশের মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিল। ভারতের যে মানুষেরা সর্বদা ব্রিটিশের পশুবলের ভয়ে সন্ত্রস্থ হয়ে থাকত সেই ভয় তাদের মন থেকে দূরীভূত হয়েছিল। দেশবাসী বিপুল আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের অসাফল্য বা বিরতি তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে পারেনি। এ সম্বন্ধে গান্ধীজী লিখেছিলেন "1920 খ্রীষ্টাব্দে যে সংগ্রাম সুরু হয়েছে তা উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত শেষ হবে না, এটা একমাস স্থায়ী হতে পারে, আবার একবছর ধরেও চলতে পারে। আবার হয়ত এটা বহু বহু মাস অথবা বহু বহু বছর ধরেই চলতে থাকবে।"

স্বরাজ্যদল

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্তরে একটা বিচ্ছিন্নতবোধ ও শৈথিল্যের ভাব জেগে উঠেছিল। কংগ্রেস দলের মধ্যে পূর্বেকার সেই উদ্দীপনা অদৃশ্য হয়েছিল এবং একটা হতাশার ভাব দেখা দিয়েছিল। নেতৃবৃন্দের মধ্যেও মতবিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছিল।

এই সময়ে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরু দেশকে নূতন ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি অবলম্বনের যুক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের বক্তব্য এই ছিল যে পরিবর্তিত অবস্থায় রাজনৈতিক কর্মসূচিরও পরিবর্তন আবশ্যক। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরুর প্রস্তাব এই ছিল যে জাতীয়তাবাদী দল ব্যবস্থাপক সভাগুলি বর্জন করার পরিবর্তে এখানে ঢুকে পড়বে এবং সরকার যে নীতি অনুসরণ করতে চায় তার দোষত্রুটিগুলি উদ্ঘাটিত করে দেবে অর্থাৎ প্রতিপদেই সরকারকে বাধা দেবে। সরকারকে এইভাবে বেকায়দায় ফেলা হলে দেশবাসীর মধ্যে যে উত্তেজনার সঞ্চার হবে তাতে দেশ লাভবান হবে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ আন্সারী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অন্যান্য অনেকে এই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ বা কাউন্সিল এন্ট্রি প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। অসহযোগ নীতির পরিবর্তন বিরোধী রূপে এঁরা নো-চেঞ্জার (No-Changer) রূপে আখ্যাত হয়েছিলেন। এঁরা এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে ব্যবস্থাপক সভায় যোগদানের

রাজনীতির দ্বারা জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা হ্রাস পাবে ও নেতাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব জেগে উঠবে। এই কারণে এঁরা চেয়েছিলেন যে কংগ্রেস চরকা-কাটা, মদ্যপান নিবারণ, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যস্থাপন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন ইত্যাদি গঠনমূলক কর্মধারা নিয়েই থাকুক।

1922 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহেরু কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ্যদল বা পার্টি নামে একটি দল বা উপদল গঠন করেন। চিত্তরঞ্জন এই দলের সভাপতি ও মতিলাল নেহেরু এই দলের অন্যতম সম্পাদক হন। এটা কংগ্রেসেরই অঙ্গ বা উপদল হিসেবেই থাকবে—কংগ্রেসের বাইরে নয়, এটাই স্থির হয়। কংগ্রেসের সব কর্মসূচিই এঁরা মেনে নিয়েছিলেন—শুধু ব্যবস্থাপক সভাগুলির নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সর্তটি এঁরা বর্জন করেন।

স্বরাজ্যদল ও 'নো-চেঞ্জার'রা এখন পরস্পরের সঙ্গে তীব্র রাজনৈতিক বিবাদে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। 1924 খ্রীষ্টাব্দের পাঁচই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী কারামুক্ত হয়েছিলেন। কারামুক্তির পর গান্ধীজীও দুই দলের মধ্যে ঐক্য আনতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তাঁর উপদেশমত দুই দলই কংগ্রেসের মধ্যে থাকতে সম্মত হন। তবে তাঁরা নিজ নিজ মতেই চলবেন, এটাও ঠিক হয়।

1923 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নির্বাচনের দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল। স্বরাজ্য-দলের হাতে প্রস্তুতির সময় খুব কম ছিল, তথাপি নির্বাচনে এই দলের উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় (সেণ্ট্রাল লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্বলী) নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ছিল একশত একটি। এইগুলির মধ্যে চল্লিশটি আসন স্বরাজ্যদল দখল করেছিল। অন্যান্য ভারতীয় দলগুলির সমর্থন নিয়ে স্বরাজ্যদল সদস্যগণ অনেকবার ভোটে সরকার পক্ষকে পরাজিত করে দিয়েছিল। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। 1925 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বরাজ্যদল বিঠলভাই জে প্যাটেলকে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ বা সভার (সেণ্ট্রাল লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্বলী) সভাপতি (স্পীকার) পদে নির্বাচিত করতে সমর্থ হয়েছিল। বিঠলভাই ছিলেন একজন অগ্রগণ্য জাতীয়তাবাদী নেতা। এতৎ সত্ত্বেও স্বরাজ্যদল ভারত সরকারের স্বৈরাচারী শাসন নীতির কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এই অবস্থার প্রতিবাদে স্বরাজ্যদল এসেম্বলী থেকে 1926 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বেরিয়ে এসেছিল। সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক

ব্যাপার এই ছিল যে স্বরাজ্যদলের কাজকর্ম মধ্যবিত্ত অথবা সাধারণ মানুষদের সক্রিয় রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে আনতে পারেনি। তবে এই সঙ্গে 'নো-চেঞ্জার' বা পরিবর্তন বিরোধী কংগ্রেসীরাও গণসমর্থন বিশেষ আদায় করতে পারেননি। বস্তুতঃ কংগ্রেসের দুদলই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হতাশা অপনোদনে ব্যর্থ হয়েছিল। এই দুই দলের মধ্যে মূলতঃ কোন নীতিগত বিরোধ ছিল না, দুই দলের নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সদ্ভাবও বজায় ছিল। একদল অন্যদলকে নিজেদের মতই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রূপে স্বীকার করত। এইসব কারণে ভবিষ্যতে একটা নূতন রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে এরা মিলিতভাবে সংগ্রামের কথা ভেবে রেখেছিল। ইতিমধ্যে জাতীয় আন্দোলন তথা স্বরাজ্যদলের উপর একটি অতি নিষ্ঠুর আঘাত নেমে এসেছিল। 1925 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা দেশে একটা হতাশার সঞ্চার করেছিল, এই অবস্থায় দেশে কুশ্রী সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ দেশের পরিস্থিতির সুযোগে দিকে দিকে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব ছড়াতে আরম্ভ করেছিল। 1923 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে দেশে বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটেছিল। মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা দুটি প্রতিষ্ঠানই এসময় আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে এ পর্যন্ত সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ যে ভারতীয়-বোধ গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তিতে সর্বপ্রথম একটা ধাক্কা লেগেছিল। স্বরাজ্যদলের মুখ্য নেতৃদ্বয় মতিলাল নেহেরু ও চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন কট্টর জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িকতা এঁদেরও দ্বিধান্বিত করেছিল। সংবেদনশীল বা সাড়া দিতে প্রস্তুত (responsive) নামে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটি উপদল ছিল। মদনমোহন মালবীয়, লালা লাজপত রায় এবং এন. সি. কেলকার এই দল-ভুক্ত ছিলেন। হিন্দু স্বার্থরক্ষা করা হবে এই সর্তে এঁরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এঁরা মতিলাল নেহেরুর নামে এই অপবাদ দিয়েছিলেন যে তিনি হিন্দুদের ডুবিয়ে দিচ্ছেন, তিনি হিন্দুবিদ্বেষী এবং গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের সমর্থক। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা-বাদীগণ এই সময় সরকারী চাকরি বা বিশিষ্ট পদ লাভের আশায় অতি তৎপর হয়ে উঠেছিল। এদের সংগ্রামও বেশ তীব্র ছিল। গান্ধীজী বার

বার একথা বলতেন যে "হিন্দু-মুসলিম সংহতিসাধন আমাদের চিরদিনের অভীষ্ট, যে কোন অবস্থাতেই আমরা এই কর্তব্যকর্মে ব্রতী থাকব।" সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাবে বিচলিত গান্ধীজী এই সময় দুই সম্প্রদায়ের মিলন-সেতুরূপে কাজ করতে নেমেছিলেন। তিনি এই দুঃসহ অবস্থার উন্নতি করতে কৃতসঙ্কল্পও হয়েছিলেন। 1924 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদ আলির বাড়ীতে থেকে একুশদিন অনশনের সঙ্কল্প নিয়ে অনশন সুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাগুলিতে যে অমানবিক নৃশংসতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত। দুঃখের বিষয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে তাঁর প্রয়াস সাফল্য লাভ করেনি।

বস্তুতঃ দেশের এই সময়ের অবস্থা বেশ হতাশাব্যঞ্জক হয়ে উঠেছিল। দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা অবসাদও দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজী যেন অবসর জীবনযাপন করছিলেন। স্বরাজ্যদল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল, দেশে সাম্প্রদায়িকতা প্রসারিত হচ্ছিল। 1927 খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গান্ধীজী লিখেছিলেন—"আমার একমাত্র আশার উৎস হল প্রার্থনা এবং প্রার্থনার অনুসরণ।" কিন্তু, এই অবস্থাতেও জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল। 1927 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'সাইমন কমিশন' গঠনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে, ভারতবর্ষ যেন একটা অন্ধকার জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে একটা নূতন রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রবেশ করেছিল।

দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন

1927 বৎসরটিতে অনেকগুলি ঘটনা থেকে বোঝা গিয়েছিল যে জাতি আবার সুস্থতা লাভ ও শক্তি-সঞ্চয় করে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, শুধু দরকার একটা নেতৃত্বের আহ্বান। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই জাগরণের লক্ষণ কংগ্রেসের মধ্যে একটি নূতন বামপন্থী চিন্তাধারার উদ্ভব থেকেই ধরা পড়েছিল। এই নূতন ধারার নায়ক ছিলেন—জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। এই দুই তরুণ নেতা কালহরণ না করে সমগ্র দেশ পরিক্রমা করেন এবং দেশবাসীর মধ্যে নবযুগের সমাজতন্ত্রবাদী ভাবধারা সঞ্চারের চেষ্টা করেন। এঁরা সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ ও সামন্ততন্ত্র বা জমিদারি প্রথাকে আক্রমণ প্রসঙ্গে দেশবাসীকে অবহিত করে দিয়েছিলেন যে দেশের স্বাধীনতা দেশবাসীকে সংগ্রামের দ্বারা অর্জন করে নিতে হবে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'দান' হিসেবে

ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না। এই দুই তরুণ নেতা ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে অপরিসীম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

এঁদের প্রভাবে ভারতের যুবসমাজ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। দেশের সর্বত্র যুবসংগঠন গড়ে উঠেছিল এবং যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। 1928 খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে নিখিলবঙ্গ ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর পর দেশের বহু স্থানেই ছাত্রদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বছরেরই (1928) ডিসেম্বর মাসে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এইসব জাতীয়তাবাদী তরুণেরা ধীরে ধীরে সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। এই তরুণেরা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি চরমপন্থার সাহায্যে সমাধানের ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছিল। এই তরুণ দল থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উঠেছিল, এদের প্রচারের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভের কর্মসূচি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় 1920 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী বৎসরগুলিতে। রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত বহু তরুণ জাতীয়তাবাদীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই জাতীয়তাবাদী তরুণ সমাজের অনেকেই গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে ঝুঁকেছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায় হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী দলের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। 1924 খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট্ মুজাফ্‌ফর আহম্মদ ও এস. এ. ডাঙ্গেকে দেশে সাম্যবাদী চিন্তা প্রচারের জন্য গ্রেপ্তার করেছিল। পরে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় এঁদেরও বিচার হয়। 1925 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সাম্যবাদী (Communist Party) দলের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দল বা গোষ্ঠীগুলি মার্ক্সীয় ও সাম্যবাদী চিন্তাধারা বিস্তারের কাজে নেমেছিল।

ভারতের কৃষক ও শ্রমিক সমাজের মধ্যেও একটা জাগরণ এসেছিল। উত্তর প্রদেশে (তদানীন্তন সংযুক্ত প্রদেশ) প্রজাস্বত্ব আইন পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। প্রজা বা কৃষকেরা খাজনার হার কমাতে চেয়েছিল, জমির অধিকার থেকে উচ্ছেদের আইন প্রত্যাহার এবং ঋণ-মকুবও চেয়েছিল। গুজরাটের চাষীরা সরকারী কর্তৃপক্ষের পরিকল্পিত খাজনা বৃদ্ধি নীতির বিরোধিতায় নেমেছিল। এই সময়ে বিখ্যাত বারদৌলি সত্যা-

গ্রহের ঘটনাটি ঘটেছিল। 1928 খ্রীষ্টাব্দে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কৃষকেরা একটা খাজনা বন্ধ আন্দোলনে নেমেছিল। পরিণামে এদের দাবি গৃহীত হয়েছিল। শিল্পোদ্যোগের জগতে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া প্রাপ্তির ভিত্তিতে শ্রমিক সঙ্ঘ আন্দোলন (Trade Union Movement) প্রসার লাভ করেছিল। এই আন্দোলন নিখিলভারত শ্রমিক সঙ্ঘ (All India Trade Union Congress) কর্তৃক পরিচালিত হত। 1928 খ্রীষ্টাব্দে অনেক শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকেরা ধর্মঘট বা শ্রম-বিরতি পালন করেছিল। খড়্গপুরের রেলকারখানায় ধর্মঘট দুইমাস স্থায়ী হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ের কর্মীরাও ধর্মঘট করেছিল। জামসেদপুরে টাটার লৌহ ও ইস্পাত কারখানায়ও শ্রমিকরা কর্মবিরতি বা ধর্মঘটে যোগদান করেছিল। এই ধর্মঘটের মীমাংসায় সুভাষ-চন্দ্র বসু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘটের ক্ষেত্র ছিল বোম্বাইর বস্ত্র কলকারখানাসমূহ। প্রায় 150,000 শ্রমিক পাঁচমাস ধরে কাজ করেনি। এই ধর্মঘট সাম্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। 1928 খ্রীষ্টাব্দে ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা পাঁচলক্ষে পৌঁছেছিল।

দেশে নবজাগরণের চিহ্ন অন্যান্য দিক থেকেও ফুটে উঠেছিল। বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ভাবধারাও ছিল সমাজতান্ত্রিক। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার সময় থেকে দেশে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকর্মের পুনরাবির্ভাব দেখা গিয়েছিল। 1924 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতিকল্পে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন' নামে একটি বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ এই সংগঠন ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বহু বিপ্লবী যুবককে গ্রেপ্তার করে 'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা' নামে একটি মামলা তুলে এই যুবকদের অভিযুক্ত আসামীরূপে খাড়া করেছিল। এটি 1925 খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। অভিযুক্ত যুবকদের মধ্যে সতের জনকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। চারজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। চারজন বিপ্লবী যুবককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। ফাঁসিতে যে চারজনকে মৃত্যুবরণ করতে হয় তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন রামপ্রসাদ বিসমিল এবং আসফাকউল্লা। বিপ্লবী যুবকেরা অল্পদিনের মধ্যেই সমাজ-তান্ত্রিক ভাবধারায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। 1928 খ্রীষ্টাব্দে এঁরা চন্দ্রশেখর

আজাদের নেতৃত্বে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ঈষৎ পরিবর্তন করেন। সংগঠনের নূতন নামকরণ হয় "হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিক্যান এসোসিয়েশন।"

ভগৎ সিং, রাজগুরু ও আজাদ (চন্দ্রশেখর) এই তিন যুবক এক ব্রিটিশ কর্মচারীকে হত্যা করায় সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ একটা নাটকীয় রূপ গ্রহণ করেছিল। নিহত ব্রিটিশ কর্মচারীটি ইতিপূর্বে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি বিক্ষোভ মিছিলের উপর নির্বিচারে লাঠি চালানোর হুকুম দিয়েছিল। পাঞ্জাবকেশরীরূপে পরিচিত লাজপত রায় একটা লাঠির আঘাতে গুরুতভাবে আহত হন ও পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্রিটিশ কর্মচারীকে কেন হত্যা করা হল তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে এই যুবকেরা জানিয়েছিল যে "লক্ষ লক্ষ দেশবাসী মানুষের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন একজন নেতা নগণ্য এক পুলিশ কর্মচারীর লাঠির আঘাতে প্রাণ হারাবেন…এই ঘটনাটি সমগ্র জাতির প্রতি অপমান। ভারতের যুবসমাজের উচিত এই অপমানের অপনোদন। আমরা বিশেষ দুঃখিত যে একজন মানুষকে আমরা হত্যা করেছি—তবে এই মানুষটি ছিল সেই নৃশংস ও অন্যায় শাসনব্যবস্থার অঙ্গ যে শাসনব্যবস্থা নির্মূল করে ফেলাই আমাদের লক্ষ্য। নররক্ত-পাত আমাদের পক্ষে দুঃখদায়ক কিন্তু বিপ্লবের বেদীমূলে রক্তপাত অপরিহার্য। আমাদের লক্ষ্য হল এমন একটা বৈপ্লবিক শক্তির সৃষ্টি, যে সৃষ্টিতে একজন মানুষের পক্ষে অপরের প্রতি অত্যাচার করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।"

এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার আর একটা ঘটনা ঘটেছিল 1929 খ্রীষ্টাব্দের আটই এপ্রিল। ঐ দিন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে (Cent al Legislative Assembly) একটা বোমা ফাটান। ব্যবস্থা পরিষদে 'পাবলিক সেফটি' বা জননিরাপত্তা বিল নামে একটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার উদ্যোগ চলছিল। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হলে জনসাধারণের স্বাধীনতা হানির আশঙ্কা ছিল। এসেম্বলিতে বোমা ছোঁড়ার উদ্দেশ্য ছিল জননিরাপত্তা বিলটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। এই বোমা ফাটার ঘটনায় কেউ আহত হয়নি, কারণ বোমাটি এমনভাবে তৈরী হয়েছিল যাতে এর বিস্ফোরণে কোন প্রাণহানি না হয়। ভীতিপ্রদর্শনই ছিল এই বোমা ফাটানোর উদ্দেশ্য। সন্ত্রাসবাদীদের একটা প্রচারপত্রে (leaflet) বলা হয়েছিল—এসেম্বলীতে যেসব বধির ব্যক্তি

আছেন, কম কানে শোনেন, তাদের আমাদের প্রতিবাদ শুনিয়ে দেওয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। বোমা নিক্ষেপের পর ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারতেন কিন্তু তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক ধরা দেন। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল আদালত-ঘরে অভিযুক্ত আসামীরূপে বৈপ্লবিক বাণী প্রচার। বাঙলায়ও সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কর্মধারার পুনরভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। 1930 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়েছিল। অত্যাচারী ব্রিটিশ কর্মচারীদের উপর আক্রমণও এই সময় সুরু হয়। বাঙলা দেশে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠেছিল। বহু তরুণীও এই আন্দোলনে নেমে পড়েছিল।

সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব অতি কঠোরভাবে দমনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। বিপ্লবীদের মধ্যে বহুজনকে গ্রেপ্তার করে অনেক-গুলি ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এই মামলাগুলি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। ভগৎ সিং ও অন্য কয়েকজনকে পুলিশ কর্মচারী হত্যার জন্যও আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিচার-কালে আদালতে এই তরুণ বিপ্লবীদের প্রাণের মায়া ত্যাগসূচক নির্ভীকতা ও সাহসিকতাপূর্ণ বিবৃতিগুলি দেশবাসীর হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। জেলখানার ভয়াবহ অব্যবস্থার প্রতিবাদে তাদের অনশন ব্রত গ্রহণ দেশে গভীর উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে এরা সম্মানজনক ও ভদ্র ব্যবহার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রত্যাশা করেছিল। এই অনশন প্রতিবাদ চলা কালে, যতীন্দ্রনাথ দাস নামে এক তরুণ দীর্ঘ ৬৩ দিন অনশন পালন করে মৃত্যুবরণ করেন। যতীন দাসের অনশনে মৃত্যুবরণ একটা তাৎপর্যময় ঐতিহাসিক ঘটনা। নিজের প্রাণ আহুতি দিয়ে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। জনসাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে 1931 খ্রীষ্টাব্দের একত্রিশে মার্চ ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত এই তিন তরুণ বিপ্লবী স্বদেশপ্রেমিক জেল সুপারিনটেনডেণ্টকে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে "শেষ যুদ্ধের দিন এগিয়ে আসছে। এই যুদ্ধই পরিণাম স্থির করে দেবে। আমরা এই সংগ্রামে যে যোগ দিয়েছিলাম তজ্জন্য আমরা গর্বিত।" ভগৎ সিংয়ের শেষ দুটি চিঠিতে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কর্মধারার

উদ্দেশ্য যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা সে কথার উল্লেখ ছিল। তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের কৃষক-সমাজকে শুধু বিদেশী শাসন মুক্তি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা চলবে না, সেই সঙ্গে তাদের ভূস্বামী ও ধনিকশ্রেণীর হাত থেকেও মুক্তি অর্জন করতে হবে।" 1931 খ্রীষ্টাব্দের তেসরা মার্চ তারিখে তাঁর সর্বশেষ লেখা চিঠিতে তিনি ঘোষণা করে যান যে ভারতের সংগ্রাম ততদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত "মুষ্টিমেয় শোষণকারীর দল সাধারণ মানুষের শ্রমার্জিত অর্থ নিজেদের মুনাফা বাড়াবার জন্য শোষণ করতে থাকবে। এই শোষণকারীর দল পুরোপুরি ব্রিটিশ হতে পারে, আমাদের দেশীয় মানুষ ও ব্রিটিশের মিশ্রিত গোষ্ঠীও হতে পারে এমনকি একান্তভাবে এই শোষণকারীর দল ভারতীয়ও হতে পারে।" অর্থাৎ শোষণকারী যেই হক না কেন শোষণ বন্ধ করতেই হবে এই ছিল ভগৎ সিং-এর শেষ বাণী। দেশবাসীর তরফ থেকে এই বীর বিপ্লবীদের প্রাণদণ্ড মকুব করে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আবেদনে হৃদয়হীন সরকারী কর্তৃপক্ষ কোন সাড়া দেয়নি। দেশবাসীর মধ্যে এই ঘটনায় বিশেষ ক্ষোভ জন্মেছিল। এই তরুণ বিপ্লবীদের গভীর দেশপ্রেম, অজেয় সাহস, দৃঢ়সঙ্কল্প ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব দেশবাসীর মানসিকতায় একটা আলোড়ন এনে দিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কর্মধারা দেশে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় গতিবেগের সঞ্চার করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রবাহও এনে দিয়েছিল। তবে এই বৈপ্লবিক কাজকর্মের গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে এসেছিল। কিছুকাল পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন স্থানে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের স্ফুরণ অবশ্য দেখা যেত। 1931 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুলিশের সঙ্গে এক সঙ্ঘর্ষে এলাহাবাদের একটি সাধারণ উদ্যানে চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিশের গুলির আঘাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এলাহাবাদের এই উদ্যান বা পার্কটি পরবর্তীকালে আজাদ পার্ক বা উদ্যান নামে চিহ্নিত হয়েছে। 1933 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সূর্য সেন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন, ফাঁসিকাষ্ঠে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

এইভাবে কুড়ির দশকের শেষ দিকে দেশে একটি নূতন ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশ জেগে উঠেছিল। পরবর্তী কালে, এই সময়ের কথা প্রসঙ্গে ভাইসরয় লর্ড আরউইন লিখেছিলেন যে "একটা নূতন শক্তি ভারতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিশ বা ত্রিশ বছর আগের ভারত সম্বন্ধে যাঁরা অভিজ্ঞতার দাবি করতে পারেন তাঁদের পক্ষে এই নবজাগ্রত চেতনা বা শক্তির সঠিক তাৎপর্য-

নির্ণয় করা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে সরকারী কর্তৃপক্ষ এই নবজাগ্রত শক্তিগুলিকে দমন করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি।" আগেই বলা হয়েছে কি ভীষণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দমন করা হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান শিল্প-শ্রমিক সঙ্ঘ ও সাম্যবাদী আন্দোলনের উপরেও কর্তৃপক্ষ নির্মম আক্রমণ স্থরু করেছিল। 1929 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একত্রিশ জন বিশিষ্ট শ্রমিক ও সাম্যবাদী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এই একত্রিশ জন বন্দীর মধ্যে তিনজন ইংরাজও ছিল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে এদের দীর্ঘস্থায়ী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

সাইমন কমিশন বর্জন

1927 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ভারতের জন্য একটি সংবিধান গঠনকারী কমিশন বা সংস্থা নিযুক্ত হয়েছিল (Indian Statutory Commission)। এই কমিশনের সভাপতি সার জন সাইমনের নামানুসারে ইতিহাসে এটি 'সাইমন কমিশন' নামে খ্যাত হয়েছে। ভারতের শাসনতন্ত্র সংস্কারের বিষয়টি খতিয়ে দেখাই ছিল এই কমিশন নিয়োগের উদ্দেশ্য। এই কমিশনের সকল সদস্যই ছিল ইংরাজ। সাইমন কমিশন গঠনের সংবাদ ভারতে পৌছানো মাত্র সর্বস্তরের ভারতবাসীই এই প্রস্তাবের প্রতি ধিক্কার জ্ঞাপন করেছিল। ভারতবাসীর ক্ষোভের কারণ এই ছিল যে ভারতের শাসনতন্ত্র ভবিষ্যতে কেমন হওয়া উচিত সেই অনুসন্ধানের ভার যে দলের উপর দেওয়া হয়েছিল, তাতে কোন ভারতবাসীরই স্থান হয়নি। এটা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে কতকগুলি বিদেশীর হাতেই ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণের ভার দেওয়াই বিদেশী-সরকারের উদ্দেশ্য। অন্য-ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই কমিশন নিয়োগের কাজটি স্বায়ত্তশাসননীতি বিরুদ্ধ ছিল। তাছাড়া কোন ভারতবাসীকে এই কমিশনভুক্ত না করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছাপূর্বক ভারতবাসীর আত্মসম্মান বোধে আঘাত করতে চেয়েছিল। 1927 খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ আন্সারীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেস এই কমিশন বর্জনের প্রস্তাব নিয়েছিল। বলা হয়েছিল যে প্রতি পদে পদে এমনকি যে কোন উপায়ে এই কমিশনকে বর্জন করতে হবে। মুসলিম লীগ এবং হিন্দুসভাও কংগ্রেসের এই বর্জননীতি সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বস্তুতঃ সাইমন কমিশন অন্ততঃ সাময়িকভাবে দেশের সকল দলের মধ্যেই

একটা ঐক্য এনে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ঐক্যমত স্থাপনের সং উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলিম লীগ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে যৌথ নির্বাচন নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিল, তবে এই সঙ্গে একটি দাবিও রাখা হয়েছিল যে মুসলমানদের জন্য কয়েকটি আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে।

ব্রিটিশের স্পর্ধার সমুচিত উত্তর দেওয়ার জন্য ভারতের সর্বদল ও সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ স্থির করেছিলেন যে তাঁরা সকলে মিলিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীন ভারতের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করবেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে দিল্লীতে পরে পুনাতে (পুনে) একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহুত হয়েছিল। এই সম্মেলন কর্তৃক একটি উপ সমিতি গঠিত হয়েছিল। মতিলাল নেহেরু এই উপ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, আলি ইমাম, তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং সুভাষচন্দ্র বসু। এই উপ সমিতি 1928 খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। এই প্রতিবেদনটি 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে খ্যাত। এই প্রতিবেদনের সুপারিশ ছিল যে অবিলম্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রেখেই ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা (Dominion Status) দিতে হবে। ভাষাভিত্তিকরূপে প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হবে, এবং এই প্রদেশগুলিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রশাসনকে জনগণের নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদগুলির কাছে দায়ী থাকতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যৌথ নির্বাচন চলবে, তবে দশ বৎসর কালের জন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কিছু আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। প্রদেশগুলির সহযোগে ভারতে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে (Fedaration) ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, 1928 এর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে এই রিপোর্টটি গৃহীত হতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক মনোভাবদুষ্ট কয়েকজন নেতা এই রিপোর্টের প্রস্তাবগুলিতে আপত্তি তুলেছিলেন, এঁরা ছিলেন মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, শিখ-সঙ্ঘ প্রভৃতি দলের সদস্য। মুসলিম লীগভুক্ত জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছিল। মহম্মদ আলি জিন্না এই সম্মেলনে তাঁর 'চোদ্দ দফা দাবি' পেশ করেন। এই দাবিগুলির অন্যতম দাবি ছিল যে যৌথ নির্বাচন চলবে না, ধর্মীয় ভিত্তিতে পৃথক্ নির্বাচন করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে

হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় মুসলান সদস্যদের আসন দিতে হবে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে হবে। হিন্দু মহাসভার সদস্যেরা মুসলমানদের পক্ষপাতী এই অজুহাতে রিপোর্টটি সরাসরি অগ্রাহ্য করে দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদী গোষ্ঠীগুলি এইভাবে একটা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে বানচাল করে দিয়েছিল।

নিছক শাসনতন্ত্র সংস্কারমূলক যেসব প্রস্তাব উঠেছিল সেইগুলিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য এমন কিছু গভীর ছিল না। সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছায় বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা এবং ব্যক্তিবিশেষের মৌলিক অধিকার সর্বোপরি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণের দিকে এঁদের পূর্ণ মনোযোগ ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই জাতীয়তা-বাদী নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানসিকতা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেননি। এই সংখ্যালঘুগণ বিশেষভাবে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে একটা অহেতুক ভয় মনে মনে পোষণ করে আসছিল। আধুনিক যুগসম্মত রাজনৈতিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক পরিচয় স্থাপিত হলে মুসলমানদের মধ্য থেকে এই অহেতুক আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই ব্যবহারিক রাজনৈতিক শিক্ষায় বলীয়ান মুসলমান সমাজ তখন প্রতিক্রিয়াশীল নেতা অথবা বিদেশী শাসকদের প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারত না। বহু জাতীয়তাবাদী নেতা এই সত্যটি পরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এসম্বন্ধে 1933 খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহেরু লিখেছিলেন "একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আশঙ্কা জেগে উঠা অযৌক্তিক নয়, অন্ততঃ এদের ভয়ের কারণটা যে বোঝা যায় না, এমন নয়।......ভারতের হিন্দু সমাজের একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে, কারণ তারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়; তাছাড়া আর্থিক ও শিক্ষাগত ব্যাপারে তারা মুসলমানদের চেয়ে অনেকটা উন্নত। (হিন্দু) মহাসভা এই বিশেষ দায়িত্ব পালন না করে এমনভাবে কাজ করে চলেছে যার দ্বারা মুসলমানদের মনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে, হিন্দুদের তারা মোটেই বিশ্বাস করতে পারছে না। একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রাদুর্ভাব, আর একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের

অবসান ঘটাতে পারে না, কালক্রমে দুটিই স্ফীততর হয়ে উঠার সম্ভাবনা থেকে যায়।"

1934 খ্রীষ্টাব্দে লিখিত আর একটি প্রবন্ধে জওহরলাল নেহেরু এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন থেকে হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে ভীতির ভাব মুছে ফেলাই আমাদের পক্ষে কর্তব্য। মুসলমান জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কোন ভাবেই হোক, তাদের ইচ্ছানুযায়ীরূপে তাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।" এমনকি জিন্নাও এক সময়ে জওহরলালের এই মতের সমর্থন করেছিলেন। 1931 খ্রীষ্টাব্দের একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন "আমার অবস্থা এখন এই দাঁড়িয়েছে যে আমি বরং পৃথক নির্বাচন প্রথা সম্বন্ধেও পুনর্বিবেচনায় সম্মতি দেব। তবে এই আশায় এবং এই বিশ্বাস নিয়ে যে যখন আমরা নূতন শাসনতন্ত্র পরিচালন করব তখন হিন্দু ও মুসলমানগণ পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ভীতি থেকে মুক্ত থাকবে। স্বাধীনতালাভের পর আমরা সময়োচিত দায়িত্ব গ্রহণ করব। এটা আশা করা যায় যে তখন পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রয়োজন অতি দ্রুত ফুরিয়ে আসবে।"

যাই হোক্ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের ব্যাপারে জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদ ঘটেছিল এবং এক্ষেত্রে যা করণীয় ছিল তা করা হয়নি। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের উপর হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তরফ থেকে ক্রমাগত মুসলিম তোষণনীতি বর্জনের চাপ পড়ছিল, এতে এঁরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া এঁদের মনে হয়েছিল মুসলিম সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক একটি অলীক কল্পনা। এঁরা আরও ধরে নিয়েছিলেন যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতৃবৃন্দের পেছনে বৃহত্তর মুসলিম সমাজের সমর্থন নেই, কাজেই এই 'ভুঁইফোঁড়' নেতাদের দাবিগুলি অনায়াসে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। এইখানে একটা খুব ভুল হয়েছিল। মৌলানা মহম্মদ আলির মত জাতীয়তাবাদী নেতাও এই অভিযোগ তুলেছিলেন যে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ পূর্ণ স্বাধীনতা দাবির ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ রফা করতে ইচ্ছুক অথচ তাদের নিজ দেশবাসী সংখ্যালঘুদের দাবিগুলি মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের মনোভাব অনমনীয়, কোন আপোষ রফায় তাদের অভিরুচি নেই। এই সময় মৌলানা আজাদ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন "রক্ষা-কবচ বা বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ চাওয়াটা মুসলমানদের পক্ষে

নির্বুদ্ধিতা, আবার এই দাবিগুলি মেনে নিতে অস্বীকার করাটা হিন্দুদের পক্ষে আরও বেশী বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক।" যাই হোক, এই ঘটনার পর থেকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব ধীরে ধীরে বেশ তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

এটা মনে রাখতে হবে যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে একটা বেশ মৌলিক পার্থক্য ছিল। জাতীয়তাবাদীগণ বিদেশী শাসকদের সঙ্গে যে রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল দেশের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন। হিন্দু বা মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কর্মপন্থা ছিল ভিন্ন ধরনের। এদের দাবিগুলি জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করা হলেও, এরা সাধারণভাবে তাদের দাবিগুলি যাতে গৃহীত হয় তার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী সরকারের সমর্থন সংগ্রহের চেষ্টা করত। আবার সরকারী অনুগ্রহ পাওয়ার চেষ্টাও এরা করত। কংগ্রেস নেতা বা কংগ্রেসের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত থেকে সরকার পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতায়ও এরা কুণ্ঠিত হত না।

সর্বদল সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির পরিণাম দেশে খুব একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারেনি। এই সময়ের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা দাঁড়িয়েছিল 'সাইমন কমিশনের' বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ। এই কমিশনের সদস্যগণ ভারতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেশে একটা শক্তিশালী বিক্ষোভ-আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই বিক্ষোভ-আন্দোলন জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে একটা নূতন গতিবেগের সঞ্চার করেছিল। এই আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও একটা ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের তেসরা তারিখে কমিশন সদস্যবৃন্দ বোম্বাই-এ পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতব্যাপী 'হরতাল' পালিত হয়েছিল। এর পর কমিশন সদস্যদের ভারতের যে কোন শহরে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালোপতাকা সহ বিক্ষোভ মিছিল দ্বারা অভ্যর্থিত করা হত আর জনতার মধ্য থেকে ধ্বনি উঠত 'সাইমন ফিরে যাও' (Go Back Simon)। সরকারী কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করতে বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছিল। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারও চলত।

সাইমন কমিশন উপলক্ষে এই বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে নিরবচ্ছিন্ন

কোন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্য জেগে উঠেনি। এই সময়ে গান্ধীজী হয়ে উঠেছিলেন জাতীয় সংগ্রামের অবিসম্বাদী অথচ অঘোষিত সেনাপতি। গান্ধীজীর মনে সংশয় জেগেছিল যে ঠিক সেই সময় দেশ বৃহত্তর সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত কিনা? কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই সময় এত বিপুল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল যে মনে হয়েছিল এর গতিরোধ কারো পক্ষে সম্ভব নয়। দেশবাসী যে বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য অধীর হয়ে উঠেছে তার লক্ষণগুলি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল।

পূর্ণ স্বরাজ

দেশের এই পরিস্থিতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যেও গভীর উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। গান্ধীজী আবার সক্রিয় রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 1928 খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। অতঃপর তিনি জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি সৃষ্টির দিকে মন দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন অর্থাৎ বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের কংগ্রেসের মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্তি করণই এই সময় তাঁর প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল। 1929 খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের জন্য জওহরলাল নেহেরুকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই অধিবেশনটি একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনের একটা ঘটনা দেশের মানুষের মনে বেশ একটা ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেছিল কারণ এই অধিবেশনে পূর্ব বৎসরের (1928) নির্বাচিত সভাপতি মতিলাল নেহেরুর স্থানে তাঁর পুত্র জওহরলাল নেহেরু সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ পরিবারের গৌরব এমনভাবে আর সূচিত হয়নি।

কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন একটি নূতন বেপরোয়া চরমপন্থী চিন্তাকে রূপায়িত করেছিল। এই সর্বপ্রথম এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে পূর্ণ-স্বরাজ বা পূর্ণ-স্বাধীনতাই জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনের লক্ষ্য। 1929 খ্রীষ্টাব্দের একত্রিশে ডিসেম্বর নূতন ভাবে গৃহীত ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করা হয়েছিল ও পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ 1930 খ্রীষ্টাব্দের ছাব্বিশে জানুয়ারী দিনটি স্বাধীনতা দিবসরূপে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়েছিল যে অতঃপর প্রতি বৎসর এই দিনটি 'স্বাধীনতা দিবস' রূপে পালন করা হবে এবং এই দিনটিতে ভারতবাসী এই সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ

করবে যে ব্রিটিশ শাসন মেনে নেওয়া ঈশ্বর এবং মানুষের বিরুদ্ধাচরণ, অর্থাৎ এটা মহাপাপ। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। তবে এই আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি বিশদভাবে তখনই ব্যাখ্যা করা হয়নি। এই কর্মসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব মহাত্মা গান্ধীর উপর অর্পিত হয়েছিল এবং কংগ্রেস-সংগঠনকে তাঁর ইচ্ছামত সংগ্রামে লিপ্ত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর গান্ধীজীর নেতৃত্বে আর একবার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল। দেশবাসী আর একবার স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল এবং এই সঙ্কল্প গ্রহণ দেশবাসীর মনে নূতন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন

1930 খ্রীষ্টাব্দের বারই মার্চ সুবিখ্যাত ডাণ্ডি অভিযানের দ্বারা দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হয়। আটাত্তর জন মনোনীত অনুচর সঙ্গে নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে প্রায় দুইশত মাইল পায়ে হেঁটে গান্ধীজী ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করেন। ডাণ্ডি গুজরাট্ সমুদ্রতটে অবস্থিত একটি গ্রাম। ডাণ্ডি পৌছে গান্ধীজী তাঁর অনুচরবৃন্দ সহ সরকারের লবণ আইন ভঙ্গ করে সমুদ্রজল থেকে লবণ প্রস্তুত করেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে লবণ প্রস্তুতের কাজটি ছিল একটি প্রতীক বা উপলক্ষ্য মাত্র। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়ে দেওয়া যে ভারতবাসী আর ব্রিটিশের গড়া আইন মেনে চলতে অনিচ্ছুক। ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকতেও আর তারা চায় না। গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন—"ব্রিটিশ শাসন এই মহান দেশ ভারতবর্ষকে, নৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের পক্ষে এক অভিশাপ বলে মনে করি। আমি এই সরকারের ধ্বংস সাধন করতে চলেছি···রাজদ্রোহ এখন আমার কাছে ধর্মীয় কর্তব্য। আমাদের এই সংগ্রাম অহিংস। আমরা কারও প্রাণহানি ঘটাব না। তবে সরকারী শাসনকে ভারতের মাটি থেকে উচ্ছেদই এখন আমাদের পবিত্র কর্তব্য।" এই আইন অমান্য আন্দোলন দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। দেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষ হরতাল, বিক্ষোভ প্রদর্শন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও খাজনা বন্ধ আন্দোলনে যোগদান করেছিল। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এই নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। দেশের

নানাস্থানে কৃষকেরা জমির খাজনা বা অন্যান্য সরকারী কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এই আন্দোলনের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল আন্দোলনে বহু-সংখ্যক নারীর যোগদান। গৃহকোণের মায়া ত্যাগ করে এরা সত্যাগ্রহে যোগদান করেছিল। বিদেশী বস্ত্র এবং মদের দোকানে এরা পিকেটিং-এ যোগ দিত, যারা বিদেশী বস্ত্র বা মদ্য কিনতে চায় তাদের এই মেয়েরা বাধা দিত। পুরুষ সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শক শোভাযাত্রায় যোগ দিত।

এই আন্দোলনের ঢেউ ভারতের সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পর্যন্ত পৌছে সেখানকার দুঃসাহসী এবং শক্তিশালী পাঠান অধিবাসীদেরও প্রভাবিত করে তুলেছিল। সাধারণত 'সীমান্ত গান্ধী' নামে পরিচিত খান্ আব্দুল গফ্ফার খানের নেতৃত্বে 'খুদাই খিদমতগার' নামে একটি সংস্থা সংগঠিত হয়েছিল। 'খুদাই খিদ্মতগার' কথাটি আক্ষরিক অনুবাদে ঈশ্বরের সেবক বোঝায়। তবে সাধারণভাবে এদের 'লাল কুর্তা' (Red-Shirts) সংগঠন বলা হত। এরা অহিংসভাবে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিল। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার শহরে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে-ছিল। ব্রিটিশ সরকারের অধীন দুটি গাড়োয়ালী সৈন্যবাহিনীকে পেশোয়ারে একটা বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী শোভাযাত্রার উপর গুলি বর্ষণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। গাড়োয়ালী সৈন্যেরা এই গুলি চালনার আদেশ পালন করেনি। সামরিক বাহিনীর সৈন্যদের পক্ষে এটা গুরুতর অপরাধ। সামরিক আদালতে এই ধরনের অপরাধের বিচার হয় এবং বিচারে অভিযুক্তকে সুদীর্ঘ কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই ঘটনা থেকে এটা বেশ বোঝা গিয়েছিল যে ইংরাজের বেতনভুক্ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতেও জাতীয়-চেতনার উন্মেষ হয়েছে, অথচ এই ভারতীয় সামরিক বাহিনীই ছিল ব্রিটিশ শাসনের এক প্রধান স্তম্ভ।

এইভাবে ভারতের পূর্বতম প্রান্ত থেকেও জাতীয় চেতনা জাগরণের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। মণিপুরের অধিবাসীগণ এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। নাগাভূমিকে (নাগাল্যাণ্ড) এক দুঃসাহসী নাগা তরুণীর আবির্ভাব হয়েছিল। এর নাম রাণী গাইডিনলিউ (Gaidinliu), মাত্র তের বছর বয়সের এই বালিকা কংগ্রেস এবং গান্ধীজীর আহ্বানে বিদেশী শাসনের

প্রতিবাদে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধরেছিল। এই তরুণী রাণী গাইডিনলিউ 1932 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়ে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এই তরুণীর উজ্জ্বল যৌবনের দিনগুলি আসামের বিভিন্ন কারাগারের অন্ধকার ঘরে অপচিত হয়েছিল। 1947 খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর এঁর কারা-মুক্তি ঘটেছিল। 1937 খ্রীষ্টাব্দে এঁর নাম উল্লেখ করে জওহরলাল নেহেরু লিখেছিলেন যে, "এমন একদিন আসবে যেদিন ভারতবাসী তাঁকে স্মরণ করবে। শুধু তাই নয় তাঁকে আমরা বরণীয় করে তুলব।"

আগে সরকারী পক্ষ যেভাবে জাতীয় আন্দোলন দমন করেছিল সেই ভাবেই বর্তমান আন্দোলনকে দমন করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। এই তীব্র দমননীতির অঙ্গ ছিল নিরস্ত্র জনতার উপর নির্মম লাঠি চালনা ও গুলি বর্ষণ। গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা সহ নব্বই হাজার সত্যাগ্রহীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনি ঘোষিত করা হয়েছিল। কঠোর 'সেনসর' প্রথা প্রয়োগ করে জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। সরকারী হিসাব মত 110 জনেরও অধিক ব্যক্তি পুলিশের গুলির আঘাতে প্রাণ হারিয়েছিল, আহতের সংখ্যা ছিল 313এরও অধিক। বেসরকারী হিসেবে পুলিশের গুলির আঘাতে মৃতের সংখ্যা 110 থেকে অনেক বেশী ধরা হয়েছিল। এছাড়া পুলিশের লাঠির আঘাতে সহস্র সহস্র ব্যক্তির মাথা ও হাড়গোড় ভেঙ্গেছিল। এই পুলিশী নির্যাতনের তাণ্ডবলীলা দক্ষিণ ভারতে ভয়াবহরূপে অনুভূত হয়েছিল। শুধু-মাত্র গান্ধী টুপি অথবা খাদি বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি দেখলেই পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করত। অবস্থা অসহ্য হয়ে উঠায় অন্ধ্রের এলোরা নামক স্থানে জনসাধারণ পুলিশী নির্যাতন প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিল। এদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করায় বেশ কিছু ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটেছিল।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উদ্যোগে 1930 খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রথম একটি 'গোল-টেবিল' বৈঠক বা সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মুখপাত্রগণ একটি গোলটেবিল ঘিরে মুখোমুখি একসঙ্গে বসে সাইমন কমিশন শাসন সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রতি-বেদন দিয়েছিল সেই সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই সম্মেলন বর্জন করেছিল। সুতরাং এই সম্মেলনের প্রস্তাবাদি কোনো কাজেই লাগেনি। তার কারণ সুস্পষ্টই ছিল। ভারত সম্বন্ধীয় যে কোন

আলোচনা সভায় জাতীয় কংগ্রেসের অনুপস্থিতিটা রাম ছাড়া রামলীলা অভিনয়ের মতই অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সরকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এখন কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আর একটি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন এই বোঝাপড়ার উদ্দেশ্য ছিল। শেষ পর্যন্ত লর্ড আরউইন এবং গান্ধীজী 1931 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির সর্ত এই ছিল যে অহিংস সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং এর পরিবর্তে কংগ্রেসকে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে। এই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সম্মতি দিয়েছিল। বহু কংগ্রেস নেতা বিশেষ করে বাম-ঘেঁষা তরুণ দল গান্ধী আরউইন চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন কারণ এই চুক্তিতে সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতীয়তাবাদীদের কোন একটি প্রধান দাবিও মেনে নেওয়ার আভাস ছিল না। ভগৎ সিংও তাঁর দুই সহকর্মীকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেবার জন্য সরকার পক্ষের নিকট যে দাবি পেশ করা হয়েছিল এমনকি সেটিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজীর মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে লর্ড আরউইন তথা ব্রিটিশ সরকার ভারতের দাবিগুলি আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করতে প্রস্তুত, সুতরাং এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। গান্ধীজীর 'সত্যাগ্রহ' দর্শনের একটা সূত্র এই ছিল যে যার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সে যে মত পরিবর্তন করেছে বা তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছে তা জানানোর সুযোগ তাকে দিতে হবে। কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে তিনি কংগ্রেসের নেতাদের দিয়ে গান্ধী-আরউইন চুক্তিটি গ্রহণ করিয়ে নিয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনটি আর একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। ভারতবাসীর মৌলিক অধিকার ও জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মসূচি এই অধিবেশনেই প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়েছিল। একটি প্রস্তাবে ভারতের প্রতিটি মানুষের জন্য মৌলিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। ভারতের অতি প্রয়োজনীয় ও প্রধান প্রধান শিল্পোদ্যোগ ও চলাচল ব্যবস্থাকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ছিল অপর একটি প্রস্তাবের মূল মর্ম। এই প্রস্তাবের সঙ্গে গৃহীত অপরাপর সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব ছিল শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি, কৃষকদের স্বার্থে ভূমিসংস্কারমূলক আইন সংস্কার, বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিজনের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

প্রবর্তন। করাচি অধিবেশনে এই মর্মে আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ভাষা ও বর্ণমালাগুলি বজায় রাখা হবে, এবং যে ভাষাভাষী মানুষ যেখানে বাস করে তাদের স্বার্থও সংরক্ষিত হবে।

1931 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। গান্ধীজীর জোরালো যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার ভিত্তিস্বরূপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে রেখে ভারতকে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন বা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্ মঞ্জুর করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিল, অথচ এটাই ছিল কংগ্রেসের ন্যূনতম দাবি। গান্ধীজীর ভারত প্রত্যাবর্তনের পর জাতীয় কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করেছিল।

এই সময়ে ভারতে নূতন ভাইসরয় বা গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিংডন কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন। এঁর নেতৃত্বাধীন সরকার কংগ্রেস আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। বস্তুতঃ সরকারী শাসনযন্ত্র বা ব্যুরোক্রেসি জাতীয় আন্দোলন অবদমনে কোনদিনই নিষ্ক্রিয় থাকেনি। এমনকি গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরের ঠিক পরেই অন্ধ্রের পূর্ব গোদাবরী অঞ্চলে পুলিশের গুলিতে একটি জনতার মধ্য থেকে চারজন নিহত হয়েছিল। এদের অপরাধ ছিল এই যে এদের সঙ্গে গান্ধীজীর প্রতিকৃতি ছিল। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধীজী ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকেও 'বে-আইনি' ঘোষণা করা হয়েছিল। দেশে প্রচলিত আইনকানুনগুলি তুলে নিয়ে জরুরী আইনের (Special ordinances) সাহায্যে দেশের প্রশাসন চালানো হয়েছিল। পুলিশ ন্যায়-ধর্মের কোন পরোয়া না করে নির্লজ্জভাবে দেশবাসীর উপর অত্যাচার করতে নেমেছিল। বহু স্বাধীনতা-সংগ্রামীর উপর এরা অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল। একলক্ষেরও উপর সত্যাগ্রহীকে বন্দী করা হয়েছিল। বহু ব্যক্তির জমি-জায়গা, বাড়ী-ঘর ও অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী সাহিত্য প্রচার নিষিদ্ধ হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকেও কঠোর নিয়ন্ত্রণের (সেন্সর) সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

পরিশেষে এই সরকারী দমননীতিরই জয় হয়েছিল, তার মূলে ছিল সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ নিয়ে ভারতের নেতাদের অন্তর্বিরোধ। তীব্র

দমননীতির প্রকোপে আইন অমান্য আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে এসেছিল। রাজনৈতিক আশা ও উদ্দীপনা মুছে গিয়ে হতাশা ও অবসাদ দেশবাসীর মনকে গ্রাস করে ফেলেছিল। সরকারীভাবে কংগ্রেস 1933 খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 1934 খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়। গান্ধীজী আর একবার সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সময় পদত্যাগের কারণে কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষে নেমে এসেছিল।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতি (1935-1939)

কংগ্রেস যখন সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত, সেই অবসরে 1932 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন সুরু হয়। বলা বাহুল্য প্রথমবারের মত এবারেও এই বৈঠকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অনুপস্থিত ছিল। এই সম্মেলনের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে পরিশেষে 1935 খ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্নমেণ্ট আইনটি গৃহীত বা বিধিবদ্ধ হয় (Govt of India Act)। এই আইনে সর্বভারতীয় একটি যৌথ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট গঠনের ব্যবস্থা ছিল। ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সমাহারে কেন্দ্রীয় যৌথ রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় বা যৌথ রাষ্ট্রের জন্য দুইকক্ষ যুক্ত ব্যবস্থাপক সভা স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়, তবে এই দুই কক্ষেই দেশীয় রাজ্য প্রতিনিধিদের সংখ্যা দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত রকম বেশী ধরা ছিল, অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরাই উভয় কক্ষে যাতে সংখ্যাগুরু থাকতে পারে এমন প্রস্তাব করা হয়েছিল। তারপর—দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছিল একটি বিশেষ রাজ্যের রাজা বা শাসকের মনোনয়ন। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা দুটিতে পাঠাতে পারবে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ভারতের অংশগুলি থেকে চোদ্দ শতাংশ মাত্র মানুষকে কেন্দ্রীয় সভাগুলির জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ

ব্রিটিশ ভারতের শতকরা চোদ্দজন মানুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয়দের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ বা সভায় অত্যন্ত কম আসন দিয়ে দেশীয় রাজা বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়ার পেছনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের গূঢ় অভিসন্ধি এই ছিল যে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ 'যো হুকুম' প্রতিনিধিরা জাতীয়তাবাদীদের দাবিদাওয়াগুলি ভোটের সংখ্যাধিক্যের জোরে নস্যাৎ করে দেবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সরকারী কর্তৃপক্ষের মনোনীত প্রতিনিধিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাতে থাকে তার ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু কার্যতঃ এই সভা বা পরিষদগুলির হাতে বিশেষ কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। এই পরিষদ বা সভাকে প্রতিরক্ষা বা বিদেশ-নীতি নিয়ন্ত্রণের কোন প্রকার ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। একমাত্র গভর্নর-জেনারেলের উপর অন্যান্য জরুরী কাজকর্মের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। ভারত শাসন আইনে গভর্নর-জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের উপর। স্বাধীন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা পার্লামেন্টের কাছে গভর্নর-জেনারেল বা প্রাদেশিক গভর্নরদের কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া থাকে। অথচ এই নূতন ভারত শাসন আইনে গভর্নর-জেনারেল বা প্রাদেশিক গভর্নরদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করার সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে এদের বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক রাখা হয়েছিল। প্রদেশগুলির উপর কিছু বেশী অধিকার অর্পিত হয়েছিল। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের কাছে দায়ী রেখে মন্ত্রিদের হাতে প্রদেশের প্রশাসনিক সর্ববিধ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছিল। তবে এই সঙ্গে প্রাদেশিক গভর্নরদের হাতে কিছু বিশেষ ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল। ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত যে কোন প্রস্তাব বা আইন নাকচ করে নিজের মনোমত আইন চালু করার অধিকার গভর্নরদের দেওয়া হয়েছিল। আর একটা বিষয়ও প্রাদেশিক গভর্নরের বিশেষ অধিকারভুক্ত রাখা হয়েছিল, এটা ছিল সিভিল সার্ভিস ও পুলিশের উপর কর্তৃত্ব। জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত ব্যবস্থাপক সভা বা মন্ত্রিদের এবিষয়ে নাক গলাবার কোন অধিকার দেওয়া হয়নি। এই নূতন ভারত শাসন আইন (1935) ভারতের জাতীয়তাবাদী মানুষদের প্রত্যাশা মোটেই পূরণ করতে পারেনি, কারণ এই নূতন শাসন-সংস্কার আইনেও সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মুষ্টি-

বদ্ধ থেকে গিয়েছিল। নূতন আইনেও সেই বিদেশী-শাসনের নাগপাশ শিথিল করা হয়নি। একমাত্র সুবিধা যা দেওয়া হয়েছিল তা হল এই যে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত কয়েকজন মন্ত্রিকে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অংশ নেওয়ার সুযোগ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই নূতন আইন বা য়্যাক্টকে 'পরিপূর্ণ হতাশাব্যঞ্জক'রূপে ঘোষণা করেছিল।

1935-এর ভারতশাসন আইনের কেন্দ্রীয় সরকারের বিকল্প 'যৌথ যুক্তরাষ্ট্র' বা 'ফেডারেল' ব্যবস্থাটি কার্যতঃ কোনদিনই প্রবর্তন করা হয়নি। তবে প্রাদেশিক সরকার গঠন সম্বন্ধে এই আইনের নির্দেশগুলি অতি দ্রুত প্রবর্তিত হয়েছিল। এই নূতন আইনের তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই নূতন আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তি এই ছিল যে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সকলের কাছে এই আইনের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করা হবে। নির্বাচন অন্তে বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা গিয়েছিল যে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরাই বিপুল সংখ্যক ভোটে জিতেছে। এটা দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত করে দিয়েছিল। 1931 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিগণ প্রদেশ শাসনের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। পরে আরও দুটি প্রদেশে কংগ্রেস অপর দলের সহযোগিতায় দ্বি-দলীয় (Coalition) মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল। একমাত্র বাঙ্‌লা ও পাঞ্জাব এই দুটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে ব্যর্থ হয়েছিল।

কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থার মৌলিক চরিত্র পরিবর্তন করা কংগ্রেস শাসিত প্রদেশের মন্ত্রিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, কারণ এমন সম্ভাবনাও ছিল না। বস্তুতঃ এইসব রাজ্যের মন্ত্রিগণ একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন স্ব স্ব প্রদেশে আনতে পারেননি। তবে 1935 খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকেও কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ দেশের মানুষের অবস্থার উন্নতিসাধনের বহু উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ তাঁদের প্রাপ্য বেতন 500·00 টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, এর চেয়ে অনেক বেশী বেতন তাঁদের আইনতঃ প্রাপ্য ছিল। এঁদের অনেকেই রেলের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতেন। জনসেবার ক্ষেত্রে এঁরা

সততার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। এই সততা দেশে বিরল হয়ে এসেছিল। এই কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ প্রাথমিক, বৃত্তিগত ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির দিকেও এঁদের লক্ষ্য ছিল। প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করে ও কুসীদজীবীদের অধিকার হ্রাস করে এঁরা দেশের চাষী সমাজের উপকার সাধন করেছিলেন। 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে এঁদের লক্ষ্য ছিল। 'পুলিশ ও গোয়েন্দা-রাজ' এঁদের শাসনকালে জনসাধারণকে আর আগের মত জ্বালাতন করতে সক্ষম হয়নি। সংবাদপত্রগুলিকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক সংস্থা বা ট্রেড্ ইউনিয়নগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়েছিল, এর ফলে শ্রমিকশ্রেণীর বেতনবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। বস্তুগত দিক থেকে যাই হোক না কেন, সবচেয়ে বেশী যা লাভ হয়েছিল, সেটা ছিল মানসিক। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলির মানুষেরা এটা মনে মনে অনুভব করতে পেরেছিল যে ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা পরাজিত হয়নি, স্বাধীনতার আস্বাদ তারা এখন কিছুটা অনুভব করতে পেরেছিল। এই কিছুদিন আগে ইংরাজের জেলে বন্দী ছিলেন এমনি কয়েকজন নেতা এখন প্রদেশের মহাকরণে বসে সরকার চালাচ্ছেন এই ঘটনাটা দেশের মানুষকে বেশ অভিভূত করেছিল।

193১ থেকে 1939 পর্যন্ত কতকগুলি রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলন একটা নূতন পথে পরিচালিত হয়েছিল।

সমাজবাদী চিন্তার বিকাশ

1930 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব লক্ষিত হয়েছিল। 1929 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি দেখা দিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমগ্র বিশ্বে অর্থনৈতিক অবনতি বা মন্দার বাজার দেখা দিয়েছিল। প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদন কমে গিয়েছিল, বৈদেশিক বাণিজ্যেও মন্দা দেখা দিয়েছিল। এর ফলে এইসব দেশে নিদারুণ অর্থসঙ্কট অনুভূত হয়েছিল। রুজি-রোজগারহীন বেকারের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। একটা সময়ে ব্রিটেন, জার্মানী ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ত্রিশ লক্ষ, ষাট লক্ষ ও একশ কুড়ি লক্ষ (3,6 and 12 Millions)। কিন্তু এই সময়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বা রুশ দেশের (U.S. S. R) অবস্থা দাঁড়িয়েছিল ঠিক এর বিপরীত। এখানে কোন অর্থনৈতিক মন্দা

দেখা দেয়নি। উপরন্তু 1929 ও 1936 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনান্তে তার শিল্প উৎপাদনের হার চারগুণ বৃদ্ধি করে ফেলেছিল। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রাদুর্ভাব হেতু, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা বেশ হ্রাস পেয়েছিল। এর ফলে বুদ্ধিমান মানুষেরা মার্ক্সবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যক মানুষের বিশেষভাবে তরুণ সমাজ এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে সমাজবাদী চিন্তাধারার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাশ্চাত্যের এই অর্থনৈতিক মন্দার আঘাতে ভারতে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 1932 খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে ভারতে কৃষিজাত পণ্যের দাম 50% ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। এই সুযোগে চাকুরীদাতারা চাকুরিয়াদের বেতন হ্রাসের উদ্যোগ নিয়েছিল। সারাদেশে কৃষক সমাজের মধ্য থেকে ভূমিসংক্রান্ত আইন সংস্কার, জমিদারি প্রথা বিলোপ, জমির খাজনা অথবা সেলামি হ্রাস এবং ঋণ-মকুব ইত্যাদির জন্য প্রবল দাবি উঠেছিল। কারখানা এবং বাগিচা শ্রমিকেরাও ক্রমাগত দাবি পেশ করে যাচ্ছিল যে তাদের কর্মক্ষেত্রের সুযোগসুবিধা বাড়াতে হবে এবং তাদের শ্রমিক-সঙ্ঘ গড়ে তোলা ও তার মারফৎ মালিক শ্রেণীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার অধিকার দিতে হবে। এই ধরনের আন্দোলনের ফলে শ্রমিক সংস্থা (Trade Union) আন্দোলন শহরাঞ্চলে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেশের নানাস্থানে বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশ, বিহার, তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল ও পাঞ্জাবে বহু কৃষকসভাও স্থাপিত হয়েছিল। কৃষকদের স্বার্থসংরক্ষণ এই কৃষকসভাগুলির উদ্দেশ্য ছিল। সর্বভারতীয় কৃষক সঙ্ঘ 'সারাভারত কৃষাণ-সভা' নামে 1936 খ্রীষ্টাব্দে সংগঠিত হয়েছিল। এই সময় থেকে কৃষক বা চাষী শ্রেণীর মানুষেরা অধিকতর সংখ্যায় জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে সুরু করেছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 1936 ও 1937 খ্রীষ্টাব্দে পর পর দুবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। 1938 ও 1939 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এঁদের নির্বাচন থেকে স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে কংগ্রেসে বামপন্থী বা বামঘেঁষা মনোভাব ক্রমশই প্রাধান্য লাভ করছে। পুরাতন মতবাদে বিশ্বাসী মানুষের প্রভাব কংগ্রেস সংগঠনে আর বিশেষ কার্যকর হচ্ছে না। 1936 খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের

লক্ষ্ণৌএ অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনই কংগ্রেসের আদর্শ হওয়া উচিত কারণ জাতীয় আন্দোলনের স্বার্থে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলেছিলেন যে মুসলিম সমাজকে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাবাদী নেতৃবৃন্দের প্রভাব মুক্ত করতে হলে কৃষক-শ্রমিক স্বার্থেই জাতীয় আন্দোলনকে পরিচালিত করতে হবে। তাঁর ভাষণের মর্ম ছিল এইরূপ "আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে বিশ্বের তথা ভারতের সমস্যাগুলির একমাত্র সমাধান সমাজতন্ত্রবাদের মাধ্যমেই সম্ভব। একথা বলতে গিয়ে সমাজতন্ত্রবাদের মানবিক মূল্যবোধের দিকটির প্রতিই শুধু আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকেনি। সমাজতন্ত্রবাদের অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ়, একথা ভেবেই আমি সমাজতন্ত্রবাদের প্রবর্তন চেয়েছি। এই সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের জন্য আমাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন আবশ্যক হবে। জমি-জমা ও শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে কায়েমি স্বার্থের অবসান প্রয়োজন হবে, সামন্ততান্ত্রিক জমিদার বা দেশীয় রাজ্যের নৃপতিকুলের স্বৈরাচারের মূলোচ্ছেদ করতে হবে। তার অর্থ হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন, তবে বেপরোয়া বা যথেচ্ছভাবে অবশ্যই তা করা হবে না। কৃষি বা শিল্পক্ষেত্রে মুনাফা লুঠের অবসান ঘটাতে হবে, এবং সর্ববিধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সকলের পক্ষেই হিতকর এমন একটা সমবায় পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। এই পরিবর্তন সাধনের জন্য শেষ পর্যন্ত আমাদের ব্যক্তিগত সহজাত প্রবৃত্তি, অভ্যাস এবং কামনা-বাসনাগুলিরও রূপান্তর বা সংস্কার প্রয়োজন হবে। এক কথায় বলতে গেলে, একটি নূতন ধরনের সভ্যতা আমাদের প্রবর্তন করতে হবে যা বর্তমান কালের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় করা অসম্ভব।"

কংগ্রেস সংগঠনের বাইরে এই সমাজতান্ত্রিকতার প্রভাব থেকে পি. সি. যোশীর নেতৃত্বে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অন্যদিকে আচার্য নরেন্দ্র দেব ও জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বা কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 1939 খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সভাপতি পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন। গান্ধীজী এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে তাঁর অনুগামীদের বিরোধিতার জন্য 1939 খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ পরিত্যাগ

করেন। তিনি তাঁর বামপন্থী অনুগামীদের নিয়ে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রবর্তন করেছিলেন।

কংগ্রেস ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ

বিশ্ব রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহ 1935 থেকে 1939 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মধারায় আর একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। 1835 খ্রীষ্টাব্দে জন্মলগ্ন থেকেই জাতীয় কংগ্রেস আফ্রিকা ও এশিয়ায় ব্রিটিশ স্বার্থে ভারতীয় সৈন্য ও ভারতের অর্থসম্পদ বিনিয়োগের বিরোধিতা করেছিল। ধীরে ধীরে কংগ্রেসের একটা নিজস্ব বিদেশ-নীতি গড়ে উঠেছিল, এই নীতি সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের বিরোধী ছিল। 1927 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জওহরলাল নেহেরু বিশ্বের নিপীড়িত জাতিসমূহের স্ব স্ব দেশ থেকে বিতাড়িত বিপ্লবী ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এই সম্মেলন বেলজিয়াম দেশের ব্রুসেলস্ (Brussels) শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাজনৈতিক কর্মী বা বিপ্লবীগণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক্ থেকে সাম্রাজ্যবাদ কবলিত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে এসে ব্রুসেলসে সমবেত হয়েছিলেন। এই সমাবেশ বা কংগ্রেসে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কর্মসূচি ও তার রূপায়ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ইউরোপের বহু বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এই কংগ্রেসে নেহেরু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "আমরা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারি যে পরাধীন বা অর্ধ-পরাধীন নির্যাতিত জাতিসমূহের সঙ্গে আমাদের (ভারতবাসীর) সমস্যাগুলি একই ধরনের, কাজেই আমাদের সংগ্রামও একই প্রকার। আমাদের বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা প্রায়ই এক, তবে কখনও কখনও এদের নাম ভিন্ন। তবে এদের অত্যাচারের ধরন একই প্রকার।"

ব্রুসেলসে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসের অধিবেশনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সংগঠন গঠিত হয় (League against Imperialism) জওহরলাল তার কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। 1927 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে গভর্নমেণ্টকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে ভবিষ্যতে ব্রিটেন যদি তার সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে ভারতবাসী তাতে অংশগ্রহণ করবে না।

1930 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেস পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিল। শুধু তাই নয়, এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি জাতীয় কংগ্রেস সমর্থনও জানিয়েছিল। এই সময়ে জাতিবৈরিতা (racialism) ও সাম্রাজ্যবাদী চেতনার চরম অভিব্যক্তিরূপে ইতালি, জার্মানী ও জাপানে যে 'ফ্যাসিস্ট' শক্তি বা ফ্যাসিবাদের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তীব্র ভাষায় তার প্রতি ধিক্কার জানিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইথিওপিয়া, স্পেন, চেকোস্লাভাকিয়া ও চীনের জনগণের আত্মরক্ষামূলক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রতিও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। 1937 খ্রীষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হওয়ার পর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন যে, ভারতের অধিবাসীগণ চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য জাপানে প্রস্তুত কোন দ্রব্য ব্যবহার করবে না। এই মর্মে ভারতের জনগণের কাছে আবেদনও জানানো হয়েছিল। 1938 খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ডাঃ অটলের নেতৃত্বে একটি চিকিৎসক দল (Medical Mission) চীনে প্রেরিত হয়েছিল। চীনের যুদ্ধরত সামরিক বাহিনীর সেবার জন্যই এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এটা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিল যে ফ্যাসীবাদের (fasism) বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্র ও সমাজবাদী শক্তির আসন্ন সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। বিশ্বের ঘটনাবলীর প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বে ভারতের স্থান কি হবে সেই বিষয়টি 1936 খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস সভাপতিরূপে প্রদত্ত জওহরলালের ভাষণে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "সর্বত্র স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম চলেছে, আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম তারই একটা অংশ মাত্র। যে শক্তি আমাদের এই সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে, সেই একই শক্তি বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের প্রেরণা জুগিয়েছে। ধনতন্ত্রবাদ বেকায়দায় পড়ে ফ্যাসীবাদের রূপ ধারণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের অধীন উপনিবেশগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে যে ঘাতকের ভূমিকা পালন করে এসেছে ফ্যাসীবাদ স্বদেশে সেই ভূমিকাই অনুসরণ করে চলেছে। পচনশীল ধনতন্ত্র বর্তমানে দুটি রূপে প্রাদুর্ভূত

হয়েছে—এ দুটি হল সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ। পশ্চিমের সমাজতন্ত্রবাদ এবং পরাধীন প্রাচ্য ভূখণ্ডের জাতীয়তাবাদ এই ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শত্রুরূপে আবির্ভূত হয়েছে।”

জওহরলাল নেহেরু জোর দিয়ে বলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে কোন সংগ্রামে ভারত গভর্নমেণ্টের যোগদানের ক্ষেত্রে ভারতবাসী তার বিরোধিতা করবে। তবে স্বাধীনতাকামী প্রগতিপন্থী যে কোন শক্তির সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খল চূর্ণ করার প্রচেষ্টায় তাঁর দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন থাকবে তার কারণ ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের সঙ্গে ভারতবাসীর সংগ্রাম অভিন্ন।

দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন

এই যুগের জাতীয় জীবনে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। এই সময়ে দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলিতে জাতীয় আন্দোলন বেশ ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। এই দেশীয় রাজা শাসিত অধিকাংশ রাজ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ বেশ ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। চাষীদের উপর উৎপীড়ন চলত। জমির খাজনা ও অন্যান্য ট্যাক্সের হার ছিল দুর্বহ, শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। স্বাস্থ্য এবং এই ধরনের সামাজিক সুবিধা ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। সংবাদপত্রের কোন স্বাধীনতা ছিল না। কাজেই জনসাধারণের অভাব অভিযোগ প্রকাশের কোন উপায় ছিল না। মোট কথা, দেশীয় রাজা শাসিত রাজ্যগুলিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা অত্যন্ত খর্বিত ছিল। রাজ্য থেকে যা আয় হত, তা শাসক নৃপতির বিলাসব্যসনেই ব্যয়িত হয়ে যেত। কোন কোন দেশীয় রাজ্যে দাস প্রথা, ভূমিদাস প্রথা এবং বেগার খাটানো প্রথা অবাধে চলত। অতীত কালে দুর্বল এবং অত্যাচারী দেশীয় নৃপতিদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রজারা বিদ্রোহ করত, তাছাড়া বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় শাসক নৃপতিগণ প্রজাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য অন্যায় অত্যাচার থেকে বিরত থাকত। ব্রিটিশ শাসনের আওতায় থেকে এখন আর দেশীয় নৃপতিদের বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা প্রজাবিদ্রোহের আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকতে হত না। ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতা তাদের কুশাসন ও অত্যাচারের অবাধ অধিকার ভোগ করার সুবিধা এনে দিয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল দেশীয় নৃপতিদের সাহায্যে দেশের জাতীয়

সংহতির অগ্রগতি সেই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতি রোধ। ব্রিটিশ সরকারের এই দুই অভীষ্ট পূরণ করে দেশীয় নৃপতিরা স্বরাজ্যে প্রজা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ব্রিটিশের সাহায্য প্রত্যাশা করত এবং কার্যতঃ এই সাহায্যও পেত। ব্রিটিশ প্রশ্রয়পুষ্ট দেশীয় নৃপতি সমাজ স্বাভাবিক কারণেই জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী হয়ে উঠেছিল। 1921 খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় নৃপতিদের একটি সংগঠন নরেন্দ্র মণ্ডল (Chamber of Prinees) নামে সংগঠিত হয়েছিল। নিয়মিত এই সম্মেলনে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে এই নৃপতিরা নিজেদের সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলাপ-আলোচনায় বসত। 1935 খ্রীষ্টাব্দে 'গভর্নমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট' বা ভারত শাসন আইনে ভারতে যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল, সেই পরিকল্পনায় দেশীয় নৃপতিদের প্রভূত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রভাব ও প্রসার রোধ। এই পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চতর সভা বা পরিষদে মোট আসনের পঞ্চমাংশের দুই অংশ ($\frac{2}{5}$) দেশীয় নৃপতিদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছিল। নিম্নতর সভা বা পরিষদে মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ দেশীয় নৃপতিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল।

এখন বহু দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্যের জনসাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার তথা জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের দাবি নিয়ে আন্দোলন সুরু করেছিল। এর আগেই 1927 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সারা ভারত দেশীয় রাজ্যবাসী প্রজা সম্মেলন সংগঠনটি (All India State People's Conference) আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতে দেশীয় রাজ্যগুলিতে বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং একযোগে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ। দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন দেশীয় রাজ্যবাসী জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। দেশীয় রাজ্যগুলিতেও রাজনৈতিক তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন বেশ তীব্র রূপ ধারণ করেছিল, এদের মধ্যে রাজকোট, জয়পুর, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুরের নাম উল্লেখযোগ্য। দেশীয় নৃপতিগণ অতি কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কোন কোন নৃপতি আন্দোলনের গতি পরিবর্তনের জন্য সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয়ও

নিয়েছিলেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর রাজ্যে এই প্রজা আন্দোলনকে মুসলিম বিরোধী আন্দোলন রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। আবার কাশ্মীর নৃপতি তাঁর রাজ্যের প্রজা আন্দোলনকে হিন্দু-বিদ্বেষী রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা তাঁর রাজ্যের আন্দোলনকে খ্রীষ্টানদের আন্দোলন রূপে ঘোষণা করেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যবাসী প্রজাদের এই সংগ্রামকে সমর্থনের জন্য এগিয়ে এসেছিল। কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিল যে তাঁরা যেন নিজ রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই সঙ্গে প্রজাদের কতকগুলি মৌলিক নাগরিক অধিকার দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছিল। 1938 খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এটা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিল যে ভারতের স্বাধীনতার অর্থ দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণেরও স্বাধীনতা। অর্থাৎ দেশীয় রাজগুলিকেও ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত করা হবে। পরের বৎসর ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে স্থির হয়েছিল যে দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রজা আন্দোলনের দিকেও কংগ্রেস বিশেষ মনোযোগ দেবে। 1939 খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহেরু সর্বভারতীয় দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এর থেকে বোঝা গিয়েছিল যে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ভারতবাসী এবং ব্রিটিশ আশ্রিত দেশীয় রাজ্যবাসী ভারতবাসীর আন্দোলনের একই লক্ষ্য। দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রজা আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে উঠেছিল, জাতীয়তাবাদ। দেশীয় রাজ্যবাসী প্রজাদের জাতীয়তা আন্দোলনে যোগদানের ফলে জাতীয় সংহতির ধারাটি বেশ পুরিপুষ্টি লাভ করেছিল।

সাম্প্রদায়িকতার জাগরণ ও প্রসার

এই কালের চতুর্থ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসার। ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সীমিত ভোটাধিকার এবং পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন হওয়াতে দেশবাসীর মনে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার উদ্ভব হয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্থাৎ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে কংগ্রেস দলভুক্ত মুসলিম প্রার্থীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত 482টি আসনের মধ্যে মাত্র 26টি আসন কংগ্রেস প্রার্থীদের হস্তগত হয়েছিল। এর মধ্যে 15টি আসন একমাত্র নর্থ ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার

প্রদেশ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। তবে মুসলিম লীগ নিজেরাও খুব বেশী আসন পায়নি। জিন্না পরিচালিত মুসলিম লীগ এখন জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এখন মুসলিম লীগের তরফ থেকে দিকে দিকে এই ধ্বনি শোনা গিয়েছিল যে মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ গ্রাস করে ফেলতে চাইছে। মুসলিম লীগ তার-স্বরে এই প্রচারে ব্রতী হয়েছিল যে হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি এবং তারা কখনও একসঙ্গে বাস করতে পারবে না। বলা বাহুল্য এই যুক্তিটি অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক। 1940 খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগ এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যে দেশকে ভাগ করতে হবে এবং স্বাধীনতার পর 'পাকিস্তান' নামে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

হিন্দুদের মধ্যে 'হিন্দু মহাসভা' জাতীয় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার কাজের সুবিধা এনে দিয়েছিল। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সুরে সুর মিলিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণও এই ধ্বনি তুলেছিল যে হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে পৃথক জাতি, আর ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুদেরই মাতৃভূমি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন হিন্দুরাও এই দ্বিজাতিতত্ত্বে সায় দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘুদের মন থেকে ভয় দূর করার জন্য স্বাধীন ভারতে তাদের বিশেষ স্বার্থসংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ এই বিশেষ স্বার্থ-সংরক্ষণ প্রচেষ্টা-প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেছিল। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এই প্রতিরোধ মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি। প্রত্যেক দেশেই, ধর্মীয় অথবা ভাষালঘু সম্প্রদায় তাদের সংখ্যাল্পতার কারণে কোন না কোন সময়ে এই আশঙ্কায় পীড়িত হয়ে এসেছে যে, দেশের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অধিকার হানি ঘটবে। তবে এই সব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে তাদের আশঙ্কা অমূলক, তাদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির কোন হানি ঘটবে না, তা যথোপযুক্ত রূপে সুরক্ষিত হবে। এইসব ক্ষেত্রে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যক্ষেত্রেও মেনে চলাই রীতিসিদ্ধ ছিল। ভারতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এক অংশ সাম্প্রদায়িক চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণের পথ গ্রহণ করলে সেক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠাই স্বাভাবিক হয়েছিল। 1930

খ্রীষ্টাব্দে যে সব অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সেইসব অঞ্চলগুলিই মুসলিম লীগের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। নর্থ ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরুত্ব ছিল, এইসব অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে কোন দুর্বলতা বোধ ছিল না। এই মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগ তথা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কি হিন্দু কি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী মাত্রেরই আক্রমণ বা বিরোধিতার লক্ষ্য ছিল জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাঙ্গলায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী দল মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতাবাদী দলকে কংগ্রেস বিরোধী মন্ত্রিসভা গঠনে সাহায্য দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদী দলগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সরকারী নীতি ঘেঁষা হয়ে উঠত। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বা সমর্থক কোন দল বা সম্প্রদায় কখনও বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য কোন আন্দোলনে কোনদিন কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি। এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের চোখে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ এবং বিশেষভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে শত্রু-স্থানীয় রূপে গণ্য হত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদের আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারেনি।

এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী দল বা সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের সামাজিক বা অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে মোটেই চিন্তা করত না, এ বিষয়ে যা কিছু চিন্তা-ভাবনা তা শুধু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দেরাই করতেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদী কর্মধারায় দেশবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা একটা মুখ্য স্থান অধিকার করেছিল। সাম্প্রদায়িক দলগুলি নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে শুধু কায়েমি স্বার্থ সম্পন্ন উচ্চবিত্ত সমাজের শ্রীবৃদ্ধির চিন্তাতেই নিয়োজিত থাকত। 1933 খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহেরু এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"বর্তমানে সাম্প্রদায়িক চিন্তার আশ্রয়ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক প্রতি-ক্রিয়াশীলতা। আজকে আমরা সর্বক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ

হয়েছে। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা তাদের শ্রেণীস্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য এমন একটা ছদ্মবেশ ধরেছে যেন একটি বিশেষ সংখ্যালঘু অথবা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাই তাদের একমাত্র মূলমন্ত্র। হিন্দু, মুসলমান অথবা অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের দাবিগুলি যদি খুঁটিয়ে বিচার করা হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে এই দাবিদাওয়াগুলির সঙ্গে দেশের জনসাধারণের কোনই সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ, দুঃখকষ্টের কোন প্রতিকার চিন্তা থেকে কোনও সাম্প্রদায়িক নেতা বা দল বহু দূরে অবস্থিত।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে জাতীয় আন্দোলন

1939 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে উঠেছিল। হিটলার তাঁর স্বদেশ জার্মানীর সীমা সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে পোলাণ্ড দেশ আক্রমণের ফলেই এই যুদ্ধের সূচনা হয়। ইতিপূর্বে তিনি 1938-এর মার্চ মাসে অস্ট্রিয়া এবং 1939-এর মার্চ মাসে চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্র দুটি গ্রাস করেছিলেন। ইতিপূর্বে ব্রিটেন ও ফ্রান্স হিট্‌লারকে তোয়াজ করার সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছিল কিন্তু সে চেষ্টা সফল না হওয়াতে এই দুই রাষ্ট্রের পক্ষেই পোলাণ্ডের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজনীয় কর্তব্য হয়ে উঠেছিল। ভারত সরকার বা 'গভর্নমেণ্ট অফ্‌ ইণ্ডিয়া' ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অথবা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা না করেই এই বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ফ্যাসীবাদী বা একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত দেশগুলির জনগণের প্রতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের সংগ্রামে সহযোগিতার জন্য কংগ্রেস পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে নিজেরা পরাধীন হয়ে তাঁরা কেমন করে অন্যের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে যোগদান করবেন। তাঁরা তাই দাবি উঠিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ রূপে ঘোষণা করা হ'ক, অন্ততঃ ভারতবাসীর হাতে এমন ক্ষমতা দেওয়া হ'ক যে ক্ষমতাকে তারা আক্রান্ত জাতিসমূহের সাহায্য করার কাজে ব্যবহার করতে পারে। ভারত সরকার ভারতের স্বাধীনতা তথা কোনপ্রকার ক্ষমতা প্রাপ্তির দাবি অগ্রাহ্য করায় কংগ্রেস তাদের শাসিত রাজ্যগুলির মন্ত্রিমণ্ডলকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল। 1940 খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী কয়েকজন বিশেষ

মনোনীত ব্যক্তিকে সীমিত রূপে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সত্যাগ্রহের ক্ষেত্র খুবই সীমিত রাখা হয়েছিল কারণ দেশব্যাপী একটা আন্দোলন সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বাধাদান অনুচিত মনে করা হয়েছিল। এই সীমিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে গান্ধীজী ভাইসরয়ের কাছে এই মর্মে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন—

"যে কোন একজন ব্রিটিশ নাগরিক যেমন নাৎসীবাদের বিজয়ের বিরোধী, কংগ্রেস'ও ঠিক সেই রকমই নাৎসীবাদের বিজয় আকাঙ্ক্ষা করে না। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে নাৎসী আগ্রাসন রোধের জন্য যুদ্ধে যোগদানের কথা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অবাস্তর। আপনি এবং ভারত সচিব (সেক্রেটরী অফ্ স্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া) একথা আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে সমগ্র ভারতবাসী স্বেচ্ছায় ভারত সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহায়তা দিচ্ছে। একথা এখন স্পষ্ট করে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে বিশাল সংখ্যক ভারতের মানুষ আপনাদের এই যুদ্ধ ব্যাপারে কোনপ্রকারে আগ্রহান্বিত নয়। ভারতে দুই ধরনের স্বৈরতন্ত্র কায়েম আছে। সুতরাং ভারতবাসীর চোখে নাৎসীবাদ ও স্বৈরতন্ত্রী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সমানভাবে ঘৃণিত।"

1941 খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে দুটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছিল। পশ্চিম ইউরোপের পোলাণ্ড, বেলজিয়ম, হলাণ্ড, নরওয়ে এবং পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ দেশ গ্রাস করে নাৎসী শাসিত জার্মানী 1941 খ্রীষ্টাব্দের বাইশে জুন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র (U. S. S. R) আক্রমণ করেছিল। এই বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসের সাত তারিখে জাপানী অতর্কিতভাবে পার্ল হার্বারে (পার্ল পোতাশ্রয়) আমেরিকান রণতরী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়েছিল, এই আক্রমণের অর্থ জাপান রাষ্ট্রের জার্মান ও ইতালী অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগদান। এর পর জাপান বাহিনী অতি দ্রুত ফিলিপাইন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয় এবং বার্মা আক্রমণ করেছিল। জাপান 1942 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রেঙ্গুন দখল করে নিয়েছিল। রেঙ্গুন জাপান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল বলা যেতে পারে।

এই অবস্থায় ভারত গভর্নমেন্ট যুদ্ধ ব্যাপারে ভারতবাসীর সক্রিয় সহায়তা লাভের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। ভারতবাসীর সহযোগিতা অর্জনের

উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতে একটা শুভেচ্ছা অর্জনকারী দল বা 'মিশন' পাঠিয়েছিল। এই মিশনের নেতা ছিলেন সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্, (Sir Stafford Cripps) ইনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মন্ত্রিসভার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ইতিপূর্বে ইনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে শ্রমিকদলের একজন বিশিষ্ট নেতা রূপে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক রূপেও ইনি পরিচিত ছিলেন। ক্রিপস্ ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতবাসীর স্বাধীনতা দাবির দ্রুত সমাধানই ব্রিটিশের ভারত-নীতির সার কথা। তাঁর এই ঘোষণা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে ব্রিটিশ নীতির এই রূপায়ণ বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আলাপ-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কংগ্রেস চেয়েছিল যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে ভারতবাসীর হাতে অবিলম্বে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে হবে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের এই প্রস্তাব মেনে নিতে চায়নি। অপরদিকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতের জন্য শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। কারণ এই সঙ্কটকালেও ভাইসরয় সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে স্বৈরাচারী রূপেই ভারত শাসন করে যাচ্ছিলেন। জাপানের সামরিক বাহিনী ভারতীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময় আক্রমণ চালিয়ে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এমন একটা অবস্থায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশের প্রতিরক্ষার কাজে সহায়তা করতে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তবে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভারতে একটা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই তাঁরা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করবেন।

ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতা ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশের প্রতি একটা তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি করেছিল। ভারতবাসী একনায়কতাবাদী ফ্যাসীবাদ বিরোধী শক্তিগুলির প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল থেকেও এটা অনুভব করেছিল যে দেশের এই দুঃসহ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদের আর কিছু করার নেই। ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার পর জাতীয় কংগ্রেস এখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ব্রিটিশকে ভারতের স্বাধীনতা দাবি মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য একটা সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। 1942 খ্রীষ্টাব্দের আটই আগষ্ট বোম্বাই-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। এই অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' (Quit India) প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে ব্রিটিশকে যে ভারত ত্যাগের

প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেটি গান্ধীজীর নেতৃত্বে একটি অহিংস গণআন্দোলনের মাধ্যমে কার্যে পরিণত করা হবে। প্রস্তাবটি ছিল এইরূপ ঃ

"...ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসান একান্ত প্রয়োজন, এটা শুধু ভারতের স্বার্থেই নয়, সম্মিলিত জাতিগুলির স্বার্থেও প্রয়োজনীয়... আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের লীলাক্ষেত্র ভারত একটা প্রশ্নচিহ্নের মত। ব্রিটেন এবং তার মিত্রশক্তিগুলি যে প্রকৃতই সদিচ্ছা সম্পন্ন ও স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক ভারতের স্বাধীনতাই তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে সক্ষম। ভারতের স্বাধীনতা আফ্রিকা ও এশিয়ার পদানত মানুষদের মনে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করবে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এর আশু সমাধানও প্রয়োজন, কারণ এর উপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে আছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনতা সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। স্বাধীন ভারত তার বিপুল শক্তি নিয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়বে, নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে সে চূর্ণ করে দেবে।"

আটই আগষ্ট রাত্রিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে গান্ধীজী বলেছিলেন "অতএব আমি অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই, এমনকি এই রাত্রির মধ্যেই, ঊষালগ্নের আগেই, যদি তা সম্ভব হয়।... প্রতারণা ও অসত্য আজ পৃথিবীতে উদ্দাম হয়ে উঠেছে...আপনারা নিশ্চিত জেনে রাখুন আমি মন্ত্রিত্ব বা এমনি কোন দাবি নিয়ে বড়লাট সাহেবের সঙ্গে দর কষাকষি করতে যাব না। পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে আর কিছুতেই আমার সন্তুষ্টি হবে না...। আমি আপনাদের একটা মন্ত্র দিচ্ছি যদিও এটা খুব সংক্ষিপ্ত। আপনারা এটা মনে গেঁথে নিন, এবং আপনাদের প্রতি নিঃশ্বাসে এই মন্ত্র সজীব হয়ে উঠুক। মন্ত্রটি হচ্ছে—কাজটি করব অথবা মরব (করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে)। আমাদের হয় দেশকে স্বাধীন করতে হবে নতুবা দেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমরা চিরকাল পরাধীনই থেকে যাব, বেঁচে থেকে এই দুর্গতি ভোগ আমরা কখনই করব না। বরং আমরা মরব।"

এই প্রস্তাবানুযায়ী কংগ্রেস ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন সুরু করার আগেই সরকারী কর্তৃপক্ষ কঠোর হস্তে এই আন্দোলন রোধ করতে নেমে পড়েছিল। প্রস্তাব গ্রহণের ঠিক পরদিন, ন'য়ই আগষ্ট প্রত্যুষকালে

গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে আর একবার বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল।

গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার সংবাদ পেয়ে দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। জনগণের রুদ্ধ রোষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা প্রবল বিক্ষোভ-মূলক আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। নেতৃহীন এবং সংগঠনহীন জনতা যেভাবে খুসী সেইভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনে মেতে উঠেছিল। দেশের সর্বত্র হরতাল, কলকারখানায়, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট এবং বিক্ষোভমূলক জনসমাবেশ দেখা দিয়েছিল। পুলিশ গুলিবর্ষণ অথবা লাঠি চালিয়ে এইসব বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করেছিল। কর্তৃপক্ষের বার বার গুলিচালনা ও দমননীতির তাণ্ডব লীলায় প্ররোচিত হয়ে বিক্ষুব্ধ জনতাও হিংসাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রতীক স্বরূপ পুলিশের থানা, পোস্টাপিস ও রেলওয়ে স্টেশনগুলি তারা আক্রমণ করেছিল। বিক্ষুব্ধ জনতা অনেক ক্ষেত্রে টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোনের তার কেটে ফেলেছিল, রেললাইন উৎপাটিত করেছিল ও সরকারী বাড়ী-ঘরে অগ্নিসংযোগ করেছিল। এই বিক্ষোভ আন্দোলন বিশেষভাবে বাঙ্লায় ও মাদ্রাজে বেশ গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। অনেক জায়গায় বিদ্রোহী জনতা ছোট বড় শহর ও গ্রামে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। উত্তর প্রদেশ, বিহার, বাঙ্লা, ওড়িশা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের নানাস্থানে ব্রিটিশ শাসন সাময়িক-ভাবে অপসৃত হয়েছিল। কোন কোন জায়গায় বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান্তরাল সরকার (Parallel Goverment) স্থাপন করে নিয়েছিল। এই গণবিদ্রোহে ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকেরাই নেতৃত্ব করেছিল। তবে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ এবং সরকারী প্রশাসন এই বিদ্রোহ থেকে দূরে ছিল।

সরকারী কর্তৃপক্ষ 1942-এর এই আন্দোলন দমনে কোন শৈথিল্য দেখায়নি। আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য নিষ্ঠুরতম দমননীতি অবলম্বিত হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলিকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিক্ষোভ প্রদর্শন-কারী জনতার উপর মেশিনগানের সাহায্যে গুলিবর্ষণ চলেছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছিল, জনতার প্রাণহানির কথা কোন ক্ষেত্রেই চিন্তা করা হয়নি। জেলের কয়েদীদের উপরও অকথ্য উৎপীড়ন চালানো হয়েছিল। পুলিশ ও গোয়েন্দা

পুলিশের হাতেই দেশকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ তারা যা খুশি তাই করার অধিকার পেয়েছিল। বহু ছোট বড় শহর সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। দশ সহস্রেরও অধিক মানুষ পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর লোকদের দ্বারা নিহত হয়েছিল। যে গ্রামে গণবিপ্লব দেখা দিয়েছিল সেইসব গ্রামবাসীর উপর পাইকারী কারে পিটুনি কর (Punitive Tax) ধার্য হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে সমস্ত গ্রামবাসীকে ধরে ধরে চাবকানো হয়েছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দের পর সরকারী দমননীতির ব্যাপক তাণ্ডবলীলা এমনভাবে আর কখনও দেখা যায়নি।

প্রচণ্ড দমননীতির প্রয়োগ করে অবশেষে একসময়ে গণআন্দোলন দমনে সরকারী কর্তৃপক্ষের সাফল্য লাভ ঘটেছিল। 1942-এর বিপ্লবরূপে অভিহিত গণঅভ্যুত্থান বস্তুতঃ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। তথাপি এই বিপ্লব থেকে এটা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়েছিল যে জাতীয়তাবাদী চেতনা দেশবাসীর মধ্যে বেশ গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে বসেছে। এই বিপ্লব থেকে আরও বোঝা গিয়েছিল যে দেশের মানুষের সংগ্রামী শক্তি কতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাধীনতার জন্য তারা কি পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

1942-এর বিপ্লব দমিত হওয়ার পর দেশে রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড লক্ষিত হয়নি। 1945 খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই অবসাদগ্রস্থ অবস্থার কারণ এই ছিল যে দেশবাসী যাঁদের নেতারূপে মেনে নিয়েছিল, তাঁরা সকলেই ব্রিটিশের কারাগারে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দেশবাসীকে নেতৃত্ব দেওয়ার মত কোন নবীন নেতার আবির্ভাব হয়নি। 1943 খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্‌লায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, সমসাময়িককালের ইতিহাসে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আর দেখা যায়নি। মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই না খেয়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষেরও অধিক মানুষ (Over 3 Millions) মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে পারত, কিন্তু সে চেষ্টা করা হয়নি। দেশের মানুষের মনে এইজন্য সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল। তবে এই ক্রোধ কোন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি।

জাতীয় আন্দোলন এই সময়ে আর এক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবে ঘটনাটি ঘটেছিল ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাইরে। সুভাষচন্দ্র বসু

1941 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতবর্ষ থেকে গোপনে অন্তর্ধান করেছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে সেখানে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সাহায্য সংগ্রহ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 1941 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন জার্মানীর পক্ষ ত্যাগ করে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগদান করায় তিনি জার্মানী বা জার্মান দেশে চলে যান। 1943 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি জার্মানী ত্যাগ করে জাপানে চলে যান। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাপানের সাহায্য লাভ করাই তাঁর জাপান গমনের উদ্দেশ্য ছিল। সিঙ্গাপুরে তিনি 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' নামে একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন (Indian National Army, সংক্ষেপে I. N. A.)। এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ছিল সামরিক অভিযান চালিয়ে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। রাসবিহারী বসু নামে একজন প্রবীণ বিপ্লবী তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর জাপান পৌঁছানোর আগেই জেনারেল মোহন সিং আই-এন-এ গঠনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এই জেনারেল মোহন সিং ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন 'ক্যাপটেন' বা নায়ক ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অধিবাসী অনেকেই এই আই-এন-এ সংগঠনে যোগ দিয়েছিল। এছাড়া মালয়, সিঙ্গাপুর এবং বার্মায় ব্রিটিশের ভারতীয় বাহিনীর বহু সৈন্য ও সেনানায়ক জাপানীদের হাতে ধরা পড়ে বন্দী হয়েছিল। এই বন্দী সৈন্য ও সেনা-নায়কেরাও এই 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' বা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে এর শক্তিবৃদ্ধি করেছিল। সুভাষচন্দ্র বসুকে এখন থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষেরা 'নেতাজী' নামে সম্বোধন করতে সুরু করে-ছিল। নেতাজী তাদের 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি তুলে যুদ্ধক্ষেত্রে অভিযানের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। জাপানী বাহিনী বার্মা জয় করে সেখান থেকে ভারতের দিকে অগ্রসর হয়ে আসার সময় নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের সঙ্গে ভারত অভিযানে যোগ দিয়েছিল। স্বদেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে অনুপ্রাণিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিক ও সেনাধ্যক্ষদের মনে এই আশার উদয় হয়েছিল যে তারা অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের প্রধান সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতের মুক্তিদাতা রূপে ভারতভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে।

1944-45 এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি পরিবর্তনে জাপানের পরাজয় ঘটে,

এর ফলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকেও পরাজয় বরণ করতে হয়। সুভাষচন্দ্র টোকিও যাত্রার পথে এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।* সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদী শক্তির সহায়তায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন, এটা ছিল তাঁর একটা কৌশল। অবশ্য, এই কৌশল তৎকালে ভারতের বহু জাতীয়তাবাদী নেতার সমর্থন লাভ করতে পারেনি। এতৎসত্ত্বেও আই-এন-এ সংগঠনের মাধ্যমে দেশপ্রেমের এক অতি উচ্চ আদর্শ তিনি দেশবাসী ও সামরিক বাহিনীর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন—এটা সর্বজন স্বীকৃত। অতঃপর দলমত নির্বিশেষে সমগ্র দেশ তাঁকে "নেতাজী" রূপে অভিনন্দিত করেছিল।

যুদ্ধপরবর্তী কালের স্বাধীনতা সংগ্রাম

1945 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অন্তে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আর একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। 1942-এর গণবিপ্লব এবং আই-এন-এর বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে ভারতবাসীর বীরত্ব ও স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই সময় জাতীয় নেতৃবৃন্দ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে এসেছিলেন, এখন জনগণ আর একটা স্বাধীনতা সংগ্রাম অথবা শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।

আই-এন্-এ বা আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর বন্দী সৈনিক ও সেনানায়কদের বিচারকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট গণআন্দোলন দেশে জেগে উঠেছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে দিল্লীর লালকেল্লায় (Red Fort) আই-এন্-এর জেনারেল শা নওয়াজ, গুরুদয়াল সিংধীলন ও প্রেম সেগল এর বিচার হবে। এঁরা সকলেই ছিলেন ব্রিটিশ সামরিকবাহিনীর সেনানায়ক বা অফিসর। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে এঁরা ব্রিটিশ রাজানুগত্যের শপথ ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ব্রিটিশের চোখে রাজদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক এই সেনাপতিগণ অবশ্য দেশবাসীর চোখে 'জাতীয়বীর' রূপেই প্রতিভাত হয়েছিলেন। তাঁরা দেশবাসীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। সারাদেশ জুড়ে এঁদের মুক্তির জন্য বহু বিক্ষোভ আন্দোলন ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সারাদেশ উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল,

* অনেকে অবশ্য এখনও এই ঘটনায় সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন—অনুবাদক

সবাই ভেবেছিল এবার স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের জয়লাভ সুনিশ্চিত। আই-এন-এর জাতীয় বীরদের ব্রিটিশ সরকারের হাতে শাস্তি পেতে হবে, দেশবাসীর কাছে এই চিন্তা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এমনই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আর আগের মত ভারতীয় জনমতকে উপেক্ষা করার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। সামরিক আদালতের বিচারে আই এন-এর বন্দী নেতৃবৃন্দ বিশ্বাসঘাতকার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকারী কর্তৃপক্ষ জনমতের চাপে এঁদের সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বা সরকারী কর্তৃপক্ষের এই পরিবর্তিত মনোভাবের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শক্তির তারতম্য ঘটিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে ব্রিটেন ছিল বিশ্বের সর্বপ্রথম শক্তিধর রাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে বিশ্ব রাজনীতিতে তার এই প্রাধান্য লোপ পেয়েছিল। এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.) এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র (U. S. S. R.) হয়ে উঠেছিল দুটি সর্বপ্রধান শক্তি। এই দুই রাষ্ট্রই ভারতের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে দল জয়লাভ করেছিল ব্রিটেন তার অন্যতম হলেও বিশ্বযুদ্ধান্তে তার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি ভেঙ্গে পড়েছিল। বোঝা গিয়েছিল যে ব্রিটেনের আর্থিক ও সামরিক বুনিয়াদ পুনর্গঠিত করতে হলে তা বহু সময়সাধ্য হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনে শাসকদলের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছিল। পূর্বতন সরকার রক্ষণশীল (Conservative) দলের পরিচালনাধীন ছিল, এখন এই সরকারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল শ্রমিকদল (Labour Party)। এই শ্রমিকদলের বহু নেতা ভারতের স্বাধীনতার দাবির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। বিটেনের সামরিক বাহিনীর মধ্যে একটা অবসাদ এসে গিয়েছিল। ছয় বৎসর ধরে স্বদেশ থেকে বহুদূরে যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় করার পর তাদের মনে রণস্পৃহা আর মোটেই ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনের জন্য অনির্দিষ্টকাল ভারতে থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মত শক্তি ও উদ্যম তাদের আর অবশিষ্ট ছিল না।

ভারত সম্বন্ধে ব্রিটিশের মতি পরিবর্তনের তৃতীয় কারণ এই ছিল যে সরকারী কর্তৃপক্ষ এখন বুঝে নিয়েছিল যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন দমন

অতঃপর আগের মত সহজসাধ্য হবে না। প্রশাসনভুক্ত ভারতীয় কর্মচারী অথবা ভারতীয় সেনাবাহিনী আগের মত আর ব্রিটিশের হুকুমে নিজের দেশবাসীর আন্দোলন দমন করতে চাইবে না। ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ব্রিটিশ পরিচালিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর শৌর্যের উপরই এতকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। আই-এন্-এ সংগঠনের ঘটনা থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এটা বুঝতে দেরী হয়নি যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়েছে, ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি তাদের আনুগত্য তাদের দেশপ্রেমের কাছে যেকোন মুহূর্তে তুচ্ছ হয়ে যেতে পারে। এই সময় আর একটি ঘটনায় সরকারী কর্তৃপক্ষ বেশ দুশ্চিন্তান্বিত হয়েছিল। 1946 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই সরকারী নৌবাহিনীর ভারতীয় নৌ-সৈন্যেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিয়েছিল। এই নৌ-সৈন্যেরা সাতঘণ্টা ধরে সামরিক ও নৌবাহিনীর ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়েছিল। জাতীয় নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপের ফলে শেষপর্যন্ত এরা আত্মসমর্পণ করেছিল, অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ করেছিল। সামরিক বিমান বাহিনীতেও ব্যাপকভাবে বিক্ষোভসূচক কর্মবিরতি বা ধর্মঘট চলেছিল। জবলপুরের সামরিক সঙ্কেত সংস্থা (Indian Signal Corps)-তেও কর্মবিরতির ঘটনা ঘটেছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র বা বুরোক্রেসির দুটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিল—প্রশাসন ও পুলিশ। এই দুই ক্ষেত্রেও ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে জাতীয়-চেতনা উন্মেষের লক্ষণ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ বুঝে নিয়েছিল আগে যেমন এদের সাহায্যেই জাতীয় আন্দোলন দমন করা যেত এখন আর তা সম্ভব হবে না। দুটি দৃষ্টান্ত থেকে কর্তৃপক্ষের চোখে এই অশুভ সঙ্কেত ধরা পড়েছিল। বিহার ও দিল্লী এই দুই স্থানে পুলিশ বাহিনীও 'কর্মবিরতি' বা ধর্মঘটে যোগদান করেছিল।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাব পরিবর্তনের চতুর্থ কারণটি ছিল এই যে, ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ়সঙ্কল্প এবং তাদের আত্মবিশ্বাস তাদের ভীতি উৎপাদন করেছিল। ব্রিটিশের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ভারতবাসী পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে আর মোটেই প্রস্তুত নয়। স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তারা চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। একদিকে নৌবিদ্রোহ অপরদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজ বন্দীদের মুক্তির জন্য ব্যাপক বিক্ষোভ আন্দোলন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দিয়েছিল। এছাড়াও 1945-46 খ্রীষ্টাব্দে বিক্ষোভ প্রদর্শনমূলক বহু

শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, হরতাল-ইত্যাদি ঘটনা দেশে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনাগুলি হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর এবং কাশ্মীরের মত দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্যেও দেখা দিয়েছিল। 1945 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আই-এন-এর বন্দীদের মুক্তি দাবি নিয়ে কয়েকলক্ষ মানুষের এক বিরাট শোভাযাত্রা কলকাতার পথ প্রদক্ষিণ করেছিল। প্রায় তিনদিন এই শহরের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। 1946 খ্রীষ্টাব্দের বারই ফেব্রুয়ারী এই শহরে আর একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়েছিল, এই মিছিলের দাবি ছিল একজন আই-এন-এ বন্দী আব্দুল রসিদের মুক্তি। বাইশে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই শহরে 'হরতাল' অনুষ্ঠিত হয়েছিল, শহরের কলকারখানা ও অফিস কর্মচারীরা সেদিন কাজে যোগ দেয়নি। এই হরতাল ও ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ছিল বোম্বাই-এর নৌ-বিদ্রোহে যোগদানকারী কর্মীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন। জনসাধারণের এই বিক্ষোভ দমনে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়েছিল। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে রাজপথে সামরিক বাহিনীর লোকদের হাতে মৃতের সংখ্যা হয়েছিল 250 জন।

সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক অশান্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এমন কোন জাতীয় শিল্পোদ্যোগ ছিল না, যেখানে 'ধর্মঘট' বা কর্মবিরতি ঘটেনি। 1946-এর জুলাই মাসে সারা ভারতে ডাক ও তার বিভাগের কর্মীরা 'কর্ম-বিরতি' পালন করেছিল। 1946-এর আগষ্ট মাসে দক্ষিণ ভারতের রেল কর্মীগণ কাজে যোগ না দিয়ে 'ধর্মঘট' করেছিল। কৃষক আন্দোলনও একটা অভূতপূর্ব তীব্র আকার ধারণ করেছিল। জমির স্বত্ব ও খাজনাকে কেন্দ্র করে হায়দ্রাবাদ, মালাবার, বাঙ্‌লা, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও মহারাষ্ট্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কৃষকদের সঙ্ঘর্ষ তীব্র রূপ নিয়েছিল। স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা এইসব হরতাল, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠনের নেতৃত্ব করতে এগিয়ে এসেছিল। এই পরিস্থিতিতে বিব্রত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 1946-এর মার্চ মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়ে গঠিত এক কমিটি গঠন করে এই কমিটির সদস্যদের ভারতে পাঠিয়েছিল। এই কমিটি 'ক্যাবিনেট মিশন' নামে খ্যাত। এই ক্যাবিনেট মিশনের উপর ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কি কি সর্তে ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে তা নির্ণয় করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। ক্যাবিনট মিশন বা মন্ত্রী মিশন

ভারতের জন্য একটি দ্বিস্তর যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা পেশ করেছিল। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল যে এতে জাতীয় ঐক্য অব্যাহত রেখে অঞ্চল বা প্রাদেশিক সরকারগুলি যথাসম্ভব স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করবে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রদেশগুলি এবং দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে ভারতীয়-যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে, এবং এই যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকার হিসেবে সমগ্র দেশের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও চলাচল বা যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ বা রাজ্যগুলি নিজেদের সুবিধামত আঞ্চলিক জোট বা ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে, ইচ্ছে করলে প্রদেশগুলি তাদের কোন কোন অধিকার এই আঞ্চলিক জোট বা ইউনিয়নের হাতে অর্পণ করতে পারবে। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুপক্ষই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চেয়েছিল কিন্তু এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রস্তাব ছিল যে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত করে সেই সরকারের পরিচালনার জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হবে এবং এই গণপরিষদই স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করবে। পরিকল্পনার এই অংশ নিয়ে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছিল। মোটামুটি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দুপক্ষই সম্মতি দিয়েছিল তার বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা নিয়েই এই মতভেদ ঘটেছিল। অবশেষে 1946 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেছিল। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়েছিল কিন্তু গণপরিষদ সৃষ্টির পর লীগ এই গণপরিষদ বর্জন করে বসেছিল। 1947 খ্রীষ্টাব্দের বিশে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই সময় একটি ঘোষণা প্রকাশ করেন যে 1948 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ভারতে যাই ঘটুক না কেন ইংরাজেরা ভারত ত্যাগ করবে অর্থাৎ ভারত শাসনের কোন দায়িত্বই এই সময়সীমার বাইরে তারা আর হাতে রাখবে না।

দেশের আসন্ন স্বাধীনতার সম্ভাবনা দেশবাসীর মধ্যে আনন্দ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করলেও তার মাঝে একটি গভীর বেদনা ও আশঙ্কার ছায়াপাতও ঘটেছিল। 1946 খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এবং তার পরেও দেশে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ পরস্পরকে এই দাঙ্গাহাঙ্গামার স্রষ্টা রূপে অভিযুক্ত করেছিল। নৃশংস হানাহানিতে এরা পরস্পরের সঙ্গে

প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। মানুষের মধ্যে মানবিকতার কণামাত্র স্পর্শরহিত এই নৃশংস ভ্রাতৃ-রক্তপাতের মানসিকতা এবং নিজের প্রচারিত সত্য ও অহিংস নীতির অমর্যাদায় গভীর বিষাদাচ্ছন্ন হৃদয়ে মহাত্মা গান্ধী পায়ে হেঁটে পূর্ববাংলা ও বিহারে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করার চেষ্টায় রত হয়েছিলেন। এছাড়াও বহু হিন্দু ও মুসলমান নেতৃস্থানীয় কর্মী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শান্ত করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু হায়, সাম্প্রদায়িকতার বিষ সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে তা' শান্ত করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। বিদেশী সরকারও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ইন্ধন জুগিয়েছিল। গান্ধীজী ও তাঁর মত আরও অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা এই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি ও হিংসা জাতীয় জীবন থেকে অপসৃত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁদের এই কল্যাণমূলক উদ্যোগ সাফল্যলাভ করতে পারেনি।

1947 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লর্ড লুই মাউণ্টবেটেন (Lord Louis Mountbatten) ভারতের বড়লাট বা 'ভাইসরয়' রূপে কাজে যোগদান করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে বহু আলাপ-আলোচনার পর তিনি একটা মীমাংসা সূত্র খুঁজে বের করেন। তাঁর এই সূত্র ছিল যে ভারত অবশ্যই স্বাধীন হবে, তবে দেশটি ঐক্যবদ্ধ থাকবে না, দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে। ভারত ভাগ হবে এবং তারই একাংশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে। দুটিই হবে স্বাধীন দেশ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় ব্যাপক লোক-ক্ষয় ও রক্তপাতের সম্ভাবনা পরিহারের আশায় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ভারত ভাগ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে তাঁরা দ্বি জাতি তত্ত্ব অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানগণ ভিন্ন জাতি, মুসলমানগণ ভারতীয় জাতি নয়, মুসলিম লীগের এই তত্ত্ব মেনে নেননি। মুসলিম লীগের দাবি ছিল যে দেশের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে, কারণ ভারতের লোক-সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইসলামধর্মী। জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই দাবি মেনে নিতেও সম্মত হননি। তাঁদের প্রস্তাব এই ছিল যে দেশের যে যে অংশে মুসলিম লীগের প্রভাব বেশী শুধু সেই অংশগুলিই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের সিলেট জেলায় ইসলামধর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সেখানে মুসলিম লীগের প্রভাব

বেশী ছিল না। এই দুইক্ষেত্রে গণভোটের ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। মোটকথা, জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্য এই ছিল দেশ ভাগ করা যেতে পারে, তবে সেটা হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে করা হতে দেওয়া হবে না।

ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ দেশ বিভাগে স্বীকৃত হলেও শেষ পর্যন্ত কখনই মেনে নেননি যে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান পৃথক পৃথক দুটি জাতি, অর্থাৎ মুসলিম লীগ প্রচারিত দ্বিজাতি তত্ত্বকে তাঁরা গ্রহণ করেননি। বিগত সত্তর বছর ধরে হিন্দু ও মুসলমান বিরোধ তথা সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব একটা ঐতিহাসিক সত্যে পর্যবসিত হয়েছিল। এই সাম্প্রদায়িকতা এমন একটা অবস্থায় এসে পৌছেছিল যখন দেশ বিভাগ অস্বীকার করলে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের উন্মত্ততাপ্রসূত নিষ্ঠুর, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতার আগুনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা জেগে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেশের কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সেটা সংযত করতে পারতেন। হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষ রোধ করার কোনরকম সামর্থ্য থাকলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দৃঢ়ভাবে এই বিভাজন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষ অর্থাৎ এই ভ্রাতৃহত্যার ঘটনাগুলি দেশের প্রায় সর্বত্র ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল আর এই সঙ্ঘর্ষে কোন এক বিশেষ সম্প্রদায় লিপ্ত হয়নি, মুসলমানদের মতই বহু হিন্দুও এই ভ্রাতৃহত্যায় অংশ নিয়েছিল। সর্বোপরি, তখন দেশে ব্রিটিশ-রাজ কায়েম ছিল, বিদেশী শাসন কর্তৃপক্ষ এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই সময়ে বিদেশী সরকার ভেদ-নীতির আশ্রয় নিয়ে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা যাতে ঘটতে পারে তার উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিত। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের ভারত শাসনের শেষ পর্যায়ে এসে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কেন ইন্ধন যোগাত, তার একটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। সম্ভবতঃ এরা চেয়েছিল যে দুটি স্বাধীন দেশের জন্মলাভ আসন্ন সেই দুটি দেশ যেন পারস্পরিক বিদ্বেষ নিয়েই তাদের যাত্রা সুরু করে। স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তানের কল্যাণ তারা চায়নি।*

* সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে 1946 খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহেরু তাঁর ভারত আবিষ্কার গ্রন্থে (Discovery of India) নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন :

"এটা নিশ্চয়ই আমাদের দোষ ; এই দোষের কর্মফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। তবে

1947 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের তিন তারিখে ঘোষণা করা হল যে ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। দেশীয় রাজ্যগুলির নৃপতিদের এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের যে কোন একটি রাষ্ট্রে যোগদানের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির নিজ নিজ এলাকার মধ্যে গণসংগঠনসমূহের চাপে, এবং ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের অতি উচ্চস্তরের কূটনৈতিক কুশলতার প্রভাবে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করেছিল। জুনাগড়ের নবাব, হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা কিছুকাল কোন বিশেষ রাষ্ট্রে তাদের রাজ্য যোগদান করবে এ বিষয়ে মনস্থির করে উঠতে পারেননি।

কাথিয়াওয়ার উপকূলে জুনাগড় একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্যের প্রজাদের মতের বিরুদ্ধে জুনাগড়ের নবাব এক সময়ে পাকিস্তানে যোগদানের ঘোষণা প্রকাশ করেন। এর পরিণামে ভারতীয় সৈন্যেরা জুনাগড় প্রবেশ করে এটি দখল করে। পরে এখানে গণভোটে দেখা যায় যে জনগণ ভারত রাষ্ট্রে যোগদানেরই পক্ষপাতী। হায়দ্রাবাদের নিজাম পাকিস্তান অথবা ভারত কোন রাষ্ট্রের 'অন্তর্ভুক্ত না হয়ে হায়দ্রাবাদকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে ঘোষণার চেষ্টা করেন। কিন্তু 1948 খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ রাজ্য ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিল। এর পশ্চাতে দুটি কারণ ছিল—হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে নিজামের বিরুদ্ধে প্রবল গণবিদ্রোহ, এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর হায়দ্রাবাদ অভিযান। কাশ্মীরের মহারাজাও ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু কাশ্মীরের জনগণের আস্থাভাজন জাতীয় সম্মেলন (National Conference) ভারতে যোগদানের পক্ষপাতী ছিল। 1947 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পাঠান এবং সরকারীভাবে পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী নয় অথচ পাকিস্তানের প্রশ্রয়প্রাপ্ত সামরিক বাহিনী হানাদার রূপে কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল। এই অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে কাশ্মীরের মহারাজা ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে সুচিন্তিতভাবে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির সৃষ্টি করে যেভাবে তা লালনপালন করেছে, তার জন্য তাদের আমি কখনও ক্ষমা করতে পারব না। আমাদের উপর বহু আঘাত এসেছে, তা আমরা সামলে নিয়েছি। কিন্তু ব্রিটিশের কল্যাণে প্রাপ্ত এই যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির ক্ষত, তা বহুকাল ধরে আমাদের পীড়িত করতে থাকবে।"

1947 খ্রীষ্টাব্দের পনেরই আগষ্ট ভারতবর্ষ মহানন্দে তার প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছিল। কয়েকটি প্রজন্মের দেশপ্রেমিক এবং অগণিত শহীদের শোণিতপাত ও আত্মোৎসর্গ এতদিনে সাফল্যলাভ করেছিল। তাঁরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল। 1947 খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের 14 তারিখে গভীর রাত্রে জওহরলাল নেহেরু গণপরিষদে প্রদত্ত একটি স্মরণীয় ভাষণে বলেছিলেন "বহু বহু দিন পূর্বে অনাগত অদৃষ্টের কাছে আমরা একটি সঙ্কল্প-সঙ্কেত পাঠিয়েছিলাম। আজ আমরা সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে এসেছি, অবশ্য আমরা যা চেয়েছিলাম তার সবটুকু আমরা এখনও পাইনি, তবে যা পেয়েছি তার মূল্য কিছু কম নয়। মধ্যরাত্রে ঘড়িতে বারোটা বেজে যাবে, পৃথিবী তখন সুপ্তিমগ্ন থাকবে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ভারতে জীবন জেগে উঠবে, সেই জাগরণ সর্বপ্রথম স্বাধীনতার পরিবেশে ঘটবে। ইতিহাসে কত কি ঘটে যায়, কিন্তু কোন বিশেষ মুহূর্ত এমন কিছু পরিস্থিতি নিয়ে আসে ইতিহাসে যার পুনরাবৃত্তি দুর্লভ। এই সময় আমরা পুরাতন পরিবেশ থেকে নূতন পরিবেশে প্রবেশ করি। একটি যুগান্ত ঘটে, এবং দীর্ঘকাল ধরে একটি নির্যাতিত জাতির আত্মা তার আত্মপ্রকাশের ভাষা খুঁজে পায়। এই পবিত্র মুহূর্তে ভারত এবং ভারতবাসীর সেবার জন্য আমরা আত্মোৎসর্গ করব এই সঙ্কল্প গ্রহণ আমাদের উচিত কর্তব্য। শুধু তাই নয় মানবতার বৃহত্তর স্বার্থেও আমরা আমাদের নিয়োজিত করব—এই সঙ্কল্পও গ্রহণ করতে হবে।...আজ ভারতে দুর্দিনের অবসান হচ্ছে, ভারত আজ আবার নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে। আজ আমরা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আনন্দ উৎসব পালন করছি। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্বাধীনতালাভের পূর্বে আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অনেককিছু কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এই প্রতিশ্রুতি-গুলি কাজে পরিণত করার চেষ্টা আমাদের অবিরত চালিয়ে যেতে হবে, উৎসব মুহূর্তে এটা স্মরণ-রাখা আমাদের খুবই প্রয়োজন।"

কিন্তু যে উৎসাহ ও আনন্দ ব্যাপকভাবে এই শুভক্ষণে প্রত্যাশিত ছিল তা দেখা যায়নি। দেশবাসীর মনে আনন্দের আবির্ভাব অবশ্যই হয়েছিল কিন্তু এই আনন্দের সঙ্গে দুঃখ ও বেদনার সংমিশ্রণও ঘটেছিল। ভারতের সংহতির স্বপ্ন টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, এক ভাই আর এক ভাইয়ের সান্নিধ্য থেকে দূরে চলে গিয়েছিল। সবচেয়ে দুঃখদায়ক ঘটনা এই ছিল, যে ঠিক স্বাধীনতার উষা-লগ্নে ভারত ও পাকিস্তানে সহস্র সহস্র নরনারী

সাম্প্রদায়িকতা প্রসূত পৈশাচিক বর্বরতা ও নৃশংসতার অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে নিঃশেষিত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী তাদের বহু পুরুষের বাসভূমির মায়া ত্যাগ করে কেউবা ভারতে কেউবা পাকিস্তানে আশ্রয়ের আশায় ছুটেছিল।* বিয়োগান্ত নাটকের এই দৃশ্যে জাতীয় মহত্বের প্রতীকরূপে এক নিঃসঙ্গ পথিকরূপে প্রতীয়মান ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এই গান্ধীজী দেশবাসীর কাছে অহিংসা, সত্য, প্রেম, শৌর্য ও মনুষ্যত্বের বাণী প্রচার করেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর ও মহৎ মহাত্মার চরিত্রে তারই প্রতিফলন ঘটেছিল। স্বাধীনতার আনন্দে যখন দেশ উৎসব মগ্ন, গান্ধীজী তখন বাঙলায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও অযৌক্তিক সাম্প্রদায়িক বিবাদে উন্মত্ত ও বিপদগ্রস্ত মানুষদের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য পর্যটন রত ছিলেন। স্বাধীনতার আনন্দ উৎসব সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার আগেই 1948 খ্রীষ্টাব্দের তিরিশে জানুয়ারী গান্ধীজী এক আততায়ীর গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সত্তর বৎসরেরও অধিককাল ধরে যে জ্যোতি দেশে ভাস্বর হয়ে বিরাজ করেছিল—হিংসাশ্রয়ী এক বিপথ-গামী হিন্দু সেই জ্যোতিশিখাকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়েছিল।** বলা যেতে

* এই সময়ের আলোচনা প্রসঙ্গে নেহেরু পরবর্তী কালে লিখেছিলেন—"ভয় এবং ঘৃণা সেদিন আমাদের চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করেছিল। সভ্যতা মানুষকে যে সংযম শিক্ষা দিয়ে থাকে, সেই সংযম আমরা তৎকালে বিসর্জন দিয়েছিলাম। একের পর এক অতি ভয়াবহ নৃশংসতা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। মানুষের এই নৃশংস বর্বরতার ঘটনাগুলি আমাদের দিশাহারা ও স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। একটা শূন্যতা যেন আমাদের গ্রাস করে ফেলেছিল। কোথাও যেন কোন আলোর নিশানা ছিল না। তবে তারই মধ্যেই ঝঞ্ঝার মধ্যে কোথাও কোথাও যেন একটু করে কল্পিত আলোর রেখা দেখা গিয়েছিল। যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের জন্য আমরা দুঃখ অনুভব করেছিলাম। মুমূর্ষুদের জন্য আমরা দুঃখিত হয়েছিলাম। আবার যারা তখনও পর্যন্ত মরেনি তাদের দুঃখকষ্ট মৃত্যুর অধিক দুঃখদায়ক হয়েছিল, এদের জন্যও আমরা অশ্রু বিসর্জন করেছিলাম।

আমরা দেশের এই দুঃখজনক অস্থির অবস্থায় আরও ব্যথিত হয়েছিলাম। ভারত ত আমাদের সকলেরই জননী (পাকিস্তানবাসীদেরও)। কত সুদীর্ঘকাল ধরে আমরা এই দেশের স্বাধীনতার জন্য কতই না সংগ্রাম করেছি।"

** 1947 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন যে তিনি আর বেশী দিন বাঁচতে চান না। ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রার্থনা তিনি যেন তাঁকে এই রোদন-মুখর দেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। হিন্দু অথবা মুসলমান নামধারী কিছু মানুষ নৃশংস বর্বরতার আশ্রয় নিয়ে যে ঘৃণিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সেই পরিবেশে অতঃপর একজন অসহায় দর্শক হয়ে তিনি আর বেঁচে থাকতে চান না। এই জন্যই তিনি ঈশ্বরের কাছে নিজের মৃত্যু প্রার্থনা করছেন।

পারে যে—গান্ধীজী যে জাতীয় সম্প্রীতির জন্য জীবন ব্যয়িত করেছিলেন, সেই জাতীয় সম্প্রীতি রক্ষার্থেই তিনি আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।

দেশের স্বাধীনতালাভ বস্তুতঃ একটি পদক্ষেপ মাত্র ছিল। জাতীয় পুনর্গঠনের প্রধান অন্তরায় ছিল যে বিদেশী শাসন, সেই প্রবল বাধাটিই স্বাধীনতালাভের ফলে অপসৃত হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনগ্রসরতা, কুসংস্কার, অসাম্য ও অজ্ঞানতা দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই আবর্জনা অপসারণের কাজ দীর্ঘ সময়সাধ্য এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর সেই কাজ মাত্র সুরু করা হয়েছিল। মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে 1941 খ্রীষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মন্তব্য প্রকাশ করে গিয়েছিলেন—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে?"

ভারতের মানুষ এখন তাদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান এবং সাফল্য অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তাদের দেশের অবস্থা পরিবর্তনের কাজে নেমেছে। তারা একটি জনকল্যাণমূলক ন্যায়বিচার সম্মত সমাজ গড়ে তুলতে চায়।

অনুশীলনী

1. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কালের ঘটনাবলী কিভাবে সাধারণভাবে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলিতে ও বিশেষভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিল তা বর্ণনা কর।
2. রাজনৈতিক নেতারূপে গান্ধীজীর আবির্ভাব কিভাবে ঘটেছিল এবং তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদের মূল নীতিগুলি ব্যাখ্যা কর।
3. 1919 থেকে 1922 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ কিভাবে হয়েছিল তা' লিখ।
4. 1927 থেকে 1929 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয়-জাগরণের বিভিন্ন দিকগুলি কি ছিল?
5. 1929 খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন থেকে 1934 খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের গতি পর্যালোচনা কর।

6. কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার উদ্ভব, বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে কংগ্রেস দলের মনোভাব, দেশীয় রাজ্যসমূহে জাতীয় আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উদ্ভব প্রভৃতি 1930 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কাল থেকে ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ কর।

7. 1945 খ্রীষ্টাব্দের পর ভারত সম্বন্ধে ব্রিটিশ মনোভাব পরিবর্তনের কারণ কি?

8. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাব কি ছিল? এই মহাযুদ্ধ-কালে ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের কোন অগ্রগতি হয়েছিল কি? "ভারত ছাড়" প্রস্তাব, 1942-এর বিপ্লব এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা কর।

9. সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ :—

(a) মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার (b) রাওলাট য়্যাক্ট (c) স্বরাজ্যদল (d) 1925 খ্রীষ্টাব্দের পর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (e) 1935 খ্রীষ্টাব্দের গভর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট (f) ক্যাবিনেট (মন্ত্রী) মিশন (g) গান্ধীজী ও ভারত বিভাগ (h) ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহের সংযুক্তি।
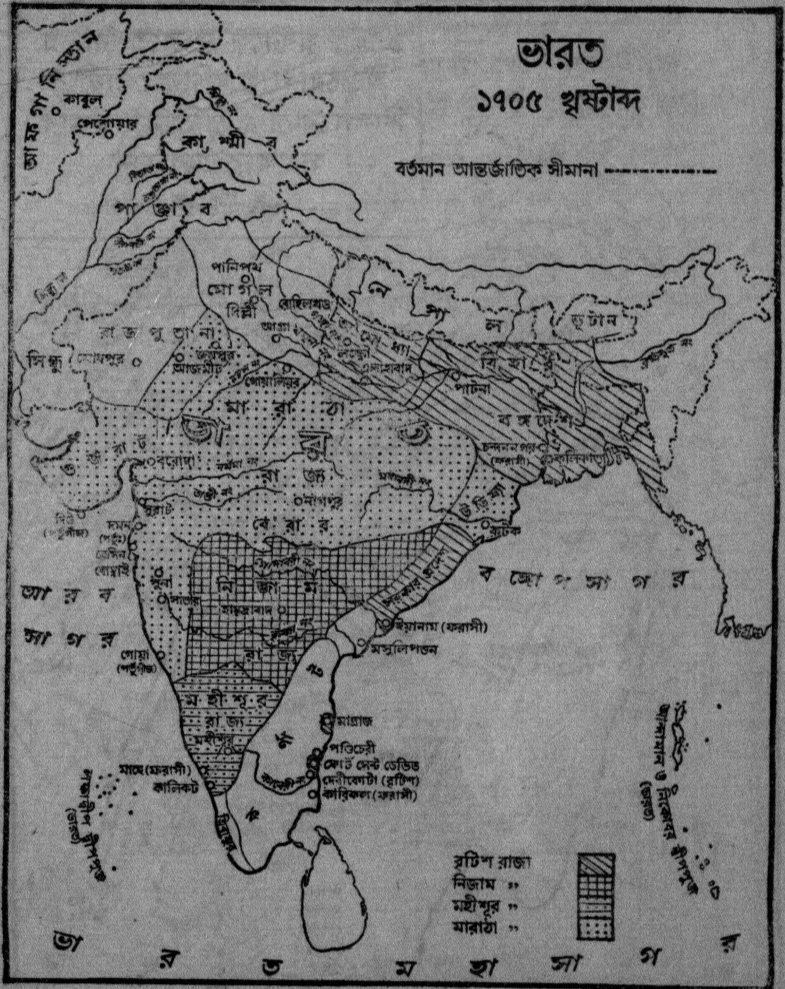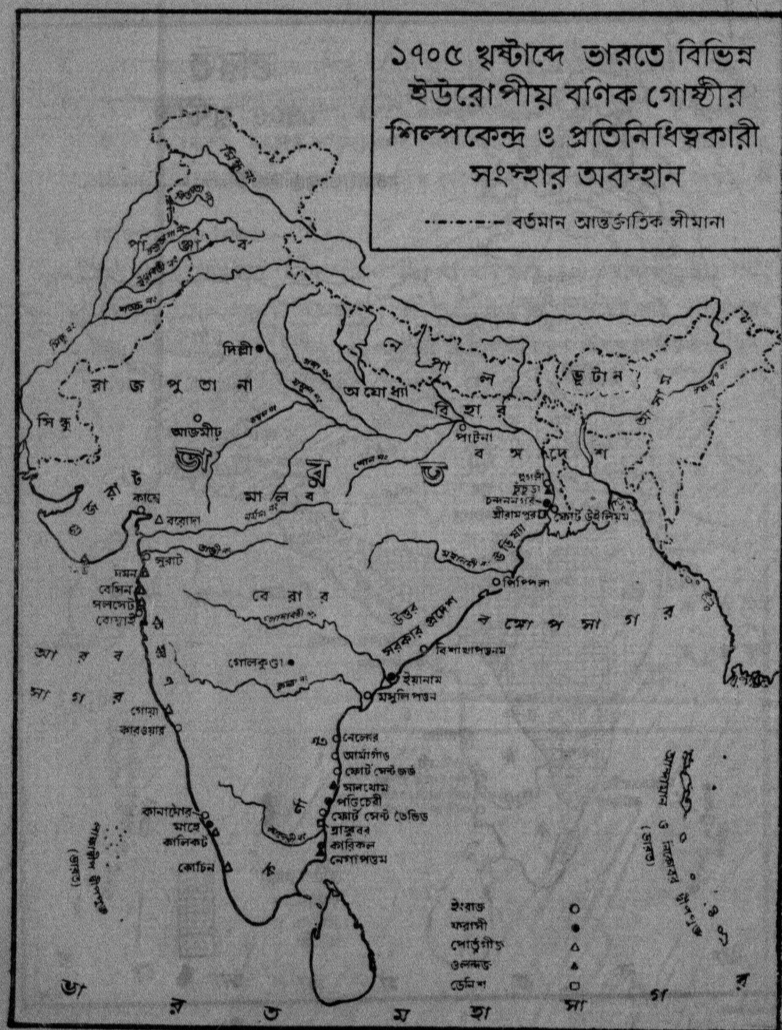
পরিশিষ্ট ক

ভারত

১৭০৫ খৃষ্টাব্দ

বর্তমান আন্তর্জাতিক সীমানা ------

বৃটিশ রাজ্য
নিজাম „
মহীশূর „
মারাঠা „

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর শিল্পকেন্দ্র ও প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার অবস্থান

-·-·-·- বর্তমান আন্তর্জাতিক সীমানা

দিল্লী
রাজপুতানা
সিন্ধু
আজমীঢ়
অযোধ্যা
নেপাল
ভুটান
বিহার
পাটনা
বঙ্গদেশ
ভারত
মালব
গুজরাট
কাম্বে
বরোদা
সুরাট
দমন
বেসিন
সলসেট
বোম্বাই
বেরার
উত্তর সরকার প্রদেশ
পিপলি
হুগলী
চুঁচুড়া
চন্দননগর
শ্রীরামপুর
ফোর্ট উইলিয়াম
বঙ্গোপসাগর
বিশাখাপত্তনম
ইয়ানাম
মসুলিপত্তন
গোলকুণ্ডা
আরব সাগর
গোয়া
কারওয়ার
নেল্লোর
আর্মাগাঁও
ফোর্ট সেন্ট জর্জ
সানথোম
পণ্ডিচেরী
ফোর্ট সেন্ট ডেভিড
ট্রাঙ্কুবার
কারিকল
নেগাপত্তম
কানানোর
মাহে
কালিকট
কোচিন
ভারত মহাসাগর

ইংরাজ ○
ফরাসী ●
পোর্তুগীজ △
ওলন্দাজ ▲
ডেনিশ □

পরিশিষ্ট খ
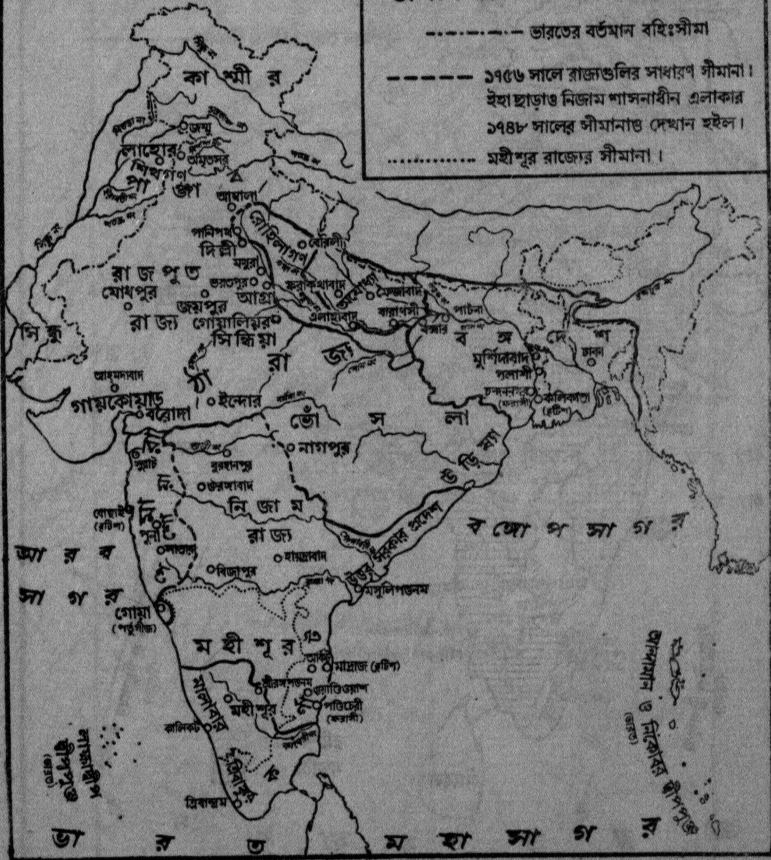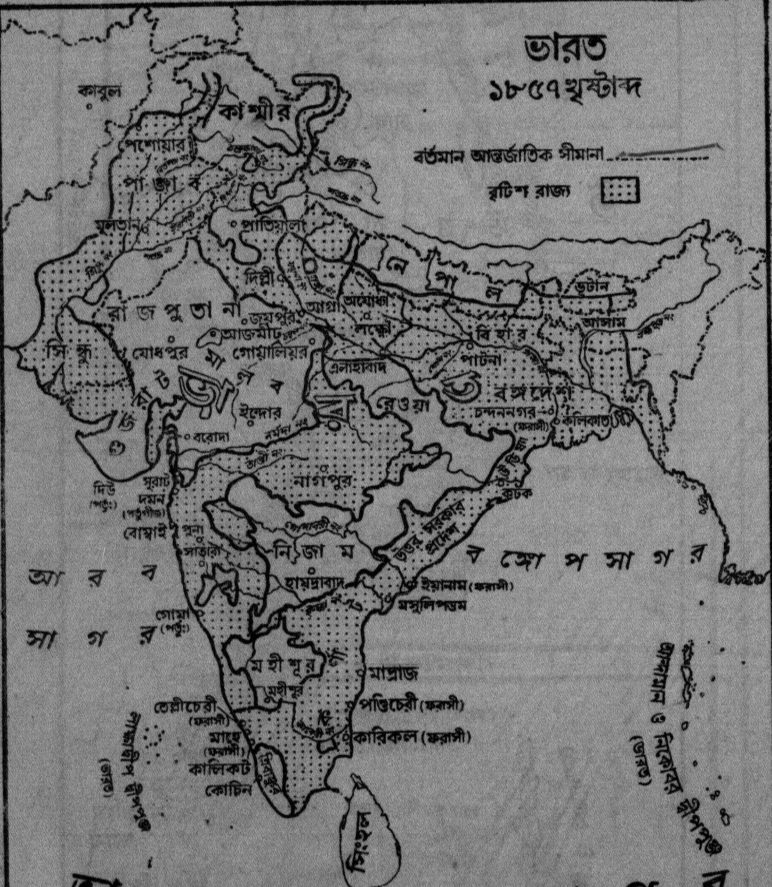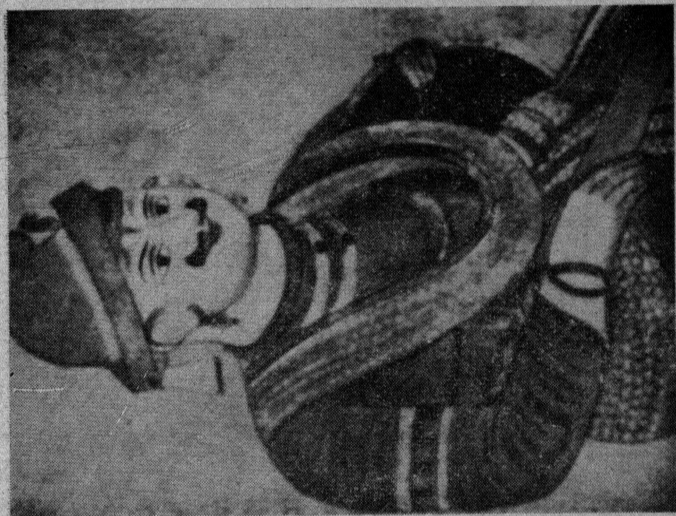
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

নানা সাহেব

টিপু সুলতান

স্বামী দয়ানন্দ

রাজা রামমোহন রায়

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
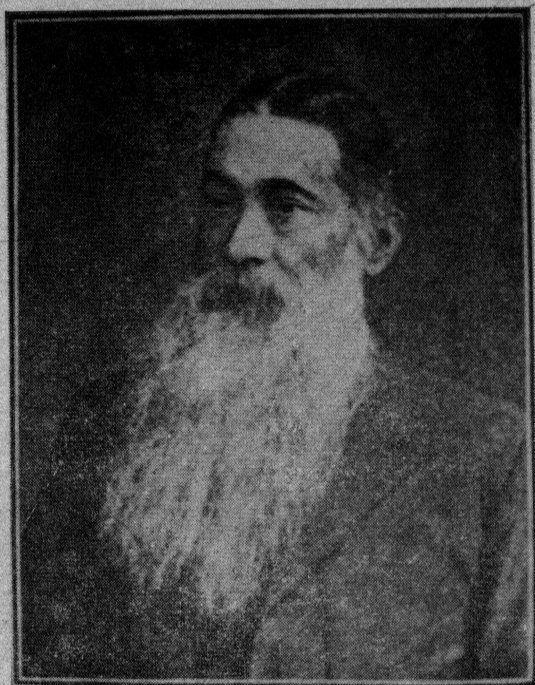
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(W. C. Bonnerjee)
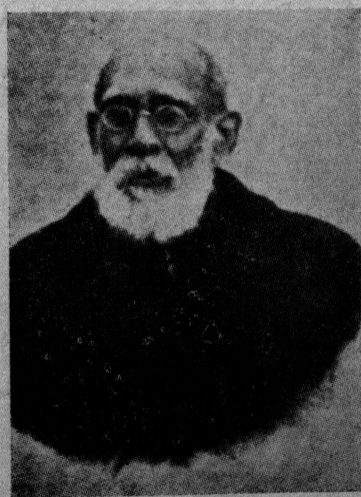
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ

বিপিনচন্দ্র পাল

দাদাভাই নৌরোজী

বালগঙ্গাধর তিলক
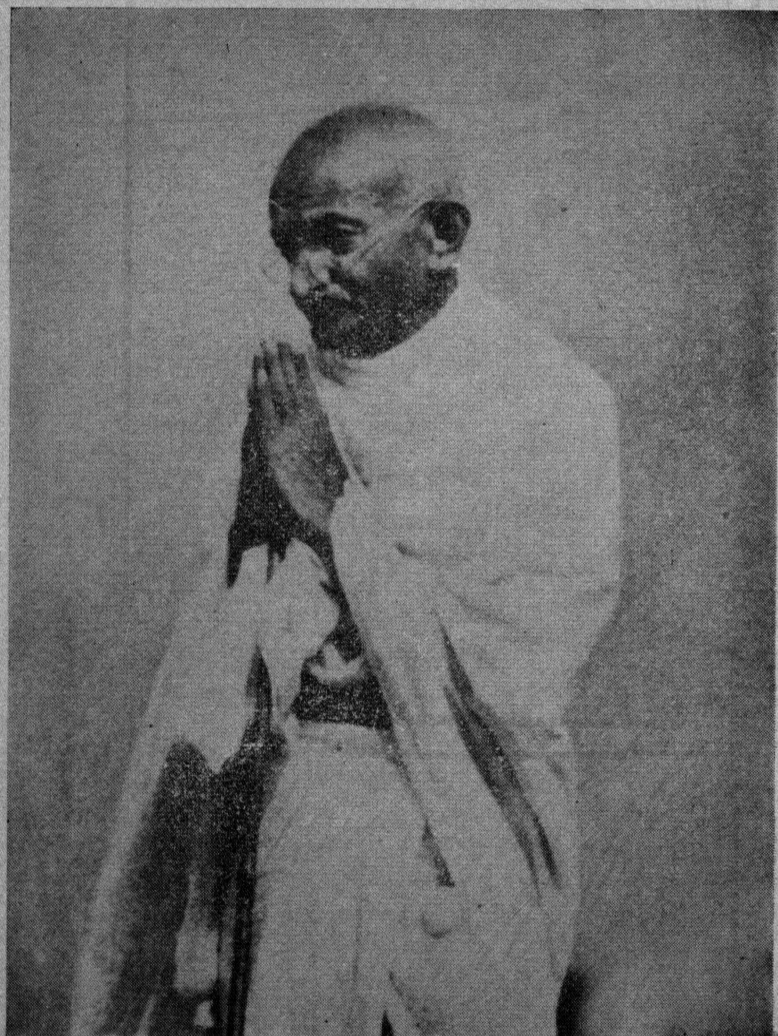
মহাত্মা গান্ধী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না

শহীদ ভগৎ সিং

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
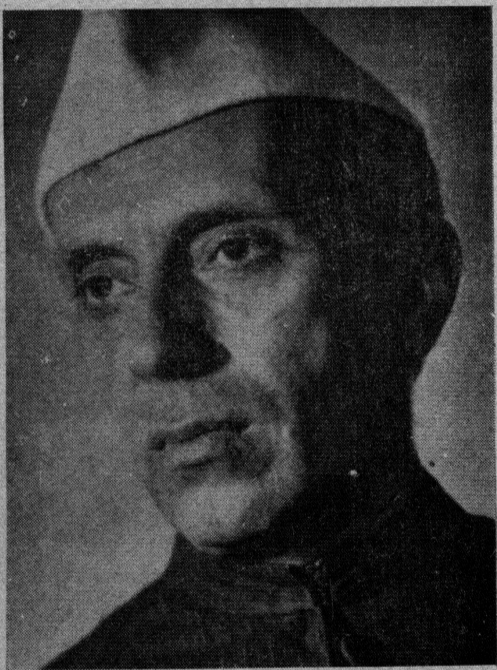
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

আমাদের দেশে আমদানি দ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশই ইংলণ্ডে প্রস্তুত। বাণিজ্যশুল্ক ধার্য করিবার পদ্ধতি ব্রিটিশ শিল্পের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত শুল্কলব্ধ রাজস্ব দরিদ্রের দুঃখ নিরাকরণে ব্যয়িত না হইয়া একটি ব্যয়বহুল শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মুদ্রা বিনিময়-নীতি আরও অধিক যথেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক, ইহার ফলে কোটি কোটি টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

"রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকিয়া ভারতের যেরূপ হীনাবস্থা হইয়াছে, সেরূপ হীনাবস্থা আর কখনও হয় নাই। কোনপ্রকার শাসন সংস্কারই ভারতবাসীকে প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে নাই। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকেও পর্যন্ত বিদেশী কর্তৃপক্ষের নিকট অবনত হইতে হয়। আমরা স্বাধীন মত প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে মেলা-মেশার অধিকারে বঞ্চিত। আমাদের দেশের অনেককেই নির্বাসিত অবস্থায় বিদেশে কাল কাটাইতে হইতেছে। তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন না। শাসনকার্য পরিচালনার উপযোগী সমস্ত প্রতিভার বিলোপ-সাধনের ফলে জনসাধারণকে শুধু কেরাণীগিরি বা ক্ষুদ্র গ্রাম্যচাকুরী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

"সভ্যতার দিক দিয়া বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতি আমাদিগকে আমাদের বিশিষ্ট ভাবধারা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ফলে যে শৃঙ্খল আমাদিগকে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খলকেই আমরা আদর করিতে শিখিয়াছি। মনুষ্যত্বের দিক হইতে বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদিগকে নির্বীর্য করিয়াছে। আমাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাকে নিষ্পেষণ করিবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিজাতীয় সৈন্যদলের উপস্থিতির মারাত্মক ফল এই হইয়াছে যে, উহাদিগকে দেখিয়া আমরা মনে করি যে, বিদেশীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এমনকি চোর, ডাকাত, গুণ্ডা প্রভৃতির হাত হইতে নিজেদের ঘরবাড়ী, পরিবার রক্ষা করিতেও আমরা অসমর্থ।

"যে শাসনপদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতুর্বিধ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেই শাসনপদ্ধতির অধীনে আর মুহূর্তকালও বাস করা আমরা মনুষ্যত্ব ও ধর্মের দিক হইতে অপরাধ বলিয়া মনে করি। একথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, হিংসাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা নহে। সুতরাং আমরা ব্রিটিশের সহিত সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা যথাসাধ্য বর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব এবং করপ্রদান বন্ধ এবং অন্যান্য উপায়ে নিরুপদ্রব

প্রতিরোধনীতি অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে—উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি হিংসার পথ অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা বর্জন করিতে পারি এবং কর-প্রদানে বিরত হই তবে এই অমানুষিক শাসনতন্ত্রের অবসান সুনিশ্চিত। অতএব এতদ্বারা আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যখন যেরূপ নির্দেশ দিবেন, আমরা সেই নির্দেশ ঐকান্তিকভাবে পালন করিব।"